

182. Ob. 923. 2 (5)

বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ

754

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, “বসুমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী প্রেসে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১।।০ টাকা ।]

182. Ob. 923. 2 (5)

বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ

754

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, “বসুমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী প্রেসে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১।০ টাকা ।]

চক্র

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে স্থানি চ দুঃখানি চ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উৎসর্গ

হে আমার শৈশবের সুখময় দিবারাতি !
অম্লান তারকা সম তোদের বিমল-ভাতি,
আজিও এ প্রাণ মন রহিয়াছে উজলিয়া ।
স্মরণে আসিয়া আজও উঠে চিত উথলিয়া ॥
স্নেহময় পিতামহ দেব-দেবী পিতামাতা,
ত্রিজগতে অতুলনা ; দিদির স্নেহের গাথা,

কচি ভাই-বোনেদের হাসিভরা চাঁদ-মুখ,
আজিও স্মরণে ভাসে, সুখে ভ'রে ওঠে বুক ।
আজ সবই একে একে আমারে ছাড়িয়া যায় ;
আজ শুধু প্রাণভরা হাহাকার হায় হায় ॥
দুঃখের তমিস্রা-মাঝে তুই তড়িতের আলো ।
তাই আজ সব চেয়ে তোরেই বেসেছি ভালো ॥

হে মোর সুখের দিন !—হে মোর সুখের স্মৃতি !

তোদেরই স্মরণে আজি ঢালিছ প্রাণের প্রীতি ॥

নিবেদন

“চক্র” ১৩২৭ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার
বিড়ম্বনার অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই ; সে জন্ত আমার স্নেহাস্পদ
সম্পাদকদ্বয়ের নিকট আমি অপরাধী হইয়া আছি ; কিন্তু এত দিন পরে আবার
ক্রোধে দেখা দিলেও পাঠকবর্গ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে না পারাই সম্ভব বোধে
আরোই পুস্তকাকারে ছাপাইতে বাধ্য হইলাম । বইখানিতে ছাপার তুল
আগাগোড়া প্রক দেখা ঘটে নাই ।

পথম অংশটুকু পাঠে কোতুলী হইয়া যাঁহারা ইহা শেষ করিবার জন্ত
করিয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইলেই আমি সুখী হইব ।

চক্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ-বর্ষীয় এক বালকের সঙ্গে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া জগদ্ধাত্রী ডাকিলেন, “বোমা! অ বোমা!” তাহার সে উচ্চ কণ্ঠস্বরে অপ্রসন্নতা বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল।

শীলেদের প্রকাণ্ড চক মিলানো বাড়ী—অন্দর-মহলের দ্বিতলের বারান্দার মোটা মোটা জোড়া থামের পাশে কাঠের রেলিং ধরিয়া একটি নবম-বর্ষীয়া বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল। বাটার গৃহিণীর ডাক শুনিয়া সে মেয়েটি ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার পরিহিত পাঁচপেড়ে কী-বাসরী শাড়ীর প্রান্তটুকু তাহার মাথার খাটো চুলের উপর ঢাকা ছিল, তাহা সেইরূপই রহিল; আর বেশী বাড়িল না। বালিকার ক্ষুদ্র ললাট জুকুটি-কুঞ্চিত হইল, সে তাঁর চঞ্চল নেত্রে শাণ্ডীর মভিব্যাহারী বালকের পানে বারেক ফুটিল।

“কি মা?”

“আজ আবার তুমি বিহুর গায়ে হাত তুলেছ? দেখ দেখি, বাছার মুখখানা আঁচড়ে-পিঁচড়ে কি ক’রে দিয়েছ! ছি ছি ছি। তোমায় যত বলি, যত শেখাই, কিছুতেই কি তুমি কিছু শিখবে না বাছা? এমন করলে আমি তোমায় কি ক’রে পেরে উঠবো!”

তিরস্কৃত বধুমাতা বারেক তাক্ষীল্য-ভরে স্বামীর মুখের উপর নিজের কীর্তি-চিহ্ন দেখিয়া লইল। সস্ত্র নখক্ষত তখনও রক্ত-সরস রহিয়াছে; দেখিয়া সে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না, বরং তাঁর রোষে জলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে কহিল, “আহা

আমিই যেন শুধু ঐ রকম ক’রে দিয়েছি,

কি ছেলেটি যেন কিছুই করেন নি!

আমার পিঠে বুকে খামচে ছাল

ক’?” এই বলিয়া সে সত্য

করিয়া দেখাইল,

বায় উন্টাইয়া

হাঁ রে হতভাগা! তুইও তো ওকে কম শাস্তিটা দিস্ নি। দেখ্ দেখি, কি করেছিস্, খুনে কোথাকার!”

মাতার সহানুভূতি পাইয়া পুল্ এতক্ষণ রোরুদ্রমান হইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল, এখন মায়ের সহানুভূতির গতি সহসা পরিবর্তিত দেখিয়া নিজের দিক্‌টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়া সে বলিল, “ও যে আমার আগে মেরেচে, তার বেলায়—?”

“মিথ্যুক! মিথ্যুক! আমি আগে মেরেচি! না মা! ওর সব মিথ্যে কথা! তুমি শুনো না। —ও আগে আমার চুল ধ’রে টেনেছিল,—এমন জোরে টেনেছিল,—যে, আর একটু হ’লেই আমি মুখ খুবড়ে প’ড়ে যেতুম।”

“ইস্। চুল ধ’রে টানলে নাকি আবার মুখ খুবড়ে প’ড়ে যায়। মুখ খুবড়ে যে

নিজের কানেই তুমি শুনতে পাচ্ছো

আমি তো আর খুব জোরে চুল ধ’রে

ও কেন আমার মুখে অত জোরে

উঃ! যা জালা কর্চে” বলিয়া বাল

হাত বুলাইল।

ইহা দেখিয়া মা বলিলেন,

তুমি একেবারে মুখখানায় আ

রাখোনি। মেয়েমানুষের অত দ

বধু এইবার কান্নায় ক্রো

উঠিয়া সগর্জনে উত্তর দিল, “

ছেলেটি কি না, তুমি তো ও

যখন আমার চুল ধ’রে ট

দোষ হোল না?—হ্যাঁ,

বেলায়।”

“তুই কেন আমার

“খুব করেছি দি

আমার কাপড় ছিঁ

সে কথা বলি

আমার

কতখানি ছিঁড়ে নিয়ে কালি মোটা হয়েছে,—তাই তো আমি কলম ভেঙ্গে দিয়েছি। বেশ করেছি—আবার দেখতে পেলেনই দেব।”

“আমিও তো তাই চুল ধ’রে টেনেছি—এবার এমন চুপি চুপি পেছন থেকে এক টান দেব সুবিধে পেলেনই যে, ধপাস্ ক’রে প’ড়ে সখের সব চুড়িগুলি মুড়্ মুড়্ ক’রে ভেঙ্গে যাবে। দেখবে তখন মজা!”

“তবে আমিই বা মারবো না কেন?”

“মা! আমিও কিন্তু ব’লে রাখছি, এবার ওর যত কাপড় আছে, সব আমি কুটি কুটি ক’রে ছিঁড়ে রেখে দেবো, ওর চুল কেটে নেব, ওর পিঠের চামড়া বেতের বাড়ি দিয়ে তুলে নেব, তবে আমার নাম।” এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ঠাকুরানীর সেই বিনয়-নামধারী পুত্রটি মহাবেগে বোধ করি বেত্রান্বেষণেই প্রস্থান করিল। তখন অপর-পক্ষও মহা আশ্চর্য্যে আততায়ীর বিরুদ্ধে কিরূপে শোধ তোলা যাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থায় জিহ্বায় একেবারে মা সরস্বতীর বৈঠক বসাইয়া দিল। সে তাহার বইয়ে আশ্বিন ধরাইয়া দিবে, ঘুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, দোয়াত ভাঙিয়া, আরও কত কি করিয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মাষ্টারের নিকট মার খাওয়াইয়া যে নিজের নাম রক্ষা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৃহিণী আর কি করিবেন? তিনি অগতাই একটু হাসিয়া “ছোটোই সমান জুটেচে!”—বলিয়া বধুর দিকে একটা হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, “আর পাগলি, আর। আমার পাকা চুল তুলে দিবি, আর।”

“হ্যাঃ আমি দিলুম তো! কেন আমি তোমার পাকাচুল তুলে দেব? তুমি কি আমার মা? তুমি যার মা, তাকে তোমার চুল তুলে দিতে বলো গে না, সে দেবে এখন! আমি আমার বাবার চুল তুলে দেব, তোমার তো দেব না,—তুমি ভারী একচোখি!”

“হারামজাদির মুখ দেখ! কি একচোখোমি করেছি রে ক্ষাপার বেটি? নে, আর, এখনি আবার ছোটোতে লেগে যাবে। একদণ্ড যে চোখ বুজে শোব, সে তো হবার ঘোটি নেই! কাল থেকে ছোটোকে হু’বরে দোর বন্ধ ক’রে রেখে দিয়ে তবে নিজে শোব। দাঁড়া না।”

“আমি কাল ভাত খেয়েই সহ্যমাদের বাড়ী পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে-টিপে না এসে—”

“আচ্ছা, এখন তো আর নয়—সে তখন যা হয় করিস। কি মেয়েই যে তুই হয়েছিস, উন্মিলা! লোকে কি বলবে, বল দেখি? লোকের বউরা কেমন শান্ত লক্ষ্মী, আর তুই দিন দিন বেন ধিঙ্গি হচ্ছেিস!”

“বেশ কর্চি, ধিঙ্গি হচ্ছে তো হচ্ছে! তুমি ওদের লক্ষ্মী-বউ একটা চেয়ে নাও না বাবু, এতই যদি ভাল লেগে থাকে। আমার না হয় দূর ক’রে তাড়িয়ে দাও বাড়ী থেকে।”

“বালাই! যাট!”—বলিয়া মেহসরী শাওড়ী হাসিতে লাগিলেন। বধুর ধিঙ্গিপদ-প্রাপ্তির আসক্ত হেতুই যে ঐ সৰ্ব্ব-অপরাধ-সমর্থনকারী সৰ্ব্বনেশে হাসিটুকুই, এটুকু জানা থাকিলেও ইহাকে পরিহার করিতে তাহার সামর্থ্য ছিল না। বালিকা বধুর তাই এত প্রশ্রয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রে শয়ন-মন্দিরে মায়ের দুই পাশ দুই জনে অধিকার করিয়া শুইত। সে রাত্রেও তাই হইল। বিনয় মায়ের গলা জড়াইয়া মাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, উন্মিলাও তদনুকরণ করিতে যাওয়ার সে তাহার হাতটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, “খবরদার, আমার মা’র গায়ে তা’র হাত দিলে তোর হাত ভেঙ্গে দেব।”

উন্মিলা এ শাসনে অভ্যস্ত; সে নির্ভয়ে উত্তর দিল, “ইস্, ওঁর একলার মা কি না!”

একলার না তো কি? তুই-ই তো তখন বলেছিস্, আমি মা’র আপনার ছেলে—তা, হলেনই হলো না, মা তোর পর?”

“হ্যাঁ হলো বই কি! কখনো হলো না,—হ্যাঁ মা, হলো মা? তুমি ওর একলার মা, মা? আমার মা নও?”

জগদ্ধাত্রী বধুকে নিজের বুকে টানিয়া তাহার মুখে চুষন করিয়া হাসিয়া কহিলেন, “নাঃ, কে বলে,—আমি তোদের দুজনকারই মা।”

“শুন্তে পেলো! মা, তুমি কা’কে বেশী ভালবাস মা?”

মা পুনরায় সেই রকম পরম পরিতুষ্ট মেহের হাসি হাসিলেন, উত্তর দিলেন—

“দুজনকেই সমান ভালবাসি রে।”

বিনয় সদন্তে কহিল, “উঃ, তোমার মনে নেই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মা, তুমি আমাকেই ওর চাইতে একটুখানি বেশী ভালবাস। সেই যে আমার অস্থির সময় তুমি দিন-রাত আমার কাছে থাকতে, কেবলি হরিকে ডাকতে—ওর কাছে শুতে না, আমি ভাল হ'লে কত সন্দেশ-বাতাসা হরির লুট দিয়েছিলে।”

মা শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু অংশীদারটি এ অপমান সহ্য করিল না, সে-ও তেমনি আগ্রহে আর একটি উদাহরণ বাহির করিল।

“আমার পান-বসন্তর সময় ডাক্তারবাবু মাকে আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলেন, মা কি তা শুনেছিল? তোমার তো শুধু জ্বর, সে তো ঘোষের নয়, আমার কাছে মা দিন-রাত থাকতেন, থাকতে না তুমি মা?”

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, “তা থাকবো না বাছা, তোমার মা-বাপ কেউ কাছে নেই,—আমিই তো তোমার মা। সে মা যা করতো, আমি কি তা না করে থাকতে পারি! উঃ, যা অস্থির করেছিল—পোয়াতির বাছাকে যে শীতল শেতল করে দিয়েছেন, এই আমার মহাভাগ্য!”

জননী কৃতজ্ঞতা-গদগদস্বরে এই বলিয়া সেই রক্ষাকারিণী দেবীর উদ্দেশে দুই হাত ঘোড় করিয়া নিজের গলাট স্পর্শ করিলেন। তা দেখিয়া তাঁহার এই ছুটি সন্তানও তাঁহার অনুকরণ করিল এবং এই আকস্মিক দেব-ভক্তির অতর্কিত আবির্ভাব উভয়ের চিত্তেই কেমন করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একটা ঘেন শান্তির প্রভাৱ বহির্গত গেল। তখন তাহারা পরস্পরকে ঠকাইতে পারা সম্ভব নয় দেখিয়াই হোক, অথবা যে জন্মই হোক, একটা মধ্য-পথ অবলম্বন করিল। বিনয় কহিল, “আর তবে, আজকের মত হ'জনে ভাব করি—বলু ডাব—”

“ডাব।”

“তোমার সঙ্গে আমার ভাব। মা! এবার একটা গল্প বলো না?”

‘তাবে’র প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ করি ইহাই। ঝগড়া চলিলে গল্প শোনার বাধা পড়ে। তা এমন ঝগড়া ও ভাব তাহাদের এই বিবাহিত দুইটি বৎসর ব্যাপিয়া নিত্যই চলিতেছে। কতবারই গাড়ী ডাকিয়া আড়ি হয়।—কতবারই ডাব আনিয়া ভাব হইয়া যায়। তা তাহারা তো দুটি কচি ছেলে,—সমস্ত সংসারই তো এইরূপ সন্ধি-বিচ্ছেদ মিলন-বিরহাস্তক।

বিপিনবিহারী শীল দেশের মধ্যে এক জন বিশেষ গণ্য-মান্য বুদ্ধি লোক। তাঁহার চালানী ও তেজারতির মস্ত কারবার। তা ছাড়া সামান্ত কয়েকখানি তালুক ইত্যাদিও আছে। ঘরে ছেলেদের অল্প-বজ্রের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক কালের অধিকাংশ পিতার জায় তিনিও ছেলেদের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখানোর পক্ষপাতী হইয়া পড়ায়, বড় ছেলেটি প্রথমে কলিকাতাবাসী হয় এবং পরে পিতার বিনামূল্যে বিলাত পর্যন্ত পলাইয়া গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে আর কিরিয়া আইসে নাই। বিলাতেই প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। টাকাকড়ির নিতান্ত অনাটন হইলে পত্র আইসে এবং রাগ-ঝড়ার করিয়াও পিতা তাহার খরচপত্র প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে চালাইয়া দেন। বিদেশে থাকিয়া যে সদভ্যাসটি তিনি করিয়াছেন, নিজের উপার্জনে তাহারই খরচ আঁটে না। তাহার উপরে একটি বিলাতী স্ত্রী।

ছোট ছেলে বিনয়কুমারের উপর আশা-ভরসা ইহাদের কোন দিনই বেশী ছিল না, এখন তো আরও একটু কমিয়াছে। বড় ছেলে অজয়কুমার বিলাতে বসিয়াই জৈনিক মালবার-শোণিত-মিশ্রিত ইউরেনীয় কত্কা বিবাহ করিয়া বসিলে, দশ বৎসরের ছোট ছেলে বিনয়কুমারের এখানে এক সাত বৎসরের স্ব-স্বরের মেয়ের সহিত শুভ-বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়। আমাদের পূর্বোল্লিখিত নায়ক-নায়িকাই এই শুভ-বিবাহে সম্বন্ধ দম্পতিদ্বয়—বিনয়কুমার ও উর্মিলা। এক্ষণে ইহাদের বয়স বৎসর কতক করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে; তবে স্বভাবটা ঠিক তেমনিই আছে।

দশটা বাজিলে স্নান সারিতে বাটীর মধ্যে আসা বিপিনবিহারীর চিরন্তন নিয়ম। তা ঘড়িতে সেই দশটা বাজিতে না বাজিতেই পুত্রবধু উর্মিলা-সুন্দরী সেই বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরে দর্শন দিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, “ওগো বাবা! আজ কি তোমার চান করবার সময় হবে না, না কি গো?”

এই রকম সে প্রায়ই ডাকিতে আসে। বারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

বিপিনবাবু তখন চোখের উপর চশমা লাগাইয়া কি সব কতকগুলো পুরাতন হিসাবের কাগজ-পত্র পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; সামনে এক তাড়া খেরো-বাধা খাতাপত্র বিছাইয়া তেজারতির গোমস্তা

সিদ্ধা; বধু-ঠাকুরাণীর সশব্দ আগমন ও সদর্প আহ্বান-শব্দে কুণ্ঠিত হইয়া সে বেচারী মাথাটা একটু হেঁট করিল। চব্বিশ-ঘণ্টাই শুনিয়া শুনিয়া কর্তার অজ্ঞাস, তাই এ ডাক তাঁহার কানে পশিলেও মনে পৌছিল না। তিনি ছুইটা সই ঠিক এক রকম দেখাইতেছে কি না, একমনে তাহাই পুজানু-পুজারূপে মিলাইতে লাগিলেন।

“বাবা! বলি, ও বাবা, ডাকচি, তা কথা কইছো না যে বড়? শুন্তে পাচ্ছ না, না কি?”

“বিপিনবাবু অর্ধ-অন্তমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, “আ? কি রে পাগলি?”

“মা—গো! এতক্ষণ পরে বলা হলো কি না, —কি রে পাগলি! চানটান করতে হবে না বুঝি আজ?”

“হ্যাঁ রে, হবে বই কি। এই যে যাই।”

জবাব দিয়া বৃদ্ধ যথাকার্য্যেই ডুবিয়া রহিলেন। তখন উন্মীলা বিশেষ রাগিয়াছে, সে দরজায় ধাক্কা দিয়া একটা চমকপ্রদ শব্দ করিয়া সরোষ-গর্জনে চোঁচাইয়া উঠিল, “বাবা রে বাবা! ছেলে যেন একজামিনের পড়া পড়্চেন! এই চল্লুম আমি, থাকো তুমি তোমার বই নিয়ে ব’সে।”

বিপিনবাবু তটস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ খাতাপত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৎসিত শালকের মত করুণ-কণ্ঠে প্রস্থানোত্ততা বালিকা বধুর পানে চাহিয়া ডাকিলেন, “ওরে, না রে না, বাস্‌নি, বাস্‌নি—এই যে আমি উঠেছি রে! ওহে গোষ্ঠ! তুমি ওসব এখন তুলে-টুলে রেখে দাও। এর পর এক সময় ওসব নিয়ে আবার বসা যাবে এখন, এখন আর হচ্ছে না, আমার ছোট্ট-মা টি এখন বেজায় ক্ষেপেছে।”

উন্মীলা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহার সম্মুখে খণ্ডের মন্তব্যটুকু কানে ঢুকিতেই সত্ত্বাত্ত স্বকবিলম্বী ভিজা চুলের রাশি নাড়া দিয়া ঝাঁকিয়া কহিল, “হ্যাঁ, আবার বলা হচ্ছে,—ক্ষেপেছে! ক্ষেপবে না তো কি? সেই কখন থেকে ডাকাডাকি করে গলা ফাটানি—বল তো, রাগ হয় না বুঝি?”

বিপিনবিহারী চটি-জুতা ছুইটার মধ্যে পা গলাইতে গলাইতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আর তো দেখি, গলাটা কতখানি ফাটলো? কৈ, কোথাও দেখতে পাচ্চি না তো!” এই বলিয়া হাসি-হাসি-মুখে সমীপবর্তিনী বধুর কণ্ঠমালা-পর্য্যন্ত কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি বিক্ষারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং অল্প

একটু মাথা নাড়িয়া যেন আত্মগতভাবেই কহিলেন, “হায় রে, ও শানিয়ে গলা না কি আবার ফাটবে!” —মন্তব্য শুনিয়া উন্মীলা খিল খিল করিয়া এবং বৃদ্ধ গোমস্তা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল।

উন্মীলা খণ্ডের হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া বলিল, “যাও, তুমি বড় ছষ্ট হয়েছ। অমন করে কথা বলো ত তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, তা কিন্তু ব’লে রাখচি।”

“তা হ’লে আমি যদি ব’সে ব’সে কাঁদি?” বিপিনবিহারী ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ বারান্দা দিয়া অন্তরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। উন্মীলা খণ্ডের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বৃদ্ধ-বালকটির মুখে সেই সঙ্গীন উত্তর শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং ছটামি-মাখানো সমস্ত মুখখানিকে তাহার এক মুহূর্ত্তেই গভীর করুণামণ্ডিত স্নেহে উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণনৈত্র খণ্ডের মুখে স্থাপন করিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা! বাবা! তুমি কেঁদো না। একটুও কেঁদো না। আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে আড়ি করে থাকতে পারি? তুমিই বল তো, পারি কি? সে বরু মা’র সঙ্গে হ’লেও হ’তে পারে, তোমার সঙ্গে হবে না।”

বিপিনবিহারীর চোখের কোণগুলো হঠাৎ যেন সত্যকার শালকের মতই তাঁহার এই ক্ষুদ্র মা’কে এই সান্দ্রনা-স্নেহ-প্রকাশে আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনিও নিবিড় স্নেহভরে ভিন্ন নীড়ের ক্ষুদ্র পাখীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের উপর নত হইয়া চুম্বন করিলেন; তার পর মমতামণ্ডিত মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র কর্ণটি কথা উচ্চারণ করিলেন, “তুমি যে আমার মা!”

কথা কহিতে কহিতে ছই জনে বাটার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বাবুকে আসিতে দেখিয়া বাবুর চাকর মধু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তেলের বাটি ও তেল-ধুতি-হাতে ছুটিয়া আসিল। তখন শীতকাল, রৌদ্রে সেবিত বারান্দার ছোট একটি পাটি পাতিয়া তেল মাখা বিপিনবাবুর নিয়ম। গড়গড়ায় তামাক সাজা ছিল, আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আগুন ঈষৎ নিশ্চুত। উন্মীলা সে দিকে বারেক চাহিয়াই মধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, “ও তামাক সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা, তুই শীগগির এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আর; আমি ততক্ষণ বাবুকে তেল মাখাই।”

বলিয়া তেলের বাটি টানিয়া লইয়া খণ্ডের পায়ের খানিকটায় সে তেল মাখাইয়া দিল। মধু কি বলিতে যাইতেছিল, উন্মীলা বাম হাত নাড়া দিয়া অপ্রসন্ন-স্বরে বলিল, “না, ও পুড়ে গেছে। তুই ভাল ক’রে সেজে নিজে আর গে যা।—যা” বলি, তাই কর দেখি।”

এই ক্ষুদ্র মনিবটির হুকুম যে কত বড় অজ্ঞান্য মধুর, মধুর তাহা ভালরূপই জানা ছিল, সে অসন্তুষ্ট হইলেও আর দ্বিধা করিল না। কলিকাতা উঠাইয়া লইয়া অপ্রসন্নতা-বাজক শব্দ চরণে চলিয়া গেল এবং ফিরিতেও যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টা করিল।

মধু দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে খণ্ডের নথ পিঠের উপর তেলমাখা হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বধু ডাকিল, “বাবা!”

বিপিনবাবু তখন তামাকের তৃষ্ণায় ঈষৎ বিষম। মুখের নিকট প্রসারিত চুখন-প্রয়াসী আলবোলায় নল মুহূর্মুহ সাদরে আহ্বান করিতেছে—অথচ প্রেয়সী প্রাণময়ী নহেন! অন্তমনস্কভাবে তিনি উত্তর দিলেন, “মা!”

“সত্যি, বাবা?”

“কি মা?”

উন্মীলা একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে বলিল, “এই যে তুমি বললে?” বিপিনবিহারী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বললুম, রে?”

“মা গো! তুমি বড় ভুলে যাও! এই এখুনি বললে না?”

“হ্যাঁ, বলেছি তো রে! তবে বুড়ো হয়েছি কি মা, তাই কি যে বলি, মনে থাকে না। তবে আর মা হয়ে কি হলো, যদি বুড়ো ছেলের ভুল-টুলই না শুধরে দিবি!”

উন্মীলা মুখের আগ্রাস্ত কল্যাণময় স্নেহ-হাতে মর্শ্বিত করিয়া জোরে পিঠের উপর তৈলাক্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, ঐ কথা। ঐ কথাটা কি সত্যি বাবা?”

“কৈ, কোন্ কথা রে?”

“আঃ, বড় বোকা তুমি!” এই বলিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াই হঠাৎ বিনীত ও কোমল কণ্ঠে ঈষৎ লজ্জার সহিত যেন সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, “সত্যি কি আমি তোমার মা হই?”

বিপিনবাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “শোন একবার কথা! মা হয়ে আমার বেটি বলে কি না, সত্যিকারের

মা হই?”—মা বুঝি কার আবার মিথ্যেকারে হয়?”

উন্মীলা এই উত্তরে অত্যন্ত খুসী হইল। আনন্দাতিশয্যে সে যে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খুব খানিকটা তৈল লইয়া সেই স্বস্ত্রসাব্যস্ত হওয়া বুদ্ধ ছেলের সঙ্কীর্ণ পৃষ্ঠে সে চাপড়াইয়া দিল। বিপিনবাবু হাসিয়া কহিলেন, “মা গো, আবার কি আমার তুই তেলে-রোদে শক্ত করছিস্ মা? কত তেল ঢালছিস্, বল দেখি?”

তখন নিজের কীর্তি চোখে পড়িতে লজ্জা পাইয়া মাঠাকুরাণী ছেলের সেই তৈল-সিক্ত পিঠের উপরই নিজের লজ্জিত মুখখানা লুকাইয়া কেনিল, এবং এই উপায়েই তাঁহার পিঠের তিন ভাগ তৈল বধু মুখে মাখায় ও কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া উহাকে রক্ষা করিল। এ দিকে ততক্ষণে তামাক সাজিয়া মধুও আসিয়া পৌছিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন এমনি করিয়াই কাটিতে লাগিল। মাতৃ-ঘের শরীরের মধ্যে কোথাও যদি একটা মস্তবড় বা থাকে তো, বাহিরে হাজার চাপা দিলেও একটু নড়াচড়াতেই তাহাতে চাড় লাগে। কিন্তু দীর্ঘ-কালের অভ্যাস সেটাকেও কালে সহনীয় করিয়া তোলে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকটে অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতারণিত হইয়া বিপিনবিহারী ও জগদ্ধাত্রী মর্মে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, প্রচণ্ড একখানা ক্ষতের মতই সে আঘাতের বেদনা তাঁহাদের চিত্তে চিরসঞ্চিত হইয়াই রহিল; কিন্তু কালের প্রলেপ যে উহার দাহ-জ্বালা অনেকখানি প্রশমিত করিয়া দিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মুখের স্তম্ভভাবেই ব্যক্ত হইতেছিল। বিশেষ জগতের সর্বপ্রধান শোক চিরাপগত প্রিয়তমের অভাবও মানুষ যখন সহনীয় করিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে, তখন এ তো তবু তাঁহাদের অপ্রতিবিধের ভ্রুংখ নয়। ছেলে বাঁচিয়া আছে, হয় তো সে সুখেই আছে। চাই কি—এমনও আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এক দিন সে নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া মা-বাপের কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিবে। অবশ্য অজয়কুমারের কোন ব্যবহারে সে আশা পূর্ণ হইবার মতই কোন লক্ষণ এ যাবৎ দেখা যায় নাই।

কয় বৎসরে বিনয় ও উন্মীলার মধ্যেও কিছু

পরিবর্তন ঘটতেছিল। বিপিনবাবুকে বুড়ী যদিও এখনও তাহাদের চোর চোর বা জল-ডেঙ্গি খেলা হইয়া থাকে, তবু সদরের বাগানে আর সে খেলা চলে না; তাহার পরি-অন্দরের সুবহুং আসিলা বা ছাদ রঙ্গভূমির অধিকার করিয়াছে। কলহ-বিবাদ উভয়ের কিছুমাত্র কমে নাই বটে, তথাপি মারামারি এখন তাহাদের নিত্য-কর্ম নয়, কদাচিৎ তাহা ঘটে। এ দিকে উর্মিলার খাটো চুল লম্বা হইয়া প্রায় পিঠ ছাড়াইয়া পড়ে, সেই চুলে আজকাল সে সোনা-বাঁধান কাচের চিকুণী গুঁজিয়া মাথাজোড়া খোঁপা বাঁধে। তাহার সর্ষশরীরের অপূর্ণতা এখন দেখিতে দেখিতে বর্ষায় ঢল-নামা পাহাড়ে-নদীর মত ভরিয়া উঠিতেছিল।

উর্মিলার মামার বাড়ী নিকটেই,—ঘণ্টা-কয়েক ঘোড়ার গাড়ী বা নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাস। মামাতো ভাইএর বিবাহে দিন-কয়েকের জন্ত সে মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীর ভিতরের কয়েকটা ভাল ঘরের মধ্যে একটার সাজ-সজ্জার আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে ঘরখানা অব্যবহার্যরূপে কতকগুলি সিঁদুকবাক্সের ও ছেঁড়া গদি-বালিসের গুদাম হইয়া অনেক দিন হইতেই পড়িয়া ছিল। হঠাৎ আজ সেখানে বেশ একটি শোভনীয় শোভনতা বিরাজ করিতেছে। উর্মিলা কৌতূহলী হইয়া ঘরটার ঢুকিয়া পড়িল, এবং ইহার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

তা ঘরখানায় দেখিবার জিনিসও নেহাৎ কম ছিল না। প্রশস্ত কক্ষের এক পাশে একখানা বকবক পালঙ্ক, তাহাতে একটি ধবধবে বিছানা—দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া ঝুপ করিয়া গুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে—মশারিটা—মা এই সে দিন যেটি সেলাই করাইয়াছেন।—ও, ঐ মতলবে বুঝি তৈরি করা হইয়াছিল? ঘরের অপর দিকে খাটখানার ঠিক সাম্নাসাম্নি ঘরের মেঝের খুব বড় গোছের একখানা আগ্রা বা লক্সোজাত কার্পেট পাতা। তার কোণ চারিটায় ফুটন্ত গোলাপ এবং মধ্যস্থলে একটা সতেজ সবল আরবী ঘোড়া আঁকা। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকাইয়া সামনের লিয়ার দৌড়বার জন্ত উত্তত-ভঙ্গীতে

জন্ত নামানো হইয়াছে গো? এ আবার কি! বাহিরের ঘরের একটা ছোট টেবিল মাথার কালো বনাত-আঁটা, এ দিকে সে দিকে সাতটা খাপখুবরি, টানা, দেওয়াল, মেটাও যে আসিয়াছে।—উর্মিলা চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে দেখিল, সেই টেবিলটার উপর বিনয়কুমারের সম্বন্ধ-সঙ্কিত এবং উর্মিলার বহুদিনকার বিশেষ লোভনীয় অনেকগুলি পদার্থ, যথা—আগ্রার শ্বেত-প্রস্তরের তৈয়ারী প্রবাল-কাক-খচিত কাগজ-চাপা, দোয়াতদান, কাশী হইতে শগুন কর্তৃক আনীত পিতলের দোয়াত-কলম, চুনায়ের ফুলদানী ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে।

“বাঃ বাঃ! ও হচ্ছে কি? দেখো, যেন আমার জিনিসপত্র সব লোপাট করে ফেলো না।”

“আমি যেন চোর! তোমার জিনিস চুরি করতেই এসেছি। না?”

ভীষণভাবে ভীষণ অভিযোগের এই প্রত্যুত্তর দিয়া উর্মিলা স্প্রিং-এর মত ছিটকাইয়া ফিরিয়া আততায়ীর সহিত ঠিক মুখামুখী দাঁড়াইল। তাহার মুখেচোখে যে ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে আহতের আঘাতটা যে কোন্‌খানে, সেটুকু বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাউতেছিল। সহস্রবার পূর্বারোপিত চৌর্য্যাপবাদ যে উর্মিলাকে এমন অতর্কিত অগ্নি-শিখায় পরিবর্তিত করিতে পারিয়াছিল, তাহার স্বামীটির মনের প্রাপ্তে এক লহমার জন্তও এমন অগ্নায় বিশ্বাস জাগে নাই। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই সে উচ্ছ্বাস করিয়া বলিল,—

“তার পরে উর্মিলাসুন্দরী! চুপি চুপি কখন আসা হলো? টুক-টুক করে চেয়ে চেয়ে দেখে কি?—এ ঘর আমার!—ওধু আমার এক—এই টেবিলে বসে এবার থেকে আমি একক লেখাপড়া করবো!—ঘুম পেলে ঐ খাটে একা একাই ঘুমিয়ে পড়বো।”

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া বারেক টেবিল সামনের চৌকিখানা টানিয়া তাহাতে বসিয়া এবং আবার তখনই উঠিয়া সগর্ব্ব-পূর্ণ খাটের সম্মুখে আসিয়া চটজুতা-জোড়াটা ধপাস করিয়া তত্পরি গুইয়া পড়িল। পরাজিত এবং একান্ত বিমর্ষ প্রতিবন্দীর দীপ্ত সহানু চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া হাফি “দেখলি তো? এ সব আমার!”

উর্মিলার মুখ জঁঝার কালো হইয়া

সন্নিধি ভগ্ন-কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “কে তোমাকে এ সব দিলে?”

“কে আবার দেবে! আমার মা দিয়েছে।”
শুনিয়া উন্মীলা হাড়ে হাড়ে জলিয়া উঠিয়া উচ্চ চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল, “মা! ও মা!—”

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক ঘরের বাহির হইতেই যেমনি মায়ের সাড়া আসিয়া পৌছিল, এবং সন্নিধি হাসিমাখা মুখে ও সম্মেহ চোখে চাহিয়া যেমনি তিনি ঘরে ঢুকিলেন, অমনি হৃৎকর ক্রোধ ও অভিমানের সমুদ্র উন্মীলার অপমানাহত ক্ষুর বক্ষে উদ্গাম হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং এইরূপেই শাণ্ডীকে জানাইয়া দিল যে, সে তাহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছে।

জগদ্ধাত্রী এ সব মান-অভিमानে বেশ অভ্যস্ত আছেন। ছই এক বৎসর পূর্বে ইহারা স্পষ্টবাক্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিত যে, “আমি তোমার উপর রাগ করিয়াছি।” এখন আর সেরূপ করে না, কিন্তু এই একটা সুস্পষ্টভাবে এখনও নিজেদের কার্য সম্পন্ন করে।

কাছে আসিয়া থপু করিয়া বধুর মাথাটা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, “রাগ হলো কেন রে?”

উন্মীলা জবাব দিবে না মনে করিয়াছিল; তবুও স্বভাববশতঃ আচম্কা ফসু করিয়া বলিয়া ফেলিল, “যাও—তুমি! আমি তোমার সঙ্গে কথাই কবো না।”

মা আবার হাসিয়া বলিলেন, “কেন রে পাগলী? কথা কবিনে কিসের জন্তে? কি বলি বন্ তো?”

“কেন রে পাগলী বই কি!—কিছু যেন মনে না।”—উন্মীলা নিজের পুঁটে-ঘেরা পাণ্ডুর মাথাটা শাণ্ডীর কবল হইতে মোচন-র একটা ঝটকা মারিল। খোঁপার-আটা কাটার ঘুমুরগুলো অমনি ঝম্-ঝম্ করিয়া মা উঠিল।

দেটে ওইয়া বিনয় এতক্ষণ হাসিয়া কুটি-কুটি

ল। সে মায়ের পরাভব দেখিয়া অধিকতর

হুভব করিয়া হো হো শব্দে হাসিতে

উঠিয়া উঠিল, “বুঝতে পারচো না?

কিন্তু এই ঘর দেখে তোমার পাগলী

সেই জলে পুড়ে মরচেন!”

মা!

“যাও, যাও, আমি তোমার মা নই,—
আমার বাবার মা। তুমি নিজের ছেলে
ঘরটির সব দিয়েছ। আমার দিয়েছ কি?”

গৃহিণী হাসিয়া সম্মেহে বধুর ললাটে
করিয়া বলিলেন, “নে পাগল কোথাকার।
তো সব রে। তোকে আবার আলাদা
আমি দোব কি?”

উন্মীলা সবেগে মুখখানা সরাইয়া লইয়া উ
কণ্ঠে বলিল, “ও-সব বাজে কথা আমি শুনবো
চাইনে। আমারও তুমি এই রকম একটা ঘর
দেবে কি না, শীগ্গির করে বলো?”

বিনয় তাড়াতাড়ি খাট হইতে উঠিয়া মা’র
দিকে ছুটিয়া আসিয়া ছই হাত ধোড় করিয়া
উচ্চকণ্ঠে চোঁচাইয়া উঠিল, “দিও না মা। তোমার
পায়ে পড়ি মা! ওকে একটা ঘর দিও না।”

মা বলিলেন, “সে কি রে! ও যে আমার
ঘরের লক্ষ্মী! তা এ ঘর তো তোদের দু’জনকেই
দিয়েছি। এইখানে আজ থেকে তুইও তো রাতে
শুবি রে পাগলি।”

বিনয় অমনি মহাশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,
“ও বাবা রে! সে হচ্ছে না। ওকে আমি আমার
ঘরে শুতে দেবো না। ওর মাথার তেলে আমার
ঘরের বালিস নোংরা হয়ে যাবে, ওর মল-পরা পা
মাঝরাতিরে আমার ঘাড়ে এসে চড়ে বসবে—
সে আমি পারবো না রে, বাবা! তার চাইতে
গাছতলায় শুতে যাব, সেও বরঞ্চ ভাল।”

মহা অবমানিত ও কোপে অরক্ত হইয়া
উন্মীলা শাণ্ডীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া
সতর্জনে বলিল, “মা! তুমি জানো তো, ঘুমুতে
ঘুমুতে কে কার ঘাড়ে এসে পড়ে? সারা রাত
তোমার পাশ-বালিস করে আঁকড়ে ধরে তোমার
ঘুম ভাঙিয়ে দেয়? তবু কি না তুমি বলচো
আমার তার সঙ্গে শুতে? বেশ ত তুমি মা!”

মা বলিলেন, “ওরে, তোরা যে বড় হচ্চিস।
চিরদিনই কি মা’র আচলের তলায় থাকবি?”

বিনয় বলিল,—“তা থাকি, আর নাই থাকি,
তা ব’লে তো আর ওই রাক্ষুসীর আচল ধরতে
পারিনে।”

ইহার শোধ লইবার জন্তই উন্মীলা পাল্টা
গাছিল, “বাপু রে বাপু! ছেলে যা যাঁড়ের
মতন নাক ডাকান! রাতে ঘুম
কত দিন যে আমি—সেই

“না! আমার একটা আলাদা ঘর
না, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে
দাও, আজ থেকে তোমার ঘরেও
শোব না। বায়ুন-মেয়ের কাছে,
কাছে গিয়ে শোব।—দেবে?—আচ্ছা,
দেবে এসো।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাবা, তোমার আজ চান করতে আসতে
অনেক বেলা হয়েছে। হবেই তো, এখন তো
আর আমার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমার ধরে
আনবার যোটি নেই।”

“না রে পাগলি! না, বেলা কেন হবে?
ঠিক সময়েই এসেছি।”

“কখনো নয়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বরং
ঘড়ি দেখ।—আনবো ঘড়ি?”

“না, না, থাক। আচ্ছা, কাল থেকে—”

“সে তোমার দ্বারা হবে না বাবা! দেখই
না একবার কতখানি বেলা হল।”

“তবে আন।”

উন্মিল উৎসাহসহকারে ঘড়ি আনিয়া সম্মুখে
ধরিলে বিপিনবিহারী দেখিলেন, বহুমূল্য ও সুদৃশ্য
সুইস ঘড়িট টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গা!—বিস্মিত
হইয়া বধুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি!
ঘড়ি কেন ভাঙ্গা, মা? তুই ভেঙ্গে ফেলি না কি?”

বধু নীরবে মাথা নাড়িল,—“না।”

বিপিন বাবু জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “তবে
ভাঙ্গলো কেন ক’রে? একেবারে দফা-রফা হয়ে
গেছে যে! জানো, কে ভেঙ্গেছে?”

বধু মস্তক হেলাইয়া জানাইল যে, সে জানে।
আর কিছুই বলিল না। তখন বিপিন বাবু ব্যস্তিতে
পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, “বিনে!
নিশ্চয় সেই বিনে হতভাগার কাজ। কই,
রাষ্ট্রলটা গেল কোথায়?”

বিনয় অত্যন্ত গম্ভীর-মুখে আসিয়া বলিল, ঘড়ি
সে ভাঙ্গে নাই। কে তাহাকে ভাঙ্গিতে দেখি-
য়াছে?—রোধ করিয়া এই কথা বলিয়াই উন্মি-
লার চোখের উপর চোখ পড়িতেই হঠাৎ সে থতমত
খাইয়া ঢোক গিলিতে লাগিল।

ঘড়ি-ভাঙ্গা এবং মিথ্যা বলা,—এই দুইটা অপ-
কর্মই বিপিন বাবু, বৎপরোন্মাদি তাঁর

ভৎসনা করিয়া ছেলেকে বিদায় দিলেন। দোব-বীকার
এবং মিথ্যার জন্ত ভৎসিত হওয়ার অত্যন্ত অব-
মানিত বোধ করিয়া ইহার যে মূল, তাহার দিকে
অগ্নি-দৃষ্টিরই অমুরূপ একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া
হুমহুম শব্দে পা চুকিয়া সে চলিয়া গেল। পুত্র
ঘরের অন্তরালে গেলে ছোট একটা নিখাস ফেলিয়া
বিপিন বাবু আত্মগত ভাবেই বলিলেন, “ছোটোই
সমান গৌরৱ। এটারও মানুষ হবার লক্ষণ
দেখি নে!”

স্বামীর সেই কোপদৃষ্টি এবং নিজের অপরাধ
স্মরণ করিয়া সে দিন সারাদিনই উন্মিল লুকুচিয়া
লুকুচিয়া বেড়াইল। কিন্তু এখন আর কেন সে
এমন করিয়া অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেও
পারিতেছিল না। এইবার স্বামীর নিকট ধরা দিয়া
কৃতকার্যের শাস্তি বহন করিতে প্রাণ তাহার
উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। সারা-
বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে
বাহির হইয়া আসিল। অন্তরালে থাকিয়া আত-
তায়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে চিত্ত তাহার
বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতে লাগিল এই জন্ত যে, এই
একটু পূর্বেই এরূপ স্থলে যেমন ঘটিয়াছে, এবার
তাহার কোন লক্ষণই যেন দেখা গেল না। বিনয়
তাহার কোন লক্ষণই যেন দেখা গেল না। বিনয়
তর্কে তর্কে উন্মিলার সন্ধানই ব্যাপৃত থাকে এবং
তাহাকে বাহির হইতে দেখিলেই বাঘের মত গর্জিয়া
আসিয়া তার ঘাড়ে পড়ে। তারপর হড়াহড়ি
মারামারি—সে সব অনেক কাণ্ডই ঘটিয়া যায়।
কিন্তু আজ তার তো কই কিছুই হইল না! গোপন
আবরণ ছাড়িয়া অবশেষে এমন কি, সারা বাড়ীতেই
উন্মিল বুরিয়া বেড়াইয়া অধীর আগ্রহে খুঁজিয়া
আসিল, শত্রুপক্ষের যে দেখাই নাই। ব্যাপার-
খানা কি? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও যে
ভরণা হয় না।—যদি ঠিক সেই সময়টিতেই সেই
অশেষিত ব্যক্তিটি আসিয়া পড়িয়া তাহার কথা-
গুলা গুনিতো পার!

সন্ধ্যার পর কি একটা দরকারে উপরতালার
ভিতরকার বারান্দার দিকে ঘাইতে ঘাইতে উন্মিল
দেখিল, বিনয়ের ঘরের মধ্যে আলো জলিতেছে।
দেখিয়াই তাহার বিষম-মুখে অমনি আশার
আলোক জগিয়া উঠিল এবং হৃৎপিণ্ডটা একে-
বারে উৎসাহে লাফাইয়া ধবক করিয়া উঠিল।
দেখিতে দেখিতে তিন লাফে ঘরের সমীপবর্তী
হইয়াই সে বন্ধন রবে মলের শব্দ করিয়া ঘরের
মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু তথানি পুস্তকের পৃষ্ঠার

অথবা মনোযোগ-নিবন্ধন বিনয়কুমারের দৃষ্টি তাহার পানে ফিরিল না! বোধ করি, চারগাছা মলের সে খন্ খন্ রব তাহার কর্ণগোচর না হইয়াই বা থাকিবে?

উন্মীলা নিজের প্রতি উহার মনোযোগ আকর্ষণের কোন সুযোগ খুঁজিয়া না পাইয়া খোলা দরজাটাকে টানিয়া বন্ধ করিয়া বন্ধ করিল। তারপর তাহাতেও বিপক্ষ-পক্ষকে অটল দেখিয়া অসহিষ্ণু ধৈর্য-হারা হইয়া ছুটিয়া যে চৌকি-খানায় সে বসিয়াছিল, সেইখানার হাতা ধরিয়া বিপুল বলে একটা ধাক্কা মারিল। পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া বিনয় তখন বিছাতের মতন তাহার দিকে ঘুরিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ গম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিল, “খবরদার! আমার ঘরে ঢুকেছ,—কি ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি।”

উন্মীলা আসিয়াছিল বিনয়ের কাছে ক্ষমা চাহিতে। কিন্তু পূর্বের সমস্ত সঙ্কল্প নিজেই যখন মাটি করিয়া ফেলিয়াছে, তখন বাকীটুকুর বখাও বিস্মৃত হইয়া গিয়া তেমনি খর-দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সে-ও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, “ইস্—তোমারই না কি একলার ঘর? জানো,—মা বলেছে, আমারও এতে সম্পূর্ণরূপ ভাগ আছে।—শুধু তাই নয়; তোমার সব জিনিসে আমার ভাগ আছে, মা বলেছে।”

বিনয় নিজ-নামের সম্মান সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়া ভীষণ-দৃষ্টিতে জ্বর পানে চাহিয়া তেমনিই স্বরে গর্জিয়া বলিল, “বেরোও বলছি, এ ঘর থেকে। ভাল চাও তো একনি বেরোও!—আমি ‘স্পাই’কে আমার ঘরে ঢুকতে দিইনে।”

এ কথায় উন্মীলার অহঙ্কার-প্রদীপ্ত মুখের দ্বিবি এক মুহূর্তে রাহুগ্রাস-কবলিত শশাক্ষের মতই নিশ্চত হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিসে যে কি ঘটে কেহ জানে না, এই যে কাণ্ডটা ঘটয়া গেল, একেবারেই ইহা অপ্রত্যা-পিত এবং অস্বাভাবিক! সারাদিন ধরিয়া উন্মীলা ও ভয়ে চোরের মতন চুরী করিয়া লুকাইয়া বেড়াইয়াছে, সে কিন্তু এ’ নয়।

ইতঃপূর্বে আর কখনই কি এমন ঘটনা ঘটে নাই? তা ঘটয়াছিল বৈ কি। বিবাহের পরদিন

হইতেই তো এ দম্পতির মতে নিত্যই চলিতেছে—তবে এবারেই বিশেষ ঘটনা ঘটিল, যাহাতে চিরন্তন টাই ওলোট-পালোট হইতে বসিয়া একবার ঠিক এই রকমে সে বিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তখন অবশ্য নেই আরও দু’তিন বছরের করিয়া ছোট। স্বপ্নের কাছ হইতে ফিরিয়া ও উন্মীলা তার কলতরঙ্গ মলকে বলমূল খন্ বাজাইয়া উদ্ধ্বাসে ছুট দেয় এবং প্র ছুটিয়া গিয়া, তরকারি কুটিতে ব্যস্ত শাওড়ীর ঘাড়ের উপর আশ্রয় লয়।

জগদ্ধাত্রী বলিষ্ঠা বধূ—আচম্কা জড়াইয়া ধরার প্রবল উচ্ছ্বাসে সবেগে বাঁটির উপর মুখ খুঁড়াইয়া পড়িতেছিলেন, কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁটি কাৎ করিয়া কহিলেন, “একুনি দু’জনেই কেটে মরেছিলুম গো! মা গো মা! কি দস্তি-মেয়ে তুই উন্মীলা! প্রাণে একটু ভয়-ভরও কি নেই রে?”

উন্মীলা অদূরে বিনয়ের গুম্ গুম্ পায়ের শব্দ অনুভব করিয়াই প্রাণপণ-বলে শাওড়ীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁর কোলের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে করিতে চোঁচাইয়া উঠিল, “প্রাণে ‘ভয়-ভর’ আছে বলেই তো তোমার কাছে এসেছি রে বাপু! ঐ দেখ না, একুনি তোমার গুণধর ছেলে এসে আমার ঠেঙ্গাবেন। ও মা! আমার তোমার আঁচল দিয়ে ঢেকে দাও,—ও মা! ঐ আস্চে!”

মা ঈষৎ হাসিয়া বধুর উত্তমাজটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “তুই কি কচি খুকি আছিস রে উমি! যে তোকে আঁচল-চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখবো?”

বলিতে বলিতেই এ দিকে তাহার শত্রুপক্ষ ততক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে খরগোসের মতন মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা-পরায়ণার সকল চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়া তার পা দুইটা ধরিয়া টান দিতে দিতে আক্ষালন ও গর্জন করিতে লাগিল,—“আমায় মার খাইয়ে এসে মজা করে মার কোলে লুকোনো হয়েছে। বাবু, কচি লুকিয়ে থাকা,—দেখ না এক বার কি দলী আজ করি। কীচকবধ করবো। মা! দাও ওর মাথাটা তোমার কোল থেকে হুম করে মাটিতে ফেলে, যাক্ একুনি পাকা বেলেয় মত

ফেটে। দিলে না! আচ্ছা, তা হ'লে এই হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাই।”

জগদ্ধাত্রী আশ্রিতাকে স্বাক্ষর চেষ্ঠায় তাঁর ষিখাসাধাই করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জোয়ান ও হৃদ্যন্ত ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়েমানুষ আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? হেঁচকা টানের চোটে উন্মিলার মাথাটা বাস্তবিকই আছড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া সেটাকে তিনি নিজেই মাটিতে আন্তে আন্তে নামাইয়া দিলেন। তা দেখিয়া উন্মিলার সকল ধৈর্য্যই টুটয়া গেল। প্রবলের কাছে পরাভূত হইলে যা হয়;—সে সব দোষ শাণ্ডীপ পুত্রপীতির ঘাড়ে চাপাইয়া নিজের সেই প্রচণ্ড আক্রমণের ভিতরেই তাঁহার উপর অনুপায় কোথের জ্বালা প্রশমিত করিতে লাগিল। কাদিতে কাদিতে অনুযোগ করিয়া বলিল, “তুমি আমার কোল থেকে ফেলে না দিলে, ও কক্ষণে আমার এত লাগিয়ে দিতে পারতো না। তোমারই তো দোষ, তোমার নিজের ছেলে ব'লে তুমিই তো তাকে জ্বিতিয়ে দিলে। বা রে আচ্ছাদে মেয়ে!”

তারপর নাকে-কানে খত দিয়া ও দাঁতে কুটি ধরিয়া যখন বিনয়ের সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেল, দুই সখা-সখীতে হাত-ধারাধরি করিয়া রান্নাঘরে ভাত খাইতে আসিল, তখনও উন্মিলা শাণ্ডীপ উপর মুখখানা ফুলাইয়া রহিল এবং তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রুকুটি করিয়া থাকিয়া উত্তর এড়াইয়া গেল। তা' দেখিয়া জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বামুন-মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “কলি কাল কি না! দেখলে মেয়ে! বেটীর আমার বিচারটা দেখলে?”

এবারেও উন্মিলা সেই রকমেরই আর একটা অভিনয়ের আশঙ্কা ও প্রত্যাশা করিতেছিল। চারগাছা মল্কে হাঁটুর নীচে গুঁজিয়া সে যে সারাদিনই চোরের মতন এখানে সেখানে লুকাইয়া ফিরিতেছিল; এর মধ্যে সব সময়েই তার বুক ছুর্ ছুর্ করিতেছিল যে, হঠাৎ কোন সময়ে বিনয় কোথা হইতে বাঘের মত লাফাইয়া আসিয়া তার টুঁটিটা টিপিয়া ধরে, অথবা পিঠের উপর ছুড় দাড় করিয়া কিলের বজা ছুটাইয়া দেয়! তা বরং দিক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, পাছে তার সারি-বেঁধান

চোটে কান কাটিয়া দিয়া শেষে নিজেই আবার তাহাকে ‘কান-কাটা’ বলিয়া ফেপায়,—সেই সব ভয়েই সে তখন অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন তার মনে হইল, এর দণ-দণটা মাকড়ি-সম্বত দুই দুইটা কানই যদি তার বিনয় তার পেনসিল বাড়া ছুরী দিয়া কাটিয়া লইত, তো যেন এর চেয়ে সে-ও অনেক ভাল ছিল! লজ্জা যে এত বড় হইয়াও সংসারের কোথাও জমান থাকিতে পারে, এ যেন উন্মিলার ধারণাতেও ছিল না।

সেই যে সে দিন উন্মিলা ধস্তরকে ঘড়ি-ভাঙ্গার কথা জানাইয়া স্বামীকে লাজিত করাইয়াছিল, তাহার পক্ষে এ কিছু নতুন নয়, কিন্তু এবারে এ কাজটা সে যে কি অশুভক্ষণেই করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাহার ভাগা-নিয়ন্তা যিনি তাহার বুদ্ধিকে ওই পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনিই জানেন। তবে ইহার ফলটা যে এতখানি কটু হইয়াই দেখা দিবে, সে, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ রাখিলে নিশ্চয়ই এমন কস্ম সে কখনই করিতে বাইত না। সেই যে সে দিন স্নগভীর স্বপ্নাতরে গুপ্তচর বলিয়া বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই উন্মিলার দুই পায়ে কে যেন জোর করিয়া একগাছা মোটা লোহার বেড়ি আঁটিয়া দিয়াছে। বিনয় সেই একটবার মাত্র গর্জিয়া উঠিয়া বিছাতের ঝিলিক হানিয়াই সেই যে আবার পিছন ফিরিয়া বই লইয়া বসিয়াছিল, সেই যে বিছাৎ সে হানিয়াছিল, তার কাছে জগতের আর কোন রকমের মৃত্যু-বাণই বৃদ্ধি বেশী নির্ধাত নয়। গুনা যায়, তাড়িতের প্রবাহের মতন অত শীঘ্র মানুষ মারিবার শক্তি নাকি আর কাহারও নাই। বিদ্যুৎস্পর্শে এক মুহূর্ত্তের চেয়েও অল্প সময়ে দেহের প্রত্যেক লোম-কুপটিকে পর্য্যন্ত স্থির রাখিয়াই জীবন চলিয়া যায়। তা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার মত কেহ সেখানে ছিল না তাই, থাকিলে দেখিতে পাইত যে, এই চঞ্চলা মেয়েটিরও অবস্থা প্রায় সেই রকমই হইয়াছে। ঐ একটি মুহূর্ত্তের প্রচণ্ড তিরস্কারের লজ্জায় তাহার বুকটা যেন কালো হইয়া পুড়িয়া গেল এবং তাহাকে মরিয়া যাইবার জন্ত যেন প্রলম্ব-ঝড়ের গর্জনেই সে অনুজ্ঞা প্রদান করিল। এর চেয়ে সে যদি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণভূষা-যন্ত্রণ কান দুইটা সেই কঠিন-হৃদয়ে মচড়াইয়া ধরিত,

খানিকটা রক্তও যদি ইহাতে করিয়া পড়িত,—চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া পিঠে অজস্র-ধারার কিল-ঘুঘি লাগাইত—বুঝি, ঠিক এইট ছাড়া আর যা-কিছু করিত, তাহাতে উন্মিলাকে এমন করিয়া মরার ব্যাধি হইতে হইত না। কতক্ষণ সে সেই দরজাটা ধরিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,— সে যে কতটা সময়, সে অনুভব-শক্তিও বোধ করি ঠিক তাহার ছিল না। তার পর সেইরূপ থাকিয়া অনেকক্ষণ পরে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া যখন সে মুখ তুলিল, তখনও তাহার আততায়ীকে তাহার সেই নিজস্থানেই ঠিক সেই একই অবস্থায় নিবিড় মনোযোগের সহিত পাঠময় দেখিয়া সহসা তাহার সেই স্বত্বাধীনত অস্তরের উপর যেন আবার একবার নুতন করিয়া তপ্ত শেলের আঘাত লাগিল। এই অকথ্য লজ্জার ঝঞ্ঝা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এবার সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে অন্ধকার বিছানার মধ্যে উপুড় হইয়া গুইয়া পড়িল।

সে রাতে শীলেনের বাড়ীর বাঁধা-নিয়মেও যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

বিপিন বাবুকে আজ আর কেহ আহ্বান করিতে ডাকে নাই। জগদ্ধাত্রী কাজ-কর্মের তদারক সারিয়া বামুন-মেয়েকে ডাকিয়া কার পাতে মাছের মুড়া, কার পাতে জাজাখানা, খোলে বা অম্বলে কোন্ বড়িগোল দিতে হইবে, সে সবেগ পুরাদস্তুর হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া মালা লইয়া ঘেমন বসেন, তেমনি বসিয়া ছিলেন; কর্তা যখন বাড়ীর মধ্যে থাইতে আসেন, তাঁহাকেও উন্মিলা আসিয়া খবর জানায়; আজ আর উঠিবার কোন তাগিদই নাই। মালার পর মালা ফিরিয়াই চলল। বামুন মেয়ে এ দিকে রান্নাঘরে রান্না সারিয়া ঘুমে তুলিতে তুলিতে বিরামিতে অস্থির হইতেছে, শেষকালে আর থাকিতে না পারিয়া রান্নাঘরের ঝিকে বিড়াল তাড়াইবার জন্ত বসাইয়া, গৃহিণীর উদ্দেশ্যে উঠিয়া আসিয়া হাঁক পাড়িল, “বলি, হ্যাঁগা মা! আজ আমাদের বোরালী কি বাড়ী নেই না কি গা? সব খাওয়া দাওয়া হবে কখন?”

গৃহিণীর মনটা যেন এই রকম একটা কিসের সন্দেহের আমেজে অপের সংখ্যা ভুল করিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ‘নামের’ মালা ঘোড়-করগুজ মাথায় ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আহকের সম্মুখস্থ স্থানে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে প্রায়ের উত্তরে

ঈষৎ চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন, “কি জানি মেয়ে! আমিও তাই ভাবছি। বলি, পাগলীর বেটা আজ গেল কোথায়?”

এমন সময় চটিজুতা ফটর ফটর করিতে করিতে আসিয়া তীক্ষ্ণ-গলায় বিনয় হাঁকিল, “বামুন-মেয়ে! বলি, আজ কি খেতে পাবো না, পেট যে জ্বলে গেল।”

“এই যে দাদা! এই যে খাবে এসো না ভাই! ওরে দাদাবাবুর আসন দে। হ্যাঁগা দাদা! আমার বৌদি’মনি আজ সন্ধ্যা থেকে কোথায় গা? অন্ত দিন সাতবার যে রূপকথাই শুন্তে ছুটে ছুটে আসে, আজ যে বড় সাড়াটি শুক নেই? তানার জন্তে ব’সে ব’সেই তো এত রাত হয়ে গেল। বলি, সময় হ’লেই তিনি আপনাদের ডেকে ডেকে আনবেন খ’ন।”

জগদ্ধাত্রীও ব্যস্ত হইয়া বিনয়কে প্রশ্ন করিলেন, “হ্যাঁ রে, বোমা কোথায়?”

বিনয় ততক্ষণে আসনে গট্ হইয়া বসিয়া সাবহিতচিত্তে আহ্বারে মনোনিবেশপূর্বক গম্ভীর-মুখে উত্তর দিল,—“হার-হাইনেসে’র টুরের প্রোগ্রাম আমার জানা নেই।”

তল্লাসে যখন জানা গেল যে, উন্মিলা তার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিতা, তখন গৃহিণীর আর ভয়-ভাবনার পরিসীমা রহিল না। ঐ দৃষ্টি মেয়েটির চক্ষে ঘুম যে কত হুঃখেই আনিয়া দিতে হয়, সে ত তাঁহার বিলক্ষণই জানা আছে। নিশ্চয়ই বড় বেশী অসুস্থ হইয়াই সে এমন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে? স্থূল শরীর ও ব্যস্ত মন লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপর-তলার উঠিয়া “উন্মিলা”! “উন্মিলা”! হাঁক পাড়িতে পাড়িতে তিনি তাহার ঘরে আসিলেন।

“ও মা, তুই ঘুমুচ্ছিস্! এমন সময় কেন ঘুমলি মা?”—বলিতে বলিতে হৃদয়-ভরা অগাধ মেহ লইয়া মেহময়ী শাওড়ী বধুর মুখের উপর কুঁকিয়া পড়িলেন।

উন্মিলা বোধ করি বা ঘুমাইয়াছিল, ডাকা-ডাকিতেই যেন তাহার কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল; এমন ভাবেই গা ভাঙ্গিয়া নিদ্রালস-জড়িত-কণ্ঠে “উ!”—বলিয়া একটা উত্তর দিয়াই সে আবার ভাল করিয়া গুইল এবং শাওড়ীর অজস্র প্রশ্নের, অনুরোধের, শাসনের উত্তরে শুধুমাত্র একই উত্তর দিল যে, তার বড় অসুখ করিতেছে।—সে আজ থাইবে না, উঠিবে না।

মা চমকিয়া গারে হাত দিয়া দেখিয়া গেবে

সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “নাঃ! বেশ আছে! নে’ বাপু ভক্তি রাখ, গা’তো তোর কনকন করছে। অশ্রুৎ হয়েছে না ছাই হয়েছে। সারাদিন দস্তি-বস্তি করিস, রক্ত-মাংসের শরীরে আর কতই সময়? তাই ঘুমিয়ে পড়েছিস। ওই ক্ষুদ্রই তো বলি বাছা! যে বড় হচ্চিস, ছপুর-বেলা আমার কাছে এসে হুদুগ শৌ, বোস, তা’ তো তোর কুষ্ঠিতে লেখে নি। কাল থেকে ছপুর বেলা ঘুমু দেখি একটু, গায়েও তা’তে ‘গতি’ লাগবে।”

উন্মীলা শাণ্ডীর হাতখানা নিজের গায়ের উপর হইতে ঝটকা দিয়া সরাইয়া দিল এবং একটু চুপ হইয়া থাকিয়া তিক্ত-কণ্ঠে বলিল, “অর তো আর আমার হয় নি, যে, তুমি গা হাতড়াচ্চো! আমার যা ভয়ানক রকম পেট ব্যথা করছে।”

গৃহিণীর বিলম্ব দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বামুন-মেয়ে উহাদের সন্মানে আসিয়া এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে অমনি বক্তার দিয়া উঠিল, “কাম-ডাবে না পেট? বলি, পেট তো আর ক্যান্সিসের ব্যাগ নয়, যে, যা খুসী তাতে ভ’রে দিলেই হ’ল! বলবো কি মা, তোমায় বললে না পেতায় যাবে, দাদাবাবু আর এই আমাদের বো-রাণীটি মা আর জন্মে যে কে ছিলেন, তা দেবতারাই জানে! এমন সব অখাপ্তি দেখিনে মা! যা ওঁদের পেটে যায় না। কাল দেখি না আমড়া-পাতা-গুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে হুন দিয়ে দিয়ে খেতে লেগে-ছেন। আরি বারণ করলুম বলে বোরাণী তো আমায় ভেংচে টেংচে এক করলে; দাদাবাবু আবার বলে কি, জানো? বলে কি না, খেয়ে দেখ তো বামুন-মেয়ে, এ খেলে আর কখনো ভুলতে পারবে না। তা ও-সব খেলে আর পেট-ব্যথা—”

উন্মীলা হাত-পা ছুঁড়িয়া অধৈর্য্যসহকারে চেষ্টা-ইয়া উঠিল, “মা গো, বাবা গো, সবাই মিলে এই ঘরের মধ্যে চেষ্টাতে ঢুকলো! যাও শীগ্গির তোমরা, না হ’লে আমি একুনি ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ ক’রে গুয়ে থাকবো, তা বলে দিচ্ছি। অশ্রুৎ করেছে বলচি, তা একটু ঘুমুতেও দেবে না।”

জগদ্ধাত্রী একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, “তা হলে একটু জোনে-হুনে থা দেখি, না হয় তো—”

বধু এবার উঠিয়া বসিয়া সরোদনে “না হয় তো খানিকটা উহুনের ছাই এনে দাও, খাচ্ছি—” বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনশ্চ বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ ডুবিল; এবং কাঁদা-কাঁদা-ধরে বলিতে

লাগিল, “বল্চি আমার কিছু ভাল লাগ্চে না, আমার সব ছেড়ে দাও, তোমাদের সে হবে না। আমার অত আদরে দরকার নেই গো, দরকার নেই! যাও দেখি তুমি আমার ঘর থেকে।”— বলিতে বলিতেই পুনশ্চ বিগুণ বেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন অপ্রতিভের এক-শেষ হইয়া স-পার্বদ গৃহ-কর্ত্তী বধুর ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু সে রাত্রের অবশিষ্ট কাজকর্মের মধ্যে আর যেন তিনি নিজের মনটাকে কোনমতেই লাগাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কর্ত্তা আজ সন্ধ্যাবেলায় আফিস খাইতে পান নাই, তাঁহার শরীর বিষম-বে-এক্সার হইয়া রহিয়াছে—পদসেবা হয় নাই, বাতের শরীর, ব্যথায় আড়ষ্ট। তার উপর বধুর অশ্রুততার সন্মানে মনটা যেন তাঁহার কি এক রকম হইয়া গেল। সে রাত্রের খাওয়ার মধ্যে কোন রসই তিনি পাই-লেন না,—সাতবার করিয়া গৃহিণীকে বলিতে লাগি-লেন, “হ্যাঁগা, পাগলী বেটার যদি সত্যি সত্যি বেশী অশ্রুৎ হয়? হ্যাঁগা, হরিদাস ডাক্তারকে না ইয়া একবার ডাকাওই না।”

বিনয়কে সাইকেল লইয়া খাইতে বলায়, সে শুধু হইয়া জবাব দিল, “আমি কি তোমার বউ-এর খানসামা নাকি যে তাঁর চুল টান্টন কর্চু বলে এই রাত্রে অমনি স্নানের যুখে বাতের যুখে পড়তে দৌড় দোব? ভাল এক আছরী জুটেচে।”

ভয়ে আর জগদ্ধাত্রী স্বামীকে এ কথা জানিতে দিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার মনটা এ-রাত্রে শুধু একটু পেট-ব্যথার জন্য ডাক্তার ডাকার হাদায়া আর পোহাইতেও খুব বেশী রাজী হইল না। তিনি বলিলেন, “দেখা থাক, চুপ ক’রে থেকে ঘুমিয়ে যদি সেরে যায় তো আর অত নেঠা কেন?”

কেবল বিনয়ই শুধু এ বাড়ীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে আহারকার্য্য সমাধা করিয়া নিজের স্বতন্ত্র শয়নাগারে নিদ্রা দিতে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর হইতে চক্রের গতি যে কেমনই সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল, সে যেন এক ইচ্ছাকাল। উন্মীলা সে দিনের সেই অপ্রত্যাশিত হুসহ লজ্জার বেদনায় এমনই মুসড়িয়া পড়িল এবং নিজের মনের সঙ্কোচে বিনয়ের সান্নিধ্যকে সে এমন করিয়াই

পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, এক এক সময়ে তাহার নিজের কাছেই এটা এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকার মতই অদ্ভুত ঠেকিল। বিষয়ে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যা' শত চেষ্টাতেও কেহ এ পর্য্যন্ত পারে নাই, কেমন করিয়া সেই এত বড় দুঃস্থ কার্য্য আপনা হইতে সে করিতে পারিতেছে? ইহা ভাবিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যটা যেন একটা অকথ্য ও প্রচণ্ড ব্যথায় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। কতবারই বিষয়টাকে অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিয়া চিত্তকে লঘু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া নিজেকে ভীকু বলিয়া গালি দিয়াছে। নিতান্ত সহজ ভাবেই ঝড়ের মত ছুটিয়া বিনয়ের পাঠাগারে ঢুকিয়া পড়িয়া ভালর-মন্দে কলহে-কাতরতায় এই বিষম অভিশপ্ত মৌন-বিদ্রোহের একটা চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্ত যে সে নিজের সমস্ত শরীর-মন-প্রাণকে ক্রুর উদগ্র আগ্রহে উন্মুখ করিয়া ধরিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্য্যামী ব্যতীত বুঝি সে নিজেও তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যে সে দিনের বজ্রপাত করিবার পর হইতেই বিনয়ের মুখ-খানা নিরেট মেঘের মতই কঠিন হইয়া আছে, অতি গোপন-সম্পূর্ণে সেই মুখখানার দিকে চুপ্ত করিয়া চোখ তুলিলেই উন্মিলার অটল হৃদয় কেনই যে পদ্মপত্রের সঞ্চিত জল-বিন্দুর মত টলমল করিতে থাকে, সে কথাও ঠিক বুঝা যায় না। আসল কথা, যে কখনও সত্যকার কোন পাপ করে নাই, সে যদি একটা যথার্থ অন্তায় আচরণ করিয়া বসে, তো তার শাস্তি যতটা বাহির হইতে সে পায়, তদ-পেক্ষায় সহস্রগুণে উপভোগ করিয়া থাকে সে নিজের মনে। এই যে অজ্ঞাত তাড়নাটা সে অহরহই ভোগ করিয়া চলিল, এটা যেন তার নিজেরই বিবেকের তাড়না।

আবার ও দিকে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতির ইতি-হাসে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের বহর দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিনয়ের মতটাও ইদানীং বেজায় রকম কড়া হইয়াই উঠিয়াছিল। কোন যুদ্ধের এক জন পাণ্ডা লিখিয়াছেন, শত্রুপক্ষকে ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁর গৃহ-পক্ষকে দণ্ড দিতে কত ক্রোশ পার্বত্যপথ ছুটিয়াছিলেন; এই অসতর্কতার স্মৃতিই এ দিকে তাঁদের পরাভব বটে। ইত্যাদি। সে একেবারে বজ্রের মত কঠিন হইয়াই স্থির করিল যে, এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য ইতিহাস-সম্মত ভাবে যখন উন্মিলাকে তার প্রাণদণ্ড দিবার উপায় নাই,

তখন অন্ততঃ উহারই একটুখানি কাছাকাছিও পৌছান আবশ্যক। গুপ্তচরকে ছেলেরা একেই একটু বিশেষরূপে ঘণা করিয়া থাকে, তার উপর বিনয়ের আবার সেই ঘণার মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত সীমায় পৌছিয়াছিল। তার উপর আবার যখন সে দেখিল, দিনের পর দিন কাটিলেও সেই অপরাধিনী,—সেই ঘৃণিত জীব, তাহার হুই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে পর্য্যন্ত আসিল না,—বরং তেজ ও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া দূরেই সরিয়া রহিল, তখন সে সেই অন্তরস্থ তীব্র ঘণা-বিদ্বেষের বশে একরকম পাগল হইয়াই নিজের মনের কাছে শপথ করিয়া বসিল যে, এ-জন্মে আর কখনও উন্মিলাকে তাহার ক্ষমা করা হইবে না, এবং এই প্রতিজ্ঞার পর হইতেই অসম্ভব মনোযোগ-সহকারে সে বিজ্ঞানাভ্যাসে যত্নবান হইয়া বই ঘাঁটিয়া, বই পড়িয়া গৃহবাসী সকলের ও স্কুল-মাষ্টারদের চমক লাগাইয়া দিল।

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিল। উন্মিলার পেট যদিও গাঁদালপাতার ঝোল ও বিটুগু দেওয়া যোয়ান-বড়ির ভয়ে আর কামড়াইতে পথ পায় নাই, তথাপি অ-ক্ষুধাটা তার খুবই জোর করিয়া-ছিল। দিনে রাত্রে বার পাঁচ-ছয় পেট চিরিয়া খাওয়াইয়াও যার ক্ষুধা মিটাইতে পারা যাইত না, সারাদিনই তেঁতুল, কুল, কাসুন্দি, আলুপোড়া ভুট্টাভাজা, চানাচুর, কুলপি-বরফ ইত্যাদির মতলবে মতলবেই যাকে ঘুরিতে দেখা যাইত; সে এখন নিতান্ত স্বেবোধ বালিকার মত নিজের খাবার-টুকু খাইয়া যার, আবার তাও খানিক খানিক পাতে পড়িয়া থাকে। কচি আম, কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে পিষিয়া ঝালের চোটে হ'চোক-ভর্তি জল লইয়া সে যখন তাহার সঙ্গীটির সঙ্গে পরস্পরানন্দ উপ-ভোগ করিত, জগদ্ধাত্রী তা' লইয়া অবশ্য অনেক রাগরাগিও করিয়াছিলেন, কিন্তু এই যে বৈশাখী ঝড়ের পড়তি আম ভাঙারের ডালায় রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল, অথচ উন্মিলা তার একটাতেও হাত দিল না, এতে যে তাঁর মনটা কতই কাঁদিল, সে যে অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেউ জানিল না। নাঃ, যে বয়সে কাড়িয়া লুটিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার কথা, তখন যদি ছেলেমেয়েরা গো-বেচারী বা বুদ্ধ-দেবে পরিণত হইয়া বসিয়া পড়ে, সে আর যার ভাল লাগিতে হয় লাগুক, মায়ের কখন তা' লাগে না—তাঁরা হুই শ্বামি-স্বীতেই তাঁদের এই পাগলী বউ-টিকে লইয়া বড়ই বিব্রতা হইয়া রহিলেন। কবিরাজ

বলিলেন, নাড়িতে কোন রোগের চিহ্ন নাই, পেটও আর কামড়ায় না যে তাকেই একটা বড় রকম আক্রমণ দেওয়া যায়; অথচ ওই যে মুখটি ভারতীর, চোক দুটি ছলছলে, হাসি নাই, ফুর্তি নাই, যে লাকালফি মারামারির চোটে বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ থাকিত, সে সবের কিছুই নাই, এ কি কখন ভাল লাগে? বিপিন শীলও এই স্তব্ধ ও মৌন প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হন, প্রাণ তাঁহার ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া উঠে, মাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করেন, “হ্যাঁগা মা! অমন করে রয়ে-ছি কখন? তোর কি হয়েছে রে?”

এই মেহ-সম্ভাষণে উন্মিলার বক্ষ যেন উথলাইয়া উঠিতে থাকে। নাক-চোক জ্বালা করিয়া জলের প্লাবন বাহির হইয়া আসিতে চায়। গলায় ঠেলিয়া ওঠা কঠিন আবেগটাকে কোন মতে নিরুদ্ধ রাখিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া হাসির ধরণ দেখাইয়া সবেগে মাথা নাড়ে,—“কিছুই না”—এবং আত্মগোপনের জন্তই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া পালায়।

ইহার পূর্বে আর কখনও তো এমনটা ঘটে নাই, তাই এতবড় কাণ্ডটা ঘটিতে থাকিলেও এই বালক-দম্পতীর প্রবীণ অভিব্যক্তির চিত্তে কোন সন্দেহের রেখাপাতই করিতে পারে নাই। উন্মিলা মুখ ফুলাইয়া থাকে, বেশীর ভাগ সে বিছানাতেই পড়িয়া থাকে, এই বলে পেট-ব্যথা, এই বলে মাথার ঘূর্ণায় প্রাণ গেল, ভাল কথাটি বলিতে গেলেও সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দশটা মন্দ শুনাইয়া দেয়। স্বপ্ন-শাওড়ী তো বউ লইয়া একরকম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ছেলের যে আজকাল তার পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যেই অথও মনোযোগের সঞ্চার হইয়াছে, কোন রকম বদমায়েসীর মধ্যেই আজকাল আর তাহার সাড়াটি অবধি পাওয়া যায় না; হঠাৎ এক দিন এই তত্ত্বটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যখন ইহার মূল তথ্যটিও জানা গেল—অর্থাৎ কি না তাহার ঘাড়ের অবিভাগটির স্বক্ৰ ত্যাগ করাতেই এই সুযোগটুকু ঘটিয়াছে; এটুকুও জানিতে বাকী রহিল না,—তখন এই একমাত্র কারণেই গুণু প্রিয়তমা বধূটির ক্রিয়া পড়াটাকে তাঁহারা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইতে পারিলেও মনে মনে তাহার জন্ত তাঁহাদের আর উদ্বেগের অন্ত রহিল না। রোগের কষ্টেই যে সে তাহার স্বামি-রক্তটিকে ভূতের মত অনুসরণ করা হইতে মুক্তি দিয়াছে, এ বিষয়ে

সন্দেহের ছিলই বা কি? ইহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ যে কবি-বাক্যকে সার্থক প্রমাণ করিয়া তাহাদের “যখন হতো ঝগড়া-ঝাঁটি, হতো প্রায়ই লাঠালাঠি,—গতিক দেখে ছোটোছুট পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকতো”—গোছের হইয়াছে। আজ সহসা তাহারা এত কি বড় হইল যে—

কিন্তু একটি পূরা দিন-রাত্রির অবসানে এই হেয় অবজ্ঞের গুপ্তচরীটির ‘বিরহ’-বেদনা তার বিচারককে এমন করিয়াই পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা প্রায় অসাধ্য হইয়াই উঠিল। তার ঘুম ভাঙ্গা হইতে ঘুম আসা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটার সকল কিছুই যেন নিরুপদ্রবে, সুনিয়ন্ত্রিতায় অসহ বিরক্তিকর হইয়া পড়িল। কানের মধ্যে ‘টু’ করিয়া, অথবা দুই পা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আর কেহই ঘুম ভাঙ্গায় না। পড়ার সময় পিছন হইতে অলক্ষিতে আসিয়া চোক চাপিয়া ধরা, আচম্কা আসিয়া পড়িয়া ফস্ করিয়া বই কাড়িয়া লওয়া এবং তাই লইয়া খানিকটা মারামারি হড়াহড়ি ও তত্পলক্ষে কোন কোন দিন তিরস্কারলাভ, কোন কোন দিন পাঠ্য-পুস্তক-খানাকেই ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করা, ভাতের খালা সামনে লইয়া যে কোন একটা তুচ্ছ বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া—আর তো তেমন করিয়া ভাত-ছড়াছড়ি, জলের গ্লাস উল্টাইয়া কত না অনাস্থাষ্টি অকর্ম্মের সৃষ্টি করা এবং সেই সব অজ্ঞায় অপচয়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে উত্তরেরই ভৎসিত হওয়া। এ সব যেন কোন সুদূরের কাহিনী হইয়া উঠিল যে! বিনয়ের প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। উন্মিলার সে দিনকার সেই ভীম মুখচ্ছবি স্মরণে আসিয়া তাহাকে তাহার উপর যেন অকস্মাৎ মমতায় ভরাইয়া দিল। উন্মিলার দোষের বিচার করিয়া সে তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছে; কিন্তু কত দিনই যে এই উন্মিলা তার কত শত অজ্ঞায় অত্যাচারকে নিজের বকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই প্রাপ্য তিরস্কার নিজে সহিয়া গিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত নিজ হইতে সে যে কতবার বলিয়াছে—“তুমি করেছ জানলে বাবা বেশী রাগ করবেন, তার চেয়ে বলি যে আমি করেছি।”—বিনয়ের এই সতের বৎসর বয়সের জীবনে হঠাৎ আজ সে সব কথা মনে পড়িয়া অত্যন্তই লজ্জাবোধ হইল। এতবড় কাপুরুষতা

তার কোথা হইতে জাগিয়াছিল, যে, মেয়েমানুষের আড়ালে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে—তার বোধ হইল, তবে তো উন্মিলার তাহাকে ধরাইয়া দিবার স্তায়-সঙ্গত একটা অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। সে যে তার কাছে নিজেকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছিল! এই কথা মনে হইতেই নিজের পরে ক্রোধে উন্মিলার সম্বন্ধেও বিরক্তিতা প্রবল হইয়া দেখা দিল। তা' যাই হোক, 'স্পাই'কে তা' বলিয়া কোনমতেই ক্ষমা করা চলে না। আবার তার উপর দোষ করিয়া—অতবড় দোষ করিয়া উন্মিলা আবার উন্মিতা কি না এমনি ভাবখানা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন, যেন বিনয়ই তাঁর কাছে কত বড়ই অপরাধী! বেশ থাকুন। এ জন্যে আর কখনই সে উহার সহিত সখ্যতা-স্থাপন করিবে না। সে এই জন্যে মতই শেষ হইয়া গেল।

অকস্মাৎ এই সমস্যাটোতেই একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।— বিনয় আসিয়া বলিল, “বাবা, আমি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে চাই, আমাদের স্কুল থেকে চার জন ছেলেকে পাঠাচ্ছে, আমারও খুব ইচ্ছা যে যাই, আমার যেতে দিন।”

বিনয়ের এক জন অধ্যাপক নিজে আসিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন : এবং বিনয়কে পাঠাইবার জন্য বিশেষ ভাবেই অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, “পড়া নিয়ে ব'সে কাটাবার চেয়ে আর সকল বিষয়েই ওর শক্তি বেশী। বিশেষ, আপনার ঘরে পরসার ছুখ নাই; এ অবস্থায় বিনয়ের মতন ছেলেরই ভাল ডাক্তার হবার সুযোগ অধিক, আমি দেখেছি ওর দয়া-ধর্মটা খুবই প্রবল। পথের তিথারীদেরও ও ডেকে কথা কয়, তুলে বসায়। ওকে জীবন সার্থক করবার এ অবসর দান করুন। বিশেষ এমন সুযোগ পাচ্ছে।”

বিপিন শীল ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনুমতি দিয়া ফেলিলেন।

জগদ্ধাত্রী কঁাদো-কঁাদো-গলায় বলিলেন, “হ্যাঁগা, ছেলেটাকে আবার তুমি কাছ-ছাড়া করতে চাইচো? তোমার কি ভয় নেই প্রাণে একটুও?”

বিপিন বাবু মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “সে তো বটেই। কিন্তু কি জানো, ছেলেটা পড়া-শোনার তো তেমন নয়, অথচ এ দিকে বেশ একটু শক্তি আছে, দেখলে না, সে দিন চট্ট করে সেই ভারী ছিঁড়ে পরা মিজীটাকে এক মুহুর্তে কেমন ব্যাঙে

বেঁধে রক্ত বন্ধ ক'রে দিলে, আর ওর মাষ্টাররাও সবাই বলচেন যে, ওর যখন একটা স্বাভাবিক শক্তিই রয়েছে, ও-বিষয়ে আবার এমন একটা সুযোগ উপস্থিত, তখন আর বাধা দেওয়াটা উচিত হয় না। দেখ, গোবিন্দ কি আর বারে-বারেই আমাদের কঁাদাবেন! তাঁর নাম নিয়ে যাতে ওর মঙ্গল হয়, তাই হ'তে দাও!”

তথাপি মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। মা ছেলের কাছে কাদিয়া গিয়া পড়িলেন; বলিলেন, “আমি কাকে নিয়ে থাকবো রে? তোর মুখ দেখেই যে শুধু পাষাণে প্রাণ বেঁধে বেঁচে রয়েছে।”

ছেলে হাসিমুখে জবাব দিল, “কেন, তোমার তো আর এক জন রয়েছে। তাকে নিয়ে খেঁক, আমার যেতেই হবে।”

শুনিয়া উন্মিলা চিলের ছাদের পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া খানিক কাদিল, তারপর দিনে রাত্রে এদিক-সেদিকে উন্মুখ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যে, যদি এই বিদেশ যাত্রা উপলক্ষ্যেও তাহাদের মধ্যকার এই সহসাগত, অথচ ইহারই মধ্যে যেন প্রায়জন্মজন্ম বিরাট মৌনতার নির্মম প্রাচীরটা কোন মতে ভাঙিয়া পড়ে! যদি তেমন ঘটতে পারে, তবে বুঝি উন্মিলার কাছে এই দীর্ঘদিনের ছাড়াছাড়ির নিদারুণ ভীতিও আনন্দ-সংবাদের মতই মধুর হইয়া উঠে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনয়কুমারের কলিকাতা-গমন উপলক্ষ্য করিয়া তাহার নিজের বাড়িতে ও পড়সী-গৃহে যখন যাত্রার আয়োজনে ছোটখাট ঘটনা উঠিয়াছে; উন্মিলার মনের ভিতরে সে সময়ে নিয়তই একটা অতি ভীষণ অশ্রু-পাত চলিতেছিল। তার মনে হইল, তার উপর রাগ করিয়া বিনয় যেন এই রকমে তাহাকে জন্মের মতন ফেলিয়া বাইতেছে। তার অপরাধেরই এ যেন প্রায়শ্চিত্ত। আর এই যে তাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া বাইতেছে, এর পর আর কখন—কোন দিন কোথাও দিরাই বা যেন তাহাদের মধ্যকার এই ব্যবধান ঘুচিবে না, এমনি একটা প্রবল আতঙ্কমিশ্র দুঃখ সে তাহার বালিকাচিত্তে এতই তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহা সহ্য করিয়া থাকা তার পক্ষে

একান্ত দুঃখ হইয়া দাঁড়াইল। এবার আর নিজেকে স্মরণ করিয়া রাখিবার চেষ্টামাত্র না করিয়াই সে যেন একান্ত অসহায়ভাবেই অন্তর্ভেদী হৃৎকের হস্তে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া কান্নার আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়া বিছানা লইল। বামুন-মেয়ে ভাত খাইবার জন্ত ডাকিতে গিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত যখন জানাইল, “আহা গো! দাদাবাবু কলিকাতায় ‘থাকতে’ যাচ্ছেন কি না, তাই জন্তে বৌদিমণি কান্দিতে নেগেচে গো! আহা, তানারও মুখটি এতটুকু হয়ে শুকিয়ে গেছে।”—তখন উম্মিলার সকল হৃৎক যেন বাঁধ-ভাঙ্গা বর্ষা-জলের মত তার বুক ছাপাইয়া পড়িয়া দামোদরের বস্তার মতই ছুঁ শব্দে ছুটিয়া বাহির হইল। কান্নায় কান্নায় সে যেন আপনাকে এবং দর্শককেও অবসন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া তুলিল।

কিন্তু বিনয় তার এই নীরব কান্নার কোন খবর না জানিয়া অথবা বামুন-মেয়ের মুখে শুনিতে পাইয়াও এটুকুকে পর্যাপ্ত বোধ করিতে পারিল না। তার কলিকাতা যাওয়ার খবরেও যখন অপরাধিনীকে লজ্জা-বিপন্ন ও ভয়বস্ত করিয়া তার পায়ের তলায় টানিয়া আনিয়া না, তখন তার ক্রোধটা যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল এবং সেই ক্রোধ যতটা হইল, তদপেক্ষায় চারিগুণ বেশী হইয়া দেখা দিল অভিমান। ‘উম্মিলা’—যে উম্মিলার জন্ত সে তার মা-বাবারও কত সময় অবাধ্যতা করিয়া থাকে, তার ছোট-বেলার বন্ধু নাথব, কালু, সুশীল এ সবাইকে যার জন্ত সে কত দূরেই সরাইয়া দিয়াছে—পাঠশালার অগ্রাহ্যের তো সীমাই নাই; সেই উম্মিলা নিজেকে অত বড় দোষী হইয়াও কি না তার উপর রাগ করিয়া মুখ ফুলাইয়া বসিয়া রহিল। সে কত দিনের মতন এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, তা দেখিয়াও তার কাছে ঘাট মানিতে আসিল না! উম্মিলার জন্তই সে স্কুল পলাইয়া আসে! এরই জন্ত চিলের ছাদে উঠিয়া আকাচা-কাপড়ে মায়ের সাধের আচার চুরি করিয়া আনিয়া মাকে মনঃক্ষুণ্ণ করে! নাঃ! এ জন্যে আর নয়—যদি মরিবার পরেও এক জায়গায় থাকিতে হয়, তখনও—সে কোনমতেই আর উম্মিলাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।—

তখন অত্যন্ত দৃঢ় ও নিবিষ্টচিত্তে সে নিজের ভবিষ্যৎকে গুড়িয়া লইতে বসিল। অদূর-ভবিষ্যতের

কলিকাতাকে সে নিজের হৃদয় দিয়া গঠিত করিল। সেখানে কত হাসি, কত আমোদ, কতই না বন্ধুজনের সাদর-কোলাকুলি। তার পর: পড়া-শুনা, কতই নূতন নূতন শিক্ষা, নব নব সমাজের মধ্যে মেলা-মেশা; দরকার কি তার মধ্যে উম্মিলার কথা ভাবিবার?—শেষকালে যখন বিনয়—ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে, খুব নামজাদা মস্ত ডাক্তার। দু-তিনখানা মোটর, চার-চারটে কম্পাউণ্ডার, মস্ত বড় ডিম্পেসারী, আরও কত কি! ভোর হইতে তার দরজায়—উঃ! সে কি ভিড়,—কি ভিড়! বৈকালেও ওমনি। ওদের দেখা-শুনা করিয়া তৈরী মোটরে এই এখানে—ওই সেখানে, সারা সहरটাতেই যেন ঘোড়দোড় করিয়া বেড়ানো, বাড়ী ফিরিয়া ছুটি নাকে-মুখে শুঁজিতে না শুঁজিতেই তখনি আবার দেশের সব চাইতে বড় লোকের বাড়ী হইতে ডাকের উপর ডাক। বাড়ীর লোকেরা তার পরিশ্রম দেখিয়া কাতর হইয়া বলিতেছে, “হ্যাঁগা, দেশে কি আর কোনই ডাক্তার নেই? তাদের কারকে ডাক না, বাবু যে খেটে খেটে মারা যাচ্ছেন!” উত্তর হইল, “আজ্ঞে, ডাক্তার ঢেরই আছেন, কিন্তু এমন মরা-বাঁচানর শক্তি তো আর তাদের নেই। কাজেই ওঁকে আমরা ছাড়তে পারি নে। দোহাই ডাক্তার-বাবু, শীগগির করে একটিবার চলুন; না হ’লে আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে যায়।” আর কি খাইতে পারে? বিনয় উঠিয়া ছুটিল, সে জুতা পরিবার হারা সহ্য না। তার মাথানাই বা তার উম্মিলাকে কিসের প্রয়োজন? নাঃ—কিছু দরকার নাই।

আচ্ছা, উম্মিলার যদি অনুখ করে? তারি কঠিন পীড়া, তাহাকে তার মা আসিয়া খবর দিলেন, সে কি করিবে?—সোজা মার মুখের উপর—বলিয়া দিবে যে, “আমি কি জানি!—তোমাদের বউমার অনুখ, তোমরা ভাল ভাল দেখে ডাক্তার আনাও না; আমি ছাড়াও তো অনেক আছে। আমি আর এমন কি ভাল!”

ভাল ভাল ডাক্তাররা আসিল, রোগ-নির্ণয় হইল না; শেষে এমন হইল যে, উম্মিলার আর জীবনের কোনই আশা রহিল না, এক দিন তো তাকে ঘেরিয়া এ বাড়ীর ও তার বাপের বাড়ী হইতে আগত লোকেরা কান্দা-কাটা পর্যন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন, তখন বিনয় কি করিবে? সে তখন নিশ্চয়ই তার বাপকে গিয়া বলিবে যে,

যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, এখন আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি; অবশু জীবন-মরণের জন্ত দায়িত্ব এ অবস্থায় আমি লইতে পারি না।—এবং তার পর বিনয়কুমার শীলের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য চিকিৎসা-কৌশলে সেই মৃত্যুমুখীন রোগীকে সে অবলীলাক্রমেই বাঁচাইয়া তুলিল। তখন! উন্মীলা তরুণ, কি করিবে? ডাক্তারবাবুর হুঁপায়ে জড়াইয়া ধরিয়া আর পায়ে উপর মুখ ঝুঁজিয়া নাঃ, ক্ষমা সে তাহাকে তবুও করিবে না! খাড়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টস্বরে তাহাকে জানাইবে যে, তুমি মরিতে বসিয়াছিলে, দয়া করিয়া তোমার প্রাণ দিলাম, তাই বলিয়া যে সেই সঙ্গে ক্ষমা করিতে হইবে, তেমন কথা—অন্ততঃ আগাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রে তো লেখে না।

উন্মীলাকে ক্ষমা, সে তো কোন দিনই করা চলিবে না।—তার যেমন কর্ম, তেমনই তো ফল হওয়া চাই। নতুবা ঈশ্বরের আইন যে ভাঙিয়া যায়। জগৎ হইতে পাপের প্রায়শ্চিত্তের দৃষ্টান্ত যে উঠিয়া যায়।

এ দিকে যে দিন ভোরের ট্রেণে বিনয়কে তার প্রফেসরের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, তার পূর্ব্বরাত্রে উন্মীলা তার অত্যন্ত নিদ্রাসক্ত-সঙ্গেও কোনমতে একটি বারের জন্ত চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না।

জগদ্ধাত্রীর ক্লাস্ত শরীর-মন সারাদিনের কান্নাকাটি ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে বিছানায় পড়িতেই ঘুমে এলাইয়া পড়িল। তখন উন্মীলা উঠিয়া চুপি চুপি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া চোরের মত পা টিপিয়া ছাদে উঠিল এবং সেখানের একটা কোণে প্রাচীরের গায়ে মিশিয়া বসিয়া মুক্তহৃদয়ে কাঁদিয়া বাঁচিল।

রাত্রি গভীর, চরাচর নিস্তরু ঘুমন্ত। শীলদের নিদ্রাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বাড়ীটার পিছনে প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি লইয়া সুরহং উদ্ভান। তার শেষ দেখা যায় না, কেবল চারিদিক্ দিয়া বড় বড় গাছের মাথাগুলো স্থানটাকে প্রাচীরের মতন ঘিরিয়া আছে, এইটুকুই দেখা যায়, বাতাস আছে কি না বুঝিতে পারা কঠিন, কিন্তু কদাচিৎ একটা সরল দেবদারু উন্নত-শীর্ষ ঈষৎ নত হইয়া অতি-মৃদু-মর্ম্মর শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। টাদের আলো নাই, কিন্তু অতি উজ্জল ও অসংখ্য নক্ষত্রের আলোর একটা অশুট জ্যোৎস্নার মতই আলো ফুটিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নার মৃদু ও স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভানের সুপ্রশস্ত

দীর্ঘিকাটি যেন একখানা প্রকাণ্ড রূপার পাত্রের মতন স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে ও জ্যোৎস্নার আলোর মিশিয়া আলো-আধারের জাল বুনিয়া যেন সেখানের সহস্র-শীর্ষ বৃক্ষ-রাজীর মাথার উপরের লজ্জা-বস্ত্রের মতই বিছাইয়া ধরিয়াছিল। উন্মীলা অনেকখানি শান্ত হইয়া তাদের চিরদিনের শত সঞ্চয়পূর্ণ সেই পাথরে-বাঁধান ঘাটের দিকে চোখ স্থির করিয়া চাহিয়া রহিল। ঐ বাগানে কত লুকোচুরি, কত জল-ডেঙ্গাডেঙ্গি, কত কাণা-মাছি খেলা, আর ঐ পুকুরের জলকে গ্রীষ্মের প্রভাত অপরাহ্নে তারা কি তোলপাড়ই না করিত। দত্ত-বাড়ীর ছ'জন মেয়ে তাদের সঙ্গে খেলিতে আসিত, কিন্তু তারা তো আজ তার মতন এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে না, উন্মীলারই যে সব গেল!

প্রকৃতিকে যতখানি স্পষ্ট ও শান্ত বোধ হইয়াছিল, ঠিক যেন ততখানি নয়। প্রকাণ্ড ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা পুরাতন বটগাছের মাথার কান্নার অনুরূপ একটা কর্কশ চীৎকারে উন্মীলার বুকের মধ্যে ভীতি উদাহরণ পাঠাইয়া দিয়া কাল-পেঁচাটা ঝটপট শব্দে ডানা ঝাড়িয়া উড়িয়া গেল। উন্মীলা ইহাতে আচম্কা অত্যন্ত ভয় পাইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই ও-পাশের রাস্তা হইতে বিশ্ববখাট তাদের পাড়ারই একটি ছেলে গোবরার গানের শব্দ সে শুনিত পাইয়া যেন অনেকখানিই আশ্বস্ত হইয়া আবার সেইখানেই যেমন তেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই অস্তুর বাহিরের সর্ব্বশূন্যতার মাঝখানে একটা জঘন্য মানুষের ওইটুকু সাঁড়াকেই তার আজ যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল; নতুবা গান শুনিলার মতন মনের অবস্থা বা সাধ সে সময়ে তার একেবারেই ছিল না।

কিন্তু থাক বা না থাক, গনটা তার কানে আসিয়া পৌঁছিল।—

“কেন রাই একলা ব’সে বয়ান ভাসে নয়ন-জলে,
কেঁদে কি পাগল হবি, শ্রাম কি লো তোর
আসবে ফিরে?”

গানটা তার পরিচিত। বিনয়ের গান গাও-য়ার যথেষ্ট সখ ছিল এবং বোধ করি, এই গোবর্দ্ধনের মুখে শুনিয়া তার অদ্বৈত সঙ্গীতের সংগ্রহ। বাগানের ঐ বাঁধাঘাটে বসিয়া কত দিনই যে সে তার এই ক্ষুদ্র সঙ্গিনীটিকে নিজের নূতন নূতন শেখা গানগুলি সাগ্রহে শুনাইয়া গিয়াছে। শুনিয়া উন্মীলা যুগ্ম তো হইয়াছেই, অধিকন্তু নিজেও যেগুলি গোপনে

গোপনে আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইয়া নিখল হওয়ায় ক্ষুদ্রও বড় কম হয় নাই। সেই গানেরই একটা আজ এমন অসময়ে অতের মুখে শুনিয়াই তার বুক যেন ফাটে ফাটে হইল। “কাঁদিয়া পাগল” হইবারই বুঝি সে আবার উপক্রম করিল। গায়কের সন্দেহের প্রতিধ্বনি করিয়া অতি নিষ্ঠুর শব্দে তাহারও অন্তরের মধ্য হইতে কে যেন প্রতিশব্দ করিতে লাগিল,—আর কি তার কাছে সে ফিরে আসিবে? কলকাতায় কত কি আছে। সে কি সেখানে থেকে উন্মিলাকে আর কখনও মনে করিবে? আবার—আবার সুদূর হইতে নৈশ-সঙ্গীতের একটুখানি শব্দ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া ভাসিয়া আসিয়া তার কানের তারে বাঁ দিল।—

“যমুনা-পুলিনে বসে, কাঁদে রাধা-বিনোদিনী,—

বিনে সেই—বিনে সেই—রাক।

শশী—বাঁকা শ্যাম।”—

এ কি! কান্নায় কি আজ সারা জগৎ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে না কি? উন্মিলার প্রাণের ক্রন্দন কি আজ সমস্ত বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শুদ্ধ মূর্ছনা তুলিতেছে? তার আসন্ন-বিরহের অপরিমিত ও অসহ্য বেদনা-জ্বালা কি আজ চির-বিরহ-বিধুরা রাধার অফুরন্ত অশ্রু-জলের মধ্য দিয়াই এমন করিয়া তাহাকেই কাঁদাইতে দেখা দিল। এ কান্নার কি তার কখন আর শেষ হইবে না? সেই ব্রজ-বিরহিণীর মতই কি চির-যুগযুগান্তর ধরিয়া চির-সাধকের সাধনার মধ্য দিয়াই অফুরন্ত এই অশ্রু-নিষ্কার অনন্তকালের জন্যই কি ঝরিতে থাকিবে? অশ্রু-সাগরের কূলকিনারা কি এই ত্রিধামা ধামিনীর মধ্য-ধামে এই নিদ্রামগ্ন বিশ্বের অনন্ত কেন্দ্রের অতল অন্ধকারে আজ চিরদিনের মতই হারাইয়া গেল? ব্রজ-বিরহিণীর মতই কি এই পরিত্যক্তা অনাদৃতা উন্মিলা সে সীমা-সন্ধিহীন বিপুল বেদনা-সমুদ্রের তীরে আর কোন দিনই পৌঁছিতে পারিবে না?—ঠিক এই কথাগুলি নাই হোক—ঠিক এই ভাবেরই একটা এলোমেলো ও খাপছাড়া রিক্ততা ও আতঙ্কে ক্ষুদ্র বক্ষকে যেন নির্দয়ভাবেই ঐ অশ্রুসজল গানের সুর দিয়া চাবুকের পর চাবুক মারিয়া গাহিয়া চলিল,—

“শুকাল কমল-মালা, বাড়িল বিরহ-জ্বালা,

কাঁদে যত ব্রজবালা, বি-নে-কাল। গুণমণি।”—

উন্মিলা মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া দমবন্ধ হইয়া হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—

তার মনে হইল, তার সঙ্গে যেন সবাই কাঁদিতেছে। ঐ পশ্চিম-দিগন্তে নব আগন্তুক কলাবশেষ ক্ষীণ দেহচন্দ্রই দেন কাঁদিয়াই অমন হইয়াছে, নক্ষত্রদেরও আর সে জ্যোতি নাই, বাতাস বিলাপের মর্ম্মরে—দেবদারু ও চাঁপা গাছের কাছে বুঝি তারই কথা বলিল? তাহারই সাড়ায় এই শোকের সভায় যোগ দিয়া যেন ভোরের পাখীরা অধীর কূজনে ডাকিয়া উঠিল। বকুলে অশোকে গলাগলি করিয়া ফুলের জলে ঝরঝর করিয়া সহানুভূতির জল ঠেলিল। তার উপর অদূর-পূর্বাকাশে উষার সিন্দূর-বিন্দুর লোহিত আভাষ ফোটো ফোটো হইতেই তাঁর বেদনাশ্রু শিলির-বিন্দুর রূপে সারা-জগতের বুকের উপরে পড়িতে লাগিল। গভীর বেদনা, বিলাপ ও দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত প্রকৃতি যেন এতটুকু একটি বালিকার সেই অব্যক্ত ও অকথ্য লজ্জামিশ্রিত শোকের উচ্ছ্বাসে পরিতপ্ত ও ব্যথিত হইয়া রহিল। কিন্তু মানুষ তার সে বুকভাঙ্গা দুঃখ চাহিয়াও দেখিল না!

তার পর অনেকখানি শান্ত হইয়া উন্মিলা উঠিয়া বসিয়া একান্তমনে হরি-স্মরণ করিতে লাগিল। ঘোড়হাত করিয়া সে বলিল, “এক্ষুনি যেন আমার কলেরা হয় ঠাকুর! হে ঠাকুর! আমি তা হ’লে তোমায় পাঁচ দিকার হরির লুট দোব। এক্ষুনি আমার কলেরা ক’রে দাও, তা হ’লে ওর কলকাতা যাওয়া বন্ধ হয়। আমি না হয় ম’রেই গেলুম, তবুও তো আমার উপর রাগ ক’রে চ’লে যেতে পারবে না। আর আমি মরবার সময় তো ওকে ব’লে যেতে পারবো যে, তুমিই আমার সঙ্গে রাগ ক’রে থাকলে ব’লে আমি হরিকে ডেকে ডেকে ইচ্ছে ক’রে ম’রে গেলুম। তা হ’লে তো সে জন্ম হবে!—ঠাকুর! ওগো ঠাকুর! তুমি তাই করা গো তাই করো।”

পূর্বাকাশে উষার খোলা কনকদ্বারের মধ্য দিয়া দিব্যোজ্জ্বল-বেশধারী ভাস্করের ভাস্বর মূর্তি দেখা দিল। তখন জগতের অন্ধকার শোকতমো কাটিয়া আলোকোদ্ভাসিত আনন্দের রূপ ব্যক্ত হইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

জগদ্ধাত্রী বাঁ-হাতে চোখের জল মুছিতেছেন, ডান হাত তাঁর ছেলের খাবারের বাস্কে তার তিন দিনের খোরাক ঠাসিতেছে; তার পাতে সন্দেশ, পানতুয়া, কচুরি, লুচির স্তূপ সাজাইয়া দিতেছে।

বামুন-মেয়ে ফৌস করিয়া নিশ্বাস ফেলিল, “জোটের পায়রা ছুটি একসঙ্গে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াতে—গো; আহা, এমন জোট-ছাড়া হয়ে ছুটিতে ছ’ জামগার কেমন করে থাকবে! তাই ভাব্‌চি গো!”

বিনয় একমুখ খাবার ঠাসিয়া ভারিগালে হাসিয়া বলিল, “বামুন-দিদি! সেখানে আমার খুব মজায় দিন কাটবে; কত কি দেখবার, শোনার, শেখবার আছে! সে কি এমন জঙ্গল! থাকবার আবার ভাবনাটা কি সেখানে?”

“হাজারও থাক্‌ ভাই! তবু ঘরের চাইতে কি আর কোথাও কিছু ভাল লাগে রে দাদা! নতুন তো ছ’ দিনেই পুরনো হয়ে উঠবে, তখন আবার দেখবে ওই পুরনো! এই জন্তেই প্রাণের মধ্যে হিঁচড় নেগেছে। এখানে যে বৌদিগিরি রাজা মুখটুকু বঁধা রইলো, সেটি তো আর ওখানে পাচ্ছে না।”

বিনয় এতবড় দার্শনিক রসিকতাটাকে ফুলান ঠোটের সাব্যস্ত অহঙ্কারে উড়াইয়া দিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, “রাজা মুখ না কালা-মুখ।”

“ঘাট্‌ ঘাট্‌! এমন কথা ঠাট্টার ছলেও মুখে এনো না দাদা! আহা, আমার সোনামুখী মেয়ে!”

আড়ালে দাঁড়াইয়া উর্মিলার বক্ষ দীর্ঘশ্বাসের ভারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

সে দিন শেষ-মুহুর্তেও উর্মিলা আশা করিতেছিল, শেষ-মুহুর্তেও হয় তো বিনয় তাহাকে কাছে ডাকিয়া বিদায় লইবে।

কতবার নিজেরই সে তার কাছে গিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে মনে মনে প্রস্তুত হইল, কিন্তু কিছুতেই কি পারা গেল না।—

কিন্তু তাহা ঘটিল না। উর্মিলার বিষম লজ্জার বেদনাকে প্রচণ্ড গর্কে ভুল করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিক গুপ্ত-চরের কার্যের সহিত তুল্য-মূল্য করিয়া তুলিয়া বিনয়কুমার জীর নিকটে নিষ্ঠুর নিঃশব্দ বিদায় গ্রহণ করিল।

বিনয় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়াছে, চারি দিন পরে কলেজ খুলিবে, এই কয় দিনের জন্ত সে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী সে আসিয়াছে বটে; তথাপি এ কয় দিনে কলিকাতা-ফেরৎ বিনয় এমনি গণ্যমান্ত হইয়া আসিয়াছিল যে, সমস্ত পাড়া ঘুরিতেই তার দিন কাটিয়া যায়। নূতন গান সে থিয়েটার-বাড়ী হইতে

শিখিয়া আসিয়াছে, উর্মিলাকে শোনাইবার জন্ত প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম, অথচ বাড়ীতে গাহিলে পাছে বিপিনবাবু শুনিতে পান, সেই ভয়ে গাহিবারও উপায় নাই, অগত্যা কালুদের বাড়ী গিয়াই গাহিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে পুনর্বিদায়ের দিনও দেখা দিল।

জনে জনে বিদায় লইয়াও হঠাৎ যেন কতই প্রয়োজনীয় কি একটা মন্ত কথাই মনে পড়িয়া যাওয়ায় বিনয়কুমার আবার একবার ছুটিয়া আসিয়া নিজের ঘরটার ঢুকিয়া পড়িল। তারও যে এই যাত্রা-কালটার সহিতে পরা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। উর্মিলা! উর্মিলা! এখনও তোমার অভায় ও অসঙ্গত রাগ পড়িল না! ক্ষমা চাহিলে না! আচ্ছা, জব্ব হও তুমি, বিনয় কখন আর এ জন্মে তোমায় ক্ষমা করিবে মনে করিয়াছ? অসম্ভব! অসম্ভব!

এ কি রে বাবা!—সে প্রায় নাচিয়া লাকাইয়া উঠিল। তার টেবিলের উপর প্রায় সাইন-বোর্ডেরই লেখার সাইজের অক্ষরে পুরা একখানা ফুলস্কেপ কাগজে গোটাকতক কি যেন লেখা পড়িয়া রহিয়াছিল। তাই দেখিয়া দৌড়িয়া সেখান। বিনয় গিয়া একরকম যেন ছোঁ মারিয়াই তুলিয়া লইল। তাহাতে শুধু এই কয়টা কথা লাল-কালিতে জল্-জল্ করিতেছে, “আমি ঘোর অভায় করেছি। আর কখন এমন কাজ করবো না। এবার করলে আমার তুমি তক্ষুনি দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিও। এবারকার মতন আমার ক্ষমা করো।—উর্মিলা”

বিনয়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন আফ্লাদে দোল খাইয়া উঠিল। তার মনে হইয়া গেল, সে যেন ধর্ম্মাসনে আসীন মুকুটধারী কোন রাজা আর এই উর্মিলা তাহার বিচার-সভায় আনীতা অনুতাপিতা অপরাধিনী। করযোড়ে সে নিজ হৃৎতির জন্ত ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিতেছে। এ কালের সঙ্কীর্ণ মত তখনও সে উত্তমরূপে শিক্ষা করে নাই। তাই দোষ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হইলেও যে ফাঁসী দেওয়া রদ্‌ হয় না—তেমনতর অনুদারতা তাহার জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ থোম্-মেজাজে সেইটার উণ্টা-পিঠে উহারই অনুকরণ করিয়া লিখিল—

“এবারকার মতন ক্ষমা করিলাম। আর কখন এমন কাজ করিলে তোমার প্রস্তাবমত কার্য

করা যাইবে।” অত্যন্ত লঘুচিত্ত এবং তেমনি লঘুতর ও দ্রুতগতি হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া তাঁর গলাটা হৃদাতে জড়াইয়া ধরিল, “থেকে যাই, কি বলো মা! কলকাতার আর যায় না।”

মা চোখ মুছিতেছিলেন, আবার সেই রাগা ছোঁচোখ ভলে ভরিয়া উঠিল। “তখনই তো বারগ করেছিলুম বাছা, কেন অমন বিদ্যুটে সখ করলি! তা না হয়—কর্তার কাছে একবার ব’লে দেখ না।”

বিনয় কানে হাত দিয়া লাফাইয়া উঠিল, “ওরে বাবা! তা হ’লে আর রক্ষা আছে!—তক্ষুনি

গলা-ধাক্কা!—দেখ মা! এ বেলা আর যাবো না, ভারী মাথা ঘুরচে, জর হবে না কি! ভাল থাকলে ও বেলা তখন যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি কিছু বাবাকে বলো। বলবে তো? আচ্ছা!”

ক্ষণপরে শীলেন্দের বাগান-বাড়ীর বাধাঘাট বিনয় শীলের তরুণ-কণ্ঠের স্বভাব-মধুর সঙ্গীত-লহরের আর উজ্জ্বল প্রশংসাসূচক মিষ্ট-হাস্তের তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া রহিল। তাঁদের সেই অনেক দুঃখের পরের পাওয়া সুখের মিলন দেখিয়া পাখীরা আনন্দের গান গাহিতে লাগিল, বাতাস সুখের স্রবর তুলিল, ফুলেরা সুরভিখাস ছাড়িল।

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক জন বিশিষ্ট রাজ-আত্মীর ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে দেশে দেশে সমারোহ চলিতেছিল ; তাহারই একটা বড় রকমের ঢেউ আসিয়া পড়িয়াছিল ভূতপূর্ব ভারত-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপরে। সহরে পত্রপত্রীর পুষ্পমালা, রক্তনিশানে স্ততিবাক্য, উজ্জ্বল আলোকমালায় সম্ভ্রিত ভক্তি-অর্থ—কোন কিছুই অভাব ছিল না। ঘরের দৈন্য এবং অন্তরের বিষাদ-ব্যথা আলোক-লহরী নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সারা সহর একটা আলোকোৎসবময় নাট্যশালায় পরিণত হইয়াছে।

এই রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য কলিকাতার কোন বড় রাস্তার উপরকার একটা বড় বাড়ীতে এক ধনাঢ্য গৃহস্থামীর পরিচিত জনকয়েক আত্মীয়-বন্ধুর নিমন্ত্রণ বাটয়াছিল। নিমন্ত্রিতগণ নির্দিষ্ট সময়ের একটু সামান্য পূর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গৃহস্থামী তাঁহাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। রাস্তার ধারের চওড়া বারান্দায় সারি সারি কেদারা পাতা, দেবদারু মালা ও গাঁদাফুলের স্তবক-ঝুলান থিলানের ভিতরদিকে যে সকল পাতলা নেটের পর্দা একটুখানি করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার দুই ধার রেণমী-ফিতার বেশ শোভন করিয়া বাঁধা; মধ্যে মধ্যে ছুঁতিনটা মার্বেল ত্রিপদীতে রোপ্য-আধারে ফুটন্ত গোলাপের তোড়া, তাহারই এক ধারে কটকী রূপার থালায় সুগন্ধি সিগারেট ও সিগার, ঐ দেশজ স্বর্ণমণ্ডিত উত্তম কারু-কার্যবৃত্ত ডিবা ও রেকাবে সোনালি পাতজড়ান পান, দেশী এবং বিদেশী কায়দার আতিথ্য-পালনসম্বন্ধীয় সকল জিনিসই প্রস্তুত রহিয়াছে। অতিথিবর্গ আসন গ্রহণ করিবামাত্র বিলাতী-ধরণে গরম চায়ের সহিত রসনা-রস-সঞ্চারী কেক-বিস্কুটেরও আমদানী হইতে বাকী থাকিল না।

অভ্যাগতদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ডু বেলী নয়; মাত্র জন পাঁচ-ছয়। নামজাদা প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিঃ করের তরুণী পুঁহিনী মিসেস্ কর সিঁড়ি উঠিবার সময় একবার এবং বারান্দায় পৌঁছিয়া

আর একবার আশে-পাশে চাহিতে চাহিতে আত্মগতই প্রশ্ন করিলেন—“কই বেবি’কে দেখ্‌ছিনে যে!”—পরক্ষণেই তন্মূহর্ত্তে সম্মুখে আগতা দ্বিতীয়া মহিলাটিকে (তিনি পাটনা হাইকোর্টের নূতন জজ মিঃ নিয়োগীর স্ত্রী মিসেস্ নিয়োগী) সন্মোদন করিয়া সাগ্রহ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “এ কি রকমটা হলো! মিঃ লাহার বাড়ী নেমন্তন্ন, আর বেবিই আসে নি?”

সম্বোধিতা মিসেস্ করের এই বিস্ময়-বিপন্নতা লক্ষ্যে ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, “এখনও যথেষ্ট সময় আছে, এলা! এর মধ্যেই তুমি হাল ছাড়্‌চো কেন?”

হুজনেই মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল; ঠিক পার্শ্বেই দণ্ডায়মান তৃতীয় ব্যক্তিটির কর্ণও ইহাদের আলোচনা হইতে বিরত ছিল না, ইহাদের হাসির আভাস তাঁহার মুখকেও একটুখানি রঞ্জিত করিয়া তুলিতে ছাড়িল না।

রাস্তার দু’ধারি বন্দুকধারী সিপাই ঠিক এক হাত অন্তর সারি দিয়া চিত্রাপিতব্য দাঁড়াইয়া আছে। তা’ ছাড়া গুপ্ত পুলিশের যে কত জন লোকই বিভিন্ন সাদা পোষাকে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, তার হিসাব পুলিশের বড় কর্তারা ভিন্ন আর কেই বা জানে? তাঁদের সে দিন বোধ করি মরিবার মতনও ‘ফুরসৎ’ ছিল না, দ্রুত-গরি-চালিত মোটরে সমুদয় রাস্তাটার আপ্রান্ত না হইবে তো অন্ততঃ এক শতবারও তাঁহারা পরি-ক্রমণ করিয়া অটুট শান্তিরক্ষার একান্ত অশান্তিতে নিজেকে অস্থির ও অজ্ঞকেও বিরত করিয়া তুলিতেছিলেন, গাড়ী-ঘোড়া লোক-চলাচল বন্ধ হইবার সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল। রাস্তার দু’ধারের ছাদ ও বারান্দা লোকের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, যে দিকে চোখ ফিরাও, কেবল নর-মুণ্ডেরই লহরী।

মিসেস্ করের চঞ্চল দৃষ্টি পুনাপুনই দৃষ্টমান রাজপথটার এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতেছিল; এইবার আরও একবার সে নিজের মনের উদ্বেগ-কৌতুহল প্রকাশ করিয়া ফেলিল—“বেবি তা হ’লে আর এলো না। বলি, তার আজকে আবার হলো কি? অ্যা! কত দিন

ধরে এই সব যোগাড়-যন্ত্র সেই তো করে রেখে গ্যাছে!”—

আর একটি কম-বয়সের মেয়ে ইহার ঠিক পাশেই আসন লইয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, “বেবি, কার বেবি, এলাদি? তোমার বেবিকে বুঝি নিয়ে আসতে বলে এসেছিলে?”

এই কথায় ছুঁচারি জন শ্রোত্রী কলঝঙ্কার হাসিয়া উঠিলেন, শ্রোতাদের অধরপ্রান্তও ঈষৎ হাস্যকুঞ্চিত হইল, তবে ভদ্রতার খাতিরে হাসি তাঁদের ঠোঁটের বাহিরে আসিতে পাইল না, এলা লজ্জাবিপন্নতার জ্ব কুঞ্চিত করিয়া মুহু তিরস্কারে কহিয়া উঠিল, “আহা ম’রে যাই! আমার ‘বেবি’ কেন হ’তে গেল! মিস্ মল্লিককে সবাই ‘বেবি’ বলে ডাকে না?”

এলার প্রবাস-প্রত্যাগতা বন্ধুটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর করিল—“তা কেমন করে জানবো ভাই! তিনি আবার কে?”

এলা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল—“আহা, মিঃ লাহার বাড়ী নেমস্তন্ন এসেছেন, আর ‘বেবি’কে চেনেন না! ডাক্তার মল্লিকের মেয়ে কৃষ্ণা মল্লিক গো, চেনো না নাকি?”

“ওঃ, তাই বলা, কৃষ্ণা মল্লিক। সেই যে খুব উৎকৃষ্ট পিয়ানো বাজাতে পারে তো? ক’বছরই উপর উপর লরেটোর মিউজিকের পরীক্ষায় ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল না? সেবারে তখনকার প্রিন্স এখানে আসতে সেই যে ছোট মেয়েদের দিয়ে ‘প্লে’টা করান হয়েছিল; তাইতে অফিলিয়া সঙ্গে কি সুন্দর অভিনয়ই যে করেছিল! সে যেন আমার আজও চক্ষের ওপর ভাসছে। মা গো, মরণটা অবধি যেন আশ্চর্য্য সুন্দর!—করেছিল অতটুকু মেয়ে।...” এই বলিয়া সমুজ্জল পূর্বস্মৃতিকে আর একবার স্মৃতিপথে আনিয়া উৎফুল্ল-মুখে মেয়েটি এবার সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, “তা কৃষ্ণা—মিস্ মল্লিক আসবেন তো? একবার দেখাও হয়ে যাবে তা হ’লে! ও কিন্তু আমাদের চেয়ে কিছু ছোটই হবে। আমার তো ছ-ক্রাস নীচেই পড়তো তখন। দেখতেও অনেকটা ছোট ছিল। পাতলা একহারা গড়ন, টকটকে কাঁচা সোনার মতন গায়ের রং, একপিঠ কৌকড়ান চুলে প্রায়ই একটা সাদা না হয় খুব হালকা রংয়ের ফিতে বাঁধা, সাদা ভিন্ন কোন রংয়ের ফ্রক পরতে কক্ষনো দেখিইনি, আর তাতেই যেন তাকে পরীটির মতন দেখাত। মেমগুলো তো ওকে আদর করে করে

অস্থির করে দিত। রূপটাও খুব বেশী ছিল, আবার তার সঙ্গে গলাও ছিল কি তেমনি চমৎকার! ওকে বুঝি বাড়ীতে ‘বেবি’ বলে ডাকে? সে আমি জানতুম না, আস্চে না কেন? আস্বে তো? আচ্ছা, কি যে বলছিলে, ওই যে মিঃ লাহার বাড়ী এসে ‘বেবি’কে না জানাটা কি নাকি একটা বোর অপরাধের সামিল না কি?”

“নিশ্চয়।”

মেয়েটির নাম মুরজা, মুরজা কিছু সরলা অর্থাৎ বোকা,—সে বিস্মিত হইয়া কহিল—“তার মানে?”

এলা হাসিয়া ফেলিল, “তার মানে কিছুই না, আবার সবই, অর্থাৎ কি না—”

পাশের ঘরে বুট-জুতার খটখট শব্দ ক্ষণে ধ্বনিত হইল, এক মুহূর্ত্ত পরে গৃহস্বামী মিঃ লাহা ঘরের পরদা সরাইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন।

“আপনাদের সব অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রাখতে জোর ক’রেই বাধ্য হয়ে পড়েছিলুম—মাপ করবেন, মিসেস্ নিরোগী!—মাপ করবেন মিঃ ব্যানার্জী! মিঃ ঘোষ! আপনাদের সবাইকার কাছেই হাত ধোড় করছি,—কটা দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, অথচ কাজ এখানেও ছুটে তাড়া করে এসেছে। করি কি বলুন?—ওঃ, এই যে মিসেস্ আতর্ষি! আপনিও অল্পগ্রহ করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তোমায় এতক্ষণ চিন্তেই পারি নি যে, কে,—সতীশ? মুরজা! এই যে তুমি। আগ্রা থেকে কবে এসে পৌঁছিলে? কৈ মিঃ চৌধুরীকে দেখেচিনে যে?—ওঃ, তিনি ছুটি পাননি! তুমি একাই এসেছ? যাই হোক, অনেক দিন পরে দেখাটা তো হয়ে গেল! তুমি আমার নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছ, এতে কত যে আনন্দ হলো, বলতে পারিনে।”

মিঃ লাহা যতক্ষণ ভদ্রতার আদান-প্রদান করিতেছিলেন, কাহারও সহিত কর্মদ্দন, কাহাকেও নমস্কার, কাহারও প্রতি শুদ্ধমাত্র একটুখানি টানিয়া-আনা, ভদ্রতার হাসি ইত্যাদি যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়নের মধ্যেও সকল সময়েই তাঁহার উদ্গ্রীব ও চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে অব্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। গহন বনে হারাইয়া যাওয়া রত্নের মতই তাঁহার সেই হারান ধন কিন্তু খুঁজিয়া মিলিল না। আগ্রহ ও আবেগে আরক্ত ও উৎফুল্ল মুখের ছবি তাহার সমস্ত উজ্জলতা হারাইয়া অকস্মাৎ শ্লান ও গভীর হইয়া উঠিল। সমাগত সম্মানিত বন্ধুবর্গের প্রতি নিতান্ত অস্বস্তি

না দেখাইতে পারিলেও, তাঁরা যে ইহার নিকট একান্তই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছেন, সেটা বেশ বুঝা গেল।

রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, ঠিক এমনি সময়ে একটা দ্রুতগামী মোটরের বাণী বিপুল শব্দে বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে সেই কালো রংয়ের প্রকাণ্ড “মিনার্ভা” গাড়ীখানাকেও দেখা গেল। গাড়ীটা চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে লাহা-প্রাসাদের সম্মুখীন হইয়া ধামিবার উদ্দেশ্যে করিল, এবং ততক্ষণে মিঃ লাহা ছুটাছুটি নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার লোকেরা, কি মেয়ে—কি পুরুষ—একটু ব্যগ্র কৌতুহলের সহিত লোহার রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই নব আগন্তুকদের দেখিতে লাগিলেন। যারা কিছু দূরে ছিলেন, আগ্রহ-দমনে অপূরণ হইয়া উঠিয়া আসিলেন। কেহ কেহ অকস্মিকভাবে পার্শ্ববর্তীকে গুনাইয়া অথবা নিজেকেই গুনাইতে চাহিয়া মগ্ণ্য করিল, “নিশ্চই ‘তাঁরা’।—”

পুরুষ-দলের মধ্যে মুরজার মতন আর কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন, “কারা হে?”

“কেন, মিষ্টার আর মিস্ মল্লিক, তা ছাড়া আবার কে হবে?”

লোকটি একটু অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিষ্টার আর মিস্ মল্লিক ওর কে হন?”

ভদ্রলোকটি একটুখানি মুচ্কি হাসি হাসিয়া সংক্ষেপে জবাব দিলেন, “হন না—হবেক ‘কেউ’ শীঘ্রই।”

“ওঃ, মিস্ মল্লিকের সঙ্গেই বুঝি তরুণের বিয়ে হবে?”

“সেই রকমই তো উভয় পক্ষের চেষ্টা—আজ ক’বছর ধ’রেই চ’লে আসছে—”

“এত দিন তবে হয় নি কেন?”

ভদ্রলোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সমধিক যত্ন-কণ্ঠে কহিল, “বাঃ! হবে কেমন ক’রে? সে শুড়ে যে বালি! তরুণ ছেলেটি তো আর জাত-সাহেব নয়, ও যে স্বকৃত-ভঙ্গ!”

“সে কি রকম?”

“বাপ ওর হিন্দু-সমাজের লোক। বিয়ে হয়ে-ছিল ওর ঠিক সত্তর বছর বয়সে এক এগার বছরের মেয়ের সঙ্গে। তার পর বয়স হ’তে না হ’তে তরুণ হঠাৎ সাঁহেব হ’ল, বাপকে গিয়ে বললে, সে বিলাত যাবে। বিস্তর কান্না-কাটনা, রাগ-দুঃখ, শেষে প্রাচীনের পরাভব। তরুণচন্দ্র

বছর কতক পরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি, সি, ল’হা হয়ে ফিরে এলেন।”

শ্রোতা কিছু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, “আর বউটার?”

“বউটা তার খণ্ডরের বাড়ী রৈল। যুগীরোগী আধ-পাগলা মেয়েটা তরুণ চ’লে যাবার পর থেকেই প্রায় অন্ন-জল ভাগ ক’রে প’ড়ে থাকতো, মাথা আরও খারাপ হয়ে গেছলো। তরুণ যখন ফিরে এলো, তখন সে “আন্ডার সেনটেন্স অফ্ ডেথ্”, “অর্থাৎ?” [মৃত্যুদণ্ডের অধীনে।]

“তার দুর্বল শরীরে মনের অত্যন্ত আঘাতের ফলকে ডাক্তার কন্‌জমসন্ ব’লেই স্থির ক’রে দিয়ে-ছিল। দিনে দিনে ক্ষয় হ’তে হ’তে সে তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দোরের কাছেই ব’সে ছিল। শুনেছি, সে দৃশ্য সহিতে পারবে না ব’লে—তরুণ তাকে একবার চোখের দেখা দেখতেও যায় নি। বাপের সঙ্গে দেখা ক’রেই চাকরী-স্থানে চ’লে গেছলো। বাড়ীর লোকেও ভয়ে বউকে কিছুই বলে নি; কিন্তু তবু সে না কি ওর পায়ের শব্দ দূর থেকে শুনে চিন্তে পেরেছিল, ও তাই নিশ্চই মহা হাঙ্গাম করেছিল। সে যাক্, এ বিয়ে তারই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় এখনও হ’তে বাকী আছে। বিশ্বস্ত-স্বত্রে শোনা গেছে, বিলাত যাবার আগে থেকেই না কি এদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে; মেয়েটি তখন অবশ্য কনভেন্টের ছাত্রী; আর ছেলেমানুষও ছিল। বাপের টাকা ও ছেলের বিত্তাবুদ্ধি দেখে বাপ তখনই মতলবে প’ড়ে—ওকে ভজন-সজ্জন দিয়ে বিলাত পাঠায়,—তখন অবশ্য জানতো না যে, ও বিবাহিত।”

“তরুণ কিছু বলে নি?”

“না।”

“তার পর কি ক’রে জানলে?”

“তরুণের ফিরতে কিছু দেরী হয়, সেখানে ক’বছর চাকরী করে—তার পর কাজে পাকা হয়ে না ও এলো, ফিরে এসেই সঃ ফাঁস্ হ’ল। মেয়ে তত দিনে ডাগ হয়েছিল, বিয়ের কথা উঠতেই ও বললে, আরও কিছু দিন যাক্। মল্লিক তাঁতে আপত্তি তুললে। তখন-আধমরা জ্বীটার খবর দিতেই হ’ল এবং প্রথম একটুখানি মন-কষা-কষির পর অগত্যাই সেটাকে মরতে সম্মত দিতে হ’ল। শুনেছি, মল্লিকের মেয়ে নাকি এক দিন অনেক জেদাজেদি ক’রে জ্বীটাকে দেখতেও পাঠিয়েছিল।”

“তা মেয়েটা তো তা হ’লে ভাল বলতে হবে?”

“ওঃ, ও-সব ডাইনীর মায়া হে! মনে মনে মতলব বোধ হয় যে, মরতে কত দেবী, সেইটাই যাচা।”

“বউটা কি করলে?”

“ঠিক জানিনে। তবে শুনেচি, সেই দিন থেকেই তার রোগ খুব বেড়ে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, সে এখন মরণাপন্ন।—এর উদ্দেশ্য হয় তো মন্দ না-ও থাকতে পারে; কিন্তু ফলটা হ’ল ওরই সপক্ষে। কারণ, ডাক্তারে বলচে—হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনার জন্ত অতিশয় দুর্বল লাগে—”

“—ওরা বোধ হয় আসচে।—”

মোটর থামিতেই একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে নামিয়া পড়িল এবং তাহার প্রসারিত কোমল হস্তের অবলম্বনে যিনি কষ্টে নামিয়া আসিলেন, তিনি এক জন পলিত-কেশ বৃদ্ধ। প্রথম-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বয়সের চেয়ে জরা তাঁহাকে অনেক বেশী প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে এবং তিনি অন্ধ।

“আমুন, আমুন—মিঃ মল্লিক! ওঃ, আমার কি সৌভাগ্য যে, আপনিও আজ এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন!—এত দেবী ক’রে আসতে হয়!”

মিঃ লাহা প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই নিজের সর্বক্ষণ প্রতীক্ষিত অতিথির সহিত উল্লিখিত সন্তাষণ করিলেন। শেষ-কথাটা অবশ্য একটু নিম্নস্বরে অপরাধ প্রতিই প্রযুক্ত হইল, বৃদ্ধকে নহে। মিঃ লাহার সুন্দরী অতিথি তাঁহার ঔৎসুক্য-চঞ্চল ও আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে একটা চকিত কটাক্ষ করিয়াই ঈষৎ গভীর ও বিষন্ন হইয়া গিয়া অরিত-কণ্ঠে উত্তর দিল—“বড্ড দেবী হয়ে গেল, মাপ করবেন। আচ্ছা, আপনি বাবাকে নিয়ে উপরে যান,—আমি একনি যাচ্ছি।”—এই বলিয়া সে গাড়ীর সোফারকে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ইসারায় ডাকিল।

মিঃ লাহা এই সংক্ষিপ্ত ক্ষমা-প্রার্থনা ও কৈফিয়তে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; মল্লিকের সান্নিধ্য হইতে একটুখানি সরিয়া আসিয়া মুহুম্মদ স্বরে তিনি ক্ষমা-প্রার্থনাকারীকে অনুযোগের সহিত কহিলেন—“আমায় তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে, তার শাস্তি নিতে হবে, অমনি ছেড়ে দেবো না, এমনি মনে হচ্ছিল, কার জন্ত এ সব বল তো?”

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া চাহিল। তখন

মে (ক)—৪

তাহার মুখের ঈষৎ বিরণ গানিমা ভেদ করিয়া ভোরের পাণ্ডতার উপর সূর্যালোকের মতই প্রসন্নমিত হাস্তের আগোকদীপ্তি বলমল করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখকে যেন সুন্দরতর দেখাইতেছিল। সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল দীর্ঘ পশ্বে ঘেরা দুটি চোখে বিপুল কৃতজ্ঞে আনন্দ ভরিয়া সেই যে সে বারেক চাহিয়া দেখিল, সেই-টুকুতেই যেন ইহার সমস্ত হৃদয়-প্রাণ একেবারে তারে তারে বাজিয়া বঙ্কার দিয়া উঠিল। সমুদয় অন্তর বাহির যেন সেইটুকু হাসি-চাহনিতেই একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া কানায় কানায় উপছিয়া পড়িতে গেল। স্থানকাল সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়া তিনি মিস্ মল্লিকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার অর্দ্ধ-অনার্যত শুষ্ক-শুভ্র মুণাল বাহমূলে একটা অতি মৃদু সোহাগের টিপুনি দিয়া আদরে-গলানো মৃদু স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “আবার দুটো মি ক’রে হাসি হচ্ছে!”

বারান্দার উপরে যে শত চক্ষু অদম্য কোঁকল চাহিয়াছিল, সেই দিকে বারেক চোখ তুলিয়াই কৃষ্ণা উহাকে সলজ্জ শাসনে অমুচ্চকণ্ঠে সাবধান করিয়া দিল—“ওঃ—ডোন্ট মেক ইউ ফুল! কত লোক চেয়ে আছে দেখ দেখি!”

মিঃ লাহা দিব্য সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া প্রকল্প-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমাদের ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত কার? যদি কার থাকে, সে-ও আজ ভাল ক’রে জানুক, তাতে আমার লাভ বৈ লোকসান নেই।”

মুখের ফুলধনু তুল্য অয়ুগলে গুণ চড়াইয়া বক্র-কটাক্ষে চাহিয়া সে কলঝঙ্কারে ধমক দিয়া উঠিল, “যান, যান, অত আর কৃষ্ণ বলতে হবে না!”

তার পর ডাইভারটিকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে লাগিল। ততক্ষণে গৃহস্থামী তাঁহার গৃহ-গত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির পরিচর্যা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজ-অভ্যাগতের শোভাযাত্রা রাজোচিত ধুমধামের সঙ্গেই বাহির হইয়াছিল। সর্বপ্রথম বিশালকার, ভীমকান্তি, দেশবাসীর ভীতিদায়ক কলের কামানের সারি, তার পর অখারোহী ও তৎপরে পদাতিক অস্ত্রধারী গোরা-সৈন্তের শ্রেণী,

স্বাক্ষরিত তাহাদের মাথার মুকুট-প্রতিমা খাতুময় শিরদ্বাণ ও হস্তধৃত মুক্ত কিরীচ শত সূর্য্য-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া অলিতেছে, তাহাদের দর্পিত গতি, নির্ভীক ও নিশ্চয় দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের বক্ষে কি যেন এক অজ্ঞাত শঙ্কায় একটা শিহরণ স্বতঃই আনিয়া দিয়া যাইতেছিল। শত শত রাজকুমারবৃন্দের বড় বড় রাজকর্মচারীগণের বহুতর শরীর-রক্ষীর মধ্যগত হইয়া রাজাত্মীয়ের ধান দেখা গেল, হিন্দুর দেব-প্রতিমার মতই তাহা নীরব নিশ্চল; চারি দিকের স্থখে-স্থখে নির্বিকার উদাসীন,—উচ্চনাদে জয়ধ্বনি উঠিয়া বাতাসধ্বনি টাকিয়া দিল। মহরগতি চলন্ত ট্রেনের মতই শৌভীষাণী নিজের গতিপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে চলিয়া গেল।

আড়ালে বসিয়া “রাজা-উজীর-মারা” চিরন্তন রীতি; এই সম্মতন-প্রথার ব্যতিক্রম কেহই আশা করিতে পারে না।—তার পর আর একটা কাজের কথা উঠিল।

“তোমার দরবার দেখতে যাবার কি হলো?”

এলা মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, “বলো কেন? পরশু যাবার দিন, এখন পর্য্যন্ত এই নিয়ে তর্ক করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। আমার মামাতো-দেওর সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরে আমাদের ওখানে এসে উঠেছে না? সে এই শুনে পর্য্যন্ত একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে। বলে, ‘কর্মীদের না হয় চাকরীর খাতিরে যেতে হয় হলেও কিছু তোমরা কেন অনর্থক ওই সব বড় বড় সভা-সমিতিতে অনর্থক ফ্যানসান কিন্তে চাল খারাপ করতে যাও? এই সব রাজা-রানী লাটি-দরবারে মেশা-মিশি করে শুধু মেজাজগুলো বড় হয়ে ওঠে; থরচের অন্ত থাকে না এবং তোমাদের দেখে সমস্ত সমাজে বিলাসিতার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব জন্তে এখন ধনীর ধন দেশ-হিতকর কোন কাজেই লাগতে পার না।”

কৃষ্ণা বলিল, “তার মতে কি দেশ-হিতের জন্ত সর্বস্ব খয়রাৎ করে দিয়ে, দেশশুদ্ধ লোক ফকিরী নেবে? যার আছে, সে কেন ভোগ করবে না? মেয়েরাই বা কেন চিরদিন ধরে কূপ-মণ্ডুক হয়ে থাকতে যাবে? এ সব ওদের বাড়াবাড়ি।”

এলা কহিল, “বাড়াবাড়ি না বাড়াবাড়ি। একেও কি কম বলচে। বলে, যারা আমাদের জাতকে জাতশুদ্ধ তুলে গাল দিতে ছাড়ে না; যাদের কাছে দেশের সর্বপ্রথম-শ্রেণীর বিদ্বান,

বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, মানী ও ধনী ব্যক্তিদেরও সমস্ত সম্মান—তাদের দেশের অতি সাধারণ শ্রেণীর এক জন সাধারণ কর্মচারীর দ্বারাও ধূলিসাৎ হয়ে যেতে বাধে না; এবং তার ভাববিচার না হয়ে অন্তর্য্য অবিচারই হয়, তাদের দরবারে যে আমাদের কতটা মান, সে যে এক জন শিশুতেও বুঝতে পারে! এই যে জাতের গায়ে জুতোর ঠোঁকর মেরে তোমায় বা আমায় একটু আপ্যায়ন করা, এতে কি স্পষ্টই বলা হয় না যে, ‘তোমার সাত-গাঙ্গী সব পাজি; তবে তুমি? তা যখন আমার সেবা করতে ইচ্ছুক, তখন কতক ‘ভদ্র-লোক,’ এমন বিধিয়ে বিধিয়ে বলবে, তুই যাবি বোধ হয়?”

কৃষ্ণা কিছু উত্তর হইয়া কহিল, “হ্যাঁ তাই, আমি যাবো। আমার গায়ে লতমোসিয়া; নিজস্বের হাওয়া লাগে নি তো! ভগবান্ যাদের ছোট-বড় করে তৈরী করেছেন, তারা সবাই ঠিক এক হবে কেমন করে? ভুল বিশ্বাস! আমি বলে এরই জন্তে সাতশো টাকা দিয়ে একটা নতুন বেনারসীর সূটই করালুম! আর ওই মুক্তটাও এই জন্ত কেনা।”

এলা নিজের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া ব্যগ্র হইয়া কৃষ্ণার কণ্ঠশোভিত মুক্তামালাটি পরীক্ষা করিতে লাগিয়া গেল।—“তারি চরৎকার তোকে মানিয়েছে তাই! তাই বা কি বলবো, তুই যা পরিস, তাতেই মনে হয়, অমন সুন্দর বুঝি আর কিছুতেই দেখাত না! তোর দেখে দেখে অমন কত জ্যাকেট, শাড়ী, গহনা আমরা তৈরী করিয়ে শেষে পরতে গিয়ে হেসে মরি। আমাদের গায়ে তেমন করে মানাবে কেন? আচ্ছা, সে দিন তাই তুই যে আসমানী রংয়ের শাড়ী আর ব্লাউজটা পরেছিলি, সেই যে খুব হাস্য কলিাপত্যর কাজকরা, সেটা তাই কোথায় তৈরী করিয়েছিস বল তো? চুনির ব্রেসলেটটাও তোর খুব সুন্দর হয়েছে! কত পড়লো বল তো?”

“সে তাই বেনারস থেকে বাবা আনিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই চুড়িটা, ওটা—ওটা—”

“বুঝেছি গো, বুঝেছি! ওটা তোমার এক জনের ‘প্রেজেন্ট’ করা! তা সেটা স্পষ্ট করে বললেই তো হয়, আমার কাছে আবার অত লুকোচুরি কেন শুনি?”

শরৎকালের রজত-শুভ্র মেঘের কুঞ্জ যেমন অন্ত-স্বর্গের রক্তালোকে রঞ্জিত হইয়া উঠে, সখীর

পরিহাসে কৃষ্ণার গুত্র-মুখ তেমনি লোহিতাভা ধারণ করিল, “না ভাই, ওরকম ক’রে বল্ছিন্ কেন? এবারকার জন্মদিনে তোরাই কি আমায় ‘প্রেজেন্ট’ করিদ্ নি? উনি দিলেই বুঝি যত না দোষ হয়? যাঃ! আবার হাস্ছিন্! যাঃ ভাই! তোর অত হাসি আমার ভাল লাগে না!”

এলা হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা, তুই রাগ কর্ছিন্ কেন বল্ তো বেবি? বেশ তো করেছেন, দিয়েছেন তার হয়েছে কি? হ্যা ভাই! লাহাদের শুনেছি নাকি কতকাল পূর্বের একটা মুক্তামালা আছে, এখন নাকি সেটার দাম ছ’তিন লাখ টাকাও উঠতে পারে, সত্যি?”

কৃষ্ণা আরক্তমুখে উত্তর দিল, “কি জানি ভাই, শুনেছি তো ভাই।”

“তোর খুব আনন্দ হচ্ছে বোধ হয়! এক দিন তো সব তোরই হবে!”

কৃষ্ণার মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল, “যাঃ!—তা’ সে ভাই যখন হবে তখন হবে, এখন তার কি! তবে উনি আমাদের সঙ্গে খুবই বন্ধুর মত ব্যবহার ক’রে থাকেন; কিছুতেই তাই না বলতে পারিনে! বললেও এত হুঃখিত হন, সে কি বলবো। এই দেখ না, দরবার দেখবার ইচ্ছে জানিয়েছিলুম, একেবারে সব ঠিকঠাক ক’রে ফেলেচেন; বল্চেন, ওঁর সঙ্গে যেতে হবে,—”

“তা কি এমন অজায় করেছি, বলুন তো মিসেস্ কর! আমাদের দেশেও যে ইউরোপী-য়ানদেরও লজ্জা দেবার মত সৌন্দর্য থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে এক আঁচটা অভিজ্ঞতা কি ওঁদেরও পাওয়া উচিত নয়? বগি-মাণিক্য সবই যদি আমাদের লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাকে, তা হ’লে অগত্যই ওঁদের ধারণা না জন্মাবে কেন যে, এটা শুধু—”

এলা হাসিয়া কেলিল, “কয়লারই খনি,—কেন না? শোন বেবি! শোন! মাই ফ্রেণ্ড! লজ্জা পাবার কিছু নেই, উচিত কথাই তো বল্ছেন! সত্যি আমাদের মত রূপ নিয়ে মেম-সাহেবদের মহলে গিয়ে দাঁড়ান শুধু দেশকে কল্যাণদ কর। তা সত্যি, বেবির মত রূপই রাজ-রাজড়ার দেখবার যোগ্য!—”

“যাঃ! তুইও আবার তেমনি। ওঁড়ির সাক্ষী পাতাল! রাজা-রাজড়াদের তো আমাদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখবার জন্তে যুম হচ্ছে না!”

“আহা, বড় হুঃখ যে গো! মিষ্টার লাহা! শুন্চেন তো বেবির হুঃখের কথাটা! সাবধান!”

“যাঃ, তুই খালি খালি যা’ তা’ বল্বি তো আমি এফুনি চ’লে যাব।”

“ওগো না না, যেও না, এখনই এক জন চক্ষে সব অন্ধকার দেখবেন। তুমি যখন আসো নি, সে কি মুখই যে হ’য়ে উঠেছিল! ও মা! ওরা কে গো! কি খীচ কর্চে শোন তো!”

রাস্তা খোলা পাইয়া ততক্ষণে আবদ্ধ জনতা জন-স্রোতের মতনই গতায়ত আরম্ভ করিয়াছিল, ছ’একটা পুলিশ ভিন্ন অস্ত্রধারী রক্ষীদের আর কাহাকেও দেখা যায় না। সেই জনতার এক ধারে, অপর দিকের ফুট-পাথের উপর তরুণ-বয়সীদের একটা ছোটখাট ভিড় জমিয়াছিল, এবং তাহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি সুদর্শন যুবক উচ্চ-কণ্ঠে সেই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছে দেখা গেল। কি বলিতেছে, শুনিবার জন্য সকলেই একটু কোতুহলী হইয়া চুপ করিতেই এই কথাগুলি কানে আসিল।

“ভূতিক্ষের লীলাভূমি, বস্তার সহচর, মহামারীর মহানন্দক্ষেত্র,—আর এ সকল ছুর্কিপাকের মূলীভূত বিবিধ কারণসমূহ যে দেশকে উৎসাদিত করিতে বসিয়াছে, তার সেই রোগ-বিক্ষত শরীরে এত সজ্জা দেখিলে দর্শকের সন্দেহ জন্মানও আশ্চর্য্য নয়-যে, হয় তো তাহার মস্তিষ্কেরই স্থিরতা নাই! যে দেশ দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ রোগ-শোকে অন্ধকারময় হয়ে উঠেছে, সে দেশে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সেই রোগ-দারিদ্র্যানাশের কথঞ্চিৎ চেষ্টায় ব্যয় না ক’রে, আলোক-মালায় বাজী-বাজনার ভয়ভূত কর্তে দেখলে শরীর-মন কি শিহরিয়া উঠে না? আর—যে দেশের মেয়ে বিবস্ত্রা হবার ভয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ কর্তে বাধ্য হয়ে-ছেন, তারই দেশ-ভগিনীগণ সহস্র সহস্র মুদ্রা নিজের বিলাস-বাসনে অকাতরে ব্যয় ক’রে দরবার দেখতে চলেছেন! এই কি সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ? এরই ত্যাগের সাহায্য না এক দিন সমস্ত পৃথিবীময় বিদোষিত হয়েছিল? আর আজ? হায় মা ভারত-লক্ষ্মীগণ! তোমরা পশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবে প’ড়ে এর স্বাভাবিক দয়া-ধর্মকেও কি পৃথিবীর সকল দেশেরই পায়ের তলায় বিসর্জন দিলে?—”

শ্রোতীবৃন্দ ঈষৎ অসন্তোষের সহিত প্রায় ঔষধ গেলার মতন করিয়া এই ধূষ্ট বক্তার ধূষ্টতা সহ্য করিতেছিল। এলা হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিয়া উঠিল,

—“ওরাই তো ওই সব ব’লে ব’লে দেশের লোকদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। ধরে—ছেলেটাকে পুন্সি!”

কথাটা জনতার এবং জনতার মধ্যবর্তী সেই ছেলেটিরও কানে গেল। গোর ললাট তাহার এক মুহূর্তে টকটকে লাল দেখাইল, ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞার তীব্র-হাস্তে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর বিভাসিত হইয়া উঠিল, উচ্চ ও অকম্পিত-কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল,—
“দেশের যখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, নারীর পতনেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়! যে ভারতনারী মেহে, প্রেমে, ভক্তিতে, কারুণ্যে—নিষ্ঠায় ও ত্যাগে মূর্তিমতী দেবীর স্থায় প্রতীয়মানা হইতেন, আজ তিনি কি? আমি জানি, নিকটবর্তী কোন প্রাসাদ-মন্দিরে এমন এক জন হৃদয়হীনা মহিলা অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি মাত্র এই ছ’একটি ঘণ্টা পূর্বেই বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রস্তুত কোন মারাত্মক গাড়ীর চাকায় এক অসহায়ী অক্ষমা বৃদ্ধার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়া অনার্য্যসেই লঘু হাস্ত-পরি-হাস ও আহা-বিহারে আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছেন! পাছে দর্শনেন্দ্রিয়-পরিভূষণের সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটয়া যায়, সেই ভয়ে তাঁহারই রথচক্রে মদিত হইয়া সে হতভাগিনী প্রাণ হারাইল কি না, সেইটুকু সংবাদ লওয়ারও যে প্রয়োজন থাকে সম্ভব—”

“ও কি, বেবি! ও কি ভাই! চ’লে যাচ্চিস্ কেন?”

“আমার ভারী নীত করছে এলা! আমি ঘরে বাই।”

“এই তুচ্ছ কথাটাও সেই সম্মানিতা শিক্ষিতা মহিলাটির স্বরণেও আসিল না!—ধিক্ এই সব শিক্ষা-দীক্ষায়! ধিক্ সেই রূপ ও ঐশ্বর্যাভিমানিনী নারীকে!—যারা ভারত-রমণীর বীর-পূজ্য কীৰ্ত্তি-গাথাকে আজ মসী-মলিন করিতে উত্তত!—তবে সেজন্ত দায়ী অথবা তাঁরা নিজে নন; আজ এই যে আদর্শের বিকৃতি ঘটাইতেছি, এর জন্ত দায়ী আমরা নিজেরাই! আমি জানি, এমন অনেকা-নেক কৃতবিদ্য উচ্চ-পদস্থ শিক্ষিত পুরুষ আছেন, যাদের ব্যবহারে তাঁদের হতভাগ্য দেশবাসী যত-দূর নিপীড়িত, তার শতাংশের একাংশও তাঁরা বিদেশী রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন না। বস্তুতঃ দেশবাসীর প্রতি যে অগ্নায় অবিচার নিয়-তাই ঘটতেছে, রাজার জাতি অপেক্ষা আমাদের নিজের জাতিই তার জন্ত অধিকতর দায়ী। আবার মেয়েদেরও এই সুখোচ্ছানের রঙ্গীন

প্রজাপতি সাজিয়া আজিকার এই দুর্দিনে যে অনর্থক বিলাস-ব্যসনে প্রচুরতর অর্থব্যয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তার জন্তও দায়ী এঁরা! দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা দেশের দুর্বস্থায় দৃকপাত না করিয়া আত্ম-সুখ-সাধনকেই সর্বস্ব করিতে শিখিলেন কাদের প্ররোচনায়? ইহা হিন্দু-নারীর স্বাভাবিক বৃত্তি তো ছিল না।—আমি শুনিয়াছি, এখনকার মত এমন দুর্দিনেও কোন ধনশূন্য ধনি-কত্যা তাহার প্রিয়পাত্র কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্বক নিজের দরবারের পোষাক তৈরী করাইতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। বঙ্গ-নারীর—হিন্দু-নারীর এই অবনতি অতঃপর আমাদের দেখিতে হইল।”

চারিদিকে একটা ধিক্ ধিক্ শব্দ উঠিয়া ক্রমশঃ সেটা থামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের দল তাঁদের দলপতিকে লইয়া পায়ে পায়ে চলিয়া গেল। ইহাদের পিছনের বাড়ীর সদর-দ্বারের পাশে—কাপড়ে সাজা একটি ভদ্রলোক হাঁটুর উপর থানা কাগজ রাখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসি অত্যন্ত দ্রুতহস্তে কি লিখিয়া বাইতেছিল, সে যে কাগজখানা পকেটে ফেলিয়া জনতার পিছু লইল।

গাড়ী-বারান্দার উপরে মিঃ লাহা দাঁত দি-ঠোট চাপিয়া সেই অদৃশ্যপ্রায় জনতার দি-চাহিয়া ছিলেন; মিসেস্ কর ছ’পাশের ভিড় সর-ইয়া তাঁহার ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া অর্ধ-অশ্রাব্য মুহূর্তেরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, “হৃৎখিত হ’লাম মিঃ লাহা! আজকাল ঐ এ-ফ্যাসান হয়েছে দেখছি! তা’ ওর জন্ত আমা-কা-আমাদের ব্যাঘাত হচ্ছে না। আপন-বাড়ী এসে আজ আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম-তা ও—আপনি আর কি করবেন, আপনি হৃৎখিত-হবেন না।”

“আমি!”—মিঃ লাহা সদন্তে মিসেস্ করের সহিত মুখামুখি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।—“আমি আমি ওদের সিকি পরসারও গ্রাহ্য করিনে! র-কুকুর ব’লেই মনে করি। তা’পর পরশু যা-তো?”

মিসেস্ কর কহিলেন, “আমার তো ইচ্ছা, দেখি কি হয়।”

“আপনারাও সোসিয়ালিষ্টের দলে ভিড়-নাকি?”

“ওঃ, না, আমি ঠিকই যাব, দেখে নেবেন-ভাইএর মন্ত্রণায় মন্ত্রণায় ওনারও মাথা খা-

হবার যোগাড় করছিল, বলছিলেন, অনর্থক নাই গেলে, দেশের ক'জন বড়লোক বিপন্ন, এ সব সময় আমাদের আশ্বাদ-প্রমোদ বতটা না করলে চলে, না করাই উচিত।—বিশেষ যাতে করে ওদের সঙ্গে কো-অপারেশনে আসতে হয়। আমি তো তাই গুলুম। বাঃ! চিৎদিন যেন আমরা কুপ-মণ্ডুক হয়েই থাকবো। কিছুই দেখো না, জানবে না;” “চললেন আপনারা! ওঃ, আপনারাও যাচ্ছেন তা হ'লে! নমস্কার! বড় আনন্দ দিয়েছেন এসে। মুরজা যে! চলল না কি? ওঃ, আচ্ছা, অনেক দিন পরে দেখে খুব আশ্বাদ হলো, এখন আছ তো? এক দিন দেখা করে আসবো গিয়ে, ক'নসর ঝাউতলা? পঁচিশ! আচ্ছা, এই নোটবুকে টুকে রাখলুম। দেখ, নিশ্চয় যাব।”—

দলে দলে অভ্যাগত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা-বৃন্দ বিদায় অভিনন্দনের আদান-প্রদান করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, এলা ও মুরজা দুই সখীতে হাত ধরাধরি করিয়া ‘ডুইংকমে’ যেন কাহার অশ্রমণে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে শীতের সন্ধ্যায় ‘ইলেকট্রিক পাখা’ খোলা ও একখানা কোচে বসিয়া পড়িয়া মিস মল্লিক নিজের হাতের ক্রমালখানা ঘুরাইয়া নিজের মুখে জোরে জোরে হাওয়া করিতেছে।

এলা হাসিয়া জনান্তিকে মুরজাকে কহিল, “বাইরে তখন শীত করচে ব'লে ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে এলেন, এখন হাওয়া খাবার ঘটাখানা দেখেছিস?”

মুরজা তেমনি ভাবে জবাব দিল, “তা তো দেখছি, তবে ব্যাপারটা যে কি, সে তো কিছুই বুঝতে পারচিনে!”

এলা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, “ওগো, প্রেমে তো কখন পড়তে সুযোগ পাওনি, ও সব প্রেমের লীলা-কলা বুঝবে কি করে? যে বোঝবার, এইবার সে নিজে এসেই বুঝুক।”—প্রকাশ্যে কৃষ্ণার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার বায়ুভরে বিপর্যস্ত কেশে অর্ধ-আচ্ছন্ন ও অন্তরের কোন অজ্ঞাত ভাবোত্তে-জনার ক্ষণ-বিবর্ণ, ক্ষণ-আরক্ত মুখখানা হ'হাতে তুলিয়া ধরিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, “সত্যি বলছি বেবি! তোর আজকের এই মুক্তিখানা যে দেখবে, সেই মাথা ঘুরে মরবে! তুই রাস্তাধারে দাঁড়িয়ে না থেকে যে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এসেছিলি, সে খুব বিবেচনারই কাজ করেছিলি ভাই! অনর্থক জীব-হত্যার লাভ কি? কাল

গিয়ে ভাই তোর নতুন শাড়ীটাড়ীগুলো দেখে আসবো।”

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে মুরজার গা টিপিয়া ঠোট উল্টাইয়া বলিয়া গেল, “দেখলি তো কেমন মায়াবিনী! একেবারে মানুষধরা ফাঁদ পেতে নিয়ে ব'সে আছে। তা এতটুকু লজ্জাও করে না! যেন ‘তিলোত্তমা’ কুমার জগৎ-সিংহের ধ্যানে বসেছেন! এতে কি আর গরীব বেচারী মুমূর্ষু বউএর খবর কেউই রাখতে পারে?”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিমজ্জিত সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, কৃষ্ণা উঠিয়া চলন্ত পাখাখানা বন্ধ করিয়া দিল। তার পর মুখের উপর ক্রমাল চাপিয়া কোচের হাতার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে উপড় হইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ ফাটিয়া তাহার হ হ শব্দে কান্না আসিতেছিল, ক্ষোভ, ক্রোধ ও অভিমানে মিলিয়া বৃকের মধ্যটাকে যেন আবেগে পড়া নৌকার মতই বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছিল। জীবনে এত বড় অপমান আর কখন যেন তাহার ঘটে নাই।

কাহার জুতার শব্দ বাহির হইতে ঘরের মধ্যে আসিতে শোনা গেল, সেই বহু-পরিচিত শব্দটা অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া থামিল। নিকটে যেন গায়ের উপরেই কাহার নিশ্বাসের বাতাস অনুভূত হইতে লাগিল। পরক্ষণে গভীর অনুরাগে ও আগ্রহে মথিত-কণ্ঠ কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, “এ কি, বেবি! এমন করে শুয়ে আছ কেন? কি হয়েছে?”

বিজ্যৎস্পৃষ্টের জ্বাষ কৃষ্ণা ছিটকাইয়া উঠিয়া পড়িল। আগুনজ্বলা চক্ষে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, —“তুমি কি সত্যিকারেরই কচি খুকী ব'লে আমার মনে করো না কি যে, ওই অপমানের পরে ‘বেবি’ ব'লে ডেকে আমার ভুলাতে এলে?”

তরুণচন্দ্র বিহ্বলপ্রায় হইয়া গিয়া স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে রাগরক্তিমায় অধিকতর মনোহর মুখের পানে চাহিয়া থাকিলেন, পরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, “অপমান!—তোমায়!—কে করলে বেবি?”

কৃষ্ণা তখন সম্মুখে এক জনকে পাইয়া এতক্ষণ-কার নিরুদ্ধ বিষেষের উষ্ণ উৎস খুলিয়া দিয়াছে, সে এই ব্যগ্র বেদনার তিলমাত্র অক্ষেপ না করিয়াই এক ঝলক অনলোদগিরণের মত উচ্চস্বরে

কহিয়া উঠিল,—“এ সবই তোমার জন্ত ঘটলো! তোমার এখানে আসার জন্ত! তা’ না হ’লে তো আর যার তার মুখে আমায় এত অপমান সহিতে হ’তো না! তোমার যেমন, আমি না হ’লে কিছুটিই হবার যো’ নেই!”—মর্ম্মস্থলে আঘাত প্রাপ্তে চমকাইয়া উঠিয়া তরুণচন্দ্র উচ্চারণ করিল, “আমার জন্ত! আমার বাড়ীতে এসে! বেবি! বেবি! কি বল্‌চো!”

কৃষ্ণা নিজের উদ্গত অশ্রু দমন করিতে করিতে বলিল,—“তোমার জন্তে নয় তো আর কার জন্তে? —তোমার বাড়ীতে আসার জন্তেই না এত সব হ’লো! একেই আমার মন কি রকম যে খারাপ হয়ে রয়েছে, তার উপর—” কৃষ্ণার গলা ধরিয়া আসিল।

তরুণচন্দ্র সাহসনা দিতে চাহিয়া কি বলিতে গেলেন, “এর জন্ত তুমি—” “সবটা শোন তো আগে, তার পর ‘কমেন্ট’ করো। বাবার তো আর বের হবার সময়ই হয় না। যখন হলো—ভাড়াভাড়ি ক’রেই আসছি, তোমার বাড়ী থেকে হুঁশো গজ হবে কি না হবে, ঐ মোড়টার মাথায় একটা খুড়খুড়ে বুড়ী এসে গাড়ীর তলায় পড়লো।—তখন আর মোটে সময় নেই,—তা’ পর বাবা ঐ অসুস্থ মানুষ, তক্ষনি আবার রাস্তাও বন্ধ হবে, ঐ অবস্থায় আমি মাঝপথে ব’সে কি করি বল তো? কাজেই এখানে চ’লে এলুম, কিন্তু এসে আমি নিশ্চিত হই নি, তক্ষনি সোফারটাকে সেখানে যেতে ব’লে দিয়েছি। বুড়ী মরেছে কি না দেখবে, তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে, যা খরচপত্র হয় করবে, নিজে ধরা দেবে, সব কিছু ব’লে দিয়েছি। তার পরও কি না ওরা শুধু শুধু আমার অমন ক’রে অপমান ক’রে গেল! আমি কি ওই খুড়খুড়ে বুড়ীকে রাস্তায় বার হ’তে পরামর্শ দিয়েছিলুম, না তাকে হাত ধ’রে টেনে এনে গাড়ীর চাকার তলায় ফেলে দিয়েছিলুম! আমার কি দোষ?”

মিঃ লাহা চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, “তোমার দোষ কি?”

“তা হ’লে কেন ও-লোকটা আমায় অনর্থক যা’ তা’ ব’লে গেল? আমি কিন্তু সহিষো না, তা’ তোমায় ব’লে রাখছি! কি অত্যাচার ম্পর্ক! লোকটাকে টুকুরো টুকুরো ক’রে কেটে কুবু’র দিয়ে খাওয়ালেও আমার রাগ যায় না! এর উপর শেষকালের সেই কথাগুলো বলি, সেগুলোও কি তোমার কানে

যায় নি? না তারও অর্থবোধ করতে পার নি বোধ হয়? দরবারে যাবার জন্ত কে এক জন তার প্রিয়-পাত্রীর পোষাকে কত হাজার টাকা খরচ করেছে ব’লে যে হিসাব দাখিল ক’রে গেল,—সেটা কা’কে বলা হলো শুনি? সে কি তুমি ছাড়া আর কেউ?”

মিঃ লাহার চোখের তারায় ক্রোধের আভাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও কণ্ঠস্বরে তাহার কণামাত্রও ব্যক্ত হইল না, বিনীত অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, “বুঝ্‌লেই বা আমার উপায় কি? হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাংয়েতেও তাকে লাথি মেরে যায়। আমার গলার ফাঁসী যখন খোলবার উপায় আমার নেই, তখন অগত্যাই তার টানও আমায় সহিতে হবে। কিন্তু তা’তে আমার কি অপরাধ?”

কৃষ্ণার রাগ পড়ে নাই। সে তীব্রস্বরে জবাব দিল, “তোমার অপরাধ নয় তো কার অপরাধ?—কার জন্তে এত কথা আমায় শুনতে হলো? আমি কক্ষনো এ রকম অপমান সহিতে পারবো না, সে তোমায় এই ব’লে দিলুম। এর যদি প্রতীকার না হয়, দেখো তুমি, এবার থেকে আর আমি, তোমার—”

মিঃ লাহা তার কোচের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, “তা’ হ’লে যাতে আর কেউ কিছু না বলতে পারে, তারই উপায়টা আগে করা যাক। অনেক দিন ধ’রেই যখন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আরও কত দিন যে বাকী, তারও যখন কিছুই নিশ্চয়তা নেই, তখন সকল সমাজের সকল লোককে অঁর কথা বলতে না দেওয়াই ভাল। যদিও তা’তেও একটা আন্দোলনের নেহাৎ কম হবে না,—কিন্তু সেটার সময় হিন্দু-সমাজ নীরব থাকবে এবং বাকীটা আমার পূর্বস্রষ্টার মৃত্যুতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

কৃষ্ণা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিয়া লইয়া একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিল। অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কহিল, “সে হয় না, তোমার সে স্ত্রী মরা পর্যন্ত আমাদের যেমন ক’রেই হোক অপেক্ষা করতেই হবে।”

“তা হ’লে এ রকম হ’লে একটা বাজে লোকের বাজে কথা সহ করাও অনিবার্য! আর তা’তে অধৈর্য হবারই বা কি আছে? বিশেষ তুমি মনের মধ্যে নিশ্চিতরূপেই জান, এক দিন আমায় পরস্পরেরই হবো; জগতে এমন কিছুই নেই—যা’তে আমাদের মিলনে বাধা দেবে। এখন হুঁতু দৈব-দুর্ভিক্ষাকে যদিই তোমার একটু সঙ্ক

হয়, আমার জন্ত সে কি তোমার পক্ষে এতই কঠিন বেবি?”

কৃষ্ণা এসব কথায় কর্ণপাত করিল না, সে ঝাঁকিয়া কহিল, “না, আমি কারও কথা সহিতে পারবো না। লোকে যে ঐ রকম ঠাট্টার শুরু করে, তোমায় জড়িয়ে নিয়ে কথা বলবে, সে আমি কিছুতেই সহিতে পারবো না।”—

মিঃ লাহা হুঃখিত ও কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “তোমার জন্ত আমি এক জী বর্তমানে আবার হিন্দুধর্মে বিবাহ করে—সিবিলিয়ানীর অমর্যাদা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তাও শুনবে না, অথচ কে একটা রাস্তার কুকুর-কি বলে চৈচিয়েছে, তাই নিয়ে আমায় দায়ী কর্চো,—এতে আর আমি কি করতে পারি বলা? সবাকার মুখ তো আমি বেঁধে রাখতে পারি নে।”

এই অপ্রিয় সত্য বাক্যটা কৃষ্ণার বুকে বিঁধিল। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল। কান্না-ভাঙ্গাকণ্ঠে বলিল,—“দাও, আমায় একটা গাড়ী ডাকিয়ে দাও, শীগ্গির দাও—একনি আমি বাবাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি;—আর কক্ষনোই তোমার বাড়ী আমি আসবো না। তুমি নিজেকে শুদ্ধ আমার অপমান করলে!”

“সে কি বেবি! সে কি? তোমায় আমি অপমান করলুম? এ কি বল্চো? দেখ, পৃথিবীতে এসে সুখ কাকে বলে, কখনও জানি নি। ছোট-বেলা মা মরেছিল, বাপ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, ছেলের খবর রাখবার অবসর তাঁর মোটেই ছিল না। তার পর পিতৃ-কর্তব্যের মধ্যে সাত-তাড়াতাড়ি একটা পাগল ধরে বিয়ে দিয়ে সকল সুখেরই চূড়ান্ত করে রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীতে এসে পাইও নি কিছু, দিইও নি কোথাও,—শুধু এই একটি জায়গায়, এই একটি আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছি। তাই এখান থেকেও যদি না পাই, যদি আশা না মেটে—তা’ হলে সে কি সহ্য করা যায়? তুমিও যদি চিরদিনই আমার ‘পরে’ অমনি করে বিমুখ হয়ে থাক, তা হলে আমি বাঁচি কেমন করে, তাই আমায় বলা তো?”

কৃষ্ণার মুখের কঠিন তাক্কিলোর ভাব পরিবর্তিত হইয়া তাহার স্থলে সুগভীর সহানুভূতিপূর্ণ করুণা জাগিয়া উঠিল। সলজ্জভাবে কহিল,—“আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, আমায় তুমি মাপ করো।”

তরুণ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, “কষ্ট তুমি আমার দাও নি

বেবি! বলেছি তো তুমিই আমার একমাত্র জীবনের সুখ। হুঃখ আমার মন্দভাগ্যই আমার দিচ্ছে। আমার যে জী মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করেও অর্ক-মৃত হয়ে বেঁচে আছে, হুঃখ দিচ্ছে আমার সেই, তুমি নয়। যে বাঁচবে না, মৃত্যুই যার শাস্তি, অনর্থক কেনই যে সে এমন করে বেঁচে রইলো, এর কোন অর্থই যদি আমি বোধ করতে পারি!”

“ছিঃ, লাহা! নিজের স্বার্থের জন্ত, তুমি আর এক জনের মৃত্যু-কামনা কর্চো! কি নিষ্ঠুর তুমি?”

“নিষ্ঠুর আমি! কিসে আমি নিষ্ঠুর? যার মৃত্যু-কামনা হৃর্ভাগ্যক্রমে আমার করতে হচ্ছে, সে আমার পায়ের বেড়ি ভিন্ন আর কি কোন কিছু? কবে কি তার কাছ থেকে আমি পেয়েছি যে, তারই বিনিময়ে তার এই জীবনমৃত অবস্থাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে সম্মান করবো? তার কাছে যা পেয়েছি, তাতে তার মৃত্যুরই প্রতীক্ষা আমার করতে হচ্ছে; তা ভিন্ন আর কি করতে পারতুম, তাই বল দেখি?”

কৃষ্ণা ঈষৎ চিস্তিতমুখে কহিল, “তা, আমি জানি নে, তবে হয় তো, কিছু পারতে, হয় তো, তা’কে ভালবেসে, তাকে মানুষ করে তুলতে তুমি চেষ্টা করলে, না পারতে, এমন নয়। শুনেছি সে না কি পাগল হ’লেও তোমায় খুবই ভালবেসেছিল। তোমার বিলাত যাবার খবরেই তার রোগ শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ও সেই থেকে সে মৃত্যুশয্যাই পেতেছে।—তবে অবশ্য বলা যত সহজ, একটা মৃগীরোগী উন্মাদের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা ততদূর সোজাও নয়, কিন্তু তা’ ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?”

“উপায় রয়েছে, তুমি আমার স্ব-জাতীয়া, অনায়াসেই আমাদের হিন্দুবিবাহ হ’তে পারে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে উন্মাদ ও চিরকরা জী বর্জ্যনীয়া। তবে এ নিয়ে যদি—এমন কি, গবর্ণমেন্টের কান্দি ও-কথাটা যায় যে, এক জন সিবিলিয়ান এক-জী বর্তমানে আবার বিয়ে করেছে, তবে সমস্ত খবর না জেনে একটু আন্দোলন হবে, কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপেই আমার ব্যাপার, তোমার এতে এতটুকুও অংশ থাকবে না।”—

কৃষ্ণা পুনশ্চ একটুখানি নীরব হইয়া চিন্তা করিল, তার পর নিজের দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন দৃষ্টি ভূমিবদ্ধ করিয়া আরক্ত-গণ্ডে জবাব দিল,—“কান্দি নেই—থাক। তিনি আর কত দিনই বা আছেন। একদিন তো পাবেই—”

“একদিন পাইবে”—এই সামান্য শব্দটি

তরুণচন্দ্রের বিরস-চিত্ত যেন একটি ক্ষণের মধ্যেই প্রচুরতর আনন্দরসে সরস করিয়া তুলিল।

এই যে রূপসী রূপ-বোবনের অনন্ত-সাধারণ সম্পদে শিক্ষা-দীক্ষার গৌরবে যে আজ কলিকাতার স্বাধীন-সমাজের মুকুটমণি, সেই শতজনবাঞ্ছিতা সুন্দরী নিজের মুখেই স্বীকার করিতেছে—“একদিন তো পাবেই”—তবে আবার কিসের ছুঃখ? এত দিনের সহিষ্ণুতার এই তো সমুচিত পুরস্কার! গভীর আনন্দে রুদ্ধবাক্ হইয়া সে শুধু অনিমেষ-মুগ্ধনেত্রে সেই লজ্জাবনত মুখের পানে अपना হারাইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার বাক্য-দুর্ভিত্তি হইলে অধীর আবেগে কি একটা বলিতে যাইতেই, তাহার বেহারা করিম দ্বারের বাহির হইতে সেলাম জানাইল।

বিরক্ত ও কিছু বিষণ্ণচিত্তে তরুণচন্দ্র ভৃত্যকে ভিতরে আসিতে আদেশ দিলে, সে আসিয়া পুলিশ-ইন্সপেক্টরের আগমন জানাইল।

“তাকে বসাতো গে, আমি যাচ্ছি”—

ভৃত্যের পশ্চাতে তরুণও উঠিয়া পড়িল।

“পুলিস-ইন্সপেক্টর কি জন্ত এসেছে? তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে?”

মিঃ লাহা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্তমুখ সগর্বে তুলিয়া উত্তর দিল, “তুমি কি মনে করো—তোমায় অপমানিত করে গিয়ে সে নির্বিঘ্নে তার ঘরে পৌঁছে স্বচ্ছন্দে ঘুমতে পারে?”

এক মুহূর্তের জন্তও কৃষ্ণার আহত গর্বে বিক্ষত-চিত্ত প্রতিশোধের আনন্দগৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব-সমক্ষে বিশেষভাবে যে ‘ব্যক্তি-বিশেষের প্রিয়পাত্রী’ বলিয়া তাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইটাই তাহার কোমার-গর্বে অটুট গৌরবে অত্যন্ত আঘাত করিয়া বাজিতেছিল। সে লজ্জা, সে অপমান যেন তাহার গোপন করিবারও স্থল ছিল না। কারণ, ইহার মধ্যে যে একটুখানি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। এই প্রলোভনীয় নিমন্ত্রণ-সভার জন্তই বিশেষভাবে তাহাদের এই ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার লইতে হইয়াছে, তা’ এমন মধ্যে মধ্যে হয়ও। অবশ্য কন্তার পিতা বরাবরই এর জন্ত এই লোককে একখানা করিয়া ছাওনোট দিয়া থাকেন; এবং এ ধারটা অল্প লোকের নিকট লওয়া হইতেছে, এই রকম কথা-বার্তায় প্রকাশ পায়, ইনিও প্রথম প্রথম বিস্তর আপত্তি করিয়া এক্ষণে কি ভাবিয়া বলা যায় না, নিরাপত্তিতেই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; সে

সব কথা এই তিনটি লোকের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোকে ইহা কোথা হইতে রটনা করিল, ইহাতেই তাহার বিশ্বাস সীমা ছাড়িয়াছিল এবং যেখানে ব্যাথা, আঘাতটাও বড় প্রচণ্ড হইয়াই ঠিক সেইখানে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার এ বিজয়ানন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। এক মুহূর্ত পরেই যেন কিসের একটা অশান্তিতে সমস্ত মনটা অস্থস্থ হইয়া উঠিল, উঠিয়া প্রস্থানোত্তম মিঃ লাহার দিকে ছই পদ অগ্রসর হইয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, “শোন, শোন, আচ্ছা, ওকে তুমি কি গ্রেপ্তার করতে বলবে?”

মিঃ লাহা ফিরিয়া আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন; ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, “তা’ না দিলে সে যে নিজে এসে ধরা দেবে, এমন আশা আর কেন ক’রে করি?”

কৃষ্ণা কহিল, “কিসের চার্জ দেবে ওকে? ও তো ‘সিডিসন্’ কিছুই বলে নি?”

মিঃ লাহা একটুখানি বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া আশ্বাসের স্বরে উত্তর করিলেন, “তার জন্ত ভাবনা নেই, সে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বসো, আমি আসছি।”

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে ঈষৎ ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে স্থির-কণ্ঠে কহিল,—“না, অত্যাচার ক’রে এক জনকে তুমি গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিতে পারবে না। ও যা’ বলেছে, তা’তে ব্যক্তিগত বিষেই ব্যস্ত হচ্ছে। দেশের ধনী ও বিলাসী লোকদের গায়ে সে চাবুক মেরেছে, তা’তে অনেকেরই গা-জালা করতে পারে; কিন্তু ফিয়ার্ভারও তো তাকে কোনই পথ নেই, কিছু কি সে মিথ্যা বলেছে? ভেবে দেখলে কি ওর প্রত্যেক কথাটিতেই নির্ভীক সত্যের অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখতে পাওয়া যায় না?”

“বেবি! তুমি কি বলচো? তোমায় আমার একসঙ্গে কত বড় মিথ্যা অপমান ও ক’রে গেল, সে কি তুমি এক্ষুনি ভুলে গেলে? এই যে বলছিলে, ‘ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও তোমার রাগ যায় না?’”

কৃষ্ণার কালো চোখে দু-চোখ ভর্তি জলের মধ্যে আগুন দেখা দিল,—“বলেছিলুমই তো! —বলেছিলুম কেন, সে তো এখনও বলছি!—আমি ওর কি করেছি যে, ও এত লোক সংসারে থাকতে শুধু শুধু—যা নয় তাই বলে আমার সঙ্গেই লাগতে এলো? ওর খুব বেশী রকম একটা শাস্তি

হওয়াই উচিত। কিন্তু দেখ, এখন ওকে আর শ্রেণীর করে কাজ নেই। ও যদি আদালতে এই সব কথা বলে, আমার নাম যদি স্পষ্ট করে পবলিকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে,—ওরে, বাবা রে! তা হ'লে আমি ম'রেই যাব!”

“তবে থাক, আমাদের হাত ও ছাড়াতে পারবে না,—কাদ তৈরী থাকলে এক সময় না এক সময় তাতে পড়তেই হবে।”

“সে মন্দ নয়। এখন আর এতে ওর দণ্ডই বা কি হবে? মাঝে থেকে লোকে এই সব কথা নিয়ে কি না কি আলোচনা চালাতে পারে। ওর পক্ষের উকীল-ব্যারিষ্টাররা হয় তো খুব ফাঁদালো করে এই সব কথার ব্যাখ্যা করতে লেগে যাবে। সবাই হয় ত বলবে, গায়ের জালায় তুমি শুধু শুধু নির্দোষীর উপর পীড়ন করাচ্ছো। চাই কি নিষ্কর্মা খবরের কাগজের সম্পাদকের দল এরই উপর রং-চং ঢেলে সাতটা বড় বড় আর্টিকেল লিখেই কাগজে কাগজে ছাপিয়ে দেবে।—রাষ্ট্রাঘাটে আমার দেখতে পেলে সবাই হয় তো একটু মুখ টিপে হাসবে।—উঃ—সে আমি সহ্যে পারবো না। তার চাইতে মরণই ভাল!—”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মে ডিকেল-কলেজ-হাঁসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডের সম্মুখে একখান ভাড়া করা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া একটি মেয়ে ত্বরিতপদে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মেয়েটির বেশভূষা আড়ম্বর যে বেশী কিছু ছিল, তা নয়, তথাপি তাহার মূল্যবান পার্শি শাড়ী ও খুব সোখীন কাট-ছাঁটের জ্যাকেট, পায়ের গোড়ালী উচু বিবিয়ানী-জুতা, মাথায় রাশিকরা ভ্রমরকৃষ্ণকেশে সযত্নচিত্রিত সব চেয়ে আধুনিক এলো থোপা, নিতান্ত অলঙ্কার হ'লেও বহুমূল্য অলঙ্কার তাহার ধনবত্তার ও সোখীনহের পরিচয় প্রদান করিতেছিল; এ ছুইট জিনিসেরই এ কালের অগতে একটা বিশেষ মর্যাদা আছে; ঘর এদের কাছে আপনিই খুলিয়া যায়, পথ দেখাইবার অগ্রদূতের কোন অপরিচিত রাজ্যে গেলেও অভাব ঘটে না।

মেয়েটি এখানের হাউস সার্জনের কাছে আগমনের উদ্দেশ্য জানাইবামাত্র সর্বিশেষ সম্মান ও আগ্রহের মধ্যে পথ চিনাইয়া তাহার গন্তব্যস্থানে

৫৪(২৪)—৫

তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া হইল। সে জামগাটা কিন্তু এই সুবেশা ও সুন্দরীর পদস্পর্শের ঠিক উপযুক্ত স্থান নহে। এ কথাটা কলেজের কর্তৃপক্ষ হইতে একান্ত তরুণ ছাত্রবৃন্দ অবধ সবাই-কারই মনের মধ্যে একবারটি উদিত হইতে ছাড়ে নাই, তা' তাদের মুখের ঈষৎ অপ্রতিভ ও শলজ ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল, অর্থাৎ সে দিকটা নিতান্ত দরিদ্র অভাগাদের থাকার জায়গা, সেখানে কেনই যে এই মা-লক্ষীর বরপুত্রী আজ পায়ের ধূলা দিতে আসিয়াছেন, সে কথা হঠাৎ বুঝিতে পারা একটুখানি কঠিন তো বটেই!

একটি শ্বেচ্ছাসেবক সাগ্রহ আনন্দে ব্যগ্র হইয়া উহার পথপ্রদর্শকের কার্যে অগ্রসর হইয়া গেলে, পিছন হইতে এই নব অভ্যাগতার সম্বন্ধে একটা যুহকর্ঠের চাপা আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল।—

“কে রে? যেন দেখা মুখ মনে হচ্ছে না?”

“কি জানি ভাই, অমন কত মুখই তো পথেঘাটে দেখা যায়।”

“না, তা ব'লে এ মুখের হাটেঘাটে ছড়াছড়ি নেই হে! এ যাকে বলে বিউটী!”

“চেনো না? উনি যে ডাক্তার মল্লিকের মেয়ে মিস্ মল্লিক।”

—“কে? কে? কোন্ ডাক্তার? বুড়ো ডাক্তার মল্লিক বুঝি? যিনি অন্ধ হয়ে গেছেন? বটে—বটে!”

“হঁ, তাঁরই মেয়ে!”

“ওঃ, ওঁর নামটা কি?”

“কৃষ্ণা মল্লিক, বিজ্ঞাবুদ্ধিরও খুব খ্যাতি আছে; ও-মহলে চেহারাখানি তো খুবই চমৎকার।

“তা' এখানে কি উদ্দেশ্যে এলেন?”

“জানাই যাবে।”

“ওঁদের মতন সোখীন জীবদেহও আবার এর মধ্যে কিসের দরকার থাকতে পারে?”

“খুব সোখীন বুঝি?”

“দেখ্‌চো না, রোগী দেখতে আসারই সজ্জা!”

“তা ভাই, ঠিক বলতে পারিনে; সুন্দর মানুষকে যেটুকু পরলে সাজা মনে হয়, এক জন সাধারণ চেহারার লোকে তার হুণ্ডন করলেও তার ধারেও যায় না। সে থেকে বিচার ঠিক হয় না। আমি দেখছি, আমার মা আর খুড়ী-মা দুজনে একই ছোড়ার শাড়ী পরেন; কিন্তু মার গায়ে সেই লাল বা কাল পাড় শাড়ীখানারই জেলা যেন সাতখণ্ড খুলে যায়।”

“তা সত্যি! রূপ থাকলেই সেটা এতটুকুতে অনেকখানি বেড়ে উঠে!”

নিজের অভীষিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃষ্ণাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। সূজন গত দিবসের ‘মোটর-বিভার্চে’র খবর জানিত। সহজেই পূর্বদিনের সেই মোটর-চাকার আহত বুড়ীটার কাছে ইহাকে পৌছাইয়া দিল।

একেই অসমর্থ অক্ষম শরীর, তাহার উপর সাজাতিক আঘাতের অসহ যন্ত্রণা। আর্ন্তনাদে ও বিলাপে অপরাপর রোগীদের অশান্তির এক-শেষ করিয়া সকলকার নিকটেই সে তিরস্কার ও গালি খাইতেছিল। হাতে, পায়ে, কপালে, বুকে সর্বদা সেই প্রায় তাহার পাঁচ সাতটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, দু-একটা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণা অনিচ্ছুক অথচ যেন তাহার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কুণ্ঠিত-সলজ্জ-মুখে আসিয়া উহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইল। সূজন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি আর কিছু করতে পারি?” কৃষ্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া রোগীর যন্ত্রণাক্রান্ত বিকৃত মুখের পানেই বন্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যথিত স্নানচক্ষু তুলিয়া উহার মুখে স্থাপন করিল; তার পর কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, “এখন নয়; দরকার হয় তো বলবো।”—তার পর দৃষ্টি নত করিয়া আবার সেই আহত হতভাগিনীর মুখে তাহা স্থাপন করিল। সূজনকুমার ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া লম্বা ঘরটার অপর প্রান্তে খোলা বারান্দায় বাহির হইয়া দাঁড়াইল।

“উহুহুঃ!! মা রে! হাড়গুলো যেন সব পিষে যাচ্ছে! ওরে বাবা! একেবারে যদি পোড়ামুখোরা মেরে ফেলে যেত তো সে এর চাইতে ঢের ভাল হতো রে!”

কৃষ্ণার বুকের ভিতর যেন জাঁতাকলের চাকা চলিতেছে—এমনি তাহার শ্বাসকৃচ্ছতা ঘটিতে লাগিল। অনেক কষ্টে হাঁপ লইয়া সে ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করিল, “বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে! কি করলে একটু কমে, আমায় বল না!”

আহত চমকিত হইয়া চোখ মেলিতে গেল, বোধ করি, কপালে কি চোখেই আঘাত লাগিয়া থাকিবে; চোখের পাতা খুলিতে পারিল না; নিম্নলিখিত চক্ষু উপরে টানিয়া উঠাইয়া তাহার কণ্ঠ লক্ষ্যে রূঢ় কর্কশ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—
“কে তুই? থিষ্টানী খাই মাগী না কি? কেন,

কষ্ট হচ্ছে কি না হচ্ছে, তা’ দেখতে পাচ্চিস্ নে! সমস্ত দেহের হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে দিলে, তার কষ্ট না হয়ে কি সোয়াস্তি হবে না কি! আ-মর কানা মাগী কোথাকার! উহুহুহুঃ! মা রে, মাঃ!”

কৃষ্ণার সর্বদেহে মনে কি যে একটা প্রবল যন্ত্রণাপূর্ণ ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল, সে যেন সে ভাল করিয়া অনুভবও করিতে পারিল না। বুক যেন তাহার ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মতই ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে হইল; গলদশ-রুদ্ধপ্রায় কাতরস্বরে সে কহিয়া উঠিল—“ওগো, তুমি বলো, কি করলে তোমার এ কষ্ট ক’মে যাবে—আমি এমুনি তাই করবো!”—আর কিছুই সে বলিতে পারিল না; আর কোন সাহসনার কথাই তাহার মনে বা মুখে আসিল না। আর করিবারই বা এ ক্ষেত্রে কি আছে, তাও তো তাহার মনে পড়িতেছিল না।

বুড়ী অশ্রুট-গর্জনে বিদ্ধ পশুর মতই আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিল—“যে হতভাগারা হাওয়াগাড়ী চেপে মানুষের বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে হাওয়া খেতে ষায়—ওদেরও যদি আমার মতন দশা হয়, তবেই না এ কষ্ট কমে। এমুনি ক’রে যদি ওদের বুকের হাড় মড়মড়িয়ে গুঁড়ো হয়, তবেই না আমার এই ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে।—ওরে মা রে মা! ওরে মা রে, মা! জল! ওরে ও থিষ্টানী মাগী! তুই যেন দিস্নে, গরীব বাটি, তবু সজ্জাতের মেয়ে তো, মরণকালে থিষ্টানের জল খেয়ে মরতে যাব কেন? যদি ভাল লোক থাকে তো বল, ওরে মা রে মা! ওরে—”

আতঙ্কে কৃষ্ণার সর্বশরীরের স্পন্দন প্রায় থামিয়া আসিবার উপক্রম করিল, সে ক্ষণকাল জড়পদার্থের মতই বিমূঢ়বৎ থাকিয়া পরক্ষণে উহারই আর্ন্তনাদে সন্নিহ-লাভান্তে সসংজ্ঞ হইয়া উঠিল।—তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সূজন-কুমারকে। সে যে অযাচিতভাবেই তাহার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, এখন সে কোথায়? যে দিক দিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্য হইতেই সে উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল, “আপনি একবার এখানে আসবেন কি?—কোথায় আছেন? শীগ্গির একবারটি আসুন না!”

সূজন বাহিরে দাঁড়াইয়া অপর একটি আগন্তকের সহিত কথা কহিতেছিল। যে কথার তাহার

আলোচনা করিতেছিল, বোধ করি, ঘরের মধ্যকার এই আছানের সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব থাকিবে, কেন না, এই ডাক তাহার কানে ঢুকিতেই তাহাকেই যে ডাকা হইতেছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াই সে তাহার বক্তব্য বিষয়টাতে আরও একটু জোর চড়াইয়া প্রতিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিল, “ঐ শোন! বোধ করি কোন কিছু সাহায্যের জন্তই ডাকছেন। না ভাই, ও তোমার মিথ্যে প্রেজুডিস! সৌখীন ও স্বাধীন ঘরে হ’লেই নির্মম হয় না। মায়া-দয়া ওটা স্বভাব-ধর্ম।”—এই বলিয়াই সে ঘরের দিকে চাহিয়া উঁচু-গলায়,—“এই যে যাচি আমি”—বলিতে বলিতেই ত্বরিতপদে চলিয়া আসিল।

“দেখুন, বুড়ী একটু জল খেতে চাইছে,—পারবেন কি একটু দিতে?”—বলিতে বলিতে কক্ষার ছোটখড়ম টস্টেসে জল পড়ো-পড়ো হইয়া উঠিল।

“নিশ্চয়! একুনি আনুচি।”—বলিয়া সূজন-কুমার প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কক্ষা বধ্যভূমে বন্দীর মতই সত্য-অনিচ্ছায় বৃদ্ধার শয্যা-পার্শ্বে প্রথগতিতে ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধার নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে সে নিজের আগমন প্রকাশ করিতে ভরসা করিল না; এমন কি, খাস-প্রখাস পর্য্যন্ত সাবধানে লইতে লাগিল। সে যে কে, এ কথা জানাইয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে যদি সম্ভব হয়, তাহার পরিবারবর্গের জন্ত কিছু অর্থসাহায্য, এখানেও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেই সে এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু সব কয়টাই এখন তাহার পক্ষে কঠিনতর বোধ হইল—কেমন করিয়া ইহার কাছে সে আত্মপ্রকাশ করিবে? পূর্বে এ কার্যটাকে তাহার এত বড় দুঃস্বপ্ন বলিয়া আদৌ সন্দেহ হয় নাই। শুধু ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে ত্যাগের দিকটাকে উজ্জল ও মহৎ বোধ করিয়া সেইটাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়াছিল; নিজের দিক হইতে নিজেকে অপরাধীর মধ্যে এক জন বলিয়া স্বীকার করিতে যে লজ্জা, সেইটাকেই সে জোর করিয়া ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া আরও একটা নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। শুধু তাহার পক্ষ হইতেই নয়, উহার পক্ষ হইতে এই অভিব্যক্তিতে যে সুবিধা আনয়ন করিবে না, তাহা বেশ সুস্পষ্টই হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সে নিজেকে প্রকাশ করে।

যজ্ঞগার বৃদ্ধার লুলিত মুখ যেন ক্রমশই বিকৃতাকার ধারণ করিতেছিল; সে হঠাৎ আবার জোরে চোঁচাইয়া উঠিল, “ওরে মাগী! জল দিলি নি! তোকে ছুঁতে মানা করেচি ব’লে রাগ হয়েছে বুঝি? ওরে তেঁয়াল বুক শুকিয়ে মরি যে রে! ওরে মড়া নিয়েও তোদের খেলা করা! —মাগী, এই মাগী! ওরে মা’ রে মা! ওরে—”

“ও মা! আমি কি করি!” আতঙ্কে এই কথা বলিয়াই কিরিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার পিছন-দিকে খানিকটা দূরে এক জন কমবয়সী ছেলে দাঁড়াইয়া—সম্ভবতঃ তাহাদেরই কার্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সে নিজের মনের ভর-ভাবনা-উদ্বেগে উহার মুখের দিকে না চাহিয়াই, বয়সেরও হয় তো বা একটুখানি গঠন-সাদৃশ্যেও—ইহাকেই তাহার পূর্বপরিচিত সূজন বোধে অনেকখানি আশ্বস্তভাবে ইহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাঘ্র-ব্যাকুল-তার কহিয়া উঠিল, “কৈ, কৈ, জল এনেছেন? ওর যে বড্ড তেঁয়া পেয়েছে, শীঘ্র—”

ঠিক এই সময়ে একটা বড় এনামেলের প্লাস্‌ভার্টি জল লইয়া সূজনকুমার ঘরে ঢুকিয়া জবাব দিল, —“এই যে আমি জল নিয়ে এনেছি।”

—“ওঃ এসেছেন আপনি, আঃ—অনেক—অনেক—ধন্যবাদ! চলুন তো, ওকে জল খাওয়াবেন।”

আগন্তকের দিকে বারেকমাত্র চকিত-কটাক্ষে চাহিয়াই সে পূর্ব-পরিচিতের সমভিব্যাহারী হইল; কিন্তু সেই এক নিমেষের দৃষ্টিটুকু সে যে কোন অপরিচিতের মুখের উপর নিবদ্ধ করে নাই, সেটুকুও সেই একটি-মাত্র মুহূর্ত্তেই বোধ করিয়া গেল। মুখখানা চেনা। তবে কোথায় এবং কবে দেখা, সে সব কথা ভাবিবার অবসর না থাকায় মনে পড়িল না।

“আচ্ছা, অত বড় গেলাস শুদ্ধ জল ও কি ক’রে খাবে? মাথা কি তুলতে পারবে?—পারবে? আহা, না, পারবে না, দেখুন না! ঐ দেখুন, চেষ্টা করতে গিয়েই ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভিজ্জে গেল, আর একটা কিছু ছোট-খাট গেলাস কি বাটি—ফিডিং কাপ—সে কি আর হবে?—”

“আচ্ছা, আমি একুনি নিয়ে আসছি।”—এত-টুকুও অসম্ভব না হইয়া বরং এই সাগ্রহ অতুরোধে প্রসন্ন ও প্রস্তুতচিত্তেই সেই স্বেচ্ছাসেবকটি এক-দৌড়ে আদেশ-পালনে চলিয়া গেল।

জলপানে অপারগতার আহতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া যথাসক্তি চীৎকারশব্দে তাহার এই দুরবস্থার

মূল যাহারা, তাহাদের অকথ্য-ভাষায় গালি পাড়িতেছিল। সে সব শুনিতে শুনিতে ইহার কষ্টে ও নিজের অপমানে মিলিয়া কৃষ্ণার চোখের জল আর কোনই বাধা মানিতেছিল না, ছ'চোখের ধারায় তাহার আরক্ত গাও শিশিরাক্ত গোলাপের আকার ধারণ করিল। একবার সে সচেষ্ট-ধৈর্য্যে কৃষ্ণার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, “শোন, আমি খুঁটান নই,—আমি তোমার জল খাইয়ে দোব কি? তুমি চিং হয়ে হাঁ করলে, খুব একটু একটু ক'রে দিতে পারবো! দিই না?”

তাহার মিনতিপূর্ণ করুণকণ্ঠে—তা' ছাড়া তুম্বার অমহ কষ্টে অনেকখানি নরম হয়ে বৃদ্ধা নিঃশব্দে হাঁ করিল, ও যেন কৃতার্থবোধ করিয়া কৃষ্ণা সেই জলের গ্লাসের খানিকটা জল মাটিতে ঢালিয়া দিয়া, সেই গ্লাস হইতে অল্পে অল্পে তাহাকে প্রায় অর্ধপরিমিত গ্লাস জল পান করাইল।

জল পান করিয়া বৃদ্ধী অনেকখানি স্নহ বোধ করিল, ও সেই সঙ্গেই তাহার বিদ্রোহ-ভাবটাও একটুখানি কমিয়া আসিল। একটা স্বস্তির শ্বাস-গ্রহণপূর্ব্বক “আঃ”—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া গুইল এবং হঠাৎ প্রায় উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—“আঃ, রাজরাণী হও!”

কৃষ্ণার হাত কাঁপিয়া—বাকী জল শুদ্ধ গ্লাসটা ঠক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সে নিজেও সেই জলে ভেজা মাটির উপর অবসন্নবৎ বসিয়া পড়িয়া নিজের মুখখানাকে দুই হাতে ঢাকিয়া মাটির সঙ্গেই প্রায় মাথাটাকে এক করিয়া ফেলিল।—এতই অল্পে তুষ্ট এরা?—

“এই যে আমি কিডিং কাপ্ এনে,—‘কৈ, কোথায় গেলেন?—”

কৃষ্ণা খড়মড়িয়া উঠিয়া শশব্যস্তে নিজের সিকের শাড়ীরই একটা প্রান্ত টানিয়া লইয়া চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াই অশ্রুজলে ভেজা ক্ষীণস্বরে জবাব দিল, “জল আমি এখন খাইয়ে দিগেছি;—” তার পর ভাল করিয়া মুখ মুছিয়া মুখ ফিরাইবামাত্র তাহার নজর পড়িয়া গেল,—সুজন ভিন্ন আরও এক জন অপরিচিত লোকের দুইটি বিষয়াশ্চর্য্য সমুজ্জল চোখের উপরে। সে যে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত কার্য্যাবলীই খুঁটিয়া খুঁটিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে,—তাহা তাহারই সেই নির্দোষ চিন্তায় স্তব্ধমূর্ত্তিই বিশেষভাবে বলিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণার পদ-নখ হইতে মস্তকের কেশাগ্র অবধি লজ্জায় ও

বিরক্তিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তার সে সুস্পষ্ট মানসিক চাঞ্চল্য—এই একটা কোথাকার কে বাহিরের অচেনা লোক—এ কি হিসাবে নিতান্ত অভদ্রের মতই ইহার সাক্ষী হইতে আসিল! ছি ছি! সেই বা কি? মনে এতটুকু বল নাই? আত্ম-সংবরণের শক্তি তাহার এতই কম? সম্মুখে চাহিতেই সুজনের দৃষ্টির বিষয় অস্পষ্ট রহিল না। লজ্জায় প্রভাত-সূর্য্যের মত রক্ত ও তপ্ত মুখ নত করিয়া ইহাদের চোখের ভাষা হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া সে মুহূর্ত্ত নম্রকণ্ঠে সুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—“আপনি আমার জন্ত অনেক করলেন; কিন্তু আর একটা অনুরোধ—”

বাধা দিয়া সুজনও সসম্মানে উত্তর করিল, “আপনার জন্ত আর কি করলুম, এ তো আমারই ‘ডিউটি’। তবে যদি কিছু করবার থাকে, স্বচ্ছন্দে বলুন, যথাসাধ্যই চেষ্টা করবো।”

কৃষ্ণা মুখ আরও নত করিয়া তেমনি মুহূর্ত্তে কহিল, “এর যাতে ভাল ক'রে সেবা ও চিকিৎসা হয়, তার জন্ত কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না? অবশ্য আমি টাকা দিতে রাজী আছি।”

মুগ্ধ হইয়া গিয়া ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে শিক্ষানবীস ডাক্তার কহিয়া উঠিল, “টাকার দরকার হবে না, এমনিই এর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।” অশ্রুহলহল স্নেহভর দৃষ্টি দ্বারা ভাবার অতীত কথা প্রকাশ করিয়া—মাত্র এইটুকুই সে ফুটিয়া বলিল, “অনেক ধন্যবাদ!”

তার পর নত হইয়া একবার আহতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে নিম্নিত মনে হইতেই নিঃশব্দ-পদে সে নিকটকর্তী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, “আজ আমি যাই, আবার কাল সকালে আসবো।—”

যে ছেলোট এতক্ষণ ধরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সে এতই আশ্চর্য্য ও দিশাহারা হইয়াছিল যে, ইহারা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ তেমনি করিয়াই দাঁড়িয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মরণ যে মানুষের সঙ্গে কি হিসাবে কারবার করে, সে বোঝা বড় সহজ নয়। তবে পচা রুদি মালের কারবার যে সে করে না, এটুকু বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছে।

মেডিকেল-কলেজের এই সার্জিকাল ওয়ার্ডে আনাগোনা করিয়া কৃষ্ণা কয়েক দিনেই এ সম্বন্ধে বেশ একটুখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ফেলিল। সেই অহতা বুড়ীটা—নাম তার ‘নবার মা’—তা’ সে নবার মায়ের কঠিন প্রাণ তাহার দৈন্ত্যগ্রস্ত জরা-বার্দ্ধক্যময় দেহের মায়া ত্যাগই করিতে পারিল না, অথবা যমরাজের ঘরে এ সব অপ্রয়োজনীয় জীবনের মূলা এই সংসারেরই হিসাবে বেজায় সস্তা বলিয়াই হোক, মৃত্যু তাহাকে ধরি ধরি করিয়াও স্পর্শ করিল না, স্পর্শ করিল না বটে। কিন্তু বড় নিশ্চয় পরিহাস করিয়া গেল। অক্ষম ভিত্তারীর ছুটি চক্ষু-রত্নকে সে অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইল। প্রথম যে দিন এ সংবাদ কৃষ্ণা ডাক্তারের মুখে জানিতে পারিল, সে তাহার পক্ষে এক ভীষণ মুহূর্ত। সেইক্ষণে তাহার মনে হইল, কে যেন দুইটা তপ্ত শলাকা বিধিয়া তাহারই হটো চোখ চড় চড় করিয়া উপড়াইয়া আনি-তেছে। হুঁচোখে অন্ধকার দেখিয়া সে টলিয়া পড়ি-তেছিল; ডাক্তার হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।—

বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই, সে আপনাকে সামলাইয়া লইবার বিপুল উত্তমের সহিত লজ্জা-কুণ্ঠিতমুখে জবাবদিহির ভাবে কহিল, “মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল। থাক, ব্যস্ত হবেন না, সেরে গেছে।” এই বলিয়া নিজের দুই কম্পিত পায়ে অবাধ্যতা জোর করিয়া রোধ-চেষ্ঠার সহিত, কম্পিত-কণ্ঠকে স্বাভাবিক করিতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, “আচ্ছা, চিকিৎসা ক’রে ওর চোখ আরাম করা যায় না?”

ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন, “না—”

“যদি খুব অনেক দিন ধ’রে বিশেষ ষড় নেওয়া হয়?”

ডাক্তার নিশ্চিত বিশ্বাসে উদাস-কণ্ঠে জবাব দিলেন, “কোন রকমেই না। চোখের ভিতরকার দু’একটি নার্ড রাপচার হয়ে গেছে। অন্ধ না হয়ে উপায় নাই।”

অন্ধ-ব্যক্ত বিলাপের মতই কৃষ্ণার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, “এর চেয়ে যে ওর মৃত্যুও ভাল ছিল!”

ডাক্তার কহিলেন, “তা’ বৈ কি! শুন্ছিলুম, ভিক্ষাই ওর জীবিকা।”

কৃষ্ণা কাতরস্বরে কহিল, “ওর যে কেউ নেই।—”

ডাক্তার কহিলেন, “সত্যি! তবে তো বড্ডই—”

একটি নূতন রোগী লইয়া কয়েক জন কুলী

আসিয়া খবর দিল। ডাক্তার উহাদের ধমক দিয়া বলিলেন, “যা, যা, উপরে নির্যেঁষা, ছেলেরা দেখবে এখন, আজকাল মোটরে-কাটা আর ট্রামে-চাপার শেষ নেই দেখছি! ‘এপিডেমিকে’ এত লোক মরে কি না মরে!”

সে দিন নবার মা’র ঘরে ঢুকিতে কৃষ্ণার পা যেন অধিকতর বাধিয়া যাইতেছিল। একেই তো উহার সান্নিধ্য তাহার মনের উপর বিশ মণ পাষণ-ভার চাপাইয়া রাখে; তার উপর—আজ যখন তাহার ‘মরার বাড়া’ পরিণামের কথা সে মনে পাইল, তখনই অপ্রতিবিদ্যে অপরাধের সঙ্কোচে মন তাহার যেন এতটুকু হইয়া গেল।

ঘরে পা দিতেই একজোড়া উজ্জল ও উৎসুক নেত্র তাহাকে যেন নীরব অভিনন্দন জানাইয়া দিল। এ চোখ-জোড়া তাহার চেনা;—যতই অশ্রুমনস্ক থাক, এ দৃষ্টিকে আজ তাহার বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে করিতে বাধা পড়িল না। এ বাহাকে সে দিন-তিনেক আগে প্রথম আসার দিনে এই ঘরেই দেখিয়াছিল, সেই।

লোকটি বোধ করি নবার মা’র সঙ্গেই কি কথা কহিতেছিল, বোধ করি, তাহার গৃহ-প্রবেশের জুতার শব্দেই মুখ তুলিয়া চোখের দৃষ্টি দ্বারের দিকেই ফিরাইয়াছিল। এখন তাহাকে সঙ্কুচিত দেখিয়া নিজে সে একটু সরিয়া গেল, কিন্তু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল না। চলিয়া তো গেলই না এবং শীঘ্র যাইবে, তাহাও বোধ হইল না, অগত্যা কৃষ্ণা তাহার সান্নিধ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই বুড়ীর বিছানার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

“কেমন আছ?”

এ ঘরে আর দু’খানা খাট ভর্তি হইয়াছিল। একটা রোগী আচম্কা চীৎকার করিয়া উঠিল,— “জল! জল! জল!”

“শীগগির একটু জল দাও গো—”

নবার মা মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, “আরে মলো! এখানে কি তোর মা-বোন্ জলপাতর ভ’রে নিয়ে ব’সে আছে না কি, যে, অত জোর তাগিদ দিচ্চিস?”

কৃষ্ণা আজ অকম্পিত-হস্তে নবার মা’র জন্ত রক্তিত জল সেই ময়লা কাপড়-পর্যাপ্ত অপরিচিত লোকটির বিছানায় গিয়া বসিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল, “হাঁ কর, আমি জল এনেছি! আরও চাই?”

“আর না, আঃ! কে গা তুমি? জল

দিয়ে বাঁচালে? হাঁসপাতালে এমন যত্ন করে কথাই বা কে কার সঙ্গে 'কর'?"

কৃষ্ণার মুখ আনন্দের উচ্ছ্বাসে গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। এই যে কয়টি প্রশংসার বাণী সে এক জন অতি সাধারণ লোকের মুখ হইতে শুনিল, পূর্বে স্বয়ং লাট সাহেবের নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়া অনেক মহারাজ ও বড় বড় সাহেব-সুবার মুখে শুনিয়াও ইহার মত সুখ তাহার কখনও ঘেন হয় নাই। উত্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, আর এক জনের উপস্থিতি স্বরণ করিয়া নিরুত্তরেই রহিয়া গেল।

“খিষ্টানী-বিবি! বলি ও মা খিষ্টানী-বিবি! হ্যাঁ গা মা, আমার কথা শুন্তে পাচ্চো? বলি, কত দিনে আমার চোখের বাঁধন ওরা খুলে দেবে, বলতে পার কিছু? আঁধারে থেকে যে প্রাণ হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি, দিনে, রাত্রে, ক’দিনে এই ‘কাণা-মাটি’ খেলার থেকে রেহাই পাব গা মা?”

কৃষ্ণা তাহার আহ্বানে কাছে আসিয়াছিল, প্রশ্ন শুনিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ দিয়া তাহার একটিও কথা বাহির হইল না। এই যে অন্ধকার হইতে মুক্তি পাওয়ার একান্ত ব্যাকুল অধীরতা, এর উত্তরে সে কি তাহাকে জানাইবে যে, সে আলো—সেই উদ্বেগ-প্রতীক্ষিত আলোকের রশ্মি এ জীবনে আর কখনই সে দেখিতে পাইবে না।—এ কথা কি বলা যায়?—আর তাহারই মুখ দিয়া ইহা বাহির করিতে হইবে?—

কিছুক্ষণ উত্তরের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া বড়ী আত্মগতই সমাধান করিয়া লইল, “ও মা, মিথ্যা”কে মর্চি! মাগী বুঝি চ’লে গেছে! হবে। তুমি বাই হোক, মাগীটা লোক ভাল! তবে বয়েস বোধ হয় উটকো হবে; নইলে যেমন তড়বড়িয়ে আসা, তেমনি হুড়মুড়িয়ে বাওয়া! একটু যে ব’সে দুটো সুখ-দুঃখের কথা শুন্বে কান দিয়ে, সেটি নেই! যা’ হোক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে তো তেড়ে মারতে আসে,—বলে, ‘তা’তে তোর দরকার কি? তুই চুপ্ করে থাক না।’ ও মাঃ! বলে কি? আমার যদি দরকার নেই তো কি আমার চোখে তোর দরকার? আ খেলে যা! মাগী হাজারই হোক মেয়ে-মানুষ তো, গোয়ার মতন মেজাজখানা নয়, ভাল করে জেনে নিতুম!”

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মতন নিঃশব্দে

কৃষ্ণা বাহির হইয়া গেল এবং বারান্দার রেলিং ধরিয়া শূন্ত-চক্ষে চাহিয়া তরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উঃ! একটা অস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়া কত পাপই না তাহাকে করিতে হইতেছে! এই মিথ্যা, এই প্রতারণা—এ অন্ধ বলিয়াই তো সে অনায়াসে উহার সহিত করিতে পারিল? আর সে অন্ধত্বপ্রাপ্তি আজ তাহার কাহাদের জন্ত?—আচ্ছা, এই জন্তই কি ভগবান তাহার পিতাকেও অন্ধ দান করিতে উত্তত হইয়াছেন? তাহার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। হয় তো তাই, হয় তো তাহাদের দ্বারা এই রকম ঘটনা ঘটিবে বলিয়াই পূর্ক হইতে ইহার বিচার ও দণ্ডও—নির্দিষ্ট হইয়া তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে।—হয় তো জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল কার্যেরই প্রত্যেক ছোট-বড় খুঁটি-নাটি, সকল অস্ত্র, তা’ সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, সকলেরই জন্ত এমনই কত শত কঠিন, কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থাও সেই অবিচ্ছিন্ন ত্রায়-বিচারকের বিচার-সভায় কবে হইতে স্থিরীকৃত হইয়া আছে। হয় তো একটার পর একটা—হয় তো একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াই বা তাহারা অকস্মাৎ তাহার মাথার উপর কোন সময় অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উঃ!

“মিস্ মল্লিক!”—

চকিতে মুখ ফিরাইয়া সমস্ত হরিণের মত ব্যাকুল দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতেই সেই আধেক-চেনা মুখখানা পুনশ্চ চোখে পড়িয়া গেল। ইহার কথাটা এতক্ষণ তাহার স্বরণই ছিল না!

“মিস্ মল্লিক! আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাহিতে এসেছি। পারবেন কি আমার মার্জনা করতে? ভাল করে না জেনে কোন খোঁজ খবর না নিয়েই শুধু অপর লোকের মুখে শোনা গুজব থেকে, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম এবং সে ভুল যে আমি নিজের মনের মধ্যে আপনি না রেখে, সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি—আমার অপরাধ এইখানেই সম্পূর্ণরূপে অমার্জনীয়।”

কৃষ্ণার প্রথমোদিত বিশ্বয় এইবার নিশ্চিত ধারণার অসংশয়ে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেই গভীর বিবেকে তাহার সারা চিত্ত ঘেন এক নিমেষেই ভরিয়া উঠিল। তাই বটে!—সে-ই বটে! এই জন্তই প্রথম-দর্শনাবধি—ইহার মুখ তাহার চেনা-চেনা বোধ হইয়াছিল।—কিন্তু মুখের চেয়ে কণ্ঠ, —এ তো আর তুলিয়া বাইবার জিনিস নয়,

অগ্নি-তপ্ত শলাকার মতই যে উহা তাহার দুই কানের ভিতর দিয়া অহোরাত্রই তাহার প্রাণের মধ্যে বিঁধিয়া রহিয়াছে। ঐ কণ্ঠের উদ্ভূত স্বরে সেই নির্ঘাত অপমানের প্রত্যেক কুখাটি প্রতি আঙনের টুকরার মত তাহার বুকখানাকে যে ছাই করিয়া দিল। সে দিনের সেই বক্তৃতা কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নামোল্লেখ না থাকিলেও সে দিনে সেখানে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ-গণের কল্যাণে এ লইয়া তাহার পশ্চাতে অনেক হাসি-রঙ্গও যেন চলিতেছে, আবার উহাদেরই কুপায় সে সংবাদটাও তাহার কাছে উহা নাই,— তবে কেমন করিয়া সে ভুলিবে? আঙনে তাতিলে সোনার যে রং হয়, তাহারও মুখ তেমনি টকটকে লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধে অধীর হইয়া কম্পিত-অধরে খুব কঠিন করিয়া কিছু বলিতে গিয়া সে শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে সমর্থ হইল—“বেশ করেছেন, বলেছেন! আপনারা পুরুষদের কিছু পারেন না, কাজেই যাদের পারা সহজ, তাদের সঙ্গে না লাগলে আর কা’দের সঙ্গে লাগতে বাবেন? তার আর মার্জনা কিসের?”

ছেলেটি বেজায় অপ্রতিভ হইয়া রহিল এবং পরে লজ্জিত ধীরকণ্ঠে কহিল,—“আমি তো প্রথমেই বলেছি, আমি ভুল করেছি। সে দিন আপনাদের নর-হত্যার পর অনায়াসেই আমোদে মাত্তে দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেছলো। সেই সময়েই একটি লোক আরও একটি কঠিন মন্তব্য করলে, এখন আমি সে সম্বন্ধেও আমার ভুল জানতে পেরেছি। হঠাৎ সেটা বিশ্বাস করাও আমার খুবই অজ্ঞায় হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি—কা’কে আমি কি মনে করে কত বড় অপমান করে ফেলেছি! সে জ্ঞাত আমি যে কি পর্যন্ত অনু-তপ্ত, তা’ বলতে পারিনে। যা’ করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাও আমি করতে রাজী আছি।”

কিন্তু তার আহত অন্তরের তীব্র দাহজ্বালা এই একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণকারী অপরাধীর সন্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ও অনুতপ্ত মুখভাবে প্রশমিত হইয়া আসিল। তথাপি এ তো তাহার গোপন লজ্জা নয়; সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত, সমালোচিত—হয় তো কত লঘুচেতার দ্বারায় উপহাসিত সেই ক্রীক-বিদ্রূপের কথা।

দাগ কি নিশ্চিহ্ন হইয়া

নিরুৎসাহভাবে কা- হয়ে গেছে, তার প্রা- করবেন? সে হয় না।”

ছেলেটি কথার উপর আগ্রহের সহিত কহিয়া উঠিল, আমি ‘পাবলিকের’ সামনে অধ- ছাপিয়ে আমার ভুল স্বীকার কা- প্রকাশ্যভাবেই আপনার ক্ষমা চাই?”

উহার মুখে ও কণ্ঠে, সরল সত্যের দী- সহিত নির্ভীক তেজস্বিতা ব্যক্ত হইয়া উঠিল। এ ব্যক্তি যাহা করে, অন্তরের সহিতই করে, গুণেটুকু উচিত বোধ করে, তাহাতে সে কোনরূপেই কুণ্ঠিত নয়; এই পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণার মনের বিধিষ্টভাবও বহু পরিমাণেই পরিবর্তিত হইয়া তাহার স্থলে যেন একটুখানি সশ্রদ্ধভাবও দেখা দিতে লাগিল।—সে-ও একটু ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, “না, না, অমন কাজ করবেন না। আমার নাম নিয়ে কোন রকম আলোচনাই আমার সহ্য হয় না। ওতেও আর একবার ওই সব পুরনো কথার আন্দোলন হবার সুযোগ দেওয়া হবে।”

ছেলেটি তখন যেন কতকটা হতাশ হইয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলিল, “তবে আর আমি কি করতে পারি বলুন?” তার পর আবার বলিল, “কিন্তু আমি নিজে বড়ই অনুতপ্ত হয়েছি, এটা আপনি অবশ্য বিশ্বাস না করলেও আপনাকে আমি দোষ দিতে পারিনে,—কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য।”

কৃষ্ণা এ কথাটা একটুও অবিশ্বাস করিল না, করিবার উপায় ছিল না, সে মুখে ও কণ্ঠে কৃত্রিমতার সংশয় অতি বড় সংশয়ান্বিত করিতে পারে না।

হুজনে একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর এবার কৃষ্ণা নিজেই প্রথমে কথা কহিল, ক্ষুণ্ণস্বরে সে কহিল, “ডাক্তার বলেচেন, নবার মা একেবারেই—”

—“হ্যাঁ, অন্ধ হয়ে যাবে।”

“আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে—আপনিও এ কথা তা’ হ’লে জানেন? ডাক্তার আপনাকেও ওই কথাই বলেচেন?” কৃষ্ণার কণ্ঠে বিষম ধ্বনিত

৥ দেবীর গ্রন্থাবলী

জন, আর
ওর ছ'চোখেরই

প্রায় আত্মগতই কহিল,
এক জন ডাক্তার।”

কহিয়া উঠিল, “না, আমি
এখানেই এক জন ‘এক ষ্টুডেন্ট’
সর পড়েছিলাম।”

৪-২-স-র!—তবু ডাক্তার নন!—সে
না।”

ছেলেটি হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, “অর্থাৎ
কাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগের মাসেই কলেজ
ছেড়ে দেওয়া গেছিলো, তাই ডাক্তারীর কোন
ডিপ্লোমা পাওয়া যায় নি।”

কৃষ্ণা এই অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটির পরিচয়ে
ক্রমেই কৌতূহলী হইয়া পড়িতেছিল, সে আবার
সামর্থ্যেই প্রশ্ন করিল, “তাতে কি লাভ হলো?”

সে উত্তর করিল, “হলো ১১ কি! ডাক্তারীর
ডিপ্লোমা না থাকলে সরকারী বা বেসরকারী কোন
রকমের চাকরী করবার সুযোগ পাওয়া যাবে না,
অথবা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে গেলেও
ডিপ্লোমা-হীন ডাক্তারকে লোকে ভিজিট দিয়ে
ডাকবে না, লাভ এইটুকুই হবে।”

বিশ্ময় যেন সীমাতিক্রম করিতেছিল। কৃষ্ণা
যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গিয়াই গভীর কৌতূহলের
সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “লোকে ভিজিট দিয়ে
ডাকবেই না যদি, তা হ'লে ডাক্তারী শিখে কি
হলো?”

ছেলেটি তাজ্জীল্যভাবে উত্তর করিল, “ধারা
ভিজিট না দিয়েও ডাকবে, তাদের জন্তু শেখা গেল।
তার সংখ্যাও তো কম নয়।”

কৃষ্ণা অবাক হইয়া তাহার নির্লিপ্তবৎ শান্ত
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুহূ-মুহূ যেন আত্ম-
গতই কহিল, “ও, আই সি!—আচ্ছা, আপনি
কি সেই জন্তুই এখানে আসেন? আমার মনে
হচ্ছিল, আমার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করাই
আপনার উদ্দেশ্য।”

ছেলেটির মুখে প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তেজনা এক
মুহূর্তে অলস হইয়া দেখা দিয়াই পরক্ষণে যেন ঝটিকা-
প্রহত দীপ-শিখার মতই নিমিষে নির্বাপিত হইয়া
গেল। সে শুধু অত্যন্ত অবজ্ঞার ভাবেই জবাব
দিয়া, “আমার ততদূর ধৈর্য্য ও সময় থাকলে, আজ
সে দিক্কার জন্তু আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে

আসতে হতো না।”—তার পর সম্পূর্ণরূপেই আপ-
নার উপরে জয়লাভ করিয়া লইয়া দিব্য হাসিমুখে
পুনশ্চ কহিল, “তা' নয়, এইখানেই তো পড়ে গেছি।
এর সব খবরই আমার তো জানা আছে।
গরীবদের উপর পৃথিবীর সর্বত্রই সমান আদর হয়ে
থাকে। এই যে সার্জিক্যাল ‘ওয়ার্ড’ দেখছেন, এখানে
অ্যাক্সিডেন্টের পেসেন্ট এলে, সর্বত্রই যেমন—
সহজে ডাক্তারের নাগালই তারা পায় না। কুলীরা
ছাত্রদের খবর দিয়ে গেল, এখন ছাত্রেরা যদি ছদ্ম-
বান্ বা কর্তব্যপরায়ণ না হন, তা হ'লেই রোগীটি
হয় তো প'ড়ে প'ড়ে ম'রেই গেল।—অবশ্য যারা
মুখু। আর যাদের প্রতীক্ষা নয়, তারা যথাকালের
জন্তু অপেক্ষা ক'রে তো থাকতেই পারে। তাই সন্ধ্যা-
সকালে এক-আধবার এসে ওই রকম হতভাগা-
গুলোর এক-আধটুকু খবর নিয়েও যাই আর বেড়িয়েও
যাই। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি, আর এক
জায়গায় যেতে হবে। আপনি তা হলে আমার ক্ষমা
করতে পারবেন, কেমন? যদিও পারাটা হয় তো
খুবই কঠিন, আমি হলে বোধ করি পারতুমই না।”

ছেলেটির কথা বলার ধরণে ও সরলতায় কৃষ্ণার
মনের রাগ-দুঃখ যে কোন্ সময়ে কোথায় ভাসিয়া
চলিয়া গিয়াছিল, সে খবর সে জানিতেও পারে
নাই। এখন পূর্ব-কথার উল্লেখে সে কথা মনে
পড়িতেই সে যেন এক অপূর্ব বিষয়ে অবাক
হইয়া গিয়া ভাবিল, ইহার উপর আবার রাগ করিবে
কি? ক্ষমা না করিবার তো কোন উপায়ই
এখানে নাই?—প্রকাণ্ডে ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া
প্রীতি-মধুর কণ্ঠে উত্তর দিল,—“বেশ, তাই হবে।
আচ্ছা, আপনি কি এনাকিষ্ট?”—প্রশ্ন করিয়াই
সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।—কেহ
নাই। শুধু একটা ভূত এনামেলের একটা বড়
গামলা ভরিয়া ধোঁয়া-ওঠা গরম জল লইয়া বারান্দার
শেষপ্রান্তে আর একটা ঘরে ঢুকিয়া গেল।

প্রশ্ন শুনিয়াই কিন্তু ছেলেটির মুখের ভাব একে-
বারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখের
কোণে ও অধরপার্শ্বে যেন কৌতূকের সহস্র উৎস
কেবলমাত্র একটুখানি ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া
আছে—এমনি বিজ্ঞপ হাসির আভাস চক্ৰমকে
তাহার চেহারাটাকে দেখাইল। কিন্তু সে উদ্যম
হাস্ত-শ্রোতকে জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া
সে মাত্র মুহূ-হাস্তের সহিত সকৌতুক প্রশ্ন করিল,
“এনাকিষ্ট আপনি কাকে বলেন?”

সলজ্জার কৃষ্ণা জবাব দিল, “রাজা এবং

রাজ্যের ব্যাধি উচ্ছেদ-কামনা করে। প্রগতি যে সম্ভব হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিবার অর্ধ-নিমেষমাত্র পরেই সে বুদ্ধিতে পারিয়া নিরতিশয় লজ্জা পূর্বেই পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিপুল হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসিত এবার আর হাসিল না, বরং সহসা উদ্ভিত গাভীর মতো নিজের স্বকুমার মুখকান্তি গাভীরামের করিয়া তুলিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষের প্রাঙ্গণে উত্তরে এই জবাব দিল, “রাজার তো নয়ই; রাজ্যেরও উচ্ছেদ-কামনা বা তদ্বিবরক কার্যো আমরা লিপ্ত নহি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, “স্বরাজ” লাভ। আর তার জন্য অন্তঃসত্ত্ব নয়; এমন কি, বিবাদ-কলহ পর্যন্ত নিরপেক্ষতামাত্র আমরা অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। একে যদি ‘এনার্কীজম্’ বা রাজদ্রোহী’ বলেন, বলতে পারেন।”

কক্ষা এই স্পষ্টবাদী ও তেজী ছেলেটির প্রতি-বাক্যে ও প্রত্যেক ব্যবহারে তাহার অন্তঃসত্ত্ব ত্যাগ ও নির্ভীকতার মহত্ত্বের পরিচয়ে নিজেকে ইহার কাছে অত্যন্তই লম্বা ও হীন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। সে তাহার সম্বন্ধে যে অবিচার করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে—তার জন্য অপকটে অসঙ্কোচে সে এই অপরিচিতার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিতেও বিধামাত্র করে নাই; কিন্তু বাস্তবিকই কি সে দিন সেই যে কথাগুলো সে উত্তেজনার মুখে বলিয়াছিল, সেগুলো একেবারেই মিথ্যা! ভিত্তিহীন? কেমন করিয়া সে কথা বলা চলে? উহার সে দিনকার কোন কথাটা মিথ্যা? এই একটা পাপের না হয় সে সামান্য প্রায়শ্চিত্তই করিতে আসিয়াছিল। তাও সেই তীক্ষ্ণ স্মরণে না বিধিলে কি এতটাই করিত? আর কবে সে গাভীর জন্য এতখানি করিতে সমর্থ হইয়াছে? কবে? কখনও না! তবে?—কিসের এ মিথ্যা গোরব? কিসের অহঙ্কারে এই ত্যাগদীপ্ত অন্তরের সুপবিত্র অমৃত্যু সে অবহেলার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? সে তো এ বস্তু পাওয়ার যোগাই নয়।

এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মুখের ভাব-টাকে সহজ ও প্রকৃত দেখাইবার চেষ্টা করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—“তা হ’লে আপনাকেও আমি তুল বুঝে আপনার ‘পরে’ অবিচার করেছি।—যাক, হৃদয়কারই অত্যাচার শোধ-বোধ হয়ে গেল, এবার থেকে আমাদের মধ্যে—” বলিতে বলিতে নিজের মনের উত্তেজনাকে নিজেরই কাছে হেঁয়ালির

এম (ক)—১৭

মত ঠেকিয়া ধাইতেই সে মনে মনে জিব্ কাটিয়া নীরব হইয়া গেল; কিন্তু ততক্ষণে অপরপক্ষ ঠিক তেমনি উৎসাহিত আনন্দে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া অসমাপ্ত পদ পূরণ করিয়া দিয়াছে,—“বন্ধু-স্থাপন হয়ে গেল,—কেমন?”

তখন কোনমতে নিজের অন্তঃসত্ত্ব অস্থিরতা গোপন করিয়া নত-চক্ষে কক্ষা উত্তর দিল, “হঁ।” তার পর ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে হৃৎকপি পা চলিতে আরম্ভ করিয়াই বারেক ধমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও মুখ না ফিরাইয়াই যত্ন-কুণ্ঠিতবচনে জিজ্ঞাসা করিল, “কি বললে আপনার খোঁজ পাব? এই ধরুন, যদি আপনার কোন ‘স্পীচ’ই শুন্তে গেলুম।—”

উহার কণ্ঠে বিদ্রূপের স্বর লুকান ছিল না, কিন্তু সেই সন্দেহ যুবার গোর-গ্রীবা ঈষৎ রঞ্জিত করিয়া দিল। সে উত্তর দিল,—আমার নাম বিনয়-কুমার শীল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিয়া জগদ্ধাত্রী ইষ্টদেবতা ইত্যাদির নাম স্মরণ করিতে-ছিলেন, এমন সময় তাঁহার কানে একখানা ভাড়া-টীয়া গাড়ীর খন্খনে আওয়াজ এবং সদর-দেউড়ীতে সেখানা খামার শব্দ একসঙ্গে প্রবেশ করিল। এত সকালে কে আসিল? এই কথা মনে করিতেই মনটা উৎসুক হইয়া ‘অহল্যা, দ্রোপদী, কুন্তী’—প্রভৃতির পুরাণ-গাথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া খুব আধুনিক একটি মেয়েকেই স্মরণ-পথে টানিয়া আনিয়া এবং জিহ্বামূলেও তাহারই নামটা ঠেলিয়া পাঠাইল,—“বোমা! দেখ তো গা, গাড়ী ক’রে কে এলো?”

ঠিক পাশের ঘরেই দেওয়ালে লাগান কাঠের আন্লা হইতে একখানা লালপেড়ে গরদের শাড়ী টানিয়া লইয়া বোমা ‘উজ্জ্বলা’ তখন নীচে নামি-বার উদ্দেশ্যে ব্যাপ্তা ছিল; শাড়ীর হুকুমেও বটে এবং নিজের কোতুলেও বটে, কাপড়-গামছা ছুঁড়িয়া ভূমে ফেলিয়া কে আসিল দেখিবার জন্য উর্দ্ধ্বাসে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়া দিল। গাড়ীখানা ইতোমধ্যে গাড়ী-বারান্দার ভিতরে ঢুকিয়া পড়ায় উপর হইতে দেখিতে পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চটাপট চটাপট চটজুতার শব্দ শোনা গেল।
—উন্মিল্লা নিজের গতিবেগ সংযত করিয়া ফেলিয়া ভদ্রভাবে মাথার কাপড় তুলিয়া ঢাকা দিল এবং আত্মগতই কহিল, “নিশ্চই ঠাকুর-মশাই! তা’ আজ এলেন কেন? সরস্বতী পূজোর তো এখন সাত-আট দিন দেবী আছে!—এতদিন ধ’রে ব’সে ব’সে কেবলই সকল তা’তেই খুঁৎ ধ’রে খিটমিট করতে থাকবেন। বাবা রে বাবা!”

পায়ের চলনটাকে বৃদ্ধ ও স্থলদেহধারী ‘ঠাকুর-মশাই’এর চলন নহে বলিয়া সন্দেহ জাগিতেই যেমনি নবজাত কোতুহলে তিনটা সিঁড়ি টপকাইয়া সে একেবারে ধুপুস্ করিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, অমনি সেই চটজুতার অধিকারীটির সহিত তাহার চোখে চোখে মিলন ঘটিয়া গেল।—

“হরিবোল হরি! তুমি! এই শীতকালের ভোরের বেলায় চটজুতো পায়ে দিয়ে! বাবা রে বাবা! এ আবার কি খেয়াল চেপেচে ঘাড়ে শুনি?”

আগন্তুক এই খেয়াল-চাপার ইতিবৃত্ত শুনাইবার কোন উত্তোগ না দেখাইয়া ভদ্রভাবে এই প্রশ্ন করিল, “ভাল আছিন্ তো বাদরি?”

উন্মিল্লা ঠোট ফুলাইয়া—“বাঃ-ও! চিরকাল ধরেই কি আমার তুমি ঐ সবই বলবে না কি?”

বিনয়কুমার নোপানারোহণ-চেঁচায় সিঁড়ির একজোড়া ধাপ বাদ দিয়া একেবারে তৃতীয় পৈঠায় লম্বা ঠাং তুলিয়া খুব নিকটস্থিত উন্মিল্লার বাম-গণ্ডে নিজের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা একটা টোকা মারিয়া ভেঙ্‌চাইয়া বলিল, “নাঃ, ঠুকে এখন থেকে মুরজাঁহাবেগম অথবা রাজ্য ক্রিওপেট্রা ব’লে ডাকতে হবে।”

কোন ‘মুরজাঁহা’র সম্বন্ধে যদি বা ঈষৎ একটুখানি জানাও থাকে, ‘ক্রিওপেট্রা রাণী’র বিষয়ে উন্মিল্লার কোন খবরই জানা ছিল না, কাজেই সেই ছই নামে তাহাকে ডাকা সম্বন্ধে সে বেশ স্পষ্ট করিয়া আপত্তি বা নিরাপত্তি জানাইতে সমর্থ হইল না, শুধু একটুখানি অপ্রতভ ‘হবো হবো’ করিয়া সবেগে মস্তবড় গোঁপা-গুন্ধ মাথাটাকে নাড়া দিয়া সজোরে কহিয়া উঠিল, “ধেং। ওসব তোমাকে কে বলতে বলচে? তা ব’লে ঐ ছাড়া আর যেন কিছু বলবার কথা বিশ্ব সংসারে নেই।”

বিনয় সিঁড়ি-ওঠা বন্ধ রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, কৃত্রিম গাভীরোঁ মুখ ভারী করিয়া

জবাব দিল,—“হঁ-উ”, তা আবার :নেই! বিশ্ব-সংসারে বলবার এত কথা আছে যে, সে শুন্তে গেলে এক বিষয় মুদিল বেধে যাবে। আচ্ছা, ছই একটা শুন্বি? তবে বলি শোন, এক রাফুসী, ছই পেত্নী, তিন হুমানী, চার—”

উন্মিল্লা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া স্বরিত-হস্তে বিনয়ের মুখ চাপিয়া ধরিতে গেল, মুখখানা ফুগাইয়া ভীষণরূপে চাকের মতন করিয়া বলিয়া উঠিল,—“বাও, বাও, আর তোমায় বলতে হবে না। খবরদার বল্চি, আমার তুমি যদি কোব নাম ধ’রে ডাকবে তো আমিও কেটে ফেল্লে তোমায় জবাব দেব না, তা’ ব’লে দিচ্চি।”—

বিনয় মুখের উপর চাপা দেওয়া হাতখানা মুঠায় চাপিয়া রাখিয়া সকৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, “বেশ, তাই সই! আমি তা’ হ’লে তোকে এবার থেকে ‘বিনামা’ ব’লে ডাকবো, কেমন রাজী?”

নামটির ভিতরকার নিহিতার্থটা উন্মিল্লার জানা ছিল না। কাজে কাজেই সে বেচারী মন্দের ভাল হিসাবে, মনে মনে ইহাতেই অর্কসম্মতগোছ হইয়া অবগু বাহিরে ঘাড় বাঁকাইয়া জোড়া ভুরুর গুণ উর্দ্ধে চড়াইয়া হাসি-মাখা সোহাগে-ভরা চোখের তারার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শর ক্ষেপণ করিয়া আব্দারে পলিয়া পড়িয়া বলিল, “বাঃ-ও! আমার নাম কি নেই, যে আমার বিনামা ব’লে ডাকবে? উন্মিল্লা না বলতে পারো, তবু ‘উমি’ বললেও তো চলে। তোমার শুধু আমাকে জালাবার ফন্দি বই তো নয়!—”

বিনয় এই দীর্ঘ বক্তৃতার বিনিময়ে তাহার গোলাল মুখের ছোট নখটি ধরিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিয়া ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ ইতি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় উপরের সেই ঘরটার মধ্য হইতে ডাক শোনা গেল।—

“বোমা! বলি বোমা! কই, কে এলো রে? গাড়ী ক’রে কে এলো? ওরে, ও উন্মিল্লা?”

“ঐ রে! একেবারে সব ভুলে গেছি! ওমা! মা! আচ্ছা, আমি কাছে গিয়ে বল্চি। বেশ তো তুমি মজার লোক! চুপ্টে ক’রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ছদ্মশা দেখে হাস্‌চো! মা’কে নিজে তো ডেকে বল্লেই পার্‌তে যে, আমি এসেছি!”—

বিনয় বলিল, “আমায় তো মা জিজ্ঞেস করেনি

যে আমি বলতে বাবো। তুমিও তো বললেই পারতে যে, 'বিনয় এসেছে।'

“আহা ম'রে যাই, কি কথাই ছিরি!”—
ঠোট বাঁকাইয়া, জ্র কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর দিকে একটা কিল উচাইয়া দেখাইল,—তার পর সে দ্রুতপদে শাণ্ডীকে খবর দিবার উদ্দেশ্যেই কোনদলে খামা-চাপা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বিনয়ও তাহার পিছনে উঠিতে উঠিতে দূর হইতেই ডাক দিল,—“মা!”

জগদ্ধাত্রী ততক্ষণে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, আস্তে-বাস্তে কাছে আসিতে আসিতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, “কে রে, আমার বিনয় এলি!”

বিনয় পাঁচ বৎসরেরও কিছু বেশী কাল কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছে। এই দীর্ঘকালমধ্যে খুব অল্প সময়ই সে নিজের বাড়ীতে থাকিতে পাইয়াছিল, ডাক্তারী পড়ায় ছুটী কম, কামাই চলে না, তারও উপর কলিকাতার নানান হজুগে মাতিয়া ঘরের কথা তাহার মনে বড় কমই পড়িত। প্রথম ছ'এক বৎসর ছুটী-ছাটায় আসা-যাওয়া ছিল, ক্রমে পড়ার চাপ বাড়িল, অবসর বড়ই কম। পড়ায় ছেলের এতটা মন হইয়াছে দেখিয়া বাপ-মাও বড় বেশী জিদ দেখাইতেন না। তার পর বিপিন শীলের মৃত্যু হইল। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে মধ্যে মধ্যে ছ'এক দিনের জন্ত আসা যাওয়া তাহাকে বিষয়-কার্যব্যাপদেশে করিতেই হয়। বাপের কারবার সে উঠাইয়া দিয়াছে, তবে মায়ের খোঁজ-খবর ও খরচ-পত্রের লেনা-দেনার খাতিরেই যদৃচ্ছাক্রমে বাড়ী আসা অনিবাধ্য। নহিলে যখন হইতে সে পড়া শেষ করিয়া বিনা-ভিজিটের এবং বিনা-ডাকের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে তাহার সময়ই বা কোথায়, যে, সে বাড়ী আসিয়া বসিয়া থাকিবে? মাকে বুঝাইল, সে দেশের কাজ করিতেছে, এর মত পুণ্য আর কিছুতেই নাই। মা বুঝিবার জন্ত তো বসিয়া আছেন, উদ্টিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন। উন্মিলা ঠোট ফুলাইয়া বলিল, “বেশ তো দেশই যখন তোমার সব, তখন তাই কর।”

সেই দিনই বিনয়ের না কি ফিরিবার কথা। জগদ্ধাত্রী সে কথাটার বিরুদ্ধে এমনি কাতর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, অবশেষে ব্যস্ত হইয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “কি মুন্সিগ! তুমি মানুষের দরকার অ-দরকার বোঝ না! আচ্ছা বাবু, না হয় আজ না-ই যাব।

হ'একটা রোগী ম'রে যান, না হয় গেলই, তুমি তো এখন থামো। আমার মার বদলে না হয় তাদের মারাই কাঁড়ক।”

মা বলিলেন, “হু-মুখো ছেলের কথা শোন্ একবার?”

চোক মুছিয়া জগদ্ধাত্রী উঠিয়া গেলেন এবং ডাক পাড়িলেন, “বোমা! অ-বোমা!”

উন্মিলা পুতুলের জন্ত ছেঁড়া তাকড়া নীলবাড়ির জলে রঙ্গাইতেছিল, সেই মূর্তিতে ছুটিয়া আসিলে, হাসি চাপিয়া ফেলিয়া মুখ ভার দেখাইবার সচেष्ट আয়োজনের সহিত শাণ্ডী বলিলেন, “ঐ জন্তেই তো ছেলেটা ঘরবাসী হ'তে চায় না! তুই যদি একটু মানুষ হতিস্ উন্মিলা।”

উন্মিলা সাহস্কারে নথ-নাড়া দিয়া জবাব করিল, “কেন বাপু, কি আমার দোষটা?”

শাণ্ডী একটু বেজার হইয়া বলিলেন, “সে যদি তুমি দেখতেই পাবে, তা হ'লে আর আমার ভাবনাই বা কি? এতকাল পরে সোয়ামী ঘরে এলো, আর তুমি অত বড় সোমন্ত মেয়ে কোথায় সাজ-সজ্জা ক'রে তার কাছে কাছে থাকবে, যা'তে তোমার দিকে ওর টান হয়—তাই করবে, তা নয়, কোথায় বেরাল-ছানা নিয়ে, তাকরা ক'রে, কোথায় পুতুল নিয়ে নীল-বাদের সঙ্গে, কচি খুকির মতন বেড়াতে লাগলে।”

শাণ্ডীর মুখের এই একদেশদর্শী ভৎসনায় উন্মিলার মনটা কিছু তিক্ত হইয়া উঠিল। একেই নিজের ভিতরটা তাহার এই বিষয় লইয়া কিছু উদ্ভাজ হইয়াই ছিল,—তাই মৃদু-বাক্যে সে অন্তরের সেই স্তম্ভ অভিমান কতকটা ছড়াইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল,—“বাদের এনে ঘরে পুরে রেখেছ, বাদের না সঙ্গে আর সাজবো কি? কি ছাই জানি আমি? শিখিয়েছ কিছু?”

জগদ্ধাত্রী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, “অমন অধর্ম্যে কথা বলিস্নে উমি! তোকে শেখাবার জন্তে কম কিছু চেষ্টা করিচি? পাড়ার মেয়েদের কাছে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে গিয়ে পড়াবার জন্তে, উল বোনা, সেলাই ফোড়াই শেখাবার জন্তে কত দিন ধস্তাধস্তি করেচি, মনে ক'রে বল দেখি? তোর হড্‌করা ছাড়া ছনিয়া-সংসারে আর কিছুতেই মন বস্‌লো না, তা আমি কি করবো বল? এখন দেখছিস্‌ জো? পিটো-পিটির মতন খুনহুটি করলেই কি বামীকে খুদী

করা যায়? একটু বড় আঙুল কি করতে পারিসনে ছাই? মেয়েমানুষেই একটু গায়ে-পড়া হ'তে হয়। দেখছি তুমি, ও একটা আপনা-ভোলা পাগলা ছেলে।”

রাগ করিয়া উম্মিলা মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিয়া উঠিল, “কেন, তোমরা অত ছোট-বেলায় আমাদের বিয়ে দিয়েছিলে?” বলিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উম্মিলা নিজের সঙ্কটাবস্থা ইদানীং ক্রমেই একটু একটু করিয়া বৃদ্ধিতে পারিতেছিল। সম-বয়সীদের বরের চিঠি, তাদের ফিস্ ফিস্ করিয়া হাসি-চাহনির মধ্যেও সমবয়সী পরস্পরের সহিত গোপন কথা কওয়া, এ সব দেখিয়া হ্রস্ব লোভের আকর্ষণ পিপাসায় সে যেন উন্মুখ চাতকের মতই তাহারও ‘বরের’ তাহারও ‘প্রিয়ের’ প্রতীক্ষা করিত। আড়ালে বসিয়া শত্রু-শয়্যার গুইয়া সখীদের মুখের শোনা কথা-গুলি চুরী করিয়া এক একটা করিয়া বুনিয়া বুনিয়া সেগুলিকে লইয়া নানাভাবে নানারূপে সাজাইত। তাহাদের ইচ্ছামত ভাদিত গড়িত, আবার একত্র করিয়া মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার এই অশুকৃতির মতে নবীন কোন সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই তাহার ছিল না। সে তো নিজের অনুভূতি হইতে স্বামীর আদর, স্বামীর প্রেমামুরাগে পরিপূর্ণ তপ্তস্পর্শ, তাহার উন্মাদনার ভরা অজস্র সোহাগ-বাণীর কিছুই কখন অনুভব করে না। তার সকল কিছুই যে পরের কাছে ধার করা, সবই যে তার বুটা, মানিক তো তার গলার হারের নয়, পথের ধুলার কাচ কুড়াইয়াই তাহাকে খেলার সাধ মিটাইতে হইতেছে যে, তাই যখন-তখন দারুণ অতৃপ্তিতে চিত্ত তাহার ভরিয়া উঠে, প্রাণের মধ্যে বিপুল নিরানন্দতার সহিত একটা ব্যাকুল বেদনা অভিমানের তরঙ্গে সারা-মনঃপ্রাণকে আহত করিয়া থাকে। বাহিরের সংসার যেন তার তলায় পড়িয়া ধূসর ও ধুলি-মলিন হইয়া যায়।—অথচ যখন সুযোগ আসে, অর্থাৎ বিনয় কিম্বা বিনয়ের পত্র আসে, তখন আশৈশবের অভ্যাস-বশতঃ উম্মিলার মনোবীণার তারে তাহার

কিছুই বেসুরা বাজে না। বরং যদি কিছু উহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটয়া যায়, তা সে-ও তো উম্মিলা বারম্বার কল্পনা করিয়াও দেখিয়াছে, আরে ছিঃ!—সে আবার কেমন হইবে? যদি বিনয় তার চিঠিতে “উম্মি হুমানি!”—না লিখিয়া যেমন—“খোঁপার ফুলের” বর লক্ষীবাবু তার চিঠিতে লেখে, তেমনি করিয়া লেখে, “প্রিয়তমা উম্মিলা!” রাম বল! তার চাইতে বই পড়িলেই তো চুকিয়া যায়! আচ্ছা, সে দিন দত্ত-বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া সে যে আড়ি পাতিয়া তার মিতিনের বরের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনিয়া আসিয়াছে, বর বলিতেছে—‘আমি তোমায় যত ভালবাসি, তুমি কি তার অর্ধেকও বাসতে পারবে?’ আর বউ জবাব দিল, ‘আমার অর্ধেক তুমি বাসো কি না সন্দেহ!’—শুনাই তো উম্মিলার আক্কেল গুড়ুম! না বাবু,—বিনয়ের সঙ্গে কোন জন্মেও এই সব ভালবাসা-বাসির কথা সে তো তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেও কাঁহতে পারিবে না। ওরে বাবা, ও আবার কি রে বাপু?—তথাপি মনের মধ্যে যৌবনের দক্ষিণা-বাতাস শীতের কোয়াসা কাটাইয়া দিয়া বাহিতে থাকে, হাজার ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া উঠে; এবং মন একা একা নিরালস্য হইয়া কাঁদিতে থাকে। চিরপরিচিত জীবনের সমস্ত স্বাদই তিক্ত ও বিরস হইয়া যায়।

তাই আজ শাওড়ীর কাছে খোঁচা খাইয়া উম্মিলার নারীত্বের নবোন্মেষে অর্ধ-বিকসিত চিত্ত যেন নিজেকে ফুটাইবার জন্ত খুঁজিয়া পাইল বলিয়া অনুভব করিল। বিনয় আসবার পূর্বে সে যে সব গাড়িয়া সাজাইয়া রাখে; সে আসলেই সব-খানি তার উন্টাইয়া যায়। চিরাত্যস্ত রীতিতে জগদ্ধাত্রীর ভাষায় ‘পিঠোপটির’ মতই তখন তাহাদের মধ্যে খুঁটিনাটি ঝগড়া কলরবের কাকলী জাগিয়া উঠে ও তার পর বিনয় চলিয়া গেলে, কিছুদিন মনের সঙ্গে সুখও তাহার বেজায় অন্ধকার হইয়া থাকে। এই চিরন্তনীর আর কিছু বড় তফাৎ পড়ে না। তা এবারটায় জগদ্ধাত্রী যখন সময় থাকিতেই চেতাইয়া দিলেন, তখন মানসিক সঙ্কোচের উপর খুব কড়া রকম চোক রাখাইয়া দিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উম্মিলা-সুন্দরী আয়না পাড়িয়া সেই নীলমাথা-হাতেই চুল বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বিনয় বাড়ী আসিলে, তার সঙ্গে বেরাল-ছানা ধরিতে লাফাইয়া বেড়ানের ব্যস্ততার উক্ত কার্যটি প্রায়ই ঘটয়া উঠে না। কিন্তু আর

সে সব ছাব্লাগীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না,—তাহাকে জোর করিয়া লাগিতে হইবে।

প্রথমে যথারীতিতে সে নিরমমত চুল জাঁচড়াইয়া লইয়া সাদাসিদা খোঁপা বাঁধিল, তার পর আরসী দেখিয়া মায়ের সাজসজ্জা করার কথা স্মরণে আসিতেই দাঁতে জিব্ কাটিয়া টান দিয়া খোঁপা খুলিল এবং গন্ধতেল, ভিজা গামছা, গলান মোম ইত্যাদি জোঁগাড় করিয়া আনিয়া খুব ঘটা লাগাইয়া দিল।

বিনয় বাড়ী থাকিলে নিজের সেই ঘরখানিতেই সে শয়ন করিত। তাহার অবিদ্যমানে এ ঘর চাবি-বন্ধ থাকিত। উন্মিলা বড় একটা এ ঘর-খানায় ঢুকিত না, এর দুইটা কারণ ছিল।—এক তো বিনয়ের শত স্মৃতি-পূর্ণ তাহারই গৃহ, উন্মিলার চোখের জলের উৎসকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে বড়ই ওজর করিত। আর তা ভিন্ন এই সর্ব্বনেশে ঘর-খানার মধ্যে পা ঢুকাইতে গেলেই উন্মিলার বুকে ঢেঁকির ঘা মারিয়া বহুদিনের পুরাতন সেই একটি অবিস্মৃত শব্দ আজও তাহার মনের কানে হাঁকিয়া উঠে—বাধা দেয়—“খবরদার, ঘরে ঢুকেছ কি, ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি!—স্পাইকে আমার ঘরে ঢুকতে দিই নে।”

আজ সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাধাটাকেও মনের জোরে একপাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উন্মিলা একটা পানের ডিবা হাতে করিয়া নিশীথ অভিসারে তাহারই স্বামি-গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয় তখন সেই ঘরের সেই টেবিলটার ধারে একখানা চৌকিতে বসিয়া হাতের উপর কপাল রাখিয়া কি যেন একটা কঠিন বিষয়েরই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। ল্যাবেণ্ডারের খর-গন্ধ বা. অনেকগুলি ঝুরো-চুড়ির ঝিলিমিলি তার ধানের বর্ষে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।—তা থাক, উন্মিলা ইহাতে ছাখিতা হইল না। প্রবেশ-পথেই যদি বিনয় তাহার কুসুমী-রংয়ের ছোপান শাড়ীর, তাহার ললাট-সজ্জিত কেশের রচনা, তাহার লজ্জার রক্তিমায় স্বতঃই রঞ্জিত গণ্ডের উপরকার রচনা করা গোলাপী আভা, তাহার কানে, গলায়, হাতে আটপোরের বদলে পোষাকী, নূতন অলঙ্কারের সমাবেশ, হার উপর হাতে জাটা-তাবিজের বদলে ফোরের অনন্ত, এই সমস্তই যদি এক নিমেষে

দেখিয়া লইয়া উচ্চহাস্তে বিজ্রপ করিয়া বসিত, তাহা হইলে—নিশ্চয়ই তাহা হইলে উন্মিলাকে সেই যে দিন তাহাকে ‘স্পাই’ বলিয়া বিন্দায় করা হইয়াছিল, সেই দিনেরই মত প্রায় তত বড়ই লজ্জায় আঘাত দিয়া তাহার গৃহপ্রবেশ রুদ্ধ করা হইয়া যাইত। মনের এ রকম বিপন্ন দুর্বলতার মধ্যে সে যে সেই তীব্র উপহাসের বাণবৃষ্টি সহ করিয়া নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইবার লড়াই চালাইতে পারিত, তা বোধ হয় না। প্রথম ধাক্কায় বিনয়ের দৃষ্টি এড়াইতে পাওয়ার সে অনেকখানি লজ্জা-জ্বালায় হাত এড়াইতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল ও এই সুযোগটাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার এতক্ষণকার সকল সঙ্কল্পই প্রায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া বসিল। সে যে সেই অবধি অনেক ভাঙ্গাগড়া করিতে করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিল যে, আজ সে ঘরে ঢুকিয়া তাহার নিজের স্থান জোর করিয়া দখল করিবে, কেমন করিয়া? তা, সে অত কি আর সবার সঙ্গেই বসিয়া বসিয়া হিসাব-নিকাশ করা যায়? লজ্জা করে যে! সমরমত প্রকাশ করা যাইবে।

কিছু ব্যাপারটা ঠিক হিসাব মতন ঘটিল না। বিনা-বাধায় ঘরে ঢুকিতে পাইয়াই তাহার চিরদিনের কোতুক-বৃত্তি তাহাকে জোর করিয়া ধরিল। তখন নিঃশব্দ-পদে পিছনে আসিয়া সে দুই হাতে বিনয়ের চোক চাপিয়া ধরিল।

বিনয় আকস্মিক চিন্তা-ভঙ্গে প্রথমে একটুখানি চমকিয়া উঠিয়াছিল, তার পরই হাত বাড়াইয়া উহার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—“পেঁচোর-মা!” হাত সরিল না,—“বিশে মালি!” হাত সরিল না দেখিয়া, তখন যেন বিশেষ চিন্তিতভাবে কহিয়া উঠিল,—“আচ্ছা, তা হ’লে হরে ধোপার বউ—না তো গয়লানৌ ধানির মা! —

“ধাঃও!”—বলিয়া সতর্কজনে উন্মিলা তাহার করাবরণ উন্মোচন করিয়া লইয়া মুখখানা হাঁড়ির মতন করিয়া ছোট নখটা ঘুরাইয়া বলিল, “আমার হাত বুঝি বিশে মালির মতন শক্ত? না হরে ধোপানীর মতন মোটা? না পেঁচোর মায়ের মতন শুকনো?”

বিনয় তত্বতরে শুধুই বলিল, “ওঃ, তুমি!”

উন্মিলা তখন পূর্বসঙ্কল্প সবই ভুলিয়া গিয়াছে। বিনয়ের জবাবে সে রীতিমত চটিকা উঠিয়াই তাহাকে আক্রমণের ভাবে কহিল, “হ্যাঁ, তা

বৈ কি, নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছিলে। আমার জ্বালাবার জ্বালা শুধু এই সব বলতে লাগলে, কেন বলো দেখি, তুমি আমার অমন যা'তা' বলো?"

বিনয় না হাসিয়া মুখ গভীর করিয়া উত্তর দিল, "বাস্ রে! তোমার না কি আমি যা'তা' বলতে পারি! তুমি হচ্ছে মহারানী 'ক্লিও-পেট্রা'।"

উর্মিলা বন্ধ করা পানের ডিপেটা স্বামীর গায়ের উপর ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল-- "ধাও! তুমি কি যে ও-সব বলো! পেটরা টেঠরা আমি হ'তে চাইনে!"

বিনয়কে সেই কঁাসার ডিবাটা যে আঘাতটুকু দিয়াছিল, সেটুকুকে সে তুচ্ছ করিয়া ডিবা হইতে ছড়াইয়া পড়া পান কয়টা কুড়াইয়া তাহারই ছ'একটা মুখে পুরিতে পুরিতে মুখ তুলিয়া উর্মিলার অভিমানী মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "খাঙ্কি ইউ? হার হাইনেস্ আজ যে বড় দাতা হয়েছেন, দেখতে পাই!" এই বলিয়া পুনশ্চ পান কুড়াইতে মনোনিবেশ করিল।

পানগুলার স্বকৃত ছরবছা দেখিয়া উর্মিলার আবার পূর্বকথা স্মরণ হইল। এই পান সাজিয়া আনার একটুখানি ক্ষুদ্র-ইতিহাস আছে। তার সহি কাঞ্চনের মুখে সে গুলিয়াছিল, সে যখন স্নাত্রে ঘরে গুহিতে যায়, একটি ডিবা সাজা পান সে হাতে করিয়া লইয়া যায়। পানগুলি সে প্রাণ ঢালিয়া সমস্তে বিবিধ উপাদানে সাজিয়া লুকাইয়া রাখে। একসঙ্গে বসিয়া সেগুলি পরম পরিতোষে তাহার ছ'জনে গল্প করিতে করিতে উপভোগ করে। কাঞ্চনের বর বলিয়াছেন, যতগুলি পান সে আনিতে পারিবে, ততগুলি নূতন নূতন গল্প তিনি তাহাকে শুনাইবেন। তা সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ এক এক স্নাত্রে তাহাদের তিন-চার ঘণ্টাও জাগিয়া গল্প শুনাশুনি করিতে হয়।—আজ উর্মিলার ইচ্ছা ছিল, এই সমস্ত-সজ্জিত পানের খিলি সে-ও তার স্বামীর মুখে নিজের হাতে তুলিয়া দিবে, পরিবর্তে স্বখীর যেটা লভ্য হয়; হয় তো—কে জানে—একই ব্যবসায় লোক-লোকসান কি এক রকমেরই হয় না?—কল্পনা-কল্পনের এই পরিণাম-লক্ষ্যে তাহার বুক ঠেলিয়া একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস উখিত হইল।

বিনয় পানগুলি জড় করিয়া যে কয়টা মুখের মধ্যে আটিল, মুখেই ভরিয়া দিল, তার পর বাকিগুলি

অঞ্জলি ভরিয়া উর্মিলার সামনে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার জন্তে নিরে যাওয়া হচ্ছিল? এই নাও, নাও, আর রাগ করতে হবে না, বেশী খাই নি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, না হ'লে আরও গোটাকতক খেতুম।"

উর্মিলাকে বাক্য-বিমুখ ও নতমুখী দেখিয়া তাহাকে ক্রুদ্ধ বুদ্ধি পান কয়টা ডিবার ভরিয়া রাখিয়া দিল ও তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার মতলবে ঘোড়হস্তে সুর করিয়া আরম্ভ করিল, "যা দেবী সর্বভূতেষু ক্রোধরূপেণ সংস্থিতা—নমস্তস্তৈ, নমস্তস্তৈ, নমস্তস্তৈ নমোনমঃ। যা—দেবী——"

"ধাঃ-ও! তুমি আমার কেবল জ্বালাতন করবে, আমি একুনি চ'লে যাচ্ছি—"

বিনয় অত্যন্ত কোমল ও আগ্রহের স্বরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"চ'লে যাচ্চিস্! আহা, তা হ'লে আমি একুনি ঘুমিয়ে বাঁচবো রে! কাল সারা রাত জেগে এসেছি। আজ সারা ছপুর গোমস্তার সঙ্গে ব'সে হিসাবপত্রের করা গেছে। ঘুমটি যা এসেছে—সে কি আর বলবো তোকে।"

উর্মিলার পদতল হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত লজ্জায় ঘেন শিহরিয়া উঠিল।—ছি ছি, কি ঘণা! পুরুষের চিত্তে যেখানে এত বড় বিকাররাহিত্য, —নারী কি না সে ক্ষেত্রে একেবারেই নিলজ্জা উপ-যাচিকা! সে একটি কথাও আর না কহিয়া নিঃশব্দে পিছন ফিরিল।

বিনয় বলিয়া উঠিল—"রাফুসি! আমার মশারি ফেলা হয় নি, তুই ফেলে দিবি, না—"

কথা শেষ না হইতেই উর্মিলা ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলবার উদ্যোগ করিল এবং যথাকার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বিনয়কুমার একবার ঈষৎ বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার নত নেত্রের ছই কোণ ছাপাইয়া অশ্রু-নির্ঝর ঝরো ঝরো হইয়া আসিতেছিল, সে তাহাদের দেখা পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছপুরবেলা রোগা বাপকে ঘুমাইতে দিয়া কৃষ্ণা তাহার বসিবার পূর্বতন ঘরটাকে একটু আধটু শুছাইয়া রাখিতেছিল, এমন সময় একটা ভারী

জুতা পায়ের চলনের আওয়াজ তাহার কানে ঢুকিল এবং শব্দটা শ্রুতমাত্রেই তাহার অধিকারীকে সে চিনিতে পারিল।

“ফুকন্! মিন্ সাব কিধার হ্যায়!”—এই জিজ্ঞাসার পরক্ষণেই ফুকনের কণ্ঠ হইতে “হুজুর!”—এইটুকুমাত্র শোনা গেল এবং তাহার অশ্রুত বাকী সংবাদটা কানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই ঘরের মধ্য হইতে ডাকিয়া কৃষ্ণা আদেশ দিল, “ফুকন্! একটো ঝাড়ন লে’আও!”

“ওঃ, তুমি এখানে? কি কর্চো?” বলিতে বলিতে পর্দা সরাইয়া মিঃ লাহা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ে যেন বেত্নাহতের মতই চম্কাইয়া উঠিলেন, “এ কি! এ আবার কি নূতন সখ হুয়েচে! ছি ছি ছি; একটা নোংরা মোটা শাড়ী পরে, নিজের হাতে নোংরা কাজগুলো কেন কর্তে এসেচ! চ’লে এসো, চ’লে এসো—ধুলো লেগে সর্দি হবে যে।”

কৃষ্ণা নিজের কোমরে-জড়ান তাঁতে-বোনা মোটা ও-কোরা শাড়ীর আঁচল খুলিয়া গায়ে টানিয়া দিল, তার পর যথা-কার্য্যে রত থাকিয়া নতমুখেই জবাব দিল, “বাবার ঘরটা বড় অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখি। ফুকন্! ঝাড়ন হামকো দেও, তোম্ দোসরা কাম পর যাও।—”

মিঃ লাহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, “আহা-হা, ওর হাতে ধুলো ঝাড়বার ভারটাই নয় দিয়ে দাও না। কি এমন কঠিন কাজ যে ওদের সাধো কম পড়বে।”

ফুকন্ দোটারায় পড়িয়া হতবুদ্ধিতাবে মুনিব-কণ্ঠার কাছে হাত পাতিতেই ধমকু খাইল,— “নেহি, নেহি, তোম্ চলা যাও।”

নিরুত্তরে সে প্রস্থান দিল।

মিঃ লাহা মুখখানা খুব ভার করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন এবং সেই বৈঠকখানা-ঘরের একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া নিজের সিগারকেসটা বাহির করিয়া একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া একমনেই টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তার পর যখন দেখা গেলো টাকার চাইতেও কম খরচে তুমি সংসার চালাবে! বল কি তুমি বিবি? তা হ’লে দেখছি না খাইয়ে তুমি আমাকেও মারবে আর নিজেও মরবে!”

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে একটি ফোঁটা ফুৎকার

৩৫ (ক)—৭

“কি! ‘আজ’ ধুলোই খাওয়াবে, না, এক পেয়লা চা-টাও পাবো?” ঘরের ভিতর হইতে কৃষ্ণার কন্ম-বাস্ত-কণ্ঠ জবাব দিল, “চা’ থাকেন! আচ্ছা,—ফুকন্! ওরে অ-ফুকন্! সাহেবকো আন্তে দু কাপ চা বনায় দেও”—ফুকন্ ছুটিয়া আসিতে আসিতে “জী!” বলিয়া জবাব দিল ও হুকুমটা সব শোনা শেষ হইয়া গেলে, দৌড়াদৌড়ি আবার হুকুম তামিল করিতে ফিরিল। কৃষ্ণার ঝাড়ঝুড়ি শেষ হইয়াছিল, সে বই ও ডাক্তারী-ষন্ত্র-পাতি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া আহত-গর্ভ তরুণচন্দ্র ক্রোধ-প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “বলি, বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এলে তাকে লোকে একবার এস বোসও তো বলে। ঐ আবর্জনাগুলোর চেয়েও কি এক দিনের ভেতরে আমি তোমার বেশী অ-দরকারী হয়ে পড়েছি?”

কৃষ্ণার এ ঘরের কাজ শেষ হইয়াছিল, তা কোন ছলেই আর অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, তথাপি সে সেই সাজান জিনিসগুলোকেই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল,—“আপনি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্তে এসে থাকেন তো বলি; তার কোনই দরকার নেই। আমার সময়ও কম।”

তরুণের মুখ ক্রোধের রক্তে আরক্ত হইয়া উঠিল। আধ-পোড়া সিগারে জোরে দুটা টান দিয়া তার পর সেটা ছ আঙ্গুলে ধরিয়া রাখিয়া তিনি গরম সুরেই বলিয়া ফেলিলেন, “তা আমি জানি যে আমার কথাকে এখন তোমার ঝগড়া ব’লে মনে হয়, আর আমার যে কথা শোনারও সময়ের তোমার নাড়াছাছেন, ঘটে থাকে, আমি না করিয়া মিঃ মল্লিক গুন্তে চাই যে, এ রকম ব’লে যে ভিকিরী মতন

মিঃ লাহার কথা তারও তো কিছু মানে নেই। নিতান্ত ক্ষমতা হাল করেচ! নিজের যে কিছু হুচে, সে আমার চোখে দেখবার উপায় নেই, এই যা একটু সুবিধে! ফ্রেঞ্চ গবর্ণেসটাকে তো বিদেশ ক’রে দিয়েছ জানি, আয়াটারও তো কোনই সাড়া পাইনে। সে দিন দাই দাই ক’রে কাক্কে যে ডাকছিলে, তা’ও জানিনে। আমার তো আর চোখে দেখবার কোন উপায় নেই।

বাঁধাচো বল দেখি? শুধু শুধুই সে দিন দর-
বারের নেমন্তন্ন-বাঁপারে বতদূর নয় ততদূর
অপ্রতিভ আর অপদস্থ তো আমায় করলেই,
তার পর সেই দিন থেকে কি ভুতই যে তোমার
ঘাড়ে ভর করেছে,—গড়া পরুচো, বাঁটা
ধরুচো, কোথায় না কোথায় হাঁসপাতালে কুগী
ঘেঁটে, ছোট লোকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে
তাদের মধ্যে তাঁত-চরকার বক্তৃতা দিয়ে, ঐ
সব বিলি ক'রে,—আবার না কি? বাড়ীতেই
পাড়ার যত হাড়ি-মুচি-কাওয়ার পাঠশালাও
খুলে দিচ্চো গুন্টি!—এ সব তোমার হলো
কি গুনি?”

সেই রাঙ্গা-মুখেই চাপা-বিরক্তিতে কিছুক্ষণ
নতমুখে টুপিচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তার পর
একটুখানি ওদাশের হাসি হাসিয়া কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা
করিল;—

“বাস! হয়ে গেল তো?”

লাহা হতাশভাবে দরজার গায়ে হেলিয়া
পড়িয়া বলিলেন, “নাঃ, তোমার সঙ্গে আর
পারলুম না!”

মুহূ হাসিয়া ও ঘরের দিকে খানিকটা
অগ্রসর হইয়া আসিয়া কৃষ্ণা কহিল;—

“বেশ, হার মেনে নিলেন তো? তা হ'লে
চলুন এখন চা' খাবেন।”

পথ ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি আশ্রয় এবং
তাহারই সহিত মিশ্রিত জীবন অভিমানপূর্ণ-কণ্ঠে
তরুণ কহিলেন, “এতক্ষণে হতভাগটার প্রতি
অনুগ্রহ হলো, তা হ'লে? সেই যে কোন্
ভোরে ট্রেণে চেপেছি, তা খেয়ে এসেছি কি
পাস্ ক'রেই আছি, সে সব খবর একবার
দরকারও তোমার মনে হয় না

ত দাঁড়াইয়া পড়িয়া
কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,
না খেয়ে এসেছেন,
—গান

“আর ছ' এক রকম আমিও বুঝতে পারছি
কিষণ! তাদের কাছে আমার ভাবনাই দেখছি
নেহাৎ পুরণো হয়ে দাঁড়িয়েচে।”

অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কঠিন
কিছু বলিতে গিয়াই অকস্মাৎ কৃষ্ণা নিজেকে
সম্বরণ করিয়া লইল। তাহার মনে পড়িল,
এ ব্যক্তিকে সে ও তাহার বাপ অনেক দিন ধরি-
য়াই একরূপ স্পন্দিত হইবার সুযোগ দিয়াছে, ইহা
ছাড়াইতেও সময়-খরচ করিতে হইবে বিস্তর।
কিছু না বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

টাদের আলোর সন্ধ্যাটা যেন আশ্চর্য্য সুন্দর
হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের বাগানে
পাখীদের সম্মিলিত-কণ্ঠে বসন্তের বন্দনা-গান উঠিয়া
যেন দিকে দিকে নব-বসন্তের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত
হইয়াছে। শেষ-ফাল্গুনের উদাসী বাতাস জ্যোৎস্না-
ধারায় স্নান করান, হাজার ফুলে আলো করা
পাছের গায়ে পুলক-আবেগে কাঁপন তুলিতেছে।
ঘরের মধ্যের সব দিকের জানালা খোলা, পদ্মা
সরানো, বিছাতের আলো বন্ধ করা, শুধু সেই
বসন্ত-জ্যোৎস্নার সুধা-ধবলিত অপক্লপ আলোর
ধারায় ঘর স্নাত ও আলোকিত। কিন্তু এ
সকলেই অনভিজ্ঞ থাকিয়া ডাক্তার সাহেব সম্মুখে
ছই হাত বাড়াইয়া দিয়া যেন কাহার স্পর্শ খুঁজিতে
চাহিয়া ডাকিলেন, “বেবি!”

“বাবা!” বলিয়া জবাব দিয়া কৃষ্ণা পাশের
ঘর হইতে স্তম্ভিতভাবে ছুটিয়া আসিল।

“তরুণ এ-কদিন কেন এলো না বল দেখি,
বেবি? তার তো এখনও ছুটি থাকবার কথা
না? বলেছিল যে চা'র দিন ছুটি।”

কৃষ্ণা বোধ করি, কিছু সেলাই করিতে করিতে
চলিয়া আসিয়াছিল; তার আঙ্গুলে একটা হাতীর
দাঁতের ‘অঙ্গুলী-রক্ষক’ পরান ছিল, সেইটা খুলিয়া
—রাখিয়া দক্ষিণহস্তে বাপের কেশ-বিবল
নিরন্তর করিতে তাঁহাকে সান্তনা

চেষ্টে ব'সে থাকবো! দেখ মা! তুমি কাল ভোরেই তাকে একটা আর্জেন্ট তার ক'রে দাও। হ্যাঁ, আর 'রিপ্লাই-প্রিপেড' দিও। তা হ'লেই সে ঠিক ক'রে আমাদের তার লাগবে ও বুঝতে পারবে, আর নিজের ভুলের দরুনীও পাবে যথেষ্ট।"

অন্ধ পিতার চোখের অন্ধকার তাঁহার মেয়ের মুখের বিপন্ন ভাব জানিতেও পারিল না। তাহার নীরবতাটাকে লজ্জাক্রমে ভুল করিয়াই পুনশ্চ জোর দিয়া দিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, —"শোন মা! তুমি এতে কিছু লজ্জাবোধ করো না। এক দিন না এক দিন যে তোমার স্বামী হবেই, তাকে ছ'দিন আগে থেকে একটু যদি তুমি যত্ন দেখাও, তা'তে লজ্জার কি আছে, আমি তো ভেবে পাইনে!—আর দেখ, ওকে যত্ন জানাবার নেইও তো কেউ। তুমি যদি না করবে, তা হ'লে করবেই বা কে? মানুষ একটা কারকে আপনার না করতে পেলো কি থাকতে পারে? আমার যেমন কপাল! তা না হ'লে আমিই কেন করি না? তা আমারই তো এখন হাতটি তুমি না ধরলে একটি পা'ও নড়তে পারিনে, তার আমি আর কার জন্তে কি করবো বলো? তা দেখ মা কিষণ! খরচের টাকার জন্তে তো তা হ'লে একটু মুস্তিলে পড়তে হবে? শিবপুরের পৈতৃক বাড়ীখানা বেচে যে টাকাটা পাওয়া গেছলো, তা'তে হাজারীমল খোলামলেনদের স্ত্রদের আট হাজার গিয়ে বাকী হাজার তিন থেকে এ তিনটে মাস তুমি তো খুব বাহাদুরী ক'রেই চালালে, কিন্তু এখন তো—"

কৃষ্ণা ধীরভাবে বাপের কথাগুলি শুনিতোছিল, এখন তেমনি শান্তস্বরেই বাধা দিয়া বলিল, "তার জন্তে তুমি অত ভেবো না বাবা! সে আমি চালিয়ে নোব। বাজে খরচ অনেক কমিয়ে দিয়েছি, এবার থেকে মাসে এক হাজারেরও কম খরচে আমাদের চ'লে যাবে।"—

ডাক্তার মল্লিকের মুখখানা ভয়ানকের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যেন তাঁহার 'পরে নিতান্তই অত্যাচারের উপক্রম হইতেছে, এমনিভাবেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এক হাজার টাকার চাইতেও কম খরচে তুমি সংসার চালাবে! বল কি তুমি বিবি? তা হ'লে দেখছি না থাইয়ে তুমি আমাকেও মারবে আর নিজেকেও মরবে!"

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে একটি ফোঁটা হুঁশের

হাসি ফুটিয়া উঠিল, "কেন, বাবা! এ ক'মাস কি আমি তোমার খেতে দিই নি, না নিজেই উপোস ক'রে আছি? অনেক বাজে খরচই তো আমাদের ছিল, সেইগুলো গেলেই খরচও চের সম্ভা পড়বে অথচ খেতেও কম পড়বে না।"

এ সাধুনার বিখ্যাত বিলাসী ডাক্তার সাহেবের সম্ভ্র-চিত্ত কিছুমাত্রও প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রায় কাঁদো-কাঁদো-গলায় বলিতে লাগিলেন, "এ তিন মাসে যা' হাল আমার করেছে, সে আর ব'লে কাজ নেই বাবা! রোজ রোজই কি না মস-গাড়ীখানা ক'রে বেড়াতে নিয়ে যাবে, তারপর আমার সেবা করবার আট জন চাকরের বদলে কি না মোট দুটি লোক ক'রে দিলে।—"

"—কেন বাবা! তোমার সেই আট জন চাকরের হাতের সেবার চাইতে কি এখন তোমার কিছু অম্বল হচ্ছে?" মেয়ের কণ্ঠে ঈষৎ বেদনার স্বাক্ষর ছিল।

ডাক্তার নিজের অপছন্দ গোপন-চেষ্টা না করিয়াই সোজা বিরক্তি প্রকাশপূর্বক বলিয়া ফেলিলেন, "তা' হয় বৈ কি! তাদের আমি সর্বদা ফাইফরমাস করতে পারতুম, তোমায় কি তাই পারি? রাত্রে শুধু পালা ক'রে এক এক জন থাকে, অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, কষ্ট আর হয় না। অতঃপর যি তুমি কি ভেবেই কর্চো, তা যদি আমার বোধবার কোন উপায় আছে!"

পিতার কথায় কৃষ্ণার মনের মধ্যে আঘাত পাইলেও তাঁহার অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহার জ্ঞান ব্যথিত ও তাঁহার অপছন্দ কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার লজ্জাও একটুখানি সে বোধ করিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইয়া অবশেষে যত্ন-কণ্ঠে শুধু বলিল, "এ সব না করলে চালাবো কি দিয়ে বলো?"

যেন আকাশ হইতেই খসিয়া পড়িয়াছেন, এমনিভাবে মুখের ভাবখানা করিয়া মিঃ মল্লিক কহিয়া উঠিলেন, "তাই ব'লে যে ভিকিরী মতন বেঁচে থাকতে হবে, তারও তো কিছু মর্জি নেই। আমার তো এই হাল করেচ! নিজের ধৈর্য হুঁচ, সে আমার চোখে দেখবার উপায় নেই, এই যা একটু সুবিধে! ফ্রেঞ্চ গবর্ণেসটাকে তো বিদেশ ক'রে দিয়েছ জানি, আবারটাও তো কোনই সাড়া পাইনে। সে দিন দাই দাই ক'রে কা'কে যে ডাকছিলে, তা'ও জানিনে। আমার তো আর চোখে দেখবার কোন উপায় নেই।

তোমারই একরকম মজা হয়েছে!” অরু একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, “শেষে কি না আমার বাড়ীতে নোংরা একটা শাড়ী-পরা, গা-খোলা দাই ঘুরে বেড়াতে লাগলো! আর আমি তোমার জন্তে ছোটো ইউরোপীয়ান্ গবর্ণেস্ রেখেছিলুম।”

বিক্র-কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল, “বাবা!”

কিন্তু বিরক্ত বুদ্ধ সে ডাক আমলে আনিলেন না, মনের খোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “এ বাপু তোমার বাড়াবাড়ি! কেন, চলবার ভাবনা তোমার কেন? সে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমিই কেন ভাবি না? তার পর তুমি তরুণকে বিয়ে করলে তোমার আবার ভাবনাটা কি? ম্যাজিষ্ট্রেট্ থেকে সে দু’দিনে কমিশনার হয়ে যাবে, খাসা ছেলে সে। তা’ ছাড়া ওদের জমীদারী আছে। মাসে দু’তিন হাজার হিসেবে বোধ হয়, ওর অংশে নিটু আয়। তুমি এই বয়স থেকে অত হিসেবী হ’লে ওর মানমর্যাদাই বা রাখবে কেমন করে? লোকে যে তোমায় ছোট-লোকের মেয়ে ব’লে ঘেঁষা করবে। নাঃ, তোমার ও-সব ছোট চালে চলা চলবে না, বেবি! ম্যাডাম কামাকে তুমি আবার চিঠি লিখে আনিবে নাও। আর সন্ধ্যাবেলাই আগে উঠে ওই তারটা ক’রে দেবে। কি লিখবে জান? ঠিক এই কথাগুলি লিখে দেবে—হোয়াই দিস্ সাইলেন্স? এক্সট্রামলী অ্যাংস্ রিপ্লাই সার্প—কম্ ইমিডিয়েটলা ইফ পসিবল্ [চুপচাপ কিসের জন্ত? অত্যন্ত উদ্বেগে আছি। অবিলম্বে প্রত্যুত্তর দিও, ও যদি সম্ভব হয় তো এসো।]। কেমন, মনে থাকবে তো? না হয় তো এইখানে ব’সেই লিখে নাও না কেন?”

অনেক দিনের রোগীর মুখ যেমন ক্লান্ত রক্ত-হীন হইয়া পড়ে, এই পরিপূর্ণ বোবনের অটুট স্বাস্থ্য লইয়াও কৃষ্ণার সুন্দর তরুণ মুখটি ঠিক তেমনি করুণ দেখাইল। মনের যে ভাবটাকে সে তাহার এই অরু বুদ্ধ জীবন্ত পিতার সমক্ষে চাপিয়া রাখিবার জন্ত ক্রমাগত কয় মাস ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছিল, সেটা যেন আর গোপন রাখা যায় না বলিয়াই তাহার মনে হইয়া তাহাকে একান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। মানসিক সংগ্রাম রুদ্ধ করিবার জন্ত সে চোট কামড়াইয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, বাপের আদেশের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা কহিল না।

মুঃ মল্লিকের তখন আর এক প্রকার সন্দেহ

হইল। তিনি ঈষৎ চকিত হইয়া তাতাতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “বেবি! তুমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করো নি তো? না না, দেখ, সে সব কিছু গোলমাল করে বসে না যেন! দেখ মা! তরুণের মতন সুপাত্র সহজে কি খুঁজে মেলে? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, বড় চাকরে, ধনী আবার তোমা-অন্ত প্রাণটি তার! কেবল ঐ একটি দোষেই সব মাটি ক’রে রেখেছে। সে হতভাগা মেয়েটা ম’রে যে কবে ওকে মুক্তি দেবে, তা কে জানে! তা না হ’লে তো যত দিন থেকে ওর সঙ্গে এ বিষয়ের পাকা কথা দিয়ে রাখা হয়েছে, বিয়ে হ’লে তো এত দিনে তোমার ছ’চারটি ছেলোপিলেও হ’তে পারতো। তা দেখ, যদি কিছু মন-কষাকষি হয়ে থাকে তো তুমি জ্বীলোক, তোমারই মা আগে হ’তে নরম হওয়া দরকার। যাও, কাগজ-কলম এনে বেশ ক’রে একখানি চার পাঁচ পাতার চিঠি লেখ। আর ঐ তারটুকু ক’রে দাও, নিশ্চয় তার রাগ প’ড়ে যাবে। সে তেমন ছেলেই নয়।”

কৃষ্ণা তথাপি একটি কথাও কহিল না, নড়িল না, যেমন তেমনি দাঁতে চোট চাপিয়া হাতে হাতে বাধিয়া কাঠের পুতুলের মতন স্থির চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথার উপরে যে দারুণ ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, সে কথা সে অনেক আগেই বুঝিয়াছিল এবং সে জন্ত সে প্রস্তুত আছে, কিন্তু এই অনন্তসহায় দুর্বলচরিত্র, অক্ষম অরু পিতা তাহার; তাহার অবাধ্যতা, তাহার বিদ্রোহ কেমন করিয়া সহ্য করিবেন; ইহার অনিবার্য ফলে উদ্ভূতপ্রায় ভীষণ জীবন-সংগ্রামের কঠোর অংশ কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন; তাই ভাবিয়া সে যেন হতভম্ব হইয়া রহিল।

এ দিকে ডাক্তার সাহেব তথাপিও কণ্ঠার সম্মতি না পাইয়া এবার কিছু বিরক্ত কিছু বিপন্ন-ভাবে ঈষৎ করুণ-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন—“বেবি! বেবি! বোকামী ক’রে সব নষ্ট ক’রে ফেলিস্ নি। তোমার যতই রূপ-গুণ, বিত্ত-বুদ্ধি থাক, তোমার বাপের টাকা নেই। দেখ্‌ছিস্ না—কি যে, আমাদের সমাজের ছেলেরা বড় অভিভাবক বা টাকা না পেলে বিয়েই করে না। ও তোকে ভালবাসে, ও আমাদের ঘরের খবর সবই জানে, এমন কি, আজ’ পর্যন্ত আমি ওর কাছে প্রায় হাজার পাঁচশেক টাকাও ধারি, এ রকম সময়ে তুমি যদি ওকে চটিয়ে দাও, কি রকমটা হবে বলো তো?”

কৃষ্ণাকে কে যেন চাবুক তুলিয়া সজোরে

পারিল। এমন করিয়াই সে চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মুখ দিয়া বিলাপ-আর্তনাদের মতন বাহিরে আসিল—“উঃ, কি করেছ! বাবা! বাবা!—” বাহিরের চাঁদ উর্ধ্বে উঠিয়া উজ্জলতর কিরণধারায় সারা বিশ্বের অঙ্গ আলোর পিচ্-কারীতে ভরাইয়া দিতেছিলেন। সেই রক্ত দেখিতে রক্ত-পাংল কাবা-রসিক দশ জনকে ডাকাডাকি বাধাইয়া কোকিল-পাণিরার তো গলা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই চাঁদের আলোর ডুবিয়া গিয়াও কক্ষের হঠাৎ মনে হইল। তাহার চারিদিকে কি নিবিড়—কি হৃৎশব্দ—কি বিপুল অন্ধকার! আর তাহাকে ইহারই মধ্যে এ জনের মত—হয় তো বা চিরজন্ম-জন্মান্তরের মতই ডুবিয়া থাকিতে হইবে! তার উদ্ধারের কোন আশাই যেন এই অসীম বিস্তৃত অন্ধকার-সাগরের তলদেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার সারা প্রাণ যেন কিসের একটা অজানিত মহাভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তার নূতন জাগরণ-উষার সোনালী আলো যেন বর্ষার ঘন মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

পর দিন বাপের আদেশমত একথানা তার সে মিঃ লাহাকে পাঠাইল; কিন্তু তাহাতে তাহার আদেশানুযায়ী ঠিক ঠিক কথাগুলি লিখিতে সে কিছুতেই পারিল না। “বাবা তোমার সংবাদ চান,”—এইটুকুই সে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। উত্তরে ইহারই জবাব পাওয়া গেল,—“তাকে জানাইয়াও আমি ভাল আছি।”—টেলিগ্রামখানা হাতে করিয়া আসিয়া সে বাপকে বলিল, “যশোর থেকে খবর এসেছে।”

“এসেছে!” বলিয়া রক্ত এমনি বালকোচিত আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন যে, বোধ হইল, যেন, তিনি তাঁর সব চেয়ে দামী হারানিধিটি আবার ফিরিয়া কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে না হোক তবু দশবারও এই তারের জবাব আসার খবর তিনি উৎকণ্ঠিত উৎসেগে ডাকাডাকি বাধাইয়া লইয়াছেন ও প্রত্যেকটি বারেরই জিজ্ঞাসার শেষে বার্ষিকতার নিরাশ্বাসে বুকটি তাঁহার আধহাত করিয়া দমিয়া গিয়াছে। সে দেখিয়া কক্ষের

মনের মধ্যে যে কি ঝড়ই বহিতেছিল, সে শুধু সেই জানে। এক-দিকে তাহার নবোন্মেষিত হৃদয়বেগে পরিপূর্ণ নবজীবন। নূতন স্বপ্নলোক, নব-জাগরণ উষা, নবীন আশাপ্রবাহ,—তার আত্মগৌরব, আত্মপ্রতিষ্ঠা, তার উদ্বোধিত শক্তির একাগ্র সাধনা! আর অপর পক্ষে তাহার এই সুখবিলাসের অপরিণাম অপব্যয়ে নিঃস্ব ফতুর, অথচ চিরান্তে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দু ক্রটি সহিতে একান্ত অসমর্থ ও অসহিষ্ণু অন্ধ পিতা! কোন্ পথ সে অবলম্বন করবে, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিবে, ভাবিয়া সে যেন কোন কূল-কিনারাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এত দিন সে যে নিজের আশৈশবের সকল অভ্যাসের শক্তি একটার পর একটা করিয়া বিধাপূর্ণ সবল হস্তে কাটিয়া ফেলিয়া নিজেকে মুক্ত করিতেছিল। অর্থশূন্য ধনি-গৃহের ধারকরা ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্য কঠিন করে চূর্ণিত আস্বাবের মত পথের ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া নিজের সুখলালিত ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত শরীর-মনের উপর সে যে কৃচ্ছ-সাধনের গৌরব-দাপ্তি অনুভব করিতেছিল এবং সেই গূঢ় তপস্তার বলে অনুপ্রাণিত হইতে হইতে ভবিষ্যতের বিষয়েও নিজের কর্তব্যও সে যে কি বিশ্বস্ত-মনেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, গত রাতে পিতার একটি কথার ঘায়ে তাহার সেই সাজান বাগান এক ঝলক তপ্ত হাওয়ার স্পর্শের মতই এক নিমেষে শুকাইয়া দিয়া গিয়াছে। গত রাত্রি হইতে তাহার নূতন-গড়া জীবনের ছায়াচিত্র শূন্যে মিলাইয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে আবার সে পুরানো ছবিখানা ফোটো ফোটো হইয়া উঠিতেছিল, লজ্জায় ও ভয়ে কক্ষ সেখানার দিকে আর ভাল করিয়া যেন চাহিয়া দেখিতেও সাহস করিতেছিল না। বারম্বার বুক খালি করিয়া করিয়া দীর্ঘশ্বাসগুলো উঠিয়া আসিয়া এই কথাই তাহার কানে কানে বলিয়া যাঠিতেছিল যে, যাহা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা আর কখনই জোড়া লাগিবে না। এত দিন যে নিজেকে না বুঝিয়াই তাহার সহিত নিজের জীবনটাকে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম, সে এক রকম স্বপ্নের ঘোরের মত ভুলের মধ্য দিয়া চলিয়া যাঠিতেছিল। কিন্তু এখন, যখন সে তক্ষা ছুটিয়া গিয়াছে, তখন আর কেমন করিয়া সে একটা লজ্জাকর ভ্রমের পশ্চাতে, একটা হীনতাপূর্ণ অগৌরবের অন্তর্ভাগে ধরিয়া রাখিয়া নিজের

সমস্ত নারী-মহিলাকে ধূলাবলুণ্ঠিত হইতে দিবে? আর তো সে তা পারে না। সে যে আজ বড় স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে যে, এত দিন যে মায়ার রঙ্গিন নেশায় তাহার অভিভাবকের হুকুমে তাহার ভবিষ্যৎকে সে সাজাইয়া রমা করিয়া দেখাইয়াছিল, এখন তাহার পক্ষে শুধুই সেটা মক-মরীচিকার মত স্বপ্নমাত্রই নয়; তেমনি শুক ও কঠোরও বটে। অরুণচন্দ্র আজ দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া তাহার কর্ণকূহরে যে প্রেমের বন্দনা গান প্রতিনিয়ত শুনাইতে শুনাইতে তাহার চপল কিশোর চিত্তকে তাহারই অভিমুখে টানিয়া লইতেছিল, অকস্মাৎ একটি দিনের সামান্য একটুখানি পরীক্ষায় সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া জানিতে পারিল যে, সে আকর্ষণটা মোটেই তাহার অন্তরস্পর্শী হইতে পারে নাই। জলে-ভাসা পানার মতই সে শুধু উপরে উপরেই ভাসিয়া বেড়ায়, মূল যে তাহার কি রকম আলগা, সেই বুঝিয়া মনের মধ্যে সে অত্যন্তই ভীত হইল। তার পর আর একটা ব্যাপার ঘটিল। এত দিন সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের ও অত্যধিক ঐশ্বর্যের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে: যে সমাজে আহার বিহার আচার ও ব্যবহার সমস্তই জাগতিক সম্পদেরই বাহ্য-আড়ম্বরের মধ্যবর্তী; সেই আধুনিক দেশীয় ও বিদেশীয় নরনারীর সাহচর্যেই তাহার জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। সেখানে বসিয়া তাই মিং লীহাকে কোন দিনই তাহার বিসদৃশ ঠেকে নাই। যে সমাজের অধিকাংশ মেয়েরাই বিলাত-ফেরত, বিশেষতঃ ম্যাক্সিষ্ট্রের স্বামী পাওয়াকে নারী-জীবনের চরম প্রাপ্তি বোধ করিয়া থাকেন; সেখানে বসিয়া অতের ঈর্ষ্যার চক্ষে নিজের ভবিষ্য মৌভাগ্যকে সেও খুব বড় করিয়াই দেখিয়াছিল। তার উপর তরুণের ঘরে টাকা আছে, বুনিয়াদী বড় ঘরের বধু হইতে এ সমাজের মেয়েদের দু-একটা সুযোগের খাতিরে লোভটা বিলক্ষণই থাকে, কৃষ্ণারও ছিল। অর্থ-স্বচ্ছলতা এবং সেকালের সেই সব ছন্দ হারা মতি একালে যা হাজার হাজার টাকা দিলেও সম্বল মিলে না, বনেদী-ঘরে পড়িলে সেইগুলো পড়িয়া মেয়েমানুষ হওয়াটা সফল করিয়া লওয়া যায়।—কাজেই বহুতর বন্ধ বন্ধসমাজের অনুঢ়া কস্তার প্রার্থিত বর তরুণচন্দ্রকে এত দিন মিস মল্লিকের মনে না ধরিবার বড় একটা কারণও দেখা যায় না। আর যে সমস্ত বড় বাধাটা তাহাদের

মিলন-পথের প্রহরী হইয়া মাঝখানে লাঠী তুলিয়া খাড়া হইয়াছিল সেই দুর্ভাগ্য ব্যবধানটার জন্তই বোধ করি কৃষ্ণার ঐ পাত্রটিকে তাহার সকল পাণিপ্রার্থীর চাইতে বেশী পছন্দ হইয়াছিল। বাহির হইতে ইহার সহিত একটা ভবিষ্য সম্বন্ধের আভাসে উত্তরপক্ষই নিশ্চিত রহিল, অথচ ভিতর হইতে কাহারও কোন দাবী-দাওয়া রহিল না, স্বাধীন-সত্তার বিলোপ ঘটিল না। এই বা এক রকম মন্দ কি?

কিন্তু মন্দ যে কি, সে অদূর-ভবিষ্যতেই এক দিন প্রমাণ হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনাজালে জড়িত কৃষ্ণার নব-জাগ্রত মন নিঃসন্দেহেই অমুভব করিয়া বসিল যে, সে তরুণচন্দ্রকে ভালবাসে না, এবং এমন কি, কোনও দিনেও বাসিতে পারা অসম্ভব!—মাথার উপরে তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তথাপি নিয়তি-পরিচালিতের মতই নিজের মনের সে অদম্য উচ্ছ্বাসকে সে কোন মতেই প্রতিরোধ করিয়া উঠিতে পারিল না, ভাবের উচ্ছ্বাসে কঠোর বাস্তবকে সে আশ্রয় করিতে না পারিয়া যে অমৃতস্পর্শে ‘নবজাত’ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অমৃত-স্রোতেই নিজেকে ভাসাইয়া দিল। নিজের সমস্তকে সে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িল এবং দেখিল, তার মধ্যে আর তার সে পরিত্যক্ত পুরাতনের কিছুই আর খাপ খায় না।

ডাক্তার মল্লিক ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “কি লিখেছে যে তরুণ? কি তার করেছে পড়তো শুনি?” সংক্ষিপ্ত বার্তাটুকু শোনা হইয়া গেলে মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিয়া উঠিলেন, “এ কি রকম হলো! তুমি তাকে আস্বার কথা লিখলে, আর সে যে তার জবাবটি পর্যন্ত এড়িয়ে গেল, এটি তো ভাল লক্ষণ বোধ হচ্ছে না বেবি!”

কৃষ্ণা ডাক্তার-সাহেবের সহিত লক্ষণের ভাল-মন্দ লইয়া কোনই উত্তরপ্রত্যুত্তর না করিয়াই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিল। জানিত, তর্কাতর্কি করিতে যাওয়া বৃথা। তা ভিন্ন সে বাধ্য হইয়া নিজের বাপকেই ছলনা করিতেছে—এটা তাহার সারা চিত্তকে একান্তই পীড়িত করিতেছিল, এই বেদনার স্থানকে নাড়া-চাড়া করিতে তাই তাহার ব্যথিত অন্তরও সায় দিল না।

মেয়েকে চূপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া এ দিকে কিন্তু মেয়ের বাপের মনের সন্দেহ ও তুসঙ্গিক বিরক্তিতাও প্রবলতর হইয়া দেখা দিল। তিনি তাহার অন্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধিনীর অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহ

মাঃস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিলেন, “কি যে তুই কাণ্ডটি ক’রে বসলি বেবি! তার আমি যদি কিছুটি বুঝতে পারিচি! তা না হ’লে সেই ছেলে, তোমার নাম করতে যার গলার স্বর কেঁপে ওঠে,—সে কি না তুমি আসবার কথাটি লিখতেও তার জবাব দিলে না! নাঃ, তুই আমার ভাবালি বেবি! কোথায় ভেবেছিলুম, বাকী দিনক’টা একটু নিশ্চিন্ত হবো। তা নয়, নিজের তো আমার এই দশা হলো, আবার এর উপর আইবড় এক ধেড়ে মেয়ের জন্ত রাত্রিদিনই ব’সে ব’সে ভাবতে হবে। নাঃ, অস্থির করেছে দেখছি!”

কৃষ্ণা পাথরের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বাপের এতটুকু কথা কখনও তাহার সহিত না, আজ এতবড় লাঞ্ছনাটাও সে নিঃশব্দে হজম করিয়া লইল।

মল্লিক-সাহেবের বিরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, “বেবি! শুনতে পাচ্চিস্ আমার কথা! এক্ষুনি তুই আর একখানা তার শীগ্গির ক’রে দে। এতে লেখ—“একটি মল্লী রিপেন্টেন্ট ফর্গিভ্ এণ্ড কম্ অ্যাঙ্ক্ সার্প্ অ্যাঙ্ক্ পসিবল্।” [নিরতিশয় অনুতাপিত হইয়াছি, ক্ষমা করিয়া যত সম্ভব আসা সম্ভব আসিবে]। হাঁ, আচ্ছা, আরও একটুখানি এই রকম যোগ ক’রে দিলে মন্দ হয় না—”

বাস্তবিকই কৃষ্ণা আর সহ্য করিতে পারিল না, সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অশ্রু-ক্লক-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“বাবা! বাবা! একটা অনিশ্চিত সুদূর-ভবিষ্যতের আশায় ভুলে তুমি আমার মান মর্যাদা সমস্তই ঐ লোকটার হাতে তুলে দেওয়াচ্ছো, এ কি ভাল করছো?”

মল্লিক-সাহেব অবাক্ আশ্চর্য হইয়া গিয়া দৃষ্টিশূন্য ছই চোখ কপালের দিকে টানিয়া তুলিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ভাল করচিনে! কিসে মন্দটা করচি শুনি? তোমার সমস্ত মান-মর্যাদা তরুণের মত বড়লোকের ছেলে—একটা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌দস্ত হয়ে থাকার দরুণ নষ্ট হচ্ছে কি রকম ক’রে? সেইটুকু শুধু বুঝিয়ে দিতে পারবে? আর ভবিষ্যতের আশা! সে জিনিসটা কি একটুখানি স্পষ্ট ক’রে বলো তো? —ওঃ, ওর সেই আধমরা বউটার কথা বল্চো বুঝি?”

কৃষ্ণা তাহার অন্তর-বাহিরের অন্ধ পিতার সহানুভূতি প্রাপ্তির ক্ষণিক দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, “হুঁ।”

“ওঃ, সেই জন্ত তুমি বিরক্ত হচ্ছে? তা সেটাকে তো খুবই অস্বাভাবিক বলতে পারিনে! তোমাদের বয়সে ও-রকম অসহিষ্ণুতাটাই যে স্বাভাবিক। এত দিন ধ’রে যে তুমি সেই পাগলীর মরণ-প্রতীক্ষায় ওকে কি ক’রে ঠেলে রেখে দিয়েছ, সেইটেকে তো আমার চোখে নেহাৎ পাকামী ঠেকছিল। তা হ’লে এক কাজ করা যাক, সমাজের লোকে হাসে তার আর হবে কি?—তোমাদের হিন্দু-বিবাহ হ’লেই সব দিক দিয়েই সকল গোল মিটে যায়। আচ্ছা, ওকে তুমি আস্তে বলো, তুমি না পারো আমিই তাকে এ কথা বলবো। আর যত শীঘ্র সম্ভব, বিয়েটা চুকিয়েই ফেলবো। আমাদের পক্ষে বাধা তো আর নেই এতে, তবে লোকের কথা!”

মেয়ের মনের কথায় বিপরীত বুদ্ধি মল্লিক-সাহেব এক দিকে যেমন হুট হইয়া উঠিলেন, অপর পক্ষে বাপের এই বিষম সান্ত্বনাবাক্যে কৃষ্ণার অন্তরের সমস্তটুকু বল-ভরসা যেন কোথায় উড়িয়া গেল। বক্ষোবদ্ধ লুপ্ততা বিহঙ্গীর মর্দ-কাতরতার মতই সে অত্যন্ত যত্ন আর্তি-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, “না, বাবা! তা বলো না, সে আমি পারবো না, মেয়ে ফেললেও পারবো না।”

“তবে তুমি চাও কি? কি তোমার মতলব, সেইটাই বেশ স্পষ্ট ক’রে ব’লে ফেল না হয় শুনি?” কৃষ্ণা কথা কহিল না।

“তুমি চাও, তরুণের সঙ্গে মিথো একটা খিটি-মিটি বাধিয়ে তাকে তুমি ছেড়ে দেবে। একে তোমার বিষম একগুঁয়েমীতে তার ঐর্ষ্যের বাঁধ কত দিন বাঁধা থাকবে, তা কিছুই বলা যায় না, কারণ, হিন্দু-ঘরে মেয়ের অভাব নেই। শুধু সে তোমার ভালবেসেই তোমার জন্ত অপেক্ষা করছে।—তার উপর যদি অল্প কিছু অনিষ্ট আচরণ ক’রে থাক, আর তার ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে না নাও, তা হ’লে তোমার ভবিষ্যৎ যে সর্বনাশের বেড়া-আঙুনে জলবে, সে আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তরুণের কাছে আমার পঁচিশ-হাজার টাকা দেনা, সে তোমায় বলেইছি। তাতে এক পরমাণু সে সুদ নেয় নি; কিন্তু এই বাড়ী বাঁধা দিয়ে সে অল্প লোকের কাছ থেকেও যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিইয়ে দিয়েছিল, সুদে সুদে সেটাও প্রায় সমস্ত আশী হাজার কি আরও বেশী হয়ে উঠলো। সব শুক জড়িয়ে দেড় লাখ হবে, বোধ হয়। ওর আশ্রয় যে তেজ ক’রে

ছাড়তে চাইচো, আমার হাত ধ'রে দাঁড়াবে কোথায় বল তো শুন? দেখ, ও-সব মতলব ছাড়, তোমার উপর আমি অনেক টাকাই খরচ করেছি, ঢের ভরসাই আমার ছিল; ভগবান আমার মারলে, তুমি শুদ্ধ আর মেরো না। যাও, ওঠো,—তারিট ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখে পাঠাও গে, বেশ বড় ক'রেই না হয় লেখ, না হয় দশ-পনের টাকাই খরচ হবে। অত কল্পনাই করবার কোন দরকারই নেই, তরুণের স্ত্রী হ'লে তোমার পরমার দুঃখ পেতে হবে না। হ্যাঁ যাও, আর আমার জন্ত এক গ্লাস স্ম্যাপেন দিতে ব'লে যেও। আঃ—তোমার সঙ্গে ব'কে ব'কে আমার মাথা ধ'রে উঠলো দেখছি! তোমার মা ছিল এক জন লেডী,—তুমি তার পেটে জন্মে কোথেকে যে এমন ইতুরে নজর পেলে, তাই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। আঃ!”

একাদশ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলাকার ডাকে যশোহর হইতে একখানা মোটা খামের চিঠি কৃষ্ণ মল্লিকের হাতে আসিল। অনেক বৎসর ধারয়াই তো আসে, কিন্তু ইতঃপূর্বে এই লেখকের পত্র-সম্বন্ধে তাহার চিন্তে উপেক্ষা বা প্রতীক্ষার ভাব কোনটাই খুব বেশী প্রবল ছিল না যে, ~~এই~~ আজিকার এই পত্রখানা হাতে পাড়িতেই সে বেশ স্পষ্ট করিয়া সেটা জানিতে পারিল—চিঠি ইংরাজীতে লেখা, তার ভাবার্থটা এই। আমার প্রিয় বেবি!

তোমার ছ'খানি টেলিগ্রামই পাইয়াছি। তোমার বাবা আমার সংবাদের জন্ত বিশেষ উৎসুক, সেটা তাঁর পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তুমি নিজেও যে তাঁর দোতোর মাঝখানে একটুখানিও গোপন অংশ লও নাই, এমন অসঙ্গত কথাটা আমার জোর করিয়াও কেহ বিশ্বাস করাইতে পারিবে না! তোমার দ্বিতীয় তারের খবর 'তুমি না বলিয়া চলিয়া যাওয়ার বাবা বিশেষ দুঃখিত, সুবিধা হইলেই তোমাকে তিনি আসিতে অনুরোধ করিতেছেন।'—এর মধ্যেও যে আমি তোমার লজ্জা-প্রচ্ছন্ন অন্তরের সুগভীর আবেগ-ভরা আমন্ত্রণ অনুভব করিয়া পরম সুখে অভিভূত হইয়া রহিলাম।

বেবি! তোমায় না দেখে এবার যে হঠাৎ

চ'লে এসেছি, তার জন্তে ক্ষমার পর ক্ষমা চাইলুম। সত্যি বেবি! মনে বড় অভিমান ভয়েছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিলুম যোধ হয়, না? তুমি ছেলে-মানুষ, সব সময় নিজের মনটাকেই নিজে হয় তো বুঝে উঠতে পারো না। বিশ্ব-সংসার এ সময়টায় তোমার কাছে একটা ছেঁদালীর মত জটিল, ছায়া-বাজীর মতই ক্ষণপরিবর্তিত। নানা রকমের উত্তেজক উপভাস ও আধুনিক দেশী-বিদেশী হজুকওয়ালার নিকোঁধ ছেলেমেয়েগুলো এই সময় তোমাদের চোখে হঠাৎ এক একটা কল্পনার গন্ধর্ব্ব-লোক সৃষ্টি ক'রে তোলে। আর তোমরা দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অমনি রাতারাতি কেউ বা যীশুখ্রীষ্ট, কেউ বা ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই হয়ে উঠতে ছুটে যাও।—কিন্তু ও-সব ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখাই সব চেয়ে সুবিধে, বরং এর ছ'একটা উপভাসের প্লট ক'রে নেওয়াও চলে, তবু বাস্তব-জীবনে এর কোনই সুবিধা বা সাথকতা যে নেই, এটা খুবই সত্য। যাই হোক, আমার ছোট্ট কিশোরটি, আমার শিশু-শাস্ত্র বেবিটি যে নিজের নভেলী-খেয়াল ত্যাগ ক'রে তার নিশ্চয় অনাদরে জীবনমৃত সাধকের পানে আবার চোক দুটি তুলে চেয়েছেন, এই তার পরম-ভাগা! সে দৃঢ়রূপেই জানতো যে, এ দুর্দিন তার বেশীক্ষণ থাকবে না, আর সেই সুসময়েরই প্রতীক্ষায় সে তার চির-অভ্যস্ত সহিষ্ণুতা নিয়ে নীরবে অপেক্ষা করছিল। সে জানতো, তার স্বপ্নলোকের রাণীটি তার মরীচিকা-পূর্ণ স্বপ্নবাণী ভুলে আবার শীঘ্রই সত্য ও সুন্দর জাগ্রতাবস্থায় ফিরবেই, আর তার বুদ্ধিমান ও স্নেহময় বাপও তার এ প্রত্যাবর্তনের সহায় হবেনই হবেন।—যাই হোক বেবি! এমন আনন্দের পাত্রটি আমার কানায় কানায় আমি এই মুহূর্তে ভরিয়ে নিতে পারলুম না, এইটুকুই বড় আপশোষ থেকে গেল। তোমার পায়ের তলায় ব'সে [আমার পক্ষে এই পরম লাভবান ও অপরিসীম আনন্দ-গৌরবে পরিপূর্ণ] তোমার মনের উত্তেজক জন্ত ক্ষমা চেয়ে নেওয়া—সে আমার মনভাগ্যে ঘটে উঠলো না। ছুটি তো এখন একেবারেই নেই, এক দিনের জন্তও জেলা ছেড়ে যাবার মোটেই এখন উপায় নেই আমার। এখানে স্বদেশী-প্রচারের হজুকটা বড়ই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে, একবেলার জন্তও চ'লে গেলে, যদি কিছু ঘটে তো চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে। তোমার বাবাকে স্বতন্ত্র পত্র দিয়েছি, তাঁকে প'ড়ে শুনিও।

তোমার চিরানুগত—তরুণ।

মিঃ মল্লিকের পত্রখানায় এর চাইতেও অনেক বেশী বিনয়-নম্রতার সহিত তাঁহাদের দিন-কয়েকের জন্ত যশোহরের বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে যে তাঁহার চিরভৃত্য ও একান্ত স্নেহাস্পদ সন্তানকে কত বড় আনন্দ ও গৌরব দান করা হইবে, তাহা লেখনী-মুখে জানানই যে অসম্ভব! আর এই অনিবার্য বিচ্ছেদে যে বেবির চিত্তও ক্রিষ্ট হইয়াছে এবং এ মিলনে যে সেও নিরতিশয় সুখী হইবে, এ আভাসও এ পত্রে অতিশয় সঙ্কপণেই প্রদত্ত হইয়াছে। আর একটা কথাও উল্লেখ ছিল। সেটা এই—“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার হতভাগিনী প্রথমা পত্নীর দীর্ঘ-জালা শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া পূর্ণ শান্তি-লাভের আশা হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন, আর তিন চারি সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার অভিশপ্ত জীবনের শেষ হওয়ার সম্ভব। অতএব আর দীর্ঘকাল বোধ হয় আমাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।”

আপনার বিশ্বস্ত ও বিনীত ভৃত্য—তরুণ।

পত্রপাঠ সমাধা করিয়া একটা দীর্ঘ—দীর্ঘতর নিশ্বাস জ্যোষ্ঠ-মধ্যাহ্নের আশুনে-ভরা ঝড়ের মতই কৃষ্ণার তপ্ত বক্ষ ভেদ করিয়া উথিত হইল। সে সেই দুখানা চিঠি কোলে করিয়া—মরা ছেলে কোলে করিয়া মা যেমন করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি তার মুহমান হইয়া বসিয়া রহিল! তাহার সন্তো-জাগ্রত সমস্ত আশা, তাহার অন্তরের সমুদয় সঞ্জীবিত সুধারস যেন এই সঙ্গে কে জোর করিয়া মোচাকের মধুর মতই নিঃসৃত করে নিঙড়াইয়া লইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। এই চিঠি বাপের হাতে পাড়লে তার পর তার ভাগ্য কোন্ পথের পথিক হইবে, সে কি আর তাহার জানা নাই! যশোহরের নিমন্ত্রণ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। সেখানে সর্বদা তাহার চোখে চোখে কাছে কাছে থাকিয়া তাহার প্রণয়-নিবেদনের সহস্র খুটিনাটি তাহাকে সহিতেই হইবে, উপায় নাই। কিন্তু আজ সে প্রেমের প্রলাপ-ধ্বনিতে যে তাহার বিদ্ধ-হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে। তাহার কাতরাচিত্ত পাগল হইয়া পলাইতে চাহিবে, সে তাহাকে ঠেকাইবে কি দিয়া? এত দিন সে উহাকেই নির্বিচারে নিজের ভবিষ্যৎ স্বামী মনে করিয়া উহার কাছে একজুনো-চিত আদর-আল্লাস করিয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে তাহার দিকু হইতে এমন কোন প্রেমের

নিশানা প্রদর্শিত হয় নাই, যাহার স্মৃতি তার কৌমার-চিত্তে এক বিন্দুও সঙ্কোচের লজ্জা আনয়ন করিতে পারে; কিন্তু সে পক্ষ হইতে যে অজস্র প্রণয়-স্মৃতি ও তার সঙ্গে সমান ওজনে মাপিয়া অনন্তসাধারণ হীরা-মতির উপহার তাহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে, সে তো নিজের জিনিস মনে করিয়াই বিধাহীন সানন্দচিত্তেই সে সব গ্রহণ করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে ক্রটি করে নাই! এই অপরিমেয় অপরাধের কা লমা মুখে লইয়া আজ কোন্ মুখেই বা সে তাহার সেই উৎসাহপ্রাপ্ত যত্নে বর্ধিত উদ্যম আশালতার মূলে বিমূঢ় চিত্তের কুঠার তুলিয়া ধরিবে? আজ নিজের অন্তরেব সত্য তাহার কাছে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে তাহাকে ভালবাসে না,—অর্থাৎ প্রেম যাহাকে বলে, সে জিনিস তাহার হৃদয়-যন্ত্রটাকে কাটিয়া কুচিকুচি করিয়া ফেলিলেও তাহার মধ্য হইতে উহার উদ্দেশ্যে এক ফোঁটা বাহির হইবে না,—কিন্তু বাহিরটা যে তাহার বালা-চাপলের অজ্ঞতাজনিত মিথ্যার জালে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কোথায়? উপায় কোথায়? উপায় কি নাই?

ঘরের পর্দার বাহিরে একটা চটি-জুতার শব্দ হঠাৎ ধামিয়া গেল। সর্ব-শরীর-মনে চমকিত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ-মুখে কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িয়া মানসোদ্বেগে দ্রুত-কম্পিত-স্বরে বলিয়া উঠিল—“আহুন!” তাহার কণ্ঠে অকূলে নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির আকস্মিক কুল-প্রাপ্তির সপ্রচুর আশা ও অনির্বচনীয় আনন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল বিনয়।

“বাঃ! আপনি বুঝি আমাদের কাজ থেকে এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ে ছুটি নিরেয়ে রসুলেন? বেশ তো! তা হবে না! চলুন চলুন, আপনাকে না হলে আমাদের তো কিছুতেই চলবে না—”

হাসিমুখে এই কথা বলিতে বলিতে সে কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে ধামিয়া গেল, ও ঈষৎ অপ্রতিভের ভাবে আস্তে আস্তে বলিয়া ফেলিল—“আমি এ রকম অকস্মাৎ নাদির শার মতন এসে পড়ে হয় তো আপনার অনেক আনন্দের ব্যাঘাত করে ফেলুম, না?—আমার কেমন মন্দ স্বভাব, ঘোঁকের মাথায় কিছুই হুঁস থাকে না।”—এই বলিয়াই সে কক্ষগচ্ছ কৃষ্ণার হাতের মুঠায় চাপিয়া

রাখা চিঠিগুলার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখের ও আলোর আভা তখনই মলিন হইয়া গিয়াছে।

সে দৃষ্টি ও তার সঙ্গে বিনয়ের ঐ অর্থ-নিহিত আত্ম-তিরস্কার কৃষ্ণার মনের ক্ষতে যেন ভীমরুলের হল ফুটাইয়া দিল, এমনি ব্যাধা-কাতর ব্যাকুল চোখে সে তড়িৎ-বিকাশের ক্ষুধার মতই নিমেষমাত্র উত্তর পানে চাহিয়া দেখিল, নিজের মুখের উপরকার আতপ্ত-রক্তমা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে গাঢ়তর হইয়া উঠিল, সে-ও সে তাহার ভিতরের রক্তোচ্ছ্বাসের দ্রুত উত্থান হইতেই অনুভব করিয়া বিব্রত নতমুখে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া অনিশ্চিত দ্রুতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “না না, আপনি এসে আমার কত যে উপকার করেছেন, সে আপনি জানেন না। আমি এ কটা দিন মোটে বেরুতে পারি নি, আজ যাব ভেবেছিলুম।”—এ কথাটা সে মিথ্যাই বলিল! আজ বাহির হইবে, এই মুহূর্তের পূর্বে সে কথা ভাবিতে সে অবসরও পায় নাই।

শিশু-সুলভ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয় প্রায় নাচিয়া উঠিবার যোগাড় করিয়া তুলিল এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “আপনাকে পেয়ে অবধি আমাদের যে কাজ কতখানি এগিয়ে গেছে, সে জানলে আপনি অবাক হইয়া যাবেন! আপনার নাম শুনেই কত লোক বলতে থাকে, সেই মল্লিক-সাহেবের খুব সুন্দরী আর ফাসানাবল্ মেয়ে! তিনিও এতে ঘোগ দিয়ে ‘গড়া’ পাবেন! তবে আমরাই বা না পারবো কেন।—কেউ বলে, তা হলে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিসটার মধ্যে সার আছে, শুধুই একটা হজুক নয়! অত সুখী বিলাসী লোক যারা, তারাই যখন এই কচ্ছসাধনের পথে ফিরে দাঁড়াচ্ছে, তখন বিশেষ কোন লাভের আশা না থাকলে, আনন্দ না পেলে, শুধুই অসার কল্পনার পথে ঐ সব বস্তুজীবী লোকরা শুদ্ধ আসবে কেন? ওরা তো বোকা নয়, মূর্থ নয় এবং গরীবও নয়। দেখুন, আপনার এই একটি আদর্শই দেশের ছেলেমেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছেন। আপনার মত আর ছ-চারজন এলে তখন আরও কত সহজ হবে, ভাবুন তো!”

বিনয়ের এই সরল অভিব্যক্তিতে তাহার কর্ম-জীবনের সাফল্যজনিত আনন্দরস যেন উপচিয়া পড়িতে গেল, কিন্তু এই অপরিমেয় আনন্দের কাকলী যেন কৃষ্ণার তৃষিত-অস্ত্রের সব তৃষ্ণা মিটাইয়া তুলিতে প্রচুর বলিয়া তাহার মনে হইল

না। সে অপরিবৃত্ত ঔদাস্তে অথচ একটুখানি স্নান-হাসি হাসিয়া কহিল—“তা হলে আমি আপনাদের ননকো-অপারেশনের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছি বলুন?”

হৃদয়-খোলা সুপ্রচুর উচ্চ হাস্য করিয়া বিনয় উত্তর দিল, “তা একরকম বৈ কি!—” তার পর সেই হাসিমুখেই একটুখানি নিঃশ্বরেও যেন কতকটা আপনা-ভোলা ভাবে সে কহিয়া উঠিল, “তা ছাড়াও আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে বেশ একটু উৎসাহ পাই, আনন্দও পাই। সেটুকু কিন্তু আপনার আড়ালে হয় না।—”—আবার সেই প্রকার কলহাস্ত করিয়া উঠিয়া বালকের মতন আগ্রহভরে চঞ্চল হইয়া কহিল—“এই জন্তই দেবাসুরের যুদ্ধে পরাস্ত দেবসেনাপণের দেবী-আরাধনার প্রয়োজন ঘটেছিল, এবং মহাশক্তিকে সহায় না করা অবধি তাঁদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হয়েচে, তা জানেন?”

কৃষ্ণার সেই টকটকে রাজা গাল যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, বুকের মধ্যেও তাহার ঠিক এই একই রকমে গরম রক্তের তোলপাড় চলিতেছিল;—ঈমারের চাকার ওলায় পড়ায় জল যেমন সমুদ্রের মতন কল্ কল্ শব্দ করে, তেমনি করিয়া তাহারও দুই কানের মধ্যে তাহার নিজের বুকের রক্তের চেউএর গর্জন শোনা যাইতে লাগিল। একটা শব্দও তাহার সেই শোণিত-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠ দিয়া বহির্গত হইতে সমর্থ হইল না।

বিনয় নিজের মনের উচ্ছ্বাসেই শ্রোত্রীর বিপরা-বস্থায় লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করিয়াই বালগা যাইতে লাগিল।—“কিন্তু দেখুন, একটা জিনিস পাবলিক—এই সাধারণ লোকে ঠিক বুঝতে পারে না—আর আমারও কেমন খটকা লাগে। আপনি এই যে বিদেশী শিল্প, বিলাসিতা প্রভৃতি বর্জন করবার শপথ নিলেন, কিন্তু যখন আপনি মিসেস লাহা হবেন, তখন কি করবেন? তিনি যে এ দিকে মন দিবেন, সে তো বিশ্বাস করতে পারা যায় না। এই আজকেরই……কাগজে দেখবেন যে, তাঁর সম্বন্ধে ‘এডিটোরিয়ালে’ কি সব লিখেছে। কাছাকাছি মাঠে বন্দে মাতরম্ বলে চেঁচানর জন্তে তিনি না-কি তিন জন ছোট ছোট ছেলেকে এক মাস ক’রে জেল দিয়েছেন। এক জন আমলা তাঁকে দেখে সেলাম করে নি বলে চাপরাসী দিয়ে তার কান ধ’রে দৌড় করিয়েছেন। তা এই লোককে যে কি ক’রেই আপনি সহ্য ক’রে চলবেন, ও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন, তাই ভেবে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, এবং—এবং—”

বিনয় হঠাৎ নিজের অন্তর-উৎসারিত বাক্য-শ্রোত কক করিয়া ফেলিয়া ছুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া কহিয়া উঠিল,—“আপনার কি অস্থখ কর্চে না কি?”

“হু”—বলিয়াই কৃষ্ণ পাশের চেয়ারখানার উপর এলোমেলোভাবে বসিয়া পড়িয়া চোক বুজিল। যে সমস্তাটা তাহার জীবনে আজ সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে,—বিনয়—এই সরল সত্যবাদী ও নির্ভীক বিনয়,—ঠিক সেইখানেই যে ধাকা মারিয়াছিল! উঃ কেমন করিয়া,—সত্যই তো কেমন করিয়া এই দুইটি জীবন-পথের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন লক্ষ্য-পরিচালিত নরনারী একাত্মতার পূণ্য-শপথ গ্রহণপূর্বক পতি-পত্নীত্বে রূত হইবে? পরম্পরের আশা উদ্দেশ্য আনন্দ সবই যখন আজ পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন কত বড় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াই তাহাদের বলিতে হইবে যে, আজ হইতে ‘তোমার আমার হৃদয় অভিন্ন!’—কৃষ্ণার সেই প্রভাত স্থল-কমলের মত সরস মুখ নিমেষে সায়াক-পদ্মের মতই ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গেল। সে একটা গভীরতর আত্মক্লান্ত সজোরে টানিয়া সেটাকে অবরুদ্ধপ্রায় বকের মধ্যে প্রেরণ-চেষ্টা করিল। নহিলে যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল।

বিনয় এইবার তাহার আগাগোড়ার অদ্ভুত ব্যবহারটাকে যেন নিজের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিয়া ইহার মানাক্রম কারণ কল্পনামাত্রে সব চেয়ে সঙ্গত ও সহজ যেটাকে তাহার সর্বপ্রথম মনে হইল, ফস্ করিয়া সেইটাকেই সে অসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল—“উঁহু, তা নয়! মিঃ লাহার সম্বন্ধে ঐ সব নিন্দা করার আপনি বোধ হয় চটেছেন! কেমন,—ঠিক ধরেছি কি না?”

বিনয়ের এই শিশুসুলভ অকৃত্রিম সরলতা ও তাহার কণ্ঠের এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অত্যাশ্রয়িত বেদনার স্বাক্ষরে কৃষ্ণাকে যেন তাহার তলাইয়া-পড়া গভীর অবসন্নতা হইতে এক মুহূর্তেই তুলিয়া দিল। সে এই কথায় চম্কাইয়া উঠিয়া ঠিক নিজের সহজ অবস্থায় যেন সুপ্তোথিতের মতই ফিরিয়া আসিল, এবং সমুদয় মানসিক সংগ্রামকে একই ক্ষণে জয় করিয়া লইয়া শান্তভাবে কহিয়া উঠিল,—“না, বিনয়বাবু! সত্যকে সহ্য করে নেবার শক্তি আমি পেয়েছি। আর সে আপ-নার হাতের চাবুক খেয়েই পেয়েছি। আপনার

৫৮ (ক)—৮

কথার কোনখানেই কোন রাগ-অভিমানের উপায় নেই; কারণ, এর সবখানিই সত্য! জোর করে উড়িয়ে দিলে, রাগ করলে তা নিয়ে লড়াইতে গেলেও সত্য কোন দিন মিথ্যা হবে না। অস্বীকার করা না, আমিও আপনার মতই আমার নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বড় বেশী ভাবনায় পড়ছি, আর তারই জন্ত আমার সকল কাজেই এ রকম এলোমেলো ভাব দেখছেন। যেহেতু জীবনটাই এখন আমার জটপাকান গোলমালে হয়ে পড়েছে।—আচ্ছা, কি করি বলুন তো?”

বিনয় উহার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে উহার সহিত সমন্বয়ে ও সহানুভূতিতে বিগলিতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ, এই অপক্লম-চরিত্রা কৃষ্ণার কথা—তাহার জীবনের এই মহাসঙ্কটের ভাবনা—সে নিজেই যে আজ কয় দিন দিন-রাত্রি ধরিয়া না ভাবিয়া পার পাইতেছে না! তাহার প্রতি নিজের অবিচার ধরা পড়িয়ামাত্রে যে অন্ততঃ বেদনায় সে ইহার ‘পরে’ নিজের অশ্রদ্ধ অন্তরকে অবনত করিয়া দিয়াছিল, ইহার অত্যধিক দ্রুত উত্থানশক্তি, অপরিমিত ত্যাগ-মাহাত্ম্য, অধ্যবসায় ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা-দর্শনে প্রতি-ন্যস্ত সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির উৎসে উৎ-সারিত হইতে হইতে সহস্র-ধারার নিজের সারা-চিত্ত প্রাণ সুধাসিক্ত করিয়া দিয়াই যে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার হস্তস্পর্শে কঠিন কন্দ-ভূমি সরস হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সাহচর্যে তাহা-দের কন্মোদীপনা শতগুণেই বর্ধিত হইতেছিল। এই শক্তিময়ীকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা নিজে-দের শক্তিকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ বলিয়া নিজেরাই পূর্ণোত্তমে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই অকাল-বোধিত শক্তি পাছে প্রবল-হস্তে অপহৃত হইয়া তাহাদের নবো-দ্দীপিত আশার শিখাটুকুকে নির্দীপিত করে, সেই সম্ভাবনার অমঙ্গল-হেতুকে সে বা তাহারা কেহই যে একবারও ভুলিতে পারিতেছিল না; সেটা আর বিচিত্র কি? তাঁদের রাহুর মতই সে যে ইহারও পিছনে লাগিয়া আছে।

কৃষ্ণার এই সহজ ও সাগ্রহ-অভিযুক্তিটুকু তাহার কানেও তাই বড়ই মধুর ঠেকিল এবং ইহাকেও তাহার অকৃত্রিম সাহায্য প্রার্থনা করিয়াই বিশ্বাস জন্মানর, সে তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরগত চিন্তা-ধারারই অনুবর্তনে তৎক্ষণাৎ এই উত্তর

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিল, “আপনি যদি মনে বুঝে থাকেন যে, এ বিবাহে সুখী হ’তে পারেন না, তা হ’লে সে বিয়ে করতে যাবেন কেন? আপনারা তো রক্ষণ-শীল সমাজের লোক নন, আর কম বয়সের বাপ-মায়ের দেওয়া বিয়েও তো আপনাদের হয় না। তা হ’লে আর বাধা-বাধকতাটা কার কাছে!”

বিমর্ষ-মুখে হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল,—“দেখতে শুন্তে কতকটা উপায় উপর তাই বটে, কিন্তু এ সমাজেও মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। অত্যন্ত গরীব বা সামান্য লোককে মেয়ে যদি হঠাৎ পছন্দ ক’রে ফেলে, তার কর্তৃপক্ষরা তার নিরীচ-চন নিশ্চয়ই যে মঞ্জুর করবেন না, এটা অনেক সময় দেখেছি। তবে সুখের বিষয় যে, মেয়েরা প্রায়ই তেমন বোকা হয় না। যাই হোক, আমার সম্বন্ধে সে ভুল যখন হয় নি, তখন যে আমি এক কথার ছাড়ান পাবো, এমন আশা করতে পারা—” কৃষ্ণা এই সামান্য দিনের পরিচিত নবীন কর্ম-বজুর নিকট এতখানি খোলাখুলি কথাবার্তা কহিতে গিয়াও আচম্কা যেন কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল, এবং তাহাতেই হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

বিনয় তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি একবারমাত্র বিষদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেই তাহার সঙ্কট-অবস্থা সবটাই না হোক, তবু যেন বহুল পরিমাণেই অনুভব করিতে পারিয়া তাহার জন্ত অত্যন্ত বেদনা ও নিজের জন্ত তেমনি একটা নিরা-নন্দতায় ডুবিয়া গিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত বিমর্ষ নতমুখে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিল। তার পর সহসা যেন কি একটা আগন্তুক আশা ও আনন্দে, উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া সে প্রায় লাফাইয়া উঠিবার জোগাড় করিয়া সোলাসে বলিয়া উঠিল, “দেখুন! আমি এর একটা পথ পেয়েছি! ‘নন-কো-অপারেসন, এণ্ড নন-ভারোলেন্স্ বট্ প্যাসিভ্ রিজিস্ট্যান্স্’। আপনার এই কেস্টাতেও তাই খাটবে!—কি বলেন?”

কৃষ্ণা এই ছেলেটির কথার রকমে কোতুক বোধ করিয়া অত হুঃখের মধ্যেও হাসিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটের পাশেই মিলাইয়া বুকের মধ্যে আশার তড়িৎ চকিত হইয়া উঠিল। এই অসহযোগিতার পথই হয় তো তাহার সকল ক্ষেত্রেই অবলম্বনীয় মুক্তির পথ হইতে পারিবে।

মিঃ লাহার লিখিত ডাক্তার মল্লিকের নামের চিঠিখানা চুরি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্ত কৃষ্ণার মন লোভ-চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকিলেও অদূর-ভবিষ্যতে ধরা পড়িবার ভয়েই সেখানা সে বাপকে গিয়া পড়িয়া শুনাইল; শুনিয়া যে বিগতক্ষমী ডাক্তার-সাহেব আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, সে কথা না বলিলেও চলে। কম দিন হইতে দিনের পর দিনেই তাঁহার চিত্তে তাঁহার একমাত্র সন্তান ও অবলম্বন এই মেয়েটির প্রতি গভীর অপ্রসন্নতা জন্মিয়া উঠিতেছিল। সে তাঁহার ছয় জন পেসবককে ছাড়াইয়া দিয়াছে, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে তাড়াইয়াছে, তাঁহার খাবারের ফল কমদামী, মাংসর চেয়ে রুটির পরিমাণ বেশী ও পানীয়ের মধ্যেও সোডা অধিক চালিতেছে, ইহা বেশ জানা গিয়াছে। আর যে কোথায় কি হইতেছে, সে সব অন্ধ বলিয়া তাঁহার দেখিতে পারিবার উপায় নাই। হয় তো তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার সাংসা-রিক ছরবস্তার চিহ্ন তাঁর এই অপরিণামদর্শী মেয়েটার খেরালে দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইবে। তখন লজ্জায় তিনি মুখ লুকাইবেন যে কোন্‌খানে, সেই ভাবিয়াই মুখ মাথা তাঁহার ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জলিয়া উঠে।

সে দিন সকাল-বেলাতেই ডাক্তার সাহেবের বিশেষ বন্ধু এবং মিসেস্ করের পিতা মিঃ হাল-দার আসিয়া তাঁহার মনের আগুনে বেশ দুখানা ইন্ধন জোগাইয়া গেলেন। তিনি আসিয়াই কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এ কি!—তা হ’লে পাঁচ-জনে যা বল্চে, তার তো কিছুই মিথ্যে নয়। বেবি! এ তোমার কি সখ? গড়া প’রে খালি পা ক’রে তুমি না কি ছোট লোকদের মধ্যে ‘প্লীচ্’ ক’রে বেড়াও, আমি সে কথা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি; কিন্তু এখন তো স্পষ্টই চক্ষের উপর তোমার সেই বেশই দেখছি। তা হ’লে তুমিও ওই গুণ্ডাদের দলে মিশেছ?”

কৃষ্ণা তাঁহার জন্ত চা তৈরী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া যুহু যুহু অনুযোগ করিল।—“গুণ্ডা তাদের কেন বলছেন জ্যোঠামশাই? তারা তো লাঠী-সোটা নিয়ে বেড়ায় না।”

মিঃ হালদার চোক কপালে তুলিয়া ফেলিলেন, “বলো কি বেবি! লাঠী না থাকলেই কি গুণ্ডামী করতে কিছু কম পড়ে? তারা জবরদস্তি লোককে

খদ্দর পরাবে? না হোক অমনি হরতাল ক'রে
—লোককে আফিস-ইস্কুল ঢুকতে দেবে না, এ কি
মগের মুলুক পেয়েছে না কি?”

কৃষ্ণা ঈষন্মাত্র হাসিয়া ফেলিল, “না জ্যোষ্ঠা-
মশাই! মুলুক যে ‘মগের’ নয়, সে বেশ দেখা
যাচ্ছে। তা—সে যার মুলুকই হোক না কেন,
দেশের লোককে হাতে-কাটা সূতোর কাপড় পরতে
বা তৈরী করতে বলায়, এই অন্ন-বস্ত্র-সমস্তার
দিনে অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিদেশী জিনিস বর্জন
করতে জোড়হাতে অমরোধ করার এবং জাতীয়
ঐক্যতার অমরোধে একটুখানি স্বার্থহানি করবার
জন্ত উপদেশ দিতে যাওয়ার যদি গুণান্বী করা
হয়, তা হ'লে সমস্ত পাশ্চাত্য-জগতের সমস্ত লোক-
গুলো যে কত বড় বড়ই গুণা, আর এ জগতে
কাজ সাধ্য নেই বটে, তা হ'লেও এক জন মাত্র
যার তাদের বিচার করবার শক্তি আছে, তাঁর
পরকারে ওদের কি না কঠোর দণ্ডই হওয়া উচিত,
তাই আমি ভাবচি।”

মুখ লাল করিয়া হালদার সাহেব যেন কুই-
নি-মিক্‌চার খাইতেছেন, এমনি ধরণেরই মুখ-
খানা করিয়া তা খাইতে লাগিলেন, এবং কৃষ্ণার
আড়ালে তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া তাহার মর্ম্মাহত
বাপের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাঁহার বেশ
একটি হৃদয়-আলোচনা চলিতে লাগিল। হালদার
সেই অল্প অসহায় বন্ধুটিকে অনেক উপদেশ ও
সাম্বনা দিয়া তাঁহার এই অসাধ্য অবাধ্য কন্ডার
সমস্ত শাসনভারই যে এই সময় হইতেই মিঃ লাহার
হাতে তুলিয়া লইতে দেওয়ার সহায়তা করা একান্ত
কর্তব্য, এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিয়া
তাঁহার মনের একান্ত বাকি বিধাটুকুও নষ্ট করিয়া
দিলেন। তার পর চুপে চুপে ছই বন্ধুতে মিলিয়া
কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইল। তার সার মর্ম্ম
এই প্রকার;—মিঃ লাহার জীবনমুতা জী যদি
এই সপ্তাহে মরিল তো উত্তম, যদি না মরে, তাহা
‘যেন তেন প্রকারেণ’ কৃষ্ণাকে বুঝাইয়া ইউক, না
বুঝাইয়াই ইউক, তাহাকে অন্ততঃ হিন্দুবিবাহপদ্ধতি
অনুসারে তরুণচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফেলা
আবশ্যক, এবং ইহা করিতেই হইবে।—তাহাতে
সন্দেহ নাস্তি! বন্ধুবান্ধবেরা প্রথমটায় নিন্দা
করিবে, হয় তো এই মিঃ হালদারও লোক দেখাইয়া
তাঁহাকে মুখে ছইটা ভৎসনা করিতেও পারেন,
তাহাতে কি আসিয়া যায়? মেয়েটা তো রক্ষা
পাইল। তা তিন্ন ইহার এই নিন্দিত আদর্শ

হইতে ইহাদের পাঁচ জনার ঘরের বধু-কন্যাগণও
রেহাই পাইবে। আর স্বার্থ এবং সুযোগের
খাতিরে অনেক বড় বড় লোকেই যেখানে মত
ও আদর্শকে খর্ব করিয়া কন্যা-পুত্রের ভবিষ্যৎমাত্র
দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখন মিঃ মল্লিক আর কোন্
ছার? এক-জী বর্তমানে হিন্দু-বিবাহ চলে, অত-
এব হিন্দুই মানি বা না মানি, হিন্দু বলিতেই বা
নোষ কি? জাতি বা ধর্ম্মের জন্ত তো আসিয়া
যায় না, সুযোগটাই সকল ক্ষেত্রে সব চাইতে
নিরকারী।

অতএব মিঃ লাহার প্রথম পত্র পাইবামাত্র সাজ
সাজ রব পড়িয়া গেল, এবং তাঁহার দ্বিতীয় পত্র যখন
চাপরাসী-বাহিত হইয়া আসিল, তখন ‘পর্যন্ত
ছাড়িয়া সিদ্ধর উদ্দেশ্যে প্রবাহিত নদীকে’ যেমন
‘রোধিতে পারা’ কাহারও শক্তি-সাক্ষেপ নহে,
তেমনি করিয়া মিঃ মল্লিক ভাবী-জামাত-গৃহোদ্দেশ্যে
ছুটিয়া বাহির হইবার যোগাড় করিয়া তুলিলেন।
কৃষ্ণা প্রথমে মিনতি করিল, তার পর অস্বস্তি করিয়াছে
বলিয়া বিছানায় কবল মুড়ি দিয়া গুইল, তিনি
চাকরের হাত ধরিয়া সেখানে গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়া
মহা গোলমাল বাধাইয়া তুলিলেন। তার পর
চাকরকে সরাইয়া দিয়া ছেলে-মানুষের মতন হাউ-
মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মেয়েকে বলিলেন,
“তুই যদি এমন ক'রে আমার এত সাধে বাদ
সাধিস্ বেবি! তা হ'লে আমি নিজের মাথা
নিজে কাটিয়ে ম'রে যেতে বাধ্য হবো।—তুই
কি চান্ যে তুই ওকে চটিয়ে তুলে ঐ দেড় লাখ
টাকার দেনার দায়ে আমার ও পথে বার ক'রে
দেয়? তোর এখন বয়সের জোর আছে, গায়ের
রক্ত গরম আছে, তা'তেও তোর দুকপাত না
হ'তে পারে, কিন্তু আমার যে মনে হ'লে বুক ধ'মে
যায়! এই বয়েসে, এই শরীরে কাণা-মানুষ আমি,
তার উপর চিরদিন আমি ভাল খেয়েছি, ভাল
পরেছি, ঐ ‘একটা অভ্যাস’ হয়ে গেছে,—আমার
কি দশা হবে, তাই বল তো? তোর কি আমার কথা
মনে ক'রেও কোন মায়া হয় না, দেশ উদ্ধার
করতে গেলে কি বুড়ো বাপকে মেরে ফেলতে হবে,
এমন কোন্ নূতনতর বিধান বার হয়েছে?”

কৃষ্ণা ইহার বিরুদ্ধ-বুদ্ধি লইয়া একটুও তর্ক করিল
না। তাহার দুহিত-গৌরব এখন অসহায়
অনুগ্রোপায় অন্ধ পিতার মর্ম্মান্তিক আবেদনে
যেন বিধা বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। লজ্জায়
অনুতাপে তাহার ধরনীগর্দ-পরেসন ইহা

মধ্যে জাগিতে ছিল। এই বাপের সুসময়ের সকল সুযোগই তো সে নিরীচায়েই নিজের জন্ত গ্রহণ করিয়া গিয়াছে; আর আজ তাহার বিচার শীল অন্তর তাহার পূর্বাভাসকে ঘূণাপূর্বক পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে বলিয়াই কি না—সে সেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজের—অসহায় বাপের কথা—তাঁহার লাভক্ষতি, অভ্যাস-অনভ্যাসের সকল ক্রটি পর্যন্ত মমতাবিহীন বিষয়ে নিজের স্বার্থের খাতিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতে ছ? এই কি সম্ভব? সে যে পথকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছে, সে পথে তাহাকে চলিবার চেষ্টা যথোচিতভাবেই করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পূর্বে তার বাপের পথকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া যাওয়া হইবে না। তাঁর সর্বস্বামী সুযোগটুকুকে বাধিয়া দিয়া তবেই সে তার নিজের চক্র সূরু করিতে পারিবে। এর জন্ত যদি পথ একটু বাঁকা হয়, কিছু বিলম্ব ঘটে, সহিতে হইবে। সে গায়ের ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিল এবং নিজের বাঁকা মনকে জোর করিয়া রাশ-টানা বোড়ার মতই ফিরাইয়া রাখিয়া সে এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—“তা হ’লে, চলো।”

মল্লিক-সাহেবের মোটর দেখা গেল, রাস্তার পাশেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতীক্ষিত-নেত্রে চাহিয়া উদ্ভিগ্ধচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, ইঙ্গিতে গাড়ী থামাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল মুখ নিগূঢ় আনন্দের আভাষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; কৃষ্ণার শোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া ফুটয়া উঠিল। সেই লালপেড়ে মোটা শাড়ী এবং তেমনি মোটা হাত-কাটা ফিকা গৈরিক-বর্ণের লালপেড়ে শাড়ীর পাড়-লাগান জ্যাকেট এবং গোটা-কয়েক চাপা ফুলে গাঁথিয়া গড়া ছোট্ট দুখানি পায়ের পাতা বাহির করিয়া শুধু দুইটা চামড়ার চটি-জুতা। কিন্তু গায়ের রংয়ে জামার রংয়ে মিশিয়া গিয়া এত সাধারণ—এত মোটাসোটা পোষাকেও যে তাহার অনুপম লাভ্যাকে কিয়ৎপরিমাণেও স্নান করিতে পারে নাই, এই সঙ্গে সেইটুকুকেও লক্ষ্য-ভূত করিয়া তুলিয়া এই বিপন্ন প্রেমিকের বেশুরা চিত্ত-বীণায় আবার আশারাগিনী বাজিয়া উঠিতেও বিলম্ব ঘটিল না। মন এই কথা বলিয়া সেই সুবোধ ব্যক্তিটিকে সান্ত্বনা দিল যে, ‘এ ভাব রবে না চিরদিন’—অতএব এ লইয়া অনর্থক এই জ্বিদের মুখে একটা কাটান-ছাড়ান করিয়া ফেলিও না যেন? আগে গোড়া বাধিয়া লও, তার পর

সবুরে মেওয়া ফলিতে থাকি থাকিবে না। অতএব ‘কুরু ধৈর্য্যং’!

মিঃ মল্লিক বিস্তর ছন্দোবন্দে তরুণচন্দ্রের এবারকার না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া আসায় তিনি এবং তাঁহার কত্না যে মনের মধ্যে কত বড়ই বিষ্ময়-বেদনার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষে দুজনে মিলিয়া কি কি করিয়া কোন্ কোন্ কথা বলিয়া তাঁহার ‘পরে’ নিজেদের আশ্রয়্য ভালবাসা ব্যক্ত করিতেছিলেন, সেই সব কাহিনীই ঝড়! ছুটি ঘণ্টা ধরিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। সেই আশখানা-মিথ্যা ক্লাস্তিকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে তরুণচন্দ্র পুনঃপুনই নত-বদনা কৃষ্ণার বিরক্তি-বিপন্ন লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ইহার সম্পূর্ণ অবসার্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লইলেন! কৃষ্ণার ভাবভঙ্গি যে আজও সেই পূর্ণ বিদ্রোহের অভিযুক্তী হইয়াই রহিয়াছে, এই নিমন্ত্রণক্ষেত্রে যে তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতেই তাহার পিতা তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন, এবং এইরূপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে হওয়ায় সে যে তাঁহার ‘পরেও খুবই সম্ভ্রষ্ট নয়, এ কথাটাও বুদ্ধিমান তরুণচন্দ্রের বুদ্ধিতে বাকি ছিল না। মনে মনে ক্ষুধায়াস পরিত্যাগ করিলেন। মনটা যে নবীন আনন্দের গাঢ় পীযুষ-রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সবটুকুই যেন নিষতীকৃত ছষ্টম্বাদ হইয়া গেল। ‘হু’ এক-বারের দৃষ্টিতেই তাঁহার কয়দিনকার বিমান-বিরচিত সমস্ত-গঠিত সু-উচ্চ প্রাসাদ ভূমিস্তাৎ হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার আশাহত চিত্ত কাতর অর্ন্তনাদে কাঁদিয়া বলিল, “এই কনকপ্রতিমার কাঞ্চন-গঠিত দেহটা তোর যার মধ্যে তুলিয়া বসাইলি বটে, কিন্তু মনটুকু তার সে কোথায় রাখিয়া আসিল? সেটুকু তো তোর জন্ত এ সঙ্গে করিয়া আনে নাই।”—তাঁর বোধ হইল, তাঁর বাপের বাড়ী যে দুর্গাপ্রতিমা আনা হইত, এর চেয়ে তার গড়া মূর্তিতেও যেন মানবীক বেনী প্রস্ফুট থাকিত। একেই কি সে এত দিনের অবিচলিত সহিষ্ণুতার সর্বস্ব-পণে আপন করিতে চাহিতেছিল?

মনের মধ্যে বড়ই অভিমান হইল, এততেও তিনি এই একটা মনকে বাধিতে পারিতেছেন না। এত দিন তো সে তাহার ভালবাসা আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিদানে,—তা এক জন ভদ্রবরের কুমারী মেয়ের পক্ষে প্রতিদানে

আর কতটুকু দেওয়া সম্ভব? যেটুকু সম্ভব, সে তো কই দিতেও কার্পণ্য করে নাই? তাঁহাকে সে এত দিন ভালবাসিত বৈ কি! তবে হঠাৎ আজ কাল আবার হইল কি? গড়া পরিলে কি মানুষের মনটাও ঐ রকম কঠোর হইয়া যায়? অথবা—আরও কিছু? আর কি কেহ আমার এত দিনের আসন দখল করিয়া—এ আবার কি ভাবনা? আমিও কি জেলাস্ হলাম না কি? ইচ্ছা করে প্রমীলাকে কোন রকম করে—নাঃ, আমায়ও সে পাগল করে দেবে দেখছি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রকাণ্ড বাংলোখানি পুরাদস্তুর সাহেবী কেতায় আগাগোড়াই সাজান ছিল। যে দিন কৃষ্ণা মল্লিকের নিমন্ত্রণ পত্র এখান হইতে গিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে সাজসজ্জার সবটাই যেন তরুণচন্দ্রের চোখে অসম্পূর্ণ ও বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। কড়া হুকুমে রাজমিস্ত্রী ও ছুতার লাগাইয়া সে সরকারী বাংলোখানার হুঁদিনের মধ্যে চূণ-ফেরান ও রং-লাগান সারািয়া ফেলিল। কালেক্টরীর নাজীর ও কয়েক জন পেয়াদার উপর সকল ভার পড়ায় হুকুম তামিল স্তচারুক্রমেই হইয়া গেল, বাগানে ফুলের কেয়ার করা হইল, গাছে বিচিত্র আকারে ছাঁট পড়িল, নুতন কয়েকটা বহুমূল্যের আসবাব, তার গোটা-কয়েক লেড'লর বাড়ী হইতে ক্রীত হইয়া ছ'একটা নিজের কলিকাতার বাড়ী হইতে বাহিত হইয়া নবীন্য অতিথির সম্মানার্থ এখানে আসিয়া হাজির হইল। ডুইংক্রমে কাঠের টেবিলের বদলে মার্বেল টেবিলে পাঁচশো টাকার ফ্রেঞ্চ কারুকার্যের টেবিল-বুথ, ড্রেসিংরুমে নিজের যা ছিল রহিল, আর একটা ঘরকে জ্বীলোকোচিত ড্রেসিংরুম তৈরি করা হইয়া গেল। তাহারই জন্ত দুইটা সর্বোৎকৃষ্ট নমুনার আয়না লাগান মেহগির আলমারি, মার্বেল পাথর-বসান মেহগির আরসির টেবিল, আরও ছোট-বড় নানারকমের জিনিসপত্র কিনিয়া আসিল। নিজের শয়ন-গৃহের অবস্থা তাঁহার মোটেই সুসঙ্গত নয়। ঘরজোড়া সতরঞ্চ বিহীন, ঘরের মধ্যে এক-খানা স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা লোহার খাট, একটা ছোট ত্রিপদীতে একটা কাঁচের কুঁজার এক কুঁজা

জল, আর কিছুই না। পাশের দিকের একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে সেগুলোকে ডাক্তার মল্লিকের জন্ত নির্বাচিত করিয়া দিয়া এই বড় ঘরখানাকে তিনি বড় সাধেই সাজাইয়া তুলিলেন। তিন আঙ্গুল পুরু গালিচার ঘরের মেজে ঢাকা পড়িল, মাঝখানে সব চেয়ে হাল-ফাঁসানের বিলাতী তৈরি জোড়া-খাট, ছাদ-বিলম্বিত চওড়া কাঠের ফ্রেমে লম্বিত রেশমী নেটের মশারি। খাটের সামনে একখানা সাতফুট লম্বা বেলওয়ানি আয়না এবং ছোট একটা রূপার ফুলদানে মস্তবড় একটা গোলাপের তোড়া। ঘরের পর্দাগুলোও আনুকেরা নূতন ফ্রান্সের আমদানী।

কৃষ্ণা তাহারই জন্ত যত্ন-আহরিত এবং সাদর-সজ্জিত এই সকল বহুমূল্য ও তাহার চির-অভ্যন্ত বস্তুজাতের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বুকের মধ্যে কি যে একটা অনিশ্চিত যন্ত্রণাবোধ করিতে লাগিল, সে যেন সেটা ভাল করিয়া সহিয়া, বহিয়াও বেড়াইতে নিজেকে অক্ষম বোধ করিতেছিল। এই যে সব প্রণয়-নিদর্শন স্তরে স্তরে তাহার চারিদিকে বেড়িয়া থাকিয়া সুস্পষ্ট সোহাগে তাহার চিত্তকে ঘেরিয়া ধরিতে চলিতেছিল, ঐ যে ফুল-গন্ধময় বাতাস তাহারই গায়ের উপর দিয়া যে হাতে ইহাদের চয়ন করিয়া আনিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে সাজাইয়া দিয়াছে, তাহারই হাতের স্নেহের পরশের মতই বুলাইয়া যাইতেছিল, ঐ যে বিকশিত ফুল-গন্ধ, সে-ও তো সেই তাহারই বুকভরা অনুরাগ সুরতির মতই তাহার বুকের বেদনার তারে স্পন্দিত হইয়া তাহার অন্তরের ক্ষতে লবণাক্ত করিয়া দিতেছিল। জানালায় পাশে পাশে বাগানভরা বসন্তের ফুলে ফুলে মোমাছিদের যেন তাহারই এই একনিষ্ঠ চিরসহিষ্ণু প্রণয়-বার্তা তাহাকে জানাইয়া দিয়া তিরস্কারের ছলেই গুণ্ডুগুণানির আর শেষ ছিল না। ইহার মধ্যেও যেন সেই অফুরন্ত প্রেমের গুঞ্জনই তাহার দুই কানের তারে বাজিয়া বাজিয়া তাহাদের বধির করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। চারিদিক দিয়া এতবড় প্রেমের উপাসনা, সে যেন তাহার কাছে অপরাধী চিন্তের মধ্যে সহ্য করিতেও পারিতেছিল না। একটুখানি আড়াল পাইতেই সে একেবারে ছুটিয়া গিয়া বাথরুমের মধ্যে ঘর কঁক করিয়া দিল। সেখানেও চোখ তুলিতেই সেই তাহার হৃদয় মথিত স্নেহের সমুদ্র চারিদিক দিয়া উথলিতেছে, দেখিতে পাইল। এনামেলের নূতন কেনা প্রকাণ্ড মানের চৌবাচ্চা, প্রকাণ্ড আয়না, প্রসাধনের বত

কিছু মূল্যবান বস্তু সভা-সমাজে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব, সে সকলি। এমন কি, নূতন কেনা গামছা-তোয়ালেগুলি পর্যন্ত নব-ক্রীত আলনার তুলিতেছে। একখানি মাত্র সবুজ রংয়ের চামড়া-আঁটা চৌকির উপর অবসরশরীরে বসিয়া পড়িয়া সে কাতর হইয়া কাঁদিল।

যখন ঘণ্টা দুই পরে তাহারই জন্ম নব-নিযুক্ত আয়া আসিয়া ঘরের কাছ হইতে তাহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্ত অনুমতি চাহিল, তখন চোবাচ্চা হইতে এক আঁজলা জল লইয়া তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে দিয়াই কৃষ্ণা ধড়-মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, একটিও কথা না কহিয়া হতবুদ্ধি নব-সেবিকার পাশ দিয়া সোজা ড্রইংরুমেই ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে তখন তাহার বিলম্ব দেখিয়া মিঃ লাহা তাহার পথ-শ্রান্ত ও কিছু অসুস্থ পিতাকে চা প্রভৃতি খাওয়াইয়া এখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে একটা স্ন্যাম্পেন গ্লাস ভরিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সেইটি ইচ্ছা-সুখে চাখিয়া চাখিয়া পান করিতে করিতে নিমন্ত্রকের সহিত যুহুযুহু বোধ করি কোনরূপ বিশেষ কাজের কথাই কহিতেছিলেন। পর্দার কাছে আসিতেই এইটুকু কৃষ্ণার কানে গেল,—“দেখ তরুণ! আমি বলি কি, ওকে অত সমীহ ক’রে চল্‌বার তোমার কিছু দরকার নেই। শ্রেষ্ঠ জোর করবে। আমি যখন তোমার দিকে রয়েছি, তখন তোমার ভাবনা কিসের? এই ক’দিনের মধ্যেই আমার ইচ্ছা যে—”

কৃষ্ণার নিকটবর্তিতা ক্রূপে বলা যায় না—অনুভব করিয়াই সম্ভবতঃ মিঃ লাহা তাঁহার অসম্পর্ক-পূর্বক সতর্ক যুহু-স্বরে কহিলেন, “এখন থাক।”—

কৃষ্ণা আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাহার দিকে নিমেষমাত্র তীক্ষ্ণ-চক্ষে চাহিতেই তাহার এতক্ষণকার কার্য্য-কলাপ সমস্তই একখানা আয়নার প্রতিবিম্বের মতই মিঃ লাহার মনের চ’খে বিদ্যিত হইয়া গেল। বেশভূষা তাহার অপরিবর্তিত, এ ন কি, মোটরে আসার সময়ে চুলে ও কপালে যে ধূলা জমিয়াছিল, তাহাও ধোত বা মার্জিত হয় নাই। কেবল দুইটি চোকে জ্বলন্ত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তিন জনের মধ্যে কোন রকমেই কথাবার্তা জমিল না। পথশ্রমে ও মনের উত্তেজনে অসুস্থ ডাক্তর শীঘ্রই ঘুমাইতে ঘাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৃষ্ণা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া মিঃ লাহা আসিয়া তাঁহার হাত

ধরিলেন, একটু হাসিয়া কহিলেন, “আজকে ঠুঁর সেবার ভার আমারই নেবার কথা।”—তার পর তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তাঁহার জন্ত নির্দিষ্ট শয়ন-গৃহে পৌছাইয়া এক জন ভৃত্যের হস্তে সঁপিয়া দিয়া বোধ হইল যেন উল্লুংখাসেই বা ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণা ঠিক সেইখানে ঠিক সেই একই ভাবে যেমন তেমনই বসিয়া আছে, উঠিয়া পলাইবার কোন আগ্রহই তাহার সেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে দিয়া প্রকাশ পাইল না। দেখিয়া মিঃ লাহা কথঞ্চিৎ আশ্চর্য এবং একটুখানি বিষময়ও বোধ করিলেন।

সাদা দিবার ভাবে একটু কাশিয়া একটা মোরারে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা লাগাইয়া মিঃ লাহা অবশেষে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। “তোমার শোবার ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে, বেবি? বেশী ক্লান্তবোধ কর্‌চা কি? আমাকে ডেকে দিয়ে যাব? না একটু বসবে?”

কৃষ্ণা তাহার ক্লান্ত চোখের তারা ধীরে ধীরে উন্নমিত করিল।—“আমার তো আমার আর দরকারই হয় না, বাড়ীতেও তো আমি এখন আমার মাদ্রাজী আয়নাটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু একটা হিন্দুস্তানী দাই আছে!—”

মিঃ লাহা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছুক থাকিয়াও চূপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, “তোমার বাবার শরীরটা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে—দেখছি। তিন নিজেই বুঝতে পার্‌চেন যে, তাঁর হার্ট খুব বেশী দুর্বল হয়েছে।—”

কৃষ্ণা শুধু উত্তর করিল, “বোধ হয়।”—তার পর আবার দু’জনেই নীরব।

রাত্রি মধ্য বসন্তের, বাহিরে যুহু জ্যোৎস্নায় মন্দ-বায়ু-হিল্লোলে মিঃ লাহার পুষ্পোদ্ভানে ফুলের মেলা বসিয়াছে। ঐ বাগানের গোলাপ-কুঞ্জের ধারে কত সাধ করিয়াই গৃহস্থামী একখানি মন্দির-বেদি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল, অপরাহ্নে দু’জনে সেইখানে বসিয়া মঞ্চোখিত অজস্র সাদা ও হরিদ্রা-গোলাপের শোভা ও সুরভির মধ্যে অন্তরের ভাব-বিনিময় করিবেন, কিন্তু কোথায় বা সেই কাব্যোচিত কল্পনা, আর কোথায় এই কঠোর বাস্তব!

অবশেষে মিঃ লাহা ডাকিলেন, “কিষণ!”

কৃষ্ণা আবার নত-দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে চাহিল।

“আমার উপর রাগ ক’রে আছ?”

তাহার কণ্ঠস্বরে কৃষ্ণার বুকে ব্যথা বাজিল, তাহার মানসিক চাকল্যে দুর্বল বন্ধ মথিত করিয়া চোখের পাতা সজল করিয়া আনিল, বিষাদপূর্ণমুখে সে শুধু ঘাড় নাড়িল,—না!

তবে কেন অমন ক’রে রয়েছ? কেন ভাল ক’রে একটা কথাও কইছো না? কত আশা ক’রেই যে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি, তা কি একটুও বুঝতে পারলে না? সত্যি কি এত দিন পরে এতই অবুঝ হয়ে গেছ তুমি? বোঝ নি কি, তুমি আস্তো জেনে মন আমার কি আনন্দেই নেচে উঠেছে!—কি স্বর্গ,—নন্দন মনের মধ্যেই রচনা ক’রে নিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছি। কিবু! আমার নিরাশ করো না।”

আবার সেই ব্যথিত-কণ্ঠের আঘাত-ব্যথা! কৃষ্ণার সঘন আন্দোলিত চিত্তে দুই বিপরীতমুখী চিন্তার আঘাতে অস্থির হইয়া উঠিবার যোগাড় করিল। আবার সে চোখের জল সামলাইল।—সে আনন্দ যে এখানের ধূলান-বাতাসে ছড়াইয়া গিয়াছে—কেমন করিয়া সে না বুঝিবার ভাণ দেখাইবে? আর এই যে নিরানন্দ-হৃদয়ের সুবিপুল অভিমান-ব্যথা, এ-ও তো কিছু লুকান জিনিস নয়!—সে নিজেকে বড় অসহায়, বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল।

“বেবি! বেবি! হ’তে পারে, তোমায় আমার আজ মতের একটা অনৈক্য ঘটেছে! হ’তে পারে, তাই নিয়ে আমাদের অনেকগুলো আনন্দসরস দিনরাত্রি নীরস তর্ক-গবেষণায় নষ্ট ক’রে ফেলতে হবে। কিন্তু তার জন্তে আমাদের মনের মিল কেন নষ্ট হ’তে বসেছে? বল,—কথা কও? কি এমন ঘটলো, যার জন্ত তুমি—সেই তুমি আমার একেবারে হৃদয়ে ঠেলে ফেলে দিচ্চো? আমার সঙ্গে তোমার বিষ ঠেকুচে। আমার ভালবাসা তোমার অবজ্ঞার জিনিস হয়েছে। আমার ঘর তোমার কারাগার ব’লেই বোধ হচ্ছে। কি এমন আমি করেছি, যার জন্ত এই যে দেখা হলো, তা একবার তুমি চোখ তুলে আমার—আমার মুখের দিকে চেয়েও দেখলে না, একটি মিষ্টি কথাও আমার বললে না।—” তরুণচন্দ্রের গলা কাঁপিয়া গেল।

কৃষ্ণা এবার জোর করিয়া সকল দ্বিধা সরাইয়া ফেলিল, মুখ না তুলিয়া তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াই সে একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “—আমায় আপনি অনেক দিন ধ’রে অনেক বড়ই

ক’রে এসেছেন, কিন্তু আমার আপনার এইবারে মাপ করতে হবে।”

কথাটার শেষ পর্যন্ত না শুনিয়াই উল্টা বুঝিয়া তরুণচন্দ্র উল্লসিত আগ্রহে বুঁকিয়া পড়িয়া তাহার একখানি সুগোল হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহ-কম্পিত কোমল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “মাপ কে কাকে করবে বেবি! মাপ করার তো কিছুই নেই। তুমি ছেলেমানুষ, আমি তোমায় কতদূর ভালবাসি, সে তুমি সব সময় হয় তো বুঝতেও পা না। যাক, ও-সব কথা ব’লে আমি তোমায় বিরক্ত করতে চাইনে। শুধু একটা কথা—তোমার বাবা আমার কাছে আজ একটি প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, তিনি তোমাকেও তা বলেছেন।—” একটু নীরব থাকিয়া মিঃ লাহা জোর করিয়া সঙ্কোচ সরাইয়া ফেলিয়া পুনশ্চ যোগ করিলেন—“তার ইচ্ছা—এইখানে এই হস্তার মধ্যে তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান ক’রে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান, বিয়ে অবশ্য হিন্দুমতেই হবে। তোমার কি মত?” মিঃ লাহা কৃষ্ণার হাতখানা নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে ঈষৎ আবেগভরে নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

বাঘের খাবার মধ্যে হাতটা অকস্মাৎ গিয়া পড়িয়াছে জানিলে মানুষ যেমন আঁকুড়াইয়া উঠিয়া সেটা সবেগে টানিয়া লয়, তেমনি করিয়া মিঃ লাহার হস্তমধ্য হইতে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কৃষ্ণা নিজেরও কতকটা অজ্ঞাতে খানিকটা সরিয়া বসিল। দেখিয়া মিঃ লাহা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন ও দ্ব্যধিত্বেরে বলিলেন, “বুঝেছি, তোমার মত নেই;—সে আমিও জান্তুম—ও কি, অমন ক’রে চাইচো কেন?—তুমি মনে করচো, তোমাদের এখানে নিয়ে এসে আর তোমার বাবাকে সহায় পেয়ে, তোমাকে ছলে-বলে আমি আশ্রয় ক’রে নোব। তাঁকেও বলেছি,—তা আমি করবো না। তা করলে এতদিন, যখন তোমার মন আমার প্রতি বিমুখ হয় নি, তখন তার জন্ত চেষ্টা করতাম। আমি চাই, তুমি ভালবেসে আমার তোমার নিজের হাতের বরণ-মালা আমার গলায় আদর ক’রে পরিয়ে দেবে। আমি তো শুধু জী চাইনে। সে তো আমার ঘরেই আছে। আমি তোমার যে হৃদয় এত দিন পেয়েছিলুম, সেইটুকুই ফিরিয়ে পেতে চাই। যদি তোমার মত না থাকে, না হয় বিয়ে তোমার ইচ্ছামত আমার পূর্ব-জীব যত্নের পরেই হবে।

এখন শুধু একটি কথা,—একবার নিজের মুখে তুমি আজ আমার এইটুকু বল যে, তুমি আমার ভালবাস। তা হ'লেই আমি নিশ্চিত হয়ে অপেক্ষা করবো, যত দিন বলবে অপেক্ষা করবো।

কৃষ্ণা এতক্ষণে ঘেন কতকটা সাহস পাইয়া কহিল—“তবে আমারও কিছু বলবার আছে।”

“বলো।”

“বলি,—” বলিয়া একটুখানি থামিয়া তার পর কৃষ্ণা নতনেত্রে আরম্ভ করিল—“আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। আমি আমার পূর্বাভাস জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'বে, এখন হ'তে সহজ সাধারণভাবে চলতে চাই।”

মিঃ লাহা শুধু বলিলেন, “বেশ!”—

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—“অন্তঃসারশূন্য দেউলে-পড়া বড়লোকের দেখান আমার চক্ষে এখন অমার্জনীয় অপরাধ। আর তার পক্ষে সব চেয়ে সহজ যা পথ তাই-ই আমি নিয়েছি। বিলাসিতার সর্বপ্রকার প্রশ্রয়দাতা বিদেশী-ধরণের জীবনযাত্রা ও তার জন্ত বিদেশী-শিল্পের যতদূর সম্ভব সংস্রব বর্জন আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।—”

মিঃ লাহা শাস্তভাবেই কহিলেন,—“আচ্ছা।”—

কৃষ্ণা এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার ঘরে এলে আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারবো কি? আপনি তা সহিতে পারবেন কি? তাই বলছি যে, আমাদের দুজনের পথ যখন বিভিন্ন, তখন আমাদের এক না হওয়াই ভাল! কেমন, এই না?”

“বেবি! তোমার গায়ের ঐ দু'দিন পরা মোটা গড়াখানা কি তোমার এই আট বছরের পরিচিত আমার চেয়েও বেশী প্রিয় হয়ে উঠলো? এই শেষ তিন বৎসর ধ'রে যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এক দিনের একটা ছজুকে প'ড়ে তাকে তুমি এত বড় অপমান করতে পারবে? কিন্তু তুমি পারলেও তো আমি পারবো না। কাজেই যদি শুধু বাড়ীর মধ্যে এই রকম থেকে বাইরে আমার মর্যাদার জন্তে রাজী হও, আমি তোমার খাতিরে তাও না হয় সহিবো, তা ব'লে তো তোমার মত অনায়াসে এত দিনের প্রেমের মর্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।—তুমি জানো, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তোমায় আমি কেমন ক'রে মতের জন্ত আমার জীবন থেকে বিদায় দিই?”

“কিন্তু”—

“আবার কিনের ‘কিন্তু’? এক জন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তার নিজের বাড়ীতে ‘খন্দর’ ব্যবহার করতে দেওয়ার দায়িত্ব কত বড়, তারও আজ আন্দাজ করতে ভুলে গেছ?”

“আরও বাধা আছে। আপনি দয়া ক'রে আমার বাবার না বুঝে-সুঝে কথা দেওয়া ফিরিয়ে নিন, আর অবস্থা, অবোধ সংসার-নভিজ্ঞ সামান্য জীলোক জেনে আমারও ক্ষমা করুন। আমাদের যে অলোক অন্তর্ভাবিত সম্বন্ধের প্রত্যাশার পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার জন্ত—অপনার কথাতেই বলি, সকল সমাজের সব লোকেই নিন্দা করছে, সেটা থেকে আমার মুক্তি দিন, আমাদের দু'জনেরই পক্ষে সাধারণের হাতাম্পদ সে অবস্থাটা মোটেই প্রার্থনীয় নয়। আমার ছেড়ে দিন, আপনার জীকে ভগবান বাঁচিয়ে রাখুন, আমি কেন কাক-শকুনির মত তার মৃত্যুর পথ চেয়ে থাকবো।”

মিঃ লাহা ক্ষণকাল ত্ত্ব থাকিয়া পরে অসহিষ্ণু-ভাবে কহিয়া উঠিলেন,—“কিন্তু লোক-নিন্দা যদি কিছু উঠেই থাকে, আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই কি সেটা খেমে যাবে?”

কথাটার মধ্যকার নির্ঘাত সত্যের তীক্ষ্ণ খোঁচাটা বিধিয়া কৃষ্ণার মুখের ছবি ম্লান হইয়া আসিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বিজয়-দৃষ্ট-চঃণে একটুখানি কাছে আসিয়া উঁচু-গলায় আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে মিঃ লাহা পুনশ্চ কহিলেন, “ভেবে দেখ বেবি! এখন যদি আমরা নির্লিপ্ত হয়ে স'রেই থাকি, তাতে আমাদের নামে যদি কোন দাগ প'ড়ে থাকে, সে কোন দিনই আর মুছা যাবে না। চিরদিনের জন্তই অনর্থক সাধারণের মনে একটা দাগ থেকে যাবে। থাক, আজ তুমি ক্লান্ত হয়েছ, যাও বিশ্রাম কর গে। আর এক দিন তখন শাস্তভাবে এ সব কথার আলোচনা করলেই হবে।” মিষ্টার লাহা ক্ষণমাত্র বিদায় না করিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দিন দুই তিন পরের একটা অপরাহ্নে মিঃ লাহার সম্বলক্ষিত গোলাপলতায় যখন সাদা ও হলুদে গোলাপের আশ্চর্য্য প্রাচুর্য্য পথগামী পথিকের নেত্র প্রশংসার বিষয়ে বিক্ষারিত হইয়া

থাকিতেছিল, তখন সেই লতাবিতানের পাশে গৃহস্থানী তাঁহার সুন্দরী ও তরুণী অতিথিটিকে লইয়া নিজের সমস্ত অন্তর ও বাহিরে ঐশ্বর্যের জাল পাতিতে বাস্তু। লতানিয়া বৃক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত পুষ্পক্ষেত্র ব্যাপিয়া মটিকৃষ্ণ, ভিক্টোরিয়া, চারনা-রোজ, মার্শেল নীল, কুইন, মসরোজ, মাস্করোজ ইত্যাদি নানা মনোরম ক্ষুদ্র ও সুবৃহৎজাতীয় শ্বেত, রক্ত, হরিদ্রা, বিচিত্র গোলাপী ও মিশ্রবর্ণের গোলাপ-গাছ অপূৰ্ণ শোভায় আপ্রাণ ভূষিত হইয়া আছে। এদিক্ ওদিকে শ্রামল তৃণাক্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে তখনও পপি, ডেফোডিল প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঋতুপুষ্প বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছিল। অদূরে কয়েকটা কলমের আমগাছ নবোদগত মুকুলের সুবাসে স্থানীয় মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি ও পাখীর দলের উৎসব-মন্দিরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ফুল ও ফলের অহুত আলোচনা হইতে সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হঠাৎ মিঃ লাহা বলিয়া উঠিলেন, “তোমার আয়ার কাছে গুনলুম, তুমি তাকে কিছুই করতে দাও না, নিজে না কি বিছানাতেও শোও না,—এ কি সত্যি বেবি?”

কৃষ্ণা প্রথমটা জবাব না দেওয়াই স্থির করিয়া থাকিয়া পরে যুহু-হাস্তের সহিত উত্তর দিল, “আপনি যে শোবার পথ বন্ধ করেই ব্যবস্থাটা করে রেখেছেন।”

“আমি! কি করেছি?”

“সবই যে আনুকোরা নতুন বিলিভী জিনিস কিনে এনেছেন, কাজেই দেশী গাল্চেখানাতে বোয়াই মিলের চাদর পেতে গুতে হয়।”

মিঃ লাহা ঈষৎ বিরক্তি-ভিত্ত-স্বরে কহিলেন,— “কিন্তু তোমার নিজের শোবার ঘরে যে ঠিক ঐ রকমই খাট-বিছানায় তুমি শোও, সে তো আমি তোমার অস্থখের সময়ে দেখে এসেছি।”

কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিল,— “তখন তো আমি ফ্রেঞ্চ বা চারনা-সিল্ক ভিন্ন আর্টপোরে পোষাক কই ব্যবহার করতাম।”

মিঃ লাহার ললাটে নেত্রে ক্রোধের রেখা সুব্যক্ত হইলেও ক্ষণকাল পরে তিনি যখন কথা কহিলেন, তাহাতে উহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না।— “আমায় বললে না কেন? তা হ’লে সেই রাত্রেই আমি তোমার জন্ত একসেট ‘খেরোর’ই বিছানা না হয় আনিয়া দিতুম।”

তাঁহার স্বরে কিছু অভিমান ও অনেকখানি বিজপ প্রকটিত হইল। কৃষ্ণা তাহা বুঝিয়াই তাঁহারই সান্তনার হিমায়ে একটুখানি সহ্যভূতি

দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, “আমার জন্ত বড্ড তো হঃখ করছেন, আর নিজের কি দশা? একটি ছোট্ট ঘরে, একখানা দেড়হাত চওড়া কাম্প খাটে, নাকের উপর একটি মশারি ঝুলিয়ে বড্ডই বৃষ্টি আরামে ঘুম হয়? পাশ ফিরতে গেলেই প’ড়ে ঘাবার ভয় করে না?”

তরুণের মুখ স্তব্ধ প্রসন্নতার দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সে তাহা হইলে তাহার এই আত্মত্যাগ দেখিতে পাইয়াছে! দেখিয়া অন্তরে অনুভব করিয়াছে! তবে তো কষ্ট সার্থক? যুহু-হাস্তের সহিত উত্তর দিলেন,— “অভ্যাস করচি, না হ’লে এর পরে কবল শয্যা সহিবে কেন?”—কথাটার গুঢ় নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেই কৃষ্ণার হাসি-মুখ গভীর হইয়া আসিল।

সে রাত্রে মিঃ মল্লিককে তাঁহার ঘরে রাখিয়া মিঃ লাহা নিজের সেই ক্ষুদ্র শয়ন-গৃহটির উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে ড্রইংরুমের মধ্যটার একবার উকি দিয়া যাইতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণা তখনও উঠিয়া যায় নাই।—লোভে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া সেই ঘরে আসিলেন। এ কয়দিন সে মিঃ মল্লিকের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া যাইতেছিল।

মিঃ লাহা আসিয়া হাসি-মুখে বলিলেন, “কি বেবি! আজকের নুতন খদ্দেরের বিছানায় যেতে হবে অস্থির হচ্চো যে! মোটা ও কোরা চাদরের গন্ধে ঘুম কিন্তু আজ হবে না, তা ব’লে রাখছি।”

কৃষ্ণা মুখ তুলিতেই মিঃ লাহার মুখের আলো তাহার ছায়াপ্রতিহত হইয়া প্রায় কালো হইয়া আসিল। তিনি দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বেন কঠিন আঘাত প্রাপ্তের ব্যথিত-কণ্ঠে সবিম্বরে কহিয়া উঠিলেন, “বেবি! বেবি! কীদছিলে?”

কৃষ্ণার চোখ দিয়া তখনও ফোটার পর ফোটা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে তাহা রোধ করিতে চেষ্টাই করিল না, অথবা করিতে পারিল না, তা বলা যায় না। দেখিয়া নিজেদের মাঝ-খানের এ কয়মাসের সকল বাবধান ও বিরাগ সব বিস্মৃত হইয়া গিয়া তরুণচন্দ্র তাহার সোফার পাশেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন ও তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবার জন্ত তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখ তুলিতে গেলেন। “বেবি! আমি সব পারি, শুধু তোমার চোখের জল আমার অসহ্য! কেন কিষণ! অমন করে কীদচো কেন?”—

আন্তে আন্তে তাঁহার হাতের স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া নিজের আঁচলেই মুখ মুছিয়া ফেলিয়া অশ্রুজলে-ভেজা কাতর-কণ্ঠে কৃষ্ণা কহিল, “মিঃ লাহা! আমাদের মধ্যে সে পুরনো দিন, যখন আর ফিরিয়ে আনতে পারছি না, তখন এমন করে শুধু সেইগুলি নিয়ে থেকে ছ’জনকারই ক্ষতি হচ্ছে,—আজ থেকে আপনি আমায় ছুটি দিন, আমি আপনার কাছে এই জোড়হাত করে মুক্তি-ভিক্ষা চাইছি, আমায় যেন থেকে বিদায় দিন আপনি। আপনার অনেক টাকাই বাবার কাছে পাওনা, আমি তা জেনেছি। সে টাকা আমাদের বাড়ী বেচে আপনি নিয়ে নেবেন। শুধু বাবার জীবনের কাটা বছর আপনাকে একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে। তার পর যখন খুসী আপনি—”

মিঃ লাহা এতক্ষণ পুরে বাকশক্তি ফিরিয়া পাইয়া যন্ত্রণাবদ্ধ উচ্চ-কণ্ঠে বাধা দিলেন, “তারও পর? তার পরও—তোমার এই হৃদয়হীন খেলার অবসান হবে না? বেবি! বেবি! কি তোমার মনের ভাব আমি আজ একটু স্পষ্ট করে জেনে নিতে চাই!—এমন করে বুক তুমি আমার কেন যে ছ’পায়ে মাড়িয়ে মড়মাড়িয়ে ভেঙ্গে দিচ্চো, এর কি অস্ত্র কোন কারণ আছে? অথবা শুধুই তোমার এ একটা নির্দয় খেলা?”

অনেকক্ষণ ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। মিঃ লাহার কথাগুলো সে ঘরের বাতাসে যেন বহুক্ষণ মুগ্ধ বেদনার মতই ধ্বনিত হইয়া রহিল, তার পর কৃষ্ণা নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া বলিল,—“আপনার সঙ্গে আমার বাগদান ফিরিয়ে নিই, আমাদের—আমাদের বিয়ে কোন দিন হ’তেই পারে না!”

মিঃ লাহার ছুই চোকের মধ্যে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহার বক্ষের মধ্যে গুপ্তঘাতকের ছুরি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তিনি যথাসাধ্য স্থির থাকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—“আমার জীবন যত্নের পরেও না?”

কৃষ্ণা অত্যন্ত যত্ন-স্বরে উত্তর দিল, “না!”

“কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?”

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, “পারেন,” কিন্তু কথা কহিতে তাহার একটু বিলম্ব ঘটিল।—সে বলিল, “প্রথমতঃ আপনার ও আমার জীবনের লক্ষ্য ও পথ ঠিক আর এক নেই।—আপনি এক জন গবর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী,

আপনি রিপ্রেসনের পক্ষে—আর সেই রিপ্রেসন আমাদেরই উপর। এ ক্ষেত্রে যদি আমরা বিবাহিত হই, তা হলে সে মিলন শুধু কি দৈহিক মিলনই হবে না—যাতে আপনার কৃতি নেই বল-ছিলেন?”

মিঃ লাহা ঈষৎ একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন,—“বেবি! তুমি কি মনে কর, বর্তমান গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তোমরা দু’চারটে ছেলেমেয়ে মিলে একটা হৈ চৈ করলেই, সেটা গুঁড়িয়ে পড়ে যাবে? জলে হলে অন্তরীক্ষে অজস্র ব্রিটিশ-সিংহ তোমাদের মত অসহায় গর্ভের ইঁদুরের উৎপাতে সোনার ধনি ভারত-সাম্রাজ্যের মৌরসী-পাট্টা তোমাদের হাতে ফেরৎ দিয়ে নিজের বাসায় ফিরে গিয়ে ঘুমবে?”

কৃষ্ণা ঈষৎ লজ্জাবোধ করিলেও দুর্বলতা অনুভব করিল না, সে সাগ্রহে বলিল,—“তা করিমে; সেইজন্য বর্তমান গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিজ্রোহ আমরা তো করতেও চাইচিনে। আমরা, দুর্বলের মধ্যেও যে একটা প্রবল শক্তি আছে,—ইউরোপীয় অনেক জাতিই যাকে সহায় করে উঠেছে, সেই একমাত্র সম্বলকেই কেন্দ্রীভূত করতে চাইছি। যথার্থতঃ এতে আমার ধর্ম বা আইন কিছুই বাধা দিতে পারে না। এতে কারো উপর কোন অত্যাচার নাই, অথচ নিজের দেশের পক্ষে উন্নতির অপরিহার্য আশা রয়েছে। এর একমাত্র বিদেশী শিল্পের নিতান্ত আবশ্যকীয় কল-কজা বৈ যন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি ছাড়া আর সব বর্জনেতেই যে এই গরীব দেশের গরীব জাতের কত লাভ, তা আমি নিজে এই চার মাসের মধ্যেই প্রভূত রকমে জানতে পেরেছি। এ চার মাস আমার বাবাকে আপনার কাছ থেকে এক পরস্যাও ধার নিতে দিই নি, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন?”

মিঃ লাহা শেষ-কথাটা কানেই আনিলেন না, পূর্বলোচনার অমুসরণে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা বেবি! এই জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে তুমি কি ইউনিটির যথার্থ আশা করো? যে দেশের ছোটো লোকের মধ্যে একতা নেই, তাদের সবাইকার মনে দেশাত্মবোধ জাগবে, এবং তারা সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করে সঙ্ঘবদ্ধ হবে, এটা কি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা-কুসুম নয়?”

কৃষ্ণা কহিল,—“দেখুন, সংসারে আকাঙ্ক্ষা-কুসুম কি, আর কি নয়, তার কথা কেউ আগে থাকতে বলতে পারে না। জাতিভেদ প্রভৃতির কথাও

আমরা ইংরেজ প্রভুতির মুখ থেকে শুনে শুনে কপ্‌চাচ্ছি, ওর কোন ভিত্তি নেই। এই দেশেই চিরদিন ব্রাহ্মণ জমিদারের বাদগী পাইক ছিল ও আছে। দরকার হ'লে তারা মনিবের জন্ত প্রাণ দিয়েওছে এবং দিচ্ছেও। আবার জাতিভেদহীন মোগল-পাঠানও পরস্পরের বৃকে শতাব্দী শতাব্দী কাল ধরে ছুরি-মারামারি করতে ক্রটি করে নি। ইউরোপের ইতিহাসেও বাহ্যতঃ জাতিভেদহীন জাতির পরস্পরে ও ঘরে ঘরে গলাকাটাকাটি রক্ত-ছড়াছড়ি কম যাচ্ছে না, তবে আমাদের দেশের পুরান শিক্ষাদীক্ষায় শোণিত-তৃষ্ণাটা কম থাকায়, বিষয়-বৈরাগ্যাটা বেশী থাকায়, অত্ন রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা নূতন শিক্ষকের হাতে প'ড়ে যখন নূতন হয়ে গড়ে উঠছে এবং অবস্থাও যখন প্রাণ-সঙ্কট হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন একাত্মতা যে আসতেই হবে। তা হোক স্বরিতে, হোক বিলম্বে। না এসে আর উপায় নেই।”

ঈশ্বর একটুখানি কৃপার হাসি তরুণচন্দ্রের চোঁটের আড়ালে চকিত হইয়া মিশাইয়া গেল, শিশুর প্রলাপকে বিজ্ঞ-ব্যক্তি যেমন সকলুণ মনে সহিয়া লইয়া থাকেন, তেমনি করিয়াই এই সব জটিল সমস্যার সমাধান-চেষ্টা না করিয়াই তিনি কথা উল্টাইয়া কহিলেন, “তা, না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে, এক দিন তোমাদের স্বপ্নই সফল হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তার মাঝখানে, তত দিন পর্যন্ত কি বিরুদ্ধ মতের পিতাপুত্র একত্র হবে না? স্বামি-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকবে?”

‘স্বামি-স্ত্রী’ কথাটা কৃষ্ণাকে অত্যধিক উত্তেজিত ও বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে উদ্ধত-স্বরে উত্তর দিল, “স্বামি-স্ত্রী এ অবস্থায় পড়লে কি করবেন, তা তাঁরা ভেবে দেখুন গে, কিন্তু আমাদের অবস্থা এখনও অতটা সঙ্কটাপন্ন হয় নি, তাই আমি বৃদ্ধ পাব্‌চি, এত বড় মতবৈধের মধ্যে আমাদের মিলিত হওয়া উচিত নয়।”

“কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রয়েছে, তখন এটুকু বিরোধকে আমরা অন্ততঃ একটুখানি সহনীয় ক'রে নিয়েও অনায়াসে ধরকরা করতে পারবো। উভয়পক্ষ থেকেই না হয় কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করা যাবে। কি বল? আর দেখ, ভালবাসা জিনিসটা বাইরে থেকে হঠাৎ এক দিনে পাওয়া যায় না; নিশ্চয়ই যথাকালে তার আবির্ভাব হবে, যদি এখন তার অভাব—এই ঘটে থাকে, আমার বিশ্বাস যে তা ঘটে নি।”

কৃষ্ণা সমুচিত-স্বরে কহিল, “সেটা আপনার ভাস্তিও হ'তে পারে তো?”

“কোনটা আমার ভাস্তি বেবি? তোমায় ভালবাসা? অথবা আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? ওঃ! তুমি কি আমায় আজ বোঝাতে চাও যে, এই তিন বৎসর ধ'রে তুমি আমার সঙ্গে যে আচরণ ক'রে এসেছ,—সে সমস্তই তোমার ছলনা?”

নিজেকে অবমানিত বোধ করিলেও এই আঘাতের কোন কঠিন প্রত্যাঘাতই সে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। শুধু অপরাধী ভাবেই কহিল, “নিজের মন হয় তো আমি জানতুম না।”

যন্ত্রণাহত কাতর মুখচ্ছবি লইয়া তরুণচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া রক্ত-বাস্কের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমায় যে কখনও ভালবাস নি, এটা এখন কেমন ক'রে হঠাৎ জানতে পারলে? বেবি! বেবি!—কিষণ! আজ দীর্ঘ তিন বৎসর পরে এই কথা তুমি আমায় বললে? আমায় কখন ভালবাস নি?—কখনও না? কখনও না! এই কি সত্য?”

কৃষ্ণার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, “আপনি—যে ভাবে বলছেন, তেমন ক'রে বোধ করি কখনই বাসি নি। তা হ'লে—”

“হ্যাঁ, ‘তা হ'লে’ কি আর এমন নিশ্চয় আঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে দিতে পারতে!—এই বোধ হয় তোমার দ্বিতীয় আপত্তি? বেশ,—আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল ভোরেই আমায় মফঃস্বল বেরুতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে—তোমার তৃতীয় বাধার কথাটাও শোনা যাবে!—যাও—আজ শোও গে যাও।—তোমায় খুসী করবার বৃথা-চেষ্টায় অনেকগুলো টাকার ‘চট-ক্যাশিস্’ও কিনিয়ে আনিয়াছিলুম, আমার উপর দয়া ক'রে সে ক'টা অন্ততঃ ব্যবহার করো, মাটিতে প'ড়ে থেকে কষ্ট পেরো না।”—

এই বলিয়া মিঃ লাহা নিজেকে জোর করিয়া দমন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধোত্তেজিত উপহাসপূর্ণ কণ্ঠ, তাঁহার হতাশা-ক্লিষ্ট অন্তরের প্রবল উত্তেজনার গুরুপদক্ষেপে, কৃষ্ণাকে কতক্ষণের জন্তই যেন সেখানের জমীতে অচল করিয়া দিল, তথাপি অন্তরের মধ্যে সে যেন আজ অনেকখানি লঘুবোধও করিল। বোধ হইল যেন একটা অক্ষমণীয় জুরাচুরীর হাত হইতে সে নিজেকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিনটাই সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিষতিক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। মোটরে বাহির হইবার সময়েই গাড়ীর দরজাটা কষিয়া থাকার জন্ত মোটর-ক্লিনারটাকে বুটের একটা ঠোঁকর মারিয়া গাড়ী চড়িলেন, পথে একটা ছাগলছানার ঘাড়ের উপর দিয়া গাড়ীখানা সগর্বে চলিয়া আসিলে, সোফারটা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি তিরস্কৃত হইল। যে মোকদ্দমটার তদারকে গিয়াছিলেন, তাদের সে দিন লাঞ্চার আর অবধি রহিল না। সাক্ষীদের মধ্যে যে দুজন খদ্দর পরিয়া আসিল, তাহাদের সাক্ষ্য “অবিস্বাস্য”—এই চিহ্ন দিয়া রাখিলেন।—ফিরিবার পথে একদল স্কুলের ছেলে ‘বন্দে মাতরম্’ বলিয়া একটুখানি ফুটি করিয়া লইতেছিল, সঙ্গে পুলিস-ইন্সপেক্টরকে হুকুম দিলেন, “রাজদ্রোহসূচক শব্দ ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবমাননা দেখাইবার জন্তই বিশেষ-ভাবে করা হইয়াছে, অতএব উহাদের গ্রেফতার করা দরকার।”

বাড়ী ফিরিতেই দেখা গেল, ফটকের সামনে একটা ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত ভিখারী তারম্বরে ভিক্ষা চাহিয়া চেষ্টাইতেছে, তাহার এবং তাহাকে এতক্ষণ তাড়াইয়া দিতে অসমর্থ দরওয়ানটার পিঠে চাবুকের ছই চারিটা ঘা পড়িল; এবং রাত্রে চুরীর মতলবে যে ভিখারীগুলো দিনের বেলায় ভাগ্যবানদের ঘরের খবর লইতে আসে, তাহাকে থানায় পাঠান হইয়া গেল। বুট খুলিতে গিয়া সাহেবের মুখ দেখিয়া বেয়াটা তাই-শুদ্ধ লাথি খাওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইতে থাকিলেও কিন্তু তাহার কোন্ সঞ্চিত পুণ্যবলে সে বেচারার রক্ষা পাইয়া আড়ালে গিয়া হাঁপ লইল।

অপরাত্নে চারের টেবিলে কক্ষার সহিত দেখা হইল। মিঃ মল্লিক অনেক আদর-আপ্যায়নে সকাল-বেলায় পঞ্চশ্রম ইত্যাদির বিষয়ে খুঁটিয়া নিংড়াইয়া খবর জানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এত বড় কার্যের দায়িত্ব, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিলেন; কিন্তু নীরব শ্রোতা-সুগলকে লইয়া তাঁহার নিজের অধ্যবসায় বজায় রাখা দায় হইল। আহা রাত্রে কক্ষা উঠিয়া চলিয়া গেলে, মিঃ মল্লিক ডাকিলেন—“তরুণ!”

“আজ্ঞে!” বলিয়া জবাব দিয়া মিঃ লাহা একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

“বেবির জন্ত বড় ভাবনায় পড়েছি বাবা!”

“হুঁ”—বলিয়া তরুণচন্দ্র পুনশ্চ নিজেরই চিন্তা-শ্রোতে ডুবিয়া রহিলেন।

“সে কালই বাড়ী ফিরতে চায়। বলে, সে না কি তোমাকে সব কথাই বলেছে; তুমি না কি আর তার চ’লে যাওয়ার অমত করবে না।—আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথাই সে আমার আজ বলেচে।—আমায় মেরে ফেলেচে!”

আগ্রহহীন নীরস-কণ্ঠে মিঃ লাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলেচেন?”

“সে না কি তোমায় বিয়ে করতে পারবে না, আর এই কথা না কি তোমার মুখের উপরেই সে বলে দিয়েছে?—পাগল হয়ে গেছে তরুণ! মেয়েটা বন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে!”

ডাঃ মল্লিকের কণ্ঠে বিলাপের করুণ মূর্ছনা শ্রুত হইল। “কত বোঝালুম, বল্লম—তোমার জন্ত শেষ-টার আমার গুলী থেয়ে মরতে হবে দেখছি। তাতেও তার ঐ এক কথা! কিন্তু আমি যে এই ঋণের বোঝা ঘাড়ে ক’রে রাস্তায় কেমন ক’রে দাঁড়াব; আমার দেশহিতৈষিনী মেয়ে সে কথার তো কোন জবাবই দেন না! বলেন কি জানো? ‘আত্মগর্বে মেয়েটা বলে কি না,—‘চিরদিন কি সবার সমান যায়? গরীব হয়েছি, তাতে লজ্জা কিসের? বাড়ী বেচে গরীবের মতনই থাকবো’।—সে না হয় তুই পারতে পারিস—তোমার সখ, আমি সে পারবো কেন বলো দেখি?”—বলিতে বলিতে সেই ভয়াবহ সম্ভাবনায় গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়া মিঃ মল্লিক ভূতভয়াহত অসহায় শিশুর মতই ফোঁপাইতে লাগিলেন। “মাই বয়! মাই বয়! হোয়াট অ্যাম আই টু ডু? হোয়াট উইল বি কম্ অফ্ মি!”

মিঃ লাহা নিজের মনের পূর্ণ বিরক্তি ও ক্রোধ দমনে রাখিয়া উঁহাকে সাহুনা দিয়া বলিলেন, “আমি বতরুণ আছি, আপনাকে আমি হুঃখ পেতে দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!—আপনার মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবার আর কোন কারণ দেখালেন?”

ডাক্তার-সাহেব মহা বিরক্তিতে কাঁজিয়ে বলিলেন, “কারণ আবার ও দেখাবে কি? অকারণ শুধু শুধুই আমাদের হুঃখ দেবে ব’লিই দিচ্ছে বৈ তো নয়। বলে, ‘ওঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই!’ আরও বলে, ‘বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাগদত্তা হয়ে থাকার লজ্জায় আমি ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাতেই পারিনে!’ যে পাত্রের হাতেও

পড়বার জন্তে ভদ্র-সমাজের সমস্ত আইবড় মেয়ে আকুল হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে ওঁর নাম লোকের মুখে উচ্চারিত হ'তে শুন্লে উনি না কি 'লজ্জার ম'রে যেতে চান! উঃ, কি ভয়ানক কালসাপকেই আমি গায়ের রক্ত দিয়ে তৈরী করেছি! সর্বস্ব খুইয়ে মানুষ করেছি! ওঃ, কি অকৃতজ্ঞ, কি স্বার্থপর সন্তান!"

মিঃ লাহা এই সমস্ত পিতাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য পর্যন্ত না বলিয়াই একটা সিগার ধরাইয়া নিস্তান্ত অন্তমনস্কে সেটা ধীরে ধীরে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আবার একটা কাতরোক্তি শোনা গেল, "তরুণ! চ'লে গেলে বাবা?"

"আজ্ঞে, না,"—বলিয়া মিষ্টার লাহা ফিরিয়া বসিলেন।

"তুমি কি ওকে ছেড়ে দেবে? ওরই এক-ওয়েমীর—ষেচ্ছাচারের স্রোতে ভেসে যেতে দেবে? ওকে টেনে তুলবে না?"

"আমি কি করতে পারি বলুন?"

"তোমার যা খুসী! আমি তো ওকে তোমার হাতেই দিয়েছি।"

মিঃ লাহার অধরপ্রান্তে একটু দুঃখের হাসি দেখা দিল, "আপনার দেবার ক্ষমতা নেই, আপনার মেয়ে নাবালিকা নয়।"

"ওঃ!" বলিয়া এই শেষ আশ্বাসভঙ্গে ডাক্তার-সাহেব একেবারে যেন এলাইয়া তাঁহার আরাম-চৌকিটার গায়ে হেলিয়া পড়িলেন। "তা হ'লে ওরই জিদ বজায় থাকবে? কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল বে-আইনী হাঙ্গামাকারীর দলে মিশে হয় তো কোন্ দিন জেলেও তো যেতে পারে? অ্যাঁ! তরুণ! তুমি ওকে এ লজ্জা, এ অপমান থেকে রক্ষা কর, বাবা!"

বৃদ্ধ অন্ধ হাতড়াইয়া মিঃ লাহার হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিবার জোগাড় করিলেন। "সেভ' হার—মাই চাউল্ড!"

তাঁহার মাসে খানিকটা পানীয় ঢালিয়া দিয়া মিঃ লাহা উঠিয়া পড়িলেন, স্থির স্বরে কহিলেন, "আমি তাকে রক্ষা করবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ভোর-বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গরম বোধ হওয়ার খোলা জানালার কাছে আসিয়া কক্ষা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো তখনও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারেরও জমাট ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। নৈশ-নীবরতা

তখনও চরাচরের বক্ষকে শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। শেষ-রাতের মুহূর্ত জোৎস্না-ধারায় দূরের গোলাপ-বিতান যেন শুভ্র বসনাচ্ছাদিতা বৈরাগ্য-বেশধারিণী নারী-মূর্তির মতই দেখাইতেছিল। সরকারী রাস্তা-ধারের যেন সমান করিয়া ছাঁটা সুরহৎ অশ্বখ, বট ও পাকুড়ের শ্রেণী ঘন অন্ধকার গায়ে মাখিয়া মানুষের হাতে-গড়া প্রাচীরের মতই দেখাইতেছে। শুষ্ক রাজপথ হইতে কদাচিৎ একখানা গো-যানের বা পথবাহী পথিকের আসা-যাওয়ার সাড়া কচিৎ উঠিতেছিল। ভারাক্রান্ত-চিত্তে বাগানের ভিতর চাহিতেই কক্ষার দুই চোখের দৃষ্টি বিষ্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। কে এক জন পুরুষমূর্তি না—গভীর শব্দহীনা স্তব্ধরাত্রে একাকী বিনিদ্রনেত্রে উর্দ্ধে তারকাখচিত আকাশে চাহিয়া ধীরপদে পরিক্রমণ করিতেছে! নক্ষত্রালোকে সেই সুপরিচিত দীর্ঘমূর্তি কক্ষা একবার চাহিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। কাহার চিন্তায় সেই পুরুষ নিজের সান্ধা-সজ্জা বদল পর্যন্ত না করিয়া সেই প্যান্ট-কোট, সেই টাই-কলার, এমন কি, গায়ের ভারি জুতা জোড়া পর্যন্ত মা খুলিয়া সারা রাতই হয় তো এই রকম পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এ কথা মনে হইয়াই কক্ষার পদনখ হইতে কেশাণ্ড পর্যন্ত যেন একটা অসহায় কাতরতাপূর্ণ ভয়ে ও লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। এ কি কঠিন বেড়াজালের মধ্যেই উহার সঙ্গে তাহার এই অভিশপ্ত জীবন জড়িত হইয়া গিয়াছে! কেমন করিয়া এ পাশ সে ছিন্ন করিয়া লইবে? কেমন করিয়া—ও গো, কেমন করিয়া? অথচ—অথচ না নিলেও এর চেয়েও যে ঢের বড় দুঃখের ঝঞ্ঝার তার নিজের জীবনের দিবানিশি একাকার হইয়া যাইবে, সে-ও তো আর মিথ্যা নয়! সেই বা সে সহিবে কেমন করিয়া?

পুরুষমূর্তি বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারই জানা-লার দিকে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে অপ-সৃত হইয়া আসিল এবং দেখিতে পাইল, তরুণচক্রে সতৃষ্ণ চোখে সেই জানালার দিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন। তখন নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে সে মুখ যেন বড়ই নিরাশা-কাতর, বড়ই বেদনা-বিধুর মনে হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলা হঠাৎ ঝড় উঠিয়া এক পশলা দৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আকাশময় এখনও কালোয়-সাদায় ধূসরে মেশান রুষ্টি-আনা মেঘের পুঞ্জ ইত-স্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাছ ভিজা, মাটি ভিজা, পাখীর বাসাগুলি ঝড়ে উলটিয়া গিয়া সেই ভিজা মাটিতে আর্দ্র হইয়া নুটাপুটি খাইতেছে। ঝড়ে ছিঁড়িয়া-পড়া গোলাপবাগানের ফুল ও খসিয়া-পড়া রাণীকৃত পাপড়ি, তাহাদের পূর্ব-সন্ধ্যার বর্ণ-বৈচিত্র্য হারাইয়া কাদা-মাখা হইয়া পথের উপর ছড়াছড়ি হাইতেছে। লতাবিতানগুলি ঝড়ের হাওয়ায় লঙ-ভঙ, এবং সমরশায়ী বীরের মতই একটা সরল ঋজু দেহ দেবদাক্ষ সমুলোৎপাটিত হইয়া পথের উপর পড়িয়া।

প্রাতঃভ্রমণের পোষাকে বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার চড়িতে গিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টি সেদিনকার মস্ত আনিত ডাকের তাড়ার উপর পতিত হইল। চাপরাসী, সাহেবকে প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল, কাগজ-পত্র উল্টাইয়া এক গাদা সরকারী খাম ও বে-সরকারী সংবাদপত্র ব্যতীত একখানি মাত্র পত্র দেখিতে পাইলেন। সাধারণ ডাকঘরের ছাপান খামের মধ্যে পত্র, উপরে বাংলা অক্ষরে নাম ও ইংরাজীতে ঠিকানা লেখা, চিঠিখানা কৃষ্ণা মল্লিকের নামে। চাপ-রাসীর হাতে সেখানা ফেরৎ দিতে গিয়া কিসের একটা অনিবার্য লোভে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিত্ত একটি বে-আইনী কাজ করিয়া ফেলিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

চিঠিখানা মাত্র পকেটে ফেলিয়া তিনি ঘোড়ার রেকাবে পা তুলিয়া দিলেন এবং অর্ধ-মুহূর্তের মধ্যেই তাঁহার বাহন তাঁহাকে পিঠে লইয়া বাগানের পথ ছাড়াইয়া পথে পড়িয়া ছুটিল।

সে চিঠিখানায় এই রকম লেখা ছিল,—
সবিনয় নিবেদন—

আপনি যদিও আপনাকে আমার অ-পছন্দ স্বিস্ মল্লিকের বদলে কৃষ্ণা ব'লে সম্বোধন কর্তেই ছকুম দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু সে আদেশটা রাখতে পারলুম না,—দোষ নেবেন না। 'মিস' ব'লে এ দেশের মেয়েকে উল্লেখ করা আমার কানে ভাল শোনায় না বটে,—অথচ আমাদের মধ্যে ঐ রকমের কোন কিছু ডাকবার সহজ পন্থাও তো নেই। সেকেলে লোকেরা হয় তো এ রকম ক্ষেত্রে

অনারাসে ব'লে বসতেন, "কেন, মল্লিকের 'মিস' অথবা একটু শুদ্ধ ভাষায় 'মল্লিককুমারী' বলেই হয়!"—কিন্তু যতই হোক, আমরা—আধুনিকরা এত দিন ধ'রে দেশের ঠাকুরের চাইতেও বিদেশী কুকুরের পক্ষপাতিত্ব ক'রে এসে হঠাৎ একেবারে সব-খানি উল্টে ফেলে পুরো সেকেলে ব'নে যাওয়া,—তা আমি যদিও এর খুব পক্ষপাতী আছি,—তবে আপনি কি অতটাই একেবারে বরদাস্ত করতে পারবেন? বয়সে বড় হ'লেও না হয় 'দিদি' বলাই যেত, এ তো তারও পথ বন্ধ!

বেশ মজা ক'রে ব'সে ব'সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী খুব ভোজটোজ তো খাচ্ছেন! এ দিকে যে বড়বাজারে কলের কুলীরা ম্যাক্গেটারকে রাজগী লিখে দিলে ব'লে! আসছেন কবে শুনি? মাড়োয়ারী জাতটা মোটেই আমাদের মানে না। তাদের ~~ক'রে~~ রাখতে পারে এক রাজা, আর যদি রাণীর জাতি আপনারাই কিছু পারেন,—দেখুন দেখি চেষ্টা ক'রে?—আমুন—শীঘ্র—শীঘ্র—শীঘ্র—ফিরে আসুন। আপনার কর্মভূমি—আর আপনার কর্মসঙ্গীরাও ব্যাকুল-প্রাণে আপনাকেই যে ডাকুচে। আর দেরী করবেন না।—দোহাই আপনার!—

বিনয় শীল।—

সে দিন ফিরিবার পথে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘোড়া ও তার সহিসটা অনাবশ্যকেই কশাহত হইল। সে দিন এজলাসে গিয়া তিনি যখন বিচারাসনে বসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালান্তক যম বলিয়াই মনে হইল। সে দিনকার তিনটা মোকদ্দমার মধ্যে প্রথমটা ছিল এই, স্বামী মাতাল—স্ত্রীকে বৃথা সন্দেহে বেদম মার মারিয়া আধমরা করিয়াছে। স্ত্রীর চীৎকারে পাহারাওয়াল বাড়ী ঢুকিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে এবং আশ্রয়-গৃহে পৌছাইয়া দেয়। অগুরু ক্ষত-চিহ্ন প্রমাণ ছিল, বিশেষ বিশেষ সাক্ষ্য-সাবুদে স্ত্রীর কথাই প্রামাণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু রায় বাহির হইল উল্টা! স্ত্রীর চরিত্র সন্দিগ্ধ, এ ক্ষেত্রে স্বামিগৃহেই তাহার বাস করা কর্তব্য বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রায়ের মধ্যে টিপনী কাটিলেন। বিজয়ী বীরের মতই ভীষণ মুগ্ধিতে স্বামী গিয়া ভারতী স্ত্রীর হাত ধরিল। এজলাসের বাহিরে পা দিয়াই দস্ত করিয়া বলিল,—“শুনলি তো, ধর্ম্মাবতার কি বলেন? চল ঘরে, এবার তোকে কোতল করবো, তবে ছাড়বো।”

দ্বিতীয় মোকদ্দমাটার এই রকম নিষ্পত্তি হইল।
—কেরামত সেখ, গাঁয়ের মোড়ল গোছের, সে
‘জুমা’র দিনে (শুক্রবারে) তার এলাকার সব মুসল-
মানকে ‘খদ্দর’ পরিয়া আসিতে হুকুম দিয়া দেয়।
সবাই পরে, পরে নাই শুধু কালেক্টরীর দপ্তরী ফৈজু
ও তার কুটুমসম্পর্কীয় জনকয়েক লোকে। দ্বিতীয়-
বারে কড়া হুকুম জারি করা হয়, তাহাতে ফৈজু
না কি গাঁয়ের অনেক লোকের সাম্নেই বলিয়া
বেড়াইয়াছে যে, ওর হুকুম মান্তে গেলাম কোন্
দুঃখে? উনি জেলার জজ না ‘মেজেষ্টার?’—এবং
নমাজের সময় নূতন কেনা ম্যাঞ্চেষ্ঠারের ছাপ লাগান
ধুতি, কুর্তা পরিয়া সে নমাজ করিতে যায়, কিন্তু
মসজিদে ঢুকিতে পায় না। তার পর হইতেই
তাহারা দুইটি দলবদ্ধ হয়। সেখের দল ফৈজুর
দলকে ‘এক ঘরে’ করে, ইহার মধ্যে ফৈজুর সম্বন্ধী
এবং তার ছোট স্ত্রী-ও সংযুক্ত ছিল! অতঃপর মার-
পিট বেশ রীতিমতই হইয়া গিয়াছে। ক্রোধাক্ত
ফৈজু ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হইতে গুপ্তা জমা করিয়া
সেখের দলকে হঠাৎ আক্রমণে জখম করিয়া
দিয়াছে।—নিজের সম্বন্ধীকে আধমরা করিয়াছে—
খুন অবশ্য কাহাকেও কেহ করে নাই।—শরীরে
চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সরকারী ডাক্তারের রিপোর্টে জানা
গিয়াছে, সম্বন্ধীর আঘাত কিছুই মারাত্মক নহে।
বিচারে ফৈজু বেকসুর খালাস পাইল। ‘অত্যাচারী’
দলস্থ জন আষ্টেক লোক লইয়া দলপতি বুড়া
করিম সেখ এক বৎসরের জন্ত জেলে চলিলেন,
সেখানে তাঁহাকে খাটিতে হইবে।

তিনেরটার কপালে হয় তো বা কিছু সুখ ছিল,
সেটা সিনিয়র ডেপুটির হাতে চালান পাঠাইয়া দিয়া

সাহেব কোর্ট বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। বুক-
পকেটের চিঠিখানা তাঁহাকে আর সুস্থির হইয়া
বসিতে দিল না।

বাড়ী গিয়া কৃষ্ণাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ঘরের
মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে আসিলে খাম-খোলা
চিঠিখানা হাতে দিয়া সে দিনের বিচারের রায়
দেওয়ার মতই মুখ করিয়া তেমনি স্বরেই কহিলেন,
“তোমার তিনের নম্বর ‘বাধা’র কথাটা তুমি না
বলতেই আমার শোনা হয়ে গিয়েছে। অতঃপর
খামটা ছিঁড়ে ফেলেছিলুম,—মাপ করো;—অবশ্য
তখন মোটেই সন্দেহ করি নি যে, তারই মধ্য থেকে
কাল-সর্প বার হয়ে এসে আমাকেই ছোবল
মারবে!”

বলিতে বলিতে কৃষ্ণার মুখ তীক্ষ্ণ অগ্নিবর্ষা চোখে
চাহিয়া দেখিলেন, এবং এও দেখিলেন, অপরাধের
গুরু লজ্জাভারে আনমিত সেই কমনীয় মুখে আরও
একটা কোম কিছু রমণীয়তা অতি গোপন
আনন্দে সন্ধ্যাবেলার গোলাপের মতই ধীরে
ধীরে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। আর নিজেরও
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কম্পিত আঙ্গুলগুলা চঞ্চল
হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই খামের মধ্যের চিঠিখানাকে
টানিয়া লইতে চাহিতেছিল, ইহার সান্নিধ্যকেও
তাহারা যেন সম্মান বা সন্মোচন করিতে সমর্থ হইতে-
ছিল না, এটুকুও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে
পারিল না।

ঈর্ষ্যার শত সহস্র বৃশ্চিকের তীব্র-দংশনে তরুণ-
চন্দ্রের সমস্ত হৃদয়-প্রাণ যেন অসহনীয় যন্ত্রণায় ফাটিয়া
পড়িতে গেল। তবে এই জন্ত তাঁহার সুখের
স্বপ্ন ভোর হইতে চলিয়াছে!

তৃতীয় অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছপুরবেলা কর্ম-কাজ সমাপনান্তে ধোত ও মার্জিত শ্রাদ্ধের দালানে বসিয়া বায়ুন-মেয়ে থাকির-মা দাসীকে দিয়া টাকপড়া মাথার পাকাচুল বাছাইয়া লইতে লইতে ছ'জনে মিলিয়া মুনিক-বাড়ীর দোষগুণ গুণনস্বরে আলোচনা করিতে নিবিষ্ট হইয়া আছে। উপরের সেই মোটা মোটা থামদেওয়া চওড়া দালানের এক পাশে গিন্নীর ঘরের পাথরের ঠাণ্ডা মেজের মছলন্দ মাজুর পাতিয়া শোকে ও চিত্তার অকাল-বৃদ্ধা গৃহিণী দিবানিদ্রায় ভ্রাতাইয়া পড়িয়া আছেন। যুবতী বধুটি এতক্ষণ তাঁহার গায়ের থামাচি খুঁটিতেছিল, এতক্ষণে তাঁহাকে নিদ্রিতা এবং নিজের পোষা বিড়াল রতনমণিকে লাজ ছলাইয়া নিকটে আসিতে দেখিয়া সেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

সেই দালানেই সারি সারি পাখীর খাঁচা ঝোলান। তাহার গলার সাড়া পাইয়াই একটি লোহার খাঁচায় বদ্ধগলার তিন-রজ্জা তে-নরির কণ্ঠস্বর চন্দনা আধহাত লম্বা পুচ্ছ নাচাইয়া শব্দ করিয়া উঠিল, “রুপু! রুপু! রুপু!”

উন্মিলার কক্ষতলে সোহাগী বিড়ালীটার চোখ এই শব্দে চক্চকে হইয়া উঠিয়া গলা হইতে ধ্বনি উথিত হইল, “পরু!”—

“কি রতুমণি! ঈশ! নোনা যে স্ক স্ক করছে!” বলিয়া সেই লোভাতুরের গালে দুই আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া সে পাখীর উদ্দেশে মুখ তুলিয়া তাহারই অনুকরণ করিল,—“রুপু! রুপু! রুপু!”

ডাকটা ফেরত আসিল, মাঝে হইতে প্রকাণ্ড পিতলের দাঁড়ে-বসান কাকাতুষাটা তাহার হাঁড়ির মতন মোটা গলায় আওয়াজ বাহির করিয়া মুকব্বি-চালে হাঁকিল, “রুপো—রুপো—রুপো!” পাখীটির নাম তাহার রূপের গরবে ‘রুপসী’ রাখা হইয়াছিল, ডাক নামটি “রুপু।”

পাখীর শব্দ বিড়াল-বাচ্চাকে ঘাড়ে করিয়া তখন আর অধিকক্ষণ অরি-মিত্র যোগ না করিয়া উন্মিলা ‘রতুকে’ লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল

এবং সেখানে তাহার নাহশব্দ নরম দেহটি নিজের কোলের মুখে ফেলিয়া জাম্ব দোলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে বসিল। ছোটো ডব্‌ডবে সবুজ চোখের উপর করতলের মূহ মূহ আঘাত দিতে দিতে ঘুম-পাড়ানিয়া ছড়া বলিতে আরম্ভ করিল—

“আয় চাঁদ আয়!

বাঁশবনের ভিতর দিয়ে

চাপাগাছের উপর দিয়ে

নীলসাগরে সাঁতার দিয়ে

আয় চাঁদ আয়!—

দে রে ধরা চাঁদের ফাঁদে—

নইলে যে রে চাঁদ কাঁদে—

আঁচল-কোণে রাখব বেঁধে——”

সিঁড়িতে এবং তার পর দালান দিয়া জুতার মস্‌মস্‌ রব তুলিয়া যে লোক এই ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরের ভিতরকার এই দৃশ্যটি চোখে পড়িতেই সে ব্যক্তি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“বাঃ! বাঃ! উন্মিলা! বেশ তো তোমার চাঁদটি! আহা, যেন ষোল কলার পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ।”

নিজকণ্ঠের কলরবে এতক্ষণ উন্মিলার কণ্‌ ইহার জুতার শব্দে অজ্ঞ ছিল, এখন পরিচিত কণ্ঠের সাড়া পাইয়া সে অকস্মাৎ ভীষণ ভাবে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল এবং ইত্যবসরে তাহার কক্ষ-স্থিত বিড়ালশিশুও নিজের অনিচ্ছা-সেব্য আদরের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেই এক লাফ দিয়া নামিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।—তাহা দেখিয়া আগন্তুক ব্যক্তি আর একবার তেমনি করিয়াই উচ্চ কৌতুক-হাস্তে সারা কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

ইহার ভিতরে উন্মিলা নিজের কোমরে-জড়ান রজ্জ্ব ছোবান বৃন্দাবনীছাপা সাড়ীর আঁচল খুলিয়া মাথায় তুলিয়া দিয়াছে, এবং কিছু বিমূঢ়-ভাবেই অবাচ্‌ চোখে এই অদ্ভুত আচরণশীল অপরিচিত ব্যক্তিটিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল। এর সম্বন্ধে কোন পথ যে সে অবলম্বন করিবে, তাহার কিছুই এখনও ভাবিয়া পায় নাই।

নিম্নগণের অপেক্ষা না রাখিয়াই সেই লোকটি কিন্তু দিয়া প্রতিভমুখে ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া অপর আসনের অভাবে বিছনা-পাতা খাটের উপরেই সটান বসিয়া পড়িলেন ও বিষয়ে ইতবুদ্ধিপ্রায় উন্মিলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “কি গো, ‘উন্মিলাগি!’ বলি, চিন্তেই পারলে না যে! আমি কিন্তু সিঁড়ি উঠতে উঠতে তোমার ঐ ‘দে রে ধরা চাঁদের ফাঁদের’ সুর শুনেই তোমায় চিন্তে পেরেছিলুম! তুই তো এতবড়টা হয়েছিস, তবু কিচ্ছুই তো প্রায় বদলাস্ নি!”

উন্মিলা বিষম সমস্তায় পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া পুনশ্চ কপালভাবে তিনিই বলিলেন, “নাঃ! এ মেয়ে-মানুষের জাতের কাছে মনে রাখানর দাবী করতে যাওয়ার মতন ছরাকাজ্জা দেখছি সঙ্গসঙ্গে আর কিচ্ছুই নেই! অস্বি বিষয়-বিষুটে! তরুণ-চন্দ্র লাহা নামক কোন অভাগা—আজ্ঞাকর্মী কথটা কি একটুও স্মরণ হয়? অথবা—”

“ওহো! বুঝতে পেরেছি—এইবার বুঝতে পেরেছি,—আপনি বড় জামাই-বাবু! ও সেই জন্তেই যেন আপনাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছিল, অথচ—”

“তোমার মুণ্ড হচ্ছিল। কোথায় ‘চিনি চিনি’ করছিলি রে? মুখখানা তো বেজায় ‘তেতো তেতো’ করেই চোক বার করে চেয়েছিলি! অচ্ছা, এখন চিন্টি তো? আর এইখানে বসবি আর। ভাল করে তোকে একটু দেখি।”

এতকণে উন্মিলার হারাণ সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রায় যুগান্তরের পরপার হইতে ভাসিয়া আসা এই প্রায় অচেনা আপনার লোকটিকে যে কিছুমান সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন থাকিতেও পারে, তেমন কথা মনের মধ্যে ভুলেও না ভাবিয়া সে এই আকস্মিক প্রাপ্তির গভীর আনন্দে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সানন্দ কলরব করিয়া বলিতে লাগিল, “তা চিন্বেই বা আপনাকে কেমন করে? কতকাল হয়ে গেল আপনাকে যে চক্ষেই দেখি নি, সেইটি বলুন দেখি! ন’বছর দশ বছর তো খুব হবে। আর তখন তো আপনি সারেসবও ছিলেন না! আপনার তখন গৌরব ছিল, ধৃতি-টুতি পরুতেন! তা’ এতকাল পরে যে বড় আমার কথা আপনার আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল? কি ভাগ্যি!”

শেষ কথাগুলো সে ঈষৎ অতিমানের সুরেই বলিল।

তরুণচন্দ্র জুতা-পরা পা দোলাইতে দোলাইতে মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে সেই সকল স্মৃতি-যোগ ভুতিতেছিলেন, শেষ কথাগুলো ও তার স্মরণটুকু গায়ে না রাখিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়াই বলিলেন, “তুই বুঝি গৌরব রাখার খুব পক্ষপাতী? তোমার বরটির বোধ হয়, চাড়া দেবার মতন খুব ভাল রকম গৌরবের জোড়াটি? হ্যাঁ রে, তোমার বরটি কোথায়? তাকে একবার ডাক না, তার সঙ্গেও একটু ভাব করি।”

‘বরের’ কথায় লজ্জায় মাথাটি নামাইয়া উন্মিলা মোম হইয়া রহিল।

“ও কি রে উমি!—তোমার বিষের দিনেই বুঝি তোকে সে-ই শেষবার দেখেছিলুম? তখন তো ‘বরের’ আফ্লাদে তোমার ছ’পাটি দাঁতের একটিও যদি ঢাকা পড়ছিল! সে দিন তুই আমার কি বলেছিলি মনে আছে? আমি তোকে ‘কনে’ বলতুম কি না,—তোমার বর আসতেই গিয়ে বল্লুম, ‘হ্যাঁ রে উমি! তোমার যে বর এলো রে, এখন আমার দশটা কি হয়?’ তুই তখন বল্লি—”

একটা বিসদৃশ কিছু বলিয়া থাকিবার আশঙ্কায় মাথার সঙ্গে নাকের নথটা শুদ্ধ ভীষণ বেগে দোলাইয়া উন্মিলা ঝাঁজিয়া উঠিল, “যান্ যান্! ওসব আমি শুন্তে চাইনে। আচ্ছা বহন আপনি, আমি ছুটে গিয়ে স্বাকে একটু খবর দিয়ে আসি।”—বলিয়া যথার্থই সে আনন্দ-মগ্ন বালিকার মতন নাচিতে নাচিতে ছুটিল! তাহার চলন্ত-মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তরুণচন্দ্র মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ অমুভব করিলেন।—একটা নিখাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন :—“আমার জীটা যদি এমনও হতো; তা হ’লে কি আর আমার আজ এমন করে—”

উন্মিলা শাওড়ীর কাছে সব কথা জানাইয়াই তৃপ্ত হয় নাই, তাঁহাকে শুদ্ধ নিজের পিছনে পিছনে টানিয়া আনিয়াছে। সে আসিয়া দেখিল, তাহার ‘জামাইবাবু’ তখন বরের দেওয়ালে ঝুলান একটা ছবি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। উহার আগমন জানিতে পারিয়া মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এরা কারা রে? তুই আর তোমার বর বুঝি?”

“যান্”—বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া উন্মিলা পুনশ্চ শাস্ত্রবরে কহিল, “মা এয়েচে।”

তরুণচন্দ্র ফিরিয়া গৃহিণীকে প্রণামপূর্বক ভক্তি-ভরে পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, “এসো বাবা এসো। দীর্ঘজীবী হও, রাজা হও, মনের সুখে থাকো! হ্যা বাবা! প্রেম আমার একটু সার্চে-টার্চে?”

“তেমন, কই।”—বলিয়া উত্তর দিয়াই তরুণচন্দ্র উন্মিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এক গ্লাস খাবার জল আন তো উমারিণি!”

উন্মিলা চলিয়া গেলে স্বর কিছু ছোট করিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “প্রমিলার দুঃখময় জীবনের শেষ হয়ে এসেছে, তার আর বাঁচবার আশামাত্র নেই।”

গৃহিণী বলিলেন, “আ—হা!”

তখন তরুণচন্দ্র আরও একটু নিঃস্বরে ও স্বরিকণে কহিলেন, “দেখুন, বিনয়ের সম্বন্ধে আমি দুটো খবর পেয়ে আপনাকে তাই জানাতে এলাম। দেখা শোনা নাই থাক, তবু সে আমার আপনার লোক তো বটে! আপনি তাকে কল্কাতার হুজুগে পড়ে মাটি হাতে দিয়ে রেখেছেন কেন?”

জগদ্ধাত্রীর মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত অভিমানের উৎস এই কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া তিনি উত্তর দিলেন,—“আমি তাকে ফেলে রাখবার কে বাবা! যে ফেলে রাখবো?—সেই যে এখন এ বাড়ীর হর্তা, কর্তা, সেই তো আমাদের হুঁজুকে বনবাস দিয়ে রেখে যা তার মন চাইচে তাই করে বেড়াচ্ছে!”

তরুণ অবাক হইয়া গিয়া কহিলেন, “আপনার কথা সে শোনে না, না কি?”

“হ্যা—আমার কথা শুন্বে! যার বাড়ি নেই, সেই তাঁকেই বড় মেনে ছিল! ‘বিনে’ ‘বিনে’ করে যে পাগল হতেন, বিনয়ের তো বড় খোঁজ খবর! কার দোষ দোষ বল, বাবা! ও আমার গর্ভের দোষ,—আমার ভাগ্যেরই দোষ! পোড়া পেটে একটাও কি আর মানুষ জন্মাতে নেই? হু-হুটো ছেলে হলো, হুটোই কি বাঁদর হাতে হয়? এই তো তুমিও তো বিলেত গেছলে বাবা, অতবড় একটা চাকরীও তো কর্চো, তা মন তো আর তার মতন বিলিতি হয়ে যায় নি।”

তরুণ কহিলেন, “তা এখন শুধু ভাগ্যকে দোষ দিয়ে নিজেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেই তো আর হবে না যা! যাতে ছেলেটি আপনার ঘরে ফেরে, জেল কেল-একটা না হয়,—তা’ ছাড়া আরও যে একটা মস্ত রকম কেলেকারীরও জোগাড় সে করে তুলে, সে সবগুলো থেকে যাতে রক্ষা

পায়, তার জন্ত তো আপনাকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।”

• মনে মনে অত্যন্তই শঙ্কামুভব করিতে থাকিয়া জগদ্ধাত্রী কাতর-কণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিলেন,— “বাবা! তা হলে কি হবে বাবা? ও মা, এ হতভাগাও কি আবার ঐ বড়র পথেই গেল না কি গো? আ! তের বছর বয়সে যে ওর ঐ ভয়ে বিয়ে দিলুম, বলি তা হলে আর কোন দিকে বুঝি চেয়ে দেখবে না। তা’ এ আবার আমার দেখছি উণ্টে দুগুণ জালা হলো!”

উন্মিলা বাতাসে রুদ্ধ স্বর বনাৎ করিয়া খুলিয়া গালভরা পানের সঙ্গে ঠোটভরা হাসি লইয়া কাঁচের গ্লাসের জল ভগ্নিপতির হাতে তুলিয়া দিল। “দেখুন তো, আমাদের নীচের কুঁজোর জল ঠিক বরফ-জলের মতন ঠাণ্ডা নয়?”

“তাই তো রে!” বলিয়া তরুণ হাসিয়া জল পান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী-অতিকষ্টে নিজের আহত হৃদয়ের জালা চাপিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, “বোমা! যাও তো বাবা! বামুন-মেয়েকে দিয়ে বড় ছেলের জন্তে খানকতক গরম লুচি, একটু আলুর দম, আর দু’খানা আলু-পটলের ভাজা চট করে করিয়ে নিয়ে এস তো। আর কাপড় ছেড়ে ভাঁড়ার-ঘরের শিকে থেকে পেড়ে কালকের বানানো নাড়ু আছে, তাই দিয়ে দিও গোটাকতক। যাও, শীগ্গির করে যাও।”

সম্ভ্রষ্ট-মনে কন্দিষ্ঠা উন্মিলা লাফাইতে লাফাইতে নীচে নামিয়া গেল। তাহার বন্ধনহীন-প্রায় অবসর-কালকে কোন এক জন আপনার লোকের জন্ত একটুখানি উৎসর্গ করিতে পাইয়া সে যেন আজ বর্তাইয়াছিল।

জগদ্ধাত্রী ছুই চোখে ও কণ্ঠস্বরে কাতরতার সঙ্গে মিনতি করিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, “হতভাগা ছেলে কি যে করেছে, জানিনে। তবে ওর রকম সকম দেখে দেখে অনেক দিন থেকেই আমারও কেমন যেন মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কলেজে পড়লে, সব করলে, শেষ পরীক্ষার সময় কোথাও কিছু নেই, হুট করে কলেজ ছেড়ে দিলে। তাই না হয় না পড়িস্ বরেন্ টলে আর। নিজের জাত-ব্যবসা যা’ সব আছে, তাঁনার—অতবড় কার-কারবার, সেই সবই দেখ শোন্ না, পড়বার তাঁদের দরকারই যে ছিল না; সে-ও তো তাঁদের নিজের নিজেরই সখ। তা’ নয়—আবার পাঁচ জনেরই মুখে মুখে

উন্টে পাই, পথে পথে না কি টোটে ক'রে বেড়িয়ে—কোথায় কোন্ ভিথিরী মরচে, কে কোথায় কার হাওয়াগাড়ী কি ট্রায়ে কাটা প'ড়েছে, তাদের নিয়ে সেবা হ'চ্ছে! খাওয়া নেই, ঘুম নেই, পায়ে একটা জুতো,—মাথায় একটা ছাতা পর্যন্ত নেই—পথে পথে কাপড় বেচা হ'চ্ছে, দেশ না কি এই ক'রে উদ্ধার করা হ'চ্ছে! ভয়ে আশি আশমরা হয়েছিলুম বাবা! রাতে আমার ঘুম হয় না, কোথাও একটু শব্দ হ'লে যেন বুক আমার ধ'সে পড়ে। কেবল মনে হয়, কোথা থেকে বৃষ্টি কি কু-খবরই বা এলো! তা এই তুমিই তো বল্চো যে, তার বিপদ না কি এসেই পৌঁছে গেছে? মন যে অন্তর্যামী!—আর নেহাৎ বেশী কিছু না ঘটলেই কি আর এত কষ্ট ক'রে তুমি নিজেকে এসেছ?—জগদ্ধাত্রীর চোক দিয়া হুহু শব্দে জল পড়িতে লাগিল।

তরুণ তাঁহাকে অর্ধ-সাস্থ্য দিয়া কহিলেন, “দেখুন মা! বিপদ বিনয়কে সত্যি সত্যিই ঘিরেচে। আমি কোন রকমে জানতে পেরেচি, তারা ভিতর ভিতর একটা খুব বড় রকমই ষড়যন্ত্র করচে। তার জন্ত অস্ত্রশস্ত্রও না কি নানাদেশ থেকে জোগাড় হ'চ্ছে। এই সময় খুব বেশী সাবধান না হ'লে আর তাকে রক্ষা করা যাবে না। তা ছাড়া ক'ল-কাতার এক বিলাতফেরৎ ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গেও তার নাম নিয়ে আজ কাল খুবই গোলমাল যাচ্ছে। তা'কে না কি সে বিয়ে করতেও চায়। আচ্ছা, উম্মিলাকে কি তার মনে ধরে নি? কেন, ও তো খাসা মেয়ে!”

জগদ্ধাত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “সকলিই আমার বরাত রে বাবা! সকলিই আমার এই পোড়া বরাত!—উম্মিলাকে সেই একরত্তি বেলা থেকে যে পিঠোপিঠির মতন ক'রে এসেছে কি না, এখনও ওদের ঠিক সেই রকমই চ'লে যাচ্ছে। এখনও বাড়ী আসে তো অস্ত্র ঘরে শোয়; কেবল ছুটিতে রাতদিন ছেলেমানুষের মতন মারামারি আর হুড়োহুড়ি! হাজার বল্লোও শোনে না, বোঝে না, আর বাড়ীতেও তো কেউ ওদের সমবয়সী নেই যে, তেমন ক'রে বুঝিয়ে বলে। বউটোও হয়েছে বোকার একশেষ। আমি বলি তো ওকে বিধিয়ে বিধিয়ে, তা গণ্ডারের চামড়া না কি যে ওর গায়ে আছে, সকলি যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন ভুগুন হত-ভাগা মেয়ে!”

তরুণ একটু চিন্তিতমুখে নীরব রহিল দেখিয়া জগদ্ধাত্রী উঠিয়া আসিয়া একবারে তাহার দুই হাত

হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “যদি পোড়াকপালীর মুখেরে কষ্ট ক'রে এতদূর এসেইছ বাবা! তা হ'লে যাতে আবাগীর বেটীতে জন্মের মতন ভেসে না যায়, তারই একটা উপায় কর। ওর এই সোমোত্ত বয়েস, দেহতরা রূপ, যা হোক ঘরে দুটো পরসাত আছে, ওকে দেখবেই বা কে? ওর দশা হবে কি?—আমি আর কদিন! দোহাই বাবা! তুমি একটা মেজ-ঠার, তুমি মনে করলে কি না পারো? ওকে কোন রকমে একবারটি ঘরে পুরে দিয়ে যাও।”

“আমিও তো তাই চাইচি। আচ্ছা দেখুন, আপনি যদি বিস্তর কাদাকাটা ক'রে ওকে বাড়াতে আনিতে নেন; আর ও এলেই ওকে ও উম্মিলাকে সঙ্গে ক'রে,—ধরুন—এই বদরীনারায়ণই চ'লে যান এবং সেখান থেকে ফিরে হৃষিকেশে কিছুদিন ধরে ওদের নিয়ে বাস ক'রে থাকেন। অর্থাৎ বৎসর খানেক ঐ রকম অনেক দূরে দূরে জনসঙ্গ ছাড়া নিভৃত স্থানে ওকে যদি আটকে রেখে দিতে পারেন, তা হ'লে হয় তো ছ'রকম বিপদ থেকেই ও বেঁচে যেতে পারে। বুঝলেন? তা ভিন্ন আর তো কোনই উপায় দেখি না।”

জগদ্ধাত্রী এ পরামর্শে কথঞ্চিৎ শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও অস্বস্তিতে অধীরা হইয়া পড়িলেন, “হ্যাঁ বাবা, এ যে তুমি বল্চো, এ তো খুবই ভাল কথা বাবা! তোমার বুদ্ধির উপযুক্তই তো পরামর্শ দিয়েছ, তা, সে হতভাগা ছেলে কি আর আমার কথা কানেই তুলবে? না, আমার সে দিন আর আছে? মা বল্চো বিনয় আমার এত দিন অজ্ঞান হতো, এখন ‘দেশ’ পেয়ে যে পোড়াকপালী মাকে সে ভুলে গেছে।—ও বাবা! আমার মুখ চাইবার আর কেউ নেই। ভগবান্ তোমার ভাল করবেন, আমার হুঃখ দেখে তুমিই দয়া ক'রে যদি কোন উপায় ক'রে দাও।”

তরুণ সবিনয়ে কহিলেন, “সে কি আর আপ-নাকে আমার কষ্ট ক'রে বল্চো হবে মা! দেখুন, আমার নিজের বোন নেই, উম্মিলা আমার ছোট বোনটির মতন। তার যাতে ভাল হয়, সে কি আর আমি না করবো। তবে কথা কি জানেন, আজকালকার ছেলেরা একটু বেশী পরিমাণে স্বাধীন হয়ে উঠেছে। তারা আমাদের মতন লোককে কেয়ারই করে না, বরং গবর্ণমেন্টের চাকরী করি বলে ওদের চোখে আমরা লোভী, ভীক, এবং অপদার্থ। তারা সব এ বুগের অর্জুন, ভীক।—

কাজেই তাদের সামনে যেতে আমরাও ভরসা কম করি। না হ'লে আমি তাকেই তো নিজে ডেকে এ সব কথা বলতে পারতুম। অনর্থক এতদূর আসবার তো কোন দরকারই ছিল না। তা আপনারা যতদূর পারেন চেষ্টা ক'রে তো দেখুন, নেহাৎ না হয়, তখন আমি তো আছিই।”

“বাবা! তোমার ভগবানই কৃপা ক'রে দুঃখিনীদের কাছে এনে দিয়েছেন, যাতে সুবিধা হয় তাই করো। আমি মুখা মেয়ে-মানুষ;—শৌকে, রোগে জানোয়ার ব'নে রয়েছি; কি আর তোমার বেশী বলবো? তুমি একটা জেলার নেভেষ্ঠার, দিনরাতই তো ওই সব করুচো, যাতে হতভাগাটা বেঁচে যায়—তুমি তাই করো।”

হাস্ত-কৌতুকের মধ্যে দিয়া জলযোগ সমাধা হইলে, তরুণ বলিলেন, “তোমার সেই সোনার না হীরের চাঁদটিকে একবারটি কোলে ক'রে নিয়ে আর তো রে উমি! আহা, বেড়ে মোটা ল্যাঙ্কটি তার।”

উম্মিলা তাহার পোষ্যপুত্রের ‘ল্যাঙ্কের’ প্রশংসায় আহ্লাদে ডগ্‌মগ হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ও খানিক পরেই অনিচ্ছুক বিড়াল-ছানাটাকে ঘাড়ে চাপাইয়া সেটাকে নাচাইতে নাচাইতে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

তরুণচন্দ্র পকেট হইতে একটি ভেলভেটের বাক্স খুলি করিয়া তন্মধ্যে হইতে খুব সুন্দর গঠনের একটি সোনার চেন লইয়া সেই বিড়াল-ছানাটার মাথার উপর সেটি বুল করিয়া ফেলিয়া দিলেন। চেনটার মাঝখানে একটা বড় ধুকধুকি। তাহাতে বড় একখানা ওপালের চারিপাশে সোনার পাতায় মুকুতা-খচিত। জিনিসটার দাম আছে।

“এ আবার কি? নাঃ!”—বলিয়া হারগাছা হাতে করিয়া উম্মিলা বিড়াল-বাচ্চাটাকে ছাড়িয়া দিল।

তরুণচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তোমার খোকার মুখ দেখবো ব'লে আসবার সময় কিমে এমেছিলুম রে! তা আমার উম্মিলায় যখন ঐ রকমেরই খোকা, তখন কাজে কাজে তাকেই দিতে হচ্ছিল! আচ্ছা আয় দেখি, তা হ'লে তাকেই না হয় পরিয়ে দিবে যাই। দেখলে মধ্যে মধ্যে সবু এই অভাগা জামাইবাবুটার কথা মনে পড়ে যাবে এক আধবার।”

উম্মিলার বিস্তর আপত্তি-সত্ত্বেও তাহাকে সেই বিড়াল-প্রসাদী হারগাছা পরিতে হইল, এবং শেষে শিটমাটো হইল এই রকমে—“আচ্ছা, ওটা তুই

অমনি না নিস, ওর বদলে আমার না হয় ওর চাইতেও বেশী দামের খুব ভাল জিনিস একটা দিবে দে। কেমন রে! প্রাণ ধ'রে কি পারবি দিতে?”

জিজ্ঞাসু-চোখে চাহিতেই তরুণচন্দ্র সম্মিতমুখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, “তোমার হুঁজনকার ঐ ফটোখানা।”

“ওঃ তারি তো!” বলিয়া উম্মিলা ঠোট উল্টাইয়া মুখ ফিরাইল এবং তৎক্ষণাৎ সেখানা ফ্রেম-ওক খুলিয়া আনিয়া অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া ভগ্নিপতির হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল, “তারি তো, এর বুঝি আবার অত দাম! আহা হা, যা বুঝি গো!”

তরুণ সেখানা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া সহাস্ত-মুখে উত্তর দিলেন,—“যা হোক তোমার বুঝির দৌড় যে কতদূর, তা বেশ জেনে রাখলুম।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণা ইংরাজীতে লিখিত এই পত্রখানা পাইল।—
আমার প্রিয় বেবি!

কাজের ভিড়ে ক'দিন তোমার খবরাখবর নিতে পারি নি, তার জন্য আমার মাপ করো। আশা করি, তুমি শারীরিক বেশ সুস্থই আছ? তোমার বাবা কিছু সুস্থ হইয়াছেন কি? তাঁর জন্য যে নূতন প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সেদিন পাঠাইয়াছি, তাঁর কাজ-কর্ম বেশ মন দিয়া করিতেছে তো?

একটা অপ্রিয় সংবাদ দিতেছি। সত্যটাকেও ‘প্রিয়’ ভাবে প্রকাশ করা শাস্ত্রকারদের অনুমোদিত হইলেও অবস্থা-বিশেষে শাস্ত্রশাসনলঙ্ঘনে আমাদের যে ~~কোন~~ক সময়ই বাধ্য হইতে হয়, অবশ্য সেটা তুমি বোধ হয় এখনও অস্বীকার করিবে না?

দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার নবীন-বান্ধব ও উপদেষ্টা বিনয় শীল নামধারী লোকটির সকল রহস্য আমার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এই বিনয়কুমার শীল আমার মৃত্যুদ্বার-সমাসীনা চিরকথা স্ত্রী প্রমিলার ছোট বোন উম্মিলার স্বামী। সেই সম্বন্ধে সে আমার ‘ভায়রা-ভাই।’ তুমি জান, খণ্ডর-কুলের কাহারও সহিত আমার বিশেষ ভাবে বনিষ্ঠ পরিচয় নাই। বিনয়কুমারকে তাহার বিবাহ-রাত্রে একবার-মাত্র এগার বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম, তাই সে দিন রাত্তার দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারি নাই। গত কল্য বিশেষ কার্যব্যাপদেশে কৃষ্ণনগর গিয়াছিলাম, সেখানে বহুদিন পরে আমার শালী উম্মিলাকে

দেখিলাম। উন্মিলাকে দেখিতে এখন খুবই সুন্দর হইয়াছে! তাদের দু'জনকার একসঙ্গে তোলা ফটোগ্রাফ একখানা উনি আমার উপহার দিয়াছিল; তা—রী সুন্দর ছবি উঠিয়াছে! এই সঙ্গে সেখানি তোমার পাঠাইলাম, মিলাইয়া দেখিও, এই উন্মিলার স্বামী বিনয় শীলই তোমার সেই নব-পরিচিত ও বন্ধু বিনয়শীল কি না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন তোমার নূতন বন্ধুর আশা করা তোমার পক্ষে অধিকতর নিশ্চিন্দ হওয়ারই আশঙ্কাপূর্ণ, [যেহেতু, তার স্ত্রী তোমারই মত সুন্দরী ও অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, অধিকন্তু তোমার পেক্ষায়ও ছ'এক বৎসরের অল্পবয়স্কা] তখন অনর্থক তাদের সুখময় আনন্দময় আশা-সরস তরুণ দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে নিরানন্দের বিচ্ছেদের বেদনার হাহাকার না টেনে এনে যে লোক আজ দীর্ঘতম আট বৎসর একাদিক্রমে তোমারই ধ্যানে তন্ময় হয়ে বেঁচে আছে, তারই কাছে ফিরে এসো না কেন? আমার স্ত্রীর অবস্থা প্রতিদিনের চেয়ে প্রত্যেক দিনেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে; তার শেষ হবার আর বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু বিনয়-কুমারের স্ত্রী উন্মিলার হয় তো তোমার পরেও কিছুদিন বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। বিবাহিতের সহিত নিজের নামকে জড়িত রাখা তোমার বিশেষ অনিচ্ছা জানিয়াই এই খবরগুলি তোমায় দিলাম। বিনয়ের সহিত তোমার নামোল্লেখ ইতোমধ্যেই কোথাও কোথাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, [ইহা ইচ্ছা করিলে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়]। চিরকথা ও উন্মাদ স্ত্রীর স্বামীর নামের সহিত উল্লেখ হওয়ার অপেক্ষা কোন সুন্দরী স্ত্রীলা পুণ্যচরিত্রা রমণীর পতির সহিত সংযুক্ত হওয়াতে কি তোমার নামের গৌরব বৃদ্ধি হইবে আশা করো? তন্নিম্ন কোন ভদ্রমহিলার নাম সাধারণে যদি পাঁচবার পাঁচ জনের সঙ্গে সংযোগ করে, তাহাতে সমুদয় ভদ্রসমাজেরই গ্লানি। ভরসা করি, আমার কঠোর কর্তব্যপালনব্যপদেশে অপ্রিয়ভাবে প্রযুক্ত সত্যকথাগুলি তোমার পক্ষে অসহ্য হইবে না এবং এর জন্ত আমার তুমি ক্ষমাও করিতে পারিবে? তোমাদের কুশল জানিতে ইচ্ছুক ও উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

তোমার চিরানুগত তরুণ।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণার মুখের উপর বিবিধ ভাবের তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ক্রীড়া করিয়া গেল। তাহার কবিত কাঞ্চনবর্ণ কখনও তীব্র বেদনার

কালো দেখাইল, কখনও অকথ্য অবমাননার অসহায় ক্রোধে হাপরে-ভরা স্রবণের মতই তাহা রাঙ্গা হইয়া উঠিল,—অবশেষে চিঠি পড়া সমাধা করিয়া সে সেই একই ভাবে কতক্ষণই যেন অবসর হইয়া বসিয়া রহিল। কখন একান্ত অপ্রত্যাশিত মর্ম্মস্তদ্রুপে তাহার স্বভাব-রক্ত কপোল ললাটের রক্তরাগ অপমৃত হইয়া গিয়া তাহাকে বিবর্ণ পাণ্ডুরাভ করিয়া তুলিল। সম্পূর্ণরূপেই অচিন্তনীয় ব্যাপার কিছু না ঘটিলে মানুষের সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার, সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি এমন করিয়া বুকি আচ্ছন্ন হইয়া যায় না!

যখন বহুক্ষণ পরে আপনাকে আপনিই আবার স্মরণ করিয়া লইবার সামর্থ্য ফিরিয়া আসিল, তখন নিজের কোলের উপর চোক পড়িতেই মস্তবড় একখানা খামে মোড়া 'পেপ্টবোর্ডের' রক্ষণার মধ্যে সেই তথাকথিত ফটোগ্রাফখানার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তার পর আর একটুখানি সময় থাকিয়া থাকিয়া বক্ষের উদ্ধাম নর্ত্তন-বেগকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া মোড়ক খুলিতেই হস্ত-সংস কোতু-কোজ্জল একখানা বড় পরিচিত—বড় পরিচিত মুখের পাশেই এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা কিশোরীর হস্ত-প্রফুল্ল পূরিত মুখের উপর তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বাধিয়া রহিল। এই সেই নারী, যাহাকে তাহারই মত 'সুন্দরী ও অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্ন' বলিয়া মিঃ লাহা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন! ইনিই বিনয়-কুমারের স্ত্রী উন্মিলা শীল! ফটোগ্রাফ-খানা নামাঙ্কিত রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে স্তব্ধ ও আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বেখাচিত্রের স্থায় তাহার কাছে কতকগুলি কালির আঁচড় মাত্র বোধ হইতে লাগিল। জীবনের নব-জাগ্রত আশা-স্বপ্নের অর্দেকখানাই তাহার বুকি সেই সঙ্গে ভাঙিয়া গেল।

দু'দিন পরে মিঃ লাহা তাঁহার উৎকণ্ঠাপূর্ণ নিত্য-প্রতীক্ষিত পত্রের এইরূপ উত্তর পাইলেন।—

প্রিয় মহাশয়!

আপনার পত্রে আমার 'নবীন-পরিচিত' ও কর্ম্ম-সঙ্গী স্ত্রীকৃত বিনয়-বাবুকে আপনার নিকটতম আত্মীয় জানিয়া বিশেষরূপে আনন্দিত হইলাম। বিনয়বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ-পরিচয় করিতে ইচ্ছা করে, বড় সুন্দর মেয়েটি! যদি কখন আপনার বাড়ী তিনি আসেন, খবর দিলে গিয়া নিশ্চয়ই একবার দেখা করিয়া আসিব এবং সম্ভব হইলে তখন তিনিও আমাদের কর্ম্ম-সঙ্গিনী হইবেন।

আপনি অনেকখানি অনধিকার-চর্চায় অনর্থকই নিজের মাথা বকাইয়াছেন; এবং আমাকেও সেই সঙ্গে অহেতুক অপমান করিয়া ফেলিয়াছেন! আমার আপনার নামের সহিত আমার নাম নিরুদ্ভূত-বশতঃ দীর্ঘ-কাল ধরিয়া জড়িত রাখার ফলেই আজ এই পর্য্যন্ত আমার মৰ্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আপনি এবং আপনার মত যে কেহই আমার সম্বন্ধে দুইটা কথা কহিতে পাইলে ছাড়িয়া দেননা। যাহা হউক, আমার সুনাম কুনামের চিন্তায় আপনি আর অনর্থক দুঃখভোগ করিবেন না। এখন হইতে আমাদের দুজনকারই ঐ সম্বন্ধে দুটা হইয়া যাক। তবে নিতান্তই যদি দুর্ভাবনার জন্ত আপনার নিজস্বীনতা জন্মে; সেই জন্তই জানাইলাম যে, বিনয়বাবুর সম্বন্ধে আপনার ঐ অতি হেয় ঈর্ষ্যা একান্তই নিশ্চয়োজ্জন। আপনি বা আর কেহ—কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন ব্যক্তির সহিতই আমি নিজের নামকে আর সংযুক্ত গুনিতে ইচ্ছা করি না—এবং সত্যকথাই বলিব;—বিবাহে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। বিবাহেই আমার প্রবৃত্তি নাই। অতএব নিশ্চিত-চিত্তে নিজের গন্তব্যপথে স্বচ্ছন্দে গমন করুন; আর দোহাই আপন-নার, আমার পথে আমার একটুখানি স্বস্তিতে চলিতে দিন। মিনতি করি, আমার পিছনে আর ধাওয়া করিবেন না।

আর এক কথা,—আপনার সহিত আমার বিবাহের বাগ্‌দান-ভঙ্গস্বরূপ আপনার দেওয়া মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি আপনাকে ফেরৎ দেওয়া আমি উচিত বলিয়া মনে করি। ‘ইন্সিওরড’ পার্শেলে আপনার টাকায় কেনা মুক্তার মালা,—আপনার দত্ত হীরার ও মুক্তার ব্রোচ দুট, হীরার আংটি, চুনীর ব্রেসলেট ও গবর্ণমেন্ট হাউসের নিমন্ত্রণের জন্ত যে বেনারসীর স্টুট তৈরি করাইতে আপনার কাছে ধার লওয়া টাকার সাতাশো পঁচিশ খরচ হইয়াছিল, সেই ‘অব্যবহৃত’ সাদী ও ব্লাউস দুইটিও ঐ সঙ্গেই পাঠাইতেছি। আমি গরীব, অতঃপর গবীবের মতই থাকিব। ও-সব আমার আর কোন কাজে লাগিতে পারে? ভবিষ্যতে যিনি ম্যাজিস্ট্রেট-মহিষী হইবেন, তাঁহার কাজে লাগিবে।—আপনার কাছে আমার বাবা অনেক ধানে আবদ্ধ, অন্তরের ঋণও আপনার সঙ্গে আমাদের প্রচুরতর। অর্থ-ঋণ বাবার ঘর-বাড়ী বিক্রী করিয়া শোধ হইতে পারে; আপাততঃ আমার কয়েকখানা গহনা বেচিয়া যে দশ হাজার

টাকা পাইয়াছি, এই সঙ্গেই দিলাম। আর আপনার মেহের ঋণ এ জন্মে শোধ হইবার নয়, সেটা ধারেরই থাকিল। আশা করি, সকল অবস্থা এইবারে পরিকাররূপে বুঝিয়া লইয়া আমার ছাড়ান দিবেন।

আপনার বিনীতা কৃষ্ণা মল্লিক।

ইহার পর কৃষ্ণার এই সুদীর্ঘ পত্রের উত্তর সঙ্গেপেই আসিল।—

আমার প্রিয় বেবি! তোমার পত্র ও গহনা টাকা ইত্যাদি ফর্দমত সমস্তই মিনাইয়া পাইয়াছি, কেবল পাই নাই সেই আমার স্বল্প-আহরিত অতি সুন্দর ফটোখানি! হীরা-মুক্তার চাইতেও অমূল্য বোধে বোধ করি, সেইখানিই শুধু নিজের জন্ত রাখিয়াছ?

তুমি যে লিখিয়াছ—বিবাহিত এবং কোন অবিবাহিত পুরুষের সহিতই তুমি সম্বন্ধে আসিতে আর সম্মত নও। কিন্তু এই মতটা তোমার—বিনয়বাবুরের সঙ্গীক ফটোখানা দেখার পূর্বে যে ছিল না, ইহা নিশ্চিত!

যাই হোক ‘বিবাহিত’ এবং ‘অবিবাহিতের’ প্রতি বিরাগ জানাইয়া যে বিপত্নীকের প্রতি অনুকম্পা-টুকু বাকী রাখিয়াছ, ইহাতে আমি ভবিষ্যতের জন্ত আশ্বস্ত রহিলাম। আশা করি, সর্বদীন কুশলে আছ? তোমার বাবার সংবাদ দিতে ভুলিয়া গিয়াছ, তিনি কেমন থাকেন খবর দিও।

তোমার চিরানুগত তরুণ।

ক্রোধোত্তেজিত বিকৃত হস্তাক্ষরে এই পত্রখানি কৃষ্ণা মল্লিকের নিকট হইতে ডাকে আসিল। “মহাশয়!

আপনার ব্যবহার ভদ্রতার সীমা বহুদিনই অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে একেবারেই অসহনীয় বোধ করিতেছি। আমার ইচ্ছা, বাড়ীখানা বেচিয়া আপনার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিই। আপনার মত হৃদয়হীনের সংস্রব রাখার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

আর এক কথা—যাহাকে আপনি অস্তানু-রাগিনী বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাহাকে নিজের স্ত্রী করিতে চাহিতেছেন কোন্ হিসাবে? আপনার আরোপিত অপরাধের আমি প্রত্যাচার করিলাম না জানিবেন।—এইবার আমার মুক্তি দিন!—মুক্তি দিন! মুক্তি দিন!—

কৃষ্ণা মল্লিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় সে দিন প্রথম হরতাল। বড়-বাজার ও হারিসন রোডের কতকগুলি মাড়ওয়া-রীর দোকান ভিন্ন প্রায় সব দোকানই বন্ধ। দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও উপবাসী ছেলেরা দলে দলে অন-ভিজ্ঞ ও অধিকাংশ অশিক্ষিত নাগরিকবর্গকে 'হরতালের' বা সজ্ব-বন্ধ হইয়া কার্য্য করিবার উপকা-কারিতা ও উদাহরণ সচেষ্ট ধৈর্য্যাবলম্বনে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোথাও কোথাও হুই দলে বেশ একটুখানি তর্ক জমিয়াছিল। কিন্তু 'সেরা প্রমাণ যে লাঠীর গুঁতা' সেটা এ ক্ষেত্রে কোথাও উপস্থাপিত করা হয় নাই। কারণ, 'হর-তালী'রা একবারেই লাঠিশূন্য।

'তৃতীয় পক্ষ' নিজেদের রেগুলেস্ লাঠি এবং বন্দুক, বেওনেট, কিরীচ প্রভৃতি সমস্ত উত্তম করিবা-মাত্র একটা ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় আছে। বড়ের পূর্বকণের আকাশের মতই সমস্ত থমথমে ও শুক! রাস্তার দু'ধারে একতল হইতে চারিতল পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীর ঘাট জানালা বারান্দা ও পঞ্চম তলার ছাদে পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক জমিয়া উঠিয়া আসন্ন ঝটিকার প্রতীক্ষায় যেমন করিয়া তড়িৎ মেঘে ব্যাপ্ত আকাশের দিকে চাহে, তেমনি করিয়া হর-তালী ও সশস্ত্র পুলিশ-সার্জেন্ট ও গুর্খাসমার্সের রাজ-পথের দিকে উৎপ্রেক্ষিত-নেত্রে চাহিয়া আছে।

শেরালদহের কাছাকাছি, হারিসন রোডের উপরের একটা বিলাতী কাপড়ের দোকানে জন-কয়েক আফিসের কেরাণী কতকগুলি সৌখীন বস্ত্র ক্রয় করিতেছিলেন। 'মুটুয়া'র সাজ পরা গুটি-কয়েক তরুণ ছেলের মাথখানে একটি তরুণী হাতের উপর বুলাইয়া কতকগুলি চরকার সূতার মোটা কাপড় লইয়া সেইখানে দেখা দিলেন। ছেলে-দের মধ্য হইতে এক জন সেই পাতলা কাপড়ের খরিদার-বাবুদের ডাকিয়া বলিল, "মশাই! আজ-কার দিনটাতে আর কেনা-বেচা না করলেই ভাল হয় না? একটা দিন বই তো নয়।"

বাবুদের মধ্য হইতে এক জন রুষ্ঠ-বিজ্ঞপে জবাব দিলেন—"বান্ মশাই! নিজের নিজের চরকার তেল দেন গিয়ে, পরের উপর জুলুম করতে আস-বেন না, বল্চি।"

ছেলেটি হাত হুটি জোড় করিয়া সবিনয়ে কহিল—"আমরা দেশের তরফ থেকে দেশবাসীর সেবা করবার ভার নিষ্পেচি, জুলুম করা আমাদের

মোটাই উদ্দেশ্য নয়। একটা দিন জাতীয় গৌরব-বর্ধনের সহায়তার জন্য সকলেই সামান্ত ত্যাগ স্বীকার করুন এই অনুরোধ।"

আর একটি বাবু জবাব দিলেন, "তাতে আমার লাভ?"

"জাতীয় উন্নতি অবনতির মধ্যে আপনারও লাভক্ষতি আছে বৈ কি! আপনি তো আ-জাতীর বাহির নহেন।"

বাবুটির মুখ তাঁমার হাঁড়ির মত দেখাইল। রোথ্ দেখাইয়া বলিলেন, "এ সব তোমাদের গুণ্ডামী! এক দিন হরতাল করলে কি দুখানা খদর পরলেই কি ভারত স্বাধীন হয়ে উঠবে?"

এদের দল হইতে উত্তর আসিল—"না হ'তেও পারে। কিন্তু আমরা যে একটা স্বতন্ত্র মহাজাতি, আমাদেরও যে একটা জাতীয় ঐক্য থাকা সম্ভব, আমরা যে সংবদ্ধ হয়ে কঠিন কার্য্য সাধন করলেও করতে পারি, এ বোধটা অন্তের কাছেও কিছু মান বাড়ায় এবং নিজেদেরও প্রাণশক্তিকে সম্বর্দ্ধন করে। আর খদর পরলে? তা বোধ হয় আত্মগৌরব একটু বাড়ে বই কমে না এবং বিলাসি-তার হ্রাসে অর্থ-সমস্যার অনেকখানিই সমাধান হয়।"

যে বাবুটি প্রথম কথিয়াছিলেন, তিনি একটু নীতল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তা কি করবে। বন্ধি-বাপু! দেশী কাপড়ে বিলাতীর চাইতে অন্ততঃ জোড়া পিছু এক টাকা, বার আনা বেশী পড়ে, অথচ মোটা ও শ্রীহীন হয়।"

ছেলেটি বলিল, "মানলুম! তেমন ঢের বেশী ট্যাকসইও হয় তো এবং অনেক বাজে স্কিনিস কিন্তে হয় না ব'লে বিদেশী বর্জনে যেটা বেঁচে যায়, তাতে এই পরসারটা পুষিয়ে গিয়েও লাভ থাকে। তা ভিন্ন চরকা ও তাঁতের চলন বাড়লে তুলোর চাষ বৃদ্ধি হ'লে কাপড়ও সম্ভা হবে। বিশেষ বিলিতি কাপড় এখন তো সম্ভাও নেই।"

বাবুটি কিছু নরম হইয়া গিয়া কহিলেন, "সে সব তো পরের কথা, এখন আজই যে আমার মেয়ের বাড়ী ফুলশয্যার তত্ত্বে নমস্কারী কাপড় পাঠাতেই হবে, নতুন কুটুমরা তো আর তোমাদের সঙ্গে পরা-মর্শ ক'রে ব'সে নেই যে, পাওনা-গুণ্ডাটি ছাড়বে। মাঝে প'ড়ে কি আমার কুটুম চটবে, আর মেয়েটার খোয়ার করবে।"

কথা চট করিয়া সামনে আসিয়া একখানা মোটা শাড়ী তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে এই কাপড়

কিন্তু, শুভ-বিবাহে অশুভ বিদেশী জিনিস দিবেন কি জ্ঞাত? আমাদের দেশে বিবাহ প্রভৃতিতে চরকা-কাটার সূতার কাপড় ব্যবহারেরই নিয়ম রয়েছে, আজ পর্যন্ত তার নিদর্শন অনেকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। জানেন অবশ্যই?”

আবেদনকারিণীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বাঙ্গালী বাবুটির মেজাজ একেবারেই গলিয়া পড়িল, তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “মা! আপনার মতন যদি এ দেশের সকল মেয়েই শিক্ষিতা ও ত্যাগশীলা হ’তে পারেন, তা হ’লে তো কোন দুঃখই ছিল না, কিন্তু একটুখানি সৌখীনত্বের লোভে মেয়েরা এখন এতই পাগল হয়ে পড়েছেন যে, এই গড়া পর-বার কথা তো দূরে থাক, অল্পস্বল্প মোটা শাড়ীই তাঁরা পরতে রাজী হন না। কম দামের ফ্রেঞ্চ জরি ও জর্মানসূতার শাড়ী ছ’দিনে ছিঁড়ে যায়, তাই মোটা বেনারসী চেলি মেয়ের জন্তে কিনে এনেছিলুম ব’লে, ঘরে পরে লালিত হচ্ছি। ও কাপড় দিলে কুটুমবাড়ীতে কি আর আমার চৌদ্দপুরুষের শ্রদ্ধা হ’তে বাকি থাকবে? না হ’লে আমি কিনতুম।”

কৃষ্ণা কহিল “আপনার জামাইটি তো শিক্ষিত? তাঁর বাপ কি করেন?”

“জামাই শিক্ষিত হ’লেই বা সে কি করবে? মা-বাপের উপর সে কি কথা কইতে পারে? বাপও অশিক্ষিত নন; কিন্তু মা! আপনি কজন শিক্ষিত পরিবারকে আপনার মতন ত্যাগী ও উদ্বাসীল দেখছেন? মনে হ’লেও কাজে কেঁকটুকু ক’রে উঠতে পারছেন? আপনার কথায় ছ’খানা শাড়ী আমি নিচ্ছি, কিন্তু বাকিগুলি আমার—”

কৃষ্ণা হাত দিয়া দূরের একটা বড় দোকান দেখাইয়া কহিল, “তা হ’লে এখান থেকে অন্ততঃ দেশী মিলের ও তাঁতের শাড়ী নিন। মঙ্গল-কার্যের ভিতরে আর ম্যাকেষ্টারের ছাপ মারবেন না।”

বাবুর দল চলিয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীর সহিত ছেলেদের তর্ক কলহের কাছাকাছি গিয়া পৌছিল।

অল্প দূরেই এক জনের হাতে ঝুলান এনামেলের বালতি ও জাপানী সিল্ক হরতালীদের মধ্যে কেহ কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াতে প্রথমে দু’জনে হাতাহাতি বাধিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে শৌন-বিহঙ্গবৎ পুলিশ আসিয়া তাহাদের বেঁধে নকরিল। —দেখিয়া বিনয় উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া যাইতে উত্তত হইয়াই বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ফিরিয়া দেখিল,

তাহার জামার প্রান্তটা কৃষ্ণার মূর্তির মধ্যে চাপিয়া ধরা।

সে মুহূর্তেরে বলিল, “বিনয় বাবু! মনে রাখবেন, —‘নন-ভায়োলেন্স!’ ছেলটি ওর জিনিস কেলে দিয়ে কাজ একটুও ভাল করে নি,—এইবার যান, তাকে ভাল ক’রে বুঝিয়ে দেবেন। আর—একটু মিনতির সঙ্গেই বলিল—“নিজেও স্বরণ রাখবেন।”—

একখানা ‘ক্যালকট’ বেগে আসিতেছিল; সেই মুহূর্তে যেন একটা বিকট হিংস্র-গর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া পরস্পরে ফুঁসিতে ফুঁসিতে আসিয়া পড়িল। গাড়ীর মধ্য হইতে মিঃ লাহা নামিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, —“ঠিক এই কথাই আমিও ভেবেছিলাম, তবে এত শীঘ্র পাব আশা করি নি। ধ্যাক গড্!”

এমন করিয়া কথা কয়টা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা দম-ফেলা গোছ করিয়া দীর্ঘশ্বাস উখিত হইল যে, সব করজান লোকই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কৃষ্ণার বুকটা ভিতরে একটু কাঁপিল, তার ভয় হইল, পাছে এই ভক্ত-সম্প্রদায়মধ্যে তাহার মর্যাদা-হানিকর কোন আচরণ ইনি করিয়া বসেন, পাছে ইহারা তাহাকে ইহার গুণ্ডচরই বা মনে করিয়া

লয়!

মিঃ লাহা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিলেন, “বাস্! অনেক তো হলো? এখন ফিরে চলো দেখি।”

“কোথায়?” বলিয়া কৃষ্ণা কিছু ভীত-দৃষ্টিতে তাঁহার সুগভীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। প্রতি-ক্ষণেই এই রাজপথের মধ্যখানে নিজেকে সকলকার নিকট একটা দর্শনীয় পদার্থ করিয়া তুলিবার আশঙ্কা তাহার মনকে পীড়িত করিতে থাকিয়া এই অনধিকারী উৎপীড়কের প্রতি তাহার বিরাগকে প্রবলতর করিয়া তুলিতেছিল।

“বাড়ী চলো।” বলিয়া মিঃ লাহা নিজের মোটরের অভিযুখে এক পদ অগ্রসর হইলেন, “এসো বেবি! আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি।”

একটুখানি নিকটস্থ হইয়া অনুচ্চ অথচ দৃঢ় ভৎসনাপূর্ণ-কণ্ঠে কৃষ্ণা কহিল, “মিষ্টার লাহা! আমার পিছনে লেগে থেকে কেন আপনি আমার অনর্থক অপদস্থ করতে এলেন? আমি আপনার কি করেছি যে, কিছুতেই আপনি আমার ছাড়ান দিতে পারছেন না? যান, আমার মুক্তি দিন।”

মিঃ লাহা এই কথা শুনিয়া শুধু একটুখানি

মুচুকিয়া হাসিয়া তাহার কোপ-কুটিল চক্ষের উপর নিজের স্থির-দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া সম্মিত-মুখে উত্তর করিলেন, “তুমি! আমার! কি করেছ? কি করবে? কিছুই করতে পারো নি।”—তাহার কণ্ঠে মাত্র প্রবল পরিহাস ব্যক্ত হইল।

অদূরে জনতা বর্ধিত হইতে হইতে বিপুলারতন ধারণ করিয়াছিল। পুলিশের লাল-পাগড়ী ও গুর্থার থাকিতে জনতা জম্জমে হইয়া উঠিয়াছে। যে সব দোকান এতক্ষণ হরতালকারীদের অনুনয়ে বন্ধ হয় নাই, সেগুলো লুঠ-তরাজের ভয়ে চটপট বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ছাদ বারান্দাগুলো উৎকণ্ঠিত দর্শকের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিল।

কৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে চাহিতেই মিঃ লাহার দৃষ্টিও সেই সঙ্গে তথাকার জনতা ভেদ করিয়া রহস্তোদ্ধারচেষ্টা করিল; এবং এক নিমেষেই সমস্ত বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ দৃঢ়-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আর তোমার এখানে থাকা চলবে না, বেবি। তুমি শীঘ্র উঠে পড়ো, যে রকম দেখছি, এইবার একটা খুনোখুনি কাণ্ডও হয়ে পড়তে পারে।”

কৃষ্ণা তাহার গভীর আবেগে উদ্বেলিত আতঙ্কিত অন্তরকে প্রাণপণে সংঘত রাখিবার চেষ্টায় নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। সেই কোলাহল-ময় দাঙ্গাস্থলে তাহার অনুসন্ধিৎসু ব্যগ্র-দৃষ্টি যেন আলোকাকৃষ্ট পতঙ্গের মতই উগ্র আগ্রহে বাঁপাইয়া পড়িতেছিল, অন্তবের মধ্যে তাহার চিন্তা যেন রণবাস্তব অবশ্যে উন্নত বুদ্ধাধার মতই উন্মূখ হইয়া সেইখানেই ছুটিয়া যাইতে তাহাকে ছ’হাতে ঠেলিতেছিল ও তাহার বক্ষের মধ্যে এই সবল উত্তেজনার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রায় নিরুদ্ধবাক্যে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “নিরস্ত্র নিরাপরাধীদের উপর গুলী চালাবে! ওদের হাতে যে বন্দুক রয়েছে দেখ চি!”

মিঃ লাহা সেই দিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন, ও তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, “শান্তিরক্ষার দরকার হ’লে চালাবে বই কি!”

“নিরস্ত্র জনতার শান্তি-রক্ষার দরকার এমন কি হ’তে পারে, যাঁতে গুলী চালাতে হয়! উঃ, কি অত্যাচার!”

জনতার মধ্য হইতে সত্য সত্যই একটা বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হইল, ও সঙ্গে-সঙ্গেই জনতা ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণা দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া মার্জিতভাবে চোক বুজিল।—তাহার

সমস্ত অন্তর কাঁপাইয়া সে ধ্বনি যেন বুকের ভিতরে গিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল, চোক চাহিতে গেলে হয় তো বা কোন দৃশ্য তাহার চেথে পড়িবে! ওঃ, হয় তো কোন পরিচিত রক্তাপ্লুত প্রাণশূন্যদেহ,—হয় তো —হয় তো—

মিঃ লাহার নিকণ্ঠম কণ্ঠ তাহার অবসন্ন শরীরে বলাধান করিল।—“ফাকা আওয়াজ! এঃ!—রাগাটিয়া সব পালাচ্ছে! মোটে তিনটে লোককে আরেষ্ট করেছে।”

কৃষ্ণা গভীর শ্বাস-গ্রহণপূর্বক দেখিল, ছেলে তিনটিই তাহার অপরিচিত এবং ইহার মধ্যের একটিও সেই যে জাপানি সিন্ধ ও বালুতি ফেলিয়া দিয়াছিল, সে নয়। দোষীর চেয়ে নির্দোষী বড় সহজেই ধরা পড়িয়া থাকে।

রাগার লোকেদের আবার এই দিকে ফিরিতে দেখিয়া মিঃ লাহা নিজের কাজে মনোযোগী হইলেন। অদূরে বিনয়কে আসিতে দেখিয়া বিশেষ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “আর আমার অপেক্ষায় রেখ না, কিষণ! সকাল ৭টার খবর পাই; তক্ষণি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে চার্জ দিয়ে মোটর একদম ফুলস্পীডে ছুটিয়ে এসেছি। সকালে সেই যা একটু চা’ আর একটু ডিম্‌টিন্ খেয়েছিলুম। এসো, তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে একটুখানি ঠাণ্ডা হয়েই আবার আমার ছুটতে হবে। কাল একটা ‘রায়েট বেস’ আমারও কাছে আছে।”

কৃষ্ণা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া ফুটপাথ হইতে নাস্তায় নামিয়া পরপারে বিনয়ের নিকট যাইতে চেষ্টিত বুঝিয়া তিনি সহসা পক্ষযকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?”

কৃষ্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই স্বর প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, “না।”

“এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে আর কোন ভদ্র-মহিলা যোগ দিতে এসেছেন কি? তুমিই কি এক জন জেয়ান অফ্ আর্ক ফিরে জন্মেছ না কি!”—

নিরন্তর দেখিয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন, “কেন অনর্থক গুলী খেয়ে ম’রে পড়বে, অথবা পু’সের হাতে গ্রেপ্তার হবে। পুলিশের হাতের নিগ্রহ কোন দ্বীলোকের পক্ষে গৌরবের বস্তু নয়, এটাও ভেবে দেখ।”

কৃষ্ণা কোন জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া রাস্তা পার হইয়া ওপারের ফুটপাথে বিনয় প্রভৃতির পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ লাহার মুখ অপমানে কালো হইয়া গেল,

তাহার কপালের শিরা ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল, হুঁচোখ জঁর্বায় জলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপেই সংযত রাখিয়া সোফারকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন, সে গাড়ী লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, নিজে তিনি শীকারীর থাকি পোষাকের পকেট হইতে সিগারকেস্ লইয়া একটা মোটা সিগার ধরাইলেন ও বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য-তাপ মাথায় লইয়া মুখের সঙ্গে মনের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতে দিতে দৃষ্টি ধারা কৃষ্ণাকেই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পকেটে-ভরা বামহস্ত বারবার চঞ্চল হইয়া সেখানে গোপনে রক্ষিত ছোট্ট দোনলা পিস্তলটাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে সম্পূর্ণ উদাত্ত-ভাবাপন্ন কৃষ্ণার পার্শ্ববর্তী বয়সে তরুণ এবং সুন্দর গঠন বিনয়কুমারের বক্ষ লক্ষ্য করিতে লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকিলেও তিনি বাহিরে শাস্ত উদাসভাবেই চুরোট টানিয়া যাইতে থাকিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার শ্রামলাল মল্লিকের নামে গাঙ্গুলী এবং দত্ত এটর্নির আফিস হইতে এক পত্রে জানা গেল, তাহার বসত-বাড়ী জঙ্গীলাল ও মোহনলালেরের ঋণের দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মক্কেল মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জী উহা ক্রয় করিয়াছেন, সপ্তাহমধ্যে উহাতে দখল লওয়া হইবে।

এবার আর ডাক্তার মল্লিকের কাছে ব্যাপারটা লুকান রহিল না, তিনি তাঁর অন্ধকারময় জগতে প্রবল ভূকম্প অনুভব করিয়া কৃষ্ণাকে ডাকাইয়া অতি তীব্র তাপযুক্ত ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, “তোমারই কল্যাণে আজ আমার পথের ভিখারী হ’তে হবে। তোমার শিক্ষার জন্তই যে বিপুল অর্থক্ষয় আমি বৃথা করেছিলুম, শুধু সেইটে জমিয়ে রাখলেই আমার জীবনটা সুখে কেটে যেতে পারতো। তোমার মত সন্তান যদি আমার না জন্মাত!”

চির-আদরিণী কৃষ্ণা পিতার কঠিন বাক্য মনের মধ্যে বেদনা পাইলেও নিঃশব্দে সবই সে সহ করিল। পিতার বাক্য অংশতঃ সত্য হইলেও, তাহার উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়িতার জন্ত তিনিই যে প্রধানতঃ দায়ী, সে সত্য তাহাকে দেখাইয়া দিবার লোক ছিল না, এবং দিলেও কেহ দেখে না।

সৌধারণতঃ অধিকাংশ বিলাত ফেরতের মতই তাহারও যত্র আর তত্র ব্যয় থাকায় আর কমিতেও ব্যয় করে নাই। ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ’—এই নীতির অনুসরণে তিনি ‘ঘৃতের পরিবর্তে’ তদপেক্ষা ব্যয়-সাধ্য ও তদানুযায়িক সকল প্রকার ব্যসনেরই অভ্যাস, সামর্থ্যের একবিন্দু থাকিতেও ত্যাগ করেন নাই, আজও না। পোষাক তাহার প্যারিসের দোকানে তৈয়ারি হইত, কাচিতেও যাইত সেই দেশে। জ্বী-কন্টার পিছনে ফ্রেঞ্চ গবর্নেস্ এবং তাহাদের মেলামেশা, চাল চলন সমস্তই বিলাতী লর্ডদের জ্বী-কন্টারই অনুরূপ। অগ্নম এবং অন্ধত্বের সীমায় পৌঁছিতেই ডাক্তারীর সমস্ত আর একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়া অকুল-পাথারে ফেলিয়া দিল, কিন্তু স্বভাব বদলাইয়া দিতে পারিল না। কথিত আছে, মরিলেও না কি ওটা বদল হয় না।

যাই হোক, ডাঃ মল্লিক তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, তাহার নূতন প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিয়া মিঃ লাহাকে ‘জরুরী’ তার করিলেন এবং পত্রও লেখান হইল। সে দিন কাটিয়া গেল, কোন উত্তরই আসিল না। মল্লিক-সাহেবের অসুস্থ-শরীর এবং উদ্ভিগ্ন-চিত্ত ঘেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তরুণ তবে সত্য সত্যই তাহার আত্মস্বত্ব ও অর্কাটীন মেয়ের দুর্ব্যবহারে কষ্ট হইয়া তাহাকে শুদ্ধ ত্যাগ করিল? মনের সহিত শরীরও তাহার অবসাদের চরমে গিয়া পৌঁছিল।

কৃষ্ণা সে দিনের সকল কাজের মধ্য দিয়াই নিজের ভবিষ্যৎটাকে সম্পৃষ্ট করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। এই বাড়ী—সার্কুলার রোডের এই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদ-ভবন, এ আর তাহার নই! সাত দিনের মধ্যে এ গৃহ জন্মের মতই পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।—শুধু তাই নয়; বৃদ্ধ অন্ধ অসুস্থ পিতার হাত ধরিয়া নিঃস্বলে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। কোথায়?—এ প্রশ্নের উত্তর সে চারিদিক হাতড়াইয়াও খুঁজিয়া পাইল না। মিঃ লাহা যে এতবড় অত্যাচার করিতে পারিবেন, এ সন্দেহ ঘূণাক্ষরেও তাহার চিতে কোনও দিনই উদ্ভিত হয় নাই। তা হইলে সে এত দিন নিজেদের একটা বিলিবাৎসল্য করিয়া কেলিতেও সচেষ্ট হইত। এই বাড়ীখানার দাম—উচিত মূল্যে বেচিতে পারিলে তিন-চারি লাখ টাকাও হইতে পারিত। কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই জুয়াচুরীর আশ্রয় লইয়া তাহাদের অজ্ঞাতে এর অর্ধেক টাকার চেয়েও অল্প খণ্ডে এই বাড়ী

উহারা দখল করিয়া লইয়া তাহাদের একেবারেই আজ অকুল-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। ইহার বলেই সে যে এত দিন নিজের মনে বলসকল করিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ী বেচিয়া ঋণ শোধ দিলেও তাহার অবশিষ্ট অর্থে তাহারা অনায়াসেই ভ্রম গৃহস্থভাবে কালাতিপাত করিতে পারিবে। কিন্তু এখন? মহাজনের নিকট হইতে কোন তাগিদ তাহারা পায় নাই, আদালতের পিয়াদা শমন ধরাইয়া যায় নাই, নীলাম ইত্তাহার জারী করা হয় নাই। একেবারেই এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

এর কি বিচার নাই? বিচার! বড় দুঃখে কৃষ্ণার অধরে তীব্র শ্লেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল। যদি এই অত্যাচারী যথার্থই জঙ্গীলাল মোহনলালরা হইত, তাহা হইলে বিচার পাওয়া যাইত কিনা, তবু সন্দেহহীনও ছিল। কিন্তু তা যখন নয়; জঙ্গীলালদের আড়ালে দাঁড়াইয়া যে ছদ্মবেশী মেঘনাদ তাহাদের উপর গুপ্ত শরসন্ধান করিতেছেন, তখন তাঁহার সে লক্ষ্য যে ব্যর্থ হইবে, এমন আশা বাতুলে ভিন্ন কে করিতে পারে?—বিশেষতঃ বিচারশালায় পণ্যক্রয়ের পক্ষে আজ কৃষ্ণা মল্লিকের অধিকার কেই বা সাব্যস্ত করিতে পারিবে? তত্ত্বিন্ন নে নিজেও সেখানের দ্বারে আশ্রয় লওয়ার অপেক্ষা নিরাশ্রয় হওরাকেও নিরাপদ মনে করিয়া থাকে যে। সে যে ননকো অপারেটর,—কোন মুখে এ অবিচারের বিচার সেখানে সে খুঁজিতে ছুটিবে?

মল্লিক-সাহেব সে দিন বিছানা হইতে উঠিলেন না, কোন মতেই তাঁহাকে সে এতটুকু কিছু আহ্বার করাইতে পারিল না, অবোধ বালকের মতম কাতর হইয়া তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন এবং মেঘের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “তোরা ভাগ্যে নির্ধাত জেলখানার ভাত লেখা আছে, সে আমি আমার এই অন্ধ চোখেও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার মাথা হেঁট করবার আগে কেন তুই ম’রে গেলি না? আমার তুই পথে বার করলি!”

“বাবা!”—বলিয়া আর্তস্বরে ডাকিয়াই কৃষ্ণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এটর্নী আফিস, মেকিঞ্জিলালের আফিস এবং যে জহরীর দোকান হইতে তাহারা জহরত ক্রয় করিত, তাহাদের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া সে যখন রাস্তার পা দিল, তখন তাহার মনে সর্ব-স্বান্তের একটা সর্বনাশা শাস্তি তাহার গভীর

ভারাক্রান্ত হৃদয়কে অত্যন্তই লঘু ও লঘুতর করিয়া ফেলিয়াছে। যে বৈরাগ্যে চৈতন্যদেব, বুদ্ধ প্রভৃতি সুখের আলয় জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের মতই পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বালিকা-চিত্ত যেন সেইরূপই একটা তীব্র রিক্ততা নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিল, যাহার সহিত আরও একটা তেমনি সুবিপুল অনুপম শাস্তিও বিজড়িত।

এটর্নী জানাইলেন, জঙ্গীলালদের দেনাটা স্নেহ-আসলে জড়াইয়া এক লক্ষ সাতাশ হাজার ছয় শত টাকা ক’আলা ক’পাই দাঁড়াইয়াছিল; ইহার জন্ত রীতিমত এটর্নী আফিস হইতে চিঠি দিয়া এবং আদালত হইতে সমন প্রভৃতি ধরাইয়া আইনমত কার্য করা হইয়াছে। প্রমাণ—তা যদি ‘ম্যাডাম’ অনুগ্রহ পূর্বক খবর লয়েন, অথবা তাঁহাকেই সে ভার দেন, যথার্থ জানিতে পারিবেন। নীলাম-ইত্তাহার জারী করার পরেও তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট দেখিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিতই তাঁহাদিগকে যথাকর্তব্য করিতে হইয়াছে। অল্প খরিদার না থাকায় তাঁহারই এক মক্কেল উহা ঐ এক লক্ষ সাতাশ হাজার ছয় শত কত আনা কত পাইয়েই কিনিয়া লন। এক্ষণে তাঁহাদের অত্যন্ত বিনীত অনুরোধ যে, পূর্ব-নির্দ্ধারিত তারিখমধ্যে বাটীর নূতন অধিকারীকে দখল লইতে দেওয়া হয়।

এক লাখ সাড়ে সাতাশ হাজার টাকা? যে বাড়ীর চার লক্ষ টাকা দর হওয়া অনভিজ্ঞেও স্বীকার করিবে, তাহা জলের দামেই চলিয়া গেল! এত বড় অস্ত্রায়ের প্রতিরোধ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে তাহার শরীর-মনের প্রতি অণুটি পর্য্যন্তই যেন তারস্বরে অস্বাকার করিয়া উঠিল। অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য লোকেরা যে ভাবে ইহাদের হাতে নিপীড়িত হয়, সেই অত্যাচার এই সহরের বুকে বসিয়া তাহাদের মতন লোকেরাও যদি স্বীকার করিয়া লয়, তবে তো ইহাদের স্পর্ধার সীমাই থাকে না! কিন্তু ফল কিছু হইবে কি? এ সংসারে আজ কাল ‘যতো ধন্যন্ততো জয়ঃ’ এ বাক্যের সার্থকতা ঘুচিয়া ‘যতো অর্থ স্ততো জয়ঃ’ই ঘটিতে দেখি। তাহার সে বস্তুটাতেই যে টান পড়িয়াছে। তত্ত্বিন্ন—মাথায় তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ো পড়ো হইল।—মিঃ লাহার পঁচিশ হাজার টাকা দেনার মোটে সেই দশটি হাজার শোধ হইয়াছে, এখনও পনের হাজার টাকা শোধ দিতে বাকি। সে টাকাও এই বাড়ীর ভিতরে শোধ হইল না!—উঃ! এত বড় সমস্যানী—মানুষের সঙ্গে মানুষেও করে।

আদালতে—কার আদালতে সে যাইবে? যেখানে এক জন গণ্যমান্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে (কারণ, জঙ্গীলাল, মোহনলাল বলিয়া কেহ বাস্তবিকই আছে কি না—তাহাও সন্দেহ স্থল) একটা নগণ্য নিঃস্ব জীলোকের বিরোধ; সেখানে তার মীমাংসা হইবে সাধারণ বিচারশালায়? আর বহু উর্দ্ধে উঠিবার পক্ষে সে যে এখন একান্তই অশক্ত!

জহরতের দোকানের যিনি ম্যানেজার, তিনি কৃষ্ণার মায়ের আমলের পুরাতন লোক, কৃষ্ণাকে গহনা বেচিতে উদ্বৃত্ত দেখিয়া অবাধ্যুখে চাহিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, “এ কি বেবি-দিদি! ও সব জিনিস তুমি বেচে ফেলতে চাও? এর এক একটা ডিজাইন, আমার কত মাথা খাটিয়ে বার করিতে হইছে জানো? এমন সব ভাল জিনিস কি আর আজকের বাজারে তুমি পাবে?”

কৃষ্ণা স্থিরকণ্ঠে কহিল,—আমি তো আর এ সব পরি না,—তুমি কোন্টার কি দাম দেবে—তাই বলো।”

বিস্তর বাদামুবাদের পর গহনা বিক্রয় হইল। মুক্তা ব্যতীত জহরতের দাম পুরাতনে অত্যন্তই কমিয়া যায়। ভগবানুপ্রসাদ যতটা সম্ভব উচিত মূল্যই দিল। একগাছি একনরী অম্লান সুগোল অথচ অনতিবৃহৎ মুক্তাহার কৃষ্ণার গলায় পরান ছিল, সেইটি খুলিয়া হাতে দিতেই সে অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া উহা তাহার পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিল, —“বেবি-মল্লিক! তুমি কি তোমার ঠাকুরদাদার বইসি বুড়োর সঙ্গে আজ তামাসা করিতে এসেছ! যাও যাও—তোমার গলা থেকে খোলা ও মালা আমি হাতে ক’রে ছুঁতে পারবো না। নাও, শিগ্গির কুড়িয়ে নাও বল্টি!”

কৃষ্ণার ডাগর চোকে দুইটি বড় বড় মুক্তার মতই অশ্রুবিন্দু তাহার প্রবাল-রক্ত অধরের একটি ফোঁটা হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের হৃকুম তামিল করিয়া পুনশ্চ মিনতির সুরে সে কহিল, “আচ্ছা, দাদা-ভাই! এর দামটা কত হ’তে পারে, সেটা তো বলো দাও। না নাও, না নেবে।”

বুড়া গুম্ হইয়া জবাব দিল, “ভারি চালাক মেয়ে! দাম জেনে তুমি অল্প জায়গায় বেচে এস আর কি! দেখ দিদি! ও দিলোনি মুক্তো। ওর দাম মোটে বেশী নয়, ওটা তুই ভাই কিছু-তেই বেচিস্ মি। ই্যা, জিনিস বটে, সেই সে দিন যেটা লাহা-লাহেব কিনে নিয়ে গেছেন।”

বৃদ্ধের মিথ্যা-বিজড়িত এই সম্বন্ধে স্তোকবাক্যে মনে মনে সঙ্কতজ্ঞ হাসি হাসিয়া সে মুক্তামালাটি কুড়াইয়া লইয়া ফিরিতেছিল, পিছন হইতে ম্যানেজার বড়ই কুণ্ঠিত-ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে ফিরিয়া ডাকিল।

“ডাক্তার-সাহেবকে মনে ক’রে দিও তো—বেবি-দিদি! তাঁর সেই হীরের নেকলেসটার দরুন যে টাকাটা ক’বচ্ছর থেকে দোকানের পাওনা আছে, সেইটে যদি সুবিধা ক’রে দিতে পারেন, তা হ’লে—”

সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া কৃষ্ণা বলিয়া ফেলিল, “বাবা! কিনেছিলেন! হীরের নেকলেস! কই, না।”

বুঝা অত্যধিক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া তাহাদের হিসাব বই বাহির করিল, ও হিসাব এবং রসিদ বই হইতে মিঃ মল্লিকের হাতের সই দেখাইল। দুই বৎসরকার পূর্ব্বের ঘটনা। তখন মিঃ মল্লিক চোখে অল্পস্বল্প দেখিতে পাইতেন। দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া সে সাড়ে তিন হাজার নেকলেসের ও পুরাতন হিসাবের কয়েক শত টাকা শোধ করিয়া চলিয়া আসিল।

একখানা থার্ড ক্লাস ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে নিজের পরিশ্রান্ত দেহ-মনকে এলাইয়া দিতেই একটা অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিতে তাহার সেই শ্রান্ত শরীর-মন যেন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সে নিঃস্ব! এই বিপুল বিশ্বের বিরাট কারবারে সে এই জীবন-প্রভাতেই দেউলিয়া হইয়া পড়িয়া বিদায় লইল।—এইবার তার নব জীবন-প্রভাত! অমনই বিপরীত দিক্ হইতে তাহার এই আশা-সুখ্যাকে আড়াল করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাপের মুখ! কি অসহায়, কি দুর্ব্বল, কি অসহিষ্ণুতার চঞ্চল সেই বিশীর্ণ বিবর্ণ মুখ! কৃষ্ণার বৈরাগ্যের শান্তিতে ভরা চিত্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা গভীর অশান্তির আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিল। কোথায় মুক্তি? কেমন করিয়া সে মুক্তি পাইবে? অন্ধ এবং আতুর পিতা যে তাহার এই অনাবিল, আত্ম-প্রতিষ্ঠ শান্তিময় জীবনকে নিজের ক্ষোভ-জর্জরিত অন্তরের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আতপ্ত ক্রুদ্ধিতে ছাড়িবেন না, সে কথা দিনের আলোকে মতই যে সত্য—সত্য—সত্য!—পনের হাজার টাকা দেনা এখনও তাহার বৃদ্ধের উপর পাথর হইয়া বুলিয়া আছে, বাজার-দেনা এখনও যে তাহাকে কত দিক্ দিয়াই বেড়িয়া ধরিয়া আছে—তাহার হিসাব করাই এক ভয়াবহ কাণ্ড! সে কেমন করিয়া

মনে করিতে যাইতেছে যে, সে মুক্ত? এই সুবি-
পুল ঋণজাল হইতে ছাড়ান পাইয়া মুক্তি তাহার
অন্ত কে জানে যে কত-কত দূরেই বসিয়া আছে!
সে কি তবে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়া আজই
রাতারাতি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে পলাইয়া যাইবে?
এই চিন্তাতেও তাহার সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।
যাহারা বিশ্বস্ত-মনে এত দিন পর্যন্ত ভদ্রলোক-বোধেই
তাহাদের কাছে পাওনা টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছে,
তাহাদের সেই সরল বিশ্বস্ততার কঠিন আঘাত দিয়া
চোরের মত লুকাইয়া ফিরিবে?—এ কাজ করিলে
যে শাস্তির এক কণামাত্র এত অশাস্তির মধ্যেও
সে উপভোগ করিতে পাইয়াছিল, এ জীবনে আর
কি কখন ইহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ
ঘটিতে পারাও সম্ভব?

তুফানে পড়া টলমলে মনের মধ্যে একটা নূতন
কথা একবার মাত্র উকি দিল। বিনয়বাবু তো শুনেছি
বড়লোকের ছেলে, তাঁর কাছে কিছু ধার নিলে
হয় না? কিন্তু সেট একটি ক্ষণের আশার প্রদীপ
পরক্ষণেই আত্ম-তিরস্কারের দম্কা হাওয়ার অন্ধ-
কারে ডুবাইয়া দিয়া কঠিন হইয়া গিয়া সে মনে
মনে বলিল, “না, আমার এ জাগতিক সুখ-দুঃখের
মধ্যে তাঁকে আমি কোন কিছুই জন্তে টানবো
না, তাঁতে আমার ভাগ্যে যত কিছুই ঘটতে পারে
যটুকু। তিনি শুধু আমার পথপ্রদর্শক, আমার
গুরু, আমার কর্ম-জগতের বন্ধু,—কিন্তু ব্যবহারিক-
জগতে তিনি আমার এতটুকুও কেউ নন।”

‘রোখো’ ‘রোখো’ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত
গাড়ীখানা হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং লাফাইয়া পাদানে
উঠিয়া পড়িয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, “কোথায়
চলেছেন?”

কৃষ্ণা চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাসি-মুখের
দিকে চকিত কটাক্ষ করিয়া নতমুখে কহিল,
“বাড়ী।”

“চলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিবে আসি।”
—বলিয়াই সম্মতির অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া সে
গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল এবং কোচম্যানের
উদ্দেশ্যে হাঁকিয়া বলিল, “চলো।”

এই যে অতর্কিত কাণ্ডটা ঘটয়া গেল, বিনয়
তো দিব্য নিশ্চিন্ত হাসিমুখে সামনের আসনে ধুপসু
করিয়া বসিয়া পড়িয়া, কোথায়-কিরূপ কাজ-কর্ম
হইতেছে, পুলিশ সার্জেন্ট কোন্ নিরুপদ্রব খন্দর-
ধারীকে মাত্র তাহার পোষাকের দৌলতে কিরূপ
অত্যাধীন করিয়াছিল, তাহারই গল্প জুড়িয়া দিল,

কিন্তু কৃষ্ণা নিজেকে যেন কোন মতেই আর সহ্য
করিয়া লইতে পারিতেছিল না। বুকের মধ্যে
হৃৎপিণ্ডটা তাহার বিপুল বেগে নড়িত হইতেছিল,
ও সমস্ত মন ভরিয়া সঙ্কোচ, ভয়, লজ্জা ও বুঝি
তাহাদেরই অন্তরালে এক ফোঁটা অতি তীব্র সুখও
উকি মারিতেছিল।

আপনার মনে অনর্গল বকিয়া যাওয়ার শেষে
যখনই হুঁস হইল, বিনয় বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণার নিক-
স্তর ও নিরুদম মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, “আপ-
নার কি হয়েছে বলুন তো? মুখ অত শুকনো
কেন? খান্নি বুঝি কিছু? না অসুখ করেছে?”

কৃষ্ণা বিপুলবলে উথলিত অশ্রু দমন করিয়া
রাখিয়া ঈষৎ হাসিতে গেল, “কিছুই তো হয় নি!”

বিনয় অবিশ্বাসের সহিত প্রবলবেগে মাথা
নাড়িল, “হয় নি বই কি! আপনার অত সুন্দর
মুখ, আজ কি রকম বিস্তীর্ণ দেখাচ্ছে! হাসলে যে
আপনাকে কত মানায়, আজ যেন সে-ও অত রকম
দেখাল। সত্যি, বলুনই না? আমি যদি কিছু
করতে পারি।”

প্রচণ্ড প্রলোভনকে প্রাণপণে দূরে ঠেলিয়া দিয়া
কৃষ্ণা শুধু মাথা নাড়িল,—“কিছু না।”

বিনয়কে কিছু হুঃখিত দেখাইল, সে ঋণকাল
গভীর-মুখে থাকিয়া তার পর হঠাৎ চট করিয়া বলিয়া
উঠিল,—“ও, বুঝেছি! মিঃ লাহার সঙ্গে বুঝি
ঝগড়া করেছেন, না? তা অমন হয়ে থাকে, ওর
জন্তে ছনিয়ার উপর চটলে চলবে কেন? দেখুন,
একটা কথা আমি যখন তখন ভাবি।”

কৃষ্ণা সে ‘কথা’ শুনিবার জন্ত কোনই আগ্রহ-
প্রকাশ না করিয়া যেন তেমনই স্থির হইয়া রহিল।

“আচ্ছা, মিঃ লাহার সঙ্গে আপনার বন্ধু কি
ক’রে; আমি তো সেই কথাই ভেবে হিসেব
পাই নি। উনি তো স্বদেশীর স’টি পর্যন্ত সহ্য করতে
পারেন না, ওঁর কোন পুরণ আমলা না কি খন্দর প’রে
আমার জন্তে সে দিন বরখাস্ত হয়েছে, আর আপনি
তো এই—”

আচম্বিতে মুখ তুলিয়া স্থির-কণ্ঠে কৃষ্ণা বাধা দিল,
“তাই জন্তেই তো আমাকেও ‘বরখাস্ত’ না করবার
সুযোগ দিয়ে তাঁহাকে মুক্তি দিয়েছি।”

“তা হ’লে তাঁকে আপনি বিয়ে করছেন না?”
বিনয়ের কণ্ঠে বিস্ময় যেন ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

“না।”

কচি-ছেলের মতন করতালি দিয়া আনন্দ-ধ্বনি
করিয়া উঠিয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, “আঃ, বেশ হবে,

—বেশ হবে! এটা আমার এত বিক্রী লাগছিল যে, সে কি বলবো আপনাকে! আপনার মত ত্যাগী, মহিষ্ঠরীয়া মহিলার—যাই বলুন তিনি উপযুক্ত নন। তা হ'লে এইবারে আপনাকে আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনার ক'রে পাব, কেমন না?”

কৃষ্ণার হৃৎস্তম্ভীর সব কয়টা তার সজোরে বাঁধা এস্রাজের সব কয়টা তারের মতই একসঙ্গে ঝামঝাম করিয়া বাজিয়া উঠিল এবং তার পরই বেন তাহা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে গেল।

ততক্ষণে বাড়ী পৌছিয়া গাড়ী থামিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়াই পিতার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে সর্বপ্রথম চাক্ষুষ হইল। জানিতে পারা গেল, মল্লিক-সাহেব এ পর্যন্ত জলম্পর্শও করেন নাই এবং ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িয়া কেবলই তাহাকে খুঁজিয়াছেন।

অপরাধ-সঙ্কচিত পায়ের মুহূর্তও অন্ধের কাছে অজ্ঞাত রহিল না। অধীর আবেগে উঠিয়া বসিয়া প্রত্যাশাপূর্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হলো, বেবি! তরুণের কাছ থেকে কোন তার-টার এলো? তুমি চিঠি লিখলে? আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রেই লিখলে না কেন?”

কৃষ্ণা যত্নস্বরে কহিল, “আমি এটর্নির ওখানে গিয়েছিলুম।”

ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মত আবার হতভম্বভাবে শয্যা লইয়া তিনি ক্ষুদ্রকণ্ঠে কহিলেন, “তাতে কি লাভ হবে? তারা কি তোমার বাড়ী ফিরিয়ে দেবার জন্তে এ সব জোচ্চুরির খেলা খেলেছে! এক যে পারে—তারই জন্ত চেষ্টা করো বেবি! তাকেই ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণে চেষ্টা করো, সে ভিন্ন তোমার আর দ্বিতীয় গতি নেই।”

কৃষ্ণা আজ মিঃ লাহার উপর যথার্থই রাগিয়াছিল। যে মানুষ নিজের স্বার্থের দিকটাকে—স্বার্থের দিকটাকে অতবড় প্রচণ্ড প্রশ্রয় দিয়াও সেটাকে লাভ করিতে চাহে, তার সেই হীন স্বার্থপরতার লজ্জা হওয়ার চাইতে গলায় দড়ি দেওয়াও তার কাছে বেন গৌরবের বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছিল। পিতার অস্থায়ী আদেশ ও উপদেশকে আজ সে তাই সম্মাত্র করিতে না পারিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, “বাবা! আপনি কি বুঝতে

পারছেন না, কে আজ জলীলালদের ছদ্ম নামে আপনাকে সর্বস্বান্ত হওয়ালে? যে লোক এত বড় অস্থায়ী করতে পারলে, এখনও তারই হাতে আপনি আমার দিতে চাইছেন?”

ডাক্তার মল্লিক অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিলেন, —“সে এ সব জানে না,—সে এ সব করে নি, সে আমার তেমন ছেলেই নয়।—কিন্তু যদি ক'রেই থাকে, তা হ'লে তুমিই তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেচ। তোমার ভালবেসে—তোমার পেতে চেয়েই সে আজ অপরাধী—”

“বাবা! আপনাকে আমি কেমন ক'রে—বোঝাব? একে আপনি ভালবাসা বলেন? এত জুলুম কি কেউ তা হ'লে করতে পারে?”

ডাক্তার অধীর হইয়া কহিলেন, “পারে বেবি! পারে। সবাইকার স্বভাব একরকম হয় না। আমি কি তোমার মা'কে ভালবাসি নি? আজও যে তাঁকে আমি প্রায় প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। কিন্তু সঙ্গে ও স্বভাবে প'ড়ে কত বড় বড় দুঃখ তাঁর মনেও কি দিয়ে ফেলি নি? তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততাও কই ঠিক রাখতে পেরেচি? তা ব'লে কি বলছি! তাঁকে ভালবাসা আমার কারুর চাইতে কম ছিল? —না বেবি! তরুণ তোকে ভালই বাসে।—ভাল-বাসে ব'লেই পাগল হয়ে গিয়ে যদি ক'রে থাকে তো কি করচে না জেনেই করেচে। তাকে ডাক, তাকে ফিরিয়ে আন, তাকে ভালবেসে কাছে টেনে নে! আমার শেষ দিন ক'টা আর লজ্জার মধ্যে, অপমানের মধ্যে টেনে নিয়ে যাসুনে! আমি সে সহিতে পারবো না,—আমি সে সহিতে পারবো না, —উঃ আমি! কি থেকে কি হলুম!—কি থেকে কি হলুম!”

মিঃ মল্লিক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ পুনঃ চমকিয়া চমকিয়া উঠিলেন।—খবরের কাগজে হয় তো আমার সম্বন্ধে একটি প্যারা এডিটোরিয়াল বেরবে। ওরা তার হেড্ লাইনে লিখবে—“এ রিচম্যান রুইন্ড্” তার পর মায় গবর্ণমেন্ট হাউস থেকে, ক্যালকাটা ক্লাব থেকে যাই না যাই, যেখানের যত বড় বড় নেমতর আসতো সব বন্ধ,—বাগ্‌চী, নিমোগী, হালদার, এমারসন, রিচমন্ড, কালাইল কেউ-ই আর আমার বাড়ী ভুলেও মাড়াবে না। মিসেস্ হালদার এক দিন আসেন তো শুধু তোমার আহাম্মুকীর জন্তে ছ'কথা শুনাতে,—আর কেউ না, বেবি! আমাদের কাছে আর কেউ আসবে না! উঃ! আমি সে সব সহিবো কেমন ক'রে?

একে এই চোক গিয়েই তো সব গেছে, তার উপর
বেবি! বেবি! তুই আমার কি করলি বেবি?
কি করলি, কি করলি!”

“ভিতরে যেতে পারি?”—জিজ্ঞাসা করিয়া
প্রাইভেট সেক্রেটারী গৃহে প্রবেশ করিল, হাতে
খোলা টেলিগ্রাফ।

“এই তারটা যশোর থেকে এসেছে।”—

“পড়ো,—পড়ো,—পড়ো।”—

“ভেরি বিজি, কান্ট গো নাউ” (বড় ব্যস্ত
আছি, এক্ষণে যাইতে অক্ষম)।—

“অ্যা! এই কথা সে লিখলে! আমি তাকে
কাতর হয়ে মিনতি ক’রে ক’রে তিনখানা তার
করলুম, তার এই জবাব এলো! তবে আর সে
আসবে না, তবে আর সে আমার দিকে চাইবে
না, তবে আর সে,—তবে আর সে,—তবে আর
সে—ডাক্তার মল্লিক হাঁপাইতে লাগিলেন।”

“বাবা! বাবা! ছির হবার চেষ্টা করুন,—
এইটুকু খেয়ে ফেলুন।”

হাত দিয়া মেয়ের হাত শুদ্ধ স্যাম্পেন-গ্লাসটা
সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অস্বাভাবিক উচ্চ-কণ্ঠে
ডাক্তার পাগলের মতই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,
“বেবি! বেবি! যদি তুই আমার বেঁচে থাকা
চাস,—যদি আমার প’রে তোর কোন কৃতজ্ঞতা থাকে,
—এই মুহূর্তে যশোর চ’লে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে ক’রে
আমার কাছে নিয়ে আর। না হ’লে এ জনৈক তোর
সঙ্গে আমার এই পর্যন্ত হয়ে গেল। তুই আমার মেয়ে
নোস্, তুই আমার শত্রু—মহাশত্রু! আমি তোকে
অভিসম্পাত করবো। তুই কখন সুখী হবিনে।”

স্যাম্পেন-গ্লাসটা কক্ষার হাত হইতে মাটিতে
পড়িয়া চূর্ণিত হইয়া গেল। পায়ের তলার টল্টলে
মাটি তাহার ভারও যেন আর বেশীকণ বহন করিয়া
রাখিতে পারিতেছিল না।

* * * *

বিনয় সে দিন যখন নিজের বাসায় ফিরিল,
পাখীর মত লঘু আনন্দে মনের মধ্যে নাচিতে
নাচিতেই সে যেন পথটা অতিক্রম করিয়া গেল।
সিঁড়ি দিয়া উঠার কালেই গুণ্ডুনিয়া সে একটা
পুরাতন গান মনের স্মৃতিতেই গাহিতে গাহিতে উঠিল।

“ওহে সুন্দর! মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।
আমি রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।”—

তার পর সঙ্কীর্ণ খোলা বারান্দার রজনীগন্ধার
টবের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া

পড়িয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়া
দিল—

“তুমি এসো, তুমি এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ!—

মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণহাস্ত-ভাতি।”

তার পর গাহিতে গাহিতে তাহার সমুদয় প্রাণ
মন যেন নিজের গীত-সুধারসে মাতিয়া মাতাল
হইয়া উঠিল। সেই পরমোৎসব রাত্রির সমুদায়
উৎসব এবং সকলটুকু আমোদই যেন তাহার অন্তর-
গহনের কন্দরে কন্দরে অটুট ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দের
রাগিনীতে মূর্ত হইয়া দেখা দিল! যেন এই ধূম-ধূলি
এবং কোলাহল-মুখর কলিকাতা মহানগরীর সমস্ত
দৈত্য এবং কদর্যতা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া এই তরুণ
চিত্তের আনন্দ মাত্র তাহার সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া
পড়িল। যেন ইহার রাজপথে ট্রাম-মোটরে, ঘোড়ার
পায়ে, কারখানার হাতুড়ি পেটার, মাল্লবের কল কল
শব্দে শুধু আনন্দেরই অনাহত ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে,
এমনি সে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং তাহার
সেই আনন্দ-রসে পরিতৃপ্ত কণ্ঠ স্বরের পর স্বর চড়া-
ইয়া গাহিয়া চলিল—

“তব কণ্ঠে দিব মালা—

দিব চরণে ফুল-ডালা;—

আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি

এনেছি বৃত্তি, জঁতি।”

তার পর হঠাৎ এতটা সময় তাহার মনে পড়িয়া
গেল যে, এত আনন্দের আজ তাহার মনের মধ্যে
আমদানী হইয়া গেল কোথা হইতে? সেই মূল
ভৃত্যসকলানে নিরত হইতেই সহসা নিরতিশয় বিস্ময়ে
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সেই আনন্দোৎসবের গোপন
রহস্য ফাঁক হইয়া গেল এবং যা দেখিল, তাহাতে
সে একেবারেই স্তম্ভিত হইল। যাহাকে উপলক্ষ
করিয়া তাহার জীবন-গৃহে পরমোৎসবের রাত্রি
আজ আনন্দমূর্তিতে দেখা দিয়াছে, সে এক জন
সুন্দরী তরুণী। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই তাহার
পুলকাকিত দেহে-মনে ব্যথার বজ্র সবলে হানিয়া
সত্যের বিজুলী অসহনীয় আলোক-ধাঁধায় তাহার
চোখের পর্দা টানিয়া তুলিয়া ধরিল,—কিন্তু,
তাহাকে—যার আগমনের আনন্দে বিশ্ব আজ অবা-
চিত আনন্দের অগ্নসত্ত্ব খুলিয়া দিয়াছেন, সেই
তাহাকে কণ্ঠে মালা পরাইয়া তাহার জীবন-সার্থী
করিয়া লইবার কোনই উপায় নাই!

দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দের জ্যোৎস্না
যেন নিরানন্দের অন্ধকারে ঢলিয়া পড়িল। তার

উপরে যখন প্রথম অভিব্যক্তির প্রবল ধাক্কাটা কাটিয়া আসিল, তখন জানা গেল যে, বস্তার জল আসিয়া তাহার ঘরের সঞ্চয়টুকুকেও টানিয়া লইয়াছে, সুখ-সাগরের জোয়ারের টানে গা ভাসাইয়া সহসা যেন তাহাকে অশ্রু-সাগরের কূলে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল। যে জিনিসটার অস্তিত্ব আজ এই চক্ৰবৰ্ত্ত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার কাছে এক রকম অজ্ঞাতই ছিল, আজ সেইটেই সে নিজের অন্তরেরই অভ্যন্তরে বড় বেশী প্রবলভাবে অনুভব করিয়া ফেলিয়া অত্যন্তই ভয় পাইয়া গেল। সত্যই কি অষ্টার স্বজন-গৌরব-স্বরূপা স্বরূপা কৃষ্ণাকে সে ভালবাসে! শুধু ভালবাসিলেই কিছু দোষ ছিল না, তা নয়, তার সম্বন্ধে তাহার মনে যেন একটা প্রবল স্পৃহা, একটা তীব্র কামনা তলায় তলায় যেন লুকান ছিল, সহসাই আজ সেটা এতটুকু স্রবোগকে হাতে পাইতেই দেখা দিল কি? তা কৃষ্ণা এখন তো আর মিঃ লাহার বাগদত্তা নয়, তাহার কথা একটুখানি ভাবিলেই বা আজ দোষ কি? কিন্তু দোষ নাই, এই ভাবনাটাই কি সত্য? দোষ কি যথার্থই নাই? জীবনে সর্বপ্রথম দিন আজ যুবক বিনয়ের স্তম্ভ যৌবন আগিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরকে যখন বিপুল ঝঙ্কারে সাড়া দিল, তখনই তাহার মধ্যে আরও একখানা ঘুমন্ত মুখকেও সে তার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিল না।—সে উন্মীলা। বিনয়ের আজ প্রথম মনে পড়িল, সেই উন্মীলা তাহার স্ত্রী। এ কথা আবিষ্কার করিতে গিয়া বুক আজ ভাঙিতে চাহিল, তথাপি আজকের দিনে এই সত্যকে ছেঁল-মানুষী করিয়া উড়াইয়া দেওয়া আর কোন মতেই চলিতে পারে না। অস্তুতঃ নিজের মনকেও আজ তাহার এ খবর পাইতে দিতে হইবে। উন্মীলা তাহার স্ত্রী, তাহার যৌবন সহচরী তাহার বাল্যসখীর অনধিকৃত সিংহাসনে কোন মতেই নিজের গৌরবাসন বিস্থত করিতে সমর্থী নহেন। যেহেতু, কেহ দিক্, না দিক্, সে আসন উন্মীলারই। কারণ, সে-ই তাহার স্ত্রী।

কিশোর—তাহার বন্ধু আসিয়া জু কুণ্ডিত করিয়া বলিল, “অর্থ এবং পরমার্থ একসঙ্গে ছুইয়ের সাধনায় কোমর বেঁধে লেগে গেছ যে দেখছি! রাজিটা কিন্তু বেশ ‘উৎসব-নিশায়’ পরিণত হ’তে দেওয়া কর্তাদের ইচ্ছা নয়। আজকের বোধে মেলেই বেরিয়ে পড়ে ‘পরেণনাথ’ যাবার জুকুম হয়েছে। সেখানে না কি জৈন-সমাগম হবে বিস্তর। ছ একটা মোটা মহাজনকেও যদি টলাতে পারা যায়, মন্দ হয় না।”

চট করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিনয় সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, “আমি প্রস্তুতই রয়েছি।”

এমনি করিয়া কোনওখানে নিজেকে জোড়া করিয়া দিতে, দূরে ঠেলিয়া দিতে তাহারও নবজাগ্রত ভয়ঙ্কর অন্তর ব্যাকুল উদ্বেগে ঠিক এই একই সময় পথ খুঁজিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাকতুরাটা মোটা গলায় ‘কঁয়াক কঁয়াক’ করিয়া কেবলই ডাকাডাকি করিতেছিল; ‘ব-উ-মা!—অ-ব-উ-মা! উন্মীলা খন্ খন্ করিয়া আসিয়া তাহার শিকলীটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নাড়া দিয়া ভেংচাইয়া উঠিল—“ব-উ-মা! অ-ব-উ-মা! আহা! আমার কতকালের গিন্নী রে!”

ময়নাটা শিষ্ট ছেলের মত আপনা হইতেই “কালী কল্লতরু, শিবো জগৎ গুরু,”—বলিতে আরম্ভ করিয়া পালিকা-মাতার আদরটুকু বেশ করিয়া আদায় করিয়া লইল।

পক্ষিসমাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিলেও উন্মীলার মনের মধ্যে সে দিন কিছুমাত্রই যেন সুখ ছিল না। শুধু আজই কেন, যত দিন যাইতেছে, মনের ভিতর তার একটা দারুণ অশান্তি যেন বাসা বাঁধিয়া বেশ জমিয়া বসিতেছিল। বিনয়ের কলিকাতা-গমনাবধিই তাহার মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে, এখন অশান্তিটা ষোল আনা মনের উপরই পাকা বনিয়াদ তুলিয়া বসিল। যে বয়সে বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়েরা ছেলের মা ও ঘরের গৃহিণী পর্য্যন্ত হইয়া বসেন, ততখানি বয়স পর্য্যন্ত অনবরত পুতুল খেলিয়া খেলিয়া পুতুলখেলার উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উন্মীলা সেগুলোকে পাড়ায় বিলাইয়া দিয়াছে। সখ করিয়া একটা বিড়ালছানা এবং কয়েকটা লাল মাছ পুষিল। বিড়াল মাছ কয়টাকে খাইয়া ফেলিল। তখন বিড়ালকে সে মাঝিয়া তাড়াইয়া দিল। এক গাদা পাখী মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া সে ষোণ্ড করিয়াছে বটে, তবে সেগুলোকে লইয়া তার এক মহা জালা ষটিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মনে করে—অনুমনস্ক এক দিন এদের খাঁচার দোর খোলা থাকে, আর এরা উড়িয়া যায় তো বেশ হয়! শাওড়ী, বউএর হাসিখুসী দেখিতে পান না, মুখখানা ভারি করিয়া সে এখানে ওখানে বসিয়া শুইয়া বেড়ায়, অনুখের ডরে তিনি মধ্যে মধ্যে গিন্নী

তাহার কপালের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখেন
ও বধুর কাছে ভৎসিতা হন।

বিনয় এবার ফিরিয়া গিয়া অবধি সবগুণ
ছ'খানা পত্র বাড়িতে লিখিয়াছে। একখানা
গোমস্তাকে বিষয়-সংক্রান্ত; আর একখানা
উর্শ্বীলাকে যেমন সাধারণতঃ সে লিখিয়া থাকে,
কোন কাজের কথাই নয়।

আজ এতদিন পরে আর একখানা চিঠি সে
পাইল। সেখানায় পূর্বের মত—“ও রে বাদরি!”
এই সভ্য সম্বোধনটি নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাব
ভাষা সকলই যেন অল্প রকম এবং তাই ক্ষুণ্ণ
উর্শ্বীলার কাছে উহা কিছু রহস্যময়। তাহা
এই;—

উর্শ্বীলা!

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, অবসর ছিল
না এবং ইচ্ছা ছিল শীঘ্র একবার তোমাদের কাছে
যাইব, কিন্তু ফলে তাহা ঘটিল না। বিশেষ জটিল
কার্যোপলক্ষে ‘পরেশনাথ’ পাহাড়ে যাইতেছি এবং
ইচ্ছা আছে, তার পর কিছুদিন পর্যন্ত পশ্চিম
প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, এখন শীঘ্র যে কলিকাতায়
ফিরিব, তাহার সঙ্কল্প মনের মধ্যে তো নাই, পরে
কি দাঁড়ায়।

উর্শ্বীলা! আজ একটা কথা তোমার বলি
বলি মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই ভরসা করিতে
পারিতেছি না। মন বলিতেছে, আমার সব কথাই
অকপটে তোমার কাছে জানান উচিত। আমার
জীবনের কোন রহস্য, কোন সঙ্কট, কোন কিছুই
তোমার অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে; এবং তাহাতে
মনও আমার নিরতিশয় পীড়িত হইতেছে। কিন্তু
উর্শ্বীলা! তুমি এখন ছেলেমানুষ, তোমার আমি
বেটুকু জানি, তাহাতে আমার আজিকার এই
সংশয়হীন অন্ধকার চিন্তের হর্ভাবনার অংশ তুমি
বহন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমার ভরসা
হয় না। তাই এখন আমার এই গোপন কথা
আমার মনের নিভৃত গহনেই লুকানো থাক।
যদি কখনও জীবনের এই জটিলতার হাত হইতে
নিজেকে মুক্ত করিতে পারি; যদি কখনও গুরু
অপরাধের বোঝা নামাইয়া স্বদয় লঘু হয়, তবেই
তোমার কাছে গিয়া সেই দিন সকল কথাই তোমায়
জানাইব। আর যদি তা নাই হয়, যদি না পারি,
যদি পিচ্ছিল পথে পদস্থলিত হইতে থাকে, তবে
যে স্রোতে ভাসিয়াছি, শুধু তাইতেই ভাসিয়া যাইব,
আর পিছনে ফিরিয়া চাহিব না। এ সব কি

লিখিতেছি? জানি না, তোমার মত বালিকাকে
এ সব জানানয় সার্থকতা কি? জানি না।
শুধু যা মনে আসিল লিখিলাম।—একটা কঠিন
কার্যের মহাভার মাথায় লইয়া বাহির হইলাম,
দেখি, কতদূর কি হয়। হয় মরিব, নয় মরিব। এর
আর তৃতীয় পন্থা নাই।

বিনয়কুমার।—

উর্শ্বীলার মনে এ পত্র ক্রমাগতই হেঁয়ালির
জাল বুনিয়া দিয়াছে। এ রকম সমস্তায় সে তার
সারা জীবনেও কখন পড়ে নাই। পাখীর খেলা
ভাল লাগিল না, চিঠিখানা হাতে করিয়া সে একটা
কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল ও আর একবার ইহার
মধ্যগত গভীর রহস্যোদ্ভারে মনোনিবেশ করিয়া
দিল।

দালানে জুতো-পায়ের শব্দ হইতেই উর্শ্বীলার
বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই কিন্তু জুতার
ও চলনের পার্থক্যে তাহার অধিকারীকে চিনিতে
পারিয়া একদিকে তাহার আশার জোয়ারে তাঁটা
পড়িয়া আসিলেও অপর পক্ষে আনন্দোত্তেজনার
সে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। ততক্ষণে মিঃ লাহা
ঘরের সম্মুখে আসিয়া হাসি-মুখে কহিয়া উঠিলেন—
“কি রে উমি! আজ বুঝি তোর ছেলেপিলেরা সব
ঘুমিয়ে পড়েছে?”

তাঁহার গলার সাড়া পাইয়া সেই রূপসী-পাখীটা
কলরব করিয়া উঠিল, “রূপু, রূপু, রূপু!”

ময়না ডাকিল, “কি রে উমি!”

কাকাতুয়া তাহার হেঁড়ে-গলা বাহির করিল।

মিঃ লাহা হাসিয়া উঠিলেন।

উর্শ্বীলা ইতোমধ্যে নিজের সমস্তা-পুরণের ‘সমস্তা’
ভুলিয়া মহা-ক্ষুণ্ণিভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে মিঃ লাহার
একটা হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের ঘরের মধ্যে
টানিয়া আনিতে আনিতে অনুযোগের সহিত
কহিয়া উঠিল, “খুব তো শীগ্গির শীগ্গির এসেছেন,
জামাইবাবু! ব’লে গেলেন, ‘এবার থেকে তোর
কাছে সর্বদাই আসবো!’ কি আসা গো!”

মিঃ লাহা শালিকার নথের নোলকে একটুখানি
দোলা দিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, “উর্শ্বীলা!
তুমি যে আমার অল্প পনকে প্রলয়-জ্ঞান করবে,
আমার এমন সৌভাগ্যের আমার তো কল্পনাও
ছিল না! কোন্ একটা পত্র-দূতকেই আলমী
গ্রেণ্ডার ক’রে আনতে পাঠিয়েছিল?”

উর্শ্বীলা তাঁহার কথা বলার ধরণে লজ্জা বোধ
করিতেছিল, শেষ উপমাটায় সে একেবারে থিল

খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।—“মা গো মা! বড় জামাইবাবু ‘আসামী’ আর ‘গ্রেপ্তারের’ মধ্যে এমন জড়িয়ে গেছেন যে, ভাল কথা বলতে গেলেও তার মধ্যেও ‘আসামী-গ্রেপ্তারের’ চেষ্টা বেরিয়ে পড়ে!”

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই মিঃ লাহা তাহার প্রদর্শিত আসন গ্রহণপূর্বক জবাব দিলেন, “কি করি বল, ‘যাদৃশী ভাবনা যন্ত’ ঐ বৈ আর তো কিছুই জুটলো না রে!”

উন্মিলা বলিল, “জামাইবাবু! আপনি বুঝি কবি? গান গাইতেও পারেন, বোধ হয়? একটা গান না—তা হ’লে।”

অল্প একটু নিখাসের সহিত হাসিয়া তরুণ কহিলেন, “পারতুম রে সবই; শোন্বার লোকের অভাবেই সব ছেড়ে দিয়েছি।”

উন্মিলা তাহার উন্মাদিনী ও চিরকথা দিদির কথাই মনে করিয়া মনের মধ্যে লজ্জা ও ব্যথা বোধ করিল। ঈষৎ অপরাধী ভাবে কুণ্ঠিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি আজকাল কেমন আছে—জামাই-বাবু?”

“আর কেমন আছে!”—বলিয়া এবার একটা নিখাসকে তিনি বড় করিয়াই মোচন করিলেন।

উত্তপ্ত সহানুভূতিতে উন্মিলার সরল বালিকা-চিত্ত ইঁহার প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে সেই জন্ম-পাগল জীবন্মৃতা দিদির ‘পরে তাহার যেন একটা ঈর্ষার ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহার অনাদৃত অবহেলিত নারীত্ব ভিতর হইতে পীড়িত হইয়া যেন এই কথাই বলিল, আমার সেই অর্দ্ধমৃত বোন যা পেল, জ্যান্ত-মানুষ আমি তাও পেলুম না! তাহার বক্ষ মথিত করিয়া একটা উত্তাপে-ভরা দীর্ঘ-তর শ্বাস সহসাই উঠিয়া আসিল।—সে যেন কেমন গভীর ও অন্তমনা হইয়া গেল।

মিঃ লাহা তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর লক্ষ্য করিলেন অদূরে পতিত একখানা খোলা চিঠির খামের উপর। তার পর চোক ফিরাইয়া আনিয়া উৎকলভাবেই উন্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই গাইতে পারিস্ উন্মিলা?”

উন্মিলা কুণ্ঠিতভাবে ঘাড় নাড়িল।—“উহুঃ।”

“লিখিস্‌নে কেন? খুকী হয়ে নেচে বেড়ালে বেরাল বশ করা যায়, বর বশ হবে কি ক’রে?”

সকলকার এবং এমন কি নিজেরও মনের প্রতিধ্বনি ইঁহারও মুখে ধ্বনিত হইতে শুনিয়া অক্ষমতার লজ্জার ক্ষোভে উন্মিলার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে গুম হইয়া গেল।

“উমি! রাগ করলি ভাই? আর, বোস, একটা কথা বলি শোন দেখি, আচ্ছা বিনয় কবে এসেছিল রে? আমার কাছে লজ্জা কি ভাই? আমি তোরা ভালর জন্মেই এসেছি। তুই তো আর সেই ছোটটি নেই! নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার, ভাববার ব্যয়স তো তোরা হয়েছে। এখন যদি এমন ক’রে অবহেলায় সব নষ্ট হ’তে দিস্, চিরকাল ধ’রে যে কাঁদতে হবে, উমা!”

উন্মিলা একটা অজানিত আতঙ্কে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। সে পাণ্ডুমুখে ভয়ানকতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিবার অনেক ছিল, কিন্তু লজ্জা ভয় ও সঙ্কোচে কোন প্রশ্নই তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।

মিঃ লাহা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদল করিয়া ফেলিয়া সেই ভূপতিত পত্রখানার উপর লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“কার চিঠি রে? বিনয়ের বুঝি? ওঃ, তা হ’লে সে এখনও তোকে চিঠিপত্রও লেখে!”—বলিয়াই তিনি একটুখানি দ্ব্যর্থসূচক বাঁকা হাসি হাসিলেন। উন্মিলার মন ক্রমেই আশঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

“দেখি না ভাই, তোরা বর তোকে কি চিঠি লিখেছে। একসঙ্গে দু’খানা নৌকা তা হ’লে সে তো চালাচ্ছে ভাল। আমাদের মত আনাড়ী নয়। হ্যাঁ রে উমি! বরের লেখা প্রেমপত্র হত-ভাগা ভয়ানকটাকে দেখাতে বুঝি মন সরে না? কেন রে, আমি তাতে তাকে কি হিংসা করবো? না রে, তা নয়, তুই আমার ছোট বোন্টির মত; তোরা সুখের খবর জানতে পেলো মন আমার সুখই পাবে। তবে যদি তোরা লজ্জা করবার মতন কোন কথা এতে থাকে, তা হ’লে অবশ্য আমি তোকে বিপন্ন করতে চাইনে।—”

এত বড় অপবাদটাকে সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মিলা তড়িদ-বেগে উঠিয়া চিঠিখানা মিঃ লাহার গায়ের উপরে ছুঁড়িয়া দিল। তিনি মনে ও মুখে হাসিয়া সেখানা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে তাহার মুখে চোকে একটা অভূতপূর্ব নূতন ভাবোত্তেজনা ফুটিয়া উঠিল। পত্রপাঠ-শেষে সেখানা নিজের কোর্টের পকেটেই ফেলিয়া দিয়া মিঃ লাহা ডাকিলেন “উন্মিলা!”

স্বামীর পত্র পরের হাতে তুলিয়া দিয়া উন্মিলা আজ একটু একটু লজ্জানুভব করিতেছিল, এবং সেই ক্ষণ মিঃ লাহার দৃষ্টি-পরিহার-মানসে অন্ধ দিকে

মুখ ফিরাইয়াছিল, মিঃ লাহার কণ্ঠস্বরে বিশ্বাস-হতভাবে মুখ ফিরাইল। সে প্রতিফলনেই ইহার বিজ্ঞপে-ভরা উচ্চ হাস্য ও ব্যঙ্গের ভাষা প্রতীক্ষা করিয়া লজ্জা-বিপন্ন হইতেছিল। কিন্তু এ কণ্ঠস্বরে এ সকলের স্থানই ছিল না।

“উন্মিলা! এ চিঠির অর্থ তুমি কিছু বুঝতে পেরেছিলে?—পারো নি বোধ হয়? কেমন ক’রে পারবে! তুমি যদি অমন বোকাই না হবে, তা হ’লে আর আজ তোমার এ রকম সর্বনাশ হতেই বা বসেছে কেন? শোন তা হ’লে, তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসে না, তোমায় সে কোন দিনই স্ত্রী ব’লে স্বীকার করে নি কেন জান? সে আর এক জন স্ত্রীলোককে সর্বাস্বত্ব করণ দিয়ে ভালবাসে,—তাকে সে বিয়ে ক’রতে চায়। এ কথা তোমার শাওড়ীও জানেন, ইচ্ছা হয়, তাঁকেও তুমি জিজ্ঞেস কর্তে পার।”

একটা অদ্ভুত আন্তরিক উন্মিলার কণ্ঠ ভেদ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া গেল।

“বুঝতে পারলে এখন ওই হেঁয়ালীর মানে? কোন্ পিছল পথে তাঁর পা পড়েছে; কোন্ স্রোতে তিনি ভেসে যাচ্ছেন—কোন্ সঙ্কটের মধ্যে তিনি জড়িয়ে গেছেন—এখন বুঝলে কিছু?—তিনি যাকে ভালবাসছেন, সে তোমার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী এবং সহস্র গুণেই শিক্ষিতা, তুমি তার পায়ের কাছে দাঁড়াবারও যোগ্য নাও; এখন তোমার নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলে? উন্মিলা! ও কি! ও কি ক’রচো!”

অন্তে উঠিয়া তিনি উন্মিলার এলাইয়া-পড়া দেহ ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে খাটে শোয়াইয়া দিলেন। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া জলের কুঁজা হইতে এক অঞ্জলি জল আনিয়া মুখের উপর জোরে ঝাপটা দিতেই সে চোক চাহিল।

“কি বিপদ! আঃ, মেয়েগুলো কি সব সমান সেন্টিমেন্টাল! উন্মিলা! উন্মিলা! ও রকম কর্চো কেন? এখন কি অত অধৈর্য্য হ’লে চলে? মনে বল করো, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করো, তবে তো তাকে রক্ষা কর্তে পারবে।”

উন্মিলার হুঁচোক দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিতে লাগিল।

“ছিঃ, কৈদ না! স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে, এ তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ ব’লেই আজ এত ক’রে তোমায় বোঝাতে হলো, নইলে এ তো আর নূতন

কিছু নয়। যাই হোক, আমি যখন সব জানলুম, তখন তোমার যতদূর সুবিধা করা যায়, তা আমি করবোই। কিন্তু শুধু তো আর এই নয়, সে আরও একটা মস্ত বড় বিপদের মধ্যে যে মাথা দিয়ে রেখেছে।—সে বিপ্লবপন্থী।”

এই ‘বিপ্লবপন্থা’ সম্বন্ধে উন্মিলার জ্ঞানও খুব বেশী নয় এবং এ কথাটা তাহার অসহ্য যন্ত্রণানলে বিদগ্ধ প্রায়-চিন্তে ভাল করিয়া স্থানও লাভ করিল না। সে যেন তখন কি এক রকম হইয়া গিয়া শুধু এই কথাটাকেই এক এক খণ্ড জলন্ত অঙ্গারের মত নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছিল যে, ‘বিনয় তাহাকে ভালবাসে না তাহাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহাকে ভালবাসে, যাহাকে সে পাইতে চায়, সে তাহাপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী!’ মিঃ লাহার কথায় কান্না তাহার খামিল ন’, বরং এবার সে মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

“ছিঃ, উন্মিলা! ছিঃ, চুপ করো। বিনয় বরাবরই তোমার সঙ্গে নিতান্ত অন্তায় ও অসঙ্গত আচরণ ক’রে আস্চে, আর তুমিও এতদূর সহ্য ক’রে থেকেই তো তাকে এতবড় প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছ! তা সে যা হবার হয়েছে, আমার উন্মিলার চোখের জল ফেলান তার ব্যর্থ হবে না। এর জন্ত তাকে কঠিন শাস্তি পেতেই হবে। আচ্ছা, এখন তুমি তোমার শাওড়ীকে একটবার ডেকে আন তো, তাঁকে প্রণাম ক’রে এখানি আমি বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ, ভাল কথা, তাঁকে ডেকে দিয়ে আমি যা লিখে দিই, এই কথাগুলি তুমি একখানি চিঠিতে লিখে বিনয়কে পাঠাও দেখি! দেখ, এ সব সময় লজ্জা সঙ্কোচ সমস্তই বিসর্জন দিতে হবে, মনকে জোর ক’রে বাঁধতে হবে, না হ’লে তোমার হারানিষি তুমি ফিরিয়ে পাবে কেমন ক’রে? আচ্ছা, তুই ওপোরে পাঠ কি লিখিস্ রে? কিছু না! হা রে বোকা-রাম! এমনি ক’রেই স্বামীটিকে একেবারে হারিয়ে ব’সেচ?”

যে চিঠিখানার মিঃ লাহার উপদেশ ও আদেশ-মত উন্মিলা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিল, সেখানি এই রকম।

তোমার চিঠি পেয়ে আমারও বড়ই ভয় ও ভাবনা হচ্ছে! আমি কত কাঁদলুম।—কি করেছ তুমি? কি সঙ্কটের মধ্যে তুমি ঢুকতে গেছ? তোমার জীবনের কোন্ রহস্যের কথা লিখেছ? যে কাজ আজ ক’বছর ধ’রে তোমায় কর্তে চেষ্টা করছিলে, সেই গুপ্ত কথা কি কেউ জানতে পেরে

গেছে? অথবা আর কিছু? তুমি জানো, তোমাদের মতন অত ধারালো বুদ্ধি আমার নয়। আমি কি অত সব ছেঁদো কথা ধরতে পারি? আমার মন ছটফট করছে, কেবলই কান্না পাচ্ছে, (এখানে চোখের জলে কাগজ ভিজিয়া কালি-মাখা হইয়া গিয়াছে) কেন তুমি সঙ্কটের মধ্যে পড়তে গেলে? কেন তুমি আমার কাছে ফিরে এলে না? তাই এসো, ও-সবে আমাদের কাজ কি? ‘মারিতে গেলে যখন মরিবারও’ সম্ভাবনা নিজেই লিখেছ, তখন কাজ কি তেমন দুঃসাহসিক কাজে যাওয়া? না, আমাদের স্বরাজ চাই না, স্বাধীনতা চাই না,—সাহেবরা সব যেমন আছেন, থাকুন, তুমি শুধু চলে এসো! ওগো, তুমি শীঘ্র না এলে আমি ম’রে যাব।—সত্য বল্চি, ভয়েই ম’রে যাব। তুমি শীঘ্র এসো।—

উন্মিলা।

মিঃ লাহা লিখিয়া দিয়াছেন, ‘তোমার উন্মিলা।’ সেখানটা লিখিতে গিয়া খুব এক চোট গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উন্মিলা ‘তোমার’টা বাদ দিয়া লিখিল শুধু উন্মিলা। তাহার—বিনয়ের। কই তা তো সে নয়!—উন্মিলাকে তো সে এক দিনের জ্ঞাতও সে পদ, সে অধিকার দেয় নাই! তবু শুধু শুধু গায়ে পড়িয়া আর এ আদর কাড়াইতে যাওয়া কেন? তাহার মনের প্রাণের সবখানি যে জুড়িয়া আছে, সেই হয় তো কত আদরে গলাইয়া আজ তাহাকে কত বখাই লিখিতেছে! উন্মিলা কিসের জোরে ও-সব কথা লিখিতে যাইবে? সে তো আর তার মত সুন্দরী বা শিক্ষিতা নয়! রাগে দুঃখে ক্রোড়ে অভিমানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উন্মিলার নাক-চোক সব ফুলিয়া উঠিল। মুছিয়া মুছিয়া কিছুতেই আর আহত অশ্রুপ্রবাহকে সে রোধই করিতে পারে না। একবার চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়াই সঙ্কল্প স্থির করিল। ঠিক এমনি সময়েই মিঃ লাহা জগদ্ধাত্রী-প্রদত্ত আহাৰ্য্য এক আধটুকু নাড়াচাড়া করিয়া ফিরিবার দ্বারায় অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া ডাকিলেন,—“উন্মিলা!”

উন্মিলা যেন চুরী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, এমনি করিয়া চম্কাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা মুড়িয়া লাহার অনুরোধে বাঙ্গলায় ঠিকানা লেখা থামের মধ্যে ভরিয়া ফেলিল, এবং সেখানা হাতে করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গিয়া আরক্ত ও ক্ষীত মুখখানা অস্বাভাবিক দীপ্ত দেখাইতেছে।

“আমার গাড়ী অবধি পৌছে দিবি আর। ওঃ, বড্ড ভুলে গেছলুম রে। তোর জন্তে এই একটা রুবির ইয়ারিং এনেছিলুম যে!”—

“নাঃ, রোজ রোজ এ সব কেন?”

“দিলুমই বা? দেবারও তো আমার নেই কেউ, মনুষ্য-জন্মে সাধ তো সবই যায়। তোর দিদি যদি মানুষের মতন হতো, তো সে কি দিত না?”

উন্মিলা এই মেহের দান আজ আর কোন কিছুই জ্ঞাত নয়—শুধু একমাত্র হিতকামীর দেওয়া বলিয়াই অত্যন্ত অনাগ্রহ ও অনিচ্ছার মধ্যেও গ্রহণ করিল। নহিলে বিনয়ের প্রতি তীব্র অভিমান সমস্ত পৃথিবীটাই তাহার কাছে তখন তুচ্ছ—তুচ্ছতম হইয়া গিয়াছে এবং সেই মর্মভেদী অভিমান ক্রমশই তাহার বক্ষের মধ্যে উত্তাল ক্রোধের আকার ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নীচে নামিয়া আসিয়া মিঃ লাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “চিঠি লেখা হয়েছে রে?”

উন্মিলা মাথা হেলাইয়া জানাইল, ‘হ্যাঁ’।—

“তা হ’লে সেটা আমার হাতেই দাও না কেন? টেবলনেই পোট্ট ক’রে দিবে যাই।”

নিরন্তরে উন্মিলা চিঠিখানা মিঃ লাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চক্ষে প্রশ্ন বুলিয়া এবং তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ লাহার মনেও একটু যেন দুঃখ বোধ হইল। তার পিঠে হাত দিয়া স্নেহে কহিলেন, “কি রে উমি?”

চোক নত করিয়া উন্মিলা মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি চিঠিতে ও সব কথা লিখেছেন কেন?”

মিঃ লাহা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিলেন, জোর করিয়া মনের দ্বিধাটুকুকে সরাইয়া দিয়া পরে উত্তর দিলেন—

“তা হ’লে সে ভয় পেয়ে তোমার ভুল ভেঙ্গে দিতে ছুটে আসবে, আর এলে পর, ম’তে ও তোমাতে বিস্তর কাঁদাকাটা ক’রে তাকে ফিরতে দেবে না। কেমন! কিন্তু দেখ, আমার কথা যেন কিছু বলো না তাকে।”

উন্মিলা মুখে আর কোন কিছুই বলিল না, মনে মনে বলিল, “আসতে হয় আসবে, কিন্তু আমার যে ভালবাসে না, অত্নকে ভালবাসে, আমি আর এ জন্মে কখনই তার মুখের দিকে চাইতে পারবো না। আমার সব কিছুই এ জন্মের মতন হয়ে গেল!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিবসের অবশিষ্টাংশ ও সমস্ত রাত্রিই অভুক্ত, বিনিদ্র এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহপরায়ণ বুদ্ধ অন্ধ পিতাকে লইয়া তেমনি অনাহারী এবং বীতনিদ্রা কৃষ্ণার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, অথচ যায়ও না তো! দু'দিন আগে যে সংসারাতীত সুখসৌভাগ্যের কোলের মধ্যে বসিয়াছিল, ঐশ্বর্যের চরম ভোগস্থলে যে দেহ আজন্ম-লাগিত, সেই শরীর-মনে একসঙ্গে সকল দিক দিয়া এই যে প্রচণ্ড দুঃখের শ্রাবণ-ধাণ বর্ষিত হইতেছে, সে যে কেমন করিয়া সহিয়া আছে, এইটুকুই বেন তাহার নিজের কাছেই পরম বিস্ময়ের মত চৈকিতেছিল। কৃষ্ণ যেমন হস্তপদ সমস্তই ভিতরে টানিয়া লয় ও পিঠের কঠিন সর্বসহ আবরণটাতে, এমন কি, এই বিপুল ধরিত্রী-ধারণের ভারও গ্রহণ করিতে পরাশ্রুত হয় নাই, সে-ও তেমনি করিয়াই তাহার উপর উত্তম সকল দুঃখকেই সহ্য করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মন কঠোর ত্যাগ-ব্রতের মহা সন্ধিস্থলে পড়িয়া যেমন দৃঢ়—তেমনই প্রশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরেরও অন্তঃস্থলে সে বেন এই মহা পরীক্ষায় ভগবৎ-প্রেরণা ও তাঁহার মঙ্গল-আশীর্বাদের ধারা অনুভব করিয়া ইহারই মধ্যে একটা নিগূঢ় আনন্দ হৃদয়ের তলে তলে অনুভব করিতেছিল। মন বেন তাহার এই দুঃখ-দৈত্য-লাঞ্ছনা-অবমাননাকে মাথার মুকুটের মতই পরম পরিতোষে তুলিয়া লইয়া এই কথাই তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল,—

“আরও দুঃখ সহবে আমার সহবে আমারো,
আরও কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।”

কিন্তু আর দুঃখ সহিল না। “জীবন-তার” এর চেয়ে কঠিন সুরের ঝঙ্কারে ছিঁড়িয়া পড়ে পড়ে হইল। সারা দিন-রাত্রের মধ্যে যখন মল্লিক সাহেব জলম্পর্শ না করিয়া ‘প্যাসিভ্ রিজিষ্ট্যান্স’ (নির্কিরোধ অবাধ্যতা) অবলম্বন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। এই দুর্বল বুদ্ধ-শরীরে তাহাতে তাঁহার প্রাণহানিরও আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িয়া তখন কৃষ্ণার দৃঢ়সঙ্কল্প ও শিথিলীকৃত হইয়া আসিল।

নিজের ভবিষ্যৎটাকে ইতোমধ্যেই সে খানিকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল, গহনা-বেচা টাকার মধ্যে এক হাজার মাত্র হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট এগার হাজার সে মিঃ লাহার জন্ত ইন্সিওরড পত্রে শীল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই হাজার টাকা এবং

তাহাদের বিখ্যাত ফার্মিটারগুলার, রূপার বাসন-পত্রের যে দাম উঠিবে, উহাতেই খুঁচরা বাজার-দেনা কয়েক হাজার শোধ দিয়া একখানি ছোট-খাট বাড়ী বালী-বেলুড় এমনি কোন জায়গায় ভাড়া লইয়া তাহারা দু-এক দিনের মধ্যেই সেখানে উঠিয়া যাইবে। সঙ্গে পিতার ভৃত্য দুইটি থাকি-লেই যথেষ্ট। অবৈতনিক (মিঃ লাহার দত্ত বেতন-ভোগী) প্রাইভেট সেক্রেটারীকে শুদ্ধ সঙ্গে লওয়া হইবে না। সেখানে তার প্রয়োজনই বা কি? আর কি ধনিসমাজের কেহ তাহাদের সহিত সম্বন্ধই রাখিবেন? সেই ভোগবিলাসের জগৎ হইতে তাহাদের নাম দু-দিনেই তো মুছিয়া যাইবে; এটা বিশেষ জানা কথা।—তার পর তাহাদের চলিবে কিসে? সেই কথাটাই কৃষ্ণা অনেকক্ষণ ভাবিল। কোন মেয়েসুলে সে শিক্ষাব্রতী হইতে অক্লেশেই পারে, কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষ ক্রটি এই যে, তাহার অন্ধ পিতার দেখা-শুনা প্রভৃতির অনুবিধা ঘটবে। তার চেয়ে কোন ভদ্রপরিবারের মেয়ে-দের গান-বাজনা শিখাইতে এক এক ঘণ্টা সময় দিলে, দু'জায়গায় অন্ততঃ সত্তর আশী টাকাও তো পাওয়া যাইবে। একবার তাহার ঠোঁটের গোড়ায় একটুখানি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরই সে গম্ভীর হইয়া মনে মনে বলিল, আমার নিজের এখন পঁচিশ টাকা হইলেই চলিয়া যায়। মিতব্যয়িতার পরম শাস্তি অনুভব করিয়া সে তৃপ্ত হইল।—কিন্তু কল্পনা-রচিত, আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরবে ভরা ভবিষ্যৎ তাহার বর্তমানের মহা সমস্তার ভারে তখন টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশ সে দিন ঘন-মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষার বাতাস থাকিয়া থাকিয়া আর্দ্র-ক্রন্দনের রোল তুলিতেছিল। মেঘ-ব্যাপ্ত অন্ধকার রাত্রির বক্ষে ভীতশিহরণ জাগাইয়া কাহার মমতা-হীন রোষ-দৃষ্টির ত্রায় তীক্ষ্ণ বিদ্রোহ চকিত হইয়া উঠিতেছে। বেন কোন মর্মান্বিত অন্তরের অভিশপ্ত পরিতাপের মত বজ্র হাঁকিয়া উঠিতেছিল, কড় কড় কড়।—আর এই সকল কঠিন ও অসহ শাসনে লাগিতা প্রকৃতি হৃদয়কে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছিলেন, আর তাঁহার বিদীর্ণ বক্ষের শোণিত-নিঃস্রাবের মতই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল—ঝর্ ঝর্ ঝর্।

সারা রাত্রি চোরের মত নিঃশব্দে বাপের ঘরেরই এক পাশে তাঁহার অকথ্য মনোবেদনার সাক্ষ্য স্বরূপে বসিয়া থাকিয়া অসহ যন্ত্রণার ফাটিয়া-পড়া শরীর-মন লইয়া শেষ-রাত্রে সে নিজের ঘরে

ফিরিয়া লুটাইয়া পড়িল। আর সহিবার বহিবার শক্তি তাহাতে নাই। আর আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মপ্রসাদকে সে উর্দ্ধে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—আর এ জীবনের সুখশান্তি আশা-তৃষ্ণাকে ত্যাগ-সংযম দৃঢ়তা-নিষ্ঠাকে সে আশ্রয় করিয়া থাকিতে ভরসা করিল না। এমন কি, তাহার অন্তরের নবজাত শ্রুতমার—ভীকু অথচ প্রগাঢ় ও পবিত্র, প্রেমকেও সে জলাঞ্জলি দেওয়াই হিরীকৃত করিল। নতুবা যথার্থই যে তাহাকে পিতৃ-যাতিনী হইতে হয়!—কিন্তু এ কি পরাভব? ভগবান্! হা ভগবান্! বাস্তবিক কি তুমি প্রবলের ঈশ্বর? দুর্বলের কি তুমি কেহ নও? বলীর বাহু তোমার আশ্রয়-স্থল বটে, কিন্তু তাহার অত্যাচারের খড়্গকেও কি তুমি প্রশ্রয় দিবে? কিন্তু কাহাকে এ বৃথা অনুরোধ? অত্যাচারের উত্তম দণ্ড কবে না ভাগ্যহীনের মাথা ফাটিয়া থাকে! আজ কি তাহারই জন্ত এ নূতন সৃষ্টি হইল? মনে পড়িয়া গেল, সেই অত্যাচারিতা 'নবাব মা' বুড়ীটার কথা! —সে বলিয়াছিল, 'যারা মানুষের বুকের উপর দিয়ে চাকা চালিয়ে হাওয়া গাড়ী করে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়—তাদের বুক এমনি করে মড়মড়িয়ে ভাঙ্গে তবে না আমার যন্ত্রণা যায়!—'

আজ তার সে মর্যাদাসিক অভিশাপই বুঝি ফলিতোছে! এর চেয়ে তার বুক যদি সত্যসত্যই সেই রকম করিয়া গুঁড়াইয়া পড়িত! না, তিনি যে জ্ঞানের দণ্ড বহনকারী—জ্ঞানের মর্যাদা এমনি করিয়াই বেরক্ষা করেন। ভোরের বেলা প্রাইভেট সেক্রেটারী খবর পাঠাইয়া দিয়াছে মিঃ মল্লিকের অবস্থা বিশেষ মন্দ। তিনি ডাক্তার আনিয়াছিলেন, ডাক্তার বলিয়া গেলেন, নাড়ী অতি ক্ষীণ; হার্ট যতদূর দুর্বল হইতে হয়, হইয়াছে। বলকারক ঔষধ-পথ্য খুব শীঘ্র পড়া বিশেষ আবশ্যক।—

কৃষ্ণা কম্পিত-হস্তে কোন মতে কাপড়টা বদলাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

“বাবা! বাবা! বাবা!”

“অ্যা!”—বলিয়া মিঃ মল্লিক অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে জবাব দিলেন।

“সে কি, এসেছে? তরুণ তরুণ! এলে কি তুমি?”

“বাবা! শীঘ্রই তিনি আসবেন। তুমি যদি একটু কিছু খাও, তা হ'লে আমি এক্ষণে তাঁকে আনতে যাব। না খাও তো কিন্তু কিছুতেই যাব না।”

“সত্যিই যাবি? তাকে বিয়ে করতে আর অমত করবি নে? বেবি! ঐ কি সত্যি বলছিস?”

“তোমার কাছে কি মিথ্যে বলবো? তোমার জন্ত আমার করতেই হবে। কিন্তু তা হ'লে এখন তুমি কিছু খাও, না হ'লে আমি যাব কি করে?”

“তবে দে, খাচ্ছি। অ্যা! বেবি! বেবি! মা আমার! কই, কোথায় তুই! আর যাহা আমার! আমার অন্ধকারের আলো! বুকের মধ্যে তোর মুখটা রাখ। কত মন্দ কথাই বলেছি, কিছু মনে করো না বাবা আমার! বুড়ো হয়েছি, কাণা হয়ে গেছি। তবে দেখ দেখি, কত যন্ত্রণা আমার! কি ছিলুম কি হ'লুম, আরও কি হ'তে যাচ্ছি! তবু এ বিয়েটা হ'লে এখনও মানটা কতক বজায় রেখে যেতে পারি। যাও কিছু! মনে কোন ক্ষোভ না রেখে তাঁকে হাতে ধ'রে নিয়ে এসো।—কিছু করতে হবে না, সে তোমার দেখলেই সব ভুলে যাবে। সে আমার তেমন ছেলেই নয়। তার তোমা-অন্তঃ প্রাণ যে!”

বাহিরে আসিতেই প্রাইভেট-সেক্রেটারী পর্দার আড়াল হইতে সরিয়া গেল।

নিজের কাজকর্মটুকু সারিয়া বাপের যেটুকু কাজ তার নিজস্ব, সেইটুকু সম্পন্ন করিয়া দিয়া বাহির হইতেই কয়েকখানা পত্র পাইল। তার মধ্যে দুই খানার উপর নজর পড়িতে হাত যেন তার আড়ষ্ট হইয়া আসিল। দু'খানা ঠিক দুজন প্রতিযোগীর নিকট হইতে আসিয়াছে।

প্রথম সে বিনয়ের খানা খুলিল, খুলিতে সময় কুলাইল না, দ্রুতকম্পিতহস্তে খাবটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে পত্র পাঠ করিল। পাঠকালে হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক চঞ্চলতার মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষের দৃষ্টিও যেন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

“কৃষ্ণা!”

কি লিখিব, ভাবিয়া না পাইয়া তোমায় তোমার নিজ নামেই সম্বোধন করিবার স্পর্ধা গ্রহণ করিলাম। তোমাদের নব্য এটিকেটে এটা নিতান্ত অসত্যতা তা জানি; কিন্তু তুমি তো জানই; কোন রকম সত্যতার ইতিহাস যদি আমার পড়াই থাকবে, তবে আমার এ রকম দশাই বা কেন?—

আমাদের পক্ষে একান্ত লাভজনক একটা শক্ত কাজ হাতে লইয়া দূরে চলিলাম। যাত্রাকালে একটি বার তোমায় দেখিয়া যাইবার জন্ত লোভের সীমা নাই, কিন্তু এত বেশী আগ্রহ বলিয়াই তাহা দমন করিলাম। কিছু দিন ফিরিতে বিলম্ব হইবে। মধ্যে

মধ্যে পত্র দিবার লোভটাকেও কি ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে? দূরে থেকে একখানা একখানা চিঠি লিখলে আর দোষ কি?—তুমি উত্তর দিবে তো?—দিও, সত্যি দিও। তুমি তো আর এখন কারু কাছে বাধা পড়ে নেই? তা হ'লে আমাদের এই নিঃশূল বন্ধুত্বের বন্ধনটুকুকে ছিঁড়ে ফেলবার কি এমন আবশ্যক আছে?

ঐ বাঃ! আগাগোড়াই 'আপনি' লিখতে 'তুমি' লিখে এসেছি! ভারি হাসি পাচ্ছে! কিন্তু তাই বা কি বলবো? 'কৃষ্ণা' লিখে আর 'আপনি' লিখতুম কেমন ক'রে, আ?—ও ঠিকই হয়েছে। রাগ করো নি তো? না, তুমি তো রাগ করো না। আজ আর মোটে সময় নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, যে কাজটা হাতে নিয়েছি, তাতে যেন সফলকাম হই।

তোমার বন্ধু—বিনয় শীল।

সেই চিঠিখানা কোলে করিয়া মৃত-প্রিয়তম-কোড়ে সর্বস্বাভাঙ্গী নারীর মতই কৃষ্ণা বহু-কণ অভিজুতাৎ বসিয়া রহিল। চিঠিখানার এক একটা শব্দ শোকাচ্ছন্নচিত্তে—সন্তোষিত প্রিয়জনের শেষ মেহাভিযাক্তির স্মার তাহার অন্তরের ছিন্ন-ভিন্ন এলোমেলো তন্ত্রীতে যা দিয়া দিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনটা যেন দেখিতে দেখিতে একখানা নূতন সাজান চিতার মতই কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আগুনের দুরন্ত শিখা যেন তাহাকে আর একবার নূতন করিয়া সর্বস্বাস্ত করিয়া দিল।—তার পর শ্মশান-বৈরাগ্যের মতই বিরাগভরা শূন্য চিত্তে সে মঃ লাহার পত্র গ্রহণ করিল। সে ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম এই—
আমার প্রিয় বেবি!

কাজ-কর্ম্মে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ক'দিন তোমার কোন খোঁজ খবরই রাখতে পারি নি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। বাইরে খবর রাখতে পারি নি বটে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তোমার মুখ সর্বদাই যে পদ্মের মতন ফুটে রয়েছে!

তোমার বাবা আমার যাবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন,—লিখছেন,—তিনি না কি বড়ই বিপন্ন! শীঘ্র যেতে বলেছেন।—কিন্তু বেবি! জান তো আমি পরের চাকর। ইচ্ছা করলেই তো আর আমার যাবার শক্তি নেই। কি তাঁর বিপদ—কি হয়েছে তাঁর? তুমি কিছু জানো কি? জানলেও হয় তো আমার জানাবার মতন দরকার আছে বলে মনে কর নি? না হ'লে কিস্টে তো তাঁর বদলে

আমায় যাবার কথা লিখতে পারতে? বাই হোক, যদি প্রয়োজন বোধ করো, সেই মুহূর্ত্তেই আবেদন করো; তোমার কাছ থেকে এতটুকু ইঙ্গিত পেলেই যেমন ক'রেই হোক, আমি ছুটে যাব। তুমি জান, তোমার জন্য এ পৃথিবীতে এমন কোন ভবিষ্যৎ-কাজই নেই—যা আমি করতে পারি নে।

আশা করি, তোমার বাবা তেমন কোন বিপদে পড়েন নি? আশা করি, তুমি শারীরিক দিক দিয়েই আছ?

তোমারই চিরানুগত—তরুণ।

সর্ব-বিষে জর্জরিত হইয়া মৃত্যুর কবলে অর্দ্ধ-পতিত মাহুষের মুখ যেমন হয়, তেমনি মুখে কৃষ্ণা তাহার অবশ অঙ্গুলি-মধ্যে কোনমতে কলম তুলিয়া লইয়া লিখিল।—এগ্রি টু ইওর টার্মস্—কম্ (তোমারই প্রস্তাবে সম্মত, আইস)।

নিজের হাতে এই টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দিয়া সে যেমন বাহিরে পা দিয়াছে, দেখা হইয়া গেল—তার পিতার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। লোকটি দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই জানাইল, মল্লিক-সাহেব তাহাকে খুঁজিতেছেন।

কৃষ্ণা দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল, এবং কি মন্ত্বে বলা যায় না—কৃষ্ণার প্রেরিত টেলিগ্রামের মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ জানিয়া লইয়া নিজে এই মর্ম্মে মিঃ লাহাকে আর একটা তার করিয়া দিল, “বেষ্ট টাইম্ ফর্ ইওর কমিং (আপনার আগমনের সমুচিতকাল উপস্থিত)।

নিজের বহনক্ষম শরীরকে বহিয়া লইয়া সে দিনের বাড়ী ফেরাটাই যেন কৃষ্ণার কাছে এক মহাবিস্ময়! তার পর এই যে কাজটা করিয়া আসিল, ইহার পর আর শরীরের ক্লান্তিবোধ বা স্নানাহারের প্রয়োজনীয়তা তাহার কিছুই বাকি রহিল না। মন যেন তার এই কথাটাই শুধু নালিস করিয়া বলিতে লাগিল,—

“ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা,

চুকিয়ে লও গো ভয়।

বিরোধ আমার যত আছে

সব ক'রে লও জয়।”

প্রথমেই পিতার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

মেয়ের সাড়া পাইতেই তিনিও ব্যগ্র হইয়া মাথা তুলিলেন, “কি রে বেবি?”

“তুমি আমার ডেকে পাঠিয়েছিলে?”

“কই না, কে বললে? তুমি কোথায় ছিলে?”

“টেলিগ্রাফ-অফিসে। মিঃ ভদ্র গিয়ে বললেন, তুমি আমায় ডাকচো।”—

মিঃ মল্লিক ঈষৎ চিন্তিতভাবে কহিলেন, “বলতে পারিনি তো, আমি তো কই ডাকি নি। তরুণকে তার দিলে?”

মিঃ ভদ্র সম্বন্ধে মনে মনে কিছু সন্দেহান হইয়া কৃষ্ণা পরে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিল, “হঁ।”

“যাবার খবরটা দিলে বুঝি?”

“না, আস্তে বললুম।”

“যদি না আসে?”

“না আসার কারণ তো কিছু নেই, তাঁর মতে সম্মত হয়েছি, এই কথাই তো জানালুম।”

“কি লিখলে?”

কৃষ্ণা টেলিগ্রামে যাহা লিখিয়াছিল, বলিল। শুধু ‘টারমস্’ না বলিয়া ওইখানে “প্রোপোজাল” শব্দটা ব্যবহার করিল। শুনিয়া ডাঃ মল্লিক কিছু সন্দেহ কিছু অসন্তুষ্টভাবে মন্তব্য করিলেন, “হয়েছে মন্দ না, তবে কি না, তোমার ওই পরসী বাঁচাবার জন্ত যেমন একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টি আছে, সে কোথায় যাবে! যাই হোক, ভালই করেছে। শীঘ্র শীঘ্র তরুণ এসে পড়লে বাঁচা যায় এখন। এতে সে নিশ্চয়ই আসবে। কীল তাতে রবিবার আছে।”

শনি এবং রবিবারটা ডাক্তার মল্লিকের একান্ত অশাস্ত উদ্বেগের মধ্য দিয়াই তাহার আঘাতান্ত বেলা লইয়া দিব্য মনঃসংযোগে বিদায় লইল। এই আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ছিয়ানব্বইবারও তিনি প্রত্যেক পদক্ষেপে, এমন কি, বাতাসের শব্দেও চমকিত হইয়া ডাকিয়া উঠিতেছিলেন—“তরুণ!”

রবিবারে এই অধীর ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। প্রাতে উঠিয়াই কল্লাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “বেবি! আজ নিশ্চয়ই তরুণ আসবে। নিজে আসবে বলেই সে কীল তোমার টেলিগ্রামের জবাব দেয় নি। তুমি হয় তো সেই বিল্লী মোটা শাড়ীই পরে আছ? চেহারা হয় তো তোমার অযত্নে শ্রীহীন হয়ে গেছে? কিছুই তো আর আমার দেখবার উপায় নেই! যাও, একটু যত্ন করে গা-হাত সাফ করে নাও গে। ভাল দেখে কাপড়-চোপড় পরে, চুণির ব্রেসলেট, মুক্তার মালা আর যা কিছু তার দেওয়া আছে, সেইগুলি সব পরবে। সে এসে দেখে যেন দুঃখিত না হয়, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ না করে।”

এক সময় বহুদিন অপরিচিত অন্ন একটুখানি

পুষ্পসারের মুছ সৌরভে ও একখানা নূতন শাড়ীর খসখসানীতে কল্লার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কত বেলা রে?”

“সাড়ে আটটা, বাবা! এইবার তুমি কিছু খেয়ে নিয়ে—”

“বলো কি বেবি! রাত্তির সাড়ে আটটা?—তা হ’লে তো তরুণ আজও এলো না! সত্যিই তা হ’লে সে আমাদের ত্যাগ করলে।—”

“ও বাবা! বাবা! বাবা গো! অমন করচো কেন, বাবা? এখনও হয় তো আসবার সময় আছে। হয় তো সরকারী কাজের জন্ত আস্তে পারছেন না। না হয়—আমিই কালকে যাব। তুমি স্থির হও।”—

“বেবি!—বে-বি! সে একটা চিঠিও তো আমাদের লিখতে পারতো। তবে কি, তবে কি, তোমারই সন্দেহ সত্য? সেই কি আমাদের এই দশা ঘটালে? তার পর এখন নিঃস্ব পথের ভিখারী ডাক্তার মল্লিকের মেয়েকে ম্যাজিস্ট্রেট তরুণ লাহার অযোগ্য বোধে ঘৃণা করে আমাদের দিকে ফিরে চাইলে না? তবে আমি মুখ দেখাব কি করে? হালদার, নিয়োগী, বাঁড়ুঘো ওরা যখন জানতে পারবে, আমি আমার সে গজা লুকবো কোথা দিয়ে? ও রে বেবি! তোকে যে এক সময় মঝাই হিংসা করতে রে! আজ তোর এত বড় অপমানও আমার বেঁচে থেকে দেখতে হলো?”

“বাবা! অত অস্থির হ’লে কি হবে! আমি তো বলেছি, আপনাকে খুসী করার জন্ত আমি তাঁকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি, কাল সকালেই আমি নিজে যশোর যাব।”

ডাক্তার মল্লিক একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার গুরুল বক্ষের প্রায় আধখানা খালি করিয়া ফেলিয়া সকাতরে এই কথা বলিলেন;—“আর তুমি যাবে! সে হয় তো এতক্ষণ অজ্ঞ কোন মেয়ের সঙ্গে এন্গেজড হয়েছে। আর কি সে তোমায় বিয়ে করতে রাজীই হবে?—আর কি সে তোমায় চেয়ে দেখবে! আর কি সে আমার মান-ইজ্জত বাঁচাতে চাইবে! কোন আশা নেই, কোন আশা নেই, ও রে আর যে আমার কোনই আশা নেই রে—!”

সে রাত্রে আরও একখানা আরজেন্ট টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া তাহার উত্তরের প্রত্যাশা করা হইতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার মল্লিকের খানসামাটা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণার গৃহদ্বারে দ্রুত করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল।—

“কি রে আব্দুল?” বলিয়া কৃষ্ণ নৈশবাসের উপরেই একটা শাড়ী ও জ্যাকেট টানিয়া জড়াইয়া বাহিরে আসিতেই সে খবর দিল, “ডাক্তার-সাহেব কি রকম শব্দ করছেন, কথা কইছেন না; নড়ছেন না; আপনি একবার আসুন।”

উহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া ভীতা কৃষ্ণ উর্দ্ধ্বাশ্রিত ছুটিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিতেই তাহার কণ্ঠে প্রবেশ করিল—
“আফটার অল্ ইট আর রাইট মাই চাইল্ড! আই অ্যাম ডিসিভড্—মোট কুয়েল্লী ডিসিভড্। ওঃ তরুণ!—তরুণ! তুমি এই করলে?”—

আর কোন সাড়াই সে পাইল না।

ডাক্তার আসিয়া মত্তব্য করিলেন, “হাট ফেলি-ওর।”—

সন্ধ্যা-তারকারা যথারীতিতে তাহাদের নিত্যব্রত পালন করিতে নীল-সাগরের উপকূলে আসিয়া জমা হইয়াছে। মেঘপুঞ্জের অন্তরালে ক্ষণ অন্ত ক্ষণ সমুদিত চন্দ্র তাহার রূপালী আলো দিয়া সুখচ্ছঃের ক্রীড়ার মতই ক্ষণে ক্ষণে ধরণী-বন্ধকে আলো ছায়ায় বিচিত্রতর করিতেছিল। ডাক্তার মল্লিকের প্রকাণ্ড প্রাসাদ-ভবন এই ছায়া-কাকারের মধ্যে কি নিবিড় শোকাচ্ছন্ন ও অসহনীয় নিশ্চল মনে হইতেছিল! সাহায্যের মরুপ্রান্তরের মত সেই সজ্জাহীন, শ্রীহীন জন-বিরল বাড়ীখানি যেন উর্দ্ধ্বাশ্রিত হা হা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

মল্লিক-সাহেবের বিখ্যাত গৃহ-সজ্জার শেষ অংশ গোন্ধর গাড়ী বোঝাই হইয়া ম্যাকেঞ্জিলায়েলের নীলাম-ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করিতেছে, তেমন সময় একখানা টুনীটার কার আসিয়া এই বাড়ীর আইভি-জড়িত চারনা টবে বিলাতী তালে এবং বিচিত্র কোর্টনে-সজ্জিত গাড়ী-বারান্দায় প্রবেশ করিল। মিঃ লাহা তাহা হইতে ছুরিতে নামিয়া পড়িয়াই চারিদিকে নিজের বিস্মিত দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সামনের হল অন্ধকার, সিঁড়ির প্রথমে যে ধাতুময় কাফ্রিমূর্তির হাতে ইলেকট্রিক আলোর একটা ঝাড় ছিল, সেটা নাই। ছবি, আরসি, কার্পেট, চারনা পোরসিলেনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টব, সবই গিয়াছে। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সিঁড়ি অতি ক্রম করিয়া স্পন্দিত-বক্ষে প্রত্যেক জনহীন নিরা-লোক ও স্তম্ভস্বয় ঘরগুলোকে অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে ডাক্তারের শয়নকক্ষে আলো জলিতে দেখিয়া অর্ধ আশ্চর্য্যভাবে মিঃ লাহা সেই

ঘরেই প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রবেশমাত্র তাহার সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইয়া আসিল। ডাক্তারের শূণ্য-গৃহেও তাহার পরিচিত সাজসজ্জা কিছুই বর্তমান নাই, শুধু শয্যাহীন খাটের উপর কে একজন আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে।

তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে তরুণচন্দ্রের বিলম্ব হইল না।

“বেবি! বেবি! আমি এসেছি। আজ আমি আমার অসহ্য বন্ধন হ’তে মুক্ত হয়ে তোমায় পাবার যোগ্যতা এবং দাবী নিয়েই এসেছি।”

তরুণচন্দ্র কৃষ্ণের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের উপর নিজের মমতাপূর্ণ হাত স্থানান্তরিত রাখিলেন। “বড় দুঃখ যে আর একটি দিন আগে আসতে কিছুতেই পারলুম না! গত-রাত্রে আমার জীবন মৃত্যু হয়েছে এবং—”

ধীরে—অতি ধীরে মিঃ লাহার স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া কৃষ্ণ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তার পর নিজের স্থির কটাক্ষ তরুণ-চন্দ্রের বিজয়-গৌরবানন্দ-পরিপূর্ণ অখণ্ড সমরোচিত ভাবে ঈষৎ গাভীরাম্য দৃষ্টির উপর নিবদ্ধ করিয়া শান্ত অখণ্ড স্মৃতিস্বরে কহিল;—

“কিন্তু আপনাকে দরকার আমার যে এখন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনয়ের পরেশনাথ পাহাড়ের কাজে আশানুরূপ ফল মিলিল না। অন্তর-বাহিরে বণিকবৃত্ত মাড়োয়ারীরা বিলাতী পণ্য-বর্জ্জনে সহজে কেহ সম্মত হইতে চাহে না। ছ’ এক জন ছাড়া সবাই বলে, “বাবুসাহেব! ‘বাতে ছ’ পয়সা লাভ, তাই করবো কি ব্যবসা ফেল করতে ব’সে বাব?” কেহ বলিল, “আরে যান্ যান্, বাবুসাহেব!—আপনাদের তো হুজুকে মাতা! আজ এই কথা বলছেন, আবার কালই চাই কি, একটা চাকরী পেয়ে গেলে কলারের নীচে টাই বেঁধে দিবি সাহেব ব’নে যাবেন। তখন ঐ খদ্দেরের বোঝা আমি বেচবো কাকে? আপনাদের কি বেশী দিন সহ্য করার শক্তি আছে?”

বিনয়ের দল এই শ্রাস্তসম্মত নির্বিকার প্রচেষ্টার স্থানিক-সম্বন্ধে অশেষ-বিশেষ আশা দিয়া

বুঝাইতে লাগিল। তাহার। বলিল, ইতঃপূর্বে ছ' একটা চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ সে সব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জত ভাবে করা হয় নাই। কোথায়ও বা ঐ চেষ্টার পথ সঙ্গীর্ণ ও জটিলতাপূর্ণ অধর্মমূলক হইয়া পড়িয়াছিল। এবার তাহা নহে। তত্ত্বিন্ন এবার নেতৃত্বশক্তিসম্পন্ন নেতার অভাব ঘটিবে না বলিয়া দেশ আশা করিতেছে। এই মহৎ কার্যে মহাপ্রাণ নেতা ব্যতীত কখনই কার্য-সাফল্যের ভরসা থাকে না।

উহাদের সঙ্গে দুইটি শিক্ষিত বাঙালী ছিলেন। তাঁরা বলিলেন;—মানুষ-নেতার দ্বারা হইবে না, তবে যদি ভগবান্ নিজে আবার অবতরণ করেন, তা হ'লে কি হয় বলা যায় না।—

ছেলেরা বলিল, তিনি মানুষের মধ্য দিয়েই তো এসে থাকেন। গীতায় বলেছেন;—

“পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দ্রুততাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥”

উহারা বলিলেন, “তিনি সাধুদেরই পরিব্রাণের জন্য আগমন করিতে প্রস্তুত আছেন, তোমরা এবং আমরা কি সাধু?”

ছেলেরা বলিল, “না, কিন্তু হ'তে হবে। জন্মগত সাধু বা সাধক যিনি, তিনিই তো ভগবানের অবতার। সবাই সে কপিল বশিষ্ঠ শুকদেব বা সনক-সনন্দন সনৎকুমার হবে না। কিন্তু বিশ্বামিত্র হ'তে পারে। মহা মহা পাপী ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেরও আদর্শ জননারকে পরিণত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যদি সে পাপ তার কেবলমাত্র শিক্ষা, সমাজ ও সম প্রভৃতি দ্বারা অমুষ্টিত শারীরিক পাপ হয়! কুটিল স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারটাই মনের কলুষ। সেটা নষ্ট হওয়া দীর্ঘকালসাধ্য, হয় তো অমর লতার মত তার জড় কখনই মরে না।”

“কিন্তু ধরুন, আপনারা এই কম-বয়সী ছেলে, আপনাদের কি নেতা হবার শক্তি আছে মনে করেন? আপনাদের মান্বে কে? আর যারা মান্বে, তাদের যে আপনারা ঠিক পথেই নিয়ে যেতে পারবেন, তার প্রমাণ কি?”

ছেলেরা বলিল—“এ সন্দেহ অমূলক নয়। এই জন্ত ‘অন্ধেনৈব নীয়মানাঙ্কা যথা’ গোছ ভ্রান্তি একটা তো ব'টে যাবার ভয় আমাদেরও সর্বদাই করতে হয়। এ সব বড় বড় কাজের ‘অর্গানাইজ’ করাই তো সব চাইতে ভাবনার জিনিস। তবে প্রকৃত নেতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন এক জন মহাত্মার যদি অভ্যুদয় ঘটে, তা

হ'লে তাঁরই দৃষ্টান্তে ও প্রভাবে শত শত মধ্যশ্রেণীর দেশ-সেবক তৈরি হ'তে বাকী থাকে না। প্রধান পরিচালনভার সেই একমাত্র নেতৃপুরুষের হস্তেই স্তম্ভ থাকবে, আর তাঁর অধীনে কেন্দ্রে কেন্দ্রে এক-জন ক'রে প্রধান ও অপ্রধান যত জন হয়, কার্য-নির্বাহক থাকা চাই। এককে পেলে বহুকে পাওয়া কঠিন হবে না। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই এই নীতির অনুসরণে কাজ হয়ে থাকে। স্বদেশের সাধনায়, স্বদেশের পুনরুত্থানে, নূতন ভাব-প্রচারে এবং অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ-ঘোষণাতেও সর্বত্রই এই একই পন্থা। ‘কমান্ডার-ইন্-চিফ্’ একই জন, এবং তাঁরই যথার্থ উপযুক্ততার প্রয়োজন। বাকি ছ-দশ জন ছাড়া সবই তো অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ।”

“কিন্তু ‘নেতা’ হবার যোগ্যতা তাঁর আছে কি না বুঝতে পারবো কি দেখে?”

একটি ছেলে কহিয়া উঠিল, “কেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্য-পুরাণ-স্বরূপ অমর-গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের ‘নেতৃ-প্রতীক্ষা’ প্রবন্ধটি প'ড়ে ফেলুন না; এবং সেই ভবিষ্যৎ-বেতার নেতৃ-পরিচয়ের সঙ্গে ‘নেতার’ লক্ষণ মিলিয়ে দেখে নিন। যদি সাড়ে তিনভাগও মেলে, সাড়ে তিনভাগও তো বিশ্বাস করতে পারবেন?”

বিনয় তাহাদের এই তর্কাতর্কির সব খবরটুকু সেই দিনেই বাসায় ফিরিয়া কৃষ্ণার পত্রে উপহার পাঠাইল। তার পর লিখিল,—যদি তোমার সামাজিক প্রবন্ধ পড়া না থাকে, সেইজন্য ঐ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রেই দিতেছি। আমি নিজে পূর্বে পড়ি নি, এখন প'ড়ে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হচ্ছি। কি অসাধারণ স্বপ্ন ও দুর্দৃষ্টির সহিত অনন্তসাধারণ ও অকৃত্রিম দেশপ্রেম! আজিকার এই ‘নন্-ভার্মো-লেন্স’ সম্বন্ধে বহু বহুকাল পূর্বেই তো তিনি পথ প্রদর্শন ক'রে গেছেন এবং নিজের জীবনের আদর্শে স্বদেশের সর্বপ্রকার উপকারে ও দেশীয় শিল্পের সাধনায় দেশকে আমন্ত্রণ করেছেন। সমস্ত বই-খানাই তোমার পাঠাতে সাধ হচ্ছে! কারণ, এর কোনখানটাই তো বাদ দেবার দেখাছিনে। তবে আজ শুধু ঐটুকুই পাঠাই। যদি ইচ্ছা হয়—বইখানাও আনিয়া পড়ো, বা আমার লিখো, আমি পাঠিয়ে দেবো।—

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহায়ভূতি-প্রয়াসী হইবেন।

(২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরম্পর সম্মিলন-সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন।

হুতরাং অধিকারি-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপূর্ণতা না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন।

(৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাস্বত্বের সন্নিবেশ করিবেন।

(৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে।

(৫) তিনি স্বর্ধ্যদেবের জ্ঞান ভারতাকাশের পূর্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মি-জালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নিকষিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-মত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোপুণের সম্মিলন থাকিবে। একরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্‌বাণ্য স্বরণ করিবে।

“যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভব ॥”

যাহাতে প্রভা, শ্রী ও তেজঃ দেখিবে, তাহাই আমার তেজের অংশসম্মত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাসমাত্র যাহাতে পাইবে, তাঁহারই গৌরব-বুদ্ধির চেষ্টা করিবে।—

তোমার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

বিনয়শীল।

সেই দিনের ডাকেই আর একখানা পত্রও কৃষ্ণার হস্তগত হইল।—

আমার প্রিয়তমা কিষণ !

সে দিন তোমার অদ্ভুত আচরণের জন্ত আমি কিছুমাত্রও বিস্মিত হই নাই। একসঙ্গে এত বড় বড় বিপৎপাতে আমাদের মত সবলচিত্ত পুরুষেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। তুমি তো কোমলমতি বালিকা মাত্র।

বেবি ! এত বড় কাণ্ডটি যে ঘটয়া গিয়াছে, সে কথা আমার তোমরা কেহই তো স্পষ্ট করিয়া লেখ নাই ? আমি মনে করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার বাবা আমাকে কাছে পাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া তার দিতেছেন, সুযোগ পাইলেই যাইব। তোমার পাঠান টেলিগ্রামখানি, সেই আমার চির জঁপিত, ইহ-পরকালের সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ আমারই নিতান্ত মনভাগ্যবশে যখন আসিয়া

পৌছিল, তখন আমি যশোরে উপস্থিত ছিলাম না। সরকারী কাজে বনগাঁ গিয়াছিলাম। কাজেই উহা পাইতে এক দিন বিলম্ব ঘটিল। তখন কাজ ফেলিয়া আসিবার উপায়মাত্র ছিল না, সেখানে তখন দাঙ্গার সম্ভাবনা চলিতেছে, আমার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যাই হোক, আমার অধবা বিলম্বে তোমার বাবা হয় তো আমার উপর বিশ্বাসহারা হইয়াই চলিয়া গেলেন, এ পরিতাপ আমার যে মরিলেও যাইবে না। তবে তুমি।—চির-আদরের বেবি আমার ! আমার মন প্রাণ যে চির-তোমাময়, তা কি তুমি কোন কিছুতেই ভুলতে পেরেচ ? তা যে পারো নি—সে তো তোমার এই ছুদিন বিচ্ছেদের পরেই চির-মিলনের আগ্রহ প্রকাশেই প্রমাণ দিচ্ছে।

তোমার বাড়ী আমি জঙ্গীলালদের কাছে থেকে তোমারই নামে কিনে নিয়েছি। (তাদের দুর্ভাগ্য-বহারে আমি নিজের জন্তই নিরতিশয় লজ্জিত ও সন্তপ্ত !) তোমার ফার্নিচার সমস্তই ‘সেল’ থেকে কিনে ফেলেছি, ভগবানপ্রসাদের কাছে তোমার গহনা সমস্তই জমা দেওয়া আছে। এ ভিন্ন তোমার আরও দুইটা সুসংবাদ দিই। এই মাস থেকে আমি কনকারড হলেম। আর আমার এক অপূত্রক জ্যেষ্ঠামশাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির (প্রায় আট দশ লক্ষ টাকার কম নয়) অধিকার আমিই পেয়েছি। আর একটা কথা;—আমার ৬ভূতপূর্বা পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার, (তার মধ্যে শ্রীপুরের মল্লিক-বংশের পারিবারিক বিখ্যাত মুক্তামালাটাও আছে—সেটার দাম জহুরীদের মতে লাখ টাকার কম হবে না ! আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ এটা পাঠান-রাজাদের কাছে পুরস্কার পেয়েছিলেন ওনোছ।) সে সকলই আজ তোমার। আর তার সঙ্গে আমার মন-প্রাণ সে তো তোমারই ছিল, এখন আমাকেও তুমি নিজের করে নাও, আর কি প্রতীক্ষা করা যায় বোব ? না, আর না, অনেক দেবী হয়ে গেছে, ইতোমধ্যেই।—

এখন একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সম্পন্ন হইতে বাকী আছে। যে অসং লোক তোমার ও আমার নামে অধবা ও অকথ্য গানি সহস্র লোকের মাঝখানে প্রচার করিয়া তোমার ও আমার অবমানিত অপদস্থ করিয়াছিল, যার জন্ত আমার পবিত্র-স্বভাবা চিরস্বথ-লালিতা, আনন্দময়ী কিষণ আজ জনসাধারণের হাঙ্গ-কোতুরের পাজী—সেই অহেতুক বৈরসাধনকারীর সমুচিত শাস্তি-বিধান-টুকুই বাকী আছে। মনে পড়ে বেবি ! তুমি

সে দিনে নিতান্তই মর্মান্তিক-চিত্তে ঐ পাষাণকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। তার পর দেশ-সেবার ছদ্মবেশে, তার কার্য-কলাপ পর্যবেক্ষণ জন্য তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাদের গুপ্ত-চক্রের কতদূর সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, সে সব আমার এখনও ভাল করিয়া শোনা হয় নাই। এমন অবসর পাই না যে, একটি দিন তোমার কাছে কাটাইয়া আসি।—তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিনয় শীলের সঙ্কট-কাল আর খুব বেশী দূরে নাই। শীঘ্রই সে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবে।—এই সময় যদি দেশ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে—যদি কেহ তাহাকে ইহার জন্য প্রস্তুত করে, তবেই তাহার রক্ষা! নতুবা স্থির জেনো বেবি! তাকে চির-নির্বাসন-দণ্ড হ'তে কেহই রক্ষা করতে পারবে না—তার পর বিনয় শীলের নির্বাসনের দিনেই যদি আমাদের শুভ-বিবাহোৎসবটা সম্পন্ন করা যায়, তা হ'লে কেমন হয়? তোমার প্রতিশোধ-স্পৃহাটা সম্পূর্ণরূপেই মেটে না কি? কি বল? আমার প্রচুরতর ভালবাসা ও আদর আমার চির-আদরিণী বেবিকে দিলাম!—

তোমার চিরানুগত—তরুণ।

নবম পরিচ্ছেদ

বিনয় এত দিন বালকের মত সদানন্দচিত্ত ও আপনা-ভোলাভাবে কাটাইয়া হঠাৎ এই কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণযৌবনের প্রথম আলাদীপ্তি নিজের অন্তরের মধ্যে বেশ স্পষ্ট করিয়াই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্যসখী উর্মিলার উপর তাহার যে ভাব, তাহাকে স্নেহ সৌহার্দ সব কিছুই বলা চলে, শুধু তাহা প্রেম নয়। কারণ, সে জিনিসটা স্থির স্নিগ্ধ এবং ব্যাপকভাবেই তাহার সর্বদেহের শোণিত-স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার সমুদয় মনকে অলক্ষ্য হইতে ছাইয়াছিল। পরীরমধ্যগত একান্ত প্রয়োজনীয় শ্বাস-বায়ুর মতই তাহা যেন স্বতই বর্তমান। যে বস্তুটাকে চিরদিন ধরিয়াই পাইয়া আসিতেছি, সেটা না পাওয়া পর্যন্ত তাহার অভাবটাকে কোনমতেই অনুভব করিতে পারা যায় না, এতই তাহা অভ্যস্ত হইয়া উঠে। উর্মিলাকেও তাহার বাল্য-কৈশোরাবধি

এতই সহিয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে বেঁঠন করিয়া ধরিয়া তাহার যৌবন জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। উর্মিলার চিরপরিচিত হাসি-কান্না, তাহার যৌবনোত্তমে চপল-চিত্তকে সুখে-দুখে আশার পুঙ্কে নিরাশার অন্ধকারে ডোবা-ওঠা করায় না, তাহার চঞ্চল পদক্ষেপধ্বনি তাহার সর্বশরীরের উন্নত বেগে প্রবাহিত রক্তের তালে তাল দেয় না, তাহার হাসির ও গলার সুর তাহার সর্বক্ষেপুলক-তাড়িতের কণ্ঠনা বাজায় না। তাহার অধীর অভিমান-ক্ষুরিত ক্ষুদ্র ও রক্তিম অধর তাহার অধীর ও উদ্বেল হৃদয়কে ত্রুণিত করিয়া তুলে না। কারণ, সে উর্মিলা,—তাহার সব দিনের পাওয়া, নিজের অঙ্গশোণিতেরই একটি বিন্দুর মতই নিজস্ব উর্মিলা। ইহাকে নূতন করিয়া যে আবার নিজের অন্তরের কোনও খানে, কোন অপ্রাপ্ত-প্রদেশে এখনও পাইতে বাকী থাকিও সম্ভব, সে কথাটা বড় সহজ বলিয়াই সহজে মনে পড়ে নাই।

এক দিন নব-বসন্ত-সমাগমে চিরদিনের অনাদৃত উপবনের মতই তরুণী কৃষ্ণা এই বিস্মৃত-যৌবন চঞ্চল-মতি তরুণ-চিত্তকে আকস্মিক প্রাপ্ত যৌবনোচ্ছ্বাসে ভরাইয়া তুলিল। তাহার পদস্পর্শে অশোক মুঞ্জরিত হইল, তাহার হাসি-গানে এত দিনের মুকীভূত কোকিল-পাখিয়া পঞ্চমে সপ্তমে গাহিয়া উঠিল। কৃষ্ণার প্রতি নিজের শ্রদ্ধা প্রীতি যে ক্রমশঃই প্রবল আবেগ ও তীব্র আকর্ষণজনক প্রেমে পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথাটা তাহার নিজের কাছে সেই দিনই একান্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে অবসরপ্রাপ্ত হইল, যে দিন মিঃ লাহাকে কৃষ্ণার প্রত্যাখ্যান করার সংবাদটা সে তাহারই মুখ হইতে জানিতে পারিল।—প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝখানেই তাহার আনন্দোৎসবের মুক্তধারা সহসাই ঘোর নিরানন্দে পরিবর্তিত হইয়া ধামিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণা তরুণ লাহার হইল না, এ অতি সুসংবাদ বটে; কিন্তু বিনয়েরও তো তাহাকে নিজের মনে করিতে পারিবার কোন-রূপ সাধ্য নাই! বিনয়ের মন ক্ষণিক আত্মাদিত ক্ষণপ্রভাবৎ চঞ্চল ও তেমনি তীব্র গভীর সুখের অনুভূতিটুকু প্রাপণ-বলে বৃকের মধ্যে কান্না-লের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যাহাকে ছাড়া একান্ত দুঃসাধ্য—এবং হয় তো বা অসাধ্য বলিয়াই তাহার বোধ হইতেছে, তাহাকে, এমন কি, তাহার স্মৃতিটুকুকে পর্যন্ত নিঃশেষ করিয়াই তাহার মন হইতে মুছিতে হইবে। এর চেয়ে যদি সে লাহার স্ত্রী হইতে স্বীকৃত

ধাকিত, তবে হয় তো পরনারী-হিসাবে তাহার প্রতি নিজের মনোভাবকে সে কোন মতেই এতটুকু প্রশ্রয় দিতে সাহসী হইত না, এবং তাহার নিজের মনের কাছেও এই তাঁর অনুভূতিটা অস্পষ্টই থাকিয়া যাইত।—কৃষ্ণাকে ভুলিবার সঙ্কল্প লইয়াই সে কলিকাতার বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নিজের ভ্রান্তি তাহার নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণার স্মৃতি আজ শত শত কোণ দূরেও যে তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবিয়া দেখিল, তাহার ধ্যানে সে দিবারাত্রের মধ্যে অল্প সময়ই শুধু ডুবিয়া থাকে না। দেশ-সেবার মধ্যেও সেই তারই প্রতি কার্য্য, প্রতি উদ্ভম, নির্ভীক ও শাস্ত ধৈর্য্যপূর্ণ ও উৎসাহিত আচরণ তাহাকে যেন সমধিক উজ্জল ভাস্কর-মূর্তিতে তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বিনয়ের মনে হইল, তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারিলে তাহার কর্ম্মোদ্ভম শতগুণেই যেন বর্দ্ধিত হইতে পারে। তাহাকে ছাড়িলে আজ এ পথেও সে নিঃশব্দ ফকীর।

সঙ্কল্প পরিবর্তিত করিল।—সে ভাবিল, মনে মনে আমি যদি তাহাকেই চিরদিন ভালবাসি, গোপনে—পূজা করি, তাহাতে ক্ষতি কি? এ কথা সে না জানিলেই হইল। সে তো আমি জানিতে দিব না। অথবা যদি কোন মতে জানিতেও পারে, পারিলই। আমি কায়মনোবাক্যে কখনই আমার এই অন্তরের গোপন সাধনাকে, পূজার উপচারকে, বাহিরের ভোগের উপাদান করিয়া ফেলিব না, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কাছে দাঁড়াইয়া নিজের এই দুর্বল অন্তরকে যদি এতটুকু একটুখানি উৎসাহের স্পর্শ বুলাইয়া সামর্থ্যশীল করিয়া লইতে পারি, ছাড়িব কেন? আমার পক্ষ হইতে তাহার কোনরূপ শাস্তির সূত্রে ব্যাঘাত আমি মরিলেও ঘটতে দিব না, ইহা স্থির।

বিনয় কলিকাতা যাত্রা করিল। বাঁকিপুর, আরা, বক্রার ও বেনারসে পাঁচ সাত দিন মাত্র তাহার থাকা ঘটিয়াছিল; বেশী বিলম্ব তাহার আবেগ-চঞ্চল চিত্ত সহিতে পারিতেছিল না।—তু-এক রকম চরকার নমুনা সে সঙ্গে করিয়া লইল।

ট্রেনে সে খার্ডকানের টিকিট লইয়াছিল। গাড়ীতে বেজার ভিড়। তিল-ধারণের স্থান আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বৈগুনাথ পার হইলে দেখা গেল, সেই জনারুণা—রাত্রে বাহাদের লইয়া অন্ধকূপ-হত্যার উপক্রম ঘটিয়াছিল, একগুণে, তাহাদের মধ্যে

বিনয় এবং কেবল আর একটুমাত্র বাঙ্গালী ঐ কামরাটিতে বাকী পড়িয়া গিয়াছে। বেহারীর ভিড় বেহারের সীমানাতেই নিঃশেষ হইয়াছিল।

এই লোকটির সঙ্গে বিনয়ের একটুখানি আলাপ জমিয়াছিল। বিনয়ের চেয়ে বয়সে বৎসর দশেকের বড়, বড় বড় করিয়া রক্ষিত মাথার চুল, ছাঁটা দাড়ি, একটি ছোট টিনের পেটরা, একটা ক্যান্সিসের আধ-ময়লা ব্যাগ ও ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলীর সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধা একখানা পুরাতন তালি-সেলাই ও তৎসঙ্গেও স্থানে স্থানে ছিদ্রওয়ালা ছাতা। থেলো হাঁকায় রে মধ্যে মধ্যে টিনের কোঁটা হইতে বাহির বরিয়া তামাক সাজিয়া খাইতেছিল। বিনয়কে তামাক খাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া সে তাহার পকেট হইতে কলাপাতা-জড়ান সাজা পান বাহির করিয়া দিতে গেল। পুনশ্চ হাসিয়া ও বিনীতভাবে বিনয় তাহার সাগ্রহ উপহারকে প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু একটি জিনিসকে শুধু পারিল না। ঐ দরিদ্র ব্যক্তির পরণে হাতে-কাটা মোটা সূতার খাটো ধুতি। বিনয় তাহার কিম্বত আকার ও আচার সঙ্গেও মনে মনে সশ্রদ্ধভাবে প্রণাম করিল, বাহিরে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মেমারি-নিবাসী অশিক্ষিত দরিদ্র হরিপদ বাগ শিক্ষিত সুসভ্য ও ধনি-সন্তান বিনয়কুমারের অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিল।

কথায় কথায় হরিপদ হুঃখ করিয়া বলিল, “দেখুন না মশাই, মেয়েটা খুত্তর-বাড়ী চ’লে গেল, এমনি ভুলো মন সব, পেটরাটি তার ফেলে গাছে, কেমন ক’রেই বা পৌছে দিই! আবার কতকগুলো টাকা খরচ হবে, গরীর ছাঁপোষা মানুষ মশাই, কোথা থেকে কি পাই বলুন না? কাচ্চা-বাচ্চা নিরে ছ’বেলায় দুটো মুটো খেতেই আঁটে না! গরীব তারাও মশাই! আমারই মতন গরীব তারা, আবার যে দু’খানা হঠাৎ কিনে দেবে, তারও তো বুগ্যতা নেই। চাবিট নে’ গেল, বাস্কেটা কি না রইলো প’ড়ে!” একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

দীর্ঘ হইয়া বিনয় সমস্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার মেয়ের খুত্তর-বাড়ী কোথায়? আমি না হয় পৌছে দোব। আমি তো ক’ল-কাতাতেই যাচ্ছি।”

“বলেন কি বাবু! আপনি পৌছে দেবেন! আমাদের জন্তে এত কষ্ট আপনি কেন স্বীকার করতে যাবেন!”

বিনয় কহিল,—“আমার কোন কাজ মেমারীতে পড়লে আমি যদি তোমায় লিখে পাঠাই, তুমি বি

ক'রে দেবে না ? পরস্পরের সাহায্য পরস্পরকে তো করতেই হয়। তাদের ঠিকানাট বলা তো, আমি লিখে নিই।”

“সাত নম্বর.....লেন। খণ্ডের নাম রত্নেশ্বর হাতি, আমার মেয়ের নাম কুমুম। জামাই সর্বেশ্বর হাতি।”

বিনয় কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া উক্ত নাম-ধাম সমূহ লিখিয়া লইল, উপরন্তু হরিপদর ঠিকানাটা শুদ্ধ টুকিয়া লইতে তুলিল না।—

টিনের সেই ছোট পেটারটা রাখিয়া মেমারী ষ্টেশনে হরিপদ বাগ ট্রেন হইতে নামিয়া গেল। আর এক জন ভদ্রলোক আসিয়া সেই কামরার উঠিয়া বসিলেন। ইহারও গম্যস্থল কলিকাতা।

ট্রেনখানা কলিকাতার যতই নিকটবর্তী হইয়া আসিতে লাগিল, ততই কি একটা গোপন স্থানে বিনয়কুমারের মনের মধ্যটা যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালার সুজলা সুফলা গ্রামলা ছবি কয় দিনের অদর্শনেই তাহার বিরহ-বিধুর চিত্তে যেন নব-সম্মিলিতা প্রিয়ার মুখপদ্মের মতই অপক্লপ ও নবীন সৌন্দর্যালোকের সমাবেশ করিয়া তুলিল। চারি পাশে নবকিশলয়বিমণ্ডিত হরিৎ ক্ষেত্রসমূহ, তাহার কিনারায় কিনারায় সুপ্রচুর বর্ষা-বারি-সঞ্চিত জলাশয়, কুমুদ-কল্লার ও শেত ও রক্ত পদ্মখচিত শোভায় সেই পবন-চঞ্চল নির্মল সলিলাসন-গুলি বঙ্গ-লক্ষীর নিজস্ব কমলাসনবৎ পরমরমণীয় শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চাহিয়া থাকিলে চোখ যেন কিরিতে চাহে না। স্থানে স্থানে মজিয়া আসা নদীর উপর সেতু দিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। অপ্রশস্ত জলের ধারা বর্ষায় কিছু কিছু প্রশস্ততা লাভ করিতে পারিয়াছে মাত্র। হুঁধারে পরিত্যক্ত গ্রামের উপর অমলসমুদ্র নিবিড় অরণ্যানী বাঙ্গালীর অক্ষমতার জলন্ত সাক্ষ্যরূপে ম্যালেরিয়া-ধ্বংসকারী বীজ সৃজন করিতেছে। বিনয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসিল। এই সুবর্ণ-প্রসূ বাঙ্গালার মাটি অনর্থক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে; আর বাঙ্গালীর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেও ধুমাচ্ছাদিত জন-অধুষিত সহরের বুকের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিতে করিতে শ্বাসকষ্ট্র তায় প্রাণ হারাইতেছে। এই সব নদীতীর, ক্ষেত্র-খামার, বাগান-বাগিচা অনাবাদী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালীর ছেলে সাহেবের জুতা ও গালি খাইয়া অন্ধাধনে কলম পিষিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে।—কিন্তু করিতে পারিতেছে কি?—

ক্রমে ছোট বড় সহর ও পল্লী আসিয়া আসিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এক একটার জনমানবের সাড়া প্রচুরভাবেই পাওয়া যায়, এক একটা যেন রাক্ষসের কবলে পতিত জনহীনা পুরীর জায় নিস্তর। বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকা রুদ্ধদার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝিল, পুষ্করিণী কলমী-দামে হরিষর্গ, কুটীরনিবাসী দরিদ্র ভাগ্যবানের ভাগ্যছায়া-বাঞ্ছিত ছর্ভাগ্য-সঞ্চিতস্থলে কার্যক্রেমে দিনাতিপাত করিতেছে। বিনয়ের চিত্তে তাহার নিজের পরিত্যক্ত স্বগ্রামের ছবিখানি জাগিয়া উঠিয়া তাহার জন্ত প্রভূত পরিমাণে মমতা ও সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের চিম্নি উদ্ধাকাশকেও যতখানি সম্ভব বর্তমান সভ্যতার তপ্তাশ্বাসে সজ্জ্ব করিয়া তুলিয়া নিজেদের গৌরবগাথা ধ্বজ-রেখায় তাহারই গায়ের অঙ্কিত করিতেছিল। এখানে এঞ্জিনের বিকট গর্জন, ওখানে অসংখ্য মোটর-কারের উদ্ভূত তর্জ্জন, নানা দিগ্দেশস্থ যান্ত্রিদলের কলকল কলকল শব্দে শব্দ-মুখরিত কলিকাতার মুখপাত্র হাওড়া-ষ্টেশন দেখা দিল। বিনয়ের মনে হইল, গাড়ীতে উঠিয়া একখানা তার করিয়া দিলে হয় তো এখনই তাহার বুদ্ধিক্রিত দৃষ্টির সমুদয় ক্ষুধা মিটাইয়া দিয়া কৃষ্ণার মুখ-পদ্ম ফুটিয়া থাকতে পারিত।

প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দল পুলিশ কনষ্টেবল সঙ্গে বে ইউনিফর্ম পরা সাহেবটি দাঁড়াইয়া-ছিলেন, বিনয়ের সঙ্গী অপর ভদ্রলোকটি একটু-খানি ইঙ্গিত করিতেই তাহার বিনয়ের পথ-রোধ করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।—বিস্মিত হইয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, “এ কি!”

পুলিশ-সার্জেন্ট কহিলেন, “আপনাকে আমরা আরেষ্ট করলুম। এই দেখুন বিনয়কুমার শীলের নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে।”

গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা পাঠ করিয়া বিনয় দেখিল, তাহাকে ষড়যন্ত্রের চার্জের ধরা হইয়াছে।

গাড়ীতে উঠিয়া সে কহিল, “এই টিনের বাগ্গটা সাত নম্বর.....লেনে রত্নেশ্বর হাতির বাড়ী পৌছে দেবার তার—আমি অপরের কাছ থেকে নিয়েছি, এইটুকু শেষ করতে দিলেই আর আমার কোথাও যেতে আপত্তি নেই। আপনারা সঙ্গে থেকে এই দায়টা চুকিয়ে নিতে দিন।”

ছদ্মবেশী ডিটেক্টিভ, মুচকি হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, “বেশ; কিন্তু তার আগে ওটা আমাদের খুলে দেখতে হবে।”

বিনয় কহিল, “ওর চাবি আমি পাই নি, ওখু

বাক্সটা পৌছে দেবার ভার পেয়েছি, ইচ্ছা হয় তাদের বাড়ী গিয়েই খুলিয়ে দেখতে পারেন।”

পুলিস-ইন্সপেক্টর আবার সেই রকম একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল। বলিল, “তা’ আমাদের নিয়ম নয়। লালবাজারে গিয়ে ‘সার্চ’ করবার পর এটা আমরাই যথাস্থানে পৌছে দেবার বন্দোবস্ত করবো।”

বিনয় আর কিছুই বলিল না।

বাক্সটা খোলা হইবামাত্র একটা বিষধর সর্পকে ফণা তুলিয়া দংশনোত্তর দেখিলে মাহুষ যেমন করিয়া আংকাইয়া আর্ন্তনাদ করিয়া উঠে, বিনয়ের মুখ দিয়া আচম্কা তেমনতর ভয় ও বিশ্বয়ের যুগপৎ মিশ্রণে সৃজিত একটা আর্ন্তস্বর নির্গত হইয়া গেল।

সে বাক্সটার ছিল, একজোড়া রিভলবার এবং কয়েকটা কাটিজ।

দশম পরিচ্ছেদ

বিনয়ের ধরাপড়া ব্যাপারটা লইয়া সমস্ত দেশব্যবস্থ খুব বড় রকমই একটা হৈ চৈ লাগিয়া গেল। এই উপলক্ষে ইংরাজ-সম্পাদিত খবরের কাগজওয়ালারা খুব কষিয়া একবার দেশ-সেবকদিগকে আক্রমণ করিয়া লইল। তাঁহাদের বর্তমানে অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত ‘নন্-কো-অপারেসন’ যে ‘নন্-ভয়োলেন্স’ নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্ত এই একমাত্র উদাহরণকে তাঁহারা একসহস্রবারও অন্ততঃ উল্লিখিত ও উদাহৃত করিয়া তুলিয়া ‘কলমে’র পর ‘কলম’ ঐ একই কথা পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলসংযুক্ত করিতে ছাড়িলেন না। দেশীয় খবরের কাগজগুলি এই আকস্মিক পুলিস-আবিষ্কারে লজ্জায় প্রায় অধোবদন হইয়া রহিল। এই ঘটনায় কেহ কেহ স্পষ্টই রাগতঃ হইয়া যে চপলমতি অদূরদর্শী বালক নিজের অনাবশ্যক খেয়ালে পড়িয়া দেশের এই নূতন প্রচেষ্টাকে সন্দিগ্ধ ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে গিয়াছে, তাহারই উপর বৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার কষাঘাত করিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ, প্রকাশ পূর্বক পুলিসের কার্যাব্যবস্থা ও তাহাদের মস্তিষ্কের উর্বরতাকেও লক্ষ্য করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিল, যদি যথার্থই কোন এক জন বা এক দল লোক এই পবিত্র ব্রত ধারণের ছয়বেশের অন্তরালে এই প্রকার গুপ্ত চেষ্টায়

ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তবে সে বা তাহারা নিশ্চিতই দণ্ডনীয়। আবার কেহ ইহার ঈষৎ মাত্রার সংশোধন করিয়া দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, হাঁ—সে কথা সত্য বটে, তবে কি না বড়বল্লভ বাস্তবিকই নন্-কো-অপারেটরের, অথবা পুলিসের কৃত, সেটি বিশেষভাবে অনুসন্ধান পূর্বক, নিরপেক্ষ ত্রায়বিচার অনুমোদিতভাবে দোষীর দণ্ডবিধান করা হউক। তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সহানুভূতি থাকা সম্ভব বটে। অপরাধীকে প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের নবরোপিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করা, নরমপন্থী—কি চরমপন্থী অথবা নিরপেক্ষ পন্থার লোক কাহারই অভিপ্রেত নহে।

খবরের কাগজের কল্যাণে এ সংবাদ বিনয়ের বাড়ীতেও রাষ্ট্র হইতে বাকী ছিল না। শুনিয়াই জগদ্ধাত্রী ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছা যাইতে লাগিলেন এবং উন্মিলা যে বিছানা বইয়া শুইল, সেখান হইতে তাহাকে নড়াইতে কাহারও সাধ্য হইল না। তার পর প্রথম ধাক্কাটা কাটাঁইয়া সে জগদ্ধাত্রীর জবানীতে তাঁহারই শিক্ষা-মত একখানা পত্র নিজের ভগ্নীপতি তরুণচন্দ্রকে লিখিল। এত বড় বিপদে তাঁহার কথাই হু’জনকার একসঙ্গে মনে জাগিয়াছিল। এ জগতে তিনিই যে এখন উই-দের একমাত্র ভরসাস্থল। এখন, হু’জনকারই মনে হইতেছিল, তিনি তো পূর্বেই এ বিপদের আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। তখন বিশ্বাস করিয়াও যেন বিশ্বাস হয় নাই। সেই তো এখন ফলিল!

মিঃ লাহা পত্রের উত্তর দিলেন; “আমিও সংবাদ পাইয়াছি, মোকদ্দমা ভালরূপ তদ্বির যাহাতে হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ভয় কি?”

এক জন ম্যাগিষ্ট্রেট বলিতেছে ভয় নাই—এ অবস্থায় বতটুকু সাহসমালাভ সম্ভব, হু’টি জীলো-কেই তাহা করিলেন। কৃষ্ণা অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর হরিণবাড়ীর জেলে বিনয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিল, সে দিব্য প্রশান্ত-মুখে তখন নিজের কুঠরীতে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। সে তাহাকে নমস্কার করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইতেই বিনয় প্রতি-নমস্কার পূর্বক উঠিয়া সানন্দ অভ্যর্থনার সহিত তাহাকে স্বাগত জানাইল। তাহার বিমর্ষ ও ছল্‌ছলে মুখের ভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হাস্তের সহিত তাহাকে উৎফুল্ল করিতে চাহিয়া সাগ্রহে কহিল; “আহা, এখানে বসে বেশ স্বর-সাধনার সুবিধে। যদি একটা এসাজ বা সেতার দিত, দিব্য আরামে থাকা যেত।”

কৃষ্ণা একটা নিশ্বাস ফেলিল, এ কথাই হাসিতে পারিল না।

“আচ্ছা, আমি এই গানটা গাই, তুমি তো এ বিয়ের এক জন ওস্তাদ, শোন দেখি, সুরটা ঠিক হয় কি না?”—এই বলিয়াই নিজের সহস্র উজ্জল দৃষ্টি কৃষ্ণার যথাপূর্ব রাহগ্রস্ত মুখে তুলিয়া ধরিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, এবং তার পর গান ধরিল;—

“নিঠুর হে! এই করেছ ভাল।

এমনি ক’রে হৃদয়ে মোর তীর দহন জ্বল ॥

আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ সে তো নাহি ঢালে;
আমার এ দীপ না জ্বলিলে দেয় না সে তো আলো;—
এই ক’রেছ ভাল!”—

শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণার চোক দিয়া ছুটি বড় বড় জলের ফোটা টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া গেল এবং সে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া নিজের সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেই হাসি-মুখের কান্নাভরা কঠিন অনুযোগ নিম্পন্দ হইয়াই শুনিতে লাগিল। গানের ভাষায় হৃদয়কারই প্রাণের ভাষা একত্রিত হইয়া গিয়া তাহাদের উভয়েরই অন্তরে অন্তরে কাতর মূর্ছনার তাহা কাঁদিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। লুকান আবেগ বিপুল ও অসীম হইয়া উঠিয়া অশ্রু-নদীর কূল ছাপাইয়া পড়ে পড়ে হইল।

হঠাৎ গান থামাইয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর হাসি থামিলে সে বলিল, “হাসলুম কেন জানো?”

কৃষ্ণা চোক মুছিয়া ঘাড় নাড়িল।

“মনে হলো, তোমাকে আমার গান শোনা-
লুম, এবার তোমায় একটা শুনিয়ে দিতে অনুরোধ
করবো। তোমার গানের অতটাই খ্যাতি শুনেছি
বটে, তবে কখনই কানে শুনি নি। তার পরই
মনে হলো, এ জায়গাটা ঠিক সঙ্গীত-সমাজ বসবার
উপযোগী নাও হ’তে পারে। তুমি গাইবে একটা?
না, থাক্ কাজ নেই।”

কৃষ্ণার পা কাঁপিতেছিল, সে সেই অপরিষ্কৃত
মাটির উপর অপরিসর গৃহে বিনয়ের পায়ের কাছে
বসিয়া পড়িল। বিনয় তাহাকে বিশেষ কাতর
বুঝিয়া এবার আর হাসিল না। তাহার মুখের
দিকে চাহিয়া আর একটা নূতন সন্দেহ অতি
সহসাই তাহার মনের মধ্যে আসিয়া উদ্ভিত হইল।
অল্প কালের ভিতর বিনয়ের মনের মধ্যে অনেক-
খানিই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার স্বাভাবিক

তীক্ষ্ণ দী-সম্পন্ন উচ্চ-শিক্ষিত অন্তর, বয়সের অভি-
জ্ঞতা অল্প দিনেই লাভ করিয়া ফেলিয়াছিল। কণকাল
কৃষ্ণার জলভারাতুর মেঘের মতই অশ্রু-সজল রক্তিম
মুখচ্ছবি সতৃষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিয়াই সে ভরিতে
তাহার একখানা হাত টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে
তুলিয়া লইল।

“আমার জন্ত হুঃখিত হয়েছ?—কেন? জানতে
না কি যে আমাদের সকল প্রকার বিপদই অনি-
বার্য? তোমার নিজের অবস্থাটাও যে আমার
চাইতে বেশী নিরাপদ নয়, সে-ও কি তুমি জান না?”

কৃষ্ণা নিজের হাত সেই ভাবেই থাকিতে দিয়া
বৃষ্টি-শেষের রামধনুর মত একটুখানি রঙ্গীন হাসি
হাসিল,—“সে তো আমি জানিই। এ কিন্তু তুমি
শুধু শুধু মিথ্যা অভিযোগে হুঃখ পাচ্চো যে। আমি
তো তা পাবো না। তা হ’লে আমার কোন
হুঃখ যে হতো না। তুমি কি তোমার প্রতি হঠাৎ
এই ব্যবহারের জন্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষকে সন্দেহ
করো না?”

বিনয় পরম পরিতোষের সহিত কৃষ্ণার সেই হাত-
খানি আস্তে আস্তে তুলিয়া ধরিয়া তাহার উপর
নিজের মস্তক বারেকমাত্র সশ্রদ্ধভাবে স্পর্শ করিল।
তার পর সেখানি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ পূর্বক সানন্দ-
চিত্ত শিশুর মতই হাসিমুখে কহিল, “তাতেও আমার
অ’র কোন হুঃখ নেই। শুধু—যদি কাঁসী বাই
বা আন্দামান যেতে হয়, তখন তোমার আমার মা’র
আর উন্মিলার ভার দিয়ে যাব। উন্মিলা আমার
স্ত্রী। বড় ছোটবেলায় আমাদের বিয়ে হয়েছিল,
কখন স্ত্রী ব’লে মনে ক’রতে পারি নি, বন্ধুর মত,
ছায়ার মতই সে আমার বাল্য-জীবনের সঙ্গিনী ছিল,
আজও আছে।”

প্রহরী ডাকিয়া বলিল—“আর দেবী ক’রা যেতে
পারে না।”

কৃষ্ণা উঠিয়া ত্রিংশ-পদে বাহির হইয়া আসিল।

কৃষ্ণা চলিয়া গেলেও বিনয় সে দিন নিজের মনের
মধ্যে একটা নিগূঢ় ও অনাবিল আনন্দের তীর মধুর
স্বাদ যেন অসীম-ভাবেই অনুভব করিতে
লাগিল। সমস্ত অন্তর যেন তাহার সুবিমল ও
অপরিসীম আনন্দের প্রাবনে প্রাবিত হইয়া
গিয়াছে—এমনি অনুভূতির মধ্যে সে আপন-
হারা হইয়া নিজের অন্তরে ভরা সুখের
জ্যোৎস্নার একটুখানি ধারা সেই নির্জন ক্ষুদ্র
গহবরের অন্ধকার বক্ষে ঢালিয়া দিয়া গাহিতে
লাগিল।—

“এই লভিষ্ঠ সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হ’লো অঙ্গ মম, ধন্য হ’লো অন্তর।
সুন্দর, হে সুন্দর!”

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার এক জন বড় ব্যারিষ্টার এক দিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে বিস্তর বুঝাইলেন। বলিলেন, ‘আপনি নন-কো-অপারেটার’ হিসাবে ‘অ্যারেষ্ট’ হন নাই, অথচ অপরাধে আপনাকে ধরা হইয়াছে। এই ‘কন্স্পিরেসির’ চার্জের বিরুদ্ধে নিজেকে ‘ডিফেন্স’ করতে না দিয়ে আপনি যদি দণ্ড নেন, না হয় নিলেন;—কিন্তু বরাবরের জন্ত নন-কো-অপারেটারদের’ সম্বন্ধে গাল দেবার একটা মস্ত বড় সুযোগ দেওয়া হবে, সেইটের আমরা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারিনে। অতএব আপনার ইচ্ছা থাকুক না থাকুক, আমরা আপনাকে ডিফেন্স করতে ‘পাব্লিকের’ পক্ষ থেকে কতকটা বাধ্যই, এবং তা করবো।”

বিনয় হাসিয়া বলিল, “এ এক রকম সুন্দর জুলুম নয়। উভয়পক্ষই আমার উপর অত্যাচার চালালে, এই হরিণবাড়ীর জেলেও দেখছি আমার টেকা দায় হবে।”

ব্যারিষ্টার তাহার হাসি দেখিয়া একটুখানি হাসিলেন। তার পর বলিলেন, “আচ্ছা, ঐ টিনের পেটরাটার খবর বলুন দেখি?”—তার পর আগাগোড়া সব কথা গুনিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—“আপনার কি রাজনৈতিক ব্যাপার ভিন্নও অথচ সম্বন্ধেও কোন শত্রু থাকে আপনি সন্দেহ করেন?”

বিনয়ের তখন চট করিয়া কৃষ্ণার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। “তুমি কি তোমার হঠাৎ এ অবস্থার জন্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষকে সন্দেহ করো না?” সে একটুখানি ভাবিয়া দেখিল। তার পর অসংশয়ে চোক তুলিয়া জবাব দিল, “না।”

“ক্ষমা করবেন, কোন রকম ক’রে আমি জানতে পেরেচি; আপনার স্ত্রী-ই না কি আপনাকে ধরিয়ে দেবার প্রধান উদ্যোগী। তাঁর কাছ থেকে আপনার কি চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, তাতেই নাকি এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানা যায়।”

বিনয় দণ্ডাহতের ভাষা লাফাইয়া উঠিল—

“আমার স্ত্রী! উন্মিলা?—উন্মিলা আমার ধরিয়ে দিয়েছে। উন্মিলা?”

ব্যারিষ্টার মাথা নত করিলেন, “ঐ রকমই একটা খবর পেয়েছি, তবে ঠিক না হ’তেও পারে। তাঁর কোন এক জন আত্মীয় সিবিল-সার্কিসে আছেন, তাঁকেই না কি তিনি ডেকে পাঠিয়ে আপনার চিঠি দেন। তার পর আপনার ট্রান্স থেকেও এই চিঠির উত্তর তাঁর লেখা ঐ সম্বন্ধীয় একটা চিঠিও পাওয়া গেছে, আজ খবরের কাগজেও শুদ্ধ ব’লে এ সংবাদটা গেরিয়েছে দেখলুম। এটা কি রকম কিছু বুঝতে পারলেন? সত্যি কি ঐ রকম কথা আপনি তাঁর কোন চিঠিপত্রের কোথাও উল্লেখ ক’রে—”

বিনয় শুধু মাথা নাড়িল, “না।”

“আমারও এ ব্যাপারটা কিছু সন্দেহ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, সেই আত্মীয়টি কে বলতে পারেন? তাঁর নাম-টাম কিছু প্রকাশ পায় নি।”

বিনয়ের চিন্তা মেঘ-সমাজের-চিত্তে সহসা ঈষৎ চপলা-চমকের মতই একটা পুরাণো কথার স্মরণ হইল। উন্মিলার সবার চাইতে বড় বোন প্রমীলার স্বামী তাহার বিবাহের পরই বিলাত যায়। তার পর আর কখন তাহার খবর সে পায় নাই। মধ্যে একবার যেন শুনিয়াছিল, তিনি বিলাতেই কি বড় চাকরী পাইয়াছেন। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, অত খবরও রাখিত না। হইতে পারে, এই ব্যক্তিই সেই সিবিল-সার্কিসের আত্মীয়!—কিন্তু কে সে? ওঃ, আচ্ছা মিষ্টার লাহা!—মিষ্টার লাহাই কি সেই আত্মীয় হওয়া সম্ভব? ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা মিষ্টার লাহা যশো-হরের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পুরা নামটা আপনি কি জানেন?”

“জানি বৈ কি! টি, সি, লাহা—তরুণচন্দ্র লাহা।”

“তাঁর কি পূর্বে একবার বিয়ে হয়েছিল?”

“হ’য়েছিল কেন, তাঁর স্ত্রী তো এখনও জীবিতা রয়েছেন। তিনি পাগল ও যক্ষ্মারোগী। সে বেঁচে না থাকলে তো এত দিন কোন্‌কালে কলকাতায় বিখ্যাতা সুন্দরী মিস্‌ মল্লিক তাঁর স্ত্রী হতেন।”

“এক স্ত্রী বর্তমানেই তা হ’লে ঐ সঙ্গে এনুগেজ-মেন্ট হ’য়েছিল?”

ব্যারিষ্টার সাহেব হাসিয়া কহিলেন, “তাতে কি! বিয়ে তো আর হয় নি। সে স্ত্রীটা তো জীবন্ত। যাই হোক, বুঝতে পারলেন কিছু?”

বিনয়ের ছুই চোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে শুধু সংক্ষেপে উত্তর করিল, “বোধ হয়।”

বিনয়ের মনটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল। এক তো তাহার এই সম্পূর্ণরূপে অত্যাচার বন্দিবৃত্তিকে জনসাধারণে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে জানিয়াই তাহার মনটা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, তার উপর উন্মিলার কাণ্ডে তাহার মাথার ভিতরে আগুন ধরিয়া উঠিল। ত্যাগ তখনই সফল হয়, যখন তাহার সেই ত্যাগের মূল্য পাঁচ জনের শ্রদ্ধা দিয়া শোধ করিয়া দিতে পারে। এ তো আর তাহার নিকাম ত্যাগ নয়; এ যে প্রচণ্ড কামনাতেই ভরা আত্মোৎসর্গ। একে নীরবে সঁপিয়া দিতে প্রাণও চায় না, আর এর প্রয়োজনীয়তাও তা নয়। বুঝিবার এবং বুঝাইবার সহস্র প্রয়োজন যে ইহাতে লাগিয়া রহিয়াছে।—তার পর উন্মিলা! বিনয়ের অমূলক ঈর্ষ্যা-কলুষিত ম্যানি শুনিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশ্চয়ই সে বিনয়ের বিরুদ্ধে এই ঘোরতর ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। মিঃ তরুণচন্দ্র লাহার যে বিনয়ের প্রতি মর্মান্বিতিক আক্রোশের কারণ থাকা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, সেটা হুঁদিন আগে হইলে বিনয় হয় তো বিশ্বাস করিতেই পারিত না; এখন সহজেই পারে।

কিন্তু কি ভয়ানক নীচ এবং ঈর্ষ্যা-প্রবণ চিত্ত ঐ উন্মিলার? আশৈশবের সহচরী সকল সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গিনী চির-অপরিচিত পরের মুখের ছুইটা কথায় সে তাহাকে এত বড় অবিশ্বাস করিয়া বসিল, এবং এমন হিংস্র জন্তুর মত প্রতিশোধ গ্রহণ করিল! উন্মিলার প্রতি কবে কি অত্যাচার সে করিয়াছে? সে যখন বাহা আব্দার করিয়াছে, তখনই যত টাকাই খরচ হোক, তাহাকে যোগাইয়া দিতে ছাড়ে নাই। ছোট-বেলার কথা ছাড়িয়া দাও, বড় হইয়া অবধি কোন রূঢ় কথা কোন দিনই বলে নাই। আর কি করিবে? তবে কৃষ্ণা-সম্বন্ধে তার রাগ করিবার কি ঘটতে পারে? কৃষ্ণাকে সে ভালবাসিয়াছে, তা সে অস্বীকার করে না। করিবার কোনই কারণও নাই। কৃষ্ণার সংস্রবে আদিত্যে পাইলে কে না তাহাকে ভালবাসিবে? কিন্তু শুধু পরের মুখের একটা উড়ো খবরে নিজের চিরপরিচিত স্বামী—না হোক স্বামিরূপেই পরিচিত—তবু বন্ধুকেও এমন ঈর্ষ্যা-কলুষিত বজ্রবাণ হানিতে বাওয়া উন্মিলার কি উচিত হইয়াছে? তাহার মনের চোখে সেই বহু বৎসরের অস্পষ্টপ্রায় ঘটনাটা আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠিল।—সে যে দিন

তাহাকে ‘স্পাই’ বলিয়া নিজের ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল, সে দিনের কথা! আজ ভাগ্যচক্র সত্যই কি তাহাকে তাহাই তৈরি করিয়া তুলিল? সত্যই আজ উন্মিলা পুলিশের গুপ্তচরের কাজ করিল!

সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জনের কমণীয় মুখ তাহার মনোদর্পণে এই কালিমালিপ্ত কলঙ্কিত মূর্তির পাশেই ফুটিয়া উঠিল।—সে ত্যাগে সমুজ্জ্বল, অবিচলিত নারীমহিমার দৃপ্ত ও মহিমাবিত, অথচ স্নেহময়;—সে কৃষ্ণা।

ইহার পর হইতে যতবারই উন্মিলার হৃৎসহ স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার চিত্তে একটা অসহনীয় দুঃস্বপ্নের মতই উদ্ভিত হইতে লাগিল, ততই সে গভীর ঘুণার সহিত ইহাকে সমস্তে পরিহার করিয়া লইয়া কৃষ্ণার কথাই ভাবিবার চেষ্টা করিল। যে উন্মিলার সহিত তাহার পরিচয় ছিল, সে যাহাকে ভালবাসিত, সে তো নাই! তবে আর তাহার কথা ভাবিয়া কি হইবে? যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে গুরুতর রাজদ্রোহের অভিযোগে ফেলিবার সাহায্য করিতে পারে, সে তার স্বামীর চোখে মৃত। উন্মিলা—সেই ক্ষুদ্র চঞ্চল সানন্দ চিরদগ্ধিনী উন্মিলার শব্দেহ কোথাও পড়িয়া থাকিতে পারে, সে নিজে নাই, ইহা সুনিশ্চিত।—আর সে বিনয়ও নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শরতের পূর্ণিমার চাঁদ প্রথম সন্ধ্যাতেই প্রচুরতর রূপালি আলো ধরলীলক্ষে ঢালিয়া দিয়াছেন। বিনয়দের বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানের সেই প্রকাণ্ড দীঘি! চারিদিকে তার ফুল-ফলের চিত্রকরা ফ্রেমের মতই সবুজ ঘাসের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য রকম বৃক্ষ-লতা। আর মাঝখানে যেন গগনাস্তনের কুলবধু তারকাদের মুখ দেখিবার দর্পণের মত সেই দীর্ঘিকা জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করিতেছে। ষোলকলায় পরিণত পূর্ণচন্দ্র তার বুকের উপর মুহূ হিলোলে দোল খাইয়া খেলা করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের দোলন-মঞ্চের চারিধারের ষোলশত গোপিনীর মতই নক্ষত্র-মেঘেরা সে খেলায় যোগ দিয়া কৌতুকভরে নৃত্য করিতেছিল, আর সমস্ত আকাশ পৃথিবী জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইয়া গিয়া যেন একখানা প্রকাণ্ড সোনার পাতের মতই ঝিলিক হানিতেছিল।

উন্মিলা উদাস উদাস হইয়া এই দীঘির পাড়ে বসিয়া আছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যে সমস্ত

আলোকের পুলক স্পর্শ অঙ্গে লইয়া স্থখের হাসি হাসিয়া উঠিয়াছে, একান্ত অসহায় ও অন্ধকার হৃদয়-মন লইয়া সে তখন একাকিনী এই নির্জন জলের ধারে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া ছিল। কি উদ্দেশ্য মনে লইয়া যে সে এই ভরা সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহিরে জনশূন্য বাগানের মধ্যে অনন্তসহায় হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তার মনের সেই গোপন চিন্তা আমরা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক নহি। তবে আসিবার কালীন একখানা গামছা কাপড় সে হাতে করিয়াই আসিয়াছিল, অর্থাৎ যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, মনে করিবে কাপড় কাটিতে চলিয়াছে।

ঘাটের উপর প্রশস্ত চাতাল, তার দুই ধারে বাবুদের বসিয়া হাওয়া খাইবার জন্য মার্বেল-পাথরে বাধান আসন। দু পাশে আলোকধার লণ্ঠন মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বিপিন শীলের মৃত্যুর পর আর তাহাতে কেহ আলো জ্বালে নাই। সেইখানে কাপড় রাখিয়া উন্মীলা এক পা এক পা করিয়া নামিয়া জলের একেবারে কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। টাঁদের আলোয় সোনালী জল তাহার পায়ের পাতা ধোয়াইয়া তাহার কালাপানি রংএর শাড়ীর চওড়া লাল পাড়টি স্পর্শ করিল। তখন উন্মীলা একবার উর্দ্ধে সেই অসংখ্য জ্যোতির্ময় তারকামণ্ডিত আকাশে দৃষ্টি তুলিয়া কাহার উদ্দেশ্যে তাহার যুক্তকর ললাটে ঠেকাইল। একবার অ-দূরে নিজেদের বাড়ীর মুক্ত বাতায়ন-পথে যে সস্ত্র প্রজ্জ্বলিত সন্ধ্যা-দীপটি নবোদিত একটি তারকার মতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই দেখিল। তার পর দীর্ঘিকার পরপারে যেখানে গন্ধরাজ গাছের ঝোঁপে ঝোঁপে হাজার ফুলের নক্ষত্র খচিত হইয়া আছে, সেইদিকে চাহিতেই তাহার গভীর ভারাক্রান্ত চিত্ত মথিত করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস উঠিয়া আসিল। জলে স্থলে গৃহে কাননে সর্বত্রই যে তাহার সেই একমাত্র প্রিয়তম—চিরসখার অবিস্মৃত জলন্ত স্মৃতি এই ভুবনভরা জ্যোৎস্নাজালের মতই ব্যাপ্ত হইয়া আছে! শুধু—নাই বুঝি টাঁদের আলো—যেখানে ছায়া হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর কাল্পনা হাসি যেখানে পুরানো কথার দহন দিয়া অহো-রাত্রকে অগ্নিময় করিয়া রাখে না, সেই নির্জন নিরালোক নিঃসঙ্গ জলতলে?

উন্মীলার সহিবার শক্তি সীমাতিক্রম করিতেই সে এই উপায়টাকেই সব চেয়ে সহজ বলিয়া অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু যখন সময় আসিল, তখন দেখা গেল, তাহার দুর্বল বালিকা-চিত্ত এত বড়

বিপাকে পড়িয়াও আজন্মের সংস্কারকে কোন মতেই ঠেকাইতে পারে নাই। এক দিকে মানুষের স্বভাব-জাত প্রাণের মায়া, অপর পক্ষে আত্মঘাতীর বিপন্নি-পামাশঙ্কা তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে আকণ্ঠসলিলমধ্য হইতে কূলে উঠাইয়া দিল। তখন ঘাটের সিঁড়ির উপর লুটাইয়া লুটাইয়া যে কাল্পনা সে পরিজনবর্গের মধ্যে বাস করিয়া ইচ্ছাসম্বন্ধেও কাঁদিতে পারে নাই, সেই বুক-ফাটান পাথর-গলান মর্ম্মভেদী প্রাণের কাল্পনা কাঁদিতে লাগিল। এই যে মরণের সহিত মুখামুখি দাঁড়াইতে আসিয়া সেই অচিন্ত দেশের অনিশ্চয়তাকে ভয় করিয়া তাহার শঙ্কিত ভীকৃতিত যুদ্ধে বিমুখ খোজার মতই পলাইয়া আসিল; এর পর এই বিড়ম্বনাময় জীবন লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিলা কি করিবে? মরিবার আশায় যে এতক্ষণ সে অনেক অসহনও সহিয়াছে। সে আশা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এই বিড়ম্বনার বিষে জর্জরিত হৃদয়-মনকে সে কি দিয়া আজ ঠেকাইয়া রাখে!

বাড়ীর বিষয়কার্য্য নির্বাহক হরিচরণ বিশ্বাস বহু পুরাতন কর্ম্মচারী, কিছু ফল মিষ্টায় প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জেলখানায় সে বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সেই ফিরিয়া আসিয়া জগ-দ্বাত্রীর পায়ে বিনয়ের শতকোটি প্রণাম নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার একটুখানি আড়ালে বধু উন্মীলাকে নিতান্ত হুঃখ এবং কুণ্ঠার সহিত বিনয়ের প্রেরিত বার্তা জ্ঞাপন করিল। অনেকবার কাসিয়া সাহারা মরুর মতই কেশ-বিহীন মস্তক ঘন ঘন কণ্ঠরন করিতে করিতে কোনমতে কুসংবাদটাকে সে অনিচ্ছা-নিখিল ব্যথিত-কণ্ঠে জানাইল।—

বলিল,—“বউ-মা! কি জানি মা! এ সব কথার মানে তো জানি নে, ছোট দাদাবাবু বলতে বললে, তাই মুখ দিয়ে বার করতে হচ্ছে মা! নইলে এই বড়-ছেলের সাধ্য কি ছিল যে, মা’র সাক্ষাতে এত বড় কথা মুখ থেকে বার করতে পারে? দাদা-বাবু তোমায় বলতে বলে দিলেন যে, ছয় বৎসর আগেই তিনি না কি তোমার প্রকৃত পরিচয় জেনে-ছিলেন; আজকের এই গোয়েন্দাগিরিতে তিনি তাই কিছুমাত্রই বিস্মিত হন নি।—তিনি বলেন, ‘উন্মীলাকে বলো, তার সন্দেহটা নিঃশেষেই তঞ্জন হয়ে যেতে পারবে; কারণ, তারই অনুগ্রহের দান মাথায় তুলে নিয়ে এ জন্মের মত পৃথিবী থেকে আমার স’রে যেতেই তো হবে। আর সেইজন্যেই শুধু আমারও মনে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে যে, তার মুখ আমার আর কখন দেখতে হবে না।’”

উন্মিলার দুই কান জ্বালা করিয়া বধির হইয়া গেল। তার পর আর কোন কথা যদি তাহাদের বিশ্বাস-দার মুখ হইতে বাহির হইয়াও থাকে তো উন্মিলার অবশেষে তাহাদের গ্রহণ করিতে পারে নাই। অলক্ষ্য হইতে যে বিষাক্ত শব্দ তাহার নিরন্তর পিষ্ট ক্রিষ্ট অহোরহ অনুতাপানলে বিদগ্ধপ্রায় অন্তঃকরণকে উদ্দেশ্য করিয়া সন্ধান করা হইয়াছিল, তাহার নির্ঘাত আঘাতে রক্তরঞ্জিত বিদীর্ণ বক্ষে সে সবলে দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া রূপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং তার পরই অকস্মাৎ মূর্ছাহত হইয়া পড়িয়া গেল।

সেবারের মূর্ছা-ভঙ্গে উন্মিলা মনের মধ্যে কি একটা বল-ভরসা সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়া শীঘ্রই অনেকখানি সংযত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন? এইবারই তাহার নিপীড়িত বুকের মধ্যে মুক্ত হাহা-কারে ভাঙ্গিয়া-পড়া প্রাণ যেন আতঙ্কে মুহুমুহঃ কম্পিত হইতে লাগিল। তবে এই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত জীবন,—পতিঘাতিনীর জীবন, এই দুর্ভিক্ষহ জীবনও তাহাকে বহিয়া বেড়াইতে হইবে? ঘণার ও ভয়ের তাড়নায় উন্মিলার গুরুভারাতুর বক্ষে আর যেন শ্বাস লইবারও শক্তি রহিল না। মনে মনে সে ক্ষণিকের জন্য আশা করিল, যদি দমটা বন্ধ হয়ে যায়!—তার পর যেমনি এই বাগানেরই ভিতর—অদূরে কোলা-হল শব্দে এক দল শৃগাল ডাকিয়া উঠিয়াছে; অন্ত্যাসৎসতঃ চম্কাইয়া উঠিতে পড়িতে গিয়া উন্মিলার ঠোঁটে বিছাতের মত এক লহমার জন্য একটুখানি তীব্র হাসি খেলিয়া গেল। এই না সে মরণ খুঁজিতে আসিয়াছিল!—বিস্মিত হইল। মুখে যতই বলা যাক, মানুষের প্রাণের মায়াটাই বুঝি তার সকল মায়াই চাইতেই প্রকাণ্ড বড়? নহিলে শৃগালে-কুকুরে ছিড়িয়া ছিড়িয়া খাইলেও যার পাপের এতটুকু প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় না, সেই মানুষ শৃগালের ডাক শুনিয়াই প্রাণটা লইয়া পলাইতে চাহে? হাস রে, বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি! ধন্য তুই! নিজের পরে তাহার অশ্রদ্ধার আর অন্ত রাহল না।

বাগানের মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজও যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। গভীর অন্তমনস্ক উন্মিলার কর্ণে সে সমস্ত প্রবিষ্ট হয় নাই। সহসা সে সর্বশরীরে চমক খাইয়া শুনিতে পাইল, “বোঠান! বলি হ্যাঁ গা বোঠান! তুমি কি এখানে আছ?”

কাদি-ঝি হাতে একটা হারিকেন লঠন বুলাইয়া হাঁক দিতে দিতে আগে আগে আসিতেছিল, আর তার পিছনে পিছনে আরও দু'জন মানুষের অন্তত বুঝা গেল। দু'জনের মধ্যে একজন দরোয়ান বজীর সিং, কাদির পিছনে লাঠী ঠুকিয়া নাগরা জুতা বাজাইয়া চলিয়াছে।

স্বপ্নময় জগৎ হইতে জাগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উন্মিলা উত্তর দিল, “হঁ।”

“যা হোক, যা হোক মেয়ে তুমি বাছা! বলিহারি যাই তোমার আকৈলকে!—হাজারটা গড় করি তোমার বুকের পাটাকে! এই সাঁজ-সজ্যেবেলা, পাখ-পাখালি—হাওয়া-বাতাস আছে, অন্ধকারের আনাচে কানাচে, আদেখা মাটিতে বুক দিয়ে কত কি কোথায় লুকিয়ে আছে, আর এই রাত পহর হ'তে যার, কেউ কোথায় নেই, এখানে এসে চুপটি-মেরে কি না ব'সে থাকা হয়েছে!”

কাদির বক্তৃতায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া কিন্তু উন্মিলা মুখ ফিরাইয়া—“যা, যা, তোকে কেউ লেকচার বাড়তে ডেকে পাঠায় নি—” বলিয়াই ধমকিয়া ধামিয়া গেল। শুধু কাদি নয়; কাদির সঙ্গে আরও কেহ—অপরিচিত কেহ আছে।

সে তাহার এই মানসিক বিপ্লবের মাঝখানে এমন করিয়া অজানা কাহারও উপস্থিতি একটুও পছন্দ করিল না; অথচ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায়ও কিছু চারিদিক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া না পাওয়ায় মৌন হইয়া তেমনি বসিয়া রহিল। তা দেখিয়া—যে আসিয়াছিল, সে সিঁড়ির আরও এক ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার ঠিক পাশেই বসিয়া পড়িল ও কহিল, “আপনার নাম তো উন্মিলা শীল?—বিনয়বাবুর স্ত্রী আপনিই—আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে। ঝি, তুমি ওপোরে গিয়ে বসো গে।”

বিনয়ের নামটা ইহার গলাতেই কাঁপিল, কি সে কম্পনটা উন্মিলারই বুকের, তাহা ধরিবার তেমন উপায় ছিল না। উন্মিলা সেইরূপ কম্পমান বক্ষে গুরুকণ্ঠে উত্তর দিল, “আমি উন্মিলা।—”

কি কথা, সে প্রশ্নই সে তুলিল না। কারণ, তাহা জানার কোনই কৌতুহল তাহার এই শোকাচ্ছন্ন হতাশাকার ও যন্ত্রণাবিক্ষত চিত্তের কোণেও উদ্ভিত হয় নাই। কোন কিছুর রস নিংড়াইয়া লইয়া ফেলিয়া দিলে সেটা যেমন নিঃসঙ্গ হইয়া যায়, ইহার মনটারও আজ সেই দশা।

অপরিচিতা নিজ হইতে বলিল,—“বিনয়বাবুর যে চিঠিখানা আপনি আপনার ভগ্নীপতি তরুণজি লাহাকে দিয়েছিলেন, সেখানায় যা লেখা ছিল, আপনার কিছু মনে পড়ে কি?”

উন্মীলা এবার একটু বিস্মিতা হইল, তার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, “না,—কিন্তু আপনি সে চিঠির কথা জানলেন কেমন করে?”

“জানা আর আশ্চর্য্য কি! আপনাকে লেখা পত্রই বিনয়বাবুর বিপক্ষের সব চাইতে বড় প্রমাণ, এ তো দেশজ লোকেই জানে। তবে সেটা যে আপনি মিঃ লাহাকে দিয়েছেন, সেটা অবশ্য আন্দাজ করে নেওয়া গেল। যেহেতু, তিনি যে আপনার ভগ্নীপতি, সে কথা আমি জানতুম। মনে করবার চেষ্টা করুন দেখি,—কি কি কথা ছিল তাতে?”

উন্মীলা আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। চেষ্টা সে সাধ্যমত করিয়া দেখিল, তার পর হতাশভাবে কহিল, “মনে পড়লো না, কিন্তু—কেন?”

“বড় দরকার ছিল।—তাতে আপনার স্বামীরই ভাল হতো, দেখুন, যদি মনে করতে পারেন! সবটা না হোক, তবু—”

এবার উন্মীলা চমক ভাঙ্গা হইয়া হঠাৎ সেই প্রফুট চন্দ্রালোকের মধ্যে উন্মিতাননে আগন্তুক মুখের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। চাহিয়াই কিন্তু যে কথা বলিতে উত্তত হইয়াছিল, তাহা তাহার অন্তরের আকস্মিকোদিত ঘোরতর বিস্ময়াভিহত হইয়া গিয়া অকস্মাৎ জিহ্বামূলেই সংহত হইয়া রহিল। যা দেখিল, সেটা সত্য কি না! সেইটেই তাহার সংশয় বোধ হইল। এত কাছে এমন জিনিষ সে যেন এর আগে আর কখন দেখে নাই!

আকাশে চাঁদ তখন ক্রমশই উর্দ্ধগামী হইতেছেন। জ্যোৎস্নাধারা ক্ষটিক-স্বচ্ছ স্বর্ণা-ধারার মতই ধরণী-অঙ্ক শীতল সুমিষ্ট রজতালোকে গুহ্রতর করিয়া তুলিয়াছিল। জলের মধ্যেও শশাঙ্কের সেই স্বর্ণমুষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘতর ছায়া ফোলায় নিজের রূপের গৌরবে বিভোর হইয়া রাহিয়াছে। উন্মীলার মনে হইল, এ মুখ দেখিয়া উহারও একটু লজ্জা বোধ করিলে ভাল দেখাইত! সে বিমুগ্ধ এবং সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে কহিয়া উঠিল—“তুমি—আপনি কে?”

তাহার কণ্ঠের বিস্ময়ধ্বনি ও মোহের ভাব লক্ষ্য করিয়া অপরিচিতা মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। প্রকাশে সে যেমন ভেমনি শান্ত-স্বরেই উত্তর দিল,—“আমার নাম যে আপনি

শুনেছেন, তাতে আমার সংশয় নেই; কারণ, তা না হ'লে আপনার সে চিঠি আজ মিঃ লাহার কাছে পৌঁছত না।—আমার নাম কৃষ্ণা মল্লিক।”

এই নামই যে উন্মীলা আর কখন শুনিয়াছিল, তা নয়; তবে ইহার রূপের খ্যাতিটা যে রকম তাহার বুকের বেদনার মোচড় দিয়া গিয়াছে, তাহাতে এই রূপসীকে তাহার মন চিনি চিনি করিয়াই উঠিয়াছিল। এখন যেন সম্পূর্ণরূপে ইহাকে চিনিয়া লইয়াই তাহার জালা-ভরা চিত্ত ইহার বিরুদ্ধে একেবারেই ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল।

এ কথা মনে পড়িতেই তাহার সকল অবসন্নতা এক মুহূর্তে কোথায় যেন চলিয়া গেল; শরীর-মন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া কিসের যেন একটা প্রবল অস্থিরতা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে যেন টান মারিয়া সেখান হইতে উপড়াইয়া তুলিয়া লইল। উত্তেজিত আরক্তমুখে সে বেগের সহিত বলিয়া উঠিল,—“ওঃ! আজকে তাই বুঝি তুমি আমার হৃদয়া দেখে আনন্দ করতে এসেছ? তোমার পথ সাক্ষ্য হচ্ছে কি না জানতে এসেছ?” তাহার সমস্ত দেহ জলস্রোতোহত শৈবালদামের মতই ভিতরে বাহিরে কাঁপিতে লাগিল।

কৃষ্ণা ইহার অবস্থা দেখিয়া হুঃখিত হইল, কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, “রাগ অভিমানের দিন এখন আপনারও নেই, আমারও নেই। শান্ত হয়ে এখন আমার কথা ক'টা শুনে নিন্। আমার আবার এখনি ফিরে যেতে হবে। বিনয়বাবুর ও আমার সম্বন্ধে কত দূর কি আপনি শুনে থাকতে পারেন, সে আমার জানা নাই থাক্, আন্দাজ একটা আছে। ধরেই নিন্, আপনার স্বামী অগ্নাসক্ত। কিন্তু তাই ব'লে আপনি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী, স্বামীকে ফাঁসী-কাঠে ঠেলে দেবার মত অতিহিংসা-প্রবৃত্তি কিছু আর আপনার মধ্যে নেই? যা হয়ে গেছে—তার জন্ত বৃথা পরিতাপ অথবা মনের প্রাণিতে নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু একটা বিপাক ঘটিয়ে তুলেও কিছু আর তার প্রতিবিধান হবে না। তার চাইতে ঠাণ্ডা-মাথায় ভেবে দেখুন, যদি কোন মতে অন্ততঃ তাঁর দণ্ডটাও কিছু লাঘব করতে পারা যায়। কি বলেন?”

উন্মীলার কথা কহিতে বিলম্ব ঘটিল, পরে বলিল,—“তা হ'লে তুমি তো ওকে ভালবাস?”

কৃষ্ণার অপূর্ব সুন্দর মুখ এক রকম হাসির

আভার চক্চকে হইয়া উঠিল,—“ধরুন, যদিই বাসি ! তা সে বিচারটা তিনি মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এলে করলেই ভাল হয় না ? কেউ কারকে ভালবাসলেই কি তাকেও কুইন এলিজাবেথের মতন চরম দণ্ড দিয়ে দেবেন ?—” আবার একটু হাসিয়া বলিল, “তা হ’লে আমাকেও এই দীঘির জলে কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরতে হুকুম দেবেন না কি ?”

ইহার এই মর্মঘাতী নিষ্ঠুর পরিহাস যতকের ফাঁসের দড়ির টানের মতই উন্মিলার শ্বাস রোধ করিয়া আনিল। ক্ষণকাল সে সেইভাবে নীরব থাকিয়া তার পর উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল, “আমাকে কি করতে হবে ?”

“সেই চিঠিখানায় কি লেখা ছিল,—যতটা পারেন মনে ক’রে বলুন।—”

“তাতে লাভ ?”

কৃষ্ণা কহিল, “আছে ব’লেই বলছি।—কি আছে তা আপনি এখন বুঝতে পারবেন না, কিন্তু ফল পেলেই জানতে পারবেন।”

উন্মিলা কি ভাবিল, পরে চিন্তিতভাবে কহিল, “কিন্তু কেমন ক’রে জানবো যে আমার তুমি ঠকাছো না ? জামাইবাবুকেও তো আমি খুবই বিশ্বাস করেছিলুম। বিশেষ তিনি আপনার লোক !”

কৃষ্ণা কহিল, “আপনার আত্মীয় হ’লেও তাঁর স্বার্থ আপনার সঙ্গে এক নয়, তাই তাঁর হাতে আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ছেলেমানুষ, সংসারানভিজ্ঞ,—কীজের তাঁর ছরভিসন্ধির মধ্যে ঢুকতে পারেন নি, আমার কেন সংশয় করছেন ?”

উন্মিলা একবার ভাল করিয়া সকল কথা শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিল। মিঃ লাহার সমবেদনা, মহামুভূতি, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ, বিনয়ের সেই হেঁয়ালীর জাল-বোনা চিঠি, এবং তাঁর সঙ্গীন প্রত্যাশার ! তার পরের সকল কথা—বিনয়কুমারের গ্রেপ্তারের খবর এবং হরিচরণ বিশ্বাসের দৌত্য !—উন্মিলার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, সচন্দ্র-তারকা সমস্ত আকাশ, পৃথিবী, ছালোক এবং ভুলোক সমস্তই আপন টল্টলে ও এলোমেলো হইয়া তাহার চারি পাশে যেন হাজারটা প্রেতযোনির মত বিকটচ্ছন্দে ও বীভৎস তালে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের বিকৃত ভঙ্গী ও বিকট স্বর তাহার ভয়ানক হৃদয়ে প্রবল কম্পন-বেগে জাগিয়া

যেন সন্দেহের তাড়নাকেই শিরোধার্য করিয়া লইয়া নিরাশ্বাসের মর্মচ্ছেদী বিলাপ-ধ্বনির মত উচ্চারণ করিয়া গেল,—“আমি বলবো না,—আর আমার কেটে ফেলেও আমি তার সম্বন্ধে একটি কথাও কার কাছে বলবো না। আমার যা করতে হয়, তোমরা কর।”

কৃষ্ণার মুখে ঘোর হতাশার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। স্বল্পক্ষণ কর্তব্যবিমূঢ়াবৎ থাকিয়া পারশেষে শেষ-চেষ্টার মতই সে নিজেকে সবল করিয়া লইয়া উন্মিলার কাছে আরও সরিয়া আসিল,—তার পর তাহার হাত আদর করিয়া ধরিয়া স্নেহ-কোমল-সিক্ত-কণ্ঠে কহিল,—“ভেবে দেখ বোন ! আচ্ছা, তোমারই বিশ্বাসমতেই না হয় একবার মনে ক’রে দেখ, তাঁকে যদি আমি ভালই বেসে থাকি, তা হ’লে যাতে তাঁর ভাল হয়, তাই তো একান্তভাবে আমার চেষ্টা হবে ? আমি কিছু তাঁর অনিষ্টে যোগ দিতে পারবো না ? তবে কেন আমার তুমি অবিশ্বাস করছো ?”

উন্মিলা কোনই বিধা করিল না,—নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—“তাঁর ভাল করা যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যেমন ক’রে হয় করবেই। কিন্তু আমার যে তুমি মন্দ করবে না, তার আমি কি জানি ? একেই তিনি আমার উপর রাগ করছেন, এই অবসরে আমার জন্মের মত তাঁর বিষ ক’রে দিয়ে নিজের পথ খালি ক’রে নেবে না যে, তার ঠিক কি ?—আমি কিছুই বলবো না, তাতে আমার ভাগ্যে যা হয় হোক।”

এই বলিয়া আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গমনোন্মত্তা হইল।

তখন একটা ক্ষুদ্র অথচ ক্ষুদ্র শ্বাস ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কৃষ্ণাও উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং উন্মিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বাই হোক, আর যে আপনি আপনার স্বামি-সম্বন্ধীয় কোন কথা কার কাছে বলবেন না ব’লে স্থির করেছেন, তাতেও আমি অনেকটা ভরসা পেয়ে গেলুম। আমার এখন অল্প দিক থেকে চেষ্টা করতে হবে।—তা হ’লে আসি !”

এই বলিয়া সে ত্বরিতপদে সোপান অতিক্রমপূর্বক পাথর-বাঁধান চাতালের উপর যেমন পা দিয়াছে, পিছন হইতে গুনিল,—“দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—” এবং উন্মিলা কৃষ্ণাষায়ে ছুটিয়া আসিয়াই তাহার হাত ‘জোর’ করিয়া চাপিয়া ধরিল।—“তুমি সাহসী

চেষ্টা করবে বলো? আমি বোকা মুখ্য কি বলতে
কি বলেছি—তা বলে আমার উপর রাগ করে
তুমি তার ক্ষতি হ'তে দেবে না। আমার বলে
যাও?”

কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া উর্মিলার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া
বলিল, “পাগল!”

“বলো, তার ফাঁসী—উঃ বাবা রে!—দ্বীপান্তর
—জেল কিছু হবে না? বল, তুমি বাঁচাবে?
কি করে সে আমি জানি নে, শুধু বলো পারবেই,—”

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া শুধু জবাব দিল, “হঁ।”

“চিঠির কথা সত্যি আমার মনে নাই—থাকলে
তোমায় বলতুম,—এই বলিয়া উর্মিলা নত হইয়া
কৃষ্ণার কাছে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহার দুই
পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।—“দিদি! দিদি!”

“বোন!”

“যদি বাঁচাতে পারো, আমার স্বামীকে তুমি
আর ভালানাবে না আমার বলে যাও?”

কৃষ্ণা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তার পর তাহার
কমকাজলিবেৎ হুঁথানি স্তম্ভম সুন্দর করতল উর্মিলার
নত মস্তকের উপর স্নেহপূর্ণ আদরে স্থাপনপূর্বক
সেইরূপই গাভীর্ঘ্যময় অথচ ঈষৎ ক্ষীণ হাস্য-মণ্ডিত-
মুখে কহিয়া উঠিল, “পাগলি কোথাকার! আর
উঠে আর।”—

উর্মিলা কৃষ্ণার দুই পা দু' হাতে জোর করিয়া
আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ
তাহারই মধ্যে গুঁজিল।—“বলো, আমার স্বামীকে
তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে না—বলো?
আমি যে সে সহিতে পারবো না।—কিছুতেই
যে সে আমার বুকে সহবে না ম'রে যে
নিশ্চিত্ত হবো, তারও যে আমার উপায় নেই। মর-
তেই তো আজ এসেছিলুম—পারলুম কৈ? সাহস
হলো না যে! তা হ'লে আমার কি গতি হবে?”
উর্মিলার চোখের জলে তাহার প্রতিপক্ষের পা
ভিজিয়া গেল।

“উর্মিলা!”—কৃষ্ণা জোর করিয়া উহাকে টানিয়া
তুলিয়া কিছুক্ষণ কথা খুঁজিয়া পাইল না। পরে
নিজেকেও সামলাইয়া লইয়া এবং রোদনকম্পিতা
বিবশা বিহ্বলা উর্মিলাকেও কিঞ্চিৎ শান্ত হইবার
অবসর দিয়া নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া
বলিল, “উর্মিলা! মাথাকে অত ছোট করে
দেখো না—তোমার স্বামী তোমারই আছেন, এক
দিনের জন্যও তিনি আর কার হনও নি, আর
হবেনও না। মন্দ লোকে তোমার কাছে মিথ্যা রটনা

ক'রে গেছে মাত্র। এসব ভুলে যেও। এ নিরে
ভবিষ্যতে দুজনে আর নতুন দুঃখের সৃষ্টি করো না।”

“তিনি কি আর কখন আমার ক্ষমা করবেন?
না না, কিছুতেই তা বোধ হয় পারবেন না।”—
বলিয়া উর্মিলা আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে
লাগিল। “আমি যে কত বড় অপরাধ করেছি,
সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছে, এর পর কি কেউ
ক্ষমা পেতে আশা করে?—করে কি?”

“আমায় বিশ্বাস করো, তোমায় ক্ষমা তিনি
করবেন।”

উর্মিলার বুকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের তড়িৎ
মুহূর্হ চকিত হইয়া গেল,—“কি ক'রে তুমি জানলে?
সত্যি তিনি খালাস পেয়ে ফির আসবেন? আমার
ক্ষমা করবেন? আমার ফিরে চাইবেন? সত্যি,
এ কি সত্যি? তুমি—তুমি—তাকে আমারই
ধাকতে—”

সঙ্কোচে বাধা-পড়া কথাটাকে শেষ হইবার
অবকাশ না দিয়াই কৃষ্ণা তাহার সকল প্রশ্নকেই
সমষ্টিগত করিয়া লইয়া উত্তর দিল—“নিশ্চয়।”—
তার পর উর্মিলা আবার মাটিতে পড়িয়া তাহার
পায়ের ধূলা লইবামাত্র তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ
দুই হাতে ধরিয়া তাহার ললাটে নিবিড় স্নেহে চুষন
করিয়া গাঢ় অথচ শাস্ত্রম্বরে সে তাহাকে আশীর্বাদ
করিল, “সাবিত্রী-সমানা হও।”—তার পর আর
ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যশোরের সেই গোলাপ-বাগানে যেমন বসন্তে
তেমনি শরৎকালেও আজ ফুলের খেলায় কিছু কম
পড়ে নাই। প্রাচীরের ধার ঘেঁসিয়া যে সকল দেশী
ফুলের গাছ বসন্তের উত্তল হাওয়ায়কেও জয় করিয়া
উর্ধ্বমুখীন্ স্তব্ধ সমাহিত চিত্ত সাধুর মতই অটল
ছিল; আজ শরৎ-লক্ষ্মীর পূজা উৎসবে মানন্দ-
উল্লাসে যোগদান করিতে তারাও নিজ নিজ ঘোঁগে-
ঘর্য্যের সমাবেশ করিয়া দিয়াছে। লাল, সাদা
ও পদ্ম-করবী, গন্ধে-ভরা গন্ধরাজ, রূপরানী স্থলপদ্ম,
অপরাজেয়া অপরাজিতা ও অতসী, অশ্রু-সজলা,
সু-ফলা সেফালিকা এবং তত্ত্বিম কারিনীফুলে হাজার
বাতি নিশীথ রাত্রির আঁধার বুকেও আলো করিয়া
থাকে। ফটকের মাথায় যে বিঘোনিয়া লতাটি
ছিল, তার বড় বড় উজ্জল কমলা-বর্ণের কুঁড়িগুল

ও সবুজ জমীর ধারে ধারে বর্ণ-বৈচিত্র্যশালী গন্ধ-বিহীন জিনিষাকুলের বাহার, পাশ্চাত্য সভ্যতার মতই অনেক দূরের লোককেও আকৃষ্ট করিয়া কাছে আনে। কৃষ্ণা আসিয়া প্রবেশ করিতেই আরদালীটা ছুটিয়া আসিয়া আভূমি-নত সেলাম দিয়া আন্তরিক আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিল। খবর পাইলে ষ্টেশনে গাড়ী যাইত, অনর্থক এত কষ্ট করিয়া—ইত্যাদি নানা আপ্যায়ন আরম্ভ করিতেই সে দুইটা মিষ্টবাক্যে সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“সাহেব বাড়ী আছেন কি না?” আরদালী জানাইল, “তিনি খাম-কাছরাতেই আছেন। তবে এখনি বাহির হইবার কথা। গাড়ী-বারান্দার মধ্যে মোটর-বাইকটাও নামান রহিয়াছে দেখা গেল। কৃষ্ণা উঠিয়া আসিয়া হলের সামনের বারান্দায় সাধারণ আগন্তুকদের বসিবার স্থানে একথানা চৌকি টানিয়া বসিয়া খবর দিতে বলিল। ‘কার্ড’ পর্য্যন্ত দিল না। আরদালীটি বিস্তর আপত্তি অনুযোগ করিয়া তাকে ভিতরে বসাইতে না পারিয়া, হার মানিয়া শেষে ভয়ে ভয়েই সংবাদ দিতে গেল। ইহাকে বাহিরে এমন দ্রবস্থায় রাখিয়া গেলে, সাহেবের কাছে অন্ততঃ দুইটা গালিও যে খাওয়া নিশ্চিত, তাহাতে তার সংশয় ছিল না।

কিন্তু পূর্ব-কর্মের কিছু স্মৃতি থাকাই সম্ভব। সাহেবের মেজাজ আশ্চর্য্য বদল হইয়া গেল। যেমন সে গিয়া বলিয়াছে, “খোদাবন্দ! মিস্ সাব আয়া। লেকেন বাহারমে বৈঠা হায়, ভিতর নেহি লে আনেসাকা গরীব পরবর!—গুলাম বহোত—”

সাহেব একটা কাগজ পড়িতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে পাইপের টানে অন্তরের উদ্বার মতই বাহিরেও রাশি রাশি ধূমধারা নির্গত হইয়া পড়িতেছিল। অনাগ্রহভাবে যথাকার্য্যে রত রহিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কোন্ মিস্ সাব?”

বেহারী বলিল, “হুজুর আপনা মিস্ সাব—মিস্ মল্লিক সাহাব কল্কাভা-সে আয়া—”

“হোয়াট! মাই গড্! ইজ ইট পসিবল?” মিঃ লাহা লক্ষ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।—তাঁহার হাত হইতে অগ্নিগর্ভ পাইপটা কার্পেটের উপর পড়িয়া ধরময় আগুনের ছড়াছড়ি হইয়া গেল, খবরের কাগজখানা পায়ের তলায় পড়িল। বেহারী ছুটিয়া আসিয়া অগুন নিবাইতে লাগিল। তিনি তার মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণা একাকিনী বসিয়া সেই ‘চায়নারোজ’ ও

মার্শেলনীল জাতীয় গোলাপ-কুঞ্জের পানে চাহিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতেছিল। বারেক তাহার মুখ অদূরস্থ হরিদ্রা গোলাপের মতই বেদনা-পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, আবার তাহা উহানের মতই গুল্ল হইয়া পরিশেষে নিজের স্বাভাবিক বর্ণ বসোরা-গোলাপের উজ্জলরূপ ফিরিয়া পাইল। মনে মনে নিজেকে সে এই আসন্ন-সাক্ষাতের জন্যই তখন প্রস্তুত করিয়া রাখিল।—অতীত বা ভবিষ্যৎকে ইহার মধ্যে এতটুকু প্রশ্ন দেওয়া চলিবে না।

“ভাল আছ তো বেবি?” বলিয়া মিষ্টার লাহা যখন বাহির হইয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার বাহু-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া কোনরূপ অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যাই-তেছিল না।—“পথে কোন কষ্ট হয় নি? ষ্টেশনে নেমেই গাড়ী পেয়েছিলে তো? সব সময় আবার গাড়ী থাকেও না।”

“হ্যাঁ, পেয়েছিলুম।—আপনি কি এখনি বেরুবেন?”

“বেরুতে একবার হবে। তবে এখনি না হ’লেও চলে। এসো, ভিতরে গিয়ে বসি গে।—

কৃষ্ণা কহিল, “আমার জন্ত আপনার কাজের ক্ষতি করবেন না; আমার শুধু গোটাকত কথাষাত্র বলবার আছে। সেটা এখানে ব’সেই শেষ ক’রে নিয়ে আমি এখনি আবার ফিরে যাব।”

“এখানে অন্ত লোকও হঠাৎ এসে পড়তে পারে, ঘরের মধ্যে গিয়ে ব’ললেও আমাদের সময়ের বেশী লোকমান হবে না।”

ঝড়ের আকাশকে বাহিরে যেমন প্রশান্ত দেখায়, মিষ্টার লাহার ধরণ-ধারণে সেই ভাবটাই সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল।

কৃষ্ণার ইহার আজ্ঞা-পালনের রুচি বড় ছিল না, কিন্তু তা লইয়া তর্ক করিতে প্রবৃত্তি আরও কম ছিল বলিয়া অগত্যা ইহার নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিতে হইল। হলের মধ্যে প্রবেশ করিতেই মিষ্টার লাহা বেহারাকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের আরও কি, কির জন্ত অনুচর্যের উপদেশ দিয়া কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তোমার সেই ঘরটির সব ঠিকই আছে। সমস্ত তৈরী পাবে! যাও ঠাণ্ডা হ’য়ে এসো, তার পর তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া যাবে। কেমন?”

কৃষ্ণা খুঁটির মত শক্ত হইয়া থাকিয়া ঘাড়

নাড়িল। “চা আমার খাবার দরকার নেই, আমি আমার কাজটা, এখনই শেষ করে নিতে চাই!”—

মিষ্টার লাহা একখানা চৌকি তাহার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, “তা হ’লে বসো”—নিজে আর একখানা লইয়া তাহার অদূরে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ যথেষ্ট শান্ত ও গাভীয়াপূর্ণ থাকার সঙ্গেও চোখের কোণ দুইটা চক্চকে হইয়া উঠিল।

“আপনি বিনয়বাবু জীর কাছ থেকে তাঁর স্বামীর লেখা যে চিঠিখানা ভুলিয়ে এনেছেন, সেখানা একবার আমার দেখাবেন?”

মিষ্টার লাহা বলিলেন, “যেখানায় বিনয় তোমাকে ভোলবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করে তার জীকে আশ্রয় করতে চেয়েছে, সেইখানা? সে তো এখন আর আমার হাতে নেই।”

এ আঘাত-চেষ্টাটা ব্যর্থ হইল কি কোথাও গিয়া নির্বাত বাজিল, তাহা জানিতে না দিয়াই কৃষ্ণা শান্ত ওদান্তে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি সেটা এখন আর কোনমতেই কি প্রত্যাহার করাতে পারেন না?”

এ প্রশ্নও যে সম্ভব ছিল, এ সন্দেহ বোধ করি মিষ্টার লাহার মনে ক্ষণিকের জন্তও উদিত হয় নাই। তাই বিস্মিত এবং কিছু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া কহিলেন, “সেটা প্রত্যাহার করাতে পারি কি না, জিজ্ঞেস করুন? আমাকে?”

কৃষ্ণা কহিল, “হ্যাঁ।”

মিষ্টার লাহা দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ভিতরের প্রবল ক্রোধোন্মত্তজন্য সবলে দমন করিয়া লইয়া উত্তর দিলেন, “না।”

“কিছুতেই না?”

“কিছুতেই না। আর কেনই বা তা করাতে যাব? বিনয় যদিও আমার নিকটতম আত্মীয়; এবং তার জী আমার বিশেষ স্নেহপাত্রী, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে আমাদের ভাই, ছেলেকেও মাপ করে চলা চলে না, সে তো তুমি জানই। আমি গবর্ণ-মেন্টের তরফ থেকে বারমাস মোটা মাইনে খাচ্ছি, তার নেমকহারামী কর্বো কেমন করে?”

কৃষ্ণার ললাট হইতে কর্ণদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া ভিতরে একটা রক্ত-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কষ্টে সেটাকে বথাসাধ্য দমনে রাখিয়া সে কহিল, “ইংলণ্ডের রুটীরই খণশোধ করুন; দেশের অন্ন-জলের ধার শোধ না করে গেলেও সে

আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না।—কিন্তু সে যা হোক; যেটাকে এখন কর্তব্য-পালন বলে উল্লেখ করলেন, সে কাজটা তো চিরদিনই ও-পর্যায়-ভুক্ত ছিল না। এক সময় ওটা প্রতিশোধ নেওয়ার হিসাবেই তো আরম্ভ হয়েছিল, তখন নেমকহারামীর ভয়টা এ ক্ষেত্রে ছেড়ে দিলেও দেওয়া যায় না তা নয়। আর আমি বলি কি, তাই না হয় দিয়ে ফেলুন।”

মিষ্টার লাহা একবার স্থির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি উহার মুখে প্রথরভাবে স্থাপন করিয়া পরে অন্তদিকে চাহিয়া জবাব দিলেন, “তোমার ও আমার সম্বন্ধে বিনয় যে অপমানসূচক কথা লো প্রচার করেছিল, তারই জন্ত রাগ করে তুমি তার উপর শোধ নিতে চেয়েছিলে। সে তো তুমি পারো নি। তা’ হ’লে আর প্রতিশোধের কথা তুলতে কেন? প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা তোমারই তো তখন বেশী ছিল, না?”

কৃষ্ণা কহিল, “না, পারি নি। তাই আমার অক্ষম দেখে আপনার সক্ষম হস্তে আপনিই সে ভারটা গ্রহণ করেছেন। তাই বলছি, এখনও ওটা ফিরিয়ে নিন।”

“বেবি।”

“রাগ করলেও এ কি মিথ্যা কথা মিষ্টার লাহা? বিনয় শীলকে আপনি আপনার সর্বস্বত্ব-করণ দিয়েই কি দীর্ঘা করেন না? এবং সেই আশুনেই কি সে আত্মদগ্ধ হ’তে বসে নি?”

মিঃ লাহা ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া চূপ করিয়া থাকিলেন, পরে বিচলিত-স্বরে কহিলেন, “মনের খবরের উপর কারু কোন দাবী দাওয়া রাখা চলে না বেবি! তা হ’লে আমিও হয় তো আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে এই প্রশ্ন করে বসতুম যে, এত লোকের মধ্যে আমার শ্রাণীপতি বিনয় শীলের জন্তই বা আমার বেবির এতটা মাথা-ব্যথা কিসের?”

অবিচলিত ও সুস্পষ্ট-স্বরেই কৃষ্ণা কহিল, “সে তো আপনি জানেনই?”—এই বলিয়া সে অস্বাভাবিক স্থির-দৃষ্টিতে মিষ্টার লাহার যজ্ঞগাহত অন্তরের অকস্মাৎ উদ্ভলিত ক্রোধ-পাংগুল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। বেশ বুঝতে পারা গেল, যেন ইচ্ছা করিয়াই সে এই শূলের ফলাটা তাঁহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন কর্ণধরের সামান্য কাঁপন ছাড়া মানসিক বিপ্লবের অপর কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। বলিলেন, “বিনয়ের জী যখন

আমার আপনার লোক, তখন তার ভাল মন্দও তো আমার দেখা উচিত। তার এই ষড়যন্ত্র-মামলায় যাতে ফাঁসীটা অন্ততঃ না হয়, তার জন্য আমাকেও বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে। আরও ক'জন ছেলেকেও আরা, বাঁকিপুর থেকে ধরে আনা হয়েছে, তাদের নাম বোধ করি তুমি জানোও না—তারা আবার কেসটাকে জটিল না করে ফেলে! যে রকম সব এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ট্রানস্পোরটেশন্ ফর লাইফ না হ'লেই বাঁচি।”

কৃষ্ণা ভিতরে ভিতরে আপাদমস্তক, শিহরিয়া উঠিল, “তা হ'লে এ মোকদ্দমা এখন চালাতেই হ'বে? কোনমতেই আর তুলে নিতে পারেন না? চিঠিখানায় ঠিক কি ছিল জানতে পারলেম না; তবে বোমার কথা বা লার্ড-বে-লার্ডকে খুন করবার মন্তব্য যে ছিল না, তা আপনিও বেশ জানেন। বিনয়বাবুর মত সামান্য লোকে এমন একটা অসামান্য ব্যাপার ঘটলে তুলতে যে পারে না, সেটুকু মোটা বুদ্ধি তাঁর ঘটে আছে। সে যাক, এখন একটা শেষ-মীমাংসা। কোন মূল্যেই বিনয়বাবুর ও তার খাতিরে আর যে ক'জন নির্দ্বিবেচী ভদ্র-সন্তানকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের মুক্তি ঘটা সম্ভব কি না?”

মিষ্টার লাহা সক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্র-কণ্ঠে কহিলেন, “বেবি! তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করচো, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গেই তা করা চলে না। শুধু তুমি ব'লেই আমি সমস্ত স'রে যাচ্ছি!—বিনয়কে পুলিশ কি প্রমাণে ধরেছে, তার জিনিষপত্র সার্চ করতে গিয়ে রিভলবার, কার্টিজ বার হয়েছে, তার কাছ থেকে তার স্ত্রীর লেখা পত্রে তাদের গুপ্ত-সমিতির কথা জানা গেছে, এ সব কি খবরের কাগজে পড়ো নি? আমি তার কি করতে পারি? বিনয়ের লেখা সেই চিঠিখানা উন্মিল্লা আমার অর্থবোধ করতে না পেরে পড়তে দেয়, অন্তমনস্কে পকেটে ফেলে রেখেছিলুম। সে দিন হঠাৎ দেখতে পেরে তখন তার অর্থ আমিও কতকটা বোধ করতে পারায়, এখানে সেই সময়ে উপস্থিত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে দিই।—অবস্থা না দিলেও চলতো। তবে ওটা আমার কর্তব্য ব'লেই বোধ হয়েছিল। কিন্তু আমি সামান্য এক জন ম্যাজিস্ট্রেট, আমার সাধ্য কতটুকু সে কি তুমি জানো না যে, পুনঃ পুনঃ আমার ঐ প্রশ্নই করচো? গবর্ণর বা ডাইসর

ব্যতীত ও-সব মামলা কি যার তার হুকুমে রদ হয়?”

কৃষ্ণা নতমুখে বসিয়া থাকিল, তার পর হৃদয়ো-খিত দীর্ঘশ্বাসটা গোপনে গোপনে বুকের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—

“আচ্ছা, আমি এখন চলুম; একটা পনেরোর ট্রেনটা আবার ধরতে হবে।”

মিষ্টার লাহা প্রথমতঃ নিজের সগর্ব সন্নত ভঙ্গি বজায় রাখিয়া গভীর ও ঔদাস্তপূর্ণ ভাবে নিজের হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তার পর সে হাত স্পর্শমাত্র না করিয়া ঈষৎ মলিন হাস্তের সহিত কৃষ্ণা শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া সংক্ষিপ্ত নমস্কার-ক্রিয়া সমাধা করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়াই তাঁহার সেই সমস্ত-বদ্ধ স্নেহের বাঁধ একেবারেই ধ্বসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সামনে আসিয়া দুই হাতে দ্বার রোধ করিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “বেবি! বেবি! পরও তো পরের বাড়ী থেকে এমন করে অভুক্ত চ'লে যায় না। এই দীর্ঘ পথ এসে, একটা বেলারও বিশ্রাম না নিয়ে, মুখে একটু জল পর্যন্ত না দিয়ে তুমি চ'লে যেতে চাইচো! তুমি কি আমার সেই বেবি? এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হ'লে? উঃ! কে তোমার এমন করে বদলে দিলে?”

কৃষ্ণার শুষ্ক জ্বালাপূর্ণ নেত্র ভেদ করিয়া সহসা যেন একটা প্রবল অশ্রু-উৎস সবেগে উথলিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। এই লোক—এই স্বার্থ-সর্বস্ব দারুণ আত্মাভিমानी আত্মোন্নতির খাতিরে পরের সর্ব-প্রকার ক্ষতি করিতেও যাহার মনে কিছুমাত্রও অনুতাপ জাগে না, সেই স্বার্থপর লোকই যে তাহাকে কত দূর নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছে, সে কথা যে তাহারও অজ্ঞাত নয়—তাহা নিঃস্বার্থ প্রেম নাই হোক, কিন্তু অতি প্রবল ও প্রগাঢ় যে সে প্রেম, তাহাতে আজ যদি সে সন্দেহ দেখায় তো তাহা তাহার কৃতঘ্নতা! যে বেগবান্ ও তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রেমের বস্ত্রা-ধারায় হয় তো জগতে শত অমঙ্গলের উদ্ভব করিতে পারে; কৃষ্ণা তাহার বেগ সহ না করিতে পারিয়া ইহার সান্নিধ্য হইতে আত্ম-রক্ষার্থ পলাইয়া বাইতেও হয় তো সমর্থ, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে অস্বীকার করিবে সে কোন্ মুখে?—তাহার স্মৃতির মন্দির উল্টিয়া কত কালের কত সঞ্চয়ই যে একসঙ্গে ছড়াছড়ি করিয়া সে দিক-টার একটা কটাক্ষক্ষেপ করিতেই একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল! কৃষ্ণা যখন সুখে বসিয়া বালিকাবস্থা

হইতে বিমুক্ত হইয়া কৈশোর-জীবনে সজ্জ পদার্পণ করিতেছে। ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষার আবর্তে এবং ট্যারো, অ্যাক্টিং—মিউজিক্ প্রভৃতি নইয়া বিস্তৃত ছাত্রীদলই যখন তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজ, সেই সময় তাহাদের বাড়ী এই তরুণ পুরুষ তরুণের প্রথম অভ্যাসের ঘণ্টে।—সে যুগে জন্মদিনের উপহারে ছুটীর আমোদ-প্রমোদেও তাহাকে হাত খুলিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যময় নব নব উপহার-বস্তু যোগাইয়াছে, সকল কাজের সাহায্য করিয়াছে সেই। তার পর তাহার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রথম স্বপ্নে সে উহাকেই তাহার সর্বোত্তম ও নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয়বোধে জীবনখাতার লেনা-দেনা ইহার সহিতই তো আরম্ভ করিয়াছিল! আজ তাহার কাছে সংসারের মূর্তি বদল হইয়া গিয়াছে, উপরের সোনার পাত ক্ষয় হইয়া ভিতরকার খুণখুণা কাঠের চেহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তা যখন হয় নাই। তখনকার—সেই সোনালি আলোর রঙ্গীন নেশায় এই বদান্ত বন্ধুটিকে সে-ও কি বড় কম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে ছাড়িয়াছিল?—আর আজ ইহার এই বিদ্ধ বেদনার করুণ মিনতি এমনি কারয়া পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেও সে কি এক বিন্দু বিধা করিবে না?—মানুষের মন বলিয়া তবে জগতে কি কোন কিছুই অস্তিত্বই নাই?—আছে শুধু মত, বিশ্বাস ও তাই লইয়া স্বার্থ-সংঘর্ষ! কৃষ্ণার সমস্ত অন্তর ঘেন তাহারই বিবেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া তাহাকে ফিরাইতে গেল,—পা চাপিয়া ধরিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কানের কাছে বলিয়া উঠিল—
 অন্ততঃ ওইটুকু।—এতটুকু যদি তৃপ্ত একবারের জন্তও দিতে পার! এর কাছে তুমিও তো কম ধার নি।—কিন্তু সেইটুকু ঋণ শোধের বাসনাকেও তাহার জোর করিয়া আজ জয় করিতে হইল।—না, সে পারে না।—কোন মতেই পারে না। মনের মধ্যে তাহার যে উদ্দেশ্য আজ ক্রমেই দৃঢ় সঙ্কল্পের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাকে চিত্তে রাখিয়া এখানে সম্মুখ অতিথেরতাকে সে কোন মতেই কলঙ্কিত করিতে পারে না। নিকপায় ভাবে মুখ তুলিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল—“আমায় আপনি মাপ করবেন।—পারবো না।”

মিষ্টার লাহা দণ্ডাহতবৎ রোষে ক্ষোভে ব্যথায় চ-চিতে নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নত করিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন, “এমনি ক’রেই কি দু’জনে দূরে চ’লে গেলুম? আর কি আমাদের হুঁহু হুঁহু হুঁহু কোন উপায়ই নেই? তুমি

তখন আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে, বিনয়ের মূল্য পাবার কোন মূল্য আছে কি না?—আমিও তোমার মিনতি ক’রে জিজ্ঞেস করছি বেবি, তোমাকে আমার পাশে ফিরিয়ে পাবার কোন দাম—কোন বিনিময় হ’তে পারে কি না?”

কৃষ্ণার মন দারুণ লোভে চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার অদম্য উত্তেজনার মধ্যে মনে হইয়া গেল যে, ইহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া সে তাহারই জন্ত বিপন্ন নিরপরাধীকে রক্ষা করে। আত্মত্যাগ এর চেয়ে আজ আর কোন কিছুতেই তাহার পক্ষে বেশী করায় হইবে না। কিন্তু মানুষ যতই কেন ধা বলুক না, নিজেকে সে কাহারও চেয়ে কম ভালবাসে না। অন্তের জন্ত প্রাণ দেওয়াটা বরং অনেকটা সোজা, কিন্তু নিজের মনের সমস্ত বিধাবন্ধকে প্রশ-মিত করিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে হার স্বীকার করা বড় সহজ নয়। তার পর অদূর-ভবিষ্যতে তাহাদের দাম্পত্য যে কত বড় অভিশাপের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারই একটা কদর্যা ছায়া সেই মুহূর্তই তাহার মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার মনটাকে শিহরিত করিল। সে কহিল, “তা’ হয় না।”

মিষ্টার লাহার মুখ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি কম্পিতস্বরে কহিলেন—“বেবি! এ পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র সুখশাস্তি! আমার তুমি প্রাণাধিক প্রিয়তমা।—আমার চেয়ে অল্পবয়সী ও দেখতে একটু ভাল ব’লে আমার প্রাণঢালা ভালবাসা প্রত্যাখ্যান ক’রে বিনয় শীলকে তুমি আজ আমার—একমাত্র আমারই অধিকৃত আসনে এনে বসালে! কিন্তু সেখানে তাকে রাখতে তুমি পারবে না। তাকে পাবে না। কখনই পাবে না। বাইরে তাকে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিলই, এখন তো অসম্ভবই হবে। তবে অনর্থক নির্যাসিতের দুঃখময় স্মৃতির পিছনে প্রাণোৎসর্গ না ক’রে, যেখানে আমাদের দু’জনকারই জীবন ফল ও সার্থক হয়ে উঠতে সমর্থ, সেইখানেই তুমি ফিরে এসো না?—দেখ, মানুষের জন্মটা এতটা দীর্ঘ নয় যে, একটা স্থায়ীত্বের ভরসাপূত্র খেলারই পিছনে তার খানিকটা অপব্যয় ক’রে ফেলা চলে। জগতে কাজ করতে চাও, দেশের উপকার করতে চাও, কত আছে—করতে বারণ কার? মেয়েদের জন্ত স্কুল করো, ক্লাব করো, শিল্প-বিদ্যালয় করো, সকলকেই যে ঐ একটা হুঁহুকেই মাততে হবে, তারও তো বিধান দেশভক্তির শাস্ত্রে নেই! এসো বেবি! আমার কাছে ফিরে এসো তুমি, আর আমি পার্শ্চি নে।

আর হুঃখ আমার দিও না, কিম্বা। আমারও জীবন যেন তার মতোই আসে। তোমার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে অনেক চেষ্টাই তো করলুম, কিন্তু কি ভয়ানক নিষ্ঠুর যে তুমি—‘কিছুতেই তোমার আসন টলাতে পারলুম না।’

কৃষ্ণা সমস্তকণ চুপ করিয়া সব কথাই শুনি, তার পর তিনি খামিখামি আর একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। খানিক পরেই একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীর চাকার শব্দে তরুণচন্দ্র বৃত্তিতে পারিলেন, সে চলিয়া গেল।

—মিঃ লাহা যখন সরকারী কাজে বাহির হইয়া গেলেন, মনে মনে এই কথা দৃঢ় করিয়াই ভাবিয়া গেলেন—বিনয় চিরদিনের জন্ত নির্দ্বাসিত হইলেই কৃষ্ণার মোহ-বিকার কাটিয়া যাইবে। এক দিন সে তাহার হইবেই!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শিয়ালদা ষ্টেশনে মিষ্টার এবং মি.সম্. করের সহিত কৃষ্ণার অতর্কিতে সাক্ষাৎ ঘটয়া গেল। পর্য্যটনের উপযুক্ত বেশভূষার উপর গলায় বুকে পাখীর পালকের মালা ঝুলাইয়া উচু গোড়ালীর সৌখীন জুতার খুটখুট শব্দ তুলিয়া এলা তখন একখানা রিজার্ভকরা ফাষ্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিতে বাইতে-ছিল; পিছনে পিছনে স্থলকার প্রোচ ব্যারিষ্টার মিষ্টার কর, জ্বর সহিত চলনের পাশ্চাত্য দিতে গিয়া রীতিমত হাঁফ ধরাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহার রংটি বাদ আর সবটুকুই সাহেবী, কিন্তু মনটার ভিতর কোন্ খানটার একটুখানি যেন দেশের মাটি লাগিয়া রহিয়াছিল। তবে তরুণী জ্বর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। সৌখীনদের এতটুকু ক্রটি সৌখীন জ্বীটির মাথা ধরাইয়া ফেলে। নিম্নশ্রেণীর মাদ্রাজী খুর্দান আয়াগুলা—চেহারা প্রায়শই তাহাদের তাড়কা রাক্ষসীর মত, প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পত্তি এক একটী ছোট ছেলে বা মেয়েকে কোলে বা হাতে ধরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সেই সমস্ত দলটির সহিত মিস্. মল্লিকের সামনা-সামনি দেখা হইয়া গেল।

“বেবি যে! কোথা থেকে? কি বিস্ত্রী হয়ে গেছ! কিছু যেন চেনবারই উপায় নেই! মা গো মা! আর তেমনি কি পোষাকের শ্রী!”

কৃষ্ণার এই আকস্মিক মিত্রাভাষে মন বড়

একটা আপ্যায়িত হইয়া উঠিল না, বরং নানা রকম অশ্লেষণ-বিশ্লেষণের জালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে মনে করিয়াই মনটা তাহার তেতো হইয়া গেল। মনে হইল, এর চেয়ে বরং মিষ্টার লাহার অনুরোধ রাখিয়া সেখানে স্নানাহার সারিতে এই ট্রেনখানাকে ফেল করিলেই ভাল ছিল। ভদ্রতার খাতিরে অগত্যা জিজ্ঞাসা করিতে হইল, “দারজ্জি-লীং যাচ্চো বৃত্তি?”

“হ্যাঁ ভাই! ওনার ইচ্ছে ছিল না যে যান। তা দেখ না আমার শরীরের অবস্থাটা! এবার এই ছোট বেবি হয়ে অবধি আর তো সারতে পারি নে; গ্রীষ্মকালে গিয়ে মোটে ছ’টি মাস থেকে ডালির অল্পখের খবরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো না? সারতে আর তেমন পারলুম কই? এয়ার তো ইচ্ছা আছে, শীতের প্রথমটা অবধি থেকে আসবো, দেখি কি হয়! তুমি এখন আই কোথায়? ঠিকানা জানি নে যে, এক দিন যাব কিম্বা একটা লোক পাঠাব। সে দিন ‘শীলা’র জন্মদিন গেল, বলতে পারলুম না।”

কৃষ্ণা কহিল, “আমার সঙ্গে দেখা হওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। ঠিকানা আমার ১৪/১.....লেন।”

“ডিম্বার মি! এসব কি তোমার পাগ্লামো নয় বেবি? ওই সব জায়গায় তুমি কোন্ ভরনায় রয়েছ শুনি? নোংরা গলি, পচা ড্রেন, হাওয়া চলে না মোটে, গায়ে গায়ে বাড়ী, একেবারে এপিডেমিকে ভরা! কেন, তোমার বাবার বাড়ী তো শুনলুম মিঃ লাহা তোমারই নামে কিনে আবার যেমন ছিল, তেমনি ক’রেই সাজিয়ে দিয়েছেন! সেখানে থাকলেই তো হয়? তোমার যেমন বেগাড়া খেয়াল।”

কৃষ্ণা দেখিল, তাহাদের সকল সংবাদই তাহার পুরাতন সমাজ রাখিয়া থাকে, শুধু রাখে না পরের অনুগ্রহজীবী না হইলেও তাহার কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকা চলে সেইটুকুই। সে জন্ত সে কাহারও নিন্দা করিল না। সমাজ তাহাদের পুরা মাত্রায় অন্ততঃ নব্য-শিক্ষায় ও শিক্ষিতা হইবার অবকাশ ও অধিকার দিয়াছে, তার পর সে যদি তাগকে পোষণ করিবার ভার না লয়, তাহাতে দোষ দেওয়া চলে না।

এবার কথার জবাবে তাই শুধুই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, “সারা দেশই যখন ঐ নোংরা গলি, পচা ড্রেন ও এপিডেমিকের মধ্যে প’ড়ে শোয় হয়ে যাচ্ছে, এর কোন প্রতিবিধান-চেষ্টা

রাজা-প্রজার সমান তাজ্জীল্যে প'ড়ে যখন অসম্ভব হয়েই রৈলো, তখন একা একা আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য উঠি-পড়ি লেগে থেকে হবে কি? ও হাল ছেড়ে দেওয়াই ভাল।”

এলা মুখ ভার করিয়া বলিল—“তুমি আবার অতিমাত্রায় সোসিয়ালিষ্ট হয়ে পড়েছ! বলসেভিক গবর্নমেন্ট না হ'লে আর অত কেউ করে না তা ব'লে!—যা হোক তোমাদের বিয়েটা হচ্ছে কবে? হ্যাঁ, ভাল কথা, সে দিন আর এক অদ্ভুত জীবের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হলো!—নাম অজয় শীল, অনেক বছর বিলাতে ছিল। সেখানেই এক মেম বিয়ে করে। ছেলেপিলেও কি ছ'চারটে হয়। তার পর ও-ক্ষেত্রে অনেক সময় যা ঘটে থাকে; অর্থাৎ ‘জুডিসিয়াল সেপারেসন!’ তবে এঁর কিছু গ্রহের জোর আছে বোধ করি; মেমঠাকরুণ মারা গেছেন। ছেলে-মেয়েদের কোথায় বোড়িং না কনভেন্টে রেখে দিয়ে অজয় বহুকাল পরে এই ক'দিন হলো দেশে ফিরে এসেছে। এঁদের সঙ্গে না কি এক সঙ্গে বিলাত যায়, এক সঙ্গেই পড়তো। সে দিন পথে দেখে ইনি চিন্তে পারেন নি, সে কিন্তু পেরেছিল। ইনি কেমন ক'রে পারবেন? এখানে এসে না কি মাথায় বড় বড় চুল রেখে গেরুয়া প'রে রামকৃষ্ণমিশনে না কোথায় সাধু হয়ে বেড়াচ্ছে। ইনি বলছিলেন, বিলাতে না কি বেশ ভাল প্র্যাক্টিস ছিল, বড্ড মাতাল ছিল ব'লে যদিও তেমন সুবিধা করতে পারে নি, তবু এখানে এক জন বড় ব্যারিষ্টারের চাইতেও কম পেতো না! সে সব ছেড়ে এখন এই টো টো কোম্পানীতে নাম লেখালেন! এখন ঐ ক্যাসান্ উঠেছে যে—”

অজয় শীল! অজয় শীল!—কে সে? নামটা কক্ষার কানে পরিচিত ঠেকিল।

তার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল, এর পূর্বসূরী কাহিনী তাহার অশ্রুত নয়!—এই অজয় শীল, বিনয়কুমার শীলের বড় ভাই। ব্যগ্র হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—“তিনি কোথায় থাকেন?”

হাস্ত করিয়া মিসেস্ কর কহিয়া উঠিল, “তবেই হয়েছে! পাগ্লার সাঁকো নেড়ে দিলাম না কি? —কি জানি ভাই! তখন তো বেলুড-মঠে যাচ্ছিল বলে। নির্দিষ্ট স্থান বোধ করি কিছুই নেই। আমার এসেছেই তো মোটে এই ক'দিন। বটুকু কেয়ার মাই ফ্রেণ্ড! মিষ্টার লাহাকে বঞ্চিত করে শেষে যেন তোমার এই খদ্দরকে গেরুয়ায় দিয়ে বসো না, দেখ!”

দার্জিলিং মেল ছাড়িবার বাঁশী তারস্বরে বাজাইয়া দিল। যাত্রিদল সচকিতে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইল। কক্ষা বাহিরের দিকে চলিল।

* * * *

হরিণবাড়ীর জেলখানার যে গর্তে বিনয় বাস করিতেছিল, বেলা এক প্রহর থাকিতেই তাহার মধ্যে অন্ধকারের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ও আঁধারের প্রজা মশকবুল তাহাদের বিজয়োৎসবের বাজ বাজাইতেছে। বিনয় নিজের একমাত্র কলখানি মাটিতে বিছাইয়া চিংপাত হইয়া শুইয়া শুইয়া এক পায়ের হাঁটুর উপর আর একটা পা লম্বা করিয়া তুলিয়া দিয়া নিম্নলিখিত-নেত্রে গান গাহিতেছিল। হাত দুখানা পরস্পরে বন্ধ এবং তাহা কপালের উপর রক্ষিত। গান সে গাহিতেছিল, কিন্তু সে দিনের মতন আজিকার গানে তাহার প্রাণের রসধারা সঞ্চিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছিল না। গান, সে আজ যেন শুধু কথার সমষ্টি, যেন সুরের ইন্দ্রজাল, বুকের সে অমৃত-উৎস নয়। এটা ওটা সেটা লইয়া টানাটানি করিয়া শেষে তিক্ত বিরক্ত হইয়া গিয়া সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, “না বাপু! গানকে আজ আর বাগাতেই পারা গেল না। থাক্ গে থাক্—” বলিয়া আবার চোক বুজিয়া পড়িয়াই রহিল। কিন্তু সেই অতি চপল, স্বজন-তৎপর তরুণ বন্ধের অন্তর্গত চাকল্যে-ভরা মনের মধ্যটা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব সাধকের মত, অথবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-ভিক্ষুর জ্ঞান আনন্দঘনের অথবা সর্বশূন্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে তখন নিজের মধ্যেই আপোষে একটা আলাপ তর্ক সুরু করিয়া দিল। তবে কথা কহিতে গেলেই এখন আর কিসের কথা সে কহিবে? মনের ভিতর যে উত্তাপটা জমিয়া রহিয়াছে, বাতাস বহিলে তাহারই তাপটাকে সে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ছাড়ে না। বিনয়ের মনও কথা কহিতে গিয়া উন্মিলার কথাই কহিতে বসিল; এত দিন বরং নানা ঘটনার সজ্জাতে উন্মিলাকে সে অনেকখানি দূরে দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার তাহাকে তাহার বড় কাছাকাছি, বুকের মাঝখান চিরিয়া যেন তাহারই অন্তর্ভাগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর এখন সে উন্মিলা নয়, এ সেই উন্মিলারই শবদেহের অগ্নিময়ী স্থিতি! তার সে আনন্দ-প্রতিমা, শৈশব-সঙ্গিনী উন্মিলা আজ কোথায়? বিনয়ের বুক আজ এ কথা ভাবিতে ব্যথায় টনটম্

করিয়া উঠিল। উন্মিলা নাই!—উন্মিলা মরিয়াছে!—
বিনয়ের স্মৃতির কাছে চিরদিনের জন্তই যে তাহার
মৃত্যু ঘটিয়াছে, এ কথা মধ্য বিনয়ের সমস্তই যেন মস্ত-
বড় একটা শ্মশানে পরিণত হইয়া দেখা দিল। উন্মিলা
যে তাহার এতখানিই ছিল, তাহাকে এমন করিয়া
হারাইয়া না ফেলিলে বৃষ্টি এ খবরটা সে কোন দিনই
জানিতে পারিত না! বৃষ্টি এই জন্তই ভগবানের
ভক্ত হওয়ার চাইতে তাঁর শত্রুতার মূল্য বেশী?
সত্যই আজ বিনয় দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে,
উন্মিলার প্রতি তাহার অন্তরে সঞ্চিত ভালবাসার
অস্ত ছিল না। সে তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিল;
তবে যে ইদানীং আর একরকম সন্দেহ হইতেছিল,
সেটা কি শুধুই মনের কল্পনা? ক্ষণকাল আকাশ-
পাতাল ছাইপাশ ভাবিয়া আবার নিজেরই সিদ্ধান্ত
করিয়া লইল, না তা নয়, কৃষ্ণাকেও আমি
ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা তার রূপ গুণ বিভা-
বুদ্ধি ত্যাগ ও চারিত্র্য-মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ
ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা। কিন্তু এ যে আমার চির-
দিনের গলার হার, আমার ভালয় মন্দয় মেশান,
আমার বুকের শোণিত-বিন্দুর সঙ্গে মিশ্রিত আমার
উন্মিলা! তাকে হারিয়ে যদি আমার চির-জীবন
আন্দামানেই বাস করে বেঁচে থাকতে হয়, তা হ'লে
কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো? তার চেয়ে ফাঁসী
যদি হয়, তো সেই ভাল!

প্রথম-প্রেমের মত বেগবান ও বিগলিত যে আর
কিছুই নয়, তাহা সে মর্মে মর্মেই অনুভব করিল।

স্নান করিয়া শিকল খুলিয়া রক্ষীর পিছনে কৃষ্ণা
আসিয়া প্রবেশ করিল।

“এসো, এসো, বসো।—অত শুখনো দেখাচ্ছে
কেন? ভাল আছ?”

“হ্যাঁ,” বলিয়া কৃষ্ণা বিনয়ের আমন্ত্রণানুসারে
তাহার কক্ষলখানার এক প্রান্তে উপবেশন করিল।—

“আপনিও একটু শুখিয়েছেন! তা অপরাধই
বা কি?”

বিনয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, “কৃষ্ণা!”

“বলুন?”

“আমার জী না কি আমার ধরিয়ে দিয়েছে?
এ কি সত্য?”

বিশুদ্ধ নীলকান্ত মণির মায় স্বয়ম্ভূত দুইটি নেত্র
সুধীরে বিনয়ের মুখে স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণা কহিল,
“বিশ্বাস হয়?”

বিনয় মৃদুস্বরে মত বলিয়া উঠিল,—“কি,
কৃষ্ণা?”

“আমার কথা?”

“হয় বৈ কি।”

“আপনার জী নির্দোষী! মন্দ লোকে ঘোর
চক্রান্ত করে তাকে ভুল বুঝিয়ে তার কাছ থেকে-
আপনার চিঠি চুরী করে এনে আপনাকে বিপদ
গ্রস্ত করেছে। সে এর কিছুই জানে না।”

বিনয়ের বুক যেন সুগভীর আনন্দের আখ্যাসে
ভরিয়া উঠিল। সে গভীর একটা নিশ্বাস লইয়া
বলিল, “কৈ তোমার হাত?”

নিজের সবল হস্তের মধ্যে কৃষ্ণার ছোট হাত-
খানি লইয়া সে তখনি ভিজাসা করিল, “আমার
মিথো সাক্ষ্যনা করুচো না?”

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল,—“না।”

“তবে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করলুম। কিন্তু কেমন
করে তুমি জানলে?”

কৃষ্ণা কহিল, “আমি জানি।”

আবার একবার উল্লাসের একটা চলন্ত শ্রোত
বিনয়ের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া বহিয়া গেল।
সে পরমসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া কৃষ্ণার হাত ছাড়িয়া
দিল। তার পর হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা,
তুমি কি ওদের কাছে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“গিয়েছিলে? মা'র সঙ্গে দেখা হলো?”

“তিনি তখন পূজার ঘরে ছিলেন। দেখা হয় নি।”

“আর উন্মিলা?”

“তাঁকে দেখেছি। তিনি আপনাদের দীঘির
ধারে একা বসেছিলেন, রাত তখন সাড়ে আটটা।”

“অত রাত্রে একলা সেখানে? তার যে নানা
রকমের ভয় ছিল, সে কোথা গেল?”

কৃষ্ণার অধঃপ্রান্তে ক্ষীণ একটি হাসির রেখা দেখা
দিল, “মরণকে যার ভয় ভেঙ্গে গেছে, তার কি আর
কোন কিছুতেই ভয় করবার বাকী আছে,
বিনয়বাবু?”

বিনয় এ কথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া
চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণা বলিল, “আপনার জী সে দিন ডুবে মরবার
সঙ্কল্প নিয়েই তেমন সময় সেখানে পৌঁছেছিলেন।”

বিনয় শিহরিয়া চোক বুজিল। “কৃষ্ণা। কৃষ্ণা।
তুমিই ওকে—আমার উমিকে বাঁচিয়ে এলে।”

প্রহরী তাগিদ জানাইল। কৃষ্ণা-দত্ত দশটা
টাকায় সে মিনিট কয়েক সময় বেশীও খরচ করে
এবং দরজার একটু পাশ করিয়া বসিয়াও থাকে,
আর কি করবে? কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

“বিনয়বাবু!”

“কি?”

“আপনার স্ত্রী তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে যে অখ্যাতির মধ্যে এসে পড়েছেন, যখন আরও স্পষ্ট করে জানতে পারবেন যে, কতবড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েই তাঁকে এই কলঙ্ক ও ক্ষতি সহ করতে হয়েছে, তখন আশ্চর্যিকভাবেই তাঁকে ক্ষমা করে শুধু স্ত্রী বলে নয়; সহধর্মিণী বলেও এবার নুতন করে গ্রহণ করবেন? বলুন? আপনার কাছে এই আমার প্রথম আর শেষ ভিক্ষা!”

“ও-কথা কেন কৃষ্ণা? তুমি যা বললে, তা আমি স্বীকার করে নিলাম। যদি মরি, তাকে ক্ষমা করেই মরবো, আর যে ভাবেই বাঁচি, এখন ক্ষমা তাঁকে মন থেকেই করতে পারবো। তুমি যে তাঁকে নির্দোষী বলেছ কৃষ্ণা! তোমার কোন কথাই তো আমি অবহেলা বা অবিশ্বাস করতে পারবো না! সে আমার স্ত্রী, কিন্তু তুমি আমার কি জানো?” মুহূর্ত্তে হাসিমুখে বলিল,—“ঐবতারা।”

কৃষ্ণা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় গান গাহিতে লাগিল,—

“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঐবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাক পথহারা।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের মাফলা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সাক্ষীদের এজাহার হইতে-ছিল। উভয়-পক্ষীয় উকীলে জেরায় জেরায় অনেক পাকা মাথা, কাঁচাইয়া দিতেছিলেন।

আজ প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহেরও তৃতীয় দিন আসিয়া পৌঁছিল। দলে দলে সরকার-পক্ষীয় সাক্ষীগণ নানা দিগ্দেশ হইতে লালবাজার পুলিশ-কোর্টে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। নব নব অধ্যায় রচনা করিয়া দিয়া চব্য-চোষ আহারান্তে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে আরব্য উপত্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর জায় কোতুলোদীপক এক-খানা স্মৃতি উপভাস রচিত হইতে থাকিয়া ‘নথির’ আকার পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

“পরেশনাথ পাহাড়ের মাড়োয়ারীদের মধ্যে দু’জন বিনয়কে ‘রাজদ্রোহ’ প্রচার করিতে শুনিয়া-ছিল, তা লইয়া তর্ক করিয়াছিল। বিনয় না কি তাদের বলে, বিলাতী বস্ত্র আমদানী না করিয়া

জাপান ও জার্মানী হইতে বন্দুক, পিস্তল আনা হইতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করা হয়। নিকপদ্রব অসহযোগিতায় কিছু হইবে না; অস্ত্র চাই।”

ইহারা না কি বলে, “দু’চারটে বন্দুকে কি সাম্রাজ্য লাভ হইবে?” তাহাতে বিনয় তাহাদের কটুবাক্য প্রয়োগ করে এবং বলে, “সকলেই যদি দু’চারিটার জোগাড় করে, তবে তো আর দু’চারিটা থাকে না, তা ভিন্ন বিনয়ের দল ইতোমধ্যেই কয়েক শত সংগ্রহ করিয়াছে। ইত্যাদি।”

বাঁকিপুরে, আগায়, বক্সারে, বেনারসে অমন একশত লোকের কাছেই বিনয় শীলের রাজদ্রোহ প্রচার, পিস্তল পকেটে লইয়া সন্ধ্যায়, রাত্রে নির্জন রাজপথে অপর কয়েক জন সন্দেহ-যুক্ত যুবকের গৃহে গমন, তাহাদের পরস্পরের সহিত কোন পড়ো-বাড়ীর চৌকাঠে বসিয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য লুটিয়া লওয়ার গুট পরামর্শ আটা এ সবেই বুড়ি বুড়ি সাক্ষী হাজির হইয়া পাতার পর পাতা ভর্তি করিয়া সাক্ষ্য দিয়া গেল। দারোগার দপ্তর আর একবার নুতন সংস্করণে বাহির হইল। বিনয়ের পক্ষের দু’জন ব্যারিষ্টার, তার মধ্যে এক জন বিনয়ের সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত; তাঁর জেরায় কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষীই কাঁচিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া সাক্ষীর বহর কিছু কমিয়া আসিল। অপর পক্ষের ব্যারিষ্টার এ দিকে ধমকের পর ধমক দিয়াও এই তীক্ষ্ণ-ধী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যারিষ্টারটিকে দমাইয়া দিতে সমর্থ না হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার যোগাড় করিলেন।

তথাপি বিনয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ রহিয়াছিল, তাহাতে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বুঝিতে পারা গেল। অপর কয়টি ছেলের মধ্যে বাঁকিপুরের নীললোহিত সেন, আরার স্বর্ণকান্তি মহলানবীসকে কোনমতেই দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। তবে একা একা না কি ষড়যন্ত্র করা যায় না, কাজেই শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ চন্দ, কদ্রপ্রসাদ ধর প্রভৃতি কয়েক জনকে কোনমতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইল। মোকদ্দমা দিনে দিনে মন্দর দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবশেষে শেষ গুনানির দিনে উম্মিলাকে লিখিত ও উম্মিলার লেখা পত্রদ্বয় লইয়া সরকার-পক্ষের ব্যারিষ্টার ইহাতে নানারূপ টীকাটিপনী প্রভৃতি লাগাইয়া ইহার অশ্লেষণ-বিশ্লেষণ পূর্বক দীর্ঘতর ছন্দে প্রকাণ্ড এক বক্তৃতা করিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, যে বিনয়কুমার শীল, চিরকালের দুর্দান্ত ও দোদard

প্রতাপশালী লোক, তাহার এনার্কীজম্ সর্বজন-বিদিত।—এমন কি, উহার নিজের স্ত্রীই,—আবার সে স্ত্রী সেই সুদূর অতীতকালে বিবাহিতা দীর্ঘ দিনের সহচরী—সেই স্ত্রী নিজেই তাহাকে ‘এনার্কীজম্’ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুনয় বিনয়পূর্বক পত্র দিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনয়কুমার যে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই করিতেছিল এবং উহার দ্বারা সম্ভবই একটা ভয়াবহ কোন কিছু—যাহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তিপৰ্য্যন্ত টলমল করিয়া উঠে, এমন কিছু ঘটনা উঠিতে পারিত, এই কথাটা বিচক্ষণ সুচতুর এবং বাগ্মী ব্যারিষ্টার মহাশয় প্রায় পুরাপুরি প্রমাণ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষ হইতে এক জন নূতন সাক্ষীর জবানবন্দী জ্ঞাত কোর্টে প্রার্থনা করিলেন।

সরকার-পক্ষের কৌশলী ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া জানাইলেন যে, তাহা আর সম্ভব নহে। এই মোকদ্দমায় ইতোমধ্যেই সরকার-পক্ষের ও তাঁহার অমূল্য সময় যথেষ্টই অপব্যয় হইয়া গিয়াছে, আর অনর্থক নষ্ট করা যায় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াই গিয়াছে।

বিপক্ষ-ব্যারিষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোর্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হজুর! আমার সাক্ষী পুলিশ-প্রেরিত, বাজে সাক্ষী নয় যে, তাঁহার সাক্ষ্য অসার-বাক্যবহুল ও ক্রান্তিকর এবং অপর পক্ষের জেরায় ভুয়া হইয়া যাইবে। তিনি এক জন উচ্চশিক্ষিত, মহৎশৈল্যব ও বঙ্গসমাজের উচ্চ-শ্রেণীর লোক। আমার এই সাক্ষীর জবানবন্দীর জ্ঞাত কোর্টকে মাত্র একটি ঘণ্টার অধিক সময় খরচ করিতে হইবে না। অথচ তাঁহার এজাহারে এই কেসের অবস্থা একেবারেই উল্টাইয়া যাইবে। ধর্ম্মাবতার! আমি অনেক বৎসর কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া সম্প্রতি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আমার চিত্ত আজও “ব্রিটিশ জায়-নিষ্ঠার প্রতি সন্ধিগ্ধ হইতে পারে নাই। আমি কয়েক বর্ষ সেখানে ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে অনেকানেক উচ্চমনা উদার-চরিত্র ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের সম্মুখীন হইয়াছি। আমার ধারণা তাই আজও অকলুষিত রহিয়াছে এবং আশা আছে যে, দেশভেদেও আমার এই উচ্চ ধারণার কোন দিমই ব্যতিক্রম ঘটতে পারিবে না। আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের নিরপেক্ষ জারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হোক।”

বিচারক নূতন সাক্ষী আনিতে অনুমতি দান করিলেন।

বিনয় একপ্রকার নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম এই ক্রান্তিকর দীর্ঘ মিথ্যাসাক্ষ্য শুনিতে শুনিতে পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের জায় সে বেন ফুলিতে থাকিত। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকগুলা দিবা নিম্নজ্জভাবে আসিতেছে, যা’ খুনী তাই বলিতেছে, তাহার অচেনা মুখ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছে, কটাক্ষপাত না করিয়াও চিনিয়া ফেলিতেছে, কত কিই অভিনবত্ব ঘটতেছে, দেখিয়া শুনিয়া তাহার হাড় অবধি জ্বালা করিতে থাকে। মনে মনে আশ্রয় হইয়া যে রিভালবারগুলা নষ্ট রাখি-যাও তার আজ এই ছরবছা, তাহারই একটা যদি সত্যই এখন তার হাতে আসিয়া পড়া সম্ভব হইত! তার পর যখন বেশ স্পষ্ট করিয়াই দেখা গেল যে, তাহাকে বড়যন্ত্রকারী, নরহত্যার চেষ্টা-কর্তা, প্রভৃতি খুব বড় বড় অপরাধে মণ্ডিত করিয়া একটা জাঁকালো রকম শাস্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় পার্শ্ব হইয়া আসিল, তখন হইতেই এ সম্বন্ধে তাহারও মনের চাঞ্চল্য রোধ হইয়া মনটা বেশ প্রশান্ত হইয়া গেল। মনে মনে সে তখন নিজেই নিজের বিচার ঐ বিচারমঞ্চের ম্যাজিস্ট্রেটের চোকে দিয়া করিয়া লইয়া একটা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বাঁচিল। সে মনকে বলিল, ফাঁসী আমার হইবে না, হ’লেই চুকিয়া যাইত, তা আর অদৃষ্ট নাই। যাবজ্জীবনেরই চেষ্টা চলিতেছে। তাতেই বা এত ক্ষতি কি? জীবন যে আমার আরও সম্ভব বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে, তাই বা কে আমার বলিল? হয় তো পাঁচ সাত বৎসরে শেষ হইয়াও যাইতে পারে! আর যদি বিশ বৎসরের পরেও উহাদের হাতে টেকিয়া থাকি, না জানি তখন দেশে ফিরিয়া কতই সুখলাভ হইবে! আবার নূতন করিয়া জননী-ধরিত্রীর অঙ্কে তখন বেন আর একটা জন্মলাভই করিব! যখন তার প্রাণটাকে লইয়া পাশার দান চালাচালি চলিতেছে, তেমন সময় হয় তো সে তাহার ভবিষ্যৎ আন্দামানী-জীবনের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ফেলিল!—সেখানে তাহাকে কি কি খাটুনিতে জুড়িয়া দিবে?—নারি-বেল ছোবড়া ছাড়ান, ঘানি টানা, পাথর ভাঙ্গা... সবই বোধ করি পালাক্রমে করিতে হইবে? ‘প্যাসিভ্ রিজিস্ট্যান্সটা’ সেখানে থাকিতে বোধ করি অভ্যাস হয় ভাল করিয়া, না? চাবুক খাইলে ফিরিয়া আমার পথ তো নাই! কোন সময়

জেলখানার সেন্টেমেতে মেজের শীত ও মশকের দোয়াওয়া যে নিজে উপভোগ করিবার উপায় কম; এখানের কাঠগড়ার ভিতর হাঁটুতে মাথা গুঁজিয়া তাহারই বরং কতকটা শোধ মিটাইয়া লয়। মধ্যে মধ্যে ঘুমন্ত তাহার নাক ডাকিয়া উঠে। কেহ বিস্মিত, কেহ বিরক্ত হয়। এইরূপেই বন্দিদশার দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর দিনগুলো সেই চঞ্চল ও উত্তম পূর্ণ তরুণ-বয়সী ছেলেটি কোন মতে যাপন করিতেছিল। এক এক দিন তাহার সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত, কদাচিৎ অর্ধ-পরিচিত, অপর তিনটি ছেলের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে বসে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাড়ার চোটে সেটা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পায় না। নিজের সম্বন্ধে তাহার আর কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না, বরং একটু একটু কৌতুক বোধ হইতেছিল। এই যে বিনয়-কুমার শীল, ডাক্তারীর এম্ বি পরীক্ষাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলিকাতার অলি-গলিতে বিনা ভিজিটে ডাক্তারী করিয়া খদ্দর বেচিয়া বড় জোর এই সম্বন্ধেই এক আধটা উপদেশ দিয়া বেড়ায়, এই পর্য্যন্তই তো তাহার দৌড়। এক দিন যদি এ দেশ স্বরাজ লাভ করে, যদি স্বরাজ-লাভের ইতিহাস লিখিত হয়, তার মধ্যে এই অসীম সাহসী, অকুতোভয়, অনন্ত-সাধারণ অধ্যবসায়-শীল, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-উচ্ছেদ-চেষ্টাকারী বিনয় শীলের অমর নাম কি অক্ষয় অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত হইবে না? তাহার ভারি হাসি পাইল। কিন্তু কাঠগড়ায় বসিয়া তত হাসি হাসিতে গেলে না কি এখনই কারার ব্যবস্থা ঘটয়া যাইবে, তাই সেটাকে হজম করিয়া লইয়া মুহু মুহু হাসিতে হাসিতে সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ধ্যান-ভাঙ্গা হইয়া বুঝিল, আদালত-গৃহে কিসের একটা পরিবর্তন ঘটয়াছে!

বিনয়ের পক্ষের এই নূতন সাক্ষী প্রবেশ করিতেই শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষেরই উপর দিয়া বাস্তবিক একটা যেন ঘোরতর পরিবর্তনের হাওয়া বহিয়া গেল। এমন কি, উভয় পক্ষীয়ের বহির্গত বিচারক শুধু যেন মন্ত্রসম্মোহিতের ভায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে সম্মান জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

আসামীর ব্যারিষ্টার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। সাক্ষীকে চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ না করিয়াই সরাসর সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বিনয়ের বিস্মিত, সন্দেহ কল্পিত দৃষ্টি সাম্নাসাম্নি তাহার মুখের উপর ব্যগ্র-ক্ষুধার ঝাঁপা-ইয়া পড়িয়াই স্তম্ভিত ও ভয়ান্ত হইয়া উঠিল। তাহার

প্রথম হৃৎকম্পের মধ্য দিয়া ক্রুদ্ধপ্রায় অর্ধফুট কর্ত প্রায় অশ্রাব্য আর্ন্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, “কৃষ্ণা!”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয়ের সমস্ত শরীর-মনের ভিতর দিয়া যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল; তাহার সমস্ত স্নায়ুগুল তাহারই তড়িৎ-স্পর্শে যেন আচ্ছন্নবৎ হইয়া গেল। এই অসমরোপযোগী ভাবে অকস্মাৎ ও একান্তই অপ্রত্যাশিতরূপে উহার দেখা পাইয়া, বিশেষতঃ ঐ স্থানে উহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি যেন একটা অশ্বতন, কি যেন একটা অমঙ্গল যেন কোন্ মুহূর্ত্তেই ঘটয়া যাইবে, যেন ইতোমধ্যে ঘটতেই আরম্ভ করিয়াছে, এমনি দুঃসহ-ভয়ে সে কৃষ্ণাকে সাক্ষ্য-মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে নিজের ব্যাকুল অন্তর-ভরা ছুটি চোখের তারা তুলিয়া ধরিতেই সে চেষ্টা অসাধ্য বুঝিয়াই আপনা হইতে তাহার উন্নত দৃষ্টি নমিত হইয়া আসিল। কৃষ্ণাই সে বটে, তবু সে যেন সেই তাহার পরিচিতা কৃষ্ণা মল্লিক নয়। তাহার মুখে এমন অনৈসর্গিক কিছু আছে, যার কাছে এ পৃথিবীর ভাবী বা ভাব লইয়া কোনমতেই পৌছাইতে ভরসা করা যায় না। সে যেন একটা ছায়ামূর্ত্তি, যেন কোন্ স্বপ্নলোকের মায়া; তাহারই সবাই দেখিতেছে, সে কিন্তু যেন কোন কিছুকেই দেখিতেছে না।

যথারীতি শপথ লইয়া এই নূতন সাক্ষীর জবাব বন্দী আরম্ভ হইল। কৃষ্ণা বলিল, “বিগত ডিসেম্বর মাসে কোন রাজপরিজনের অভিযুক্ত উপলক্ষে কলিকাতায় যে উৎসব হয়, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে? সে দিন... রোডের একটা বড় বাড়ীতে আমরা তাঁর শোভা-যাত্রা দেখবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়াছিলাম।—” এই বলিয়া সে বিনয়কুমারের সে দিনকার বক্তৃতা মুখে মুখেই সবটা বলিয়া গেল, এবং ইহা পরদিনের যে যে সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছিল, তাহা তাহাদের ব্যারিষ্টার দাখিল করিয়া দিলেন।—সে বলিতে লাগিল, “আমার সঙ্গে বশোরের ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার তরুণেন্দ্র

লাহার বিবাহের সম্ভাবনা সকলেই জানিতেন; কিন্তু মিঃ লাহার এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহে বিলম্বে ঘটতে থাকায় ইহা কিছু বিজ্ঞপাতক হইয়া উঠে। বিনয়বাবু কারু কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন এবং সস্ত্র সস্ত্র মোটর চাপা দিয়ে পালিয়ে আসার ব্যাপারটায় চটে উঠে আমার ও মিঃ লাহার নাম একত্র মিলিত ক'রে ঐ প্রকার ক্ষেপোক্তি করেছিলেন। আর বাস্তবিকই সে সময় মিঃ লাহা আমায় একগাছা বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন এবং দরবারে যাবার জন্ত তাঁর কাছে আমার বাবা কয়েক হাজার টাকা ধারও নেন। আমাদের দুজনকার মনেই সেই মুহূর্তে এই কুৎসাকারী নিন্দকের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধে পাগল হয়ে উঠলো।”

এই বলিয়া কৃষ্ণা ইহার পরের ঘটনা যথাযথই বিবৃত করিতে লাগিল। তার পর বলিল, “ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে গুঁকে ‘কুকুর দিয়ে খাওয়াতে’ও চেয়েছিলাম। পরিশেষে আমাদের দু'জনের মধ্যে স্থির হয় যে, এখন উঁহাকে গ্রেপ্তার করাইলে সংবাদপত্রে আমার নামে অধিকতর কুৎসা রটিবে, দণ্ডও উঁহার বেশী হইবে না,—তার চেয়ে সময়ের প্রতীক্ষা করাই ভাল। মিঃ লাহা আমায় বলেন, “জাল পাতা থাকিলে এক দিন না এক দিন তা'তে এসে পড়তেই হবে।”

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করিলেন, “এই বিনয়কুমারের সঙ্গে আপনার কি বিশেষরূপ সৌহার্দ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই? ইহারই প্ররোচনায় আপনি খদ্দর ব্যবহার ও আপনার পূর্ব-সমাজের সমস্ত পরিচিত বন্ধুদের কি পরিত্যাগ করেন নাই?”

উত্তর হইল, “করিয়াছি, এবং ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দও জন্মিয়াছিল। এই পত্রখানি পড়িলেই আপনারা এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার রূপে সকল কথাই বুঝিতে পারিবেন যে, কি জন্ত এই আসামীর স্ত্রীর মনে তাহার স্বামী সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার স্বামীর লিখিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থযুক্ত পত্রের পূর্ণ রাজনৈতিক অপরাধযুক্ত অর্থ প্রয়োগ করিয়া উত্তর তাহার ভগ্নিপতি তরুণচন্দ্র লাহা দ্বারা উপস্থিত হইয়া লিখিত হইয়াছিল। আসামীর স্ত্রীর ও মাতার সাক্ষ্য লওয়া হইলে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইতে পারিবে। আপাততঃ আমার প্রদত্ত মিষ্টার তরুণচন্দ্র লাহার এই স্বহস্ত-লিখিত পত্র পাঠ করিয়াই এই ব্যক্তির নির্দোষিতা

সম্বন্ধে যে আপনারা নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই।”

আদালত-গৃহের বিপুল জনতা একেবারে খাম কক করিয়া এই রূপসী তরুণীর অদ্ভুত জবান-বন্দী শুনিতেছিল। ঘর এমনি নিস্তব্ধ যে, একটি সূচিকাপাত হইলেও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই মুখে ব্যগ্রকৌতুহল, এবং অধিকাংশের মনেই মিথ্যা অভিযোগে প্রাণ-সঙ্কট বিপন্ন বিনয়-কুমারের প্রতি গভীর সহানুভূতি। কিন্তু যে ঐ অবিচলিত সাহসে, অকুতোভয়ে নিজের গুঢ় রহস্তের গুপ্তধার উদ্ঘাটিত করিয়া সহস্র নেত্রের মাঝখানে অকম্পিত জিহ্বায় প্রচার করিতে দৃঢ়পদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এত লোকের মধ্যে একজনমাত্র কেহই তাহার সেই উচ্ছ্বল অপরাধের অভিযোগে তাহাকে দ্বিকার পর্য্যন্ত দিতে পারিল না, বরং অনেকের মনেই বেদনা পুঞ্জীভূত হইল।

আসামী-পক্ষীয় ব্যারিষ্টার কৃষ্ণার প্রদত্ত মিঃ লাহার লিখিত পত্র পাঠ করিলেন। সমস্ত পত্রখানাই আত্মোপাস্ত পঠিত হইয়া অবশেষে ইহার শেষাংশে বর্তমান মোকদ্দমা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আসিলেন।

“—এখন একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সম্পন্ন হইতে বাকী আছে। যে অসংলোক তোমার ও আমার নামে অযথা ও অকথ্য গ্লানি সহস্র লোকের মধ্যে প্রচার করিয়া তোমার ও আমার অবমানিত অপদস্থ করিয়াছিল, যার জন্ত আমার পবিত্র-স্বভাবা, চির-সুখ-লালিতা আনন্দময়ী কিষণ আজ জনসাধারণের হাত-কোতুকের পাত্ৰী, সেই অহেতুক-বৈর-সাধনকারীর সমুচিত শাস্তিবিধান বাকী আছে। মনে পড়ে বেবি! তুমি সে দিন নিতান্ত মম্বাহতচিত্তে ঐ পাষণ্ডকে ‘কুকুর দিয়া খাওয়াইবার’ ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই! তার পর দেশ-সেবার ছদ্মবেশে তার কার্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণের জন্ত তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাদের গুপ্ত-চক্রের কতদূর সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, সে সব এখনও যে আমার শোনা হয় নাই। এমন অবসর পাই না যে, একটি দিন তোমার কাছে কাটাইয়া আসি। তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিনয় শীলের সঙ্কটকাল আর খুব বেশী দূরে নাই। শীঘ্রই সে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবে, এই সময় যদি দেশ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায় তাহা হইতে পারে, যদি কেহ তাহাকে

ইহার জন্তই প্রস্তুত করে, তবেই তাহার রক্ষা! নতুবা স্থির জেনো বেবি! তাহাকে চির-নির্কাসন দণ্ড হইতে বেহই রক্ষা করিতে পারিবে না! তার পর—বিনয় শীলের নির্কাসনের দিনই আমাদের বিবাহোৎসবটা সম্পন্ন করা যাইবে। কেমন, তাহা হইলে তোমার প্রতিশোধ-স্বহাটা সম্পূর্ণরূপেই মিটে না কি?”

শ্রোতার দল নীরব নিম্পন্দ। সকলেই যেন রঙ্গমঞ্চে কোন ভীষণ বিরোগান্ত অভিনয় দর্শন করিতেছে, এমনি তন্ময়! আর আসামী? সে তখন একেবারেই বজ্র-স্তম্ভিত। শরীরে তাহার সংজ্ঞা ছিল কি না সন্দেহ। সকল ইন্দ্রিয়ের এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া আসিয়া সমস্ত শরীরের স্নায়ুপেশী-গুলি শিথিল হইয়া পড়িয়া এ পৃথিবীর আলো, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ অন্তর্বাহ যত কিছুই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপারকে তাহার নিকট হইতে অপসৃত করিয়া দিয়াছিল। সে যে কি গুণিল, কি বুঝিল, কিছু বুঝিল কি না, ঠিকমত অনুভব করিতেও পারিল না। শুধু একটিমাত্র বজ্রধর কর্ণের একদ্বী-অস্ত্রের মতই তাহার বিশ্বস্ত সরল চিত্তে বজ্রবেগে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, উন্মিলা নয়—এই কৃষ্ণাই তাহার ধ্বংসের জন্ত হীন চক্রান্তের স্বজনকারিণী! তাহার প্রেমাস্পদ ও বন্ধু মিঃ লাহার সে সহকারিণীমাত্র! তবে এত দিনকার সে সমস্ত তাগের খেলা, মহত্ত্বের মহিমাযিত্ত অভিনয়, মহোচ্চ আদর্শের সুগভীর অনুরাগ সে সকলই তাহার এই গুঢ় ও হেয় কার্যসাধনেরই ভাগ মাত্র? তবে এই বিনয়ের প্রতিও সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, সহকারিত্ব এবং সেই একটা আরও কিছু,—যাহাকে এ জগতের অনেক উদ্ধে দিব্যলোকেই সে আসন পাতিয়া বসাইয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাজলি অতিশয় গুচী-গুচ্ছ চিত্তেই সম্বর্পণে প্রদান করিয়া থাকে, সেও একটা মিথ্যা অভিনয়?

বিনয়ের মাথার মধ্যে দারুণ অবসন্নতা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। এই মানুষ? এত হীনতা এবং এত দীনতা এই মানুষেরই মধ্যে ছদ্মবেশ ধরিয়া লুকানো থাকিতে পারে? এত বিশ্বাসের এই পরিণাম! সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই যেন তাহার চোখে একটা স্তম্ভে বদলাইয়া গেল। রাজা এবং রাজ-পুরুষেরা তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য-প্রীতির মোহে কূট-নীতির আশ্রয়ে অনেক কিছুই করিয়া থাকেন; প্রজাও তার ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে এই রাজনীতিবেই অনুসরণ করিতে শিখিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট বন্ধ করিতে হুকুম দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণা যখন সাক্ষ্য-মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল;—বিশৃঙ্খল জনতা নিজেদের মধ্যে সরিয়া সরিয়া তাহাকে পথ করিয়া দিল। উপহাস, ঘৃণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ অথবা শ্রদ্ধা মনের মধ্যে যার যাহাই থাক, প্রকাশ্যভাবে কোন এক জনও তাহা প্রচার করিতে সন্মত হইল না। আর সব কিছুকেই আড়াল করিয়া তাহার সাহসে মগ্নিত ত্যাগ—সে যে কত বড় ত্যাগ—সেইটাই সেই সমবেত ইতর ভদ্র শিক্ষিত নিরক্ষর সবারাই মুগ্ধ মনে জ্যোতির্মগ্নিত হইয়া উঠিল। এই যে নারী কোথা হইতে অকস্মাৎ খসিয়া পড়া উদ্ধার মত আসন্ন বিপৎপাতের মধ্যে অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া দিয়া, আবার ঠিক তেমনি নির্ভীক ও নির্দ্বন্দ্বভাবে কোন দিকে দৃকপাত পর্য্যন্ত না করিয়াই সোজা চলিয়া গেল, অগ্নি-গুচ্ছ নিখাদ স্বর্ণের মত। তাহার গৌরব-দৃশ্য মূর্তি স্বতঃই জনতার মস্তক নত করিয়া রাখিল, শ্রদ্ধা ও করুণায় নেত্র সজল করিয়া তুলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সরকার বিনয়ের উপর হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া লইলেন। বিনয়ের ব্যারিষ্টার প্রথমতঃ ইহাতে একটুখানি আপত্তি করিলেও ‘কুমীরের সঙ্গে বাদ সাধিয়া জলে বাস করা নিরাপদ নহে’ এই চলিত বাক্যের হিসাবে জগত্য়াই চুপ করিয়া গেলেন। সন্ধিকাবস্থার মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ড বহন করাও ভাল, মর্যাদারও ইহাতে লাঘব ঘটিতেছে বলিয়া বিনয়েরও এক্রপ মুক্তি বিশেষ কটিকর হইল না।

সে যখন আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, বাহিরের জগৎ ঠিক সেই একই রকম চিরপরিচিত মূর্তিতেই তাহাকে স্বাগত জানাইতেছে! কিন্তু এই স্বপ্ন করটি মাসের মধ্যেই ভিতরটা তাহার কি ভীষণভাবেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল! যে বিনয় হরিণ-বাড়ীর জেলের মধ্যে তিন মাস পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বিনয়—সেই জীবনী-শ্রোতে পরিপূর্ণ চঞ্চল ও আনন্দময় কিশোর বিনয় আজ আর সেখান হইতে বাহির

হইয়া আসিতে পারিল না—আজ যে আসিল, সে চিন্তাশীল, সংসারভিজ্ঞ, জীবন-স্রোতোহত গভীরপ্রকৃতির পরিণতবুদ্ধি যুবক বিনয়কুমার।

বাহিরে সামনেই সেই অপরিচিত ‘সিনিয়র’ ব্যারিষ্টারটি কতকটা উৎসুক হইয়াই কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিনয় সম্মুখীন হইয়া দুই হাত লগাটে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে উত্তত হইতেই তিনি তাহার সেই দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্ত-মুখে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সম্মুখে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন,—“বল তো বিহু! আমি কে?”

বিনয় নির্ঝক্ বিন্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি পুনশ্চ হাসিয়া ফেলিয়া তাহার কপালে-পড়া কৃষ্ণ ও দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ সম্বন্ধে সরাইয়া দিয়া ‘স্নেহ-গভীর-কণ্ঠে’ তাহার বিন্ময়-নির্ঝক্ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, “আমার নাম অজয়-কুমার শীল, আমি—”

“দাদা এসেছেন! তাই আপনার জন্তেই আমি মুক্তি পেলুম!”—বলিয়া বিনয় অকৃত্রিম ও অপরিমিত আনন্দে মগ্ন হইয়া তাহার সাহেব-দাদাকে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিল।—সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে কক্ষার শেষ গোরবটুকুও তাহার সমস্ত পূর্বস্মৃতির চিত্তভঙ্গের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার দাদাই তাহা হইলে এই রহস্তের উদ্ঘাটনকর্তা; এবং খুব সম্ভব যে তিনিই উহাকে কোনরূপে বাধ্য করিয়া ঐ স্বীকারোক্তিটা বরাইয়া লইয়াছেন।

মনকে অস্ত্র দিকে ফিরাইয়া লইয়া সে তাড়া-তাড়ি প্রশ্ন করিল—“মা’র কাছে গিয়েছিলেন?”

অজয় কহিলেন, “এত দিন পরে এসে মা’র কান্না সহিতে পারবো না ব’লে ভরসা ক’রে যেতে পারি নি; আজ তোকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে যাব।”

“তবে চলুন।”—বলিয়া বিনয় অনেকখানি ক্ষুণ্ণিত হইয়াই দাদার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

রাস্তার পূর্বের মতই জনারণ্য; কৰ্ম্ম-কোলা-হল,—সহস্র লোকের সহস্র প্রকারের উদ্দীপনা, ঐশ্বর্য্য-মদগর্ভের পদতলে দারিদ্র্যের মাৎসর্য্য ভাব যথাযথ একইরূপে প্রবাহিত।

একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী, তার সমস্ত জানালা-জ্বলা বন্ধ করা, কেবল একখানা খিলমিলি মাত্র একটুখানি ফাঁক, গেটের বাহিরে ফুটপাথের ধারে

দাঁড়াইয়া ছিল। তার কোচবারো বিশ্রামশীল কোচ-ম্যানের পার্শ্বে যে দরওয়ানজাতীয় লোকটি বসিয়া ছিল, তাহার প্রতি নজর পড়িতেই অজয় বিনয়ের কালের কাছে ঈষৎ কুণ্ঠিত ও মৃদুস্বরে কহিল, “এই গাড়ীতে মিস্ মল্লিক রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক’রে যাবে না, বিনয়? তাঁর জন্তই তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে।”

যে দিকে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া ছিল, তার উণ্টা দিকের ফুটপাথে বাহির হইয়া পড়িয়া বিনয় শুধু জবাব দিল, “দরকার নেই।”

* * * বাড়ীতে বোড়া সত্যনারায়ণের পূজা খুব ঘটা করিয়া হইতেছিল। ধামা ধামা ফেনি-বাতাসা ও সন্দেশ, চাঙ্গারি-ভক্তি পান-সুপারিও হলুদ। পূজার উপকরণ প্রকাণ্ড রূপার খালে থরে থরে সজ্জিত। ধূপ-ধূনা-গুগ্গুলের গন্ধে রাস্তা ও প্রতিবেশীদের গৃহ পর্য্যন্ত আনোদিত হইয়া উঠিয়াছে। পাড়া ঝাঁটাইয়া সমস্ত হিন্দু-মুসলমান (এই ব্রতের নিয়মানুসারেই) আজিকার এই শুভদিনের মঙ্গলোৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া শীলেদের বাড়ীর মস্ত বড় অঙ্গনে আসিয়া চাঁদোরার নীচে বসিয়াছিল। সকলের জন্তই সন্দেশ বাতাসার হাঁড়ি ও বড় বড় গামলাভর্তি কাঁচা সিরি, নানাবিধ ফল-ফুলারির প্রসাদ বণ্টনের ব্যৱস্থা হইয়া আছে। ঠাকুর মহাশয় তখন পূজা সমাধা করিয়া পুঁথি হাতে ব্রত-কথা শুনাইতেছেন,—

“ফিরে এল পতিধন দুঃখ গেল দূর,
অতুল আনন্দ হৈল বিস্তব প্রচুর।—”

বধু ও জননীৰ ভক্তি-মুদিত চারি চক্ষু হইতে সুগভীর ও অসহনীয় আনন্দের অশ্রুজল এই পরম-কারুণিক দেবতার পায়ের অর্ধরূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের ভাষাহীন কৃতজ্ঞতার অফুরন্ত মৌনবাণী তাহাদেরই আনন্দ-সিক্ত মন্থন করা বুকের মধ্য হইতে নীরবে উঠিয়া যেন তাঁহার সকল পূজার উপর দিয়া স্থললিত ও সুরচিত স্তোত্র পাঠের জায় অজয় স্মৃতির বাণীতে মুখর হইয়া উঠিল। যে আশা হতাশার সীমানাতেই আটকাইয়া পড়িয়া-ছিল, আজ শুধু এই সৰ্ব্বক্ষম-শক্তির সহায়তা-বলে তাহা বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছে। ও গো দয়াময়! ও গো দয়াময়! এত দয়া তোমার?—তবু আমরা তোমার করুণায় সংশয় বোধ করিয়া ছুঃখ পাই!

বাহিরের দিক হইতে একসঙ্গে যুগল শব্দধ্বনির মত, অনাবৃষ্টির আকাশে অপ্রত্যাশিত মেঘ-গর্জনের মত, প্রবাস-প্রবাসী এবং কারাগৃহ-বাসী যুগল সম্ভানের চিবপরিচিত এবং বহুদিন অশ্রুত যুগল-কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল, “মা!”

সে রাত্রে বন্ধু, পরিচিত ও আত্মীয়গণের স্নেহ-মানবসম্ভাষণাদি হইতে অগ্রসর পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে আসায় বিনয়ের অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। প্রায় মধ্যরাত্রে সে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ঘরের সমস্ত সাজসজ্জাই যথাপূর্ব সজ্জিত ও সযত্নসংরক্ষিত রহিয়াছে। টেবিলের উপর সেই তাহার ছেলেবেলার সাজান আগ্রার সাদা পাথরের কাগজ-চাপা, মোরাদাবাদী দোয়াত-দান,—কাশীর পিতলের ফুলদানী সকলই সেই এক ভাবেই রহিয়াছে। অধিকন্তু সেগুলি সব ঝাড়ামোছা ও সুমার্জিত এবং ফুলদানীতে একটি গুচ্ছ রজনীগন্ধা ঘরখানিতে অত্যন্ত যত্ন একটি সুরভি দান করিতেছিল।

বিনয় আসিয়া সে দিনকার সেই চেয়ারখানাতেই বসিয়া পড়িল। টেবিলে তেলের সেজ জলিতেছে, বেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া। তাহার আর এক রাত্রে কথ্য মনে পড়িল। সেই নিশীথ অভিমান—তাহার নিফল অভিমানে আজ যেন বিনয়ের চোখের সামনে চোখের জলে ভিজিয়া, নিবিড় লজ্জায়—রাগিয়া, নিজের সুপ্ত যৌবনের ব্যর্থ দিবসকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। উন্মিলাকে যদি সে সে দিন নিজের কাছে টানিয়া লইত, তবে হয় তো আর তার জীবনটা অত বড় বিড়ম্বনা-পাকে ওড়াইয়া পড়িত না, এবং সে জাল খুলিবার চেষ্টায়—যাক, গতানুগোচনা সম্পূর্ণই নিরর্থক।

প্রতীক্ষা যখন অসহিষ্ণুতার পরিণত হইয়া আসিল, তখন উঠিয়া আসিয়া বাহিরে পা দিতেই ঢাকা দালানের এক পাশ হইতে যেন একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাহত চাপা কান্নার গুমরাগি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিত ও বিস্মিত হইয়া শব্দানুসরণে অগ্রসর হইতেই অক্ষুট নক্ষত্রালোকে একটা অর্ধ-মলিন-বজ্রাবৃত মনুষ্যাকৃতি সে দেখিতে পাইল। মানুষটা তাহার সান্নিধ্য জানিতে পারিয়া কান্না চাপিতে চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য হইতে পারে নাই, তাহা তাহার ফুলিয়া ও কোঁপাইয়া ওঠা হইতেই সে স্পষ্ট টের পাইল। এই নির্জনে নিশীথে একাকিনী বিবশা রোদনপরায়ণা ভুলুটিত নারীকে এক লহমার মধ্যে চিনিয়া লইয়াই তাহার

পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, “উন্মিলা!”—এবং জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল।

“উন্মিলা!—উন্মিলা!—আমি যে এতক্ষণ তোমাকেই খুঁজছিলাম। তুমি আমার কাছে গেলে না কেন?”

উন্মিলা আবার অব্যক্ত কণ্ঠে কাদিয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ছাড়াইয়া তাহার পাথরের উপর উপড় হইয়া পড়িল, কান্নাধরা ভগ্নকণ্ঠে কোনমতে কহিল, “তবে কি আমার তুমি এবারও ক্ষমা করবে? তবে কি আমার তুমি এখনও দূর করে তাড়িয়ে দেবে না?”

বিনয়ের চোক দিয়াও জল পড়িল। সে-ও প্রায় রুদ্ধস্বরে উত্তর করিল, “তুমি তো দোষী নও উন্মিলা!”

উন্মিলা আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত করিয়াই ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, “তুমি তা হ’লে জানতে পেরেছ? আমি যে ইচ্ছা করে কিছুই করি নি,—বড্ড বোকা, আর বড্ড মুখা বলে না বুঝে না জেনে নিজের সর্বনাশ নিজেই যে করে ফেলেছিলুম, সেই দেবকন্ঠাটি কি সে কথা তোমার সব বুঝিয়ে দিয়েছেন? তা হ’লে আমার ঠেলে ফেলো না, আমার তোমার ইচ্ছামত করে গড়ে নাও,—আমি এই দেখ, তোমার মতন মোটা কাপড় পরেছি, চরকা কিনেছি, পড়তে শিখছি। আমাকে কি তুমি তোমার মতন করে নেবে? তুমি যা করতে বলবে, আমি সমস্ত শুনবো।”

“আমিও সেই আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। বন্ধু, প্রেমসী, সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী একাধারে সবটুকুই আমি যেন এবার হ’তে তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারি। নিজের স্বীকেই যদি না গ’ড়ে নিতে পারবো, তবে পরকে গঠিত করতে যাবো কোন্ মুখ নিয়ে?”

এই বলিয়া নূতন পাওয়া চির-পুরাতন জীবন-পথের সঙ্গিনীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বিনয় তাহার আনন্দাশ্রুসিক্ত গণ্ড ও ওষ্ঠ অজস্র আদরের চুম্বনে প্রাবিত করিয়া দিল।

* * * *

সকাল হবো হবো হইয়াছে, তখনও দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই—এমন সময়ে বিনয় আসিয়া একান্ত ধৈর্য্যহারা অসহিষ্ণুভাবে ঘুমন্ত অজয়ের পা ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ডাকিয়া উঠিল, “দাদা! ও দাদা!”

সত্ত নিদ্রাভঙ্গের স্বলিত-জড়িত-কণ্ঠে “উ?” কল্পিত উত্তর দিয়া অজয় পাশ ফিরিয়া আর একবার নিদ্রা দিবার উপক্রম করিলেন।

“দাদা! মিস্ মল্লিককে আপনি কেমন করে খুঁজে পেলেন, আর ঐ চিঠির বিষয়ই বা জানলেন কেমন করে বলুন তো?”

অজয় ততক্ষণে ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া আলস্য ভাজিতেছিলেন; ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিলেন, “মিস্ মল্লিককে আমি খুঁজে পেলুম, না তিনিই আমার আবিষ্কার করে খুঁজে বার করলেন? কেমন করে তা তিনিই জানেন। আমি তো এসে সরাসরি রামকৃষ্ণ-মিশনে ঢুকে পড়বার মতলবে বেলেড় গিয়ে জুটেছিলুম, তোমাদের মুখ দেখাতে লজ্জা করছিল বলে।”

“তিনি নিজ হাতেই কি তা হলে ঐ চিঠির কথা আপনাকে বলেছিলেন?”

“না, চিঠির কথা আমার তিনি মোটেই বলেন নি, সবশুদ্ধ এই কথাই বলেন যে, বিনয়বাবুকে যেমন করে হয় বাঁচাতেই হবে, তার জন্ত আমার যা করতে হবে, আমি সমস্তই করতে প্রস্তুত আছি। আপনারা চেষ্টা করুন, নেহাৎ যদি না পাবেন, আমার তখন সাক্ষী মানবেন, শেষ উপায় আমার উহাতে আছে। আমি সে উপায়টা কি, জানতে চাইলে বলেন যে, এখন সেটা বলবো না; কারণ, নিতান্ত নিকপারে এক জন নির্দোষীকে রক্ষা করবার জন্ত যা করতে প্রস্তুত হচ্ছি, অপ্রয়োজনে তার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়, যেহেতু যতই অত্যাচারী হ’ন, এতে যাকে অপ্রদত্ত করতে হবে, এক সময় অনেক উপকারও তিনি আমাদের করেছেন। কিন্তু বিনয়—কাল তাঁর সম্বন্ধে তুমি একটু অবিচার করে এলে—ভাই! আমি শুনেছি, তোমার পক্ষাবলম্বন করার জন্ত মিঃ লাহার কোপে পড়ে তিনি হত-সর্বস্ব, পিতৃহীন এবং অশেষ রকমে সীলিত হয়েছেন, তবু তাঁকে বিয়ে করতে কিছুতেই সম্মত হন নি, এবং নিজেও তাঁর সম্মান পর্যাণ্ত বিসর্জন দিয়েও এইতো তোমার প্রাণরক্ষাও করলেন, দেখলে!”

বিনয়ের বক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল, সে বিষয় পাংশুমুখে স্নানভাবে বলিতে গেল, “কিন্তু সেই চিঠিখানায়—”

অজয় স্থির-দৃষ্টি ভাইএর মুখে মেলিয়া ধরিয়া যুহ-হাস্তে বাধা দিলেন, চৌদ বৎসর ব্যারিষ্টারী করছি বিনয়! ও চিঠিখানা যে মিঃ লাহার ‘চাল’, সে তুমি কেলে-মানুষ না বঝতে পেরে থাক, আমার বুঝতে

বাধে নি। কিন্তু ভাগ্যে ওরকম করে মিস্ মল্লিককে ভয় দেখাবার জন্তও সে ঐ চিঠি লিখেছিল; না হলে তোমায় আজ ফিরিয়ে আনে কার সাধ্য!”

* * * *

.....লেনের একখানি অপরিচরিত ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ীর সামনে ট্যান্ডি হইতে নামিয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাড়ীর সদর দরজার দিকে চাহিতেই বিনয়ের বুকেটা ধড়াস করিয়া উঠিল। দরজার তালাবন্ধ!

পাশের ঘড়ীর দোকানে একটা ঘুবা যুগ্ম যুগ্ম যন্ত্র-সাহায্যে পুরাতন ঘড়ী মেরামত করিতেছিল, তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঐ বাড়ীতে কে থাকেন বলতে পারেন?”

ছেলেটি মুখ না তুলিয়াই ইহার উত্তরে বলিল, “থাকতেন বটে—আপাতত কেউ তো থাকেন না!”

একটা অজানা আশঙ্কার ঢেউ বিনয়ের অন্তঃস্থ-চিত্তে সহসা উদ্ভাস হইয়া দেখা দিল, তথাপি সে নিজের ভ্রম হওয়ার শেষ আশায় ঈষৎ আশ্বস্ত হইতে চাহিয়া পুনশ্চ এই প্রশ্ন করিল, “মিস্ মল্লিক কি ঐ বাড়ীতেই থাকতেন?”

ছেলেটি এবার নিজের কার্য-নিযুক্ত দৃষ্টি উঠাইয়া প্রশ্নকারীকে পর্যবেক্ষণ করিয়া লইল, এবং তার পর বিশদার্থপূর্ণ ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিল, “হ্যাঁ, মিস্ মল্লিক ঐ বাড়ীতেই থাকতেন বটে;—ও বাড়ী আমার কাকার, তবে আজ ভোরেই তিনি বাড়ী-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। হাওড়া ষ্টেশনের পথে যেতে দেখেছি, তবে কোথায় যে যাবেন, তা কারকেই তিনি বলে যান নি, তাই আমরা কেউই তা জানিনে।”

বিনয় হাতড়াইয়া একটা জানালার গরাদ চাপিয়া ধরিয়া চোক বুজিল। তার পর বহুক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ ও অক্ষুট স্বরে যেন আত্মগতই উচ্চারণ করিল, “চলে গেছেন! একাই গেছেন হয় তো!”

ছেলেটি তাহার এই মুহূর্ত্ত ভাব দৃষ্টেও বিশেষ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, সে একটুখানি মুচ্কি হাসি হাসিয়া—অজিজ্ঞাসিত স্বগতোক্তির, গায়েপড়া হইয়াই এই উত্তর দিল, “একানয়, সঙ্গে গেছে তার সেই পুরণো দরওয়ানটা।—তা শুধু তিনি আপনাকেই ফাঁকি দেন নি। আপনার আগে আর এক জন বাঙ্গালী-সাহেব একখানা টু-সীটারে করে এসে

এমনি ক'রেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তবে তিনি আপনার মতন হালছাড়া লোক নন,—তখনই হাবড়া স্টেশনের দিকে মটর ছুটিয়ে দিলেন।”

ডুনিয়াই বিনয় ক্রতপদে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া একথানা চলন্ত ট্যাক্সির ড্রাইভারকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল।

রাস্তার ফেরিওয়ালারা ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদপত্র ফেরি করিতে করিতে হাঁকিতেছিল, “বিনয় শীলের রহস্যপূর্ণ মোকদ্দমার অদ্ভুত সমাধান! মিস্ মল্লিকের আশ্চর্য্য রহস্যভেদ!—যশোরের সেই স্বনামধন্য স্বদেশী-দলন মহামহিম মাজিষ্ট্রেট প্রবর মিঃ লাহার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ!”

সমাপ্ত

গরীবের মেয়ে

(উপন্যাস)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মাননীয় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে—

আপনার উৎসাহেই আমার রচনা লোকচক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ।
“গরীবের মেয়ে”কে তাই আপনার হাতে দিলাম ।

আপনার স্নেহের

অনুরূপা

গরীবের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল, বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। আফিসের কেরাণী, দ্বারবান, বাড়দার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদল যথানিয়মিত সময়কে পাছে না ধরিতে পারে, তাহারই জন্ত পশ্চিমের এই ছুরন্ত শীতকেও উপেক্ষা করিয়া খালি গায়ের উপর কেহ এক খাব্‌লা তেল চাব্‌ড়াইতেছে, আবার কেহ বা শীতাক্ততায় গায়ের জামাজোড়া খুলিতে না পারিয়া সেই সব শুক্কই মাথা বুলাইয়া, মাথার চুলগুলোকে একটুখানি ভিজাইয়া লইতেছিল। এইরূপ কাকস্বানের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য চুলগুলোর মধ্যে স্ফুটনভাবে টেরী কাটা। নতুবা শারীর-স্বাস্থ্যভঙ্গের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই, বরং কিছু বিরুদ্ধ সম্পর্কই দেখা যায়।

এ ছাড়া আজকাল আর এক জাতীয় জীবকেও এই আফিস ইন্সুলের অধিবাসীদিগের মতই শীতবর্ষানির্বিশেষে সাত-সকালে নাকে-মুখে দু'টি গুঁজিয়া প্রায়ই অ-স্নাত—অ-ভুক্ত অবস্থায় সারাদিনের মত বাড়ীর বাহির হইতে হয়। তাহাদের দুরবস্থা আবার আরও এক কাঠি উপরে। সে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীসকল। স্কুলের গাড়ীর ভয়ে তাহাদের ঘুম ভাঙার পর হইতে এতই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় যে, পূরা হপ্তাটা স্নান ত তাহাদের হয়ই না, আহারটাও অর্ধেক দিন না হওয়ারই সামিল। কারণ, বাসনমাজা-ঝিয়ে কামাই মাসের মধ্যে অমন পঁচিশ দিনই, খোকাখুকীদের না ধরিলে, বিছানাটা না তুলিলে, নেকড়াগুলো না কাচিলে, বাবা বা দাদার তেলটুকু, গামছাখানা, ধুতিখানি ঠিক করিয়া না রাখিলে দ্বিভুজা মাতা চতুভুজা হইয়াও যে আধসিদ্ধ ডাল-ভাতটা জোগান দিতে পারিয়া উঠেন না। বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ছাই তুলিয়া, ছেলেকে দুধ দিয়া, তাহার উপর মেয়ের কাছে কণামাত্রও সাহায্য না পাইলে, স্নতিকারোগ-

জীর্ণা মাতা বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সব কয়টিকে কেমন করিয়া সাড়ে নয়টার ভিতর সারাদিনের রসদ যোগান দেন? বিশেষতঃ সারা সহর ঘুরিয়া মেয়ে সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া মেয়ে-স্কুলের গাড়ী বেশীর ভাগই সাড়ে সাতটা হইতে আটটা নয়টার মধ্যেই সর্বত্র আসিয়া পৌঁছে।

পৌষমাস, যেমন প্রবল শীত পড়িয়াছে, তেমনই প্রচণ্ড বর্ষা দেখা দিয়াছে। এক দিকে মেঘ ও অপর দিকে কোয়াশার স্থল অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া ধরণীবক্ষে দিনের আলোর অবতরণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বেলা নয়টা বাজিলেও মনে হইতেছিল, সবেমাত্র বৃষ্টি এই ভোর হইয়াছে। একে ত শীতের ভোরে পাখীরা সহজে সাড়া দেয় না, তাহার উপর বৃষ্টির দৌলতে কাক, পক্ষীরা সকলেই যেন ছয়ার বন্ধ করিয়া বুমাইয়া আছে, কাহারও আর সাড়াটুকু পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু জীবজগতের সর্বত্র ত আর একই নিয়ম চলে না, মনুষ্যজীবের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের ত আর কাহারও ভরা কলসীতে ঠোঁট ডুবাইয়া, বাড়াভাতে মুখ জুবড়াইয়া বেড়াইলে দিন চলিবে না, কাজেই বাত, বর্ষা, আতপ এবং হিমকে পরাস্ত করিয়াই তাহাদিগকে পেটের চেষ্টা দেখিতে হইতেছে। আরামের এবং বিরামের অদৃষ্ট লইয়া তাহাদের জন্ম হয় নাই, তবে ইহারই মধ্যে যাহারা স্মৃতিবলে অপরের বাড়া ভাত খাইবার মত বুদ্ধি ও শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

এলবার্ট বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড অমৃনিবস্থানা দুইটি বার্কক্য-শীর্ণ ও বৃহদায়তন “সেকেণ্ডহাণ্ড” কেনা কালো ঘোড়ার দ্বারা বাহিত হইয়া, সহরের প্রান্তভাগে অনেকগুলো পড়োবাড়ী, খোলার ঘর, কালকাসন্দা, ঘেঁটু ও বাঁশবাগানের পাশাপাশি একখানা অর্ধভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনের পাদানীতে আড়ষ্টভাবে উপবিষ্টা ময়লা ‘চুন্নরী’ শাড়ী

ও ছেঁড়া 'ঝুলা'-পরা বালিকা-বিড়ালয়ের 'দাইঠাকুরানী', চলন্ত গাড়ী হইতে ত্রস্তে নামিয়া পড়িয়া, সেই অসংস্কৃত, জীর্ণ, নাতিবৃহৎ অট্টালিকাটির প্রবেশদ্বারের মধ্যে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—
“নীলীবউয়া! হো নীলীবউয়া! গাড়ী আয়া।”

বাড়ীর ভিতরদিক হইতে একটি উদ্বেগ-বিপর্যয় কণ্ঠস্বরে তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, “ওই শোন মা! আমি ত বলছি তোমায় যে, আজ কিছুতেই আর আমার খাওয়া হয়ে উঠবে না, তা তুমি কিছুতেই শুনলে না ত! এখন?”

“ও মা! মোটে যে গোণা দুটি গরাস ভাত মুখে দিইছিলি রে! এখনি উঠছি কি বল? দুধওয়ালী মাগীও ত এখনও এলো না যে, দুধ একটু নিয়ে না হয় গরম ক'রে দোব। আজ না হয় না-ই গেলি, মা!” নেপথ্যস্থিতা খুব সম্ভব যে সেই সম্বোধিতা মায়েরই কণ্ঠ হইতে এই ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রতিবাদটুকু বাহির হইল।

মেয়ে কিন্তু এই স্মৃতির সমর্থন করিল না; সে অসহিষ্ণুভাবে দ্রষ্টব্য তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তোমার ত অর্ধেক দিনই এই রকম; না গেলে ফাইন দিতে হবে যে! আর সে পরসাত্ত আর তুমি আমায় দেবে না। না, মা! রোজ রোজ সন্ধ্যার সামনে আমায় দাঁড় করিয়ে দেবে, সে আমি পারবো না, বাপু! তার চেয়ে না খাই না-ই খেলুম, আমি—”

দাই হরমতিয়া অগ্রসর তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া, ডাকিয়া উঠিল, “নীলি বউয়া! জলদি আইয়ে বউয়া, মাইজি লোগ কেত্তা বোলতা হায়, আপ ত আপনেসে হি কুছ্ কুছ্ শুনাথা? তব, ফিন্ কাহে এত্তা দেরী করতেই বউয়া?”

“ও মা! না না, তুমি আর কিছু বলো না, মা! এ দাই! তুরন্ত মায় আতেই—”

তুই তিন মিনিট পরেই একটি বছর এগার বারো বৎসরের মেয়ে একথানা আধময়লা মিলের সাড়ী ও বাজে ছিটের আধছেঁড়া একটা জামা পরা, হাতে তার গাছকতক কাচের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ চুলের পিছনে একটা আধখোলা প্রকাণ্ড খোঁপা, একগাদা ময়লা ও মলাটখসা পুরাতন বই-খাতা বগলে চাপিয়া দ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

“হা, নীলি বউয়া! আপ কেত্তা দেরী কিয়া!—” এই মন্তব্য করিয়া দাই মিলিটারী ধরণে পা ফেলিয়া

গাড়ীর দরজা খুলিতে অগ্রসর হইল। গেল এবং মেয়ে গাড়ীর পাদানীতে পা দিবার পূর্বেই তাহার সহাধ্যায়িনীমণ্ডলী হইতে একটা কল্লোলিত কলরব উঠিয়া পড়িল—

“বাবা! নীলিমা! তোমার যে আর সাজা-গোজার শেষ হয় না, ভাই! এতক্ষণ ধরে হচ্ছিল কি, শুনি?”

“রোজই ত ভাই, তোমার দরজায় আমাদের তিন ঘণ্টা ক'রে সময় লাগবে, আমরা তবু তোমার কত আগে বেরিয়েছি, তোমারই বা রোজ রোজ এত দেরী কিসের জন্ত হয় ভাই?”

আর এক জন বলিল, “ও মা! তবু চুলটা ত চারদিন থেকে ওই রকমই বাঁধা আছে দেখছি। মা গো! তুই কি কুড়ে, ভাই! আমি দেখে আজ চান করতে পারিনি, তবু চুলে 'কেতা' ক'রে ফিতে বেঁধে নিইচি তো। তুই ভাই, যেন কি!”

নীলিমা ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের মধ্যে নিজের আসন গ্রহণ করিয়া অপরাধিতাবে সকলের সব প্রশ্নেরই একসঙ্গে এই জবাব দিল, আমাদের যে ভাই বামা-পিসীর অসুখ করেছে, মা'রও শরীরটা মোটে ভাল নেই; তাতে এই রুষ্টি-বাদলা, রান্না হ'তে অনেক দেরী হয়ে গেল, তবু আমি ঠিক গোণা দুটি গরাস মাত্র ভাত মুখে দিয়েই—যেমনি দাইএর সাড়া পেয়েছি, অমনি উঠে পড়ে মা'র মানা না শুনেই পালিয়ে এলুম।”

এই বলিয়াই মায়ের পরিমান ছল্‌ছলে মুখ চোখ মনে পড়ায় তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা মৃদু হাসি উঠিয়া আসিল। কিন্তু তাহার বান্ধবীগণ সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সপ্তরথীর মতন একসঙ্গে তীব্র বিদ্বেষের তীক্ষ্ণস্বরে তাহাকে পুনরাক্রমণ করিয়া বলিল

অণুকা বলিল, “ও মা! বাদলা-রুষ্টি কি শুধু দেবরই বাড়ীতে হয়েছে না কি? সারা সের শুদ্ধ দেবর কি ক'রে রান্না-বান্না হলো, শুনি?”

সুসমা চৌট টিপিয়া মন্তব্য করিল, “নীলির মা যদি কালিয়া-পোলাও চড়িয়ে থাকে কি ক'রে এর মধ্যে শেষ হবে বল? আমরা খিচুড়ী আর আলুবেগুন ভাজা খেয়ে এ নয়। এ তোমার অজ্ঞান কথা যে!”

মনোরমা একটা দুই কাঠীর গলাবন্ধ, পশম দিয়া এই গাড়ীর প্রচণ্ড ঝাঁকানীতে করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বুনিল

এই সময়টুকুর জন্তও তাঁহার সেই লাল সবুজ পশমের সলাইটুকু বন্ধ থাকিলে, কি জানি, কি অনর্থই বা ঘটয়া যাইবে,—তা সেও অকস্মাৎ নিজের সেই একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া মুখ তুলিয়া ও মাথা ফিরাইয়া, সুষমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, “বলি সুখি! তুই বুঝি আর এ সহর খুঁজে পোলাও খাধবার লোক দেখতে পেলিনি? তাই নীলির মায়ের পাঁড়ে ওর দায় ফেলি? হ্যাঁ ভাই নীলি! আজ তাদের কি রান্না হয়েছিল, বল তো ভাই?”

এই প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ভিতরকার রহস্য এ সমাজে নতাস্তই অ-প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া এ কথায় সকল মেয়েরই চাঁটের আশে-পাশে তৎক্ষণাৎ কিছু কিছু হাসির আভাস বিদ্যাতের মতন খেলিয়া গেল। কোন মেয়ে বা সেটাকে সামলাইতে না পারিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াও ফেলিল। নীলিমার গণ্ড ও কর্ণমূল এই বিজ্রপ-প্রশ্নে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে নিজের লজ্জা-বিপন্নতা সম্বন্ধে রোধচেষ্টা করিতে করিতে পাশ্চাত্যে সহজভাবেই উত্তর করিল, “আজকের দিনে আর অত্ন কি হবে? খিচুড়ীই চড়েছিল, মা তাই থেকে হাতায় কেটে আশায় দু’টি তুলে দিয়েছিলেন, তাও আবার গাড়ী এসে পড়লো বলে—”

অণুকা প্রশ্ন করিল, “আজ তা হ’লে তোর মা নিশ্চয় তোকে জলখাবারের জন্ত পয়সা দিয়েছেন? আমি, চাই, আজ চাউ চানাচুর, সাড়ে বত্রিশভাজা, কচুরি আর গোল্লা কিনবো। মনু, তুই কি কি কিনবি? নীলি, তুই?”

মনোরমা বোনা বন্ধ করিয়া তখনই জবাব দিল, “আমি বাালবড় আর গোলাপী রেউড়ির কথা ভেবে, তা ছাড়া যা হয় হবে। কিন্তু নীলি নিশ্চয়ই ছাই ছাই খাবার কিনবে না, সে আজকের দিনে নী, রাবড়ী আর মতিচূর কিনতে দেবে,—হুই, নীলিমা? কেমন তোর ‘মেমু’ তৈরী ক’রে চলে?”

নাম নীলিমা হইলেও সুষমা বা মনোরমার তাহার অনেকটাই সাক্ষ্য, তার সেই এই ব্যঙ্গোক্তিতে অনেকখানি লাল মুখে সে শুধু একটুখানি হাসিয়া তো খুব ভালই হয়েছে; কিন্তু খাবার কিনবো না, বাজারের খাবার যে আমার নয় না, সে তোমরা ভাই, জানই ত?”

“হ্যাঁ,—তা—বটে!” এমন সুর করিয়া মনোরমা এই কথাটা বলিল যে, বাকী মেয়েরা তাদের চাপিবার ইচ্ছা সম্বন্ধেও কেহই আর হাসি চাপিতে পারিল না; কেবল নীলিমাই তাহাদের সেই হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াও হাসিতে ত পারিলই না, উপরন্তু তাহার সমস্ত মুখটা অপমানের লজ্জায় অধিকতর রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ইহার ভিতর তাহাদের সুবৃহৎ যান গমগম শব্দে সমস্ত মহরের রাস্তা কাঁপাইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে ভিতরের মেয়েরা ছড়াছড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আজও তাহারা ‘লেট’ আসিয়াছে। স্কুলের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে এবং দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, সে দিনও স্কুলোচনাদি’র মুখের চেহারাখানা বেশ সুপ্রসন্ন নয়। ইহা দেখিয়া সকল মেয়েই একসঙ্গে ত্রুটি করিয়া ভয়বিপন্নমুখী নীলিমার আনত মুখের দিকে এমনই ভাবে চাহিল যে, তাহার এ অর্থ করাও অসম্ভব হয় না—যে, এই সব কোপকটাক্ষে সে যদি ভয় হইয়া যায় ত হয় ভাল!—তাহা হইলে ত আর রোজ রোজ তাদের ‘বি না থাকার’, মায়ের অসুস্থতার’, ‘বাপের কোন কিছুর’ দরুণ ভাত না হওয়ার দায়ে সবাইকার এই অযথা বিলম্ব ঘটয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেমেয়ের গালভরা বাহারে নাম রাখিতে যদি কিছুমাত্র পয়সা খরচ হইত, তাহা হইলে নীলিমার পিতা অনুকূলচন্দ্র কখনই তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণলতার উপর তাঁহার ছেলেমেয়েদের নামকরণের ভার দিয়া নিশ্চিত হইতে পারিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে আজও আমাদের কর্তৃপক্ষীয়গণের অনবধানতা প্রযুক্ত এই একটা ব্যাপারের উপর কোনরূপ কর ধাৰ্য্য করা এখনও পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই অনুকূলচন্দ্রের পত্নী তাঁহার দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই একটা বিষয়েই শুধু একটুখানি স্বাধীনতা লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। তা মনের ক্ষোভ তিনি এ বিষয়ে কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, মানুষে ছাড়িলে আবার যমে ছাড়ে না যে! যম-দূতেরই একটি ছোটখাট সংস্করণ স্বামিরত্নটি যদি বা একটুখানি উদারতা দেখাইলেন ত ভাগ্যানিয়ন্তা

বাম হইয়া সেই জোড়গাঁথা নামগুলির কয়েকটিকে খসাইয়া লইয়া চিরসহিষ্ণু, ধৈর্যশীলা, শান্তপ্রকৃতি মায়ের বুকেটাকে মড়মড়িয়া তালিয়া দিলেন। একটির পর একটি করিয়া স্বর্ণলতা তাঁহার পূর্ণিমা, সুরমা ও সুষমাকে হারাইলেন। বাকী রহিল কেবল তাহাদের সহিত মিল রাখিয়া রাখা নাম সকলের ছোট মেয়েটি নীলিমা। আবার এ দিকে অরুণেন্দু, নিশ্বলেন্দু দুই জন চলিয়া গেল, শুভেন্দু এদের সবার ছোট, সেইটিই শুধু মায়ের কোল জুড়িয়া রহিল। এমনই করিয়াই কৃপণ স্বামীর স্ত্রী স্বর্ণগতা নিজের অশন-বসন-ভোগ-বিলাসের একান্ত অভাব সত্ত্বেও সকল দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবকে তুচ্ছ করিয়া যে মহাধনে নিজেকে ইন্দ্রাণীসমা বোধ করিয়া গৌরবানন্দে পরিপূতা হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাহার প্রায় সবটুকুকেই বিসর্জন দিয়া জীবন্যুতা হইয়া রহিলেন। সাতটি সন্তানের মধ্যে বাকি দুইটির উপরই বা কিসের আশা? সদা মনে হারাই, হারাই,—এই ভাবে যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা, ইহার চেয়ে মানুষের পক্ষে আর অভিশাপ বুঝি কিছুতেই নাই! তা তেমন করিয়াও মানুষকে প্রায়ই ত বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং স্বর্ণলতাও রহিলেন।

শুভেন্দু ছেলেটি খুবই মেধাবী বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন নয়। তাই বলিয়া ছোটবেলা হইতে যত্নপূর্বক পড়া-শুনা করাইলে সেও যে 'মানুষ' হইতে পারিতই না, তেমন কোন মন্দ লক্ষণও তাহার শৈশব-জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে, এমনও মনে পড়ে না। কিন্তু শুভেন্দুর পিতার নাকি ভবিষ্যদর্শনজ্ঞানটা অত্যন্তই প্রবল, তাই তিনি তাঁহার এই একমাত্র পুত্রকে বিদ্যালভের পক্ষে একান্ত অসমর্থ জানিতে পারিয়া প্রথমাবধিই তাহার জন্ত কোন প্রকার যত্ন লয়েন নাই। বিশেষতঃ ছেলেরা আজকাল বিদ্যালয়ে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একান্ত ধৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে ও পিতামাতা—বিশেষতঃ পিতার প্রতি আর যথোচিত বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে পারগ হইতেছে না, এই প্রকার হেতু-প্রযুক্ত ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রতি শুভেন্দুর পিতার বিশেষরূপেই একটা প্রচণ্ড বিরাগ ছিল। তবে ইংরাজী বিদ্যা বয়কট করিয়া রাখিয়াও যে ছেলেদের পক্ষে অপর বিদ্যালভ করিতে পারা সম্ভব, এমন কুতর্ক তুলিবার মত লোক সৌভাগ্যক্রমে এ পরিবারে বা ইহার বাহিরে তেমন কেহই ছিল না, যে এক জনমাত্র ছিলেন, তিনি অনুকূলচন্দ্রের এক জন বাল্যবন্ধু, নাম তাঁহার

ভুবনমোহন রায়, এক্ষণে বহুবর্ষ যাবৎ দুই জনে সাক্ষাৎ নাই। কাজেই নির্বিরোধে শুভেন্দুর বাধ্যতা-মূলক স্ন-শিক্ষা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ কোনরূপ শিক্ষা-লাভেরই ব্যবস্থা হইল না। বিদ্যা তাহার পাঠশালা, বাঙ্গালা স্কুল প্রভৃতি হইতে আর উর্দ্ধনীমায় উঠিতে পাইল না। এত দিনের পর হঠাৎ একদা একটা সুযোগ যদিও বা নিজে হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও তার ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ লইয়া গেল।

অনুকূলের বাল্যবন্ধু ভুবনমোহন একটা মোকদ্দমায় আসিয়া এক বেলায় জন্ত বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে ডাল-ভাত, সজিনাখাড়া চচ্চড়ি, মোরলা মাছের অম্বল ও খয়রা মাছ ভাজার পরিবর্তে তিনি বন্ধু-কন্তা নীলিমার হাতে এক জোড়া সোনার ইয়ারিং ও জিয়া দিলেন এবং বন্ধুর সঙ্গে বিস্তর তর্ক-তর্কির পর বন্ধুপুত্র শুভেন্দুকে বিদ্যাশিক্ষার্থ নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বন্ধুর হাতে ছেলে দিলে খরচের ভাবনা নাই, সে কথা অনুকূলও জানিতেন এবং বন্ধুও প্রথমাবধি সে ভরসা দিয়াছিলেন। ইহাতে অসম্মতির কিছুই ছিল না, বরং শুভেন্দুর উপর যেটুকু খরচ পড়ে, সেটুকু শুদ্ধ বাঁচাইতে পারা যাইবে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুকূল সুদূর-ভবিষ্যতে তাঁহার এই ইংরাজীশিক্ষিত উত্তরাধিকারীর কথা মনে করিতেই সর্বাস্থে শিহরিয়া উঠিলেন। ইংরাজী শিখিলে সে কি তখন আর এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিবে, বাপের মত আটহাতি ধুতী বেনিয়ান পরিবে, না চান-ভিজা ও গুড় দিয়া জলখাবার খাইতে রাজী হইবে? উঃ, তখন হয় ত ডসনের জুতা, আঙ্গুর পাঞ্জাবীতে ও মাংসের কাটলেটে তাঁহার বুকের রক্তস্বরূপ টাংকা দুইদিনের মধ্যেই উড়াইয়া দিয়া শুভেন্দু পথে পথে করিয়া বেড়াইবে। এই দুশ্চিন্তা মনে উদ্ভিত হইয়া তিনি উঠিয়া তীব্র ও অকাট্য প্রতিবাদ তুলিলেন, 'মরহাজা একটামাত্র ছেলে; ও ছেড়ে থাকতে কিছুতে রাজী হবে না।'

ভুবনমোহন তৎক্ষণাৎ নীলিমার দিকে কহিলেন, 'তোমার মা'কে এই দোরের দাঁড়াতে বল তো খুকি! আর তাঁকে দি শুভেন্দুকে আমার সঙ্গে লেখাপড়া শেখা দিতে তাঁর কোন অমত আছে কি না?'

অনুকূল নেপথ্যে অবস্থিত পত্নী করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, 'বে'

চিন্তে দেখ, গিন্নি! হঠাৎ একটা খামখেয়ালী ভাবে যেন কিছু ক'রে বসে না। ছেলে ছেড়ে দিয়ে যে শেষকালে প্যান-প্যান ক'রে কাঁদতে বসবে, সেটি যেন হয় না দেখো। তাতে তোমার আবার বুকের ব্যামো আছে।

নালিমার মুখ দিয়া স্বর্ণলতা জানাইলেন, ছেলে ছাড়িয়া তিনি এক দিনও টিকিতে পারিবেন না।

হিতকামী সুহৃদ সুদীর্ঘ নিখাসসহকারে বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্বে তিনি আর একবার গৃহ-স্বামীর অজ্ঞাতে তাঁহার বালিকা কন্যা দ্বারা পুত্রস্নেহে তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্বন্ধে বিচারশক্তিহীনা জন্মনির নিকট এ সম্বন্ধে বিস্তর দরখাস্ত পাঠাইয়া এই একই উত্তর পাইয়াছিলেন।

স্বর্ণলতার যদিও নিজের সম্ভানের সম্বন্ধে এতবড় অবিচার করিতে বুক ফাটিয়া গেল, কষ্ট চাপিয়া আসিল, শেষে চোখের জলে বুক ভাসিল, তথাপি স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইয়া আসিল না। নতুবা ভদ্র-ঘরের মেয়ে স্বর্ণলতা নিজ সম্ভানের শুভাশুভ সম্বন্ধে যে জ্ঞানগম্য-হারা হইয়া নিজের খেয়ালেই তাহাকে কাছে টানিয়া রাখিলেন, তা নয়। আসল কথা, অনুকূলচন্দ্রের স্ত্রী স্বর্ণলতা যদিও বয়স ও পদমর্যাদায় গৃহিণী, জননী এবং এমন কি, তাঁহার প্রথম সম্ভানগুলি বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে স্বশ্রমাতার পদবীতেও উন্নীত হইতে পারিতেন, তথাপি স্বভাবে আজও তিনি সেই নবোঢ়া বালিকারই ছায়া তাঁহার স্বামীর কাছে ভরসাকুচিয়া হইয়া আছেন। সংসারে এক এক জন মানুষ দেখা যায়, যাহাদের

কিছুই মনে হয়, তাহারা যেন জগতে কেবলমাত্র বিত হইবার জন্তই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্বামী-বটেই, পাড়াপ্রতিবেশীরাও সুযোগ পাইলে সম্বন্ধে একটুখানি না একটুখানি অবিচার এবং তাহারাও নিরীক্ষারোধে উহা সহ্য কর শুধুই যে সহ্য করে, তাও নয়; তাহাদের মন অস্থায় হইতেছে, এমন কথা মুখে ত তাহাদের মনেও হয় ত পড়ে না। চির-সহিয়া ঐ জিনিসটাই যেন জগতের একমাত্র পাওনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠাট্টা বিশ্বাস নিজের মনেও জন্মিয়া যায়। টিকি এই প্রকৃতির। দশ বছরে বিবাহ হকী" শাশুড়ীর হাতে অশেষবিধ লাঞ্ছনা

সহিয়াছেন, বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্বাবাসের ক্রটি ঘটিলে তাঁহার গালি খাওয়ার অন্ত থাকিত না। এক-বার কি একটু প্রতিবাদ করিতে যাওয়ায় ইহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর মুখে জলন্ত দিয়াশালাইয়ের কাঠি চাপিয়া ধরিয়া "বউ মানুষের চোপা করার" এমন এক শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন যে, বধূর মুখ সেই দিন হইতে ছুঁচ-সুতা দিয়া সিলাই করিয়া দিলেও এর চেয়ে বেশী করিয়া আর বন্ধ করিতে পারা সম্ভব হইত না। সেই যে বালিকা স্বর্ণলতা তাঁহার প্রতি শাশুড়ীর সকল অত্যাচারকে নীরবে সহিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন, আজও প্রোঢ়া গৃহিণী ঠিক তেমন ভাবেই দেব-মানবের সকল অত্যাচারকেই "চিন্তারহিত" কি না বলা যায় না—তবে "বিলাপরহিত" ও অপপ্রতীকারপূর্বক নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। দৈববিপাকের বিরুদ্ধে দেবতাকেও তিনি কোন দিন দোষী করেন নাই এবং মানুষকেও না। এমন কি, নিজের ভাগ্যকে পর্যন্ত কোন দিন তাঁহাকে নিন্দা করিতেও কেহ শুনিতে পায় নাই।

স্বর্ণলতার বিবাহ হয় বৈশাখমাসে। দারুণ গ্রীষ্ম বিবাহের সময় বলিয়া শয্যাদানের সঙ্গে তাঁর বাপ তাঁকে গায়ে দিবার লেপ দেন নাই; আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঘর-বসতও হইল আশ্বিনে। তখনও তাই লেপখানি দিতে বাদ পড়িল। পৌষমাসের কনুকের নীতে তাঁর শাশুড়ী তাঁহাকে গায়ে দিতে একখানি পুরাতন কাঁথা দিয়া বলিলেন, "বাপ মিন্বে লেপ দিলে না যে, আমি কোথা থেকে কি দেবো? তার মেয়ের জন্তে ঘরের পয়সা ভেঙ্গে লেপ কি আবার তৈরী করতে যাব না কি? ঐ গায়ে দিক।" তা এখন প্রায় সেই এক ব্যবস্থাই তাঁহার জন্ত চলিতেছে। শাশুড়ী মরণকালে নিজের প্রতি-নিধিতে যে ছেলে রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা মৃত্যুর অন্তিম অবমাননা ঘটিতে পায় নাই।

অনুকূল স্ত্রীকে সংসার-খরচ করিতে মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা দিতেন, ইহার ভিতর অশন-বসন সমস্তই চালাইতে হইত। ইদানীং স্ত্রীর হাতে বাজে খরচ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নিজের হাতেই সমস্ত খরচপত্র রাখিতে হইয়াছে। তবে স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি নাকি নিতান্তই অবিচার করিতে পারেন না; তাই ছয় মাস অন্তর যখন কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করা হয়, তখন দুই তিন টাকা করিয়া তিনি স্ত্রীর হাতে দিয়া থাকেন। কারণ, ঐ টাকার মধ্যে হাজার পাঁচেক টাকা স্বর্ণলতার বাপের বাড়ী হইতে

পাওয়া গিয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুতে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান স্বর্ণ, শুধু ঐ টাকা কেন, আরও অনেক কিছু লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়াও কোন সময় সে সকল সম্বন্ধে কোন কথাটি পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিতেন না। স্বামী হাতে ভুলিয়া হেলান শ্রদ্ধায় যেটুকু দিতেন, সেইটুকুই কি তিনি ভরসা করিয়া খরচ করিতে পারিতেন? যদি কোন দিন খরচের হিসাব চাহেন? অব্যবহারে সকল জিনিসেই যেমন মরিচা ধরে, এ মেয়েটির সমস্ত মনোবৃত্তিরই বোধ করি সেই রকম ভ্রবস্থা ঘটিয়া থাকিবে। তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তির একটা অংশ খুব সজাগ ছিল—সেটা ভয়।

বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও ইহারই ভিতরে স্বর্ণলতাকে অনুকূলচন্দ্রের দিদির বয়সী মনে করিতে পারা যাইত। তাঁহার গায়ের রং এক সময় বেশ উজ্জল ছিল, আজও তাহার আভাস তাঁহার অত্যন্ত শীর্ণ ও অযথা লোল চর্ম্মের উপর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ দেহ ইহার মধ্যেই মধ্যভাগে যেন নত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছিল। ললাটের গুহ চর্ম্ম রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মাথার চুলের অর্দ্ধেকগুলি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। গালের মাংস লোল হইয়া, গায়ের মাংস শীর্ণ হইয়া তাঁহাকে যেন একটি রসহীন আতপশু ফলের মতই দেখাইত। কিন্তু তাঁহার সচকিত ভীত দৃষ্টির মধ্য দিয়া এবং শুক্ক মৌন শাস্ত অধরের অভ্যন্তর হইতে এখনও যেন একটি অতৃপ্ত বালিকাজীবনের সাড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শুক্ক বালুরাশির তলদেশে এখনও যেন অনেকখানি স্বচ্ছ শীতল সলিল কোথায় লুকান আছে বলিয়াও একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু দর্শকের সে সন্দেহভঞ্জন করিবার কোনই পথ ছিল না, দ্বারে তার কড়া পাহারা।

যাহা হউক, এইরূপে “মাতা শত্রু” এবং “পিতা বৈরী” হইয়া তাঁহাদের বালকটির পড়া-শুনার পথে যখন কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া বসিলেন, তখন কোথা হইতে আর এক অদৃশ্য শক্তি আসিয়া আর একটা অভাগা জীবের আশ্চর্যরূপ সহায়তা করিয়া বসিল। পাড়ার নরহরি ভট্টাচার্য্যের এক বয়স্থা অনুতা কত্থা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত বলিয়া অনেকেই—বিশেষ করিয়া আবার অনুকূলচন্দ্রই সে বেচারাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িয়াছিল। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, এক মোটা মাহিনার মধ্যবয়সী রাজকর্ম্মচারী তাঁহার

দ্বিতীয় পক্ষের জন্ত সেই বয়স্থা ও লেখাপড়া-জান্না মেয়েকে, তাহার সৌন্দর্য্যহীনতাকে তুচ্ছ করিয়াও বিনা পণে বা সামান্য পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবাহসভায় বরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে বরটি গম্ভীরমুখে উত্তর দেন যে, “গায়ের চামড়া একটু কটা পাওয়া যাইতে পারে, পয়সাও অকিঞ্চৎকর নয়; কিন্তু স্ত্রীকে ‘ক থ’ শেখাইতে বসার পরিশ্রম উহার দ্বারা পোষাইয়া উঠে না। এই মেয়েটি সেলাই জানে, হাতের লেখা ভাল; গান-বাজনাও জানা আছে, ছোট ছেলেমেয়েদের কতকটা শিক্ষাও দিতে পারিয়া আমার ভার লাঘব করিবে।”

এই ঘটনায় অনুকূলচন্দ্রের চোখ ফুটিয়া গেল। তিনি বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “বলি গিন্নি! ওগো! বলি শুন্‌চো? কাল থেকে আমি নীলিকে মেয়ে-স্কুলে ভর্তি ক’রে দেবার সব ঠিকঠাক ক’রে এসেছি। এবার কিন্তু আর তোমার কাঁছনী শুন্‌ছিনে যে, মেয়ে ছেড়ে সারাদিন কেমন ক’রে থাকবো! সেটি আর তোমার হচ্ছে না, বাপু। আজকালের দিনে মেয়েছেলের একটু লেখাপড়ার দরকার হয়েছে।”

স্বর্ণলতা অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি যে কি শুনিতেন কি শুনিলেন, তাহাই যেন ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে বাড়ীতে ছেলের বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ, সেই বাড়ীর মেয়ে চলিল কি না স্কুলে ভর্তি হইতে?

কিন্তু বিশ্বাস তাঁহাকে করিতেই হইল। ইহার পরদিন সকালে যখন ঘড়-ঘড় হড়-হড় শব্দে মেয়ে স্কুলের গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের দরজায় দাঁড়াইল, তখনই অনুকূল আন্তে-বাস্তে আসিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেই গাড়ীর সঙ্গে আগতা স্কুলের দাইয়ের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন।

শুভেন্দু আসিয়া অভিমানে জলভরা চোখে মার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইল, ফুক-কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, “নীলিকে যে স্কুলে পাঠান হলো বড়?”

স্বর্ণলতা এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া নিঃস্বরে কহিলেন, “ওর ইচ্ছা হলো, বাবা।”

শুভেন্দু বলিল, “তা’ হ’লে আমার বেলাই বা হলো না কেন ওর ইচ্ছাটা?”

স্বর্ণলতা চকিতে ছেলের দিকে চাহিয়া সত্যে কহিয়া উঠিলেন, “চুপ কর, শুভেন্দু!”

শুভেন্দু একবার নিজের পিছনটার চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া লইল, তাহার পর সে দিক্ দিয়া উপস্থিত আশঙ্কার কারণ না দেখিয়া সে দৃঢ় এবং রুদ্ধকণ্ঠে পুনশ্চ নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কহিল—

“কেন, ইস্কুলে পড়লে যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হ’লে নীলিই বা হবে না কেন? ও কি চাকরী ক’রে পয়সা এনে তোমাদের খাওয়াবে না কি? ও যদি পড়তে যেতে পারে ত আমিই বা তা পাবো না কেন, শুনি? আমাকেও দিতে হবে ভর্তি ক’রে ইস্কুলে। নিশ্চয়ই দিতে হবে।”

স্বর্ণলতা তখন একখানা ছেঁড়া কাঁধার উপর আর এক খানা পুরাতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিতেছিলেন, সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং সম্মুখে ও সম্মুখে ছেলের একটা হাত হাতে ধরিয়া তাহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃদু ও ভীতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “ইংরেজী পড়া উনি পছন্দ করেন না, তারই জন্তেই ত তোমায় ইস্কুলে দেন নি, নইলে আর দিতে কি? নীলি ত আর ইংরেজী পড়তে না ও এখন দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয় পড়তে বৈ ত না, তুমি এ নিয়ে আর গোলমাল করো না, লক্ষ্মী-গোপাল আমার!”

শুভেন্দু গা-ঝাড়া দিয়া মায়ের হাত গায়ের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। উদ্ধত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে স্বাক্ষরের সঙ্গে কহিল, “হঁ—গোল করবে না বৈ কি! ‘লক্ষ্মী-গোপাল’ বৈ কি! আমি কিসের লক্ষ্মী-গোপাল! সে ত তোমাদের ঐ ধীজি আচ্ছাদনী নীলি। বা রে মজা! মুখপুড়ী মেয়ে, সন্ধ্যাকাল খেয়ে দেয়ে গাড়ী চ’ড়ে ইস্কুলে যাবেন, পড়তে শিখবেন, আর আমি বাড়ীতে সন্ধ্যার পাত কুড়িয়ে খাব, গরুর খড় কাটবো—নেদি কুড়বো—বা রে মজা!”

ক্ষীণ ও শুষ্ককণ্ঠে মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, “ছেলেদের ইস্কুলে অনেক খারাপ ছেলে আছে কি না,—সেই জন্তেই ত দিতে পারেন না, না হ’লে তুমিও ত পড়তে। সেবার বিপিনের সঙ্গে কি রকম মারামারি করেছিলে, মনে নেই?—তাইতেই ত ছাড়িয়ে নিতে হ’লো—”

শুভেন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল—“মিথো কথা—মিথো কথা; তোমাদের ও-সব চালাকী আমি খুব বুঝি! দেশ শুদ্ধ সব ছেলেই ইস্কুলে যাচ্ছে, আর

আমি গেলেই নাকি বয়ে যাব? আচ্ছা, দেখ তা হ’লে, আমি বাড়ীতে থেকে বয়ে যেতে পারি কি না! এবার থেকে যত সব মন্দ ছেলে বেছে বেছে তাদের সঙ্গেই বেড়াবো। দেখছো ত ইস্কুল ছেড়ে অবধি সারা-দিনই ঘুড়ি ওড়াই আর লাটু খেলি? এখন থেকে কেবলই ঘুড়ি ওড়াবো, লাটু খেলাবো, কপাটী খেলাবো, সাঁতার দোব, এই সব দিনরাত করবো, তোমাদের গরুর খড় কুচুতে বলে গুনছি তাই কলা—”

ক্ষীণ বহির্ঘরে মনুষ্যপ্রবেশজনিত বেশকটা শব্দ গেল, তাহাতেই এই বালক-বীরের বীর্যসে কিছু বাধা পড়িয়াছিল। পরক্ষণেই শুকনো ও ছেঁড়া চটির যে চিরশ্রুত অপূর্ণ বাদ্যধ্বনি উথিত হইল, তাহাতেই একেবারে সকল বীরত্ব জলাঞ্জলি দিয়া সে শুষ্ক ও বিপন্নমুখে তাহার বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলাইল।

স্বর্ণলতার গভীর ভারাক্রান্ত অন্তর ভেদ করিয়া একটা কষ্টবহুল সুদীর্ঘ নিশ্বাস এতক্ষণের পর উথিত হইয়া আসিল, কারণ, ছেলের সাক্ষাতে এতটুকু স্বাধীনতাও তিনি গ্রহণ করিতে ভরসা করেন নাই।

বলা বাহুল্য, ঐ ছেঁড়া চটির অধিকারী ব্যক্তি তাহারই স্বামী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কুলের ছুটির পর সকল মেয়েই যখন বাড়ী ফিরিবার জন্ত হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীর চারিপাশে জড় হইয়াছে এবং একে একে বা একসঙ্গেই দুই জনে লাফা-লাফি করিয়া আগে উঠিবার চেষ্টায় সোরগোল লাগাইয়া দিয়াছে, বারান্দার উপর হইতে বিজ্ঞানায়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তখন ডাকিয়া বলিলেন, “নীলিমা! শুনে যাও।”

এই আহ্বান পাইয়াই নীলিমার মুখ একটুখানি স্নান হইয়া আসিল। ‘সুলোচনাদি’ কি জন্ত যে তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কথা তার ত আর অজ্ঞাত নয়, এবং এরূপ ভাবে আহ্বান পাওয়াও ত আর তার পক্ষে এই প্রথমবার নহে। ভয়ে ভয়ে কিরিয়া আসিয়া সে নতমুখে তাঁর সামনে দাঁড়াইল।

সুলোচনা বহু পূর্বে বালিকা-বিজ্ঞানায়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী থাকিলেও এক্ষণে প্রতিনিধিত্বে তিনিই প্রধানার পদ অধিকার করিয়া আছেন, নীলিমা কাছে

আসিতেই নিজের পদমর্যাদার উপযুক্ত গাভীরের সহিত তাহাকে প্রণয় করিলেন, “তোমার বাবাকে সে চিঠি দিয়াছিলে?”

নীলিমা নতনেত্রে, ষাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে তাহা দিয়াছিল।

“কি বললেন তিনি?”

নীলিমার কপালে একটু একটু ঘাম দেখা দিল। তিনি বাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা বলিবার শক্তি বা সাহস তাহার প্রাণে থাকিলে তবেই ত সে তাহা বলিবে? আবার মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিবার অভ্যাস—তাহাও সে কোন দিন করে নাই। কাজে কাজেই অত্যন্ত বিপন্ন ও অতিশয় বিমর্ষভাবে সে নিজের পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল, মুখ দিয়া তাহার একটি শব্দও বাহির হইল না।

তিনি যে ‘কি বলিলেন’—এ প্রশ্নের উত্তর এর চেয়ে আর বেশী সরল ভাষায় পাওয়া সম্ভব ছিল না, সুলোচনা বসুও তাহা বুঝিতেন। তাই মনে মনে এদের পরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও বাহিরে তিনি আর এই বিপন্ন জীবটিকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; শুধু স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ-গভীরস্বরে বলিলেন, “প্রায় তিন বৎসর তুমি এখানে ভর্তি হয়েছ, কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা তোমার মাহিনার দারুণ একটি পরীক্ষাও কখন পাই নি। বেশী পীড়াপীড়ি হ’লে পাছে তোমার ছাড়িয়ে নেন, সেই জন্ত মায়া ক’রে আমরাও তাঁকে তার জন্ত বড় একটি ব্যস্ত করিনি, সে ত তুমি সব জানোই? কিন্তু এখন আর কারকে ‘ফ্রি’ রাখা সম্ভব হচ্ছে না, স্কুলের গবর্নমেন্ট-‘এড্’ প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। নানা রকমে খরচ বেড়েছে, সেই জন্ত সকল ক্লাসের মেয়েদেরই কিছু কিছু মাইনে বাড়িতে হলো। যে সব টাকা অনাদায়ী হয়ে প’ড়ে আছে, সে সব আদায়ের জন্ত উপর থেকে কড়া হুকুম এসেছে। এ সব না হ’লে আমাদের চাকরিতেও টান পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনারও আভাস এবার ইন্সপেকট্রিস মিস্ বিল দিয়ে গেছেন। তোমার বাবাকে সব কথাই বেশ ক’রে খুলে লেখা হয়েছিল, তাতেও ত তিনি দিব্যি নীরব হয়ে রইলেন। তা, তা হ’লে আর কি করা যাবে বলো? এই চিঠিটা আবার আজ দাও গে, পনের দিনের মধ্যে হয় অন্ততঃ অর্ধেকটা পাওনা দিয়ে দিন, না হয় ত’ তোমাকে আর কেমন ক’রে চিরদিন ধ’রে এমনিতে পড়ান যায়?”

৫৫ (খ)—২

এটা অন্তের পক্ষে বড়ই ‘ব্যাড-একজাম্পল’ হচ্ছে, অর্থাৎ কি না, দৃষ্টান্তটা তো ভাল হচ্ছে না। তোমার নজীর সবাই দিতে আরম্ভ করেছে, বড় অনুবিধায় পড়া গেছে। বুঝতে পারলে?”

নীলিমার দুইটি চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছিল, পাছে সে জল প্রভাতকালের শিশিরের মত মাটির বুকে ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজেকে সম্বরণ করিতে করিতে কোনমতে একটুখানি ষাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে বুঝিয়াছে। তার পর অন্তদিকে মুখ করিয়া সে হাত-পাতিয়া সুলোচনা বসু প্রদত্ত খামে আঁটা চিঠিটা লইল।

নীলিমার সঙ্গিনীগণ তাহার হাতের খামখানায় কি লেখা আছে, দেখিবার জন্ত তাহাকে ঝাঁক বাঁধিয়া ধরিয়া ফেলিল—“দেখি, দেখি, আজ আবার কার নামের চিঠি এলো? ‘অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী স্যার’। অ-ভাই! রোজ রোজ সুলোচনা’ তোর বাবাকে কি সব এত লেখেন তাই? কৈ আমাদের বাবাদের ত কৈ তিনি কিছুই লেখেন না!”

মনোরমার সেই দুই কাঠির বোনাটা এখন অনেক খানি লম্বা হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্ত এখন সেটাতে ঝাকড়া জড়াইয়া পিন আঁটিয়া সেটাকে বলের মতন গোলাকারে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। গাড়ী-চলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বোনাটা হাতে লইয়া প্রথম প্রশ্ণকারিণীকে লক্ষ্য করিয়া একটা বাণ ছুড়িল—“মালতি! তুই যেন কি! তোর বাবা গবর্নমেন্টের উকীল, মাসে দু’হাজার টাকা রোজগার করেন, তোর স্কুলের মাইনে কি কখনও দিতে বাদ প’ড়ে থাকে যে, তোর বাবার কাছে সুলোচনা’র চিঠি যাবে?”

প্রতিমা অমনি টানা সুরে ষাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, “ও মা, তাই! সেই জন্তই সুলোচনা’ বারান্দা থেকে যক্ষুনি নীলিমা ব’লে ডাকলেন, তক্ষুনিই নীলির মুখটি শুকিয়ে যেন এতটুকুখানি হয়ে গিছিলো। তুমি নিশ্চয় তখনই বুঝতে পেরেছিলে, না নীলিমা?”

নীলিমা নীরবে একটা ঢোক গিলিল, কথা কহিল না।

মনোরমা তাহার ছোট বোন প্রতিমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া ক্ষুরঝণের মত তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “শিশী কি যে বলে! ও নাকি আর তাই বুঝতে পারেনি? এই ত আর প্রথমবার ওর হাত দিয়ে ওর বাবার

কাছে তাগিদের চিঠি পাঠান হয় নি যে, ওর বুঝতে বাধবে! 'ও' ত, 'ও, আমিও ত' যেই স্লোচনাদি' ওকে ডেকে বলেছেন, 'নীলিমা শুনে যাও'—তক্ষুনি বুঝতে পেরেচি যে, কি জন্তে তিনি ওকে ডাকছেন।"

অনুরূপা বলিল, "আমিও ভাই।"

সাবিত্রী মেয়েটি সকলের পিছনে বসিয়া ছিল, সে সেখান হইতে মুখ বাড়াইয়া দিয়া করকাপাত তুল্য খনখনে কঠিন স্বরে নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল, "তা নীলিমা! তোমার বাবাকে তুমি স্কুলের মাইনেটা দিয়ে দিতে বলতে পার না? সত্যিই ত বার মাস ত্রিশ দিন ওঁরা কি তোমায় 'ফ্রি'তেই পড়াবেন না কি? কি অত্যাচার তোমাদের!"

শুনিয়া ছুই এক জন মেয়ে পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়া করিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, কিন্তু মনোরমা মেয়েটি নাকি কাহারও কোন অসৈরণ সহিতে একেবারেই অভ্যস্তা নহে, কাজেই সে সোজাসজি খপ করিয়া অমনি বলিয়া বসিল—"সত্যি না কি, সাবি! অত্যাচার না কি? তা হ'লে তোমার দাদামশাই সেই অত্যাচারটা কি ক'রে ক'রে থাকেন ভাই? আমি এই সে দিন স্লোচনাদি'র সঙ্গে রামদীন চাপরাসীর কথা হচ্ছিল শুনেছি যে, তোমারও তো সাত আট মাসের মাইনে আদায় করতে বেচারী বোলধেয়ে যাচ্ছে। তা তুমিই বা এমন অত্যাচার সহিচো কি ক'রে?"

তখন দলপতিক (পত্নী?) কিরিতে দেখিয়া ছাত্রী-সমিতির মধ্যেরও হাওয়া বদলাইয়া গেল। সুষমা তখন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর ও বেচারী তার বাবাকে কেমন ক'রেই বা টাকার জন্ত তাগিদ দেবে, ভাই? সে বরঞ্চ স্লোচনাদি'রই দিতে পারেন।"

সাবিত্রী মেয়েটি মেয়েদের স্কুলের মধ্যে না কি কলহ-বিজ্ঞাপন বিশেষ পারদর্শিনী।—তবে এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কারলাভ অবশ্য এ পর্য্যন্ত সে যে করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, ওই বিষয়ে স্কুলে কোন প্রাইজ এখন পর্য্যন্ত দিবার ব্যবস্থা ছিল না, থাকিলে মনোরমার পরিবর্তে বোধ করি সে-ই দেটা পাইত। তবে তাদের 'ব্র্যাকেটে' পাশ করাও নেহাৎ অসম্ভব ছিল না। কারণ, হাঁক-ডাক কম থাকিলেই যে নৈপুণ্যের অভাব বুঝায়, তাহা নহে। বরং টিপিয়া টিপিয়া চোখা চোখা শরৎকপ করিতে জানাতেই সমধিক সমরপটু বুঝায়। এখন মনোরমার মন্তব্য

শুনিয়া বড় বড় ডাব্‌ডেবে ছুই চোথকে গোল করিয়া পাকাইয়া সাবিত্রী যেন বাঘের মত গর্জিয়া তাহার শত্রুপক্ষের উপর হুমকি দিয়া উঠিল, "বলি মোনা! তোমার যে বড্ডই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে দেখতে পাই? আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের মাইনের টাকা ইন্সুলকে দেয় বা না দেয়, তোমার তাতে কি আসে যায় শুনি? তুই যা খুসী তাই ট্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক ক'রে বলবি ক্যান্‌ লা? ফের যদি কখন আমার সঙ্গে লাগতে আসবি, তা হ'লে—"

"কি, মা'বি না কি? সুষমা, লীলা, অনুরূপা, সবাই সাক্ষী থাকুলি, এর যদি না আমি একটা প্রতীকার করি, তা হ'লে—"

"কি প্রতীকার করবি লো? জেলে দিবি না ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবি?"

এইরূপ সলজ্জ আশ্ফালনে পথের দুই সারি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে করিতে নেপথ্যাচারিণীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখিনী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যদিও সে সময়টা অমুকুলচন্দ্রের বাড়ী থাকিবার সময় নয়, তথাপি কি ঘটতে কি ঘটে, দৈবের কথা বলাও ত যায় না, তাই বাড়ী ঢুকিয়া নীলিমা সতর্ক চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল ও তাহার পর কতকটা আশ্চর্যচিত্তে ঈষৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে অনতি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

"এস, মা এস!"—বলিতে বলিতে ক্ষীণাঙ্গী ক্রান্তমুর্তি জননী তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে বসান খাতায় চারিটি গম লইয়া স্বামীর রাত্রিতে রুটী খাওয়ার জন্ত আটা পিষিতেছিলেন।

"এস, মা, এস—আহা, মুখটি শুকিয়ে গেছে রে! সারাদিনটাই উপোসে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে রান্নাঘরে আস, চারিটি ভাত শেষ ক'রে ফুটিয়ে রেখেছি, একটু ছুখচিনি দিয়ে খাবি, চল।"

নীলিমার পেটের মধ্যে যে রকমের উগ্র জ্বালা ছিল, তাহা হইতে তাহার অপমানাহত ক্রুদ্ধ মন ওই শুভ সংবাদেই জুড়াইয়া জল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু

উপর্যুপরি ক্রমাগত তিরস্কার ও বিক্রপ সহিয়া সহিয়া আজ তাহার পূর্ণ উপবাসী শরীর-মন বড় বেশী রকম তাতিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে মায়ের দেওয়া ঐ সু-খবরকে আদৌ আমলে না আনিয়াই উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “যাও, আমি তোমার দুধ-ভাত খেতে চাইনে; আমার স্কুলের মাইনেটা তোমরা দিয়ে দিবে কি না, তাই এখন স্পষ্ট ক’রে বলো ত?”

স্বর্ণলতার ভরাচিত গুটাইয়া ঘেন এতটুকু ছোট হইয়া আসিল। মেয়ের মনের মধ্যে কিসের যে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে, মুহূর্তের মধ্যে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া তিনি অপরাধিতাবে মাথা নত করিলেন। এই যে প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইল, তাহার স্পষ্ট ছাড়িয়া অস্পষ্ট একটা জবাবও যে তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইল না।

নীলিমা তাহার হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া আশ্রয়-বেদনা-ছলছল চোখে মা’র পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, “স্বলোচনাদি’ আমার রোজ রোজ বকছেন, রাগ করছেন; আজ বলেছেন, এবার যদি না মাইনে পান, তা হ’লে আমার ইস্কুল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দিবেন। কেন তোমরা আমার মাইনেটা দিয়ে দিচ্ছে না বল তো? শুধু শুধু আমার সকাইকার কাছেই সব বিষয়ে খোঁটা খেতে হয়। তুমি বাবাকে কেন এ কথাটা ভাল ক’রে বুঝিয়ে বলো না?”

স্বর্ণলতা এইবার তাঁহার বিষম মুখ তুলিলেন—
“বলেছিলুম রে! উনি বলেন, অনেক টাকা হয়ে গেছে—অত টাকা তাঁর নেই, কেমন ক’রে দেবেন? এত দিন যেমন গুঁরা দয়া ক’রে পড়িয়ে এসেছেন, এখনও যদি সেই রকমই তোরা মুখ চেয়ে আরও একটু—”

নীলিমা মায়ের এই যুহু সঙ্কুচিত করুণ কথা কয়টিতে তীব্র-জগনে জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র কঠিন স্বরে বাধা দিল—“চাইনে আমি অমন দয়া ভিক্ষা করতে! যদি স্কুলের মাইনেই দিতে পারবে না, তবে কেন তোমরা আমার সকাইকার কাছে ছোট করবার জন্তে স্কুলে দিয়েছিলে?”—বলিতে বলিতে অঝরঝরে কাঁদিয়া ফেলিয়া নীলিমা তাড়াতাড়ি ছুটয়া পলাইয়া গেল। মা অবাকমুখে চাহিয়া রহিলেন।

স্বর্ণলতা বিমর্ষমুখে রাসার পিড়িতে বসিয়া একখানি যেটে পাতরে করিয়া চারটি ময়লা রংয়ের মোটা ভাত

বাড়িতেছিলেন, শুভেন্দু ‘মা’ বলিয়া ডাক দিয়া ঘরে ঢুকিল।

“হুঁ; তাই তো বলি যে, মুখপুড়ী মেয়েটা কি খেয়ে অত মোটাচ্ছে! আর আমিই বা তাই খেয়ে দিনকের দিন শুকুছিই বা কেন? এর ভেতরে মস্ত বড় একটা ঐতিহাসিক জটিল রহস্য আছে! তাই না? দাঁও দিকিন, ওই ভাতকটা দুধ দিয়ে আজ না হয় আমিই খেয়ে যাই! বাঃ বাঃ, আবার যে একটা কাঁচকলা পাকাও জমিয়ে রাখা হয়েছে, দেখচি! ওঃ, দিবি্য হবে এখন। দিয়ে ফেল আজকের মত এ সব এই অপাত্রটাকে, পেট আমার ক্ষিদেয় জ’লেপুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। আবার এখুনি যাব জগা-মতেদের সঙ্গে ফুটবলম্যাচ খেলতে।”

শুভেন্দু ধপ্ করিয়া নীলিমার জন্ত পাতা কাঠের পিড়িখানায় বসিয়া পড়িয়া আগ্রহভরিতহস্তে ভাতশুদ্ধ পাতরটা নিজের কোলের কাছে চট করিয়া টানিয়া আনিল। এইরূপে উহা আদৃত করিয়া ফেলিয়া দুধ নামে আখ্যাত নীলবর্ণের জলবিশেষকে কোনমতে ভাতের উপর ঢালিয়া আঠাগন্ধ কদলীযোগে তাহা পরম পরিতোষে মাখিতে লাগিয়া গেল।

“কৈ, চিনি কোথায়? ওইটুকু নুণের মতন চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায়? নিজেদের আহরে মেয়ের জন্তে চুরি ক’রে রাখা হলো বুঝি? দাঁও দাঁও, বার ক’রে দাঁও। না দিলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি, হ্যাঁ!”

স্বর্ণলতা চিনির কোটাটা পাতের উপর উপড় করিয়া ঝাড়িয়া দিয়া দুঃখিত স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, “আর ত ঘরে নেই, বাবা, ওই দিয়েই খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি।”

“ও সব খোসামোদের কথার ধার ধারিনে;— নেই কি! আনবৎ আছে। তোমার স্কুলে-পড়া গাড়ীচড়া মেয়ে কি না ওইটুকু চিনির টাকুনা দিয়ে এই ভাতের কাঁড়িটি খেতে পারতো? দাঁও বলছি শীগগির, না হ’লে এই রইলো তোমার ছাইপিণ্ডি ভাত প’ড়ে! আহ্লাদী মেয়ে খেতে পেলেন না ব’লে রেগে গেছ ত? সেই সোজা কথাটা খুলে বল্লই ত হতো; তা থাক, তোমার সেই বিহ্বী মেয়েই থাক; পচা নর্দমায় ফেলে লোকমান্ করবার দরকারটাই বা কি!”

তড়বড় করিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে

শুভেন্দু সত্য সত্যই মাথাভাত পাতর শুদ্ধ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেল এবং মায়ের বুকফাটা কাতর করণ জাহান কানে না তুলিয়াই সে গুম-গুম শব্দে পা ফেলিয়া দালান পার হইয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

নীলিমা নিজের দুঃখ-অভিমানে অভিভূত হইয়া গিয়া মায়ের সঙ্গে যেটুকু কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, মার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়াই সে তাহার জন্ত ভীষণভাবে অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মা যে তাহার কত বড় অসহায়, সে কথা বালিকা সম্পূর্ণভাবে না বুঝিলেও স্বামীকে তিনি যে কতদূর ভয় করিয়া চলেন, সে কথাটা যে তাহাদেরও অজ্ঞাত ছিল না। পিতা না দিলে মা আর কেমন করিয়া তাঁহাকে দিয়া দেওয়াইবেন? এই কথা মনে হইতেই তাহার মনে হইল, মার মনে সে আজ শুধু শুধু কষ্ট দিয়াছে। মা তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিতে চাহিলেন, আর সে কি না 'খাইতে চাহে না' বলিয়া তাঁহার সে যত্নের অবমাননা করিয়া চলিয়া আসিল! অপরাধীর মত সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া সে নিঃশব্দপদে নীচে নামিয়া আসিল। আবার লজ্জাও তার মনে বড়ই জ্বালা দিতে লাগিল, সে 'খাইতে চাহে না' বলিয়া আবার তখনই কি না খাইতে চলিয়াছে! মনকে জোর করিল, বলিল, "হোক গে, মা তো খুসী হইবেন"—কিন্তু রান্নাঘরের কাছাকাছি যাইতেই তাহার সঙ্কল্প পরিবর্তিত হইয়া গেল। শুভেন্দু সোৎসাহে ভাত মাখিতে মাখিতে উৎফুল্লকণ্ঠে বলিতেছে—“কৈ, চিনি কোথায়? অতটুকু মুণের মত চিনি দিলে কখন অস্ত-শুলো ভাত খাওয়া যায়?”

আবার তেমনই করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নীলিমা উপরে উঠিয়া আসিল; মনে মনে ভাবিল, “যদি আমি এখন খেতে গেলে দাদার কষ পড়ে যায়! থাক, আগে ওর খাওয়া হয়ে যাক, তখন ওর পাতেই না হয় খাবো।”

সে জানিত, তাহার মা নিজের ভাগের চাল দু'টি দু'টি করিয়া প্রতিদিন একটা ভাঁড়ের মধ্যে জমা করেন এবং মুটাখানেক জমিলেই এক দিন তাহাদিগকে বিকালের পাপর-পোড়া বা ভুট্টাভাজার বদলে ভাত রাধিয়া দেন। সে ক'টি ভাত দুই জনে খাইতে গেলে কাহারও আধপেটাও হয় না।

উপরে আসিয়া এবার সে তাহার নিত্যকার্যগুলি

সম্পন্ন করিতে মনোনিবেশ করিল; কিন্তু মার তখনকার সেই বিষয় নিরুপায় মুখচ্ছবি মনে করিয়া তাহার মনটা বেশ সহজ হইতে পারিল না। তাহার উপর সারাদিনের উপবাসে শরীরেও যথেষ্ট দৌর্বল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টির জন্ত কাপড়-চোপড় ঘরে বারান্দায় টাঙ্গান ছিল, সে সব খুলিয়া, যেগুলি শুষ্ক, সেগুলি আলমাস রাখিয়া ভিজা সেন্টসে কয়েকখানা লইয়া ছাদে উঠিল, কিন্তু সেই সাবিত্রী পাহাড়ের সিঁড়ির মত উঁচু উঁচু সিঁড়ি উঠিতে সে দিন তাহার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কয়েক দিনের পরে আজ মধ্যাহ্ন হইতেই বৃষ্টি থামিয়াছে; মেঘলাও অনেকখানি কাটিয়া আসিয়াছিল। বিশাল আকাশের সর্বত্রই যদিও নির্মেষ হইতে পারে নাই, তথাপি আশে পাশে যে সকল খণ্ড-মেঘ লবু ব্রহ্মগতি লইয়া ইচ্ছানুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা যে কোন জাগতিক জীবের ভয়প্রদ নহে, তাহা উহাদের শাস্তমূর্তিই সপ্রমাণ করিতেছে। মেঘের বিরাট প্রাচীর টুটিয়া যাওয়াতে বারিধীত প্রসন্ন জগতের বন্ধে নামিয়া আসিয়া অগ্নান রজত-কৌমুদীরই সমতুল্য শীতের প্রফুল্ল সূর্য্যকর যেন স্থিতহাস্যে সকলকেই অভিনন্দন জানাইতেছিল। ইহার প্রতিদানে আবার দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর অট্টালিকায় সর্বত্রই এই চির-অতিথির আগমনী-উৎসব সমারোহের সহিতই চলিতেছিল।

নীলিমা কাপড় কয়খানা ছাদের প্রাচীরের উপর মেলিয়া দিয়া ধানিকটা দূরের একটা বাড়ীর ছাতের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বাড়ীটা অনুকাদের। সে দেখিতে পাইল, ছাদের উপর অনুকারা তিন ভাই-বোনে কমলালেবু খাইতে খাইতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; আর তাহার মা একটা ছোট ডালার ভরিয়া আঙ্গুর, আপেল ও কমলালেবু তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেছেন। বুকের কাছে একটা নিখাস আচম্কা জমিয়া উঠিতেই সে চমকিত হইয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল! তাহার ক্ষুৎপিপাসাতুর বুড়ু দেহ-মন কি অস্ত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষ্যা করিতেও আরম্ভ করিল না কি? পরের সুখ দেখিয়া লোভ করিবে না, এ কথা প্রাণপণে মনে করিতেও কিন্তু তাহার বিবেকের সহস্র নিষেধ না মানিয়াই তাহার অতৃপ্ত নিরানন্দ মন অকস্মাৎ মনে

করিয়া বলিল,—সে-ও যদি অমুকারই আর একটি বোন হইয়া জন্মিত! কত তপস্যা করিলে মানুষে গরীবের ঘরে জন্মায় না?

আবার তখনি সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখখানি মনশ্চকুতে ভাসিয়া উঠিল। কি শাস্ত, কি কোমল, আর কি করুণ সে মুখ! উঃ, নীলিমা কি নিষ্ঠুর!—ও-ই মাকে কি না সে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়া মনে করিতেছে যে, সে যদি অল্প মায়ের মেয়ে হইত ত বেশ হইত! কেমন করিয়া এমন কথা সে মনেও করিতে পারিল? সে যদি না তাহার মায়ের মেয়ে হইয়া জন্মিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি হইত, কে বলিতে পারে? হয়ত অল্প মায়ের কাছে তাহার স্থখ কিছু বেশী হওয়াও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু তাহার মায়ের কি হইত? মা'র মুখ চাহিতে ত আর কেহই থাকিত না! এ কথা ভাবিতে গিয়া তখন আবার মনে পড়িয়া গেল যে, সেই বা তাহার মায়ের মুখ এমনই কি চাহে? এই ত সে মায়ের আদর করিয়া ভাত খাইতে ডাকার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে দশটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া অনাম্মাসে চলিয়া আসিয়াছে। মা'র প্রাণে তাহার এই ব্যবহারে কতখানি ব্যথা বাজিতে পারে, সে কি তাহা একবারও ভাবিতে পারিয়াছিল? কিন্তু যদি তাহার ওই মা-ই আবার ও-বাড়ীর ঐ অমুকার মায়ের মত তাহার মুখের সামনে আঙ্গুর-আপেলের ডালা ধরিতে পারিতেন? সে কি তখন সে সব প্রত্যাখ্যান করিয়া মা'র প্রাণে আঘাত দিতে পারিত? লোভ!—হায় রে লোভ! মায়ের মেহটা তাহা হইলে আসল জিনিস নয়? সন্তান তাঁহার নিকট হইতে প্রগাঢ় ভালবাসার অপেক্ষা উত্তম অশন-বসনেরই আকাঙ্ক্ষা অধিকতর করে? নিজের প্রতি তার যেন যুগা বোধ হইল। এমনই সে মা'র কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

“কি গো বিবি সাহেব! হাওয়া খাওয়া যে আর শেষ হলো না?”

দাদার এই মেহসন্তাষণে একান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া নীলিমা মুখ কিরাইল—“তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল দাদা?”

শুভেন্দু পূর্ববৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, “ওগো, না গো না, ভয় নেই, তোমার অন্নের আমি হস্তারক হইনি। যাও, সব ঠিক করাই আছে, কৃপা করে শুধু একটু মুখে তুলে দিয়ে এল গে যাও।”

নীলিমা কথার ভাবে দাদার মনের খবর জানিতে পারিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তুমি খেলে না কেন, দাদা? যাও, তুমি খেয়ে এস, আমার একটুও আজ ক্ষিদে নেই, বড় মাথা ধরেছে। আমি খাবো না।”

শুভেন্দু বলিল, “আহা, মাথা ধরেছে। ম'রে যাই রে? প'ড়ে প'ড়ে বোধ হয়? এসো, বিছানা পেতে দিই গে, গা মেলে শোবে এসো। মাথায় গোলাপ-জলের পটা বেঁধে দেবো? হাওয়া করবো নাকি?”

এই বিদ্রূপের খোঁচা খাইয়া অভিমানে চোখের কোল ভুঁই হইয়া উঠিলেও নতমুখে তাহা সামলাইবার চেষ্টা করিয়া নীলিমা মিনতি করুণস্বরে কহিল, “কিছু করতে হবে না। লক্ষ্মীটি! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি খেয়ে এস।”

“হঁ! আমি খেলে কি হবে? বরং তুমি খাও গে যে, মাথার মগজে একটু ঘি হবে। আ মর্দে! মুখপুড়ী মেয়ে আবার ভাঁ ক'রে কঁদে ফেললেন! কাঁদলি তো বড় আমার বয়েই গেল! তোর সখ হয়েছে, তুই কঁদে মর গে যা। তাতে আমার কি? হঁ, বুঝছি! ও কি আমার খাওয়াবার জন্তে কাঁদছিস? মনে করেছিস, ওই রকম প্যান-প্যান করলে আমি রেগে মেগে চ'লে যাব, আর তখন মজাসে খুব খানিক গুড়-চিনি মেখে নিয়ে গবগবিয়ে ভাতগুলো সব গিল'বি।—ঐ রে! কিপ্টে বুড়োটা ঐ গলির মোড় ফিরলো রে! বাড়ীর দিকেই ত আসুচে না? তাই ত—পালাই।”

শুভেন্দু তিন লাফে সিঁড়ি নামিয়া খিড়কীর দ্বারের দিকে ছুট দিল। আর পথের উপর বাপকে দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে ছুইটা বিপদের সম্ভাবনা একত্র মনে উদ্ভিত হইয়া নীলিমাকেও ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথমতঃ বাড়ী ঢুকিয়াই তাহার পিতা একবার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সারাদিনের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ রান্নাঘরে না গেলে তাঁহার মন তো স্থিরই হয় না। যদি ইহারা মায়ে-মেয়ের ও ছেলের মিলিয়া সেখানে তাঁহার সকল সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বিশেষ ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া থাকে, তাহারই ‘ডিটেকটিভ’ তাঁহাকে প্রতিদিনই হুই একবার করিয়া করিতে হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই এক এক দিন অকস্মাৎ অসময়ে কর্মস্থান হইতে চলিয়া

আসিতেও হইয়া থাকে। আজ যখন তিনি ঐ কুম্ভমাখা ভাত ও রন্ধনকারিণীকে একত্র ঐ স্থানে দেখিতে পাইবেন, তখনকার সেই দৃশ্য মনে করিতেও তাঁহার সর্কাসে কাঁটা দিয়া উঠিল। ছুটির দিনে বাড়ী থাকিলে সে দেখিয়াছে যে, তাহার মায়ের ভাত আজকাল খুবই কম থাকে। যদিও সে অন্ত্রযোগ করিলেই তিনি অ-ক্ষুধার দোহাই পাড়িয়া থাকেন, তবুও নীলিমার মনে সন্দেহ হয় যে, ওই যে মধ্যে মধ্যে তাহাদের দুই ভাই-বোনকে তিনি ভাত রাঁধিয়া খাওয়ান, তাহারই জন্ত তাঁহার ঐ অ-ক্ষুধাটুকু দেখা দিয়াছে এবং ফলে জীর্ণদেহ অধিকতরই শুষ্ক হইতেছে। এবার হয় ত অপব্যয়ের চাউল বাঁচাইতে গিয়া পিতা তাঁহার জন্ত অর্দ্ধাশনেরই ব্যবস্থা করিয়া বুসিবেন! তখন তাহার এই প্রথম চিন্তাটাকেই প্রবল করিয়া তুলিয়া স্কুলের মাহিনার বিষয়-চিন্তাটাকে কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সে নিজের মনকে যেন প্রচণ্ড কশাঘাত করিয়া ভাবিল—এই আমি! মা'র মনে কষ্ট দিলেম, মা'কে আবার বকুনি খাওয়াব, তাহার উপর আমার জন্ত মা'র ভাতেও টান পড়বে! না না, আমি আর কান্নকে চাইনে, আমার মায়ের মেয়েই বেন আমি থাকতে পাই!

উদ্বেগে শঙ্কায় অধীর হইয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

“মা, মা, বাবা আসছেন। কি হবে, মা?”

স্বর্ণলতার নিজের মুখ এ সংবাদে শুকাইয়া গেলেও তাঁহার এতক্ষণকার মনঃকষ্টের কাছে তাহাও যেন তাঁহার কাছে ছোট হইয়া গেল। তাঁহার চিরাত্যস্ত অটুট ধৈর্যের সহিত তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে মুহূর্তে মেয়েকে কহিলেন, “তুমি খেয়ে নাও, নীলা! আমি ওদিকে যাচ্ছি। কি আর হবে, তোমায় কিছু বলবেন না।” এই বলিয়া পতি-সন্তুষ্টার্থ তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেলেন। কিন্তু স্বর্ণলতার আজ কাহার মুখ দেখিয়া যে রাত্রি পোহাইয়াছিল, বলা যায় না। মহিলে এমন অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় কাণ্ড কখন ঘটে!

“গিন্নি! ওগো ও, বলি কোথায় গো!” এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্রান্ত শীর্ণ চরণকে যতখানি সম্ভব দ্রুত করিতে চাহিয়া গৃহিণী স্বর্ণলতা বলিদানোদ্দেশ্যে আনীত জীববিশেষের মত কম্পিত-কলেবরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নিজের জন্ত ভয়

যত না হইতেছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবনা হইতেছিল—নীলিমা হয় ত এই সব গোলমালে মাখা ভাত কমটা খাইয়া উঠিতেই পারিবে না। শুভেন্দুর কথা মনে হইয়াও তাঁর বক্ষ চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল ও পড়িল। না খাইয়া কোলের ভাত ফেলিয়া ছেলেটা কোথায় যে চলিয়া গেল, আহা, এমন অবস্থা সে কেন হইল! সহসা অতিমাত্রায় বিস্মিত ও চকিত হইয়া তিনি গুনিতে পাইলেন, তাঁহার কক্ষমেজাজী কঠিন স্বামী তাঁহার সহিত এ কি আবার রসিকতাও করিতেছেন নাকি?

“ও গিন্নি! নেমস্তন্ন খেতে যাবার জন্তে যে বড় জোর তাগিদ এসেছে, বলি, খেতে যাবে নাকি? তা হ'লে চটপট তন্নিতল্লা সব বেঁধে ছেঁদে নাও গে যাও।”

নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ অবাচ্ হইয়া স্বামীর দস্ত-বিকসিত আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ রকম কথা তো আর তাঁর জীবনে তিনি শুনে নাই যে, এর উত্তর দিবেন!

অনুকূলচন্দ্র হাতের নোটের তাড়াটা দেখাইয়া তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, “বিশ্বাস হচ্ছে না! একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি আর কি! সত্যি গো, মাইরি বস্ছি, তোমার সঙ্গে রঙ্গ করছি। তোমার সেই ভুগ্ন রায়কে মনে আছে, সেই যে একবার ক'বছর আগে এসে গোঁড়াকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল না? সে-ই তোমাদের বাবার জন্তে অনেক ক'রে চিঠি লিখেছে, আর এই টাকা-গুলো পাঠিয়েছে গাড়ী-ভাড়া ব'লে। সবাইকার সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া! উঃ, কত টাকাই না জানি ওয়া বাজে খরচ করে যে! আহা, মনে একটু দরদও কি করে না গো?”

‘উড়নচড়ে’ লোকগুলার আশ্চর্য্য অপব্যয়শক্তির কথা শ্রবণে আসিতেই ‘মিতব্যয়ী’ অনুকূলের ললাট অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেইক্ষণেই আবার যেমনই মনে পড়িয়া গেল যে, সেই অপব্যয়িত টাকা-গুলো উড়িয়া তাঁহারই লোহার সিন্দূকের ‘দোরগোড়ায়’ আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব এ ক্ষেত্রে সেই অমিতব্যয়ী লোকেরা তাঁহার আশীর্বাদ-ভাজনই হইতে পারে, অমনি তাঁহার গলার সুরটাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল :—

“তা ভালই করেছে; অনেক হয়েছে, একটু আধটু আর খরচপত্র করবে না! আমাদের মতন

ত আর পাতরচাপা কপাল ক'রে আসে নি, ভাগ্য দিচ্ছে অচেন, ছড়িয়েও ফেলেছে তেমনি দুহাতে। তা দেখ, গিন্নি! তোমরা আর এই দুঃস্থ নীতে কোথায়ই বা যাবে? আমিও ত আর কাজ-কর্ম ছড়িয়ে ফেলে কোথাও যেতে পারবো না। ক্ষেত-খামারটুকু করেছি, রবিগুলো নষ্ট হবে। পঁজার ইটে আগুন দেওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে চলবেই না। তার পরে মধু মিস্ত্রীর স্ত্রীদটা উত্তুল করা নেহাৎ দরকার হয়ে পড়েছে। নৈলে তামাদি হ'তে পারে। আর নেই যেন একটি পরসী, কিন্তু 'স্কাঠা'টুকু ত তার ঘোল আনার উপর আঠারো আনাই আমার পোহাতে হচ্ছে। তা দেখ, আমি বলি কি, ওর জন্তেই পাগল ত; ঐ গোঁড়া ছোঁড়া-টাকেই না হয় ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমরা সব থেকেই যাও। গাড়ী-ভাড়ার টাকারটাও তা হ'লে কিছু বেঁচে যাবে। আর গোঁড়ার এই বয়সে অত নবাবী ত আর ভাল নয়, তাকে একখানা খার্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়া দিলেই চ'লে যাবে।—কি বল?"

স্বর্ণলতা ঈষৎ ব্যগ্র হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, "হঁ"—পরক্ষণেই কি ভাবিয়া লইয়া এই অবসরে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াই কোনমতে বলিয়া ফেলিলেন—“ওই টাকা থেকে তা হ'লে নীলার ইস্কুলের মাইনেটা চুকিয়ে দিলে হয় না? ওরা রোজ রোজ বড়ই তাগিদ দিচ্ছে, বলছে—”

অনুকূলের 'দন্তকুচি' আবার 'কৌমুদী' ছড়াইয়া বিকসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এবার আর তাহা আনন্দে নহে। ইম্পাত শাণে ঘষিলে বে রকম শব্দটা জন্মায়, ঠিক সেই ধ্বনির সুস্পষ্ট অনুকরণে তিনি কহিয়া উঠিলেন, “কি বলছে, শুনি?”

স্বর্ণলতার দুর্বল ছৎপিণ্ড 'ধবক্ ধবক্' করিয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল, তথাপি তিনি কোনমতে ধরা গলাটাকে সাফ করিয়া লইয়া মুহূর্তে উত্তর দিলেন, “কালকের মধ্যে মাইনে না পেলে ওকে নাকি স্কুল থেকে ওরা ছাড়িয়ে দেবে।”

অনুকূল এবার দাঁতে দাঁতে আবারও একটা বিকট স্বর্ণশব্দ করিয়া বলিলেন, “ছাড়িয়ে দেবে? বটে! হঁ! আচ্ছা। দেবে কেন, আমি নিজেই আমার মেয়েকে ওদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবো। আর শুধু তাই নয়, সকল মেয়েই যাতে ওদের ঐ

হতভাগা স্কুলটাকে ছেড়ে ছুঁচো-বেটীদের দেশ-ছাড়া ক'রে দেয়, তারই জন্তেই আজ থেকে বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করবো। ইস্কুলে মেয়ে দিইছি, তাই কত না, এতেই তোদের চোন্দ পুরুষের ভাগ্য ব'লে মেনে নে; না হয় আবার তার জন্তে ছ'টাকা ক'রে মাইনে দেবে না, কচু করবে! আহ্লাদ দেখে আর বাঁচি নি যে!”

পাছে তাহাদের মজর লাগে—এই ভয়ে কল্যাণ টাকাগুলিকে সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। সেগুলিকে লইয়া চলিয়া যাইবার অভি-লাষে ফিরিতে গিয়া কি মনে হইল, ফিরিয়া মুখ খিঁচাইয়া জীকে বলিলেন, “আর তুমি মাগীও ত বড় কম সয়তানী নও! যেই এই ক'টা টাকা চোখে-উপর দেখতে পেয়েছ, অমনি ওর বিবি-মাইটিয়ে মেয়ের জন্তে ওর উপর চোখ প'ড়ে গ্যাছে! আরে বাপু! এই টাকাগুলি অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে যদি রাখতে পারি, মধু মিস্ত্রীকে যদি সাড়ে তের টাকা স্নদেও কর্ত্ত দিয়ে রাখতে পারি, তবেই না তোমাদের বারো মাসের কুঁড়ো পাথরটি যোগান দেবো। বলে কি না, 'মেয়ের ইস্কুলের মাইনে দাও।' মেয়ের উপর যদি টাকা খরচই করবো, তা হ'লে মেয়েকে ইস্কুলে দিলুম কি কর্ত্তে শুনি? একটি পাই-পরসী ওর ওপোর আমি বার করবনি, এটি বেশ ক'রে জেনে রেখে দাও। ওকে নিজের পথ নিজে ক'রে নিতে হবে।”

টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়া কর্ত্তা তখনও স্বর্ণ-লতাকে সেই স্থানে ও সেই ভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু প্রসন্নস্বরে (বোধ করি সমস্ত টাকা গোণার শব্দটা কানে ও প্রাণে বাজিয়া রহিয়া-ছিল বলিয়াই) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ওর জন্তে তুমি কিছু ভেবো না গো গিন্নি! ও আমি সব ঠিক ক'রে নেবো। নীলির পড়া আমি ছাড়াবো না, পড়াতে ওকে হবে। তবে ও ছায়ের ইস্কুলে কিছু ভাল জিনিস শেখায় না। প্রাইজ ত ওতে নেই বল্লই হয়;—আমি ওকে মিস্ রেজের মিসন্ ইস্কুলে কাল থেকেই ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসবো। তার মাইনে ত নেইই না, উন্টে শাড়ী, জামা, বই, প্লেট, সমস্তই প্রাইজ দেয়। আবার কেমন সুন্দর বড় বড় 'ডল' দেয়, সেগুলো আমাদের দোকানে আধা কড়িতে বেচে এলেও তার একটা দাম

আছে। আচ্ছা, কালই আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভক্তি করিয়ে দিয়ে আসছি।—হ্যাঁ, আর গোড়াটাও তা হ'লে কালই ওখানের জন্তে রওনা হয়ে যাক। আঃ, এই ছেলেপিলেগুলোই হয়েছে মানুষের বিষম জালা!”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা গ্রামবাজারে ভুবনমোহন রায়ের প্রাসাদ-তুলা অট্টালিকা। তাঁহার সুদৃশ্য উত্থানে বহু স্বদেশীয় ততই বিদেশী পত্রপুস্তকের বৃক্ষলতা উজ্জল শোভায় পথিকের নয়ন-মন মুগ্ধ করিত। তাঁহার আস্তাবলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া, বক্মকে ক্রহাম, ল্যাণ্ডো ও মোটর ;—তাঁহার অতি মূল্যবান স্বদেশী বিদেশী গৃহ-লজ্জী প্রভৃতিতে সুরুচি, ধনবস্তা ও বিদেশের প্রতি অভক্তি না থাকিলেও স্বদেশের প্রতি যে যথেষ্ট পরিমাণে ভক্তি আছে, তাহার পরিচয় প্রদান করিত। বিশেষ যত্নপূর্বক কাশ্মীর, লাহোর, মুজাপুর, মোরাদাবাদ, কাশী ও মাদ্রাজ প্রদেশীয় অপূর্ব শিল্পসত্তার যতদূর এ দেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশের আপাত-মনোরম নিকৃষ্ট ও সহজলভ্য পদার্থ দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ না করিয়া সযত্নে আহরণ করা হইয়াছে।

ভুবনবাবুর পৈতৃক বাটীতে যদিও এতটা ঐশ্বর্যের সমাবেশ ছিল না, তথাপি সেই পুরাতন ‘এজমালি’র সম্পত্তিকে তিনি কালের হস্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে সাহায্য করেন নাই। এ বিষয়ে অনেক বড় বড় নামজাদা কৃষ্ণ-বিষ্ণুদের পৈতৃক-গৃহ হইতে তাঁহার পৈতৃক-গৃহকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে।

সে বাটীও সুবৃহৎ। যদিও তাহা উত্তানবেষ্টিত নহে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে বহুদূর-বিস্তৃত প্রকাণ্ড ফলের বাগান অমূল্য ও অক্ষয় ফলের ভাণ্ডাররূপে বারো মাসই গৃহস্থ পোষণ করিয়া আসিতেছে। উত্তানে স্নান ও পানের জন্ত একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে; তাহা সযত্ন-রক্ষিত ও সুসংস্কৃত। বাসন রাজিবার জন্ত অপর ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা ডোবা এই উত্তানের এক পার্শ্বে অবস্থিত; তাহা হিঙ্গা, কলমী, পানা, পানিকল এবং শরৎপ্রারম্ভে কুমুদকল্লার ও সুনীল বর্ণের পানা-ফুলে খচিত হইয়া থাকিত।

বাটীর সদরদরজা পার হইয়া সুপ্রশস্ত অঙ্গন,

ইহার এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সাত আটটা সিঁড়ি দিয়া মণ্ডপে উঠিতে হয়। পুরাতন হর্ম্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ আট-পলে জোড়া খাম, খামের মাথায় বিচিত্র পশুপক্ষী, খিলানসমূহে নানাবিধ লতাপাতা ও জালির কাষ। এই অঙ্গনের দক্ষিণধারে সারি সারি বৈঠকখানা-ঘর, তাহার সম্মুখে দৌড়বার টানা দালান। ঘরগুলি সেকালের প্রথা-মত নীচু-চৌকির উপর ঢালা বিছানায় সজ্জিত। ছিটের জাজিরের উপরে দুই একটা করিয়া তাকিয়া-বালিস রাখা। তাকিয়াগুলি অবশ্য সেকালের চেয়ে একালে হুস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। তা মানুষগুলিই কি হয় নাই?

এই বাড়ী এখন বিয়ে-বাড়ী। গ্রন্থাবলী ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা তরুলতার বিবাহ এই ফাস্তন মাসেই স্থির হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভুবনবাবুরা সপরিবারে তাঁহাদের পল্লীগৃহে আগমন করিয়াছেন। যদিও এখনকার প্রথামত এই গ্রামের বাটীতে না আসিয়া তাঁহার সুখৈশ্বর্যমণ্ডিত কলিকাতার বাটীতে বিবাহ দেওয়াই সম্ভব ছিল, তথাপি অনেক বিষয়ে আধুনিক হইলেও ভুবনবাবুর কতকগুলি সেকালে মতামত ছিল; তাহার মধ্যে একটি এই পল্লীপ্রীতি। সর্বদা কলিকাতায় থাকিলেও প্রতি বৎসর পূজাবকাশে তিনি তাঁহার অজ্ঞাত সমপদস্থ ব্যক্তিগণের জ্ঞায় সিমলা, দার্জিলিং বা মধুপুর যাত্রা না করিয়া পৈতৃক আবাসে আগমন করেন। বাটীতে তাঁহার যথেষ্ট সমারোহের সহিত জুর্গোৎসব হয়। কলিকাতায় থাকিয়া অর্ধোপার্জন করিতে শিখিয়াও ভুবনবাবু সেই পৈতৃক পূজা উঠাইয়া দেন নাই, বরং মহার্ঘ্যতা বৃদ্ধি পাইলেও সযত্নে সেই পুরাতন রীতি যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ভুবনবাবুর পিতা অমরবাবুর আমলে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ইতরতন্ত্র এই উৎসবে নিমজ্জিত হইয়া আসিত। এ দিনে গ্রামবাসী ভক্তগণ অধিকাংশই দেশত্যাগী; তবে পল্লীবাসী অপর সকল ব্যক্তিরই এই তিন দিন বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বারণ আছে। এই দেশভক্তি ও পল্লীপ্রীতিই কলিকাতানিবাসী ধনী ভুবনবাবুর কন্যার বিবাহ পল্লীগ্রামে ঘটাইয়া তাঁহার অনেক ধনী ও শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের মনক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কারণ, ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাঁহারা ত এখানে আসিতে পারেন না।

গরীবের মেয়ে

ভুবনবাবুর এতদূর সুখেশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার সংসার শ্মশান। গৃহলক্ষ্মীশূন্য নিরানন্দ গৃহস্থালী মরুভূমির মতই সুখশূন্য। প্রথম উত্তরের মুখে এত বড় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনশ্রোত আহত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্যগুণে তিনি নিজেকে ছন্নছাড়া ও নিরুদয় হইতে অবসর দেন নাই। বাহিরের প্রেমসীকে অন্তরের মানসী প্রতিমা-রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কট-সঙ্কুল যৌবনকাল তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত কিরণ আজ তো না হয় অবসানের পথেই নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণে এই ধনী ব্যক্তিটির এই ইচ্ছাকৃত ত্যাগের মূল কোথায় খুঁজিয়া পাইত না। বিশেষতঃ তাঁহার অকালকালকবলিতা পত্নী চাক্ষুশীকে দেখিতে একে-বারেই সাদাসিধা ও অতি সাধারণ ছিল। কলিকাতার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অভিতাবিকারূপে যে বালবিধবা ভগিনীটি বাস করিত, এখন তাহারও বয়স চল্লিশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নাম তাঁহার সরোজিনী। সরোজ পাঁচ জনের অমুরোধে ভাইকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারে গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার কথা একবারমাত্র বলিতে গিয়া যে উত্তর দাদার নিকট হইতে পাইয়াছিল, তাহার পর আর কেহ দাদাকে বিবাহের কথা বলিতে অমুরোধ করিলে জিত্ কাটিয়া সে সমস্ত উত্তর দিত, “বাপ্ রে! আবার আমি বলবো? বলতে হয় ত তোমরা বল গে—আমি আর এ জন্যে কখন বলতে যাচ্ছিনে।”

সরোজিনীর দাদা তাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—“আমায় কেন বিয়ে করতে বল্ছি? আমিও তা হ’লে তোকে বিয়ে করতে বলবো, মনে মনে তোর এই ইচ্ছা আছে, না?”

সরোজ রাগ করিয়া বলে, “তুমি কি যে যা তা কথা বল! ও কথা কি কখন মুখে আনতে আছে?”

দাদা বলেন, “মুখে নেই থাক, মনে তো আনতে আছে? না হ’লে আমাকেই বা তুই কোন্ হিসাবে এমন কথা বলতে পারুলি?”

সরোজ বলিল, “আমাতে আর তোমাতে?”

ভুবন বলিলেন, কেন, “তুই আমার চাইতে বয়সে ও বিজ্ঞাবুদ্ধিতে এতই শ্রেষ্ঠ যে, তোর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না?”

সরোজ মুখ লাল করিয়া জবাব দিল, “যাও! তাই

কি আমি বলেছি? তুমি যে বেটা ছেলে।—বেটা ছেলে তো হ’বার ছেড়ে চারবার বিয়েও করে, তুমিই বা আর একবার না করবে কেন?”

তত্বতরে ভুবনবাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, “কোন কোন বিধবা শুনি লুকিয়ে লুকিয়ে মাহ খায়, তুইও কি তাই খাবি? ওই ও বাড়ীর লেডী ডাক্তার যখন তিনবার বিয়ে করেছে, তখন তুইও কেন আর একটবার কর না?”

সরোজিনী বিপন্নভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “থাম তুমি! আর আমি কখন যদি তোমায় বিয়ে করতে বলি তো”—কিন্তু তার দাদা তখনই থামিলেন না, তিনি তেমনই সহাস্ত-মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “আমি তিন ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে যদি বিয়ে করতে পারি, তা হ’লে তোর তো একটাও ছেলে-মেয়ে হয়নি, তোর বেলা তো মোটেই দোষ হ’তে পারে না! আজকালকার মেয়ে-পুরুষে যে ভেদবুদ্ধিটা উঠে যাচ্ছে; তবে তুই-ই বা কেন চিরকাল ধ’রে একাদশী ক’রে মরবি বল তো, তার চেয়ে—”

সরোজিনী উঠিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে—“বাট মানলুম, তবু হলো না?—বল্ছি তো আমি আর কখন তোমায় এ কথা বলবো না”—বলিতে বলিতে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেই অবধি ‘বাহির হইতে যত বড়ই উপজীব আহুক না কেন, ঘরের মধ্যে আর তাঁহাকে উপজীব হইতে হয় নাই। নির্বিবাদে নিজের কনট্রাক্টরীর কাজকর্ম দেখিয়া শুনিয়া স্বদেশী বিদেশী দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চায় ডুবিয়া থাকিয়া ভুবনবাবুর দিন সুখে না হউক, খুব দুখেও কাটে নাই। ছেলে-মেয়েদের তিনি অন্তরের সহিতই ভালবাসিতেন। ছেলেটি যাহাতে তাঁহার উচ্চাদর্শ লইতে পারে, মানুষের মত হইয়া মানুষ হয়, এইটি বলিতে গেলে তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহারই জন্য সর্বপ্রথমে তিনি নিজের বিশ্বাস ও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করিয়া আসিতে ছিলেন। মেয়ে দুইটির নাম তরুলতা ও বিনতা—একমাত্র ছেলের নাম সুনীলকুমার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার সংসারে সরোজিনী গৃহ-কর্ত্রী হইলেও দেশের সংসারের কর্তৃত্ব যাহার উপর ঋন্ত, তিনি ভুবন-বাবুর জ্যেষ্ঠাইয়া। বয়স তাঁহার সত্তরের উপর। মাথার চুলগুলির মধ্যে কালের আঁক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখনও আঁখের টিকলী চিহ্নাইয়া খাইতে পারেন। প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গান্নান করিয়া আসিতে এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ-বোধ হয় না এবং নিজের সংসারের দেবতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ-পালিত পশু হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী, প্রতিপাল্য আত্মীয়-স্বজন ও আতুর শিশু পর্য্যন্ত সকলেরই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আবার শুধুই বয়ের কর্তৃত্ব করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি নাই, পড়নী-বাড়ীর কোন্ শিশুটির পেটে প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বুকে পিঠে ‘কড়া’র জন্ম স্বাচিয়ার আঁঠা দিয়া দাগ দিতে হইবে, কাহার ঘুড়ি অরের টোটকা চাই-কোন্ অল্পবয়সী দরিদ্র বিধবার জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, তাহার জন্ম তাহাকে দিয়া পৈতা তুলাইয়া কিনিয়া লওয়া, চরকা কাটাইয়া সেই সূতা চাকরের হাতে জোলায় বাড়ী বেচিয়া দেওয়া এই সমস্ত পঙ্কজর বেগার খাটিয়া বেড়াইতেও তাঁহার কখন আলস্য ছিল না। খাইয়া দাইয়া নভেল লইয়া পড়িতে বসি, ভাস-পাশা বা দিবা নিদ্রায় গা ঢালিয়া দিয়া সকল কার্য্যেই সময়ের অভাব বোধ করা তাঁহার সেকালে হাড়ে সহিত না। শান্তুড়ী-বধুর মনের অমিল চলিতেছে, রায়-গৃহিণীর কাণে উঠিলে অমনই তিনি সেই বাড়ী যান; উভয় পক্ষকে মিষ্টবাক্যে, কখনও সম্মেলন তিরস্কারে, নানারূপ উদ্ভাষণ প্রদর্শনে ঠাণ্ডা করিয়া আইসেন। শান্তুড়ীকে বলেন, “সে কি বউমা! তোমার গোপালের বউ, তোমার কত আদরের ধন, তাকে নিয়ে যদি সুখী হ’তে না পেলো, তা হ’লে তোমার সংসারই বা কি, অরণাই বা কি? না না বউ, এও কি একটা কথা হলো? এই বেলা সামলে নাও, দশে না শোনে। লোকে তো ওই সব গৃহ-ছিদ্রই চায়। সামনে এসে ‘আহা’ব’লে আত্মীয় জানাবে, আড়ালে গিয়ে হাসবে। তুমি মা, একটু সয়ে যাও, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।” তাহার পর বধুর কাছে যাইয়া তাহাকে বলেন, “ওলো নাতবৌ! মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া কেন লো? বলি, ‘একটি পান কি ফোঁফুড়া’ পেয়েছিলি নাকি? নে তাই, শান্তুড়ীকে গড় ক’রে পায়ের ধুলো তুলে মাথায় দে’। সর্ব্বরক্ষে! শান্তুড়ীর মুখের উপর

চোপা কি কর্ত্তে আছে? নিজের গর্ভধারিণী আর সোয়ামীর গর্ভধারিণীতে কি ‘করক’ আছে লো নেকি! দশ দিন ঘর কর না; তখন দেখবি, আবার সে-মাকে ছেড়ে আস্তে যেমন প্রাণ কাঁদে, একে ছেড়ে যেতেও তেমনি হবে।”

গ্রামশুদ্ধ ছোট এবং বড়, ইতর এবং ভদ্র সকলেই তাই এই প্রশস্তদ্বারা উদার-চরিত্র। গৃহিণীর একান্ত বশীভূত।

ভুবনবাবু এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে আবার বাড়ীতে একটা সমারোহ বিবাহ উপস্থিত। বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, আর ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠাইয়ার তো বিন্দু-মাত্রও অবকাশ নাই। ও দিকে রান্নাবাড়ীর উঠানে বড় আটচালা বাঁধান, রান্নার জন্ম জোয়াল কাটান, ভিয়ান-ঘর সাফ করান, নিত্য-যজ্ঞের জন্ম ধামা ধামা ডালের বড়ী তৈয়ারী করা ইত্যাদি শতবিধ কার্য্যে তিনি এই বৃদ্ধবয়সেও চরকির মত পাক খাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মধ্যে মধ্যে আঁচলে চোখের জল মুছিয়া যাহাকে তাহাকে বলিতেছিলেন, “আজ যদি আমার বড় বৌমা বেঁচে থাকত!”

যথাকালে কলিকাতা হইতে সকলে আসিয়া পৌছিলে রায়-গৃহিণী তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন—“এস বাবা এস,—আয় মা, সরোজ! আয়, অমন রোগাটি হয়ে গেছিস কেন গো মা? সুশীল! ভাল আছ ত তাই? কি গো আমার তরু-রাণি!—তরুণি! বলি এত দিনে তোমার ‘তরুণে’র সন্ধান মিললো তা হ’লে? মনে মনে খুব আহলাদ হচ্ছে, না?”

তরুণতা ঠাকুরমার এই স্বাগতসম্ভাষে হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে পায়ের উপর একটা মুছ রকমের চিম্টি কাটিয়া লজ্জায় রাঙ্গিয়া মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিল, “যাও—তোমার আহলাদ হচ্ছে কি না?”

ঠাকুরমা তাহার দাড়ি ধরিয়া চুমা লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার আহলাদ তো একশোবারই হচ্ছে লো! তা ব’লে তুই কি আর তা’ থেকে বাদ পড়ছিস, বোন? তা’ তরুর আমার তরুণটি কেমন হচ্ছে লা বিনুতা?”

বিনতা নিজেকে গহনার বাস্তুটা তখন তাহার সেজ কাকীমার জিন্মায় সঁপিয়া দিতে ছিল। সে এই সময় কাছে আসিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতে করিতে

বলিল, “এতক্ষণ পরে বিনতার কথা হ’ল হলো মেয়ের! বলবো না তো অনেক ক’রে এখন আমার খোসামোদ না করলে।”

ঠাকুরমা চঞ্চলা ছোট নাতনীকে নিজের গায়ের উপর টানিয়া লইয়া তার মুখে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন, “ওলো ছুটু! তোর তো আদরের দিনই নিকট হয়ে এলো লো! দিদি পথ ছেড়ে দিচ্ছে তো এইবার, আবার ছ’মাসের মধ্যেই তোর আদর বেশী ক’রে ক’রেই করা যাবে তখন। এখন বল তো, বোন, আমার তরুর বরটি কেমন হচ্ছে?”

বিনতা হাসিমুখে হাত পাতিয়া বলিল, “কি দেবে আগে দাও, তবে তো বলবো? নইলে শুধু শুধু তোমার বলতে বাব কেন?”

ঠাকুরমা তার ভরাগালে আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া বলিলেন, “ও মা! ছুটু মেয়ের রকম দেখ! ওলো! দোব, দোব, শীগ্গির একটা রাজা বর এনে দোব, ছটো দিন একটু সবুর কর।”

বিনতা এদিক্ ওদিক্ মাথা ফিরাইয়া দেখিল, কাছাকাছি কোন গুরুজন নাই, সে তখন ফটু করিয়া বলিয়া বসিল, “কিন্তু ঠিক রাজাবরটিই আমার চাই, দিদির মতন যেন একটি কালো বর এনে জুটিও না, তা এখন থেকেই বলছি—খবরদার! দেখো!”

ঠাকুরমা ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “কেন, দিদির বর কি কালো হলো? তোরা না তাকে দেখেছিস?”

বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, “দেখেছিই তো, তিনি নিজে কেনে দেখে পছন্দ ক’রে বিয়ে করবেন পণ করেছিলেন, কালো বউ করবেন না, প্রতিজ্ঞা।”

ঠাকুরমা বলিলেন, “তা কি বড্ড কালো? তরুর অপছন্দ হয়নি তো? ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলি? হ্যাঁ তরুদিদি! বরকে মনে ধরেছে তো?”

“যাও, আমি দেখিনি।” বলিয়া লজ্জায় বাড়ীকাইয়া তরু মুখ ফিরাইয়া রহিল। বিনতা তাহার হইয়া জবাব দিল, “আহা, তোমার তরুদিদির যা পছন্দর ছিরি গো, ওটা তো একটা জড় পদার্থ! ও পিসীমাকে বলি কি জানো? বলি, বাবার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন নিশ্চয় ও-ই ভালো। বাইরের রূপ থাকলে আমার হয় তো চোখে বেশী ভালো লাগত, কিন্তু ভিতরের গুণ কি আর আমি বেশী তুলিয়ে বুঝতে পারতুম? ওঁরা আমাদের চাইতে শত

গুণেই তো বেশী বুঝেন, ওঁদের কাছে এক দিনে ঘেঁটা ধরা পড়ে, আমাদের তাতে অন্ততঃ আট বৎসর লাগবে। কি মজার কথা রে! আমি তা ব’লে ও সব শুনিছিনে, বাপু, আমি এই স্পষ্ট ব’লে রেখে দিছি, আমার কিন্তু ওরকম গয়লার গাইটি নিয়ে কিছুতেই চলবে না। তা হ’লে আমি বিয়েই করবো না।”

ঠাকুরমা তরুর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ‘সাবিত্রী-সমানা হও’ বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “ও আমার ছোটকাল হ’তেই বড় ধীর, বড় বুদ্ধিমতী, তা দিদির যদি কালো বর মনে ধরে তো তোরই বা ধরবে না কেন, শুনি? তুই কি দিদির চাইতে বেশী সুন্দরী?”

কিন্তু মুখরা বিনতাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই। সে-ও তৎক্ষণাৎ এ যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিল, “সুন্দরী নই বলেই আমার সুন্দর চাই গো! কেন, দিদির বর নিজে দেখতে ভালো নয় ব’লে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সুন্দর মেয়ে না হ’লে সে বিয়ে করবে না। তা ওঁরা যখন নিজেরা দেখতে খারাপ হয়ে সুন্দর বউ চান, তখন আমাদেরই কি আর কালো হ’লে সুন্দর বরের সাধ যায় না?”

বিনতাদেরই সমবয়সী তাহার বেজ কাকার একটি মেয়েও কালো বরে পড়িয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ বিনতার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছিস, বিনা! আমরাই বা ছাড়বো কেন? কেন, আমরা কি আর মানুষ নই? ওঁরা সগাই চান রূপসী কেন, তার জন্ত আমাদের দেখে মুখ সিঁটকে ফিরে যান, আমরাও যদি সেই পণ ধরি, তখন কেমন মজাটি হয়? কালো বর-গুলি তখন কোথা থেকে রূপসী বিয়ে ক’রে ক’রে বরে আনেন দেখি।”

ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, “এই সব মেয়েদের বড় ক’রে রাখার ফল হচ্ছে, আর কি! তা এদের ত বেশী বেশী স্বাধীন হ’তে দিলে ওই রকমই তো হবে। এর পরে দেখছি, পছন্দ করতে করতে মেয়ে-পুরুষে আর মোটের উপর কাককে কাক বিয়ে করা হয়েই উঠবে না। আমাদের দেশের তিনভাগ লোকই ত কালো। আবার তার ওপর জাত, জন্ম, কুলশীল বাছতেও তো হবে; তবে ব্রাহ্মণের মতন এক-কার ক’রে ফেললে অবশ্য ছ’পাঁচটা মিললেও হয় তো মিলতে পারে। কিন্তু একাকার ক’রেও তো বাপু ব্রাহ্মণমেয়েদের বিয়ের অভাব বেড়েছে ভিন্ন কমেনি

দেখতে পাচ্ছি। অথচ হিন্দু-সমাজে কালো, কুৎসিত কেউ কখন পড়েও নেই এবং রূপের জন্তও কই কেউ যে বর বা কনেকে ত্যাগ করেছে, তাও তো বড় একটা শুনিনি বা দেখিনি। বরং মহা মহা রূপসীকেও গুণের অভাবে স্বামিত্যক্ত হয়ে থাকতে চোখে দেখেছি। কালে কালে কতই হ'ল!”

বিনতা তখন ঠাকু'মাকে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিল, “ওগো, অত বড় ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না গো! সকল কালেই তোমার ‘তরুদিদির’ মতন মেয়ে জন্মে এক রকম সামঞ্জস্য ক'রে চালিয়ে নেবে। শুধু আমার মতন পাষাণবাই তো আর এ কালে একলা জন্মাবে না।”

এমন সময় ভুবনবাবু আসিয়া বলিলেন, “তরু মা! আমার হাত-বাগের চাবিটা দেবে এস ত।”

অগত্যা এই দুক্ল বিষয়টাকে অসীমাসিত রাখিয়া তখনকার মত সভাভঙ্গ করিতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে শুভ বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছিল। এখন শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই হয়, গলিতপত্র শীতশীর্ণ বৃক্ষলতা নবকিসলয়ে আগ্রাস্ত ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের কোথাও কোথাও নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছও অতি উজ্জল ও বিচিত্র শোভায় দিক্ আলো করিয়া আছে। বিরলমলিলা দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীগুলিতে জলজ পুষ্প আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু জলের মূর্তি সহজেই চোখে পড়ে, গ্রামের মধ্যে মধ্যে অদূরবিস্তৃত শস্তক্ষেত্র শুভ্র মূলকফুলে, হরিদ্র সরিষা-কুম্ভমে এবং উজ্জল বেগুনী বর্ণের কড়াইগুটির পুষ্পগুচ্ছের প্রাচুর্য্যে অপূর্ব সুন্দর মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তন্নিম্ন আলুক্ষেত্রের আশে-পাশে রক্ত ও পীত বর্ণযুক্ত কুম্ভকুলের ক্ষেত্রগুলি সকল শোভার যেন আধার হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তভাগে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর— গোচারণের মাঠ। মাঠের ইতস্ততঃ কতকগুলি বিশালকায় অশ্বখ, বট, তিস্তিড়ী ও পাকুড় বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে এক আশটা শিরীষ, সেগুন, ছাতিম এবং আম-কাঁঠালের গাছও ইহাতে আছে। ইহার পশ্চিমদিকের বিশ্রামস্থল হয় ও রোজকান্ত চরণশীল

গাভীদিগকে আশ্রয় প্রদান করে; ইহাদের তলায় বসিয়া রাখালবালকেরা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া পুরাকালের গোষ্ঠলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়; ইহাদের অনতি-উচ্চ শাখায় দড়ি দিয়া দোলনা প্রস্তুত করিয়া গ্রাম্য বালকবৃন্দ সানন্দচিত্তে দোল খায়। এই গ্রামের অনতিদূরে একটি নদী। নদীর অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়, ইহার স্থানে স্থানে চর দেখা দিয়াছে, নদীগর্ভ ক্রমে ক্রমে মজিয়া আসিতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের রেলপথবিস্তৃতি ও খালকর্তৃনের গুণে এমন অবস্থাপ্রাপ্তি অনেক নদীরই ভাগ্যে ঘটিতেছে, তথাপি নদীতীরবর্তী সুসমৃদ্ধ গ্রামের শোভা যে কোন সৌখ-অট্টালিকাবিশিষ্ট নগরীর তুলনায় শতগুণেই শ্রেষ্ঠ। শুভ্র জলধারার পরপারে শান্ত স্নিগ্ধ শ্রামল তরুরাজি, পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যেন চিত্রাঙ্কিতবৎ শোভা পাইতেছে। কচিং তাহাদের বুক চিরিয়া একটি বহু প্রাচীন প্রশস্ত চাতাল ও শিবমন্দিরসম্বিত বাঁধাঘাট নামিয়া আসিয়াছে। এ পারের মেটেঘাটের উপরেই একটা প্রকাণ্ডাকার বটবৃক্ষের তলদেশে সানবাঁধান। গ্রামের সেটি বসীতলা। অদূরে জমীদার-বাবুদের দ্বারা সত্ত্বসংস্কৃত বহুপুরাতন শ্মশানের শিবের অতি বৃহৎ মন্দির ও ভোগঘর, ইহারই এক পাশে পূজারীর থাকিবার ছইখানি খড়োচালা। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসেই এখানে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া নদীতীরে মেলা বইসে, শিবের মাধায় জল ঢালিতে চারিদিকের গ্রাম ও পল্লী সকল হইতে দলে দলে লোক আইসে। চম্পক-চামেলীর ও কচি বিলপত্রের ভারে শ্মশানের বিশাল মূর্তিটিও তখন চাপা পড়িয়া যায়। এক্ষণে কেবলমাত্র ছই চারিটি শুক বিলপত্র ও কয়েকটি কুন্দ ও ক্ষুদ্রজাতীয় গাঁদা লিঙ্গমূর্তির পিনাটের উপর পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শ্মশানঘাতীরাই শুধু এক একটা প্রণাম করিয়া যায়।

শুভেন্দু বিবাহবাড়ীতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই। নিজের সমবয়সী অথবা অধিকাংশ বয়ঃকনিষ্ঠ বালক, এমন কি, ছই চারিটি বালিকাকে পর্য্যন্ত নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়া সে সারাগ্রাম ও গ্রামান্তর পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার সুন্দর চেহারায় এবং নানারূপ উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে বোধ করি কোনরূপ সীমাহনের সমতাও

নিহিত ছিল; দুই দণ্ডের পরিচিত সকলেই একবাক্যে যেন কতকালের দলপতির মত তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া সেই আকর্ষণী শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া বোধ করিতে পারে নাই। ইহাদের দ্বারা নির্বিরোধে শুভেন্দু অনেক প্রকার অকর্ম-হুম্মের সাহায্য পাইতেছিল, সাজা পান ও আচার চুরিতে ইহারাই সকলের অগ্রাভিনী। এই দলের মধ্যে ভুবনবাবুর ছেলে সুশীলকেই শুভেন্দু বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। সুশীল শুভেন্দুর ঠিক সমবয়সী হইলেও এবং স্কুলের পড়ায় এ পর্য্যন্ত ভাল ছেলে বলিয়া গণ্য হইতে থাকিলেও এবার এই শুভেন্দুর শুভাগমনে তাহার নিজেকে নেহাৎ ছেলেমানুষ ও নিতান্তই নিকোঁধ বলিয়া মনে হইল। কলিকাতায় সে এক প্রকার বন্দিদশায় কাল কাটায়। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠা হইতে রাত্রিতে বিছানায় প্রবেশ করা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটিই তাহার একই নিয়মমুত্রে গ্রথিত হইয়া একখানা রুটিনের লেখার মত হইয়া আছে, ইহার একটি দিনের নিয়মও কখন উলোমুপলট হইতে পায় না। আজও সকালে সেই মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসা, পাঠশেবে চাকরের হাতে তেল মাখিয়া সাবান ঘষিয়া পরিপাটি স্নান ও অত্যন্ত সাবধানতাপূর্ণ ভাবে অর্থাৎ তেল, ঝাল, টক ও সস্তা দামের তরিতরকারি, মৎস্য, ফল সমস্তই বর্জন করিয়া রোগীর পথ্যানুমোদিতভাবে গুরুজনের শাসন-দৃষ্টির তলে তলে আহার-কার্য্য সমাধা এবং গাড়ী চাপিয়া মাষ্টারের সঙ্গে স্কুলে গমন। বাকী দিনটার ইতিহাসও এই পূর্ব্বাঙ্কের সহিত নেহাৎ বেখাপ্পা নয়। খেলার যেটুকু অবসর সে পায়, সেও এক আনন্দ-উৎসাহবিহীন প্রাণ-হীন খেলা। বাড়ীর ক্ষুদ্র ‘লেনে’ মাষ্টারমশাই, বাবা এবং বাবার বন্ধু এক আধজনের সঙ্গেই আর সব বিষয়ের মতই সে খেলা সীমাবদ্ধ,—পিংপং, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, কখন বা ঘরের মধ্যে বিলিয়ার্ড টেবলে এমনই নিকুংসাহে বিলিয়ার্ড বল লইয়া ছোড়াছুড়ি। ভুবনবাবুর একটি ভাই যুবাবয়সে ফুটবল খেলিতে গিয়া গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইল ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। সেই পর্য্যন্ত এ পরিবারে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর হাড়ডুডু, গুলিডাঙা এ সব এখনও ছোটলোকের ছেলেরা কদাচিৎ খেলিতেছে বটে, তবে আশা আছে যে, দুই দিন পরে তাহারাও আর খেলিবে

না, টেনিস খেলাই বোধ করি আরম্ভ করিবে। কাজেই সুশীলের নিগড়বদ্ধ জীবন পল্লী-স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার শুভেন্দুর মত এক জন সর্ববিদ্যায় বিশারদ সঙ্গী লাভ করায় তাহার মন পরম সুখে নৃত্য করিয়া উঠিল। যদি বা এ কদিন পিসীমা, দিদি, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি অশেষবিশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহার স্নানাহারটাকে কতকটা নিয়মিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শুভেন্দুর শুভাগমনাবধি আর কাহারও সাধ্যো তাহাকে আঁটিয়া উঠা সম্ভব হইল না।

বাড়ীর বড় পুকুরিণীতে সচরাচর বাহিরের লোক স্নান করিতে পায় না। বাড়ীর বাবুরা বা বধু ও কন্যাগণ স্নান করিয়া থাকেন। আজকাল বিবাহবাড়ীতে এ নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, এখন দিবাগাত্রিই নিমজ্জিত-নিমজ্জিতাগণের দ্বারা পুকুরিণীর জল আলোড়িত হইতেছিল। কলিকাতাবাসী সুশীল ইতঃপূর্বে বাটী আসিলে নদীর তোলা জলেই স্নান করিত। পুকুরে নামিয়া স্নান করায় তাহার মনেও বিলক্ষণ ভয় আছে এবং বাড়ীর লোকেরও নিষেধ ছিল। শুভেন্দু আসায় সে ভয় ও নিষেধ কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার আর কিছুই ঠিকানা পর্য্যন্ত রহিল না। প্রথম দিন সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া ঘটি করিয়া মাথায় জল পড়িল, দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দুর বিশেষ সাহায্যে ডুব দিয়া স্নান হইল, তৃতীয় দিবসে পল্লীর অস্ত্রাত্মক বালকদিগের সহিত সমান পাল্লা দিয়া সুশীল পুকুরিণীবাসী মৎস্য, শস্য ও কর্কটকার দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে বাড়ীর লোকের তাড়নার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার চেষ্টায় পরামর্শ করিয়া এক দিন তাহারা নদীস্নান করিতে গেল। সে দিন তরুর ‘গায়ে হলুদ’। বাড়ীর লোক সেই সব ব্যাপারেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। ইহারই ফাঁকতালে সুশীল এই নদীঘাতীর দলে ভিড়িয়া পড়িতে বিশেষভাবেই সুবিধা পাইয়াছিল। নতুবা হয় তো তাহার গমনে বাধা পড়িত।

সাঁতার দিতে শুভেন্দুর যুড়ি প্রায় খুঁজিয়া মিলে না। কোন্ বিছাটারই বা তাহার অভাব আছে! সুশীলের খুড়তুতো ভাই মলিকুমারের সহিত “বাচ” লাগাইয়া সে মাননদী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিল, সুশীল তখনও ভরসা করিয়া জলে নামে নাই। শুভেন্দুর মতলব ফাঁসিয়া গেল। মিছামিছি নিজের হার

স্বীকার করিয়া লইয়া সে সলিলের পাশ কাটাইয়া ফিরিল। চারিদিকে ছবুরে ধ্বনির মধ্য দিয়া দৃকপাত-শূন্যভাবে তীরে উঠিয়া সে স্রুণীলের নিকট আসিলে নিতান্ত ভ্রমমাণভাবে স্রুণীল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “সলিলদার কাছে তুমি হেরে গেলে? কিন্তু তুমিই তো তখনও অনেকখানি এগিয়েছিলে, হার স্বীকার ক’রে নিলে কেন? ও কক্ষনো অতদূর যেতে পারতো না।”

শুভেন্দু ক্র কুণ্ঠিত করিয়া জবাব দিল, “তুমি জলে না নেমে সংএর মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তাইতেই তো আমার গুধু গুধু হার মেনে নিয়ে ফিরে আসতে হলো। তুমি একেবারেই ‘গুড-ফর্-নথিং বয়’!”—

এই ইংরাজী গালিটুকু সে তাহার সম্বন্ধে অনেকের মুখেই শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন সেটা নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, আজ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া এক হাত লইল।

স্রুণীলের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, বাড়ীতে তো কথাই নাই। এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে সে শুনিতে পায় নাই। কাজেই মনে মনে রাগিয়া সে মুখখানা হাঁড়ি করিয়া জলে নামিল এবং প্রায় অবক্ষ জলে পৌছিয়াই গভীর জলের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গেই ডুবিয়া গেল।—সেখানটায় একটা গভীর খাদের মত গর্ত ছিল।

এই অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় - ঘাটভরু ছেলের দল অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেকেই আবার, স্রুণীল এটা ডুব দিল কি ডুবিল, তাহারও কোন স্থিরতা করিয়া উঠিতে পারে নাই, এমন কি, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “বাব্বা, স্রুণীল!”

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শুভেন্দুর একটুও বিলম্ব ঘটে নাই, সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া জলে পড়িয়াছিল এবং খানিকটা পরে অনেকখানি জল খাইয়া প্রায় অবসন্ন স্রুণীলের শিথিল দেহ সাপটাইয়া ধরিয়া কোনমতে তাহাকে উদ্ধার করিল। শুভেন্দু ও সলিলে মিলিয়া যখন স্রুণীলকে তীরে উঠাইল, তখন স্রুণীলের সমস্ত দেহ পাক্কাশবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার হাত-পাগুলো শীতে নীল মা’ড়িয়াছে, দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বাইতেছে, পেটের

মধ্যেও কিছু জল গিয়াছে; তবে সেটা খুব বেশী নয়। শুক্র, ভয়াকুল সঙ্গীর দল এতক্ষণে কিছু ভরসা পাইয়া একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল, “বাড়ীতে খবর দেওয়া দরকার।” কেহ বা প্রস্তাব করিল, “একখানা ডুলি আনাতে হবে।” সলিল গুরুমুখে কহিল, “কিন্তু জ্যোঠামশায় কি ভয়ানক যে চ’টে যাবেন, সে বলবারই নয়।” এই সম্ভাবনাটার আসন্ন ভয়ে অনেকেই আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দুই এক জন বালক বার্তাবহের কার্য্য করিতে উত্তত হইয়া বাড়ীর পথে পা বাড়াইতে বাইতেই স্রুণীলকে লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত শুভেন্দু তাহাদের হুকুম দিয়া বলিল, “খবরদার! এ সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কারুর মুখ থেকে বার হ’তে পর্য্যন্ত না পায়! স্রুণীল! এই স্রুণীল! তোর কি ডুলি চ’ড়ে বাড়ী যাবার সাধ হচ্ছে না কি রে?—দিদির বরের মতন?”

ইতিমধ্যেই স্রুণীল অনেকখানি সামলাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক পেট জল খাইয়া তাহার শরীরের মধ্যে তখন এক রকম হাঁস্‌ফাঁস করিতেছে, বমনেচ্ছা হইতেছে, ডুলি চড়িয়া বাড়ী বাইতে তার আপত্তি যে বিশেষ ছিল, তা নয়; কিন্তু এই অবমাননাজনক পরিহাসে ইহারই মধ্যে সে কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সবেগে মাথা নাড়া দিল, “হ্যাঁ! ডুলি কি হবে?”

শুভেন্দু বলিল, “তা হ’লে সবাই মিলে কথাটা একেবারেই চেপে যাও। তোমরা সব বাড়ী ফিরে যাও, স্রুণীলের খোঁজ হ’লে বলবে যে, সেও বাড়ী এসেছে। ওই ওদিকে আছে, ডেকে আনছি, এই না বললে সটান স’রে পড়বে। আমি একটু পরেই একে নিয়ে যাচ্ছি। এই নিত্য! একটা কাজ কর দেখি, ওই মন্দিরবাড়ীর পুরুতের কাছ থেকে এতটা মূণ নিয়ে আয়, সেইটে জলে গুলে খাইয়ে দিলে বমি হয়ে যাবে। তা হ’লেই সব সেরে ঠিক হয়ে বাবেখন।”

নিত্য আদেশপালনে ছুটিল। সলিলের মেজ ভাই অনিল বলিয়া উঠিল, “শুভেন্দুর যে ডাক্তারীও পড়া আছে দেখছি!”

গর্বে বুক ফুলাইয়া শুভেন্দু সেই ফুলান বুক তাল ঠুকিয়া কহিল, “থাকবে না! আমি যে ‘লাষ্টো কেলেশের আউট’ হওয়া ছেলে, তার খবর রাখো কিছু? আমার কোন্ বিজেটাই ঐ কম?”

এই গর্কোক্তির মধ্যে অর্থ কিছু থাকুক বা না-ই থাকুক, উহার বলিবার ধরণে কথাটা শুনিয়া সকলেই খুব একচোট হাসিল এবং হুগ খাইয়া সুনীলের পেটের জল অনেকখানি বাহির হইয়া গেল, সুনীলকে কতকটা সুস্থ দেখিয়া শুভেন্দুর পরামর্শমত তাহাদের দুই জনকে শুধু সেখানে রাখিয়া অপর সকলে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। ইহার মধ্যে সুনীলের জন্মগত হওয়ার খবরটা বেমানমভাবে চাপিয়া বাওয়া হইবে বলিয়াই সেই পক্ষায়েত সভায় একবাক্যে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সুনীলের জন্মে ডোবার সংবাদটা বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখা হইল বটে, এবং সে দিন তরুর ভাবী খণ্ডরবাড়ী হইতে তব আসার গোলমালে সুনীলের গৃহে অনুপস্থিতিও কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না বটে; তথাপি সুনীলের নিজের মনের মধ্যে এ দিনের এই ঘটনাটা কেমন যেন একটা অপরাধের গুরু ভারের মতই ভারী হইয়া রহিল। বিবাহবাড়ীর আমোদে সকলেই সুখোন্নত। তরুর শাণ্ডীর সুবিবেচনার ও খণ্ডরের মুক্তহস্ততার খ্যাতিতে সে দিন বাড়ী ছাপাইয়া দেশ ভরিয়া গেল। বাড়ীজ্ঞ, পাড়াজ্ঞ ছেলেমেয়েরা তরুর সত্যপ্রাপ্ত খেলানার রাশির চারিদিকে, বসন্তপুষ্পসম্ভারের চারি পার্শ্বে আকর্ষিত মধুপকূলের স্থায়, গুঞ্জরিয়া ফিরিতে লাগিল; কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পর ম্লানমুখে আসিয়া সেই যে সুনীল একটিবারমাত্র দিদির বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের পানে অমাগ্রহভাবে তাকাইয়াই আন্তে আন্তে চলিয়া গেল, সেটা আর কেহ লক্ষ্য না করুক, তরুলতা করিয়াছিল এবং পরম স্নেহের ছোট ভাইটির এই প্রকার বৈরাগ্যপূর্ণ অবহেলার ভাব তাহাকে একটুখানি ব্যথিত করিতেও ছাড়ে নাই। তরু ভাবিল, “এ সব জিনিস, বোধ হয়, সুনীলের তেমন পছন্দ হয় নি। আমি কোথায় ভাবছিলাম, এগুলি সব হাতে পেলে এর থেকে ভালগুলি বেছে বেছে সুপু আর বিনাকে এর অনেকগুলিই দিয়ে দেবো। কিন্তু কেন ওর কিছু ভাল লাগলো না? আচ্ছা, আমি ওকে ছেড়ে চ’লে যাব, তাই মনে করে কি ওর মুখটি অত শুকনো দেখাচ্ছে!” সুখসরোবর পরিপূর্ণ হইয়াও তাই ছাপাইতে পারিল না।

সুনীলের অঞ্চ এ সব বিষয়ে কোনমতেই আজ মন লাগিতেছিল না। মাতৃহীন সুনীল পিতার বড় আদরের ধন। ভুদনবাক্স নিজের একটা আদর্শ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, হলেরা শাসনে একেবারেই বিগড়াইয়া

যায়, অতএব তাহাদের সতত আদর করিবে; কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য রাখিবে—তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দিকে। মিথ্যাবাক্যকথন এবং মিথ্যাচরণ না ঘটতে পারিলেই শিশুজীবন চিরনিরাপদ হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা এবং আজীবন এই শিক্ষাতেই তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে “মানুষ” করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুনীলও এই অনুসারে পিতার সহিত কোন বিষয়ে লুকাচুরি করিতে কখন শিক্ষা করেন নাই এবং এ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজনও তাহার কখন ঘটে নাই। কলিকাতাবাসী বালকের ছাত্রজীবন এমনই ঘড়ীর কাঁটার মত নিয়মতন্ত্রতার গঠিত যে, তাহা হইতে এতটুকুও এদিক ওদিক সরিবার তাহার কখনই দরকার হয় না। আজ জীবনে এই প্রথমবার শুভেন্দুর পরামর্শের কুহকে পড়িয়া সুনীল পিতার নিকট কথা গোপন করিল এবং তাহাই তাহার বিবেককে ভীমরূলের হলের মত কাঁটা বিধাইতেছিল।

অবশ্য সুনীলের স্বপক্ষ যুক্তিরও কিছু অভাব ছিল না। শুভেন্দু তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, ইহাকে মিথ্যাচরণ মনে করা সুনীলের নিছক কল্পনামাত্র। অপর কোন যথার্থ কারণ ইহার সঙ্গে নিহিত নাই। যেহেতু, সুনীলের পিতা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এ বিষয়ে তিনি তাহাকে কোন প্রশ্নও করিতেছেন না এবং সে-ও সে প্রশ্নের ভুল উত্তরও দিতেছে না। তবে তাহার ইহা মিথ্যাচরণ কিসে হইতে গেল?—কিসে যে হইতে গেল, শুভেন্দুর সে কথা বুঝিতে পারা সম্ভব তো ছিলই না। সুনীলেরও সমস্ত সত্য এই গোপনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকিলেও সেটাকে ভাষা দিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিতে কতকটা তাহার অনভিজ্ঞতা ও কতকটা মানসিক দৌর্বল্য তাহাকে বাধা দিতেছিল। সে-ও, মনে না হউক, অন্ততঃ মুখেও মৌন রহিয়া এ মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাইয়া আত্মপ্রত্যারণার সূত্রপাত করিল। কিন্তু চিরদিনের শিক্ষাকে তো বড় সহজে কেহ এড়াইয়া যাইতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে মনটা তাহার এমন সুখের দিনেও একান্ত নীরস, তিক্ত ও সুখলেশহীন হইয়া রহিল, আর পাছে কোনরূপ কুটপ্রশ্নে পড়িতে হয়, এই ভয়ে পিতার চির-ঈর্ষিত সঙ্গের আসক্তি পরিহারপূর্বক পিতার সান্নিধ্যকে সে যথা-সাধ্যই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।—এ ঘটনাও সুনীলের জীবনে এই প্রথম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাকালে তরুর বিবাহ সাড়ম্বরে সমাধা হইয়া গেল। কিন্তু রোসনাইয়ের আলো দিয়াও বরের কালো রঙ্গ ঢাকা পড়ে নাই, এটাও ঠিক। বর দেখিয়া ঘরে পরে অনেকেই মুখ বাঁকাইলেন। কেহ কেহ আবার সেই বাঁকামুখে মন্তব্য করিলেন—“মেয়ে সেয়ানা আছে লো! জানে মনে, বড়লোক বিয়ে করলে হীরের পাশ-বালিসও পায়ে দিয়ে শুতে পারে। নাই বা রইলো বরের অঙ্গে রূপ, রূপোর তো আর তা’ ব’লে তার ঘরে অভাব নেই। তাই হলেই হলো। হীরের আলোয় গায়ের রং চেপে যাবে।”

ইহা শুনিয়া এক জন স্বামিসোহাগিনী রূপসী ঠোঁট উন্টাইয়া জবাব করিলেন, “তা’ যা’ বলিস্ আর যাই কোন্স বোন! আমি বাবু হক্ কথা বলবো। রূপো যতই কেন সিন্দুকে সিন্দুকে ঠাসা থাক, কি মেয়ে কি পুরুষ অঙ্গে যদি একটু রূপই না রইল তো সকলি বাবু ‘বেৰ্থা’ হলো। ওই যে কুল-আটির মতন মুক্তর মালা গলায় হুল্ছে, ও যদি বট্টাকুরের ছেলে—কি ওই ওঁর বন্ধুর ছেলে শুভেন্দুর গলায় ওঠে তো দেখবে, ওর না জেল্লা খুলে যাবে! আর এঁর গলায় মনে হচ্ছে যেন সেই ‘কার’ গলায় মতির মালা!”—

মহিলাকুল অনেকেই এই অর্ধ-প্রচ্ছন্ন উপমাটিকে অরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে উপহাসের অজস্র হাসি হাসিয়া উঠিলেন এবং সে হাসি থামিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এমন সময় কর্মব্যস্ত বৃদ্ধা জ্যোঠাইমা সেইখান দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আনন্দ-স্মিতমুখে বলিয়া গেলেন, “ওলো, তোরা আমার ভুবনের জামাই দেখলি? তা বেটা ছেলে, শ্যামবর্ণ রং একটু বটে, তাতে আর হয়েছে কি? মুখছিরিটুকু, বাপু, দিব্যি আছে!”

জ্যোঠাইমা’র মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই নাক সিঁটকাইয়া ঠোঁট উন্টাইলেন। তাঁহার পিছন ফিরিতে যেটুকু দেরী, তাহার পরই তাঁহাদের তীব্র-ভাষার ঝাঁজে ভুবনবাবুর নব জামাতার “মুখছিরি-টুকু”র সমস্ত ত্রীই প্রায় ঝলসিয়া গেল। ভুবন-বাবুর ভ্রাতৃবন্ধু বলিলেন, “ও বলতে হয় তাই, বলা। যখন ঘরের জামাই হচ্ছেন, তখন ও কথা না ব’লে আর কি বলা যাবে? তবে সত্যি কথা বলতে হ’লে বাবু বলতে হয় যে, মুখে ‘ছিরি’টির ব’লে ত কোন পদার্থই দেখতে পেলেন না।”

ইহার আর এক জন জা বলিলেন, “সে কি লো, সেজদি! দেখতে পেলিনি কি বল? কেন, দিদি! অমন খাঁদা নাক, অমন ছুটি কোটরে ঢাকা চক্ষু আর অমন ‘ট্যাঁকতোলা’ চোড়া ‘চৌরস গড়ের মাঠের মতন’ প্রকাণ্ড কপাল রয়েছে, মুখে আর নেই কি?”

আর এক জন বলিলেন, “ওলো, ব্যাখানা কর্ছিস্ কি? বড় কপাল যে ভাগ্যবন্ত পুরুষের লক্ষণ। দেখছিস্ না, তাই অমন কপালে-পুরুষ। পাঁচটা না ছ’টা পাশ দিয়েছে, আবার শুন্তে পাই নাকি খুব ভাল চাকরীও পেয়ে গেছে এই বয়সে।”

“তার উপর অমন রূপেগুণে বোঁ পেলো।”

মেয়ের খুড়ী একটুখানি টেপা হাসি হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, “তা হোক, তাই, সে তো অনেকেরই হয়, তা ব’লে মুখের অর্ধেকখানি কপাল কিন্তু ভগবান্ সবার জন্তেই তৈরি করেন না।”

বাসরঘরে সুরসিকা ঠান্দি বরের পাশে বসিয়া সুর করিয়া গানের ছন্দে সখেদে গাহিলেন—“হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।”

বর যতীন্দ্র দেখিতে সত্যসত্যই ভাল নহে। সংসারশুদ্ধ সকলকেই যে সুরূপ হইতে হইবে, এমনও তো কোন কথাবার্তা বাধা নাই! কেহ বা রূপে মন্দ, কেহ বা গুণে মন্দ, আবার কেহ কেহ রূপেগুণে সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কোথাও ঠিক উন্টাও ঘটে। যতীন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিতে বসিলে আরম্ভেই তাহাকে ফেল করিয়া বসিতে হয়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, বিজ্ঞা এবং বিনয়বাধ্যতা এ সকল গুণ না কি কখন চামড়ার রঙ্গের উপর নির্ভর করে না, সেই হেতু এই বিশ্ববিজ্ঞানের সমুদয় ছোট বড় ডিগ্রিধারী পরমপণ্ডিত সুরচিত্র ছেলোট এক দিকে কঠোর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বড় রকম মাহিয়ানার একটা উচ্চপদ এবং অপর পক্ষে সুবিজ্ঞ ভুবন-মোহনের নিকট হইতে সাধারণ-জল্লভ কস্তারত্ন এত-ছতমই লাভ করিয়া বসিল। ভাগ্যবিধাতা তাহার অন্তর ও বাহির ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিতে কোথাও কোন কার্পণ্য দেখাইলেন না। আবার কনে দেখা এবং বিশেষতঃ শুভদৃষ্টির সময় তরুণী তরুর সলজ্জ স্মিত-মুখখানি পলকের মধ্যে দেখিয়া ফেলিয়া যতীন্দ্রের তরুণ চিত্ত আশার পুলকে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তরুর মুখে তো কোথাও অসন্তোষের

তাহা হইলে কুরূপ যতীন্দ্রের প্রতি তাহার মনে কোন বিরুদ্ধভাবের উদয় হয় নাই! নতুবা এমন মন্দমধুর হাসির ছটায় কখন ঐ দুইটি ক্ষুদ্র প্রবাল-রক্ত ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত? গুরুজনের আদেশে যখন সে তাহার ভূমিলগ্ন অবনত নেত্র দুইটি উঠাইয়া সুধীরে যতীন্দ্রের মুখে বারেকের জন্ত স্থাপন করিল, সেই পলকের মধ্যের চকিত দৃষ্টিটুকুর তলে কি অপূর্ব বরাভয় সে যে দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই সুখজড়িত বিপুল বিশ্বয়ে তাহার যৌবনোন্মেষিত আশাতরা চিত্র যেন মুহূ-মুহু সুখভরে নর্ত্তিত ও কাঁপিত হইতেছিল। অন্তরে নিহিত সেই গভীর পুলকের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়া তাই সে ঠান্দির অনুযোগের উত্তরে সহাস্ত-মুখে জবাব দিতে পারিল—

“যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর আহার,
কমলে কটক হাস বিধান তাহার।”

ঠান্দিও ভেমনই! তিনিও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিমুখে কহিয়া উঠিলেন, “ঠিক বলেছ, ভাই! ‘কমলে কটক হাস বিধান তাহার!’ ওলো ও সাবিত্তিরি! চঞ্চলা! বেলা! তোরা ছোটো গানটান গা’ না’ লা। বালি সেই ‘রাধাশ্রামের’ গানটি গা’ দেখি,—বেশ অক্ষরে অক্ষরে ছবছ মিলে যাবে এখন। ও মা, জানিস্নে কি লো? অবাক কথা মা! আজকালকের ছুঁড়ীওলো সব কিই গো! রজনী সেন আর রবি ঠাকুরকে নিয়েই ওঁরা উন্নত, আমাদের সেকলে সব কত সুন্দর সুন্দর বাসর-জাগার গান ছিল, সে সব দেখাছ তোদের হাতে প’ড়ে লোপ পেয়েই যাবে। নে, তা হ’লে আমিই না হয় তোদের বদলে গেয়ে দিচ্ছি! আমার এমন সুখের দিনে একটু গানও গাইব না? তা দেখিস্, ভাই, শেষে যেন গলা শুনে হেসে বিষম খেয়ে মরিস্নে সব। আমাদের সেকালে অত গলা-ফলার ভাবনা ছিল না, বাড়ীতেই হোক, পাড়াতেই হোক, বর দেখলেই আমাদের গানে পেত, তা গলা থাক বা নাই থাক।”

“কই ঠান্দি, গান গাও, বড়তাই ত দিতে লাগলে।”

“এই যে গাচ্ছি লো, এই যে কলি, এসেছি, দুই ত ঐ-গানটা জানিস, আর আমার সাথে গা’—দেখি—

৫২ (খ)—৪

‘রাধাশ্রাম একাসনে মিলেছে ভাল।

মিলেছে ভাল—রাধাশ্রাম সেজেছে ভাল—

ওগো, রাই আমাদের সো-নার ব-রণ,

শ্রাম চিকণ কালো’।”

গান শেষ হইলে সভামধ্যে একটা চাপা হাসির তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রোতৃ-বৃন্দের মধ্য হইতে দুই একজন চাপা গলায় বলাবলি করিলেন, “তা ঠিকই হয়েছে বটে। রাই, আমাদের সোনার বরণ, শ্রাম চিকণ কাল।” তা এটা ভাই ঠিক!”

গান শেষ হইলে যতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, “আমি এমন প্রত্যক্ষভাবে কার জীবনে দেখা দেবার সুযোগ কিন্তু সর্বদা পায় না—না, ঠান্দি?”

ঠান্দি অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাকুক, সপ্রতিভ ভাবে গালভরা হাসিয়াই উত্তর দিলেন,—“তা হ’লে গানটা তোমার ভাল লেগেছে? দেখ ভাই, রাগ-টাগ কর নি ত?”

সম্মতমুখে যতীন্দ্র কহিল, “ক্লান্তকে যখন দিন করবার উপায় জানা নেই, তখন রাগ ক’রে আর উপায় কি বলুন? ওই শ্রমীর গান আপনাদের আর কতগুলি পুঁজি আছে?”

এবার ঠান্দির পূর্বেই তাহার পিছন হইতে এক জন আত্মপরিচয়গোপনকারিণী—শাওড়ী-সম্পকিয়া সকৌতুকে বালিয়া উঠিলেন—“কেন, দু-একটা শিখবে না কি?”

যতীন্দ্র পূর্ববৎ হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে চাহিয়া জবাব দিল, “শিখতে চাইনে, তবে যাকে লক্ষ্য ক’রে আপনারা এই সমস্ত আখের বাণগুলি ঝাড়লেন, আজকের এত বড় পরীক্ষার দিনটায় প্রাণপণে সবাই মিলে একসঙ্গে আপনাদের সমস্ত চোখা চোখা শরসন্ধান ক’রে তাকে একেবারেই বিঁধে ফেলুন না? তার পর দেখা যাক, এরও পরে তিনি নিজেকে খাড়া রাখতে পারেন কি না! তবেই বুঝবো, আমার কতখানি জোরকপাল, তবেই জানবো, উনি কত বড় বীর!”

এই হাসির সঙ্গে একত্র মিশ্রিত তীব্র ব্যঙ্গভরা কঠিন অনুযোগের কথা সেই বাসরঘরের অল্পবুদ্ধি মহিলামণ্ডলীর বুকে পাড়িয়া তাহাদের চিন্তকেও যেন একসঙ্গে লজ্জায় শিহরিয়া তুলিল। সত্যই তো তরুর সাক্ষাতে এ আলোচনাটাকে এতদূর অবাধ গড়াইতে দেওয়াটা তো সত্যই ভাল হয় নাই!

তথাপি মুখে কি কেহ কখন নূতন বিবাহের বরের কাছে নিজেকে হার মানাইতে চায়? শ্রালীসম্বন্ধীরা কলিকা রোথ করিয়া বলিল, “তা যতীনবাবু! আমরা না হয় রাতকে দিন ক’রে ফেলেই—‘ওহে সুন্দর’ ব’লে তানই ধরলেম, কিন্তু ওই যে তরুর হাতের পাশে তোমার ঐ হাতখানা রয়েছে, তা এ ছুখানার তফাৎ কি আর তরুণী নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে না? পরের মুখে কালই খাওয়া যায়, তা ব’লে পরের কথায় কি কালোকে সাদাও দেখা চলে? তা হ’লে না হয় বলুন, আপনাকে যতীন বাবু না ব’লে এখন থেকে গৌরাজ বাবু ব’লেই ডাকতে থাকি!”

কলির কথায় সকলের চক্ষু বর-কনের যুগল হস্তের উপর আসিয়া পড়িল এবং তরুলতা তৎক্ষণাৎ অসহিষ্ণুভাবে নড়িয়া চড়িয়া নিজের সুগঠিত ও সুগৌর হাতখানাকে কাপড়ের তলায় ঢাকা দিয়া ফেলিল।

তখন যতীন্দ্র সাকৌতুক হাসিমুখে মুখ তুলিয়া তাহার আক্রমণকারিণীকে স্মিতহাস্তে কহিল, “এই আমার উত্তর শুনুন।”

কলিকাও তখন হাসিয়া ফেলিল, সহাস্যে বলিল, “তা হ’লে দ্বিতীয়বার গান্ধারীর অভিনয় করবে বোধ করি, তরু।”

এই সময় বিনতা নিজের দলবল লইয়া এই ঘরের ধারে উকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতোছিল, কথা-শুলা তাহার কানে ঢুকিতেই সে সেইখান হইতেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “তা বুঝি তুমি জান না, কলিদি! দিদি বলেছিল যে, ‘রূপ না কি একটা কিছু জিনিস! মানুষের গুণ থাকলেই হলো’।”

কলি উচ্চহাস্তের সহিত কহিয়া উঠিল, “ওই শোন, ভাই গুণি! তোমার গুণগ্রাহিণীর গুণের কথা শুনলে তো! আমরা তোমায় গোরই বলি আর কালাচাঁদই বলি, রাই কিন্তু নিজের মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে যে, সে কালমাণিককে মাথার মণি ক’রে নেবেই নেবে।”

যতীন্দ্র হাসিমুখে কহিল, “নিজেরাই শুনুন আর শিখুন। যেহেতু, এ বাড়ীর জামাইদের মধ্যে দেখ্‌লুম, আমার মতন আফ্রিকাবাসী নাই হোক, তবু আরও হুঁচর জন অগ্নসম্ম কালোও আছেন। তাঁদের পক্ষে কিছু সুবিধা হ’তে পারবে।”

তখন এই বয়সে অত বিবেচনা ও গুণগ্রাহিতার

জন্ত তরুর প্রশংসায় শতমুখ হইয়া পড়িয়া বারি-বাসিনীগণ পূর্ব আলোচনাতে ইতি করিলেন এবং অবশেষে সকলেই যে তরুর সহিতই একমত, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রমাণ হইয়া গেল। তাহার পর আপোষে কতকটা মিটমাট হইয়া গিয়া যখন আমরা কিছু নরম পড়িয়াছে, তখন ঠান্দির দল নিরস্ত হইয়া শ্রালিকার দলকে গান শুনাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। তখন অরগ্যানের ঢাকা খোলা—এসরাজ বেহালা সেতারের সুর বাঁধার ধুম পড়িয়া গেল। যতীন্দ্রও তখন ভরাবুকে পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি একটি মৃদু দৃষ্টিপাত-পূর্বক প্রসন্নচিত্তে সঙ্গীতসুধা পান করিতে মনোযোগী হইল। জীবনের প্রথম পরীক্ষা-সাগর সে সাঁতার দিয়া আসিয়াছে, কখন ফেল হয় নাই। জীবনের মধ্য-পরীক্ষাতেও তাহা হইলে হয় ত সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

নদীর ধারে ধারে আমগাছের সারি, কাঁঠাল নারিকেল কলা ও সুপারির স্তম্ভবিড় বন। ইহারই ইতস্ততঃ কয়েকটা উঁচুদের জাম, জামরুল, গোলাপ-জাম, আতা, পেয়ারা, লিচু, বেল ও কপিথ বৃক্ষ। আবার বাদাম, তুঁত, নানাজাতীয় লেবু, পিচ ও ফলসা গাছও ছই একটা করিয়া আছে। বাগানখানা ভুবনবাবুদের পার্শ্ববর্তী জমীদার অঘোর চৌধুরীর পুত্র বিপ্রদাস চৌধুরীর। এক্ষণে উভয় পরিবারে অসৌজন্য না থাকিলেও পূর্বে পূর্বে কাহারও সহিত কাহারও বেশ মনের মিল ছিল না। জমাজমি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক আধবার ফৌজদারীও হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক দিন হইতে আর কোন গোলমাল হয় নাই; এবার তরুর বিবাহে বিপ্রদাস বাবুর স্ত্রী কন্তা নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বিপ্রদাস বাবু নিজে আসিতে না পারিলেও আইবুড়ভাত ভালই পাঠাইয়াছিলেন।

ছেলের দল ঐ বাগানখানার উপর চিরদিনই লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল; কিন্তু ভয়ে কেহ কখনও সেই জমিতে পা দিতে পারে নাই। শুভেন্দুর কাছে সেই কথাটা ফাঁস হইতেই সে সকলকেই টিটকারী দিয়া উঠিল, “আরে ছাঃ! আমি হ’লে একদিনে অন্ততঃ এর তিন ভাগ ফল পেটে পুরতাম।”

সলিল মাথা হুলাইয়া বলিল, “তাই ত গো! মুখে শু সব বলা ভারি সহজ, এ বড় বিষয় ঠাই, এব একটা আনারস উপড়ে যেদো ভাঁতি জেল খেটে মরেছিল। চারটে আম পেড়ে হরে খাড়ার ছোট ছেলে নেপা যেনে সাত হাত নাকে খত দিয়ে তবে কোনরকমে ছাড়ান পায়। যাও না একবার পেয়ারা পাড়তে, টেরটি পেয়ে এস না দেখি।”

এই তাকিলা বাক্যে শুভেন্দুর মনের মধ্যে যে মতলবটা খেলিয়া গেল, সে তখন আর সেটাকে ফাঁস করিল না, চাপিয়া গিয়া অবাস্তুর কথা পাড়িয়া বসিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুশীলকে একপাশে টানিয়া আনিয়া শুভেন্দু তাহার কানে কানে বলিল, “জানলি, সুশীল! আজ একটা খুব সাহসের কাজ করতে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়া কিন্তু তোর কর্ম নয়, তুই বরং তার চাইতে বাড়ী যা।”

শুভেন্দু জানিত, সুশীলের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই। হইলও তাহাই। ইহা শুনিয়া সাগ্রহে সুশীল প্রশ্ন করিল, “কি কাজ কর্তে যাচ্ছ শুনি?”

শুভেন্দু যেন কতই অনিচ্ছুকভাবে থামিয়া থামিয়া জবাব দিল, “সে তোমার শুনে কোনই লাভ নাই। তোমাদের মধ্যে কেউ সে কাজে হাত দিতে কখনই ভরসা করবে না। সলিলদের বিশ্বাস, তা কতই অসম্ভব, তাই আমি তাদের দেখাতে চাই যে, যা তোমাদের সবার পক্ষে অসম্ভব, তা একা আমার পক্ষে অতি সহজ এবং—” সুশীল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে একটা ঠেলা দিল ও উৎসুক সহকারে বলিয়া উঠিল, “চল এফুণি,—আমিও যাব।”

শুভেন্দু যেন কতই বিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, “তুমি!” সুশীল গম্ভীর ও দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, “হঁ”—এবং এই বলিয়া লম্বা পা ফেলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। তখন শুভেন্দু মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, “আরে সোজাই চল যে, আমাদের পথটা যে এর থেকে একেবারেই বঁকা।”

ফলের বাগান এখন ফলশূন্য-প্রায়, তাই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্য পূর্বের অপেক্ষা কিছু শিথিল, কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে ঘাট-বাধান পুড়ুরিণী আছে—তাহাতে অনেক মাছ ফেলা

হইয়াছিল। বাবুর মাছ ধরিবার সখ বড়ই প্রবল; পাছে সেই মাছ কেহ ধরিয়া লয়, সেই ভয়ে বিশেষভাবেই যে পাহারার বন্দোবস্ত আছে, আশপাশ দেখিয়া শুভেন্দু সে খবরটা জানিতে পারে নাই এবং সম্পূর্ণরূপেই জনশূন্যবোধে তাহার দুইজনে কুল ও পেয়ারা যত পারা যায়, নিজেরা খাইয়া সঙ্গীদের দেখাইবার জন্তও অপরিয়াপ্ত সংগ্রহ পূর্বক যেমন ঝপাৎ করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়াছে, অমনি সেই প্রায়াক্রমিকারে কাহার বজ্রমুষ্টি তাহার পিঠের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে দড়ি দিয়া তাহার দুখানা হাতকেই চাপিয়া বাধিয়া ফেলিল। সুশীলের অবস্থাও ততক্ষণের মধ্যে তাহার অপেক্ষা যে বেশী ভাল ছিল না, সেটুকু দেখিতে পাওয়ার মত আলো সেখানে ছিল।

ঘাটের রণায় মাচা বাধিয়া বসিয়া বিপ্রদাসবাবু একান্তমনে হুইলের ছিপে একটা বড় কালবোস মাছকে গাঁথিয়া ফেলিবার জন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, পারিয়া উঠেন নাই, তাই মনটা বেজার হইয়া গিয়াছে। একবার ফাৎনায় টান পড়িল, ভারি ঠেকিল, তুলিয়া দেখেন, একটা মস্ত কোলা ব্যাং—আবার একটা কঁকড়া আসিয়া চার খাইয়া গেল—কি মুন্সিল!—

এমন সময় বাগানের দুইজন মালী তাহার সঙ্গে দরওয়ানটার সাহায্যে দুই কিশোর চোরকে হাত বাধিয়া লইয়া আসিয়ান্টপস্থিত হইল ও সুদীর্ঘ সেলাম বাজাইয়া বলিল, “ধর্মাবতার! এই দোনো চোট্টা মিল কর, কলমবালা আমরুত সবই তোড়তাড় লিয়া, অউর পাটনাবালা বইরতি বহুত চোরায়কে লে যাতে রহা। মালীলোককে সাথ মিলকর দুব্বনকো পাকড়া গায়া।”

জলের মধ্যে একটা বড় মাছের পাখনা-নাড়ার মূছ কম্পন অনুভব করিয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই ধর্মাবতার বিচার শেষ করিলেন, “থানা মে লে যাও।”

বিচারের রায় শুনিয়া শুভেন্দু সেকোপে দাঁত দিয়া নিজের ঠোট কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু সুশীল কোন-মতেই আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল, সমস্ত শরীর ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সতর্কণ আর্ন্তর্য্য বাহির হইয়া পড়িল। শব্দটা বিপ্রদাসের কানে গেলেও তাহার প্রাণে উহা স্পর্শমাত্র

করিল না, তিনি যথা-পূর্ব হুইলের চাকার দিকেই চাতিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কর্কশ-কণ্ঠে দরওয়ানজী বাজপেয়ী হাঁকার দিয়া উঠিল “আরে চলবে চল”—বলার সঙ্গে ছেলে দুইটির হাতে বাঁধা দড়ীতে একটা হেঁচকাটানও সে দিল, ভদ্রলোকের ছেলে বুঝিয়াও ছাড়ান দিল না। কিন্তু সুশীল তাহাতেও নড়িল না। যতদূর সাধা, শরীর মনে তাহার যতখানি বল যেখানে আছে, সে সমস্তই একত্র সংগ্রহ করিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া মাটি চাপিয়া দাঁড়াইল, মুখেও হয় ত কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রবল অশ্রুজলের কম্পনে কথা তাহার কণ্ঠের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছিল এবং কি কথাই বা তাহার বলিবার আছে, তাহাও সে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ না কহিলেও যে এখনই কি সর্বনাশ তাহার ঘটয়া যাইবে, তাহা মনে করিয়া তাহার ভীষণ আর্তনাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। শুভেন্দুর অবস্থা দেখিবার অবসর তাহার মোটেই ছিল না, নিজের কথাই এখন তাহার কাছে সমস্ত পৃথিবীর আকারের অপেক্ষাও অনেক বেশী বড়। সর্বশরীরের চলন্ত রক্ত উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া যেন তখন শুধু রুদ্ধ-কল্লোলে এই কথাই তাহাকে বলিতেছিল—“বাবা জান্লে কি করবেন! বাবা জান্লে কি বলবেন!” এর চেয়ে বেশী আর বড় কোন ভাবিবার বিষয় তাহার কাছে ছিল না।

শুভেন্দু মৃদুস্বরে দরওয়ানজীর অনেক স্তবস্ত তই করিতেছিল, কিন্তু সে সমস্ত ভয়ে স্বতর্পণের ভায় একান্ত বার্থ করিয়া চোরোদ্ধবনিকের দল যখন পরমাৎসাছে লক্ক শীকার লইয়া ‘কুইক মার্চ’ করিয়া চলিয়াছে, এমন সময় সেই অন্ধ অন্ধকারছায়াচ্ছন্ন বন-বীথির মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র দীপশিখার ভায় ক্ষুদ্রাবয়ব বালিকা ভ্রমপদে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, “বাজপেয়ীজি! হামকো একটো পাখী ধরুতো দিজিয়ে! এ কাঁহা চল্‌তা হায়, জেরা শুনিয় তো খোড়া খাড়া হোকে।”

বাজপেয়ী ঈষৎ বিপর্যয়ে খাড়া হইয়া বলিল, “দেখিয়েনা খোঁকিজী! দোঠো চোড়া আপনা কলমকা পেঁড়সে বহের চোরাতে রহা, ময় আভি মহারাজকা হুকুম তামিল করনেকে ওয়াস্তে থানে পর তুষম্ন লোগকো লে চল্‌ত থেঁ, আভি মায় কেইসে পাখী ধরুতা?”

‘খোঁকী’ ভ্রমপদে উহাদের সম্মুখে আসিয়াই যেন বিষয়ে একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল। পরে সন্ধিগ্ন মৃদুস্বরে সে বাজপেয়ীকে বলিল, “ঝুটা বাত নেহি কহনা! ই তো বাবু লোক হায়, চোড়া কাহে কহা?”

বাজপেয়ী হস্তবদ্ধ আনতবদন ছেলে দুইটির প্রতি টিটকারী দিয়া রসিকতা করিয়া জবাব দিল, “আরে খোঁকিজি! আপতো গেড়কাআদরি, আপকা মালুম নেহি হায়, আজকাল বাবু লোক সব চোড়া ওর ডাকু বড়ে হোতা হায়! চল্ বাবু! থানেপর চল্! এইসা বহোত বাবুলোক আজকাল থানেপর যাতে উতে হেঁ।”

মেয়েটি সহসা বিজ্ঞাচ্ছটার ভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া তীব্র গম্ভীর আদেশের স্বরে উচ্চারণ করিল, “খবরদার! হিঁয়াই খাড়া রহনা, মায় পিতাজীকো পাশ চল্‌তেহেঁ।”

এই বলিয়াই যেমনই অকস্মাৎ সে কানন ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল, তেমনই করিয়াই আবার নিমেষ-মধ্যে অদৃশ হইয়া গেল। অপরাধীঘর যদি নিজ নিজ দুঃখভারে অত বেশী অবসর না হইয়া পড়িত, অথবা বয়স আর একটু অধিক হইত, তাহাদের হয় ত বা কাননবিহারিণী কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ হওয়া বিচিত্র ছিল না।

* * * *

“বাজপেয়ী!”

“খোদাবন্দ।”

“চোর লোগকো দো দো বেত লাগাকর ছোড় দেনা।”

“যো হুকুম মহারাজ!”

হুকুম শুনিয়া শুভেন্দুর চোখ জলিয়া উঠিলেও সুশীলের অবসরতায় প্রায়-বিচেনদেহে যেন তৎক্ষণাৎ জীবনীশক্তি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। দুই বেত! দুই বেত কেন, থানায় যাওয়ার পরিবর্তে সে যে সহস্রগারও বেত্রাহত হইতে প্রস্তুত আছে।

থানায় গেলে তাহার পিতা যে সকল কথা জানিতে পারিবেন! আর জানিলে পর? সুশীল ভাবিতেও পারেনি যে, তার পর কি হইবে বা কি হইবে না! সুশীলকে তিনি যে কিছুই বলিবেন না, ইহা নিশ্চিত;—কিন্তু তাহার বুক যে কেমন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িবে, সে কথা সুশীল ভেলেমানুষ হইলেও তাহার অজ্ঞাত

নয়। সে যথাসম্ভব দৃঢ় ও স্থিরচিত্তে দণ্ড লইতে প্রস্তুত হইল।

“বাজপেয়াজি! বহোতি আস্তেসে বেত লাগানা, ভাইয়া! মায় আপকো একঠো কপৈয়া দেঙ্গে।”—

অত্যন্ত মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ এই করুণাপ্লাবিত শব্দকয়টি অপরাধীদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। সুশীল ইহাতে বারেক সক্রতজনেত্রে সেই ক্ষুদ্র করুণাময়ীর করুণা-কাতর স্নিগ্ধমুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল।

“বাপ্ রে বাপ্!” বেতাহত সুশীল লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার বেত উঠাইতেই কাতরস্বরে আন্তর্ধ্বনি করিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল, তাহার সম্মুখ-বর্তিনী মেয়েটি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া আগুুলিয়া ধরিল। জলভরাচোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, “খবরদার!”

বাজপেয়ীর হাতের বেত যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

শুভেন্দুকে অটল দাঁড়াইয়া বেত খাইতে দেখিয়া, বিশেষ এই অশরিত্তিতার পূর্বপ্রলোভনবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীল মনে করিয়াছিল, বেত খাওয়া জিনিষটা সন্দেহ খাওয়ার চেয়ে বেশী তফাৎ নয়; কিন্তু নিজের পিঠে উহারই একটি ঘা পড়িতেই তাহার সমস্ত ধারণাটাই উল্টাইয়া গেল। উঃ, বাজপেয়ীর হাতে আস্তে মারা বেতেরই এই জালা,—না জানি, তাহার পূর্বদমে কতখানি বেদন হইতে হইত!—যে সুশীল কখনও কাহারও নিকট একটা চড়চাপড়ও খায় নাই, তাহার পক্ষে এ যে একেবারেই অসহ্য! ইহার দ্বিতীয় আক্রমণের ভয়েই তাহার মূর্ছা যাইবারও উপক্রম হইল।

“বাজপেয়ি! জলদি পানি লাও, দোঠো বয়েরকে ওয়াস্তে তোম ভালা আদমীকো জান্ লে’ লেওগে?”

বাজপেয়ীর এই ক্ষুদ্র মনিব-কণ্ঠাটির এ প্রকার প্রভুত্ব দেখা অভ্যাস আছে, ইহাকে সে নানা কারণে অসহ্য ও করিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং সেইজন্য শুভেন্দু ও সুশীলকে সে একটু হাতে রাখিয়াই বেত লাগাইয়া-ছিল, ইহাতেও যদি নবীর পুতুল চোরকে মূর্ছা যাইতে হয়, তাহা হইলে সে আর করিবে কি? যুষের টাকাটা তাহার নষ্ট হইল দেখিয়া উহাদের উপর তাহার

ক্রোধের সীমা রহিল না, মনে মনে আপশোষ হইতে লাগিল যে, এর চেয়ে বেত দিয়া উহাদের পিঠের চামড়া খানিকটা উঠাইয়া আনিতে পারিলে তবু হাতের কিছু সুখও হইত; আর বাবু-চোরদেরও তাহার কথা চিরকাল স্মরণ থাকিতে পারিত। ঈষৎ বিরক্তস্বরে সে তাই প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “ভালা-আদমী কভি দোসরাকো বাগিচামে চোরী কর্ণে নেহি আতেই দিদি সাহাব!—এ দেখিয়ে! ডাকুলোগ মর নেহি গঁয়া! দেখিয়ে উঠকে খাড়া হো গিয়া। বাস্! আভি হাম দোনোকো বাহার নিকালকর দোসরা কাম-পর চল্‌তে হৈ।”

মেয়েটি কিছু না বলিয়া তাহার অভ্যন্ত চঞ্চল তন্তপদে আর একদিকে চলিয়া গেল, এবং ফটকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া শুভেন্দু ও সুশীল দেখিল, সে এক ঘটা জল লইয়া ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছে।

“খাবার জিনিষ কিছু নেই,—শুধু খাবার জল এনেছি, নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে! একটু জল খান।”

শুভেন্দু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু সুশীল বারেক নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতার আবার তাহার সেই করুণাবিগলিত মুখের পানে চাহিয়া প্রায় পূরা একসেরী ঘটীর এক ঘটা জল পান করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণ তখন তাহার গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অনুকূলচন্দ্রের যে কথা, কাজও সেই। বাস্তবিকই ইহার ঠিক পরের দিন এলবার্ট বালিকা বিত্তালয়ের গাড়ী আসিবার পূর্বেই সেন্ট-পিটার্স মিসন স্কুলের একটি বলদযোজিত সাম্পান আসিয়া নীলিমাকে তাহাদের স্কুলবাড়ীতে লইয়া চলিয়া গেল। এ দিকে এলবার্ট স্কুলের গাড়ী আনিয়া স্কুলের দাই যখন তাহার অভ্যাসমত ডাকাডাকি করিতেছিল, “নীলি-বউয়া! হো—নীলি-বউয়া! আপ কেত্তা দেবু করবে বউয়া! আইয়েজি! জল্‌নী আইয়ে!”

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া নীলিমার পিতা তাহার হরিদ্র-প্রভ দন্তপংক্তি প্রদর্শন পূর্বক কোন অশিষ্ট জীব-বিশেষের স্মারক যেন উহাকে

দংশনোত্ত ভাবেই চোঁচাইয়া বলিলেন :—“এই তোম কুস্তাকো মাফিক্ এইসা কাহে চিল্লাচিল্ল করকে আদমীকো কান খাতা ছায়! নিকালো নিকালো; —ইয়াসে নিকাল যাও।”

প্রত্যক্ষ ক্রদমূর্তি দেখিয়া দাউ-বেচারী তটস্থ হইয়া পড়িল, মাথার কাপড়টা একটু সংযত করিয়া লইয়া স্বর নাশাইয়া বলিল, “বউয়াকো বোলাতে হেঁ, বাবুজি! জেরা মেহেরবাণী করকর বোলা দিজিয়ে বাবু!—দেব হোগিয়া।”

অনুকূল তাঁহার খিঁচান মুখে অধিকতর খিঁচাইয়া পঞ্চমের স্বরকে সপ্তমে চড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন, “বউয়াকো বোলা দিজিয়ে!” নেই নেই, বউয়া ওর কব্‌হি হুঁয়া পড়তে নেহি যায়েগি। তোমহরা বিবিসাহেব লোগকো বোল দেনা কি ঐসা খারাব ইস্কুলমে খারাপ জানানা লোগকা পাশ হামারা লেড়কীকো হাম ওর কভি নেহি ভেজেছে। হুঁয়া পড়ানা ঠিক নেহি হোতা ছায়, গুরুমা লোগকো দেখকর বহোত বেচাল শিখ যাতা ছায়। হন লোগকো নকরী ছোড়ানেকে ওয়াস্তে হাম গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতে হেঁ। যব দোসরা মাইজী লোক আবেছে, তব ফিন্ হামারা লেড়কী হুঁয়া পর পড়নে যায়েগা—”

শকটারোহিণী বালিকাবন্দ উৎসুক-আগ্রহে বুঁকিয়া পড়িয়া উৎকর্ষা হইয়া এই বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে পরস্পরের মুখ চাহিয়া মুহু মুহু হাসিতেছিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে অকস্মাৎ চলার ঝাঁকানী বাঁচাইয়া লইয়া যে যাহার নিজস্থানে আসন লইয়া বসিল। সর্বপ্রথম মনোরমা তাহার দুইকাঠির বোনা হাতে লইয়া স্রম্যার দিকে চাহিয়া হাসিল, “বুঝলি সুমি! নীলির বাবার নামে সেই যে চিঠি-খানা সুলোচনাদি’ পাঠিয়েছিলেন না? তার জন্তই নীলিবেচারীর আপার প্রাইমারীটা দেওয়া ঘটলো না। সে হয় ত এবার পাশ ক’রে স্কলারশিপটাও পেতে পারতো।”

স্রম্যার পূর্বেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “আর সুলোচনাদি’ মনোরমাদি’দের চাকরী শুদ্ধ না খায়। বল্লেন যে, ‘গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতেহেঁ’—দেখ বেচারারা বুঝি বিপদে পড়লেন বা!”

মনোরমা ঠোট বাঁকাইয়া অবজ্ঞাসূচকস্বরে উত্তর করিল,—“ইং, নীলির বাবা তো ভা—রী একজন ব্যতকর। লোক কি না! তাই উনি ‘দরখাস’ দিয়ে

সুলোচনাদি’দের চাকরী ছাড়াবেন। আচ্ছাদ প’ড়ে গেছে আর কি! বড়জোর একদিন ইন্স্পেকট্রিস এসে ওঁদের একটা কৈফিয়ৎ না হয় তলব করবেন।”

প্রতিমা মস্তব্য করিল, “তবু ত সে একটা অপমান। আর সুলোচনাদি’ ভাই যে রকম তেজালো মানুষ—”

মনো ভ্রভঙ্গী করিয়া বলিল,—“কিসের অপমান! তা হ’লেই ত আসল কথাটাও ধরা প’ড়ে যাবে। যিনি ‘দরখাস’ দিচ্ছেন, তাঁর কাছে যে স্কুলের একটি গাদা টাকা পাওনা,—সেটিও যে ওঁরা জেনে যাবেন। তাতে অপমানটা হবে কার? সুলোচনাদি’ কাঁচা মেয়ে নন, সব চিঠিরই তিনি নকল রাখেন। ‘রাজার রাজার যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়’ তাঁর তো নয়; লোকসান হলো নীলি-বেচারীরই!—আর একটা মাসও ছিল না—মোটো এই চাকরটা না পচিশটা দিন বাদ—পরীক্ষাটা দিলে ও নিশ্চয়ই স্কলারশিপটা পেয়ে যেত!”

অনুকা কহিল, “তখন ত ও’ নিজেই ভাই, ওর মাইনের টাকা দিয়ে দিতে পারতো। আহা! সুলোচনাদি’ এত তাড়াতাড়ি না ক’রে যদি একটু দেরী করতেন, তা হ’লে হয় ত ওর পরীক্ষাটা দেওয়া হ’ত।”

সাবিত্রী এতক্ষণের পর ‘ট্যাঙ্ক’ করিয়া উঠিল—“সুলোচনাদি’ ত আর ‘জান’ নন, কেমন ক’রে জানবেন বল যে, পাওনা টাকা দিতে বল্লেন নীলির বাবা মেয়ে আটকাবে।—এমন ছোটলোক তো এর আগে আর কখন দেখেন নি তিনি।”

সাবিত্রীর মুখের ভয়ে সব মেয়েই মনে মনে উহাকে সমীহ করিত, শুধু করিত না মনোরমা। সে এখনও উহার মস্তব্যের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটিল,—“এমন ছোটলোক যে আর কক্ষণোই দেখেন নি, তাও অবশ্য হলফ ক’রে বলতে পারিনে। তবে নীলির বাবার তবু একটা আকৈলও আছে যে, মাইনে যখন দেবেই না, তখন মেয়েও না হয় আর পড়বে না; কিন্তু কারু কারু আবার দেখি সেটুকুনও নেই।”

স্রম্যা অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “কিন্তু ভাই, নীলির বাবা সুলোচনাদি’দের সম্বন্ধে কি রকম অপমানের কথাগুলো সব বলেছেন বল তো!—আমার তখন কিন্তু এমন ভয়ানক রাগ ধরছিল। আমি ওঁদের কিন্তু সব ব’লে দেব!”

প্রতিমা বলিল, “আমিও।”

সাবিত্রী কিন্তু সে দিকে কর্ণপাত না করিয়াই মনোরমার দিকে ত্রুটি-কুটিল মুখ তুলিয়া সরোবে কহিল, “খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে লাগতে আসবে না! কেন, আমি কি তোর খাই না পরিবে, যখন-তখন তুই আমাকেই চিপটেন কাটতে আসিস্?”—

গাড়ী আসিয়া বিজ্ঞালয়ের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আজিকার এই সকল অভিনব কাহিনী সর্বপ্রথম সুলোচনাদি’র কর্ণগোচরকরণার্থ আগে নামিবার জন্ত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহারই ঠেলাঠেলিতে একটি সিম্পল ক্রাসের ছোট্ট মেয়ে গাড়ীর পা-দান হইতে কঁকর বিছান পথের উপর সজোরে পড়িয়া নাকমুখ ছেঁচিয়া কান্না জুড়িয়া দেওয়াতে সুসমাচার-প্রচারিকাদের প্রথম উৎসাহের মুখে তখনকার মতন পাথর চাপা পড়িয়া গেল।

স্কুলের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল; সকল মেয়েই নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছে। কেবল দুঃসাহসিকা মনোরমা সুলোচনাদি’র সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্কুলের দ্বাই এংবারিয়ার সাক্ষ্যের মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে, তাহারই হিসাব রাখিয়া যাইতেছিল। এংবারিয়ার খানিকটা বলা হইয়া গেলে সে হঠাৎ ফোঁস করিয়া উঠিল,—“হ্যাঁ দাই, ‘গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতেই,’—ওই কথাটা বড় যে বাদ দিলে যাচ্চিস্?—আচ্ছা মজার লোক তো তুই দেখি! ওহুন, সুলোচনাদি’! নীলির বাবা আরও যে কত কথাই বলেন, তা আর আপনাকে কি বলবো! আপনাকে দেখে নাকি মেয়েরা সব বেচাল শিখছে, আপনাদের বদলে অল্প টিচার এলে তখন ওঁর মেয়ে নাকি পড়তে আসবে—আর সে ঢের ঢের কথা—”

ইনফ্যান্ট ক্রাসের মেয়েদের শ্রেণীর উপর পেনশিল দিয়া যুক্তাকর লিখিতে বসাইয়া ফোর্থ টিচার ব্রান্স-বালা দে কোতুহলাক্রান্ত হইয়া পায়ে পায়ে আসিয়া মনোরমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল; মনোরমাকে এবার ‘কমা’ দিতে দেখিয়াই অসহিষ্ণুভাবে সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—“আরও কি কথা বললে রে মনোরমা?”

মনোরমা সমুৎসাহিত হইয়া—‘ঢের কথা’ বলিবার জন্ত উহার দিকে কিরিয়া দাঁড়াইতেই সুলোচনা গম্ভীরমুখে মিস দে’র দিকে চাহিয়া বলিলেন, “That

is impertinence” বালু!—মনে! যাও তোমার নিজের যায়গায় গিয়ে বস গে।”

খট্ খট্ করিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া রেজিষ্টার বাহির করিয়া তার পাতা উন্টাইয়া খস-খস করিয়া নীলিমার নামটা তাহা হইতে কাটিয়া দিলেন। পাশের ঘরের মেয়েরা খোলা বইএর পাতার পাশ দিয়া আড়চোখে তাঁর উক্ত কার্য্য দর্শনান্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলাবলি করিল, “ওরে, নীলি আজ থেকে নামকাটা সেপাই হয়ে গেল রে!”

ইতোমধ্যে মনোরমা আসিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। থার্ড টিচার প্রেমকুম্ভ দাস কয়েকটি মেয়েকে একটা নূতন আঁক দেখাইয়া দিতেছিলেন, ইঙ্গিতে মনোরমাকে কাছে ডাকিলেন। মনো আসিলে স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, “কই, সে চিকনটা কেনা হয়ে এসেছে?”

মনো ঘাড় ছুলাইয়া জবাব করিল, “উঁহু, সে আজকে মোটে কেনা হবে, কাল আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।”

“ইউ আর এ নটী গার্ল! রোজই তো কাল, কাল বলো, কবে তোমার কাল হবে শুনি?”

মিস্ দাসের এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—“ওর ‘কাল’ হ’তে এখনও অনেককাল লাগবে, প্রেমকুম্ভদি’! দেখছেন না কি মোটা।”

মনোরমা ভ্রূভঙ্গী করিয়া কথিয়া উঠিল, “তোমার মতন ত আর সবাই পাক্তাড়ানী—কাক-তাড়ানী তা ব’লে হ’তে পারে না! না সত্যি প্রেম-কুম্ভদি’! কাল ঠিক এসে যাবে দেখবেন। মাকে আমিও ক’দিন ধ’রেই কেবলই তাড়া দিচ্ছি, তা মা কি বলেন জানেন?”

“কি?”—বলিয়া প্রেমকুম্ভ একটা মেয়ের আনা কথা অন্ধ দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

“মা এমন ছষ্টু!—না, আমি সে কথা বলবো না!—সে আপনি শুন্লে রাগ করবেন!—মা,—মা বলে, ‘তোমার প্রেমকুম্ভদি’র তো আর বিয়ে বন্ধ যাচ্ছে না—এত তাড়াতাড়ি কিসের? দোবই এখন আনিবে’!”—এই কথাটি বলিয়া মনোরমা মুখ নামাইয়া একটুখানি ঠোট টিপিয়া হাসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়ের ঠোটেই একটু একটু হাসি দেখা দিল।

প্রেমকুসুম হাতের পেন্সিলটা দিয়া মনোরমাকে ছুড়িয়া মারিলেন,—তাহার পর ভাঙ্গা পেন্সিলটা কুড়াইয়া দিতে হুকুম দিয়া উহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, “কি—সব ডেঁপো হয়ে যে উঠছেন! দাঁড়াও না, মিস্ বোস্কে তোমাদের সব বিতোর কথা শুনিয়ে দিচ্ছি!—এই অলকা! তোর কানে ও কিসের ছল রে? সিরোপাল? সুন্দর ত! কতর কেনা হয়েছে? কোথা থেকে আনানো হ’লো? দাম জানিস্?—ওঃ! মোটে কুড় টাকা! এক্সসেলেন্ট! এই মেয়ে! মাকে ব’লে আমার একঘোড়া আনিয়ে দে’ না?”

অলকারা দুই বোন—অলকা ও অনুকা দুজনেই একসঙ্গেই সমুৎসুককণ্ঠে কহিয়া উঠিল—“আজই বাড়ী গিয়ে মাকে বলবো’খন আমি, মা কালই নিশ্চয় কল্কাতায় দাদাকে লিখে দেবে পাঠাতে।”

তখন অপর ক্লাস হইতেও একটি দুইটি বড়-মেয়ে উৎসাহচঞ্চলগোভাকুলকণ্ঠে ইহার প্রতিধ্বনি তুলিল—“ও ভাই অলি! আমিও মাকে ব’লে টাকা দেবো ভাই! আমাকেও একঘোড়া ছল আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু!”

যে মেয়ের অঙ্কের তিন ভাগ ভুল হইয়াছিল, তাহাকে তিরস্কারপূর্বক প্লেটখানা ফিরাইয়া দিয়া প্রেমকুসুম ঐ মেয়ের উদ্দেশ্যে কহিলেন, “তোকে আবার এখনি কানের ছল কিনে দিয়ে কি হবে রে মেয়ে? আবার তো দুদিন পরেই বিয়ের সময় দিতে হবে।”

মেয়ে জবাব দিল, “হ্যাঁ, তা’ বই কি! আর আপনার, আপনার বুঝি পরতে দোষ হয় না? আপনারও তো—”

“কি? বিয়ের সময় হবে? কে দেবে? দেবার যদি কেউ থাকতো তো কি এইখানে এই সব গোক চরাতে আসি রে? এই সুখা! কতক্ষণ লাগে একটা ভাগ রাখতে? ভারি চালাকি হচ্ছে!”

“এই যে হয়ে গেছে—প্রেমকুসুমদি!”

“আচ্ছা প্রেমকুসুমদি!—না বাপু, বলবো না—আপনি হয় ত রাগ করবেন!”

“হা, হা, বলিস্নি, ডেঁপোর শেষ হয়েছে এই মেয়েগুলো! একদিন মিস্ বোসের কাছে না—এই সব শীগগির ভাল ক’রে বোস, মিস্ বোস

আসছেন যে! সুপ্রভা! চার সতেরং কত হয়? তবে যে এখানে চৌষট্টি লিখেছ বড়?”

* * * * *

নীলিমা যতক্ষণ সেই ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে আমোদিত বন্ধ গাড়ীর ভিতরে বসিয়া ছিল, সমানেই সে রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া মুহূৰ্হ চোখ মুছিয়াছে। তাহার নিতান্ত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গোলকটের মধ্যে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে উপস্থিত ছিল না, তাই তাহার এই অনাহুত অশ্রুজলের বেগ সামলাইয়া রাখার অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও যে ছিটাকোটাটা জোর করিয়া বাহিস্থ হইতেছিল, সেটার জন্ত আর কৈফিয়তের দায়ে পড়িতে হয় নাই। সারা পথই তার এমন করিয়া কাটিয়াছে, বিশেষতঃ যখন এলবার্ট স্কুলের গাড়ীখানা তাহার নুতন গাড়ীর পাশ দিয়া ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া গম্গম শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল, গাড়ীর মধ্য হইতে প্রতিদিনকার মতই মেয়েদের কল্কল করিয়া কথার শব্দ, হাসির শ্রোত বায়ুতরঙ্গে মিশিয়া নীলিমার কানের কাছে ভাসিয়া আসিল, মনোরমার তীক্ষ্ণ হাতের সহিত অনুকার ঝঙ্কারীকলহাস্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া নীলিমার বুকের বাধাপর্দায় ঘেন একটা ঘা দিয়াই কতকগুলো পুরাতন স্মরণ বাজাইয়া তুলিল। কত সুদূর দিনের স্মৃতির ভাণ্ডার একসঙ্গে উলটিয়া পড়িল; আর যেন নিজেকে সামলান গেল না।—পাছে উহারা তাহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে গাড়ীখানাকে দেখিয়াই সে তাহার সমুখের টানা ঝিলমিল করুটা নামাইয়া দিয়াছিল, আবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেও তাহার এই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানাকে আজকার সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই সকল সঙ্গিনীদের দেখাইতে হয়। নীলিমা বিপর ভাবে অবশেষে নিজের দুই জামুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ ওই অত বড় গাড়ীখানার—অতগুলি মেয়ের মধ্যে শুধু তাহারই অতটুকু যায়গা খালি হইয়াছে! না জানি তাহার কথা উহারা কত কি-ই বলাবলি করিতেছে? হয় তো তাহাকে আনিতে আজও গাড়ীখানা তাহাদের বাড়ীর দরজার কাছে গিয়াছিল! কে না জানি কি বলিয়া ফেরৎ দিল? ভাগ্যে এ সময় তাহার বাবা বাড়ী থাকেন না! কিন্তু আজ তো নীলিমা তাহাকে আসার সময় বাড়ীতেই দোখরা

আসিয়াছিল ? তবেই হইয়াছে ! গাড়ী তো ঐ দিক্ দিয়াই আসিল ? বাবা না জানি দাইকে কি কথাই বলিলেন ? ঐ যে মেয়েরা অত কল্কল করিয়া কত কথাই বলাবলি করিতেছিল, অত হাসি-হাসি করিতেছিল, সে তাহার, আর তাহার বাবার কথাই নহে তো ?

লজ্জায় নীলিমার চোখের জল শুষ্ক হইয়া গেল, এতক্ষণ স্কুলে পৌঁছিয়া দাই—তাহার সঙ্গে মেয়েরা যোগ দিয়া তাহাদের কথা কি ভাবেই বলাবলি হই-তেছে ? বাকি টাকা ফাঁকি দিয়া নীলিমা স্কুল ছাড়িয়া দিল শুনিয়া স্কুলোচনাদি' কত বড় ঘৃণার সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধে বিচার করিবেন । আর তো দেখাও হইবে না যে, সে তাঁহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, এ কার্য্য সে একেবারেই নিজে ইচ্ছা করিয়া করে নাই ! কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব ? স্কুলোচনাদি'র গভীর মুখ দেখিলেই যে বড় ভয় করে, তাঁহার সঙ্গে কি সহজভাবে কথা কহা যায় যে সে তাঁহাকে সুবিধা পাইলেও বুঝাইয়া দিবে যে সে দোষী নয় ? না না, সে কখনই হইবে না,—দোষী হইয়াই উহাদের নিকট হইতে তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইল !—আবার চোখের জলে তাহার বুক ভাসিতে লাগিল এবং তাহার পারিপার্শ্বিকগণ তাহার এই মেঘ বৃষ্টির ক্ষণিক খেলা অবাস্তুখে নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া বিশেষ কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না । ছুই এক জন পরস্পরকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল, “ই-বাক্সালীন্ কাইসে-আরী ?—ই-রোতী কাহে হ্যার ?” কিন্তু উত্তর প্রশ্নেরই “কা’ জানে ।” এই উত্তর মাত্র পাওয়া গেল । অগত্যা তাহারা তাহাদের মধ্যে আকস্মিক সমাগতা এই নূতন ও অদ্ভুত জীবটি সম্বন্ধে অথবা কোতুলকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া সম উর্দ্ধস্বরে এক বীণ্ড ভজন আরম্ভ করিয়া ক্ষুণ্ণিযুক্ত হইয়া চলিল :—

‘—হে মেরা যেশু ! হে মেরা প্রভু ?

আইসিও মেরা লগ্গে,—ছোড়িও না কতু ।”

স্কুলের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন মন ঈশ্বর একটুখানি সুস্থ হইলেও দেশী ও বিলাতী মেম এবং অবশিষ্ট বহুসংখ্যক চুনরী শ্রাকড়াপরা বেহারী হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীলিমার সমস্ত শরীর-মন আবার যেন সঙ্কোচে গুটাইয়া এতটুকু

৫ম (খ)—৫

হইয়া আসিল । ইহাদের মধ্যেই তাহাকে সারাদিন যাপন করিতে হইবে ?—ইহাদের কাছেই পড়া লইতে ও দিতে হইবে ? ওঃ, কোথায় মিস্ দে’, প্রেম-কুসুমদি, এমন কি, স্কুলোচনাদি'র সেই গভীর কঠিন মুখখানাও আজ তাহার মনের মধ্যে যেন মধুকরণ করিতে লাগিল । অপ্রিয়ভাষিণী সাবিত্রী মনোরমাকে তাহার যেন আজ স্বর্গাসিনী দেবকন্নার দল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল । কি করিলে, ওগো, কি পুণ্য করিলে ইহারা তাহারা হইয়া যাইতে পারিত !

সঙ্গের দাই কি বলিয়া দিল, চিঠি দিল ; শুনিয়া ও পাঠ করিয়া এক জন মেম আসিয়া হতবুদ্ধি নীলিমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন । একটি অপূর্বদর্শন সুসজ্জিত কক্ষে আর একজন স্কুলঙ্গী রক্তবদনা মেম প্রকাণ্ড একটা চৌকীতে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন ; নীলিমার সমভিব্যাহারিণী মেমটি তাঁহাকে ইংরাজীতে কি সব বলিতে তিনি একটা খাতা বাহির করিয়া নীলিমার দিকে ক্ষুদ্র ও কপিলবর্ণের চক্ষু'র ফিরাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন, “হে আমার প্রিয় বালিকা ! তোমারই নাম কি নীলিমা চাকরভারতী ?”

নীলিমা ঘাড় বাঁকাইয়া ইহার জবাব দিলে পুনঃ প্রশ্ন হইল—“তুমি এক্ষণে কত দিনের বৃদ্ধ হইয়াছ ?”

নীলিমা এ প্রশ্নের অর্থ ঠিক জ্ঞানসন্ধান করিতে না পারিয়া নীরব থাকিলে মেম ঈর্ষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও হায় হায়, বেচারী বালিকা ! তুমি যদি তোমার নিজের মাতৃ-জিহ্বাকে (ইওর মাদার টং) ভুল কর, তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইব ।”

এইরূপে নীলিমাকে মিসন স্কুলে ভর্তি করিয়া লইয়া তাহাকে ‘বেঙ্গলী ক্লাশে’ পাঠাইয়া দেওয়া হইল । এই মিসনের সঙ্গে যে অনাথাশ্রম (অরফ্যানেজ) ছিল, তাহাতেই ছুইটি বাঙ্গালীর মেয়ে এবং স্থানীয় ছুই এক জন নিতান্ত দরিদ্রাবস্থ বাঙ্গালীর মেয়েকে ইহারা ‘ভজন-সজন’ দিয়া আনিয়াছে, ইহাদের লইয়া মিসেস্ গু'ই টিচারের অধীনে এক ‘বেঙ্গলী ক্লাশ’ খোলা হইয়াছিল । নীলিমা তাহারই অগত্যা ছাত্রী হইয়া একটুখানি দলপুষ্ঠ করিল ।

সে যখন ক্লাশে ঢুকিল, তখন সেই ক্লাশের পড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । মেয়েরা ভূমে হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া চোখ মুদিয়া প্রার্থনা করিতেছিল ; কেবল মিসেস্ গু'ইই মধ্যে মধ্যে মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন যে, মেয়েরা কেহ চোখ চাহিতেছে

কি না। নীলিমাও উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সকলের মুখে গুনিয়া গুনিয়া যতটা পারিল, আবৃত্তি করিল :—

“হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মাত্ৰ হউক,—তোমার ইচ্ছা আইসুক। আমাদের দিবসের আহাৰ এই দিবসে আমাদেরিগকে দাও এবং আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরা নিজ অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া থাকি। আমেন।”

প্রার্থনা শেষ হইতেই মেয়েরা সম্মুখে হুহু করিয়া গান ধরিয়া বসিল। নীলিমা অজ্ঞতাবশতঃ হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মিসেস গুঁই তাহার দিকে চাহিয়া গাহিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—

“চেষ্টা করতে পারতে।”

নীলিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।—

“বল না ভারত যুগাবে কত, পড়িয়া পাপের ঘোরে।
দেখ না চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে, ত্রাণ-ভানু ওই অ-দূবে,
হরি রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু যাও ভুলে,
নোড়া-ছুড়ি ফেল সাগরের জলে,
যদি পার চাহ ভবান্বকুলে, সার কর তবে বীণুরে।”

এই গানটি শেষ করিয়া পড়ার পালা। মিসেস গুঁই নিজের বাঙ্গালা বাইবেলখানি খুলিয়া আরম্ভ করিলেন—“ঈশ্বর বলেন। শেষ যুগ এইরূপ হইবে।—আমি সমস্ত সংসারের উপর আমার স্ফাওয়ার বর্ষণ করিব।”

সঙ্গে সঙ্গে সকল মেয়েই নিজ নিজ বাইবেলের পাতা আঙ্গুলে খুঁখু মাখিতে মাখিতে খুলিয়া ফেলিল ও সেইরূপ সম্মুখে আরম্ভ করিল :—

“আর তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্তাগণ প্রবচন বলিবে।

“আর তোমাদের যুবকরা দর্শন দেখিবে।

“আর তোমাদের প্রাচীনরা স্বপ্ন দেখিবে।

“হাঁ, আর সেই যুগে আমার দাসদের উপরে আর আমার দানীদের উপরে আমার স্ফাওয়ার বর্ষণ করিব ও তাহারা প্রবচন বলিবে।”

ছুটির পূর্বে পুনশ্চ প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া ছুটি হইল। এবারকার গানটি না গাহিয়া পাছে নীলিমার আত্মার অনন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে, সেই ভয়ে উহা নীলিমাকে একখানি কাগজে লিখিয়া দেওয়া

হইয়াছিল; তাহার আর ভুল করিবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। সেই গানটি এইরূপ :—

“ওরে পাতকি!

ভবপারে যাবার উপায় করলি কি?

ও তোর ব্রহ্মা সুরেন্দ্র, আর কৃষ্ণ মহেন্দ্র—

তারা আপন পাপেই হাবুডুবু

তোমার উপায় করবে কি!”

ছুটি হইয়া গেলে মেয়েরা কপালে হাত ঠেকাইয়া “গুরুমা! নমস্কার!” বলিয়া বিদায় লইতেছিল, মিসেস গুঁই তাহাদের ফিরিয়া ডাকিলেন।

নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এই মেয়েটা আজ কোথা থেকে এলো? এই! তোর নাম কি?”

নীলিমা বিজড়িত স্বরে উত্তর করিল—“শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী।”

“হাঁ হাঁ, হিঁদ্রা অর্থ না বুঝেই নাম রেখে বসে তা জানা আছে। তোর এমন ফরসা রং অথচ নাম রাখলো নীলিমা!—আমি হিঁদ্রাবাড়ীতে এক জন ঘোর কালো রংয়ের মেয়ের বিদ্যাবলতা নাম রাখতে শুনেছি। নীলিমা! আচ্ছা, আমি তোকে নেলী ব’লে ডাকবো—এই নেলি! তোরা পুতুল-পূজা করিস্ ত?”

নীলিমাকে নতমুখ ও নীরব দেখিয়া বলিলেন—“খবরদার! আর কক্ষনও ও কাজ করিস্ নে। নরকের কথা শুনেছিস? সেখানে দিনরাত আগুনে পোড়ায়।—পুতুলপূজা করলে তার অনন্ত নরক হয়, আর—নরকের যে কি যন্ত্রণা, সে সব আমি কাল তোকে ভাল ক’রে বুঝিয়ে দেব এখন; আজ আর আমার সময় নাই। মনে কর, যুহ্যর পর আর অনন্তকাল ধ’রে সেই রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অথচ যীশুকে যদি ভজনা করিস্, শেষ বিচারের সময় যীশু তোকে কোলে ক’রে নেবেন। স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী হ’তে পারবি,—কেমন, পুতুলপূজা ত্যাগ ক’রে এখন থেকে যীশুকে মান্বে ত?”

অনন্ত নরকের ভয়েই হউক, আর মিসেস গুঁইয়ের বিরাট বপু ও তীক্ষ্ণ রসনার ভয়েই হউক, নীলিমা মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, সে যীশুকেই মানিবে এবং এই কথাটা স্বীকার করিবার সময় তাহার মাথার চুলের গোড়া হইতে পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত

বারবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, যেন কিসের একটা তাড়নায় সে এবার আর মিসেস গুইকে “নমস্কার” না বলিয়াই দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অনন্ত সুখের প্রলোভনদাত্রী মিসেস গুইয়ের কদাকার ও প্রকাণ্ড মুখখানাকে হঠাৎ তাহার সেই নরকের দ্বারপালেরই বিকট মুখের মত ভীষণ বোধ হইল, সেই নরকেরই একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা কুমীরের মতই ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, সেই মুখটা যেন তাহাকে গ্রাস করিতে তাহার দিকে ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।— সে যখন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, মহরগতি গো-যান যখন চলিয়া চলিয়া মিসনবাড়ীর প্রশস্ত নয়দান ছাড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, তখন সে একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে জোর করিয়া যেন ঠেলিয়া ফেলিল; ভরসা করিয়া যেন সেই অত্যাচ্ছ প্রাচীর-বেষ্টিত বিলুপ্ত-চিহ্ন বাড়ীটার পানে চাহিতে সাহসী হইল; কিন্তু তখনও তাহার শরীরের ভিতরে ভিতরে কম্পনের বেগটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই; তখনও তাহার কপাল দিয়া শীতের দিনে টস্টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। কেন, বা কি জন্ত কিরূপ একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়না সে খাইল, তাহা তাহার নিকট বেশ সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু তাহার জীবনে কিছু যেন একটা অভাবনীয়—একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের সূচনা আজ এইখানে দেখা দিয়াছে, বালিকা হইলেও ইহা তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বুঝিতে পারিয়াই অমন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা খণ্ডরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের কাছে আদরে আপ্যায়িত হইল। কিন্তু যে ভাইটিকে সে বোধ করি এ পর্যন্ত সকলের অপেক্ষাই অধিকতর ভালবাসিয়াছিল, আজ শুধু তাহার নিকট হইতেই তাহার কোন স্বাগতসম্ভাষণ আসিল না। বিস্মিত হইয়া সুশীলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে বিনতা চৌট ফুলাইয়া জবাব দিল, “তুমি চ’লে গিয়ে পর্যন্ত দাদা না কি কোন দিনই বাড়ীর মধ্যে আসে! কারু সঙ্গে

না কি কথাই কর! ছেলে ত দিন-রাত্তির অন্ধকার মুখ ক’রে বাইরের একটা ঘরে শুয়েই আছে। কেউ ডাকতে গেলে ভাল ক’রে জবাবও দেয় না।”

তরুল এই সংবাদে শঙ্কিতা হইয়া উঠিল, “তার অসুখ করে নি ত? বাবা কি বলেন?”

বিনতা ফিতাবাঁধা বেনী ফুলাইয়া জবাব দিল,— “বাবা কি বলবেন,—বাবা কি কাউকে কোন দিন কিছু বলেন? ঠাকুমা বাস্তব হচ্ছিলেন, তাই বলেন, ‘ওর শরীরটা হয় ত কিছু অসুস্থ আছে, আর তার চেয়েও তরুল জন্ত মনটাই বোধ করি, বেনী খারাপ, থাক, একটু রেস্তা নিক।’—তাই এখন ছেলে শুয়ে শুয়ে ‘রেস্তা’ নিচ্ছেন; একেবারে নট নড়ন চড়ন, নট কিছু!”

সে দিন যে হৃৎসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটয়া গেল, সুশীলের এত দিনকার সংযত ও সুভদ্র জীবনযাত্রাপ্রণালীর সহিত সেটার এতই অনৈক্য যে, সেই কাণ্ডটাতেই বোধ করি, তাহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিত, যদি শুভেন্দু তাহার স্বন্ধে ভর করিয়া তখনও তাহাকে পরিচালিত না করিত। বিপ্রদাস বাবুর বাগানের বাহিরে আসিয়া শুভেন্দু বুঝিতে পারিল, সুশীল নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ খুব কাছে আসিয়া সুশীলের যে হাতটা কাছে পাইল, জোর করিয়া সেইটাকেই চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিল, “সুশীল!”

সুশীল কথায় ইহার জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের অপর হাত দিয়া কোঁচার কাপড় তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। শুভেন্দু কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ভরিয়া তাহা সুশীলের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ পূর্বক কহিয়া উঠিল, “তুমি ক’টা ছেলের মতন কাঁদছ সুশীল? তোমার বয়স বারবছর না চৌদ্দ বছর?”

এ প্রশ্নেরও সুশীল কোন উত্তর করিল না বটে, কিন্তু এই অবমাননাজনক প্রশ্নে তাহার অবসাদগ্রস্ত শিথিল শরীরে যে একটা উত্তেজনার মাদকতা তাহার শরীরের রক্তকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাহার ধৃত হস্তের অকস্মাৎ কঠিন হইয়া যাওয়াতেই শুভেন্দু বুঝিতে পারিয়াছিল। তদ্বিন্ন এই ছেলেটির চরিত্র-লিখা তাহার নিকট একান্তই সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিছুদূর ছই জনেই নীরবে পাশাপাশি চলিয়া

আসিবার পর শুভেন্দু পুনরপি একটা আকস্মিক প্রশ্ন করিয়া বসিল, “এখন কি বাড়ী যাচ্ছে?”

সুশীল এই প্রশ্নে যেন একটুখানি হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এই ভরা সন্ধ্যায় এবং এইমাত্র তাহাকে লইয়া যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহারও পরে তাহার মত চৌদ্ধ বছরের ছেলেতে বাড়ী না গিয়া যে আর কোথায় যাইতে পারে, তেমন কথা তাহার মনের কোণেও কখন উকি দিয়া যায় নাই, তাই সে বিস্মিত ও বিপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “না হ’লে আর কোথায় যাব?”

শুভেন্দু এই প্রতিপ্রশ্ন শুনিয়া বাঘের মতন গর্জিয়া উঠিল, “কোথায় যাবে? কুকুরের মতন চাবুক খেয়ে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে এখন বলছো, ‘না হ’লে আর কোথায় যাব!’ পিঠে ওই চাবুকের জালা নিয়ে ভাত খেতে—ঘুমতে পারবে? গলায় সে ভাত বাধবে না? চোখে ঘুম আসবে?”

সুশীল আবার নীরব রহিল, কিন্তু অক্ষমতার অসহায় কোপে তাহার সর্বশরীরে যে টান ধরিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। শুভেন্দু উহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “আমি তোমাদের মতন ভাল ছেলে নই, সুশীল। আমার ঐ অবিচারের চাবুকের জালা বড়লোকের বাড়ীর পিঠে-পায়সে জুড়িয়ে যাবে না—আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।”

শুভেন্দু চলিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিল, সুশীলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরাইয়া কোমল কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, “তুমিও এলে?”

“হাঁ” বলিয়া সুশীল হন হন করিয়া আগবাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হাসিয়া শুভেন্দু ডাকিল, “ওহে, শোন।”

“কি।” বলিয়া এবার সুশীলই ঘাড় ফিরাইল।

“রায়দীঘির পশ্চিম পাড়ে সেই নাদা বাড়ীখানা।”

“হু”—

“বাড়ীর উত্তরদ্বারের প্রকাণ্ড গোয়ালবাড়ীটা কখন লক্ষ্য করে দেখেছ?”

“দেখেছি।”

“দিব্যি হবে!”

“কি?”

“ভেয় বছরে এমটান্স পাশ করলেই যে মানুষ

বিদ্বান হয় না, তুমি তার একটি একের নম্বরের উদাহরণ! চাবুকের জালায় শোধ সেই প্রকাণ্ড চালাখানার জালায় ভোলবার বেশ সুবিধা হবে, তাই বলছিলাম, তোমার কি এতটুকুও বোঝবার শক্তি নেই?”

সুশীলের মাথা হইতে পা অবধি সবনে কাঁপিয়া উঠিল, “আগুন দেবে? সে যে মস্ত একটা অপরাধ!”

“আর ছোটো পেয়ারা পাড়ার জন্ত ভদ্রলোকের ছেলেকে চাকর দিয়ে চাবুক খাওয়ানটা বুঝি বিশেষরূপ পুণ্যকার্য?”

“কিন্তু আগুন দিলে—”

শুভেন্দু হাত দিয়া পিছনে দেখাইয়া অশ্রুচক্ষুরে কহিল, “তুমি বাড়ী যাও”—বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। লোহা যেমন করিয়া চুষকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তেমন করিয়াই সুশীলও নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল।

গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া ভুবনবাবু তাঁহার শয়নগৃহের মুক্ত বাতায়ন দিয়া, গ্রামের দক্ষিণভাগে একটা অগ্নি-পর্বত দেখিতে পাইলেন। মনটা তাঁহার বড়ই বিমর্ষ হইয়া গেল, না জানি কে বা কাহারো বিপন্ন হইল! বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দ্বার খুলিয়া বারান্দায় পা দিবারাত্র তাঁহার মনে হইল, কে যেন এক জন তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। সে ঘরটা সুশীলের এবং উহার দ্বার যে ভিতর হইতে বন্ধ ও তাঁহার ঘরের দিকে মাত্র খোলা থাকে, সে কথা যত্নবশত মনে রাখা হইল না। মনে করিলেন, কোন পুরুষহিলা আগুন দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গিয়াছেন। নীচে নামিয়া আর দুই তিন জন চাকর ও দ্বারবানকে যদি সম্ভব হয় ত বিজ্ঞপ্তির কথাকিৎ সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া অনেকক্ষণ এ দিক সে দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানে পা দিতেই আবার তেমনই করিয়া একটা ছায়ামূর্তি সরিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা মর্মান্তিক বেড়নার চিহ্ন—অস্ফুট কান্নার শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। প্রথমে ইহাকেও লক্ষ্য না করিয়া তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কান্নার শব্দও যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও স্পষ্ট হইয়া কানের কাছে আসিল, তখন বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া ভুবনবাবু তাঁহার ও সুশীলের ঘরের মধ্যবর্তী দ্বারের

নিকট আসিলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু এবার বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কান্নার শব্দ এই ঘরের মধ্য হইতেই সৃষ্ট হইতেছে বটে।

ভুবনবাবু ডাকিলেন, “সুশীল!”

উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু কান্নার শব্দ বন্ধিত হইল।

“সুশীল, আমার কাছে এস।”

ভুবনবাবু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও কেহ দেখা দিল না। এরূপ প্রায় হয় না। অতিমাত্র বিষয়ের মধ্যেই তাঁহার সহসা মনে হইল, হয় ত যে ছায়ামূর্তিকে দুইবার অপহৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুশীলরই। ঐ অসহনীয় আগুন জ্বালায় ভীষণ দৃশ্য চোখে দেখিয়া বালক ভয় পাইয়াছে, ব্যথিত হইয়াছে; আন্দাজে আন্দাজে কাছে আসিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াই। “সুশীল!” বলিয়া ডাকিতেই ভয় পাওয়া শিশুর মত সুশীল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর বাঁপাইয়া পড়িয়া আর্তনাদের মত করিয়া উচ্চারণ করিল, “বাবা!”

“বাবা! ভয় কি? এস; আমার ঘরে এস;—আমি চাকরদের সব দেখতে পাঠিয়েছি—যদি কিছু করতে পারে, তার জন্তও তারা চেষ্টা করবে—”

“বাবুজি!”

“কে রে, রামপ্রসাদ? কি খবর?”

“আর খবর কবুতাবাবু? রায় বাবুদের গোশালা একদম রাখসে রাখ হোয়ে গেছে। সে জন্তে এতটুকু দুঃখ নেই—চৌধুরী সাহেব বড় ভয়মন আদমী আছে, লোকিন একঠো বাচ্ছী ইস্কে সাথ মর গিয়েছে, সেহি একঠো বড়ি আপশোষকা বাত ছায়।”

একটা সঙ্করূণ আর্তধ্বনির সহিত সুশীল সংজ্ঞাহারা হইয়া তাহার পিতার বুকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সেই হইতে সুশীলের এই রোগের উৎপত্তি, বাড়ীর লোক বলিতে লাগিল, একে ত তরুর জন্তে ওর মনে মোটেই সুখ ছিল না, তাহার উপর আবার এই যে আগুন লাগা ও গোরু পুড়ে মরবার খবরটা আঁচমকা ঘুম ভেঙেই দেখে শুনে তাহার দয়ার শরীর একেবারে গলে পড়েছে রে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ গড়াইল না। সে দিনের সেই নিশীথ অগ্নিকাণ্ডের গুপ্ত নামকরূপে বাহাকে অভিযুক্ত ও পুলিশ সোপর্দ করা হইল, সে বিপ্রদাস চৌধুরীরই এক জন পূর্বতন ভৃত্য। দিনচারেক পূর্বে বাবুর একটা রূপাবান ছড়ি চুরি যাওয়ায় ইহার প্রতি সন্দেহে ইহাকে থামে বাঁধিয়া প্রহার করা হয় এবং ইহার পর সেই অপহৃত ছড়িটি আর এক জন ভৃত্যের নিকট হইতে পাওয়া যাওয়ায় তাহাকে পুলিশে চালান দেওয়া হয়। নিরপরাধে প্রহৃত ও অবমানিত গোপাল ছাড়া পাইবামাত্র তীরবেগে বাড়ীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল ও চীৎকার শব্দে দশেধর্মে দোহাই পাড়িয়া দেবতা মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া শীঘ্রই এই নৃশংস অবিচারের শোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে বারগানরা তাহাকে আর একবার অর্দ্ধচন্দ্র দিতে অনিচ্ছুক ছিল না, কিন্তু ততক্ষণে সে পথে পড়িয়া দৌড় দিয়াছে। সাক্ষ্যের দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল যে, কয়দিন ধরিয়াই তাহাকে চৌধুরীবাড়ীর আশেপাশে সন্ধ্যার পর চুপি চুপি ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। আগুন লাগাইবার সময়টায় সে অবশ্য সাক্ষী রাখিয়া লাগায় নাই, তবে সব চেয়ে নিকটবর্তী দোকানদার সাক্ষী দিল যে, এক ডিবা কেরোসিন তৈল ও একটা দিয়াশলাই এই উদ্দেশ্যেই সে তাহার দোকান হইতে রাতি নয়টার সময় কিনিয়া ওই দিকেই গিয়াছিল।

গোপাল এ সব কথার কিছুই অস্বীকার করিল না, শুধু তাহার উপর প্রযুক্ত এই ভীষণ অপরাধটাকেই সে অস্বীকার করিল। অনেক পীড়া-পীড়িতে সে আদালতে বলিল, “রাগের মাথায় শোধ লইবার কথা বলিয়া আসিলেও বাবুর উপর যে তার শোধ লইবার উপায় নাই, তাহা সে এক দিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিল। আর শুধু সেই জন্তই দেশে না গিয়া বাবুর বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছিল।” কারণ জিজ্ঞাসায় অবনতমুখে উত্তর দিল, “বাবুর শরীরে দয়া-ধর্ম কখনই নেই; চাকরদের তিনি কখনও মানুষ মনে করেন না। ‘শালা’ ‘ব্যাটা’ ভিন্ন কোন দিন নাম ধরেও কাককে তিনি ডাকতে পারলেন না,—অথচ তাঁর পোষা কুকুরদের আদরের নাম ‘টেবি’ ‘লুলু’। কান্দীরী বেরালটাকে

আদর ক'রে 'গারল্যাণ্ড' ব'লে ডাকা হয়। লাল-মাছ, নীলমাছ, পাখী, পায়া, হরিণ, খরগোসের পিছনেই তিন তিনটে চাকর। তাঁর বিলিভী কুকুরে রোজ তিন সের ক'রে মাংস খায়, কিন্তু চাকরদের বেলায় মোটা চালের ভাতের উপর সব দিন একটু শাকচচ্চড়িরও অভাব ঘটয়া যায়—অথচ সেই ভাতের গরাস কমটা তুলিবার মধ্যেও ফাই-করমাসের জন্ত ডাক পড়াপড়ি বন্ধ হয় না। যাক, তার জন্ত আমি কিছু বলি না, সে আমাদের বরাতের দোষ। আর জন্মে বাবুর কাছে ধার নিয়ে শোধ দিই নি, তারই জন্ত এবারে তার শোধ মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর আর জন্মে কি পুণ্যকাজ ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এ জন্মে উনি দশ জনের ওপোর এই হুকুমজারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। এর জন্তে কঁাদাকাটি ক'রে আর হবে কি? আমি শুধু একটবার দিদিমণির মুখটি দেখে যাবার জন্তে ক'দিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। অমন দানব বাপের যে তেমন দেবতার মতন মেয়ে কোথা হ'তে এলো, সে আমরা তো সবাই ভেবে কুল পাই নে!”

গোপালের এ সব ছেঁদো কথা আদালতের স্মরণ বিচারে টিকিল না, যেহেতু গরীবের মত ছোটলোক ত আর সংসারে দ্বিতীয় নাই—উহারা যখন বড়মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন নিশ্চিত জানা কথাই যে, তাহার ভিতর পনের আনা সাড়ে তিন পাই ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ মিশ্রিত আছে। উহারা যদি মনিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কখন জয়লাভ করে, তবে সে দৃষ্টান্ত বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সংক্রামক ব্যাধির স্থায়ী উহা ভৃত্য-জাতীর শীতল শোণিতকে উষ্ণ করিয়া তুলে ও উহাদের স্পর্ধা বাড়ায়। অতএব এ ক্ষেত্রে সবারই ঘর সামলান দরকার বলিয়া অন্তান্ত নিরপেক্ষ স্থায়বান্ বিচারক ব্যতীত প্রায়ই স্থায়ের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। তবে এমনটাও ঘটয়া থাকে যে, যদি কালেক্টর সাহেব আবার কোন কারণে সেই মনিবটির উপর বিরূপ থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ভৃত্যটি দোষী হইলেও জয়লাভ করে। এখানে তেমন ধারাটি না কি ঘটে নাই এবং শিক্ষিত উকীলের বক্তৃতায় বেশ বাঁধুনীও ছিল, সাক্ষীরাও খুব পাকা এবং হয় ত বা হাকিমটিও একটু কাঁচা। গৃহদাহকারী গোপালের বিরুদ্ধে রায় বাহির হইল।

দণ্ডদেশ শুনিয়া গোপাল সাক্ষীরা বারেক উর্কে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—“হা ভগবান্!” তাহার পর নিজের উদগত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে সজলগাঢ়স্বরে আত্মগতই কহিল, “দিদিমণি রে! আমার এই সাজার কথা শুনে তুই কত যে কঁাদবি, ভাই! তুই ছুটে এসে আমার উপর চেপে না পড়লে, সে দিন বাবুর হুকুমে আমার তো মাধো সিং ব্যাটা মেরেই ফেলেছিল! আহা, তোর কচি মুখটি আর একটবার দেখা হলো না রে!” বলিতে বলিতে প্রোচ হু হু করিয়া কঁাদিয়া উঠিল। কঁাদিতে কঁাদিতে হাকিমের দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বলিল—“ধর্ম্মাবতার! আমার বাবুর মস্ত লোকসান হয়েছে, শুনেছি, মা-ভগবতীর হত্যাকাণ্ডও না কি হয়ে গেছে। তা'র জন্তে আমি না হয় শাস্তিই পাচ্ছি, তা মিনি অপরাধে হ'লেও আমার তেমন দুঃসু ছিল না, কিন্তু হজুর! আমার দিদিমণি যদি সত্যি ক'রে মনে করে যে, তাঁর বাবার উপর শোধ তোলবার জন্তে—আমি তাঁদের ভাত খেয়ে মানুষ,—আমি এত বড় লোকসান ঘটলাম, একটা অবোলা জীবের হত্যে করলাম; এই দুঃসুই যে আমার জেলখানায় মরণ ঘটলেও যুচবে না! এদাগা আমার বুকে শেষ পর্য্যন্ত থেকে গেল।”

উকীলের দিকে চাহিয়া বলিল, “বাবু! এখন ত আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন একবার রূপা ক'রে আমার বাবুর বাড়ী যেয়ে আমার দিদিমণিকে ডেকে ব'লে যাবেন যে, তার গোপালদাদা, সত্যি তাঁর গোয়ালঘর পোড়ায় নি; তাঁর ললাটের লেখনই এই কাজ করেছে, সে নয়। বাবু! আমার বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কেউ নেই—আমার লেগে চোখের জল ফেলতে শুধু ঐ একটি জনই আছে।—আহা রে! ‘গোপালদাদা’ বলতে বাছা যে আমার অজ্ঞান হয়ে যায়। রাগের মাথায় তিড়িতিড়িয়ে বেরিয়ে এনু—বাছা আমার অন্ধর করে কেঁদে কি ভাসিয়ে দিলে! যেমন দেবতার চোখের জল ফেলান—তাঁর ফল ফলবে না?—” বলিতে বলিতে এবার সে নিজেই কাঠগড়ার মধ্যে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কঁাদিয়া ফেলিল।

আদালতের লোকদের মধ্যে কেহ কেহ রুমালে চোখ মুছিলেন, কেহ বা মুছ হাসিয়া অপরকে বলিলেন, “একটা জানে মন্দ না!”—কেহ বলিলেন, “বেটা দাগী।”

ভুবনবাবুর বাড়ীতেও খবরটা প্রচার হইল। এখনকার ছবিবিনীত ভৃত্যজাতীয় লোকেদের উপর প্রায় কেহই সম্বন্ধ নহে। তাহারা এখন কথার কথার মনিবের উপর চোখ রাখায়, মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে চাকরী ছাড়িয়া দেয়, ভাল খাওয়া-পরাই দাবী তুলে, আবার অনেকেই গাঁজা, গুলি, সিগারেট, বিড়ি,—পশ্চিমারা ইহার উপর তাড়ি ও সিদ্ধিতে চুর হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেই ভালবাসে। মেজাজেরও ঠিক থাকে না। মনিব চাহেন, সস্তায় স্ফুরিত ও বিনীত ভৃত্য। ভৃত্য—কালধর্ম্মে বিনীত তো নহেই—সচ্চরিত্রও নহে; অধিকন্তু মনিব-পুত্রের অনুকরণে নব্যমানায় চুলছাঁটা, সিগারেট টানা, পাতলা বিলাতি ফিতাপেড়ে সাজীটি পরা, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী গায় দিবার মথটুকু পুরা-দস্তরই তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। তা হইবেই বা না কেন? যখনকার বাবুরা খাটো ধুতী, হাতকাটা বেনিয়ান ও ঠনঠনের চটি পরিত, তখনকার ভৃত্যদেরও সেই খাটো ধুতী ও বাহিরের জন্ত একটা মেরজাই-ই যথেষ্ট ছিল। তোমরা যদি ‘ঘোড়ারোগে’ শিক্ষিত হইয়াও মরিতে পার, উহারাই বা বাঁচিয়া থাকে কিসের জোরে? তোমাদের স্কুলের ছেলে “হাওয়া-গাড়ী” মার্কি সিগারেট পকেটে লইয়া বেড়ায়, ওদেরও সেই বয়সের ছেলেরা তোমাদের ঘরে চাকরী করিতে আসিয়া অমন সূদৃষ্টাঙ্গটা গ্রহণ করিবে না?

কিন্তু মানুষ নিজেদের দোষ দেখে না। তাই মনিব যখন কোপ্তা কোন্স্যা দিয়া লুচি খাইয়া যাওয়ার পর বামুনঠাকুরের রূপায় মোটাচালের ধরাগন্ধ ভাতের সঙ্গে শাকচচ্চড়ি ও ডালের ঝোলের অভাবে তোমার চাকর তোমার উপর চোখ রাখা করিয়া আসিল, তুমি অমনিই তাহার সেই রাঙ্গা চোখের ছবিখানি দেখিয়াই তাহার স্পর্কার পরিমাপ করিতে বসিলে। নিজের পূর্ণ উদরের চাপে শরীর হাঁসফাঁস করিতেছে, কাজেই চোখ যে তাহার কেনই রাঙ্গা হইল, সে কথাটি তো ভাবিলে না। ধমক দিয়া বলিলে, “এমন এক আদ দিন হয়।” সে ইহার জবাব দিল, “এমন বাড়ী কাজ করিতে পারিব না, যেখানে খাওয়ার এমন হুঁদুশা।” সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল। কাজেই কথা রটিল যে, ছোটলোকগুলার এখন বড়ই স্পর্ক হইয়াছে। কিন্তু কেন যে হইল, কাহাদের সহানুভূতিহীনতায়, হীনতার দৃষ্টান্তে হইল—সেইটুকু শুধু কেহ খুঁজিয়া দেখে না, ক্রসী সেইখানেই।

গোপালের মত ভয়ঙ্কর গৌরী-গোবিন্দ ছোট-লোকটার এমন কঠিন দণ্ডদেশে—তাই বাহাদের সর্বদা চাকর রাখিয়া ঘর করিতে হয়, তাহারা অত্যন্তই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বড় বড় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, “এ না হইলে সংসারে টিকিয়া থাকাই ত মহা দায় হইয়াছিল। মনিবের জিনিষ খোয়া গেলে একটু কি করিয়াছে, না করিয়াছে—অমনি জালাও তার ঘর, পোড়াও তার গোক!—কি ভাগা যে তারই মুখে আগুন ধরাইয়া দেয় নাই!”

ইতঃপূর্বে এই সকল লোকই অতঃপর আর চাকর রাখিয়া ঘর করা দায় হইবে বলিয়া নিতান্ত হতাশার সহিত আক্ষেপ করিতেছিলেন।

শুভেন্দু খবরটা লইয়া নিতান্ত নিরপেক্ষভাবেই সুনীলের ঘরে ঢুকিয়াছিল, সেখানে তরু ও বীণাকে উপস্থিত দেখিয়া সে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া বীণাই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “আমুন না শুভু’দা, চ’লে যাচ্ছেন কেন?”

শুভেন্দুর স্ত্রী চেহারা ও নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহস তাহাকে বাড়ীশুদ্ধ সমুদয় ছেলেমেয়ের কাছেই নিতান্ত ঘরের লোক করিয়া তুলিয়াছিল, বীণার আহ্বানে শুভেন্দু আসিয়া তাহাদের একপাশে বিছানা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সুনীল বলিল, “দিদি আমার একটা গোলোকধাম খেলার ছক তৈরী ক’রে দিয়েছে, খেলবে শুভেন্দু?”

শুভেন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দ্রব্য একটু হাসিয়া কহিল, “এখনও তুমি গোলোকধাম খেল না কি?”

শুভেন্দুর সেই হাসি ও কথার সুরে সুনীলের কানের গোড়া অবধি লাল হইয়া উঠিল। বিনতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছেন, শুভু’দা! দাদা এখনও এমনি সব ছেলেমানুষী জিনিষ ভালবাসে যে, সে দেখলে আমার ভারী হাসি পায়। আমিও ওকে বলি যে, খেলতে হয় ত তাস দিয়ে গ্রাবু খেল, না হয়, রিভার্সী খেল, না হয় ড্রাফ্ট খেল। তা নয়, ছেলে খেলবেন ত গোলামচোর, নৈলে গোলোকধাম। আর দিদিরও ঠিক কি ওর মতন পছন্দ।”

সুনীল, তরু নিজেদের বিকৃত ক্রটির লজ্জায় বিব্রত হইয়া তৎক্ষণাৎ উহাদের সহিত সায় দিয়া গিয়া বলিল, “আচ্ছা খেল, তোমাদের যে রকম ভাল লাগে, তাই খেল।”

খেলা আরম্ভ হইল। শুভেন্দুর কাছে এক পড়া-
শুনা ছাড়া কোন কার্যেই কাহারও জয়ের আশা নাই;
একবার, দুইবার, তিনবার—বারবারই তাহার স্থান
সর্বপ্রথমে। কিন্তু এতবার জয়ী হইয়াও তাহার মন
সেই জয়ের আনন্দের প্রতি নাই, সে বসিয়া পর্য্যন্তই
সুশীলের নিরুত্তর, রক্তহীন ও ম্লান মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ-
চক্ষু:ত চাহিতেছিল। তাস লইতে গিয়া কত সময়
তাহার হাত কাঁপিয়া যাইতেছে, উহাও তাহার অজ্ঞাত
ছিল না। মনে মনে বিরক্ত হইয়া চোক তাকাইয়া
উহার উদ্দেশ্যে পাঁচশোবার “ভীক” “অকর্মণ্য” বলিয়া
গালি পাড়িলেও কয় দিনের ভিতরে উহার শরীর-মনের
অবস্থা দেখিয়া বোধ করি, তাহার মনে একটু অনু-
কম্পাও বোধ হইতেছিল। তাই তাহাকে মঙ্গলসংবাদে
সুস্থ করিতে—নিশ্চিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া কথায়
কথায় বলিয়া ফেলিল, “গোপালের যে বিচার শেষ
হয়ে গেল।—”

সে-বার বিস্তার খেলা চলিতেছিল; কিন্তু আগ্রহাতি-
শয্যে তাহার সকল সাবধানতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিনতা
টপ করিয়া ইক্কাবনের টেকাখানাকে ‘পাশ’ গুঁজিয়া
দিয়া উগ্র কৌতুহলে উচ্চ করিয়া প্রশ্ন করিল, “কি
হোলো, শুভু’না! কি দণ্ড তার হ’লো?—উঃ, লোকটা
কি ভয়ানক! তার ফাঁসী হ’লেও দোষ হয় না।”

সুশীলের হাতখানা কাঁপিয়া হাতের তাস ক’খানা
ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তার মুখখানা
একবার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল ঠিক যেন
মনে হইল, তার সমস্ত শরীরের যেখানে যেখানে
যতটা রক্ত জমা করা ছিল, সে সবই যেন এক-
টানে বোঁ করিয়া মুখে ও মাথায় উঠিয়া আসিয়াছে।
শুভেন্দুর মুখের দিকে সে যখন উদাম-ব্যাকুলতায়
অধীর দৃষ্টিপাত করিল, সেই অস্বাভাবিক রাজামুখে,
আশ্চর্য উজ্জল চোখ দুইটা যেন দুইটা ইলেক্ট্রিক
ল্যাম্পের মত ভয়ানক রকম জ্বলিতেছিল। ঠোঁট
তাহার নড়িতেছিল, কিন্তু তাহা শুধু উত্তেজনার জ্ঞাত,
কি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জ্ঞাতই কিছু বুঝা গেল না।
শুভেন্দু বারেকমাত্র তাহার মুখে তীব্রকটাক্ষ করিয়াই
বিনতার প্রশ্নের উত্তরে শান্ত উদাস কণ্ঠে জবাব দিল—
“বেশী কিছু হয় নি……চার বৎসর সপরিশ্রম জেল
খাটতে হবে মাত্র।”

আবার সেই রাত্রির মতই আর একটা অব্যক্ত
যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া সুশীল অচেতন হইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রি। পল্লীগামের সুপ্তিমগ্ন মধ্যরাত্রি।
শুধু মানবই নহে, যেন তাহাদের সহিত সমস্ত বিশ্বচরা-
চর, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ
সকলেই শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুশীতল অঙ্কা-
শ্রমে বিশ্রাম করিতেছে। একমাত্র ঝিল্লীরব ভিন্ন
কোথাও কোন শব্দই নাই। যেন মহাসাধনাক্ষেত্রে
কোন যোগমগ্ন মহাযোগী সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন;
আর তাঁহার সর্বসমাহিতচিত্তে কেবলমাত্র অনাদি
প্রণবের একক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং
সেই ধ্বনি শুধু জানাইতে চাহিতেছে, মোহহং—
মোহহং—মোহহং! মানবের চিরশত্রু অহংকে মোহহংএ
মিলাইয়া দিবার সংযোজক কাল এমন আর দ্বিতীয়
নাই। কিন্তু হায়, এ মহান সুযোগ যে মানুষের সারা-
জীবন ব্যাপিয়া কত সহস্র সহস্রবারই ব্যর্থ হইয়া
ফিরিয়া যাইতেছে, তাহার যে কোন লেখাঘোখাই করা
যায় না! কি যে নিরেট পাষণ দিয়াই বিধাতা
মানুষকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন; এর কাছে যে
সমস্ত মহা মহাযোগই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার যে
সমুদয়ই দুর্যোগ, সুযোগ সে লইবে কোথা হইতে?
ভুবনবাবুর পত্নীবিয়োগের পর হইতেই রাত্রির
নিদ্রাটা তেমন গাঢ় হইত না; ভোরের দিকে তিনি
বরাবরই একটু পড়াশুনা করিতেন। চণ্ডী ও গীতা-
পাঠও হয় ত হইত। এ সময়ে কেহ তাঁহার কাছে
থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না বলিয়া ছেলেরা তাঁহার
কাছে শয়ন করিত না। আজ হঠাৎ এই মধ্যরাত্রিতে
ঘুম ভাঙিয়া তিনি আবার সে দিনের মত সেই চাপা-
কান্না শুনিতে পাইলেন। কান্নার শব্দ সুশীলের
শয়নকক্ষ হইতেই আসিতেছে। উঠিয়া নিঃশব্দে
সুশীলের বিছানার কাছে আসিলেন। শুনিতে পাই-
লেন, সুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, “কি হবে!
আমি কি করবো? গোপালকে যে জেলে যেতে
হচ্ছে—এখন আমি কি করি! বাবাকে কি ক’রে
সব বলি?”

ভুবনবাবুর মনে হইল, কে যেন একগাছা চাবুকের
বাড়ি তাঁহার মুখের উপর সজোরে আঘাত করিয়াছে।
তিনি যেন সহসা ঢলিয়া পড়িতে গেলেন। তাহার
পরক্ষণেই আপনার এই অতর্কিত ও অভাবনীয় গুরু
আঘাতের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইয়া সুগভীর
দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথা কহিলেন—“সুশীল! গোপাল
কি তোমাদের সঙ্গেও ছিল না কি?”

সুশীল অকস্মাৎ এমনভাবে সম্বোধিত হওয়ার ভয়ানক রকম চমকাইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর তাহার মনে সেই পরিমাণে বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়া গেল, বাবা কি তবে সবই জানেন? সে উঠিয়া বসিয়া অশ্রুভারাহর ব্যাকুল উদ্ভ্রান্তস্বরে বলিল “না, কিছুই জানে না সে, তাকে বাঁচান—” বলিয়াই আবার কাঁদিয়া অধীর হইয়া বিছানার মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। এই ভয়ানক ব্যাপারটার জানাজানি ব্যাপারে তাহার জ্ঞান যত বড় প্রচণ্ড লজ্জাই জন্ম করা থাক না কেন, তবু সে যে লুকোচুরির হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহার বকের মধ্যে অবরুদ্ধ তাপের প্রভাবে ফাটিয়া পড়া হইতে মুক্তিলাভ করিল, আপাততঃ সেই-ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরী-পুকুরের তক্তকে নীলজল তখনও সূর্য্যকরের সোনার গুঁড়া ঝিলিক মারে নাই; তাহার অগ্নিকোণে কল্লারবনে ঘোর রক্তবর্ণের কল্লার-ফুলগুলা সবেমাত্র পাপড়ী খোলা মুক করিয়াছে; তাহার নিশীথ-বিশ্রামের গায়ের চারক কমলপত্রে বিস্তৃত রহিয়াছে, মানব-হস্তস্পর্শ তাহা এখনও তীরদেশ হইতে অপসৃত হইয়া যায় নাই। তাহার মৎস্যকুল এখনও বকের দোরাআ তীরসংলগ্ন খাত্তানেষণ ত্যাগ করিয়া গভীর জলে আত্মরক্ষার জন্ত পলায়নপর নহে,—দীর্ঘকূলে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী, উপরে প্রকাণ্ড চত্বর, পশ্চাতে পুরাতন ছাদের স্তূপহং অট্টালিকা—ইহাই উমাপতি চৌধুরীর নির্মিত—এক্ষণে বিপ্রদাস চৌধুরীর আবাস-বাটি। বাটীর প্রবেশদ্বার এখনও খোলা হয় নাই, তবে ভিতরে দ্বারবান্জীর নাগরাজুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—খুব সম্ভব এইবার ফটক খোলা হইবে। বাড়ীর উত্তরে বিশাল একটা ভয়স্তুপ গত দুর্ঘটনার সাক্ষ্যস্বরূপে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই ভুবন রায়ের বকের মধ্যে লজ্জার আঘাত অসহনীয় বেগে পতিত হইল।

ভুবনবাবু কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন; মন অস্থির, সমসংক্ষেপ সহ করা কঠিন বোধ হইল। কিছু পরে ফটক খোলার শব্দে সম্মুখে আসিয়া দ্বারবান্ মাধো সিংএর হাতে একটা চিঠি দিয়া বাবুব

ঘুম ভাঙ্গিবারাত্র তাঁহাকে খবর দিতে বলিয়া আবার সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। ইহাকে দেখিয়া নিরপরাধ গোপালের কথা আবার বেশী হইয়াই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

বিপ্রদাসবাবু সচরাচর অধিকাংশ বাবুজাতীয় জীবেরই তায় বেলায় শয্যাভ্যাগ করেন এবং তাহার পর হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া কেশ-বেশ সারিয়া বৈঠকখানায় আসিতে তাঁহার ঐ শ্রেণীর লোকদেরই মত প্রায় সমান সময় লাগে। সেটা অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক বা তদুর্দ্ধ। আজ এমন নিতান্ত অসময়ে ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সামান্যতম পূর্ব-পরিচিত ভুবন রায়ের আগমন-সংবাদে ও পত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কার্যের উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে সকল কার্য সমাধা করিয়া লইতে হইল। বিপ্রদাস বাবু জানিতেন, এই লোকটি বিলক্ষণ ধনী এবং সর্বদা দেশে না থাকা প্রযুক্ত ইহার সহিত তাঁহার বৈষয়িক বিবাদেও যে কোন যোগাযোগ নাই, তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। আর তার উপর নিজ পয়সার লোক হইলে লোক একটু পয়সাওয়াল লোকদেরই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে; বিপ্রদাসবাবুই বা তা না করিবেন কেন?

সাক্ষ্য যে এমনভাবে হইবে, তাঁহার তাহার বিন্দু-মাত্রও ধারণা ছিল না। ভুবনবাবু দুই হাজার টাকার দুই কেতা নোট আগে-ভাগে খেসারত ধরিয়া দিয়া তাহার পর সমুদয় ইতিহাসটাই জানাইয়াছিলেন কি না, তাই তাঁহার মূর্তি অনেকখানিই বদল করিয়া শ্রোতার কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌছিতে লাগিল এবং পাঁচশো টাকার বদলে দেড় হাজার টাকা উপরি লাভ হওয়ায়, ক্ষতিটাকে তাঁহার এক্ষণে আর তেমন লোকসান বলিয়া মনে হইল না। বরং দুই পার্শ্বের বিরাট গুচ্ছক ঠেলিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধাবৃত স্তম্ভ ঠোটের আগায় একটুখানি হাসি পর্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি নোট দুইখানি পাঞ্জাবী জামার পকেটে ফেলিতে ফেলিতে সংক্ষেপে কহিয়া উঠিলেন, “কি ছেলেমানুষী!”

ভুবনবাবুর উচ্চ মস্তক আজ লুপ্তিত, তাঁহার বড় উন্নত আদর্শই চূর্ণ হইতে বসিয়াছে, কিন্তু পুত্রের আত্মপরাধ স্বীকারোক্তিতেই তাঁহার সে পিতৃ-হৃদয়ে দুঃখের মধ্যে ও সুপ্রচুর সুখের অভাব ছিল না। শীঘ্রই তিনি বিদায় লইয়া উঠিলেন, এখনই তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জিলায় যাইতে হইবে। বিদায়কালে

পুনশ্চ বিনীত মিষ্টবাক্যে কহিলেন, “বড় অত্যাচার হয়ে গেছে, বেশী আর কি আপনাকে বলবো? মন থেকেই অপরাধীদের যতটুকু পারবেন ক্ষমা করবেন।”

বিপ্রদাসবাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, “কিন্তু যারা প্রকৃত দোষী, তারা তো কৈ আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেল না!”

ভুবনবাবু নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া মুহু মুহু কহিলেন, “হ্যাঁ, তারা ত আসবেই, নিশ্চয়ই আসবে। আসবে বৈ কি!”—কিন্তু মনে মনে তিনি এই দুর্ভাগ্যী ও অহঙ্কৃত পুরুষের নিকট শুভেন্দুকে পাঠাইতে একটু সংশয়ই বোধ করিতেছিলেন।

বৈঠকখানার বাহিরে আসিয়া বিপ্রদাস তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, এর চেয়ে বেশী সৌজন্যের অপব্যয় তিনি দেশী লোকের জন্ত কখন করিতে পারিতেন না। ভুবনবাবু বৈঠকখানার দালান পার হইয়া কয়েকটা পৈঠা নামিয়া উঠান দিয়া চলিতে চলিতে পিছন দিক হইতে একটা সমস্তোচ্চ আওয়ান শুনিতে পাইলেন,— “গুনুন!”

মুখ ফিরাইতেই এক অপূর্ণ দৃষ্ট চোখে পড়িল! একটি দশ বৎসরের বালিকা, কিন্তু সেই মেয়েটির গায়ের রংয়ের চম্পক-গোরাভা, উজ্জল ও বিশাল দুইটি চোখের স্বচ্ছ সরল ও সক্রিয় কটাক্ষ, তাহার ঈষৎ ক্ষুরিত আরক্ত করপুটের মৃদুকম্পন, সর্বাপেক্ষা তাহার গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডের উপরকার গ্রন্থিহীন মুক্তাহারের মতই নবীন রৌদ্রকরোজ্জল অশ্রুমালা সমাবেশ তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ভুবনবাবু একান্ত বিস্ময়ের সহিত এই সহসা-উদ্ভূত করুণামূর্তিটি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় সেই অপরিচিতা বালিকা তাঁহার অধিকতর নিকটবর্তিনী হইয়া নিজের কাপড়ের মধ্য হইতে বায়হস্তখানি বাহির করিল, তাহার হাতে একটি রেশমের বোনা মণিবাগ। ভুবনবাবুর দিকে উহা প্রসারিত করিয়া দিয়া সে রুদ্ধপ্রায় গদগদস্বরে কহিয়া উঠিল, “এই নিন, এই টাকা খরচ ক’রে আমার গোপালদাকে ফিরিয়ে আনুন। আমি তিন সতী ক’রে বলছি, সে কক্ষন আগুন দেয়নি, কক্ষন আগুন দেয়নি, কক্ষন আগুন দেয়নি।” বলিতে বলিতে সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

ভুবনবাবু টাকার থলিটি হাতে না লইয়াই মেয়েটির সেই অশ্রুপ্লাবিত চাঁদপানা মুখের নিকে চাহিয়া স্নেহে কহিলেন, “মা, তুমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছ,

তোমার গোপালদা আগুন দেয়নি। দোষী দোষ স্বীকার করেছে, নির্দোষ গোপাল মুক্তি পাবে। তোমার টাকা রেখে দাও।”

মেয়েটির সুন্দর মুখখানি বর্ষা-আকাশের চাঁদের মতই বারেক উজ্জল হইয়া উঠিল। আবার তখনই কিছু স্নান হইয়া গিয়া সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে যে সবাই বলছে, তার চার বৎসরের জন্ত জেল হয়েছে! জেলখানা আমি মাথাবড়ী থেকে দেখেছি, সেখানে পাতর ভাঙতে দেয়, ঘানি ঘোরাতে দেয়, এমনি বিল্লী খাবার তাদের—গোপালদা তা হ’লে মরেই যাবে।”—এই বলিয়া মেয়েটি আঁচলে মুখ ঝাঁপিয়া পুনশ্চ কাঁদিয়া ফেলিল।

ভুবনবাবুর ইচ্ছা হইল, এই করুণাময়ী মেয়েটিকে বুকের কাছে টানিয়া লয়েন, মাথায় গায়ে হাত দিয়া একটু আদরের সহিত তাহাকে সাঙনা করেন, কিন্তু সে যে কে, তাহাই তো জানা নাই? তাই সে ইচ্ছা দমন পূর্বক গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন, “হ্যাঁ, দণ্ড তা’র হয়েছিল বটে, কিন্তু তার দণ্ডের সংবাদ পেয়ে প্রকৃত দোষীর মনে অনুতাপের উদয় হয় এবং সে দোষ স্বীকার করে। গোপাল ছ’ এক দিনের মধ্যেই ছাড়ান পাবে, এ তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস করো।”

“তা হ’লে তো যে প্রকৃত দোষী, সে-ও এই রকম সাজা পাবে? উঃ, চার চার বৎসর জেল খাটা কি সোজা কষ্ট! তার কি হবে?”

ভুবনবাবুর অন্তরের মধ্যে ব্যথাভরা আহত পিতৃহৃৎ যেন এই সহানুভূতিপূর্ণ করুণাধারায় টলটল করিয়া উঠিল। তাঁহার পুরুষের চক্ষুতেও এই ক্ষুদ্র বালিকার ওই সত্য ইঙ্গিতটুকুতে অশ্রুর আভাস দেখা দেয়, এমন অবস্থা হইল। তিনি ইহা দমন-চেষ্টা পর্যন্ত না করিয়াই সবাৎসর্যে উত্তর করিলেন, “মা! ঈশ্বর তোমায় চিরসুখী করুন। কত বড় মহৎপ্রাণ নিয়ে তুমি এই স্বার্থ-মলিন সংসারে নম্র এসেছ! আশীর্বাদ করি, যেন এমনি অস্নান থেকেই তাঁর পায়ে আবার ফিরে যেতে পার।”

দুই দিনের কুসঙ্গে পড়িয়া তাঁহার নিজ হাতে গড়িয়া তোলা সুগীল যে এত বড় একটা অজ্ঞানের সহায়তা করিল, এ আঘাত তাঁহার বুকে যে বজ্রপালে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

মেয়েটি ঈষৎ লজ্জিতা ও নতমুখী হইয়াই পুনরপি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া বলিল, “তাকে আবার তা হ’লে

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কি করে বাঁচাবেন ? এই টাকা নিয়ে তা'র জন্তে কিছু করুন না ! শুনেছি, মোকদ্দমায় অনেক টাকা লাগে । তা' আমি অনেক টাকা কোথা থেকে পাব ? বাবা আমার খরচ করিতে পাঁচ টাকা করে দেন, তারই কিছু কিছু রেখে এই তেরটা টাকা আমি জমিয়ে-ছিলুম । এটা নিয়ে যান ।”—খলিটি সে ভুবনবাবুর হাতে দিতে গেল ।

“মা ! আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই যাচ্ছি, টাকা আমার সঙ্গে আছে, ও টাকা তুমি রেখে দাও, আমার অন্য কাজে লাগবে ।”

বালিকা আস্তে আস্তে খলিটি আঁচলে বাঁধিল, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন বোধ হইল না ; বোধ করি, ইহার কথা তাহার যেন নিশ্চয় বিশ্বাস হয় নাই । ঈশৎ সন্দিক্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি ত উকীল ? তা হ'লে টাকা না পেলে তা'র জন্ত আপনি কেমন করে চেষ্টা করবেন ?”

অত্যন্ত বিষাদের একটুখানি স্নানহাসি বর্ষাকাশের ভাঙ্গা মেঘপুঞ্জের মধ্যস্থ এক ঝলক সূর্যালোকের মতই ভুবনবাবুর বিমর্ষ মুখকে মুহূর্তের জন্ত প্রাণিত করিল, তিনি গভীরতর একটা নিশ্বাস মোচনপূর্বক সখেদে উত্তর করিলেন, “না মা ! আমি সেই অপরাধীরই বাবা ।”—

“স্বলেখা !”—উপরের দালানের একটা ঝিলমিলি সরাইয়া নারীকণ্ঠে কেহ ঐ নামে আহ্বান করিল ।

“যাচ্ছি মা !” বলিয়া উত্তর দিয়াই সেই বিজ্ঞান্দবরণী মেয়েটি বিছাতের মতই মিলাইয়া গেল ।

ভুবনবাবু ক্ষণকাল নির্নিমেষে সেই লুকাইয়াপড়া উজ্জল মূর্তিটির প্রতি বহুদৃষ্টি হইয়া থাকিবার পর সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইলেন । গভীর ব্যথাবিজড়িত প্রাণির মধ্য হইতে মনে মনে কহিলেন, “এক দিন আগে হ'লে আমি মনে করতাম,—আজ আমি আমার মানসী প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছি, আমার স্নানিলের জোড়া মিলেছে—কিন্তু আজ আর সে কথা মনে করবার কোনই অধিকার বা স্পর্ধা আমার মনে নাই ।—কিন্তু তবু সাধ হচ্ছে—”

অতি কষ্টে গোপালের মুক্তিলভ ঘটিল । প্রথমে এ সংবাদ সে ত বিশ্বাসই করিতে পারে নাই, পরে আনন্দে প্রায় মুচ্ছা ঘাইবার মত তাহার উপবাসক্লিষ্ট শরীর টলিয়া পড়িতেছিল । বাঁধনখোলা হাত দুইটা উর্কে তুলিয়া দরবিগলিত অশ্রুজলের মধ্য হইতে সে অক্ষুট ধ্বনিতে উচ্চারণ করিল—“তুমিই সত্যের !”

বাহিরে আসিয়া সে একটা জনরব শুনিতে পাইল যে, রায়বাড়ীর ভুবন রায় না কি তাহার দিদিমণির কান্নায় গলিয়া বিস্তর পরমা খরচ করিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন । আরও শুনিল, সেই ভুবন রায়ের, এক জন রাজার যত আয়, তেমনি ধারা টাকার আমদানী আসে এবং সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিটি না কি ভবিষ্যতে চৌধুরী-কত্তার মন্তর হইবেন । কথাটা গোপালের বিশ্বাসও হইল এবং ভালও লাগিল । সম্প্রতি রায়বাড়ীর বিবাহে আইবুড়ুভাত লইয়া গিয়া সে রায়দের ঐশ্বর্য্য, বদান্ততা প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়া-ছিল, আহাৰ্য্য এবং বিদায় ভাল রকমই পাইয়াছিল । ও-বাড়ীর বড়বাবুর মেজাজও যে অসাধারণ ভাল, তাহাও লোকমুখে তাহার জানা আছে । তাহার দিদিমণি যদি সে বাড়ীর বউ হয় তো অত্যাশ হইবে না । কিন্তু এখন দিদিমণিকে একবার দেখা যায় কেমন করিয়া ? আর কি বাবু তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিতে অনুমতি দান করিবেন ?

বাড়ীধানার আশেপাশে চোরের মত লুকাইয়া ফেরাই যে তাহার পক্ষে প্রধানতম বিরুদ্ধ প্রমাণ দাঁড়াইয়াছিল, সে কথাটা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়া সে আবার সেই হুঙ্কারই করিতে লাগিল, ও শেষে এক দিন পুরাতন মনিব-বাড়ী মোরিয়া হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেও ছাড়িল না । দ্বারবান মাধো সিং তখন ফটকের পাশের কুঠরীতে আটা মাখিয়া মোটা মোটা লেটী পাকাইতে অনতি-উচ্চস্বরে সুর করিয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল ;—

“তুলসীদাস হরি-চন্দন রগড়ে,

পূজা করত রঘুবীর ।”—

গোপাল এই চৌগোপা সরসু-পারীর কঠিন দৃষ্টি, হইতে নিজের শীর্ণ ও ধ্বংস আকৃতিটা গোপন করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই না দেখিয়া অবশেষে

কঁচুমাচু মুখে দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে তাহারই শরণাপন্ন হইল।

“ভাল আছ ত বাবা, দরোয়ানজী! মেজাজ খুস্ হায়?”

“হাঁ আঁ, কাহে নেই?—কিসিকে নেহি চোরী কিয়া;—কিসিকে নেহি অপচর কিয়া; কোই হামারে তক্লিব দে’ শক্তে হেঁ?”

গোপাল চোরের অধম হইয়া গেল। কি বলিবে, কি করিয়া নিজের বক্তব্যটাকে প্রকাশ করিবে, তাহার খেই হারাইয়া ফেলিয়া সে বিমূঢ় হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আবার ধসিয়া-পড়া শরীর-মনকে কোনমতে একটুখানি গুছাইয়া লইয়া সে আবার ক্রম্বনের স্বরে আরম্ভ করিল, “দরোয়ানজী বাবা! হামার খৌকি দিদিমণিকে একবারটি বুলিয়ে দেবে, বাবা! বাবা, তোমার কাছে হামি জন্মের মতন কেনা হয়ে থাকবো, বাবা! একবারটি তেনাকে বুলিয়ে দাও।—”

মাধো সিং তাহার গজিকা-প্রসাদাৎ রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু অগ্নিতপ্ত লোহার ভাঁটার মত গোল করিয়া পাকাইয়া গোপালের দিকে তাহা যেন ছুঁড়িয়া মারিয়া তেমনি বজ্রনির্ঘোষে হুকুম করিয়া উঠিল, “কেঁও! ম্যর চোট্টাকো সাথ ম্যরকো খামিন্কা লেড়্ কীকো মিল্নে দেঙ্গে?—”

আরও কোন কোন কথা সে বলিত, কিন্তু ক্রোধাতিশয়ো তাহার কথা বাহির না হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ স্ত্রিঃয়ের মতন ছিটকাইয়া তুলিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া গোপালের পাঁকাটির মতন সরু গলাটা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া গর্জনস্বরে কহিল, “নিকালো শালে! হারামজাদ! ফিন্ ডেরামে আগ্ ফুঁক্নে আয়া! বেহায়া, বদমাস! নিকালো।—”

“দিদিমণি রে! আর তোকে দেখতে পেলাম না—” বলিয়া আর্ন্তনাদ করিয়া কারাবাসক্রেণে অর্দ্ধ-মৃত ও অনাহারী গোপাল সবেগে ফটকের বাহিরে পড়িতে পড়িতেও না পড়িয়া হঠাৎ কেমন করিয়া যে আটকাইয়া গেল, সে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরক্ষণে দেখা গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটি সুরূপ কিশোরের সহিত এক জন মাধো সিংহেরই সমপদস্থ অপরিচিত ব্যক্তি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল;

গোপাল তাহারই গায়ের উপর পড়িয়া যাওয়াতে মাটিতে পড়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইল, গোপাল তখন চিনিল, সে ভুবনবাবুর দ্বারবান গিরধারদাস চৌবে।

এ দিকে ইতোমধ্যে আর একটা কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। গোপালের সেই উচ্চকণ্ঠের আর্ন্তনাদ বাহিরের অঙ্গন পার হইয়া ভিতর-মহলের সম্মিহিত একতলার ঘরে পড়িত মহাশয়ের নিকট প্রবেশিকা-সোপান ও উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাঠে নিযুক্তা সুলেখার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ধাতু রূপ করা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া সে কশাহত জানোয়ারের মত তড়িদবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধীরস্বরে কহিয়া উঠিল, “এ নিশ্চয়ই আমার গোপালদা’ না হয়ে যায় না। কি হলো? গোপালদা’ অমন ক’রে চোঁচালো কেন? আবার কি মাধো সিং তাকে মারছে!”—

দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য বালিকা তীরবেগে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল,—“মাধো সিং! মাধো সিং! তোম্ উস্কে। একদম জান লেনে চাহ্ তা হায় কেয়া! কাহে ফিন্ মারতা হায়?”

“ম্যরকো কুহ্ কশোর নেহি হায় দিদিমাহাব। হজুরকা হকুম হায় যে, ফিন্ কতি উ দাগাবাজ আদমীঠো হন্কা কোঠীকো মাইল ভরমে আনে নেই শকে। ম্যর তো তাঁবেদার হায়।”

“কক্ষন না, বাবা সে কথা নিশ্চয়ই বলেন নি। গোপালদা’! গোপালদা’! তুমি আমার কাছে এস! আহা, তুমি কি হয়ে গেছ, ভাই!”

বিগলিত কৰুণায় যেন শীতল জাহ্নবী-ধারা ঢালিয়া দিয়া সুলেখা এই কথা বলিয়া গোপালের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার সেই সৰু সৰু দৃষ্টিটি এক মুহূর্ত্তেই বিস্ময়-রেখায় ভরিয়া উঠিল। শুধু তাহা নয়, তাহার সঙ্গে আরও যে কে দুই জন দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই এক জনের দেহে ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া গোপাল কেমন যেন অবসন্নবৎ নিবুস মারিয়া গিয়াছে। সুলেখা সহসা একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে অর্দ্ধমুচ্ছিত গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া মস্তা-স্তিক ব্যাকুলতার সহিত ডাকিয়া উঠিল—“গোপালদা! গোপালদা! আমি এসেছি যে।”

সেই স্বভাব-মধুর স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শ ও সন্তপ্তস্বর যেন মাত্নোষধির মতই মুচ্ছাতুর গোপালের ঘোর

ক্রান্তিতে হতচেতনবৎ দেহে শক্তি-সঞ্চার করিল। সে সবেগে দৃষ্টি মেলিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে অশ্রুধারা করিতে করিতে অশ্রুটপ্পরে উচ্চারণ করিল, “দি—দিদি, দিদিমণি আমার!”—তাহার চোখ দিয়া অবিরল জলের ধারা বহিতে লাগিল।

সুলেখার চোখ দুইটিও শুষ্ক ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে আর অনেক বেশী কান্নাই বোধ করি কাদিত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কিশোরের দুইটি বিস্ফারিত ডাগর চোখের উপরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল, অমনই একটা গাঢ় লজ্জার লালিমায় তাহার সরস দাড়িম্ববীজতুল্য গণ্ড দুইটি আবৃত্ত করিয়া তাহার কান্নাকেও যেন বাধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। সে চিনিল, এ সেই ছেলেদেরই এক জন—যাহারা সে দিন তাহার বাবার হুকুমে বাজপেয়ীর হাতের বেত খাইয়া গিয়াছে। মনে মনে বিস্মিত হইল, তাহারা এখানে আবার কি জন্ত আসিল? গোপালদার সঙ্গে আসিয়াছে কি? কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার ইহাদের কাছে ভারী লজ্জা বোধ হইল। পাছে সে দিনের কোন কথা আবার উঠিয়া পড়ে, সে ভয়ও একটু হইল।

“গোপালদা, এম, কিছু খেতে দিই গে”—বলিয়া সে ততক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ গোপালের হাতে ধরিয়া তাহাকে লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

সুশীলের অত্যন্ত লোভ হইতে থাকিলেও সে তাহার সম্মানরক্ষাকল্পীকে একটি রুতজ্ঞতার কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে সমর্থ হইল না। বলিলে তাহারও অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছিল।

বিপ্রদাসবাবু বৈপ্রহরিক বিশ্রামশয্যা শয়ন করিয়া আলঝোলায় নল টানিতেছিলেন, তাঁহার মাংসবহুল পদযুগল এক জন দাসীতে টিপিয়া দিতেছিল, তিনি তাহাকে তাঁহার জীকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী সত্যবতীর বয়স বিপ্রদাসবাবুর অর্ধেকের অনধিক। আকৃতি অনেকটা সুলেখারই মত; প্রকৃতিতেও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে সে শিশু, ইনি পরিণত বয়স্ক। জমীদারগৃহিণী এবং দুর্দান্ত স্বামীর জী। দ্বিতীয়পক্ষীয়া হইলেও চরিত্রের কোমলতা বশতঃ “প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী” হইতে পারেন নাই—বিশেষতঃ বিপ্রদাসও বৃদ্ধ নহেন; তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশোর্ধ্ব এবং পত্নী পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া।

প্রভুর ইজিতে দাসী বিদায় লইলে বিপ্রদাস বলিলেন—“তোমায় বাড়ী পোড়ানর ব্যাপারটা সে দিন সব বলেছিলাম না? আজ ভুবনবাবু যে তাঁ’র ছেলেকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠিয়েছিলেন।”

সত্যবতী একটুখানি চঞ্চলভাবে স্বামীর দিকে বারেক চাহিয়া লইয়া মুহূর্ত্ত সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “হঃ!”

বিপ্রদাস কহিলেন, “খাসা ছেলে।”

সত্যবতী মনে মনে ঈর্ষা বিস্মিতা হইলেও মুখে মৌনী হইয়াই রহিলেন, ইতঃপূর্বে এ শব্দ তিনি স্বামীর মুখ হইতে আর কখন বাহির হইতে শুনিয়াছেন কি না, বোধ করি, সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিপ্রদাসের আজ বোধ করি মনোবীণা খুব উচ্চ সুর-গ্রামে বাঁধা ছিল, কোন দিকে লক্ষ্য পড়িল না। আপনার চিন্তাধারারই অগ্রসরণ করিতে করিতে সত্যবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভুবনবাবুর এখন ঢের টাকা রোজগার হচ্ছে; শুনেছি, কলকাতায় না কি বড় বড় আট দশখান ভাড়াটে বাড়ী—একখানা তার বিলিতি হোটেল ভাড়া দিয়ে রেখেছে; কারবারও খুব ফালাও, আবার এ দিকের জমীদারীরও অংশ আছে। তাঁর ঐ ছেলে তো মোটে একটাই। ছেলেটি দেখতে ভাল, লেখাপড়াও মন্দ করছে না, কেমন? কি বল? মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না কি?”

সত্যবতী চকিত হইয়া উঠিলেন, “এখনই?”

বিপ্রদাস কহিলেন, “আজই নয়, যখন হয় তখন, পছন্দ কি না?”

কিন্তু ওদের লেখাকে যদি পছন্দ হয়, তবে ত?”

বিপ্রদাস বিজয়গর্বে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “পছন্দ হয় কি? হয়েছে। ভুবনবাবু সে দিন সুলিকে দেখে খুব পছন্দ করে গেছেন। বিয়ের কথা স্পষ্ট না লিখলেও ওর রূপের কথা, গুণের কথা আজকের চিঠিতে না হোক, তবু পাঁচ জায়গায় লিখেছেন। শেষে লিখেছেন, ‘আমার ছেলে যদি আজ এত বড় অপরাধে অপরাধী না হতো, তা হ’লে—যাক, মনে কত সাধ যায়; সব সাধ কি আমরা মিটাইবার সৌভাগ্য লইয়া আসিয়াছি!’—আর কি স্পষ্ট বলবেন?”

সত্যবতীর সুন্দর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, তিনি ক্ষণকাল নতমুখে নীরব থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কিন্তু সে কথাও তো সত্যি, সুশীল যা অজ্ঞান কাজটা করেছিল, তাতে বড় হয়ে—”

“সে ডাকাতের সর্দার হবে? না, মোটেই তা নয়—”

বিপ্রদাস এবার হাহাশব্দে হাসিয়া উঠিলেন—
“ছেলেটির অতি নম্রকান্তি, মাধুর্য্যপূর্ণ নম্রমূর্তি; সে এ সব ক্ষাক্তের যোগ্যই নয়। আমি ত বোকা নই, ভুবনবাবু কোন ইঙ্গিত না দিলেও আমি বুঝেছি ও জেরা ক’রে বার করেছি যে আগুন দেবার পরামর্শ এবং দেওয়া সুশীলের নয়, শুভেন্দুর—ও’র এক বন্ধুর ছেলের। সুশীল শুধু তার সঙ্গে ছিল। আর দেখ, যদিই তা’ দিয়েই থাকে, ছোট বেলায় অমন কত ছেলের কত করে। সবাই তো আর তোমার এবং ভুবনবাবুর মতন ধর্ম্মধ্বজ ও ধর্ম্মধ্বজী নয়; ও সব কি আর ধর্তব্য?”

একটু থামিয়া মুহূর্ত্তের সহিত পুনশ্চ কহিলেন,
“ধর, এই আমিই ওর বয়সে কারু ঘরে আগুন না দিয়ে থাকি, একবার সংস্কৃত পণ্ডিতের টিকিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম, আর একটু হ’লেই গো-হত্যা নয়, ব্রহ্ম-হত্যাটা হয়ে যেতে পারতো। একবার না, যাক্ গে, তা তোমার কি মত বলো? আমি তো মন ঠিক ক’রেই ফেলেছি। আমি যখন ডাকাত হইনি, ও-ও হবে না।”

সত্যবতী মনে মনে বলিলেন, “তুমি ডাকাতের চাইতে খুব বেশী তফাৎও নও!” প্রকাশে বলিলেন, “দেখ, যা ভাল হয়। তা ওরা এখন ত আর বিয়ে দিতে চাইবে না। সুলেখা এখন যে বড় ছোট আছে।”

“এখন দেবার কথা তো আর হচ্ছে না”—বলিয়া বিপ্রদাসবাবু গভীর মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন, জ্বর সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁহার পক্ষে এই যথেষ্টই হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। মেয়েমানুষের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে গেলে নিজেকে খেলো করিয়া ফেলা হয় বলিয়া তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল। তা’ ইতোমধ্যেই জ্বর সহিত মনের কথা কহিয়া ফেলিয়া নিজেকে তিনি হয় ত বা একটুখানি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াই থাকিবেন—কারণ, তাঁহার এই সকল কথাবার্তার পরে তাঁহাকে একটুখানি প্রসন্ন করিয়া সত্যবতী ভয়ে ভয়ে এই সঙ্গে একটি আরজী পেশ করিয়া বসিলেন, হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মুখ নত করিয়া যত্নকণ্ঠে কহিলেন—“লেখা তো গোপালের জন্তে বড়ই কান্নাকাটি করছে, সে যখন দোষী নয়, তখন তাকে বাড়ীতে রাখায় কি কোন দোষ আছে? যদি—”

বিপ্রদাসের মুখপ্রবিষ্ট আলবোলায় নল বিবর-প্রবিষ্ট

সর্পমুখের জ্বাশ সবগে বাহির হইয়া আসিল, ধূমধারা বর্ষাজলপ্রাপ্ত নল-খাগড়ার বনের মত ঘন গুম্ফরাজীর মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল, মনে হইল যেন, গভীর বনে দাবানল জলিয়া উঠিয়াছে। গভীর ও অবিচলিত কণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, “সে হারাম-জাদাটা কি আমার বাড়ীতে ঢুকতে পেয়েছে না কি? নাঃ, সুলুটা বড় জালালে দেখছি। এসেছে না কি?”

সত্যবতী ভয় পাইয়া গিয়া নিজ নামের বথার্থ মর্যাদারক্ষায় সমর্থ হইলেন না। ‘ইতি গজ’ করিয়া বলিলেন, “আমার কথা নয়, যদি আসতে মত দাও, তাই বলছিলাম, সে তো আর দোষী নয়।”

“দোষী নয়? বল কি তুমি? সে আমার জন্ম করবে ব’লে মুখের উপর শাসিয়ে যায় নি? তার পর এই যে দণ্ড না পেয়ে ফিরে এলো, এতে কি ওর কম আত্মারা বাড়লো ব’লে মনে কর? ব্যাটার ধরাকে যে এখন সরা জ্ঞান হবে, আর ওর দেখাদেখি সব লোকজন বিগড়ে যাবে না! ওকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যেন খবরদার আস্তে দেওয়া না হয়, আমি যে মাধো সিংকে ব’লে দিয়েছিলাম,—এই কে আছিস?”

সত্যবতী তাড়াতাড়ি অন্ত্রপথে সরিয়া পড়িলেন ও যেখানে সুলেখা আপনি বসিয়া বহুদিনের অভুক্ত গোপালকে যত্নপূর্ব্বক আহ্বার করাইতেছিল, সেইখানে গিয়া অগত্যাই তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। সুলেখার চোখ দিয়া অমনই জলের ফোঁটা টপ টপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু গোপাল এ সংবাদ পাইয়া খুব বেশী বিচলিত হইল না; সে তৎক্ষণাৎ সুলেখাকে সাহায্য দিয়া কহিয়া উঠিল—

“কাদিস্ নে দিদিমণি! আমার জন্যে তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর শ্বশুর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে আমার তাঁর বাড়ীতে থাকবার কথা ব’লে পাঠিয়েছেন; বলেছেন, কল্কেতায় আমার নিয়ে যাবেন। ছুদিন দেখা হবে না বটে, আবার তুই ভাই, সেই ঘরই তো চিরদিন ধ’রে করবি।”

মুখ তুলিয়া সত্যবতীর সহসা-কৌতুক-স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, “খাসা মানুষ মা, আমার দিদিমণির শ্বশুর! দেবতুল্য লোক! জেলখানার গিঁথে আমার মন ছোট লোকের গায়ে হাত দিয়ে কি আদরটাই না করা! যেমন আমার সীতাদেবী দিদি-মণি, তেমনি রাজা দশরথের মতন শ্বশুর হবে বাবু।”

সত্যবতী প্রীতি-আনন্দে সম্মেহ-নেত্রে কণ্ঠার মুখের দিকে চাহিলেন; মন্দ নয়! ইহারই মধ্যে সংবাদটা ছুটিয়াছে ত অনেক দূর! অথবা এটা উহাদের নিছক কল্পনা মাত্র! তা কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়, সুলেখার পিতা যদি ভূমিবাসকে বৈবাহিক করেন, তবে তাঁহার জীবনে অন্ততঃ একটাও ভাল কাজ করা হইবে।

সুলেখা অশ্রুচরা হই চোখে রোষের বাণ ভরিয়া গোপালের দিকে তাহার সন্ধানপূর্বক উন্টান ঠোটে বলিয়া উঠিল, “খ্যৎ!”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এই মিশন স্কুলে আসিবার পর হইতে যত না হউক, বাইবেল পড়া ও যীশুর গান তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণেই শিক্ষা করিতে হইতে লাগিল এবং যতই তাহা শিখিল, মিসেস্ গুই বা মিস্ হর্ণের কিছুতেই তাহার সে শিক্ষা আর মনঃ-পূতই হইতেছিল না। মিসেস্ গুইএর ক্লাসে প্রথমেই প্রার্থনা-গান, তার পর প্রার্থনা, তার পর বাইবেলের “বুক অফ্ দানিয়েল”, “জেনিসিস্ সামুয়েল”—এমনি কোন না কোন একটা জায়গা পাঠ্য। তার পর হাতের লেখায়ও সেই বাইবেল, কোন দিন ডিক্টিশন দিলে সেও সেই বাইবেল, ইংরাজী হস্তায় দুই দিন মাত্র, তাহাও সেই ওল্ড টেস্টমেন্ট হইতে ছত্র কতক করিয়া পড়ান হইত। বাকী রহিল অঙ্ক ও সেলাই, তা ও দুইটার মধ্যে না কি বাইবেল গুঁজিয়া দেওয়া কোনমতে চল না, কাজেই ও দুটাকে এই বাইবেলময় স্কুল-নিয়মের মধ্যে একান্তভাবেই সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। তবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস রীড্ নীলিমার সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে একটুখানি কেমন স্নানজরে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তাই হস্তায় এক দিন করিয়া তিনি তাহাকে একটু উচ্চাঙ্গের শিল্পশিক্ষা দিতে চাহেন, ঘর হইতে ইহার জন্ত উপকরণ যখন সে আনিয়া উঠিতে পারিল না, তখন আর কি হইবে? অগত্যা ইহার বদলে অল্প-স্বল্প ইংরাজী ও অঙ্ক সে তাঁহার নিকট হইতে শিখিতে পাইল। তবে সে ইংরাজীও বাইবেল-সম্বন্ধীয়, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। ছাত্রদিগের অগুণ্ডে পরমাণুতে এইরূপে বাইবেলের শিক্ষা ও বাস্তবপ্রেম ইহার ইন্দ্ৰজ্যেষ্ঠ করিয়া দিয়া নিজেদের

কর্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, এবং তথুলোহের তরলসারে পরিপূর্ণ বীভৎস কুস্তীরময় কুস্তীপাকের হস্ত হইতে অনন্তমুক্তি প্রদানে উহা-দিগকেও ধন্ত করিতেছিলেন।

নীলিমা ক্লাসের কাহারও চেয়ে এই আত্ম-বক্ষা-কার্যে অমনোযোগিনী না হইয়াও ইহার জন্ত উঠিতে বসিতে কিছু শিক্ষয়িত্রীদের নিকট ভৎসনা লাভ করিতেছিল। মিস হর্ণ এক দিন প্রশ্ন করিলেন, “আই হোপ, ইউ লাইক দি সাম্‌স্? (আমি আশা করি, Psalms তোমার ভাল লাগে)?

নীলিমা মিথ্যা বলিতে জানিত না, সে ভয়ে ভয়ে জানাইল যে, না, তা’ লাগে না।

“নো?—ওহ হাউ শকিং!” (না? উঃ, কি ভয়ানক!) মিস হর্ণ চোখ কপালে তুলিয়া বক্ষে ক্রশ চিহ্ন ধরিয়া দেহশুদ্ধি করিয়া লইলেন।

মিসেস্ গুই এক দিন সব মেয়েদেরই জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওই! তোরা সব পুতুলদের ভক্তি করিস? ওদের দেবতা মনে করিস?”

সব মেয়েই প্রায় ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিল। চুপ করা যখন অচল হইল, তখন যাহাদের মিথ্যা বলা অভ্যাস আছে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বলিল, “নেহি, নেহি মানুতে হৈ; পহিলে মানুতে থি; লেকিন্ আব হি তো কেবল যেসুকো প্রেম করুতে হৈ।”

মিসেস্ গুই উহাদের দিকে প্রীতিকটাক্ষ করিয়া সম্ভ্রষ্টভাবে কহিলেন, “উয়ো ঠিক কাম করতে হৈ, তোম লোগকা আত্মা নরক সে বাঁচ গিয়া!”

শুনিয়া ঐ মেয়েরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন স্বয়ং যীশুখৃষ্টই বা পুনর্জীবিত হইয়া আসিয়া তাহাদের অনন্ত পাপমুক্তির আদেশ প্রদান করিতেছেন, এমনই নিশ্চিততা তাহারা বোধ করিল।

মিসেস্ গুই তখন তাঁহার কোটরনিবাসী চোখ দুইটাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া কটমট করিয়া নীলিমার দিকে চাহিলেন, “তোমার বুঝি ও কথা বলবার সাধ্য হলো না? তুমি বুঝি এখনও ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুতুলের পূজা করছো?”

এতক্ষণ এই সময়েরই জন্ত নীলিমা স্বাসনিরোধ-পূর্বক প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। সম্বোধিত হইয়া তাহার বুকটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। তাহার রক্তাঙ্গ-তায় পাণ্ডুর অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল। হ্যাঁ না কোন কথাই সে কহিতে পারিল না।

মিসেস গুঁই এর হয় ত বা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁর অপর সকল হিন্দুস্থানী ও কয়েকটি নিতান্ত নিম্ন-শ্রেণীর বাঙ্গালী ছাত্রীদের আত্মার অপেক্ষা একটু উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা নীলিমার আত্মার বাজার-দর কিছু অধিক হওয়াই সম্ভব এবং সেই জন্তই বোধ করি, উহাকেই সুরক্ষিত করিবার জন্ত তাঁহার আগ্রহ-টাও কিছু অধিকতরই দেখা যাইত। নীলিমাকে যে উঠিতে বসিতে যীশু-প্রেম শিক্ষা দিয়াও তাহার ফল এত বড় অফলা হইয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার মন খারাপ হইয়া মুক্তিও ভীষণতর হইয়া উঠিল।

“ফর্ সেম! নেলি! ফর্ সেম!—ঈশ্বর তোমায় আমাদেরই সঙ্গে এক রকমেরই মানুষের চেহারা দিয়াছেন, দেন নি? বয়সও তোমার এখন এই নেহাৎ কাঁচা, ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি তাঁর নিজের ভেড়ার-ছেনা হ’তে পারতে। কিন্তু তা না ক’রে কি লজ্জার বিষয় যে, তুমি সমতানকে আত্মবিক্রয় ক’রে রেখে দিলে! ঈশ্বরের পুত্রকে শরণ না নিয়ে পুতুলের কাছে নিলে? বাড়ী গিয়ে একবার বাঁ পায়ের লাথি দিয়ে দেখ দেখি, তোমার পূজো করা সেই পুতুলগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে তোমায় উটে লাথি মারতে পারে কি না! * তা যদি না পারে, তবে সে তোমায় অনন্ত নরক থেকে মুক্তি দিতে পারবে?”

নীলিমার চোখে সহজে জল আসে না, আসিলেও তাহা সহসা ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু আজ আর তাহার চোখের জল চোখের মধ্যে ধরা রহিল না, গাছের পাতার শিশির-বিন্দুর মতই তাহা এক মুহূর্তে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু ইহার ফল যে ভাল নয়, তাহা বুঝিয়াই সে পরক্ষণে অশ্রু সংযত করিয়া লইবার জন্ত সচেষ্ট হইয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু চোখের জল তাহার গোপন ছিল না এবং জড়ার মনের সঙ্গে তাহা বোধ করি বিচার মতনই হস্ত ফুটাইয়া দিয়াছিল। মিসেস গুঁই একবারে রুদ্ধমুর্তি ধারণপূর্বক দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন—“আ! নেলি! এত দিন এত শিক্ষা পেয়ে তুমি পুতুলের শোকে কেঁদে ফেলো! কি ভয়ানক! কি লজ্জা! কি ঘেন্না! কোথায় আজ প্রভু যীশুর প্রেমে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমের ধারা বইবে, তোমার স্বর্গের আলোক হাসতে থাকবে, তোমার আত্মা অনন্ত

কালের জন্ত ত্রাণকর্তা যীশুর আশ্রয়ে পরিভ্রাণ লাভ করবে, তা না হয়ে নুলা জগন্নাথ, জিব বারকরা কালী-মুখী ন্যাংটা মূর্তি কালী, হাতীমুখো গণেশ মনে করতেও গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে—সেইগুলোর শোকে তুমি চোখে সরষেফুল দেখছো! এই ঘেন্নেরা! তোরা আর এর সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসবিনে; ওর সঙ্গে কথা কবিনে; ওর দিকে কেউ চেয়ে পর্যন্ত দেখবিনে। ওর আত্মা একেবারে নরকের দোর-গোড়াতে গিয়ে পৌঁছে গেছে। সেখানে ওর আত্মা হাঙ্গর-কুমীরের আহার হয়েছে,—সেখানে ওর আত্মা কীট-পতঙ্গের আহার হয়েছে,—সেখানে ওর আত্মা সংসারের যাব-তীয় পাপের ভারে ভারী হয়ে সংসারের যত কিছু ময়লা জিনিসের মধ্যে ডুব গেছে; সেখানে ওর আত্মা আগুনের হাপরে যেমন গলান লোহা ঢেউ খেলতে থাকে, তেমন ধারা গরম লোহার চৌবাচ্চায় প’ড়ে জ’লে যাচ্ছে, জ’লে যাচ্ছে, জ’লে যাচ্ছে!”

নীলিমার চোঁট ফুলিতে লাগিল, বুক ঠেলিতে লাগিল, চোখ ফাটিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই যেন এই মুহূর্তে হইতেই তাহার উক্তবিধ দুর্দশা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মাটিকে (সেটা যে কোথায় আছে, তাহা না জানিলেও) যেন হাঙ্গরে চিবাইয়া, কুমীরে গিলিয়া, জোঁকেরা চুষিয়া, পতঙ্গে কুরিয়া খাইতেছে। গরম লোহা তরল অগ্নির মতই যেন তাহার সমস্ত শরীরকে পোড়াইয়া দিতেছে, অথচ তাহাকে ছাই করিতেও পারিতেছে না। নীলিমা হাঁপাইতে লাগিল, তাহার হাত ও পায়ের তলা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। তাহার পর সর্বদা ব্যাপিয়া একটা প্রবল কম্পন দেখা দিল, সে পতনোন্মুখ হইয়া দেওয়াল ধরিল।

মিসেস গুঁই একবারমাত্র তাঁর দৃষ্টিতে বোধ করি সেই তরল অগ্নিরই কতকটা ঝাপটা মারিতে চাহিয়া তেমনই সতেজে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “সেই গলা আগুনে প’ড়ে প’ড়ে ছুটাইয়া কর্ণে কোনমতে বুঝবে না; চক্ষুতে দেখবে, মতেই প্রত্যক্ষ করবে না। চীৎকার ডাকিলেও কেহ আসিবে না। আবার ভীষণ দণ্ড পাবে—যখন ঐ আগুনের কুণ্ড নিয়ে ময়লার পচা গন্ধময় পুকুরে ঠেলে তখন চীৎকার ক’রে উঠলে সেই পচা

* এই ঘটনাটি কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে, পরন্তু বাস্তব।

সহস্রটা ভীষণাকার ক্রমিকীট কিল্কিল্ ক'রে মুখের মধ্যে—”

নীলিমার কানে শুনিবার, চোখে দেখিবার শক্তি সত্যিই লোপ পাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে সে কতকটা আত্মস্থ হইয়া মুখ তুলিয়া, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার ক্রাসের মেয়েরা তো বটেই, অত্যাগত ক্রাসের মেয়েরাও ক্রাস ছাড়িয়া তাহার বিচার দেখিতে আসিয়া জমা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিস্ হর্ণও আসিয়া নিতান্ত সক্রমভাবে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে ‘হাউ সিকিং! হোয়াট এ পীটি!’ ইত্যাদিরূপ আপশেষ জানাইতেছিলেন। নীলিমার চক্ষু-কর্ণের এ সকল দৃশ্য ও মস্তবোর জ্ঞাত বিশেষ অবসর ছিল না। মিসেস গুঁইর প্রকাণ্ড তামাটে মুখখানা ও কণ্ঠের কাংশ্রব দর্শন-শ্রবণের জন্তই তাহার অপমানাহত ভীত চিত্ত উগ্র আগ্রহে চকিত হইয়া উঠিল। মিসেস গুঁই কিন্তু সমধিক শীতল হইয়াছিলেন।

তরল তপ্ত লৌহ বুঝি একটুখানি জুড়াইয়া আসিয়াছিল না কি, বলাও যায় না। কতকটা সংযতভাবে তিনি তখন পাঠ করিলেন—“এবং সেই পরাজিত সকলেও করে, যাহাদের উপরে আমার নাম ডাকা হইয়াছে। অতএব আমার বিচার এই, পরজাতীয়দিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, আমরা যেন তাহাদিগকে কষ্ট না দিই, কিন্তু তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাই, যেন তাহারা প্রতিমাঘটিত অশুচিতা হইতে, ব্যভিচার হইতে গলা টিপিয়া মারা প্রাণী হইতে এবং রক্ত হইতে স্বতন্ত্র থাকে।”

“নেলি! এখন বেশ ভাল ক'রে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ ত? আচ্ছা, আজ রাত্রি ধ'রে অনুতাপ ক'রে নিজের পাপ-ক্ষালন কর গে যাও। পবিত্রাত্মার কাছে ঐ পশুর হৃদয়ের বদলে একটি মানুষের হৃদয় প্রার্থনা ক'রে খুব চোখের জল ফেল গে দেখি! কি বলবো, তুমি আমাদের বোর্ডিংএর মেয়ে নও, তা হ'লে এক দিনেই তোমায় আমি ঠিক ক'রে নিতুম। না ঘর হইতে ইংরে বন্ধ থাকলে আর শাস্তির কথা শুনলে উঠিতে পারিল বের হয়ে যেত।”

ইহার বদলে আতীত ও অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ পর্যবেক্ষণ-হইতে শিথিল হইয়া ভীত, কম্পিত, লজ্জাবিবর্ণ, সঙ্কোচে সম্বন্ধীয়, ইহা লিমা ক্রাসের বাহিরে আসিয়া একটা আর্দ্র-অগুণ্ডে পরমাণুকরিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাহার বাস্তব ইহা লম্বল করিতেছিল, একটা প্রচণ্ড অনিবৃত্ত

ভয়ে যেন তাহার সমস্ত মনটাকে আর্দ্রতায় অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। সে ভয়টা অবশ্য গুঁই বা মিস্ হর্ণের উদ্দেশ্যে, অথবা তাহাদের বর্ণিত সেই ভীষণ নরকযন্ত্রণার ভবিষ্য আতঙ্কজনিত, তাহা নিশ্চিত করিয়া না বুঝিলেও তাহার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সে গিয়াছে যেন জন্মের মত, ইহপরকালের মত, অনন্তকালেরই মত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

তাহার ক্রাসের মেয়েরা তখন ছুটির পূর্ব্বেকার প্রার্থনা-গান গাহিতেছিল।

“ইশ মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও”—

তাহাদিগের সেই প্রার্থনার সঙ্গে প্রাণের তান মিশাইয়া তাহার ভয়ানক চিত্তও যেন অকস্মাৎ আজ প্রাণের প্রাণেরও মধ্য দিয়া ঐ গান সপ্তস্বরে গাহিয়া উঠিল। মস্তকের ভিতর হইতে ভীত ত্রস্ত ব্যাকুলচিত্ত কাতর উদ্ভাস্ত হইয়া আর্দ্রস্বরে বলিতে লাগিল,—

“ইশ মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও,—মেরা প্রাণ বাঁচাইও,—মেরা প্রাণ বাঁচাইও।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে দিন বাড়ী ফিরিবার মুখে সারা পথটাই নীলিমা গভীর উৎকণ্ঠার সহিত ভাবিতে ভাবিতে আসিল যে, বাড়ী ফিরিয়া সে মা'র কাছে প্রথমেই জানিয়া লইবে যে, খৃষ্টধর্ম্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম্ম বড় কি ছোট? খ্রীষ্টান না হইয়া হিন্দু থাকিলেই মানুষকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কি না, হিন্দু থাকিয়াও স্বর্গযাত্রা করা চলে কি না—যে সন্ধিক্ষেপে সবিশেষ জানিয়া লইবার জন্য তাহার সারা চিত্তে উদ্বেগ ও আগ্রহের যেন আর অন্ত রহিল না। মিসেস গুঁই আজ বিদায়কালে পুনশ্চ তাহাকে দৃঢ় আদেশের সহিত বলিয়া দিয়াছেন,—মিস্ হর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাসে পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছেন,—কা'ল তাহারা তাহাকে ‘গুড বিলিভার’ দেখিতে উৎসুক রহিলেন। অসহ্য অশিক্ষিত ষাঁড়ে চড়া মহাদেব, হুঁটো জগন্নাথ, কুচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ, উলঙ্গিনী কালী (হোয়াট এ সেম!) এদের প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া ‘সেভিয়ারের’ শরণাপন্ন হইলেই যখন তাহার দীন-আত্মা অনন্ত অসীম সুখের অধিকারলাভে সমর্থ হয়, তখন অনর্থক নিজের ক্ষুধিত আত্মাকে সেই অনাস্বাদ্য সুধাপাত্র কেনই বা সে পান করাইয়া

চির-অমরতা দান না করিয়া থাকে? ইহা না করিলে তাহার পাপ আবার অত্যাচার 'হীদেন'-দের চেয়ে কোটি-গুণ অধিকতরই হইবে। যেহেতু, যীশু যে 'খৃষ্ট' এবং তিনিই যে একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র এবং সকলের ত্রাণ-কর্তা, তাহার সম্বন্ধে নীলিমাকে বহুদিন ধরিয়া বিশেষ-ভাবে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। যেহেতু নীলিমা বিশেষভাবেই জানে যে পিতৃ-পুরুষ দায়ুদ প্রবাচক ছিলেন এবং ঈশ্বর দিব্যপূর্বক তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন, এই জ্ঞান তিনি পূর্ব হইতে দেখিয়া খৃষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, তাঁহাকে পাতালে ফেলিয়া রাখা হইল না। তাঁহার মাংসও ক্ষয় পাইল না। এই যীশুকে ঈশ্বর উঠাইলেন, আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের দক্ষিণহস্ত দ্বারা উন্নীত হওয়াতে এবং পিতার কাছে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি বর্ণন করলেন। কারণ, দায়ুদ স্বর্গে আরোহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজেই বলেন,—‘প্রভু আমার, প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে উপবেশন কর, যে পর্যন্ত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার চরণের পদাসন না করি, অতএব সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যে যীশুকে ত্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রভু খৃষ্ট উভয়ই করিয়াছেন।’

মিস্ হর্ন শাম্পানীর দ্বারের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “মন পরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপবিমোচনার্থ তোমরা প্রত্যেকে যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও; তাহাতে তোমরা পবিত্র আত্মা দান প্রাপ্ত হইবে।”

নীলিমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এই শেষ কথাগুলারই প্রতিধ্বনি অনবরত তাহারই নিজের উভয় কর্ণে ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল,—“তোমাদের পাপ-বিমোচনার্থ তোমরা যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও * *” যদি বাস্তবিকই সেই ঘোরতররূপ অতন্ত নরকজালা হইতে মুক্তলাভানন্তর ইহাতে অনন্তকালের জ্ঞান সুখ-সেবা স্বর্গবাস ঘটে, তবে কেনই বা সে “যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ” না হইবে? মিসেস গুই বলিয়াছেন, “অবিশ্বাসীর আত্মাকে সহস্রকোটি বিষাক্ত কীট সহস্র সহস্র কোটিবর্ষ ধরিয়া প্রতিনিয়ত কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া কাটিয়া থাইতে থাকিবে; কাহারও সাধ্য নাই যে,

সে দুর্দগার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে! ইহার উপায় একমাত্র যীশু।”

নীলিমার মায়ের মুখ মনে পড়িয়া গেল। মার কথা মনে হইল। মা, তার স্নেহময়ী মা, তিনি যে সামান্য একটু মাথা ধরিলে কতই না ব্যাকুল হইয়া, সেটুকু ক্রেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়েন, আর ঐ অত বড় বিপাকের মধ্যে তাহাকে ডুবিতে দেখিয়া সেই মা কি কখন নিশ্চিত হইয়া থাকিতে পারিবেন? কখনই না, কখনই না—মা তাহাকে নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই অন্ধতমসচ্ছন্ন, ঘৃণিত ও বিষাক্ত ক্রমিকীটে পরিপূর্ণ, গলিত ময়লায় শ্বাসরোধকারী দারুণ দুর্গন্ধে ভরা নরককুণ্ড হইতে, গলিত লৌহের তরল অগ্নির ভীষণ আধার হইতে নিশ্চয়—নিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অসম্ভব, নীলিমার এ দুঃবস্থা তার মা থাকিতে ঘটা একান্তই অসম্ভব! মার কাছে কোনমতে এই মুহূর্ত্তই গিয়া পৌঁছিতে তার সমস্ত মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। অথচ কি ধীরমস্থর গতি ওই বলদ দুইটার পায়ের, আর সেণ্টপিটার্শ মিশন স্কুল হইতে নীলিমাদের বাড়ীর রাস্তাটাও কি না তেমনই বিষম দীর্ঘ!

বাড়ী ফিরিয়া এক রকম ছুটিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নীলিমা উচ্চ কর্তে ডাকিয়া উঠিল—“মা!”

অধীর ও উদ্গ্রীব আগ্রহে মায়ের ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু এ কি! নীলিমার সকল ব্যগ্রতাই যে ঘোর নৈরাশ্রের তীরে আছাড় খাইয়া পড়িল। এ অসময়ে তার মায়ের ভাঁড়ার ঘরের মধ্য হইতে তাহার পিতার কণ্ঠের সাড়া আসিতেছে কেন? নীলিমা সহসা নিজের অনন্ত নরকযন্ত্রণায় ভয়াবহতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার মায়ের আসন্ন কোন বিপৎপাতের সম্ভব কল্পনায় গুঞ্জন হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন কিছু অঘটন না ঘটিলে এ সময় তাহার পিতাকে ইটখোলার তদারক ফেলিয়া এখানে টানিয়া আনে নাই। তার উপর তাঁর ভাণ্ডারগৃহ-প্রবেশেই যে মস্ত বড় একটা বিপদের সূচনা করিতেছে। নীলিমা শ্রোতোহত কুসুমদামের মতই সেইখানে নিশ্চল হইয়া রহিল এবং সেখান হইতেই সে এই কথাগুলি শুনিতে পাইল।

“বল কি তুমি গিন্নি! ছোড়াটাকে ত আজ বছর চারেক হ’তে চলো ভুবোন রায় পুষেছ, তোমার বাড়ীমুখো হ’তে দেয় নি,—বাড়ীতে থাকবার মধ্যে

এখন তাহা মাত্ৰাতিক্রমেরই উপক্রম করিল। মিসেস গুইএর মুখে কি সমাচার লাভ করিয়াই তিনি সে দিন প্রায় স্বাস্থ্যক্লান্ত রক্তবর্ণ মুখে ছুটিয়া আসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিলেন—

“নেল! ইহা কি সুসমাচার! তুমি যীশু ক্রাইষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছ? ইহা কি সত্য?”

নীলিমা বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া তেমনই নতমুখে মাথা হেলাইয়া নিজের এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

“ইজ নট ইট গ্লোরিয়াস!” (ইহা প্রশংসার্থে)

“তুমি এখন যীশু ক্রাইষ্টের পবিত্র নামে বাপ্তাইজ হইতে সম্মত আছ, আশা করি।”

নীলিমার শরীরের প্রতি শিরা, প্রত্যেক লোমকূপ যেন এই প্রস্তাবমাত্রেরই একটা অননুভূতপূর্ব আতঙ্কের শিহরণে শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বক্ষ-শোণিতের সবল ধারা যেন অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত স্রোতোহত নদীবন্ধের মতই শুষ্ক ও অচল হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষুতে দৃষ্টি স্থির রহিল, অথচ সে যেন তাহা দিয়া তাহার সম্মুখবর্তিনী বিদেশিনী প্রলোভকার গুল্ল মূর্তি সুস্পষ্টভাবে আর দেখিতে পাইল না। ঠোঁট খুলিয়া সে কি যেন একটা সম্মতিসূচক বাক্য বলিতে গেল, কিন্তু ভিতর হইতে তাহার সর্বদেহমনের নিদারুণ দৌর্বল্য তাহার জিহ্বা তালু ওষ্ঠাধর সকলকেই এমনই অবশ ও অ-বল করিয়া রাখিল, যাহাতে করিয়া এতটুকু শব্দও তাহারা বাহিরে আনিতে তাহাকে সহায়তা করিল না। রক্তচিহ্নহীন পাংশু ও ক্ষীণ ওষ্ঠ বারেক কম্পিত হইয়াই থামিয়া গেল।

মিস হর্ন পুলকিতচিত্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শীকার-করা পাখীর মত তাহার বিবর্ণ শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, একটু বুঝি মায়া হইল। কাছে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া, মাথায় হাত দিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, “মাই গার্ল! নিজেকে অশান্ত করিও না, কিছু দিন সময় লও। যীশু ক্রাইষ্টকে মনে মনে পূজা কর, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, —যেমন একটি ভেড়ার ছানা। আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গেই এ বিষয়ে সাহায্য করিব। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি নিজেকে বুঝিতে পারিবে যে, ‘বিলিভার’ হইয়া তুমি এ সংসারেই কত উন্নতি

করিতে পারিবে। অন্য জগতের কথা ত দূরের, এ জগতেই বা তুমি ‘আন্বিলিভার’ থাকিয়া কি পাইয়াছ?

নীলিমার রক্তহীন, বর্ণলেশশূন্য গুল্ল মুখ স্থিরিত শোণিতোচ্ছ্বাসে সিন্দূররঙ্গা হইয়া উঠিল। তাহার অবসাদ-অবসন্ন সমুদয় স্নায়ুপেশী যেন নবীন জীবনী-শক্তির পুনরুদ্ভাদয়ে জীৱন্ত ও সতেজ হইয়া উঠিল। তাহার সংসার সুখভোগে অপরিভূষ্ট, তৃষিত মনপ্রাণ যেন ওই তীব্র প্রলোভনবাক্যের ষাড়াষটিস্পর্শে ক্ষণেকের মধ্যেই নিজের সমুদয় অতীতটাকে সুখহীন, স্নেহহীন, আশাহীন ও নিরানন্দবোধে উহাকে পরিত্যক্ত পুরাতন সর্পনিষ্ঠাকের মতই বিদায় দিয়া নব নব আশাঙ্কালে বিজড়িত ও নবীন সুখোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ নূতন জীবনকে, সমুজ্জল ভবিষ্যৎকে সাগ্রহে স্বাগত জানাইতে চাহিল। ঐ কয়টি বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহার উৎ-পীড়িত অভিমানী চিত্ত বিদ্রোহ করিয়া জবাব দিল—সত্যই ত, পরলোকের কথা ত অনেক দূরের—ইহ-লোকেই বা সে কি পাইয়াছে, কি পাইতেছে? কি পাইলে সে তাহার গৌরবে, তাহার বন্ধনে, তাহার আশ্বাসে ইহাদের দান, তাহার চিরজীবনের সুখ-মোভাগ্য ঐশ্বর্য-গৌরব, পরজীবনের অটুট শান্তি সব ত্যাগ করিতে পারে? মায়ের বুকে তাহার জন্ম স্নেহের সঞ্চয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই নিরুপায় ব্যর্থ স্নেহ, যাহা স্নেহপাত্রকে অকথ্য অপমান হইতেও এতটুকুও রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা থাকিলেই বা লাভ কি, আর না থাকিলেই বা ক্ষতি কতটুকু? তাহার পর বাপ? তাঁহার কথা মনে পড়িতেই নীলিমার সর্ব-শরীরে যেন একটা টান ধরিল, বুকে একটা প্রবল চাপ বোধ হইল। ঐ পিতার কথা হইয়া থাকার চেয়ে তাহার আর সব কিছুই হওয়া ভাল। ঐ পিতার আশ্রয়ে অতীত ও বর্তমানে যাহাই হউক, ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে আরও যে কিছু আছে, তাহার ঠিকানাই বা কি? তাহার মা যে জীবন চিরদিন ধরিয়া বহন করিতেছেন, সে জীবনের স্মৃতিতেই যে নীলিমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পিতার নিকটানে একান্ত শস্তার দরে, খুব সম্ভব ঐ দরেরই কেহ নীলিমাকে ক্রয় করিয়া লইবে; তাহাদের শ্রোত্রীয় শ্রেণীর চক্রবর্তীর ঘরে পয়সা লইয়া মেয়ে বেচারও ত প্রথা আছে। অতএব ভবিষ্যতের দড়ী-কলসীর চাইতে এদের আশ্রয়

কি শ্রেয়ঃ নয়? মরণের চাইতেও কি খুঁটান বেশী
পর? তাহার বৃকের রক্ত—জমাট বাঁধিয়া ওঠা রক্ত—
—ফেনাইয়া ফেনিল হইয়া উঠিল। সে অস্থির অথচ
স্বদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল, “বাগ্‌টাইজ আমি হ’বো;
কিন্তু তার পূর্বে আমি ভাল ক’রে শিখতে চাই।
আমায় ইংরেজী বাইবেল ভাল ক’রে পড়াতে হ’বে।
আমার শিক্ষার যাতে উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা আপ-
নাকেই করতে হ’বে। তার পর আমি বাগ্‌টাইজ
হ’বো।”

এত কথা ও এমন কথা সে যে কেমিন করিয়া এত
সহজে বলিয়া গেল, সে যেন তাহার পক্ষে একটা
ইচ্ছাকৃত বা স্বপ্ন। কিন্তু বলিতে পারিয়াই সে বিন্ময়ের
সঙ্গে সঙ্গেই অপরিণীত তুষ্ট ও তৃপ্ত হইল। তাহার
এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল এবং বলিতে পারার
শক্তিসম্পদের জন্তই যে সে তাহার এই ভীকু দুর্বল
নিরুপায় জীবনের সমস্তটাকে বদল করিতে চায়।
সে দিনের ইচ্ছামাত্রই যে এই আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য
তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, ইহাতে সে ভবিষ্যৎকে
খুবই উজ্জল ও সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিল।

মিস হর্ন যে তাহার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত
হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য এবং এই শুভ-সন্দেশ
সঙ্গিনীদের বাঁটিয়া দিবার জন্ত ক্ষিপ্ৰচরণে প্রায়
ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারাও একে একে বা একে দুইয়ে
আসিয়া কেহ নীলিমাকে এক গোছা ভায়োলেট ফুল,
কেহ এক বাগ্‌ল চকোলেট, কেহ বা একখানা লাইফ
অফ আওয়ার লর্ড (Life of our Lord) এমনই
কিছু না কিছু উপহারের সঙ্গে তাহাকে অল্পস্র আদর-
বর্ষণে মুগ্ধ ও আপ্যায়িত করিয়া গেলেন। অতঃপর
মিসেস গুঁইর উপর কড়া হুকুম পড়িল, যেন নীলিমাকে
তিনি খুব সম্মেহ ব্যবহার করেন। তা মিসেস গুঁই
নিজেও সে বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন। কেবল স্বভাব
না কি মানুষ মরিলেও সংশোধিত হয় না!—তবে
ইহার পর হইতে মিসেস গুঁইর ক্রাশে নীলিমাকে বড়
বেশীক্ষণ থাকিতে হইত না। মিস হর্ন তাহার
ইংরাজী, মিস বীল তাহার ছবি আঁকার ও
সেলাইয়ের শিক্ষাভার লইলেন; এমন কি, মাদাম
পিরীও কখন কখন কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ শিখাইয়া
তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মায়ের
সংযত উচ্ছাসহীন মাপাজোঁকা আদরের স্থানে
সমুৎসাহিত মোচ্ছাস স্নেহের বস্ত্রাপরিপ্লাবনে তাহাকে

ভাসাইয়া দিবার উপক্রম হইল। মিসেস গুঁই
নিজ তাহাকে উঠিতে বসিতে বুকাইতে লাগিলেন
যে, খুঁটান হইলে তাহার স্নেহের দীপা থাকিবে না।
তিনি বলিলেন, “এই দেখ না, কম বয়সে বিধবা হয়ে
ভাইয়ের সংসারে খেটে খেটে মরছিলুম, একাদশী ক’রে
প্রাণটা বার হবারই যোগাড় হ’ত, লোভে জিভটা
খসে গেলেও এক টুকরা মাছ নিজের পটিতে নেবার
যোটা ছিল না; ভাগ্যে ভাগ্যে না এরা আমার ভজন-
ভাজন দিয়ে বার ক’রে আনলে, তাই আজ আমার
আমার একবার ছেড়ে ছ’বার বিষে হলো, মাছ
ছেড়ে বেকন ফাউল পর্যন্ত অনায়াসেই চ’লে যাচ্ছে।
হাত পুড়িয়ে রেঁধে মরবার বদলে খানসামার তোফা
রেঁধে খাওয়াচ্ছে, নিজে যেখানে খুসী বাচ্চি আসছি,
একটা কৈফিয়ৎ কাটবারও কেউ কোথাও নেই তো।
তোরাও খুব সুখ হ’বে দেখবি কি না। তোরা তো
এমন খাসা চেহারা রয়েছে, ভাল খেতে পরতে
পেলেই তুই এক জন লেডী বনে যাবি, চাই কি কোন
সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টার ভিরিঙ্গী সাহেবের নজরেও
লেগে যাবে। আমি দেখতে তেমন ভাল নই ব’লে
আমার ও সাধটি আর পুরো হলো না। ছ’বারই
আনকিন নেটিভ হজ্‌ব্যাণ্ড (নোংরা দেশী স্বামী)
জুটলো।”

গভীর স্তম্ভার আবার নীলিমার বুক ভরিয়া উঠিল,
ফিরিঙ্গী সাহেবকে বিবাহ করিতে নাকি আবার
বঙ্গালীর মেয়ে কখন পারে? স্ত্রী হউক সে
সিভিলিয়ান, হউক সে ব্যারিষ্টার, হউক সে লার্ড
সাহেব। তার চেয়ে গরীব হিন্দু—নীলিমার মনটা
গুটাইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু? হিন্দুকে
বিবাহ করিলে যা হয়, সে তো সে চিরজীবন ধরিয়াই
দেখিতেছে! সে যদি খুঁটান হয়, বিবাহ সে তাহার
মত দেশীয় খুঁটানকেই করিবে, তাহাদের মধ্যে কি
কোন উপযুক্ত রূপ-গুণবান্ পাত্র নাই? আর সে
বিবাহ তো আর কাহারও স্বেচ্ছাচারের জবরদস্তিতে
হইবে না, সে স্বয়ং নির্বাচন করিয়াই তো তখন পতি
বাছিয়া লইতে পারিবে। তবে আর তাহার এত
ভয়ভাবনা কিসের? নীলিমা হাঁপ কেলিয়া বাঁচিল।

নীলিমার মা মেয়ের মনের এত বড় পরিবর্তনটা
ধারণা করিতে না পারিলেও তাহার বাহ্যিক একটা
বিশেষ বদল হওয়া লক্ষ্য করিলেন। সে যেন পূর্বের
মত তাঁহার কাছে মন খুলিয়া আর কথা কহে না,

চুপচাপ গভীর হইয়া থাকে। পূর্বে তাঁহার গৃহকার্যের যেটুকু সাহায্য স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই করিত, এমন কি, কত সময় তাঁহার নিষেধ পর্যন্ত মানিত না, এখন সে সবই পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি, কত সময় বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, এমনই গভীর অনমনস্কতায় সে ডুবিয়া থাকে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে, বই লইয়াই—কোন একটা কোণের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া থাকে, স্কুলের সময় আসিলে ছুটাছুটি আসিয়া নাকে মুখে ছুটি জাত গুঁজিয়া ছুট দেয়। স্বর্ণলতা মেয়ের সামনে নিঃশব্দে থাকেন, আড়ালে তাঁহার বুক ঠেলিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসে। মেয়ের মনে যে একটা বিরাত চিন্তা ও বেদনা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সেটা যে তাঁহাদের প্রতি অভিমান-প্রসূত, এটুকু তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিলেই বা তাঁহার উপায় কি? চিরদিনের অত্যাচারপীড়নে তাঁহার সকল মনোবৃত্তিই যে মূর্ছাবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পক্ষে তাই এটুকুও যে একান্ত অপ্রতিবিদ্যে। তাঁহার জীবনের শেষ শান্তি ঐ মেয়ের সহানুভূতিটুকু; তা' সেটুকুও যে তিনি এবার হারাইতে বসিয়াছেন। সে ক্ষতি তাঁহার মনে বিষম হইয়া বাজিলেও বাহিরে তাহা লইয়া তাঁহার কোনই অভিযোগ উপস্থিত করার আগ্রহ বা অস্থিরতা দেখা দিল না। দিন শুধু গতায়ত করিতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সেবারে গ্রামের বন্ধে বেলা ১১টার ডাউন পঞ্জাব স্ট্রোলে নামিয়া দুইটি সুদর্শন তরুণ পুরুষ একটা ভাড়া গাড়ী করিয়া অমুকুলচন্দ্রের জীর্ণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জন দীর্ঘায়তশরীর, বলিষ্ঠ, উজ্জলতর গোরান্দ ও স্বভাবচঞ্চল। সে ছেলে গাড়ীখানা আসিবার পূর্বক্ষণেই লক্ষ্য দিয়া নামিয়া পড়িল ও তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ত অপেক্ষামাত্র না করিয়াই ছুটাছুটি গিয়া রুদ্ধ দ্বারের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সবল হস্তের আকর্ষণে মরিচাধরা পুরাতন কজা যখন খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তেমনই সময় ভিতর হইতে কে এক জন অতি সঙ্কুচিত ধীর হস্তে দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে ভিতরের দিকেই সরিয়া দাঁড়াইল।

মে.(খ)—১

ততক্ষণে দ্বিতীয় আরোহীও গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছে এবং ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত সহচরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

প্রথমব্যক্তি দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া “এস হে সুনীল!”—বলিয়াই মুক্ত দ্বারের মধ্যে পা বাড়াইয়া দ্বারের পার্শ্বে সঙ্কুচিতা নীলিমাকে পলায়নোদ্ভীক দেখিয়া সোৎসাহকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “হাঃ, নীলিমণি বে! খিন আঙু রাগেড্‌ আজ এভার! (সেই রকমই গুঁটকি এবং তাকড়াপরা!)”

কথার ক্ষরে নীলিমা তাহার দাদাকে চিনিয়া সকৌতুকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিতমূর্ত্তি জ্যোষ্ঠের প্রতি চাহিতেই বিষয়ের আতিশয্যে তাহার মুখ দিয়া আর একটিও বাক্য ফুরণ হইল না। শুভেন্দুর হিম-গোর বর্ণ সহরের বন্ধ জল-বায়ুতে ও সুখস্বচ্ছন্দ্যের আতিশয্যে এবং সম্ভ্রপরিমার্জনে শতগুল ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত দেহে কোমলতা স্মৃর্ত হইয়াছে। তাহার উপর অসাধারণ বিলাসিতাপূর্ণ সাজসজ্জায় তাহাকে পূর্বের সেই খাটো ও ময়লা ধুতী পরা গা-খোলা গরীবের ছেলে বলিয়া চিনে কাহার সাধ্য। ময়ূরছাড়া কার্তিকটির মতই তাহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল।

“বিষয়ের প্রথম বেগ একটুখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে “কে? দাদা?” বলিয়া নীলিমা উহার পায়ের কাছে প্রণাম করিতে উত্তত হইতেই দ্বারের বাহিরে আর একটা জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল এবং আরও এক জন কেহ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জানিতে পারা গেল। তাহার মুখটার সবখানি দেখিতে না পাওয়া গেলেও সে-ও যে তাহার দাদার মতই এক জন তরুণ পুরুষ এবং সাজপোষাকে ও রূপেও প্রায় তাহার সমকক্ষ, সেটুকু সেই চকিতের দৃষ্টিতেই নীলিমা দেখিয়া লইয়াছিল। তাহার উত্তত প্রণাম-নিবেদন মধ্যপথেই বাধিয়া গেল এবং সে এই অপরিচিত নবীনীর আকস্মিক অভ্যুদয়ে থাকিবে কি পলাইয়া যাইবে, তাহা কোনমতেই স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে অশান্ত ও চঞ্চল হইয়াও স্রোতোজলবদ্ধ শৈবালখণ্ডের মতই আটকাইয়া রহিল।

ততক্ষণে শুভেন্দু বন্ধুর দিকে ফিরিয়া ডাকিয়া উঠিল, “এস না, সুনীল, নীলটিকে আবার তোমার

সমীহ কর্তে হবে না কি ? উঃ রে!—ওঃ, লগেজ-গুলো ? তাই ত!—তাই ত হে! কে নিয়ে যাবে ? এই নীলি! তোদের চাকর-টাকর কেউ আছে, বলতে পারিস্ ? এই ট্রাকফ্রাকগুলো বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় কে, বল ত ?”

দাদার কথা শুনিয়া ও তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া নীলিমার মনের মধ্যে সকৌতুক হাসির সঙ্গে একটু মায়াও হইল। শুধু দাদা থাকিলে সে হয়ত বলিয়া ফেলিত, “চাকর-বাকরের মধ্যে এক আমিই আছি, চল, আমিই না হয় নিয়ে যাই—” এবং সাধারণ্যায়ী সেগুলো বহিবার সহায়্যও সে দাদাকে অবিলম্বে করিতে আসিত ; কিন্তু দাদার সমভিব্যাহারী দ্বিতীয় লোকটিকে স্বরণ করিয়া সে তাহার কিছুই না করিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে চাকর-টাকর কেহ এ বাড়ীতে নাই। সঙ্গে সঙ্গেই বহু দিনের পরে সন্তঃসমাগত ভাইএর প্রতি তীব্র বিরক্তিতে তাহার মনটা পরিপূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিল— বাড়ীর সব হালচাল জানিয়া শুনিয়াও দাদা শুধু শুধু এ কি ছেলেমানুষী করিয়াছে!—এই বাড়ীতে আবার কোন ভদ্রলোককে কেহ সাধ করিয়াই ডাকিয়া আনে! এ দিকে শুভেন্দু আগাগোড়া যে ভয় করিয়া বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক ছুটিটার সুশীলকে ঠেকাইয়া আসিতেছিল, নিজ গৃহের যে দৈন্ত-দুর্দশা, কার্পণ্য সে প্রাণান্তেও তাহাকে দেখাইতে একবিন্দু ইচ্ছুক ছিল না, তাহার সে সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া এবার এই পথ দিয়া সপরিবার নাইনিতাল হইতে ফিরিবার সময় এই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই ভুবনবাবু যখন তাহাদের দুজনকেই এখানে নামিতে আদেশ দিলেন, তখন দু’একটা দুর্বল আপত্তি করিতে থাকিলেও জোর করিয়া ট্রেনে চাপিয়া থাকিয়া সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে শুভেন্দুর মত দুঃসাহসিকেরও সম্পূর্ণ সাহসে কুলায় নাই। ইহার উপর তাহার মনের মধ্যে আর একটা যে বিষয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটার সিদ্ধিলাভার্থ তাহার এখন ঐ লোকটিকে ঘোল আনার উপর সমস্ত রাখাই প্রয়োজন। এই সকল স্বার্থচিন্তা স্বরণে আনিয়া মনের উন্মাদ মনেই মারিয়া আরক্ত-গভীর মুখে প্রতিপালকের আদেশে সে পিতৃমাতৃদর্শনে প্রস্তুত হইয়া নামিয়াই পড়িল। তাহার পর সুশীল-কেও যখন তাহার সঙ্গে নামার আদেশ হইল, তখন তাহার মাথায় যেন কে মূগুর মারিয়াছে, এমনই ভাবে

চমকাইয়া সে প্রবল প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া পঞ্জাব মেলের হুইশেল গর্জিয়া উঠিয়াই তাহাতে গতিবেগ প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্রুট কেস দুইটা দড়াম করিয়া প্লাটফর্মে ফেলিয়া দিয়া সুশীলও এক লম্ফ নামিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টিতেই চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া ভাইয়ের অ্যাটাচীকেস বাহির করিয়া দিবার সময় বিনতার অপ্রসন্ন দৃষ্টি শুভেন্দুর ক্রোধস্কন্ধ নেত্রের উপর অজস্র করুণাধারা বর্ষণ করিয়া আসিল। নিজের আঁচলের পিনে আঁটা হলুদে গোলাপটাকে পিন খুলিয়া সে এমন ভাবে প্লাটফর্মে ফেলিয়া দিল, যেন সেটা নিজে নিজেই খসিয়া পড়িয়াছে। অনেকখানি ছুটিয়া আসিয়া সেটা সুশীল কুড়াইয়া লইতে উত্তত হইয়াছে, এমন সময় শুভেন্দুর কোন একটা কথা মাথায় ঢুকিয়া পড়াতে সে একলম্ফ আসিয়া সেটা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াই চাহিয়া দেখিল যে, বিসর্পিতগতি চলন্ত ট্রেনের কোন একটি জানালার মধ্য হইতে একটি অস্পষ্টপ্রায় মুখচ্ছবি এখনও সেই দিকেই স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। শুভেন্দু মনে মনে বলিল, “ভারি বেঁচে গেছি রে!”

যাহাই হউক, লগেজগুলোকে নিজেরাই ধরাধরি করিয়া কোনমতে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বর্ণলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতেই শুভেন্দু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, “হাউ ডু ইউ ডু মাদার— ওঃ, আই মীন মা! ভাল আছ ত?”

স্বর্ণলতার অতি বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখে বহুকাল পরে একটা আনন্দের স্মিতরশ্মি ক্রীড়া করিতেছিল, পশ্চিমাকাশের শেষ রক্তিম সান্ধ্যসুরতা ভেদ করিয়াও যেমন আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহার বহু দিন পরে পাওয়া এই সন্তান-মিলনের আনন্দ এতই প্রচুরভাবে তাঁহার চিরসংযত চিরসমাহিতব্য চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা ভাটাপড়া মরা নদীর বুকে আকস্মিক বজ্রার প্লাবনের মতই যেন কুলুকুলু রবে ভরিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সানন্দচিত্তে তিনি তাঁহার প্রায়-অপরিচিত ছেলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কষ্টে সুখের অশ্রু সংবরণ করিয়া লইলেন। পরক্ষণেই শুভেন্দুর পার্শ্ববর্তী তাঁহারই পদধূলি লইতে অবনততনু আর একটি শোভনমূর্তি তরুণের প্রতি তাঁহার মন দিতে হইল। মাতার বিষয়ে মুগ্ধ দৃষ্টির নীরব প্রস্রোতরে

শুভেন্দু উত্তর দিল, “ও সুশীল, ভুবনবীচুর ছেলে; তোমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে।” তার পর এ দিক ও দিক চাহিয়া ঘোর বিরক্তির সহিত সহসা বলিয়া উঠিল, “এই পাঁচ বছরে তোমাদের বাড়ীর পুরনো ‘ক্লগ’ সমস্তই ত দেখছি ঠিক বজায় আছে! দেখ, সুশীলকে যদি এককাপ চা-টা ক’রে দিতে পেরে ওঠে। আমাকেও দেবে অবশ্য সেই সঙ্গে দু’এক কাপ, সেটা বলাই বাহুল্য।”

স্বর্ণলতার শুক মুখ যে সজীবতাটুকু দেখা দিয়াছিল - সেটুকু মরুপলিলব্যং নিমিষে নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আন্তে আন্তে বলিলেন, “এখন তোমরা নাওয়া-খাওয়া ক’রে নিলে হ’ত না? বিকেলে তখন চা খেতে—”

শুভেন্দু অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “উহঁঃ, —সে হ’বে না। সে ভ-রী দেবী হবে। এক কাপ চা এখনই না খেলে শরীরের ‘মাজম্যাজানি’ কিছুতে ঘুচবে না। যাও দেখি, চট্ ক’রে, নীলিকেও বরং ডেকে নিয়ে যাও, শীগগির যাতে হয়, তাই করো। ওঃ, মাদার! বি এ শুড্ গাল!”

স্বর্ণলতা বিপন্নভাবে থাকিয়া পরশেষে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, “চা ত বাড়ীতে নেই, শুভু! বাজার থেকে ও বেলা আনিয়া রাখব’খন; তাই বলছিলাম, ছপুরবেলা এখন নাই বা চা খেলি, চান ক’রে নিয়ে—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে পড়িল, হাঁড়িতে তাঁহার নিজের ভাগের কয়টি মোটা চাউলের ভাত আছে, আধখানা আলুভাতে ও একটুখানি ভাজা-কলাইএর দালের সঙ্গে কয়ক খণ্ড পোঁপে সিদ্ধ মাত্র তরকারীর স্থানীয় হইয়া আছে। সেই জিনিস এই দুই বহুমূল্য দিক্কে পাজাবী ও চক্চকে পাম্পর পরা সুন্দরকান্তি যুগাপুরুষের—তা’ হউক সে নিজেরও ছেলে—কোলের সামনে ধরিয়া দিবার কথা মনে হইতেই স্বর্ণলতার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। জীবনে হয় ত এই প্রথম বারের জন্তই স্বর্ণলতার মন সম্পূর্ণভাবে নিজের কর্মকে তারস্বরে দিক্কার দিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, মেয়েমানুষ হইয়া যদি তাঁহার জন্ম না হইত, ছেলে যদি তাঁহার না জন্মিত, সে ছেলে যদি ধনী বন্ধুর সঙ্গে না আসিত! পরক্ষণেই আসন্ন বিপদের যথাসাধ্য প্রতিবিধানচেষ্টাও যে এই মুহূর্ত্তে করা অবশ্য প্রয়োজন, তাহা স্বর্ণলতার

আশায় ত্রস্ত হইয়া “তোমরা ওই বরে কাপড়-চোপড় ছাড়, বাবা, আমি রান্না চাপিয়ে দিই গে।”— বলিতে বলিতে যথাসাধ্য ক্ষতপদে তিনি চলিয়া গেলেন।

শুভেন্দু পশ্চাৎ হইতে চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ড্যান্ ইওর রান্না! রাখবে যা ছাই তা আমার জানাই আছে! চা যে দিতে পারবে না, সে আমি আগাগোড়াই জানতুম, এমন জায়গায়ও মানুষ মরতে আসে। কাকাবাবুর যেমন কাণ্ড!—”

প্রায় হতবুদ্ধি ও সঙ্কুচিত সুশীলের দিকে চাহিয়া সে বলিল, “তোমাকে শুকু আবার জোটালেন! আমার বলে ‘আপনি শুতে ঠাই পায় না শঙ্করাকে ডাকে,’ তাই হয়েছে! বাড়ীই যদি আমার বাড়ীর মত হ’বে, তবে আর এতকাল ধ’রে আমি পরের ছোয়ারে ধরা দিয়ে প’ড়ে আছি কেন?”

সুশীল এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ও তাহার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত ঘোর লজ্জাভিত্তভাবে মাতাপুত্রের মিলনকথা শুনিতেছিল এবং নিজেকেই ইহাদের এই বিপদবিড়ম্বনার হেতুভূত দেখিয়া অত্যন্তই লজ্জাক্ষুণ্ণ হইতেছিল। এখন স্বর্ণলতাকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া সে একটুখানি যেন শান্তিবোধ করিল এবং শুভেন্দুর একটুখানি কাছাকাছি সরিয়া আসিয়া বিব্রত স্বরে চুপি চুপি কহিয়া উঠিল, “কি করছো, শুভুদা! কাকীমাকে কেন অত ব্যস্ত করচো? আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি, এমন সময় কোথায় কি ব্যবস্থা ক’রে তুলবেন? একটা বেলা চা না হয়, না-ই বা খেলে! চুপ ক’রে যাও। এস কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক!”

বিরক্তি অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে শুভেন্দু সুশীলের এই কথার প্রত্যুত্তরে জবাব দিল, “যে বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ, ঠাণ্ডা এখানে হ’তেই হবে। গায়ের সবখানি রক্ত জমিয়ে বরফ ক’রে দিয়ে না ফিরতে হয়, এখন!—”

উপেক্ষার চাপাসুরে অসন্তোষের সহিত সুশীল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, “কি কর, শুভুদা! কাকীমার মনে কত কষ্ট হবে এ সব শুনে, তা কি তুমি একটুও ভেবে দেখচো না?”

শুভেন্দু তার অষ্ট্রেলিয়ান হাক্কা রেশমের টানা দেওয়া পাতলা পাজাবীতে লাগান চুপি বসান সোনার

বোতাম খুলিতে খুলিতে ক্র কুঁচকাইয়া তীব্র করিয়াই উত্তর দিল,—“দেখ, সোজা ও সত্য কথাই বলবো, তা’তে কা’র মনের মধ্যে গিয়ে সে কি হল ফোটাবে না ফোটাবে, তা’র জন্তে পাঁচ লাগিয়ে কথা কওয়া আমার কোষ্ঠীতে লিখিত নয়; তার জন্তে তোমরা কবি মানুষগা আছ, কথার কাব্য বানিয়ে হরকে নয়, রাতকে দিন তৈরী ক’রে তোল।—এই নীলি, একটু গরম জল এনে দে’ দেখি, দাড়ীটা কামিয়ে নিই।”

বিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের ছেলে যখন ঘরের বাহিরে গিয়া পরের মধ্যে পরিণত হয়, তখন সে যেমন অনায়াসে ও অতিমাত্রায় পর হইয়া যায়, সত্যকার পরও ঠিক ততখানি পর হইতে কুণ্ডা বোধ করে, তাই এই দারিদ্র্যপূর্ণ এবং কার্পণ্য কঠোর গ্রন্থালীর সহস্র অভাবের অভিযোগে ঘরের ছেলে শুভেন্দুর সুগঠিত নাসা যতই অধিক উর্দ্ধ উঠিয়া থাকিল, পরের ছেলে সুশীলের লজ্জাবিপন্নতা ততই অধিক বর্দ্ধিত করিয়া তাহার মনকে একেবারে যেন এই নির্বাক ও অসহায় সংসারের মধ্যবর্তী করিয়া টানিয়া লইতে লাগিল। বন্ধুর ক্রটি সে যে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া শোধরাইয়া লইবে, কি করিয়া কোন্ কথা বলিয়া এই ছুটি নিকরপায়া নারীর একান্ত অসহায় অবস্থার অপরিদ্রা লজ্জা-বেদনা প্রশমিত করিয়া দিবে, ইহা যেন সে দিশাহারা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইল এবং ইহার জন্ত তাহার স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী সংযত স্বভাবেরও সময় সময় ব্যতিক্রম করিয়া নিজেকে সে নির্দয়ভাবেই মুখর ও চঞ্চল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শুভেন্দু যখনই বিলাসবস্তুর অভাবে একান্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়া মাতাকে অল্পযোগ ও পিতার উদ্দেশ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে, সুশীলকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে এতদূত্বকেই যথাসাধ্য সমর্থন করিয়া জানাইয়া দিতে হয় যে, শুভেন্দুর মাতার অল্পপায়তায় এবং পিতার অক্ষমতা বা কপণতায় তাহার পক্ষে কিছুমাত্রই অসুবিধা ঘটিতে পারে নাই।

শুভেন্দুর পিতা যথাকালে বাটী ফিরিয়া এই শুভদর্শন ওরূপ দুইটিকে দেখিয়াই অকস্মাৎ বাতাহত

কদলীকাণ্ডের মত প্রায় পতনোন্মুখ হইলেন। প্রায় সন্ধ্যার স্বল্পালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, “কে গা তোমরা? আমার বাড়ীতে কিসের মতলবে এসে ঢুকেছ? এটা যে অতিথিশালা নয়, তা বোধ করি তোমরা টের পাও নি? আচ্ছা, এখন কষ্ট ক’রে নিজের নিজের পথ দেখে নাও দেখি!”

নীলিমা সেইমাত্র মাতাপুত্রীর সমবেত চেষ্টা-যত্নে সংগ্রহ করা দু’ বাটি গরম চায়ের সঙ্গে সামান্য একটু আটার মোহনভোগ দুখানি কাঁসার রেকাবে লইয়া অতিথিব্যকে দিতে আসিতেছিল, বাপের গলার আওয়াজে তাহার হাত কাঁপিয়া একটা বাটির গরম চা ঝট্টনিকটা চলুকিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িয়া গেল। সে সেইখানে একটু আড়ষ্ট ও গতিহারা হইয়া থাকিয়া তাহার পর সাহসসংগ্রহ-পূর্বক একটু উত্তেজিত ক্রতপদে অগ্রসর হইতে গিয়াই গুনিতে পাইল, তাহার দাদা বিরক্তকণ্ঠে বলিতেছে, “আমি শুভেন্দু। কাকাবাবু আমার একবার এখানে দেখা ক’রে যেতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, কালই খুবই সম্ভব আমরা ফিরে যাব। এটি কাকাবাবুর ছেলে।”

নীলিমা নিজের গতি স্থির করিয়া দেখিল, সুশীল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার বাপের সেই ছেঁড়া চটিপরা ধূল-ধূসরিত ফাটাপায়ের ধূলা সযত্নে হাত দিয়া তুলিয়া লইল এবং সবিনয় মিষ্টমুখে কহিয়া উঠিল, “জ্যেঠামশাই! আমার নাম সুশীল। বাবা আমাদের আপনার কাছে ক’দিনের জন্ত পাঠিয়ে দিলেন।”

“হাঁ, তাই বলো, তোমরা ভুবনের কাছ থেকে আসছো! বহোৎ আচ্ছা! ভুবন নিশ্চয় ভাল আছে? যার এত ধনদৌলৎ, সে ভাল না থেকে কবুবে কি! তাহার পর? তোমরা—বড়মানুষের ছেলেরা,—তোমরা এই গরীবের গরীবখানায় রাত কাটাতে কেমন ক’রে? পারবে ত? আর না পেরেই বা আজকের রাতে যাবে কোথায়? কোন গতিকে চোখুতান বুজ একটা রাত্তির বই তো নয়, চালিয়ে নিতেই হবে। কি বল হে—সুশীল না সুশীল বুঝি? কি নাম তোমার বলে?”

এই অপ্রচল্ল সত্য স্বীকারের পরিবর্তে সুশীল নিতান্ত লজ্জাবিজড়িত স্বিতমুখে উত্তর করিল, “আজ্ঞে, আমার নাম সুশীল।”

স্বভাবসিদ্ধ ঔষাধ্যাত্মক নীরসস্বরে অমুকুলচন্দ্র কহিলেন, “তা সুনীলই হোক, আর সুশীলই হোক, ও একই কথা। আজকালকার দিনের ছেলে যত ‘সু’ হয়, সে আমার খুব জানাই আছে, তবে ‘নীল’ আর ‘শীল’ নিয়ে যতটুকু তফাৎ। তা হ্যাঁ, বলছিলুম কি, একটা রাত্রির তোমাদের এইখানেই তা হ’লে চোখ-কান বুজ কাটাতেই হচ্ছে, তা হোক! কালকের ভোরের প্যাসেঞ্জারটায় তোমরা বেরুলে পরশু বেলা সাড়ে তিনটেয় তোমাদিগে হাবড়ার ইস্টেসনে নামিয়ে দেবে। কোন অসুবিধাই হবে না। সেইটেতেই তোমরা যেও। আমি যদি কখন বাড়ী যাই তো ওট্টেতেই যাই, তাড়াও কতকটা সস্তা হয়।”

এই কথা বলিয়া যেন একটা খুব মস্ত বড় অর্থ-নৈতিক সমস্যার সহিত বিশেষ কোন জটিলতর সমস্যার সমাধান করিয়া দিগছেন, এমনই প্রদর্শন হইয়া উঠিয়া তিনি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ বলিলেন, “কিন্তু কল্কেতার ছেলেদের শুনেছি বেলা চটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না, সেইটে হলেই তো সব মাটি করবে! তা আমি আর আমার গিন্নী আমরা খুব ভোরেই উঠি, আমরা তোমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবো’খন। অত সকালে তো আর মুখে কিছু দিতে মন সরবে না, চট্ ক’রে বেরিয়ে পড়লে, অ’না’সে সাড়ে পাঁচটার প্যাসেঞ্জারটা ধ’রে ফেলতে পারবে। হাঃ, তাহার পর সুশীল! তোমাদের বাবার ব্যবসা বোধ করি খুবই ভালই চলছে? কতটি টাকা ক’রে মাস মাস জমাতে পারছেন বল তো? কি গো, কুমারী নাইটিঙ্গেল কি নিয়ে এলেন? অ্যা! কি ও বাটিতে? ছুবাটি ও কি আনা হলো? আবার রেকার্ডে অতখানি ক’রে হালুগা এনেছিস কেন? হাঃ! তোর শুষ্ঠীর পিণ্ডি! কল্কেতার ছেলে ওরা, ওরা নাকি ওই হালুগার ভাল ছোটো গিলতে পারবে? তোর মতন কি ওদের রাফুসে কিধে! ওরা হাওয়া ঝেয়ে থাকে, ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়া খায়!”

ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়া খাইয়া সুধামান্দ্য করে কি না, বলা যায় না; তবে এ বাড়ীতে নাকি উহার কোন পাঠই ছিল না বলিয়াই না কি? সুধা এ দুই জন তরুণ পুরুষেরই অল্পবিস্তর পাইয়াছিল; কিন্তু গৃহস্থামীর মুখে নিজেদের ঐ প্রকার অনৈসর্গিক

আহার্যের ব্যবস্থা শুনিয়া শুভেন্দু ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া নীলিমার দত্ত চায়ের বাটিটা মাত্র তুলিয়া লইয়া হাতের ধাক্কা দিয়া রেকাবখানা ঠেলিয়া গভীর চাপাসুরে বলিল, “নিয়ে যা—”

সুশীলও তখন হইতেই ঠিক উহার অনুকরণ করিতে মনে মনে ইচ্ছুক হইল ও উৎসুক হইয়া উঠিল; কিন্তু কার্যকালে ঠিক ওই রকমটাই তাহার ভাগ্যে ঘটয়া উঠিল না।

নীলিমা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন দেখিল, তাহার পিতৃকবল হইতে ইহাদের উদ্ধারের আশা সুদূরপর্যন্ত, তখন সেই বহুলায়সে সংগৃহীত চায়ের হৃদঙ্গা ফেনের সহিত একীভূত হয় দেখিয়া অগত্যাই সে তাহার পিতৃসান্নিধ্যকে আর সম্মান দিতে সাহস করিল না। ফলে সে গৃহের কদম্বের দায়ে প্রায় অর্দ্ধভুক্ত শুভেন্দুকে এবারও অভুক্ত থাকিতে হইল দেখিয়া তাহার সোদরা-স্নেহ আহত ও বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়াদান করিল এবং কেন অধিকতর চেষ্টা দ্বারা এই সামান্য সংগ্রহটুকু একটু পূর্বে করিয়া তুলিতে পারে নাই, ইহার জন্ত সে নিজেকে মনে মনে বারংবার ধিকার দিয়া অপর জনের দিকে সমধিক সঙ্কুচিতপদে ও উদ্বেলিতবক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দিবসান্তের সেই শেষ ধূসররশ্মিরেখায় সে মুখের পীড়িত, তৃষিত, বাথিত দৃষ্টি সুশীলের সুপ্রচুর সহানুভূতিতে ভরা পরিপূর্ণ চিত্তকে অতি আগ্রহে আলোড়িত ও অভিভূত করিয়া তুলিল। সে কিছুক্ষণ সহানুভূতিপূর্ণ বিষয়নত্রে সেই বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া রেকাবওক্ত চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল এবং অমুকুলচন্দ্রের বিরক্তি-অগ্রচ্ছন্ন হিংসাকূটিল মুখের দিকে উৎফুল্ল চোখ তুলিয়া স্নিগ্ধহাস্তে কহিয়া উঠিল, “আচ্ছা, আপনি ব’লে দেখুন জ্যোতামশাই, কল্কেতার ছেলেরা শুধু ইলেকট্রিক পাখার হাওয়াই খায় না, তাল তালি মোহনভোগও অনায়াসে ঝেয়ে ফেলতে পারে। শুভদা, তুমি যদি আর না উণ্টে দাবী আনো, তা হ’লে ছকুম ক’রে দাও, তোমার ভাগটাও একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কল্কেতার ছেলেদের কলঙ্ক মোচন ক’রে জ্যোতামশাইএর কাছে প্রাইজ পেয়ে যাই।”—এই বলিয়া সুশীল হাসিয়া উঠিল এবং হাশ্বাত্তোৎফুল্ল মুখ অকুণ্ঠিতভাবে তুলিয়া নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“যদি আপত্তি না থাকে তো ও রেকাবখানাও

আমায় নামিয়ে দাও, জ্যোতামশাইএর এ রকম ভুল রেখে দিয়ে যাওয়া তো কোনমতেই চলবে না।”

নীলিমার সমস্ত মুখ রাজা হইয়া উঠিল, উহা আনন্দে কি সঙ্কোচে, তাহা সে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল, এত দিন পরে যেন তাহার জীবন এতটুকু একটু সার্থক হইতে পারিল, এক দিনের মতনও একটুখানি যেন কাজে লাগিল! এমন সুরে, এমন শব্দায়, এমনভাবে আর কেহ, আর কখন আর কোন কাজের জন্তই যেন তাহাকে আহ্বান করে নাই! সে লজ্জিত, জড়িত ও আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া তাড়াতাড়ি সবটুকু খাবার তাহার পাতের উপর ফেলিয়া দিল, ঠিক সামনা-সামনি পিতার আকৃষ্টকুটিল মুখের ছবি তীব্র ইচ্ছিতে কিছু বাঁচাইয়া দিবার কঠিন সঙ্কেত জানাইতেছিল, সে দিকে সে বারেকমাত্র চাহিয়াও দেখিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যন্ত্রের মধ্যে সুর ভরা থাকিলেও যন্ত্রীর হাতের স্পর্শ ব্যতীত সে যেমন নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, আবার উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতের এতটুকু একটুখানি পরশ লাভে তার সেই নীরস কণ্ঠের কণ্ঠেরতা এক নিমেষেই যেমন ঠেলিয়া দিয়া রসের স্রোতে সুরের ফোয়ারা উথলিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সে দিন সুনীলের সেই এতটুকু একটু মিষ্ট হাসি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও ওই কয়েকটি স্নিগ্ধ বাণীর অচিন্ স্পর্শেই নীলিমার বন্ধোবিলীন সুপ্ৰশান্ত সুরের ধারা উথলিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের তারে ওই স্পর্শটুকু যেন স্বাক্ষর দিয়া তারে তারে সুরবাহারের অসংখ্য সুর বাজাইয়া তুলিল। তাহার বুকের মরাগাঙ্গে জোয়ারের স্রোতে বজ্রার বেগ বহাইয়া তুলিল। তাহার চির-অনাদৃত ভিখারিণীর সঙ্কোচশঙ্কিত মুদিত অন্তরে রাজরাণীর ঐশ্বর্যভারের সমাবেশ করিয়া দিল। তাহার সহসা সে দিনেই প্রথম মনে পড়িল যে, তাহার বয়স এখন আর বালিকার বয়স নাই: তাহার অর্দ্ধপরিণত নবযৌবনোদ্ভাসিত তনু দেহ আজ এই অর্দ্ধাবরণের ফাঁকে ফাঁকে তাহার চিত্তকে নিরতিশয় লজ্জাবিপন্নতায় বিব্রত করিয়া তুলিল, নিজের পরিধানের মলিন ও পুরাতন বস্ত্র আজ তাহাকে দ্বিধা-ধিকারে ভরাইয়া

তুলিল। নিজের চিরদিনের দৈতে, ততোধিক কার্পণ্যে বিরস নীরস গৃহস্থালী তাহাকে আজ একান্ত পরিতপ্ত, আহত ও অসহিষ্ণু করিয়া ফেলিল। এই অপূর্বদর্শন সুখসেবিত তরুণযুগলকে তাহার এই একান্ত কুশ্রীতায় ভরা, দুঃখদারিদ্র্য এবং হৃদয়হীন গৃহস্থালীর মধ্যে কোথায় রাখিয়া কেমন করিয়া যে, সেবাপূজা করিয়া উঠিবে, সে কথা মনে করিয়া এই অসহায় তরুণীটির বুকের মধ্যে যেন লজ্জামখিত রক্তের স্রোত কলকল্লালে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। উঃ, গরীবের মেয়ে হওয়ার এত বিড়ম্বনা! তাহার উপর সে গরীব যদি আবার রূপণ, দুঃখ এবং হৃদয়হার্য হয়।

স্বর্ণলতার মনের বেলায় যে এ বিপ্লবাব্যাহতের ঢেউ আঘাত করিয়া যায় নাই, তা নয়। কিন্তু ওই চির-অসহায় নারীর পঞ্জর, জমাট বুকের মধ্যে সকল আশাই যেন চিরসমাহিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে যে আঘাত পড়ে, তাহাতে আহতকে তো প্রত্যাখ্যাত করায় না, মাত্র অবরুদ্ধ বেদনার গুরুভারে অবসন্ন মনটাকে মুচ্ছাতুর করিয়া ফেলে। তাই মনের মধ্যে সকল বাসনা-কামনাকেই সমাহিত করিয়া ফেলিয়া তিনি তাঁহার চির-প্রথামতই সেই মোটা আটার রুটি, মসুরির দাল এবং বিলাতী কুমড়ার ছক্কা রাখিতে এই খাতি পরিবেশন করিবার সময়কার নিজের ব্যথা ও ছেলের মুখের অপ্রসন্ন মন্তব্য মনে করিয়া লজ্জাপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুর সুখসেবিত সুন্দর মুষ্টি মনে পড়িয়া তাঁহার সকল দুঃখের উপর পরম সুখের শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছিল। চিরদুঃখের এত বড় সাহসনা—আজ যাহার দানে—তাঁহার পায়ের তলায় মাথা সহস্রবারই লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল নীলিমা। অমনই স্বর্ণলতার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা গভীর দার্বনিশ্বাস উথিত হইল। আজ তাঁহার পুঞ্জৈশ্বর্যের পাশাপাশি এই মেয়ের দুর্দশাটা তাঁহার কাছেও যেন অত্যন্তই সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে! তাহার উপর শুভেন্দুর সমভিব্যাহারী সুনীলের স্নিগ্ধ সৌম্য শ্রীটুকু তাঁহার মুক্ত মনের উপর কি মায়াজালই কে বিস্তৃত করিয়াছে, নে শুধু সেই জানে, যে অভাগা বাতুল গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর স্বর্ভাষ মানবের সহিত সংস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! স্বর্ণলতার বিমোহিত চিত্ত অন্তরের অত্যন্ত গোপন গুহার স্তম্ভপথে এমন একটা অসম্ভব অসঙ্গত

বাসনাও উচ্ছ্বিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার একটু-খানি বহিঃপ্রকাশে সমস্ত মানবজগতে এমন একটা হাশ্বতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া যাইবে, যাহার পর ওই চিরবিড়ম্বিত দুঃখসহিষ্ণু নারীর সকল সহ্য সীমা ছাড়াইয়া কোথায় যে ছুটিয়া যাইবে, তার কোন হিসাব থাকিবে না। এবারও নীলিমার গৃহপ্রবেশে সেই পূর্বতন ছুরাকাজ্জ্বার চকিতোদয়ে তাই স্বর্ণলতার নিস্তেজ বক্ষ হইতে অত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। আহা, সূর্য্যলের হাতে যদি নীলি-মাকে দেওয়া চলিত!

নীলিমা আসিয়া কাঠের 'কেঠো'র কোটা কুটনা-গুলার উপর বারেক অবজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, উনানের উপর চাপানো ফুটন্ত দালের হাঁড়িটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর মায়ের হাতে মাখামাখি জলঢালা আটাগুলার উপর চোখ পড়িতেই জলিয়া বিরক্তিকঠোর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মা, আজও ঠিক তোমার সেই মাক্কাতাকালের বন্দোবস্ত! দাদাকে তা হ'লে তোমরা নির্যাতনই উপোস করিয়ে মারবে ঠিক দিয়ে রেখেছ! ও তো তোমার ওই পেটেন্টলেদারের তৈরী কুটি দাঁতে কাটতে পেরে উঠবে না!" বলিতে বলিতে এতক্ষণকার সকল অভিযোগের বেদনা এই উপায়হীনা জননীর উপরেই উত্তত হইয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। বাপের কানে পৌঁছিতে পারার সকল সম্ভাবনার ভীতি তাহার মন হইতে মুছিয়া দিয়া তাহার কণ্ঠকে প্রায় সপ্তমে চড়াইয়া তুলিল। সে বলিতে লাগিল।—

"অদ্ভুত মানুষ তোমরা! এত দিন পরে ছেলে ঘরে ফিরলো, কোথায় তাকে যত্নে আদরে ভরিয়ে দেবে, দুদিন ঘরে রাখবার জন্ত চেষ্টা করবে, তা না, না খেতে দিয়ে, দুঃখ দিয়ে দূর দূর ক'রে এক রকম তাড়িয়ে দিচ্ছে! ধন্য তোমরা! কিন্তু তা' না ক'রে ওকে যদি হাতে রাখতে, ভবিষ্যতে তোমাদেরই ভাল হতো।—ও তো মানুষ হয়ে উঠেছে। দেখছো না কি, তোমাদের হতশ্রদ্ধায় কুকুরের মতন দোরদোর ঘুরে বেড়ান সে দাদা আর নেই!"

অসহায় জননীর আর্তি করণ ছুটি চোখের উপর চোখ পড়িতেই অতি সহসা সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। আনায়বদ্ধ নিক্রপায় জীব-জননীর ব্যথাকাতর মুক দৃষ্টির মতই তাহাতেও সেই একই

আশাহীনতা সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাকে সেই অভিযোগহীন বেদনা যেন কণা হহয় বজ্রবলে আঘাত করিল। নিজের ধৈর্য্যচ্যুতির মূলে যত বড় অবिवেচনাই থাক, তাহার নিজের পক্ষ হইতেও মায়ের সম্বন্ধে যে তাহার চাইতে কম কিছু করা হয় নাই, তাহা মনে পড়িতে মন সমধিক আহত হইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। মাকে এ সব কথা বলা যে একেবারেই মিথ্যা এবং মা'র পক্ষ হইতে এ অবिवেচনার প্রতিকার হওয়া স্বর্গের সিঁড়ি হওয়ার মতই যে অসম্ভব, ইহা ত জলের মতই সহজসিদ্ধ জানা কথা। ক্ষণকাল অন্তর্গূঢ় অশক্ত কোম্পিত হইয়া থাকিয়া নীলিমা সহসা কি ভাবিয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্থামীর রাত্রির খাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের শয়নকাল ঠিক সন্ধ্যা আটটা; ইহার ব্যতিক্রম কোন দিন হয় না, সৌভাগ্যক্রমে তাহা আজও হয় নাই। রান্নাঘরে একবার চৌকিদারী করিয়া আসিয়া তিনি দৃষ্টান্তে আহার করিয়া লইয়া শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রাকালে স্ত্রী ও কন্যাকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "ওগো দেখ, তোমরাও আর অনর্থক রাত জেগে অস্থবিস্থ ক'রে প'ড়ো না, ওদের দু'খানা খাইয়ে দিয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে সময়মতন শুয়ে প'ড়ো। ভোর না হ'তে আবার ওদের ইষ্টিশানে পৌঁছে আসতে হবে। অত ভোরে ত কিছু মুখে দিতে পারবে না, ও তখন ট্রেনে ব'সেই কিনে নিয়ে খাবে।"

সন্ধ্যার অপরিষ্কৃত অন্ধকারের ছায়ায় দোতলার ছোট ছাতের আলিসার গারে হেলান দিয়া নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আকাশভরা নক্ষত্রগুলি প্রাণপণে জলিয়াও এই নিরালোক বাড়ীটাকে এতটুকু উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু ওই অসংখ্য নক্ষত্রসমষ্টির মধ্যে একতমেরই মত অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রতম আলোকসম্পাতে আজ নীলিমার চিত্তটির অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া শ্মিতশব্দ রজতালোকের একটি স্নিগ্ধধারা তাহার এই নিরালোক বিজন মনের উপরে অতি ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে বাতাসে সন্মোহনশক্তির

অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

উপাদানই কোথাও ছড়ান ছিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও একান্তই প্রতিকূল। তথাপি এ কি গোলাপী নেশার রঙ্গীন আবেশে চোখের পাতা তাহার জড়াইয়া আসিতেছে, মনের তারে কোন অজানা স্বরের একান্ত নবীন রাগিণী অনর্থক কেবলই এ কি ঝঙ্কত হইতে চায়? মায়ের উপর অভিমান ও পিতার উদ্দেশ্যে অপরিমিত ক্রোধ লইয়া সে এখানে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার,—অতিথিদের ভোজনব্যাপারে নিরপেক্ষ রাখিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই কোথা হইতে কোন অজ্ঞাত চিত্তার অনাহুত আগমনে কোন সময়ে সে সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ পারিবারিক লজ্জায় লজ্জাকর হয় আন্দোলন যে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার জানাও ছিল না। সহসা অদূরবর্তী শুভেন্দুর চাপাকণ্ঠের আহ্বানে সমংগ হইয়া সে জানিতে পাবিল, তাহার অন্তরের সকল বিদ্রোহই সহসাই নিবিয়া গিয়াছে এবং সেই নির্বাপিতশিখ অগ্নিজ্বালার স্থানে সুশীতল অজস্র সুধাধারা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই স্পর্শস্থলে দাঁহ ত জুড়াইয়া গিয়াছেই, পরন্তু সেই অপরিমেয় অমৃতস্পর্শে সমস্ত মনপ্রাণই তাহার সুধাস্রোতে প্রাবিত হইতেছিল। পুলককম্পিত চরণে উঠিয়া আসিয়া শব্দানুসরণে সে ডাকিল, “দাদা!”

শুভেন্দু কাছে আসিল। রাগে হুংখে সে গর্জিতেছিল। নীলিমাকে দেখিতে পাইয়াই প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে অশ্রুত তর্জনে বলিয়া উঠিল, “কি ঝকঝকীয় কাজই আমি করেছি, এই তোমাদের বাড়ী এসে! তা’ আমার ত মোটেই আসবার ইচ্ছা ছিল না, তা’তে আবার ওই ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে ক’রে। কাকাবাবুর ঐ যে কেমন একটা ছোটলোকী গোঁয়ারতুমি, যা’ ধরবে তা’ না করিয়ে ছাড়বে না। বলি কি না, মা-বাপকে একবার দেখে আসা উচিত! আরে, বাপু, মা-বাপ কি আমার মা-বাপের মতন যে, তাদের দেখে আসবো? তা হ’লে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছি কেন? এখন ওই সত্ত্ব অপমানের হাত থেকে কেমন ক’রে বাঁচা যায়, তাই ভেবে আমার ত মাথা ঘুরচে। কি করি বল দেখি?”

নীলিমার মুখ অন্তরের স্বপ্নবিত্তের সুখস্রোত বাস্তবের কঠিন ও তপ্ত স্পর্শে আহত ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুখ তাহার একটুখানি হইয়া

জুকাইয়া গেল। কতকটা বুঝিয়া, কতকটা না বুঝিয়া সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে?”

শুভেন্দু বিরক্তিতীক্ষকণ্ঠে কহিল, “কি হয়েছে, জানিস্ নে না কি? তাকামী করিস কেন? আমি না হয় উচ্ছন্নই গেলুম, একটা রাতের মতন ত থাকবার হুকুম হয়েছে, সেটা না হয় স্নেহ জ্বল গিলেই কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওই যে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে ঝকঝকীয় ক’রে এনেছি, ওর পাতে ওই চোকরের কুটি আর মুহুরীর দাল ঢালতে তোদের না হয় ‘হায়া’ লজ্জা নেই, তোরা না হয় পারবি; আমি কেমন ক’রে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো ব’লে দে দেখি? আরে ছ্যাঃ, এদের সান্নিধ্যে আবার মানুষ আসে? না কাউকে আনে? ওদের হিন্দুস্থানী দরওয়ানগুলো কুটি ঐ রকমই পাকায় বটে, কিন্তু দালে তাদের ঘি পড়ে কত! আর সে পানপানে মুহুর দালও নয়।

ঋণকাল নীরব থাকিয়া নীলিমার দিক হইতে কোন প্রকার সাড়াশব্দটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া জলন্ত হইয়া উঠিয়া শুভেন্দু গলা চড়াইয়া কঁকশ-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “গিন্নীঠাকুরুণকে আচ্ছা ক’রে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তুমি ঠাকুরুণও জেনে রাখ, তোমাদের বাড়ীর ও ছাই-পিণ্ডি সুশীলের পাতে আমি দিতে দেবো না, তার চাইতে তাকে নিয়ে আমি একুনি বিদায় হচ্ছি।”

এই বলিয়া রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে শুভেন্দু চলিয়া যায়; নীলিমা হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, “আচ্ছা, একটুখানি দেবী কর তুমি, একুনি আমি সব জোগাড় ক’রে এনে লুচি-টুচি ক’রে দিচ্ছি। কিন্তু তাতে তুমি কতটা অন্ততঃ দেবী হবে।”

শুভেন্দুও অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া নরমস্বরে কহিল, “আহা, তা’ যদি পারিস রে! কি বলবো তোকে? দেখ দেখি বাবার কি রকম অন্তায়, সাধ ক’রে কি আর ছুটি চক্রে প’ড়ে ওকে দেখতে পারিনে! বারমাস ওদের থাকি, আর সে কি রাজভোগে থাওয়া, তোদের চোন্দ পুরুষও কখন অমন থাওয়া খায়নি! তা একটা দিনের জন্য এসেছে, তা’কে এতটুকু একটু যত্ন ক’রে খেতে দিতে পারলে না! লজ্জায় ম’রে যেতে ইচ্ছে করে যে!”

শুভেন্দু আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। নীলিমা আর সে সব কথা কানে না তুলিয়া নিজের কার্যে কৃতকল্প হইয়া চলিয়া গেল। রান্নাঘরে বাঁধা আহাৰ্য্য সামনে করিয়া স্বর্ণলতা হেঁটমুখে বসিয়া বোধ করি বা নীরবে অশ্রুপাতই করিতেছিলেন। মেয়ের পায়ের শব্দে চকিত চক্ষুতে চাহিয়া দেখিয়া ঈর্ষ সঙ্কচিত হইলেন। সেও যে তাঁহাকে ভৎসনা করিতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধাই ছিল না।

কিন্তু রূঢ় ও কঠিন সন্তুষ্টাশ্রয়ের পরিবর্তে মেয়ে ডাকিল, “মা!”

তাহার গলার অতি নম্র ও অত্যন্ত বাথিত স্বরে জননী নিজের অন্তরের রাশি রাশি পুঞ্জীভূত অকথা বেদনাসিক্ত উখলিত হইয়া উঠিতে গেল। অতিশয় মর্ম্মভেদী বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, “মা?”

“তুমি উনোন নিবিও না, মা! আমি ভাল ময়দা, ঘি, হাঁসের ডিম, আলু সব বাগাকে দিয়ে আনিয়া দিচ্ছি। সেই সব দিয়ে দাদাদের খাবার ক’রে দিতেই হবে, তা হ’লে দাদা না খেয়ে একুনি চ’লে যাচ্ছে।”

স্বর্ণলতা তড়িৎস্পৃষ্টার মত চমকিয়া চাহিলেন, তাঁহার অবরুদ্ধ বক্ষ ঠেলিয়া ক্ষুধিত প্রাণের আর্ত স্বর ছুটিয়া বাহির হইল, “ও সব তুই কোথা পাবি মা? কোথা থেকে আন্বি?”

নীলিমা সঙ্কল্পদৃঢ় স্বরস্বরে সংক্ষেপে শুধু উত্তর করিল, “সে আমি আনাছি কি না, দেখো না! আমি একুনি আসছি।”

ঘণ্টা দুয়ের ভিতরেই আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়া গেলে প্রকল্প-স্মৃতমুখে নীলিমা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ইতোমধ্যে একটা চিরপরিত্যক্ত ঘরকে ঝাঁটপাট দিয়া একখানা তক্তপোষের উপর ময়লা তোষক ফর্সা চাদরে ঢাকা দিয়া সে শুভেন্দুদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া গিয়াছিল। একটি বহুদিনের পোর-সিলেনের বাতিদানীতে একটি বাতি কিনিয়া আনিয়া সে জালিয়া দিয়াছিল। শুভেন্দু সেইখানে শুইয়া ক্ষুধার জালায় জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে নিজের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীলের পিতার পর্য্যন্ত যুগপাত করিতেছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া নীলিমার কৃতকার্য্যতার উপরেও ভীষণ সন্দেহান হইয়া পড়িয়া উহাকে একান্ত-ভাবে গালি পাড়িতেছিল। অংশু ইহাও মনে মনে। সুনীল কয়েকবার কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিয়া বন্ধুর নিকট

ধমক খাওয়ায় নিকৃপায়ে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রান্নাঘরে স্বর্ণলতার নিকট উপস্থিত হইবার প্রবল লোভ হইতে থাকিলেও শুভেন্দুর মনের অত্যন্ত বিরক্ত অবস্থা দেখিয়া ভরসা করিয়া সে কথা সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। অথচ শুভেন্দুর এই আগ্রহহীন মাতৃমিলনের সকল ব্যর্থতাই তাহার মাতৃহীন চিত্তকে বিষয়ে ব্যথায় যেন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে ঐ দুঃখসহিষ্ণু দীনমুর্তি অভাগী নারীর জটিল জীবনযাত্রার চিত্র তাহার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ তরুণ চিত্তকে যেন মমতার মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সুনীলের অত্যন্ত আগ্রহ হইতে লাগিল, আহা, যদি সে ঐ বেদনাভারাতুর মেহবুভুকিত মাতৃহৃদয়কে নিজের ক্ষুধিত চিত্তের ভক্তিশ্রমে ভরাইয়া তুলিতে পারিত!

নীলিমার হাতে পূর্বে কতকগুলো কাচের চুড়ি থাকিত, এখন তাহাও ছিল না। মিশনের অনেক মেয়ে ও টীচারের অনুকরণে সে এখন শুধু হাতেই থাকে। বাজারের সব চেয়ে কম দামী বাজে চুড়ি ঘণা করিয়াই সে পরে না। নিজের আসার আগমনী জানাইবার কোন উপায় না থাকায় অগত্যা সেইখানে থাকিয়া সে ডাকিল, “দাদা!”

শুভেন্দুর বোধ করি একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, তাহার সাড়া না পাইয়া অগত্যা সুনীলের দিকে ফিরিয়া মুহূর্ত্তের জিজ্ঞাসা করিল, “মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খাবার এইখানে আনা হবে?”

সুনীল এই প্রশ্নে একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আগ্রহ উত্তেজিত কণ্ঠে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “সে কি, না না এখানে কেন? এই আমরা তাঁর কাছেই যাচ্ছি—শুভুদা! ও শুভুদা! কি বিপদ! ঘুম দিচ্চো নাকি? চল চল, খেয়ে আসা যাক।”

শুভেন্দু ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁচাঘুম ভাঙ্গার বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সামনেই নীলিমা-কে দেখিতে পাইয়া বিরক্তি-নীরসকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “হ্যালো! কি ব্যাপার বল ত? ছাই-পিণ্ডি কি দেবে, দিয়েই ফেল না কষ্ট ক’রে, আশায় আশায় আর কতক্ষণ রাখবে? রাত তো শেষ হয়ে এলো এ দিকে।”

শুভেন্দুর নিজের বোনের প্রতি এই শুষ্ক সন্তুষ্টাশ্রয়ে সুনীল যেন চোর হইয়া গেল। সে শুষ্ক মুখে উঠিয়া তাড়িতাড়ি শুভেন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল,

“উনি তো আমাদের কখন থেকেই ডাকাডাকি করছেন ; তোমারই যে ঘুম ভাঙে না।”

আহারে বসিয়া শুভেন্দু আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে নাই ত ? কলের ময়দার ধপধপে ফুলকো লুচি, পটল আলু ভাজা, হাঁসের ডিমের কালিয়া, কিস্মিসের চাটনি, সন্দেশ রসোগোল্লা, একথানা রেকাবে কয়েক টুকরা বোম্বাই আম। শুভেন্দু বিস্মিত উল্লাসে উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল, “হ্যালো ! এ বাড়ীতে কি কর্তা বদল হয়ে আমিই বাড়ীর মাসিক হয়েছি নাকি ? এ সব কোথা থেকে এলো ? তোর খুশ্চান স্কুলের টিচাররা কি তোকে আলাদীনের প্রদীপ দিয়েছে নাকি রে ? বাঃ বাঃ, খাসা মেয়ে তুই।”

স্বর্ণলতার প্রীতিপ্রসন্ন সজল চোখের নিক্ত দৃষ্টি গভীর স্নেহে নীলিমার আনত মুখের উপর নীরব আশীর্বাদের কিরণ বর্ষণ করিয়া আসিল। সে যে আজ এই আমন্দমিলনের দিনকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া মায়ের প্রাণকে এই একটি দিনের জন্তও সার্থকতার সুখে ভরিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার মূল্য যে এই চিরজুঃখিনীর কাছে কত বড়, তা অন্তর্যামী ভিন্ন জানিবে কে ? সুশীল সকল কথা না বুঝিলেও স্বর্ণলতার আনন্দমিত্ত মুর্তিখানি বিপুল আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিরীক্ষণ করিল ও তাহার পর তাঁহারই দৃষ্টির অনুসরণে অদূরবর্তিনী স্তরুস্থির পাষণ্মূর্তির মতই অচলা তরুণীর মুখের দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কেবল সেই আনন্দমিলনের সকলটুকু আনন্দের বাহিরে গভীর ভাবাক্রান্ত ও নিরানন্দ হইয়া রহিল নীলিমার অপরাধপীড়িত মন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজীর মধ্যে প্রেম সর্বত্রই থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অন্ততঃ তাহার একটা ভাগও থাকে। স্বর্ণলতাদের দাম্পত্য জীবনে আর যাই কিছু থাক না কেন, ইহার ভিতরে মিথ্যার কোন আবরণই ছিল না। বিগতপ্রায় যৌবনসীমায় পৌছিয়া কোন অতীত স্মৃতি আঁকড়িয়া ধরিবার জন্ত এই প্রৌঢ় দম্পতীর প্রাণের কোণেও বুঝি কখনও ব্যাকুলতাটুকু জাগে নাই। জী শুধু ঘরকণার যত্নস্বরূপই ব্যবহৃত হইয়া

অসিতেছিল। সহসা আজ নিঝুম স্তরু রজনীর ঠিক মধ্যমায়ে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অনেকক্ষণ বিনিদ্রাবস্থায় চিন্তার পরে কি যেন একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া অনুকূলচন্দ্র শয্যাভ্যাগ করিলেন। চিরদিনের পর অকস্মাৎ আজ গৃহিণীকে সচিবের পদ দিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। পাশের ঘরে স্বর্ণলতা নীলিমার সহিত গভীর নিদ্রামগ্ন। অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে ঘরের মধ্যে আসিয়া চাপাগলায় অনুকূল ডাকিলেন, “গিন্নি ! বলি ওগো ! একবার উঠে এস ত ?”

ঘুমের ঘোরে ধড়মড়িয়ে উঠিয়া বসিয়া অর্দ্ধ সন্দেশে স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ?”

“ওগো, আমি। বলি একবার এসেই না ; আমার এই বুকটায় কেমন একটা ব্যথা ধরলো, একটু হাত বুলিয়ে দাওসে’ দেখি।”

স্বর্ণলতা মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিলেন, ভাগ্যে ঘণ্টা দুই পূর্বে এই ব্যথার্টা ধরে নাই !

নিজের বিছানায় ফিরিয়াই অনুকূলচন্দ্রের ব্যথার সেবা করাইবার ইচ্ছাটা সহসা বদলাইয়া গেল। তিনি তখন অত্যন্ত চাপা গলায় মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিলেন, “দেখ, তোমার ওই আইবড় কার্তিক খেড়ে মেয়েটাকে পার করবার একবার এমন সুযোগ আর কখনও এ জন্মে পাবে না। ভুবন রায়ের ছেলোটাকে যদি হাত ক’রে ওর গলায় মেয়েটাকে গছাতে পার, তা’রই জন্তে কাল থেকে লেগে পড় দেখি। যেমন ক’রে হোক, এ কাজ তোমায় করতে হবে।”

এই প্রস্তাব অকস্মাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া স্বর্ণলতা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিলেন ও তাঁহার মুখ দিয়া আচম্কা বাহির হইয়া গেল—“আমার কপালে এত সুখ কি হবার ? সুশীল আমার জামাই হবেন !”

অনুকূল স্থিরসঙ্কল্পের স্বরে জবাব দিল, “কেন হবেন না ? অতবড় তৈরী মেয়ে রয়েছে, ছেলেও খোকাটি নয়। ছোটোকে খুব মেলা-মেশা করতে দাও, মেম সাহেবের নতন, তা’র পর নিজেই বিয়ে করতে চাইবে। সাহেবদের ত ওই রকমই হয়ে থাকে। ওতে দোষই বা কি ! রাজার দেখে না শিখে কার দেখে শিখবে ?”

স্বামীর চিরজীবনের সকল যুক্তি নির্বিচায়ে ও নির্বিবাদে পালন করাই স্বর্ণলতার অভ্যাস। তাহাতে

মন সাং দিক, আর নাই দিক, প্রতিবাদ তিনি কখন কোন কার্যেরই করেন না। কিন্তু আজিকার এই পরামর্শটি তাঁহার বেশ মনঃপূত হইলেও তিনি ইহাকে নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আশাহতভাবে ক্ষীণ প্রতিবাদে উত্তর করিলেন, “সুশীলের বাপ রয়েছে, সে কি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে পারে? তার চেয়ে ভুবন বাবুকে বলে হয় না যে যদিই তিনি দয়া করে ওকে নেন, তাঁর দয়ার তো আর শেষ নেই যদিই—”

অনুকূল অসন্তোষের চুক চুক শব্দ করিয়া উঠিলেন, “ওগো, তোমার দয়ার সাগরকে সে কথা আমি বলতে ভুলে যাইনি। তিনি তাহার কাটান জবাব বহুকাল পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। কোন্ বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নাকি ছেলের ছোটবেলা থেকে বিয়ের কথা দিয়ে গরীবের মেয়েদের পথ তিনি বন্ধ রেখেছেন। ছোঁড়া চালাক কি কম! দেখছো না, তোমার ছেলেটাকে কি রকম জেটেলমান বানিয়ে ফেলেছে! তুমি কি মনে কর, ওকে নিজের জামাই করবার মতলব ওর মনে নেই? তাই আমিও তার শোধ নেব ভেবেছি। ওর কাছে ছেলের বিয়ের টাকা তো আর চাইতে যেতে পারব না, আমার ছেলে তো ওরই হাতে। তাই যখন হাতে পেয়েছি, তখন ওর ছেলে-কেও আমি ছাড়ছি নে। ওর বাড়ি নীলিকে গছাবো, তবে আমার নাম অনুকূল চক্রবর্তী। ছেলে নিজে যেচে ওকে বিয়ে যদি নেহাৎ নাই করে, তবে জবর-দস্তিতে করবে, করতে হবে আলবৎ।”

স্বর্ণলতার বুকের ভিতর আশার ক্ষীণ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া যেটুকু তীক্ষ্ণ ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেও আড়াল করিয়া সহসা এই কথায় জাগিয়া উঠিল—প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক। সর্ব-শরীর মনে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি আতঙ্কিত কহিয়া উঠিলেন, “অমন কথা বলো না। সুশীলের বাপের মতের বিরুদ্ধে সে কেন তোমার মেয়ে বিয়ে করতে যাবে? তুমিই বা তাকে কোন্ হিসাবে সে কথা বলবে? সে কাজ নেই—সে কাজ নেই, আমাদের তেমন কপাল নয়।”

স্বর্ণলতার হতাশাশ্রু ও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর চাপা দিয়া অনুকূলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে জানালার বাহিরে ফাটলে উপবিষ্ট একটা কালপেঁচা অকস্মাৎ ভয় পাইয়া চ্যা চ্যা করিতে করিতে চোঁচাইয়া

উঠিয়া উড়িয়া গেল।—স্বর্ণলতার দুর্ব্বল বুক তাহাতে হু হু করিয়া উঠিল।

“কপাল আমি তৈরী করব।—কপাল আবার কি? কপাল নিজের হাতে। এমন সুযোগ আমি নষ্ট হ’তে দেবো না। এ সুযোগ মানুষ ছ’বার ক’রে পায় না। তুমি আমায় সাহায্য না কর—চুপটি ক’রে ব’সে থাক। কোন রকমে বাধা দিয়েছ কি মরেছ! সেটি ঠিক জেনে রেখে দিও। এর বিরুদ্ধে একটি কথা কইবে কি গলা কেটে ফেলবো!”

একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্বর্ণলতার বাম অঙ্গ স্পন্দিত ও তাঁহার সর্বশরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত হইয়া গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার জীর্ণ বক্ষের মধ্যে যেন চাপিয়া থাকিয়া বহিরাগমনে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহার পর কোন্ সময়ে মাথা ঘুরিয়া তিনি যে সশব্দে ঘরের মেজের উপর মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, অবসন্ন দেহভার নিতান্তই হালছাড়া অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অন্তর্জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহার বহিঃপ্রকাশ অতি ধীরে অত্যন্ত বিলম্বে একটু একটু করিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। মনে হইল, চিরসংঘমের বাঁধভাঙ্গা এ অবসাদ আর কখনও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া তাঁহার দেহ-মনকে পূর্বাৱস্থায় ফিরাইতে পারিবে না। এই জীবনমৃত অবস্থাতেই তাঁহাকে হু হু বা থাকিতে হইবে। রাত্রির শেষভাগে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে ভীত দ্রুত গৃহবাসী, অনুকূলের উচ্চ চীৎকারে তাঁহার কক্ষে সমবেত হইয়া দেখিল, তিনি পাগলের মত বুক চাপড়াইতেছেন ও চোঁচাইতেছেন, “গিন্নি! ওগো গিন্নি! বলি গিন্নি! ওগো! সত্যি কি আমায় ফেলে তুমি চলে গেলে নাকি? হ্যাঁ গা, কি রকম পাষণ্ড তুমি! এমন করেই কি ভাসিয়ে যেতে হয়?”

নীলিমা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই স্তব্ধ ও গতিহীন হইয়া রহিল, এক পাও আর সে মড়িতে বা কাছে বাইতেও পারিল না। মা’কে এমন অবস্থায় সে ত আর কখন দেখে নাই!

শুভেন্দু এবং সুশীলও আসিয়াছিল। শুভেন্দু কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিত চোখে মায়ের শাকবর্ণ মুখের স্নানচ্ছবি দেখিতে লাগিল এবং বাপের কান্নাকে মনে মনে রুষ্ট বিজ্ঞপে তিরস্কার করিতে লাগিল। সুশীল

শুধু এই সঙ্কল্প দৃষ্টে নিজের অর্দ্রদৃষ্টি কোনমতে ফিরাইয়া এক ঘটী জল ও একখানা পাখা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুর্চ্ছিতার গুপ্তাশ্রয় মনোযোগী হইতে পারিল।

রোগিণীর চেতনা ফিরিয়া আসিলে অমুকুল হাউ হাউ করিয়া কাদিয়া সুশীলকে জড়াইয়া ধরিলেন, “বাবা সুশীল! তোমার জন্মেই শুভেন্দুর গর্ভধারিণী এ যাত্রাটা রক্ষা পেয়ে গেলেন, ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা! না হ’লে আমার কি হ’ত?”

গতকল্য হইতে ক্লান্তাশ্রয়ী, শুকচিহ্ন কপণের প্রতি যতটাই বিতৃষ্ণা সুশীলের মনে জাগিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা তাহার হৃদয়ধিকার করিল। বাহিরটা তাহার যতই কঠোর দেখাক, অন্তরের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড প্রেমের নিকর লুকান আছে, ইহা স্থির করিতে তাহার বিলম্বমাত্রও হইল না এবং না জানিয়া অবিচার করার প্রানিতে সে নিজের প্রতি বিশেষভাবেই বিরক্ত হইল।

মা’কে চোখ মেলিতে দেখিয়া নীলিমা কাছে গেল, স্বর্ণলতার বক্ষে গভীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তৃষিত ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া তিনি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠের মধ্যে সামান্য একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। সুশীল ভাড়াভাড়ি মুখে এক চামচ জল দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, “চুপ করুন, মা! কথা এখন কইবেন না।”

ভাড়াভাড়িতে সে ‘জ্যেষ্ঠাইমা’র পরিবর্তে যে স্বর্ণলতাকে শুদ্ধ ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তাহার নিজের কানে ধরা না পড়িলেও অমুকুল ও নীলিমা দু’জনকারই কানেই উহা ঠেকিয়াছিল এবং ওই একটি শব্দই দু’জনের মনে দুই প্রকার অর্থ বোধ করাইল। নীলিমা এ ঘনিষ্ঠতায় এত বড় বিপদেও যেন একটা কুল দেখিতে পাইল এবং তাহার গুণমুগ্ধ মোহিত মনে তখনই এই কথাটা জাগিল যে, আজই এখনই সুশীল তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। অমুকুল মনে মনে বলিলেন, “নিজের মুখেই সম্বন্ধটা স্বীকার ক’রে নিলে বাছাধন, আর তুমি যাবে কোথায়? যা হোক, গিন্নী এ খেলাটা খেলো ভালই, এ বেশ ভালই হইল!”

সে দিন ঘরের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়েরই ~~আচরণ~~ বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কাহাকেও অবশ্র

থাকিতে আমন্ত্রণ করিল না, কিন্তু বাড়ীর এই আকস্মিক বিপদে যাইবার কথাই বা কহিবে কে? তবে খানিকটা বেলা বাড়িলে এবং স্বর্ণলতা অনেকখানি শ্বশু হইয়াছেন বিশ্বাসে নিজের চিন্তায় প্রতাবৃত্ত হইয়া শুভেন্দু সন্নিহনে ব্যাপারটা ধারণা করিতে গিয়া মনে মনে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। ট্রেনের সময় চলিয়া গিয়াছে মনে পড়িতেই ট্রেন ফেলের কারণটা মনে পড়িল, মায়ের প্রতি মনটা বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল। মা কি অজ্ঞান হইবার আর দিন বা সময় পান নাই? এই ত এই সময় তাহারা চলিয়া গেলে পর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেও চলিত! সুশীল তখনও স্বর্ণলতার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে, নীলিমা নিতান্ত হতভম্বভাবে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া আছে। মায়ের অর্দ্ধমুদিত চকুর, শিরাসঙ্কুল পাণ্ডু-মুখের ভাবহীনতা ও অতি মৃদু শ্বাসমাত্রের জীবিত-চিহ্নবৃত্ত শীর্ণ দেহ তাহার ভয়াব্ধ মনকে যেন নিরাশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া দিতে ছিল। প্রাণপণে চোখের জলকে সে ঠেলিয়া রাখিলেও সমস্ত বুক জুড়িয়া তাহার একটা প্রবল ক্রন্দনের রোল উঠিয়া তাহার মনটাকে হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। তা’র অন্তরের সেই অব্যক্ত আর্তনাদ কেবলই বলিতেছিল, “মা আমার উঠিবেন না।” যে মানুষ জীবনে কখনও এক মুহূর্তও শোয় নাই, তাহার এই যে নিশ্চিত শয়ন, এ যে তাহার শেষ শোওয়া,—সে খবর তাহার জানিবার বাকি ছিল না। তাই বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

শুভেন্দু আসিয়া বিরক্তিবিরস মুখে ডাকিল, “নীলি! শুনে যা।”

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমাকে উঠিতে হইল।

শুভেন্দু নীরসস্বরে কহিল, “আমাদের আজকে গতিটা কি রকম হবে? ট্রেন তো ওদিকে ফেল হয়ে গেল, আবার তো চব্বিশটি ঘণ্টা এই গারদঘরে বাস করতে হবে, একটু চা-টা কি দেবে, না আজও বন্ধাশুষ্ঠ প্রদর্শনেই সারবে?”

নীলিমা ভাইয়ের কথার ব্যথার উপর বেদনা বোধ করিলেও নীরবে সেটুকু সহিয়া লইয়া তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, “জোগাড় ক’রে দিচ্ছি, তুমি মা’র কাছে একটু বসবে?”

শুভেন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, “কি করবো ব’সে? আমাদের ডাক্তার সাহেব তো খুব লেগে পড়েছেন

দেখতে পাচ্ছি। আমি বাপু ও সন্ধ্যার মধ্যে নেই। জানিওনে কিছু, আর পারিওনে। আচ্ছা, এখন চল দেখি, চা আর কাল রাতের সেই ডিমের কালিয়ার ডিম যদি কিছু বাকি পড়ে থাকে ত তাই দুটো হাফবয়েল করে দে, দুজনে কোনগতিকে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই।”

নীলিমার বিষাদবিষয় মুখ ফণেকের জন্ত ঘণার বিরুদ্ধে আরক্ত হইয়া উঠিল, তার পর সে ভাব দমন করিয়া লইয়া সে সনিধাসে এই কথাই মনে মনে ভাবিল যে, মা-বাবার কাছ থেকে ওই বা কি স্নেহ-যত্ন কবে পেয়েছে, যাতে ক’রে ওদের ‘পরে ওর শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মায়? আমি ত বুঝি মা’র কি দুর্দশা, তবু সকল সময় আমারই মাথার ঠিক থাকে না। তা ত ও বেচারীও দুঃখী কম নয়। স্নেহ না জানতে পারলে কি আর শ্রদ্ধা আসে?

অনুকূলচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াই চোখে হাত চাপা দিলেন। কান্দো কান্দো গলায় কহিলেন, “গিন্নীর মনে কি শেষে এই ছিল! এমন ক’রে গুয়ে পড়লেন! আহা, সুনীলকে যে একটু যত্ন ‘আর্তি’ করবো, তারও আমার উপায়টি আর রইলো না। বাবা সুনীল! তুমি কিছু মনে করো না, বাবা! এ তো তোমারই নিজের ঘরদোর, তুমি নিজে দেখেওনে নিয়ে কষ্ট ক’রে দুটো দিন থেকে যাও, আমি অকূলে একটু কুল পাই। এ বিপদে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়েছে!”

সুনীল প্রবল সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গিয়া আগ্রহপ্রদীপ্ত মুখে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, “কিছু ব্যস্ত হবেন না, জ্যোতামশাই! আমি জ্যোতাইমা না সারা অবধি যেতেই পারবো না, তা ছাড়া আমি বাবার কাছে হোমিওপ্যাথিক কিছু কিছু শিখেছি; আমার একটা কর্তব্যও তো আছে।”

“বটে, তুমি ডাক্তারী পড়েছো? তা হ’লে তো আর কথাই নেই। না হ’লে—এই একুনি মনে করছিলুম, যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারকে একবারটি না হয় ডাকিয়েই আনাই। বলি, হঠাৎ এ রকমটাই বা হলো কেন? তা যখন তুমি ডাক্তার রয়েছ, তখন আর বাইরের পর ডাক্তার এনে বেশী কি করতে পারবে?”—

সুনীল উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ

কহিল, “আমিও আপনাকে বল্ব বল্ব মনে করেছিলুম যে, একজন ডাক্তার দেখানই ভাল। আমি তো তেমন কিছুই জানিনে। বই দেখে পড়া বই তো নয়, চিকিৎসার আমি কি জানি, একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের দেখা খুবই দরকার। আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হ’তে পারব অবশ্য।”

অনুকূল বিষয়-প্রদীপ্ত মুখে দ্রুতস্বরে উত্তর করিলেন, “বিচক্ষণ ডাক্তার! তুমি কোন ডাক্তারকে কখন বিচক্ষণ হ’তে দেখেছ, সুনীল? ঐ যতক্ষণ শিক্ষানবীশ থাকে, ডাক্তার ততক্ষণই ভাল। পড়া ছেড়ে যেই প্র্যাক্টিসনার হলেন, ভিজিট করলেন, তাঁ’র মাথাটি খাওয়া হয়ে গেল! কিসে দুটোর যায়গায় চারটে ভিজিট করবেন, এই চিন্তাই তাঁ’র তখন একমাত্র জপমালা হয়ে বসল। রোগী মেরে কি পুরুষ, তাও তখন তাঁ’রা আর ভাল ক’রে দেখবার অবসর পান না। কতকগুলি জিনিষ কাঁচাতেই মিষ্টি থাকে, বাবা! ডাক্তার তাঁ’র মধ্যে একটি।”

সুনীল যদিও ডাক্তারজাতীয় জীবদিগের সকলকেই ঠিক এই প্রকার “ভামপায়ার” জাতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল না, তথাপি এক্ষেত্রে যে কারণেই হউক, তাহাকে শেষে ঐক্যমতাবলম্বন করিতে হইল। প্রতিবাদ বুধা জানিয়া নীরব হইয়া রোগীর দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, অসহায় ও আনায়বদ্ধ জীববিশেষের মতই ভাষান্তরা মৌন চক্ষুতে স্বর্ণলতা তাহারই মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টির উদ্বেলিত স্নেহসিন্দু গুরুত্বের অনুরোধ করিয়া সুনীলের দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার প্রতিক্রিয়ায় স্বর্ণলতার দু’চোখের কোণ গড়াইয়া দুইটি অশ্রুর ধারা বহিয়া গেল। সুনীল এ আশা-নিরাশার মিশ্রিত অশ্রুস্রাবের মূলানুসন্ধান না পাইলেও সে অশ্রু যে তাহারই এই সেবাটুকু হইতেই সঞ্জাত, এই বিশ্বাসে মনে মনে দৃঢ় হইয়া এই বিচার করিল, যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে সুস্থ না করিয়া সে এখান হইতে নড়িবে না। আহা, বেচারী বড় দুঃখী, আর তারও তো মা নাই।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীকে অচলায় মতই দেখাইলেও যেমন ভূগোলশাস্ত্রে তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের জীবনশ্রোতকেও কখন কখনও রুদ্ধগতি বোধ হইলেও বাস্তবিকই কালচক্র কোন স্থানে এবং কোন দিনই যে গতিহারা হইয়া থাকে না, সহসা অতর্কিতে সে তাহা একদা প্রমাণ করিয়া দেয়। স্বর্ণলতার দশমবর্ষীয় জীবন-নদী চল্লিশের পরেও ঠিক একই বিধিতে বক্র হইয়া চলিয়া আসিলেও সে দিনের ভোরে সেই যে সহসা শ্রোতোহত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে তাহার জীবন-নদীর মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুরাতন সে আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিল না। সুশীল তাহার যথাসাধ্য, এমন কি, তাহারও চেয়ে অধিক করিয়াছিল। অর্থাৎ নিজে হালে পানি না পাইয়া গৃহস্থামীর অজ্ঞাতে যজ্ঞেশ্বর ডাক্তার, নন্দলাল কবিরাজ, এমন কি ঠিক মনুখবর্তী প্রতিবেশী সেই কেরামতুল্লার অনুরোধে হাকিম নসীরকেও ডাকিয়া আনিয়া রোগী দেখাইয়াছিল, কিন্তু সকল ফলই সমান হইল;—অর্থাৎ সবই অকলা হইয়া গেল। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন পথাবলম্বী তিন ব্যক্তির মধ্যে ঔষধ-নির্বাচনে মতই কেন না অনৈক্য ঘটুক, রোগনির্ণয়ে কিন্তু সকলেই একতাবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ যে এপেন্ডোসিস, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগীর জীবনে আপততঃ ভয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ভরসাও কম। যে কোন উত্তেজনায় প্রাপবিয়োগ হইতে পারে। বাকশক্তি চিরদিনের মত একেবারে চলিয়া গিয়াছে, উহা আর ফিরিবে না।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, “ইহার জীবনে যে এইরূপ ঘটনাই ঘটিবে, তাহা যে কেহ অনুমান করিতে পারিত। তবে এ অবস্থার চেয়ে ইহার মৃত্যু ঘটিলেই শুভ হইত এবং শীঘ্রই তাহা ঘটাত কিছু অসম্ভব নহে।”

ডাক্তার চলিয়া গেলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সুশীল ভাবিল, বাস্তবিকই ডাক্তারীতে মানুষের মনকে কতকটা কঠোর করে! আহা বেচারী জ্যোঠাইমা! না, উহাকে ভাল করিতে হইবে। না হইলে নীলিমার কি হইবে?

সুশীল স্বর্ণলতার জীবন-মরণের মধ্যে যে নীলিমার

জন্মই বিশেষ করিয়া চিন্তিত হইল, তাহার কারণ এ কর দিনে সে কি দিনে কি রাত্রিতে সদাসর্বদাই নীলিমার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছে। তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহাও সে এই সুযোগে অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছে। এই মা ভিন্ন জগতে যে তাহার মুখ চাহিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ইহা বুঝিয়াই এক দুর্দশাপালিতা কিশোরীর প্রতি তাহার স্নেহ-সহানুভূতির অবধি ছিল না। তাহার স্বর্ণলতাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহার মুখ চাহিয়াই যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মন্তব্যে তাহার মনটা বিশেষভাবেই বিমর্ষ হইয়া গেল। এমন সময় দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিল, নীলিমা আড়ষ্ট কাঠের মতন দাঁড়াইয়া আছে। সে সবই শুনিয়াছে বুঝিয়া সুশীলের মনে বড় দুঃখ হইল, কাছে আসিয়া স্নেহশীতল কণ্ঠে সে কহিল, “ও সব বাজে কথায় মন খারাপ করো না; আমি বলছি, জ্যোঠাইমা ভাল হবেন!”

দৈববাণীর মতই এই দৃঢ় উচ্চারিত আশ্বাসবাণী কমটি নীলিমার ভয়ত্রস্ত দুঃখবিদারিত মনের উপর শীতল জলের ধারার মতই নিপতিত হইয়া তাহাকে যেন এক মুহূর্ত জুড়াইয়া দিল এবং গভীরতম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়া সে আত্মহারাৎ সেই একমাত্র আশ্বাসদাতার দুই পায়ের উপর অকস্মাৎ আর্তভাবে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুশীল এই আকস্মিক বত্মাপ্রাবনের জন্ত আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে নীলিমার এই কার্য্যে কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কি করিয়া উহাকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিপর্য্যে থাকিয়া উহাকে কাঁদিতে দিল। তাহার পর অনেকখানি ইতস্ততঃ করিয়া নতদেহে বাহু ধরিয়া নিজের অশ্রু-ধৌত পদতল হইতে উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “স্থির হও, নীলিমা! অত কাতর হ’লে ত চলবে না, আমাদের ধৈর্য্যের উপরই যে জ্যোঠাইমার জীবন নির্ভর করছে, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?”

নীলিমা সেই আকর্ষণে সর্বশরীরে রোমান্তিক হইয়া উঠিয়া বসিল এবং যথাসাধ্য ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে করিতে অশ্রুট ও অস্থির কণ্ঠে কহিল “মা, গেলে আমি যে এখানে একটি দিনও আর থাকতে পারবো

না! মা গেলে এক মুহূর্তও আ-
ধাকতে পারবো না। আমার তখন কি হবে?”

সুশীলের বৃকের মধ্যে এই হতাশাকাতর কণ্ঠের কাতর প্রশ্ন গভীর বলে আহত হইল, “তখন আমার কি হবে?” বাস্তবিক এ সংসারের যে বিধিব্যবস্থা সে এই কয় দিনেই জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে মাতৃ-হীনা বালিকার পক্ষে এখানে পড়িয়া থাকা একান্তই আত্মাহুতি দেওয়া—ইহা সে ভালরূপেই বুঝে। এই ত্রিদিব অকাতরে রোগীর সেবার সহিত সমস্ত সংসারের সমুদয় কার্যসাধন করিয়াও তাহাকে পিতার মুখের কণ্ঠের কুৎসিত ভৎসনা ব্যতীত আর কিছু শুনিতে সুশীল ত এক দিনও শুনে নাই। মমতামখিত মেহভরে সে অকস্মাৎ নিজের কোঁচার কাপড়ে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছাইয়া দিয়া উৎসাহদীপ্ত প্রফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল, “ভয় কি নীল! আমরা দু’জনে মিলে জেঠাইমা’কে বাঁচিয়ে তুলবো! না বাঁচার কথা মনে করবো কেন? চেষ্টা করিলে কি না হয়?”

নীলিমার মধ্যে ভয়ের তাড়না কোথায় সরিয়া গেল, আর তাহার স্থানে এ কি প্রবল হইয়া উঠিল—বুকভরা লজ্জা! এই স্পর্শ, এই কণ্ঠ, এই আদরের “নীল” ডাক—একি নীলিমা আজ সুশীলের কাছে লাভ করিয়া বসিল? এ যে তাহার গোপন বাসনারও অতীত! এ যে তাহার ঘুমন্ত স্বপ্নেরও অগোচর! এই তরুণ হাতের কোমল স্পর্শের অনুভূতি তাহার অশ্রুসিক্ত কপোলে আবির্ভূত হইয়া গেল; তাহার কান্না-ধোয়া চোখের পাতা ইহারই আবেশে বিহবল হইয়া সহসা নামিয়া পড়িল। তাহার সুখশিখিল ধরকম্পিত দেহলতা এই আভ্যন্তরিক সুখোচ্ছ্বাসে যেন এলাইয়া শিথিল হইয়া আসিল। কণ্ঠে তাহার ভাষা হারাইয়া গেল, বৃকের মধ্যে প্রবল ক্রমিরোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া রহিল।

তাহাকে নিরন্তর দেখিয়া সুশীল আরও কিছু বলিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর এমন একটি সুখের উচ্ছ্বাস ও আবেগের তরঙ্গ অতর্কিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অজ্ঞাতেই হিল্লোলিত হইতেছিল যে, যত বড় আনাড়ীই হোক, উহার অবির্ভাব যে কাহারও চোখে না পড়িয়া যায় না। সুশীল সবিস্ময়ে নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, তাহার মনে এই মুহূর্তে মা হারাইবার ভয়ের ভাবনা একেবারেই জাগ্রত নাই। কিন্তু এমন অকস্মাৎ সেটা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেল,

সেইটুকুতেই তাহাকে যেন কাপরে ফেলিল। সে আরও কতকগুলি ভাল ভাল স্মৃতির কথা শুনাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু ঐ হর্ষমধুর স্মৃতিগুলির অধরোষ্ঠ, অর্ধমুক্ত স্মিত দৃষ্টি ও আরকোজ্জল গণ্ড এই শোকসংবাদের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কিন্তু না বুঝিলেও সুশীলেরও তরুণ কণ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ইহারই অনুকরণে লজ্জার রক্তমাংস ফুটিয়া উঠিল। নীলিমা তার কি ব্যবহারে লজ্জা পাইল? বিনতার মত ব্যবহার কি ইহার সহিত করা সম্ভব নহে? কেন নয়? না, হয় ত তাহার ভুল, নীলিমা ইহাতে নিশ্চয়ই কিছু মনে করে নাই।

সুশীল স্বর্ণলতাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্ত মুখ ফিরাইতেই তাহার ঠিক সাম্নাসাম্নি হইয়া গেল অমুকুলের সহিত। অমুকুলের কুঞ্চিত শীর্ণ মুখে একটা বিজয়দৃপ্ত হিংস্র হাসি।

শুভেন্দু দুই দিন মা’র রোগ আরোগ্যের জন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, মা’র আর ভাল হইবার মত গতিক নহে এবং ডাক্তারের মুখে শুনিল, যে, এ রোগ আর আরোগ্য হইবে না, তখন সে ভোরের ট্রেণ ধরিয় কলিকাতা যাত্রা করিল। পড়াশুনার এত ব্যাবস্থা জন্মান তাহার সম্ভব বোধ হইল না। সুশীলও অবশ্য যাইবার জন্ত অমুকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল এবং অমুকুলও সনির্বাক তাহাকে থাকিবার জন্তই বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নীলিমা উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সুশীলের মুখে “না, আমি এখন যাব না” এই কথাটি শুনিতে পাইয়াই তাহার হৃৎপিণ্ডটা বৃকের মধ্যে উল্লাসে লাফাইয়া দোল খাইল।

সুশীল যাইবে না। ধনিসন্তান চিরসুখে পালিত সুশীল দরিদ্রের দৈন্তের অংশ গ্রহণপূর্বক শুধু তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়াই তাহাদের সাহায্যার্থ রহিল, আর শুভেন্দু তার মা’র শেষটুকুর জন্তও অপেক্ষা করিতে পারিল না। অন্তরের দুই তারে এই হর্ষ-বিষাদের দুই বিভিন্ন সুর ধ্বনিত হইতে থাকিলেও নীলিমার বক্ষে যে আনন্দের সুরটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহার কাছে অজ্ঞাত রহিল না। সে মনে মনে বলিল, “তোমার এত দয়া না হ’লে কি আমার মন এমন ক’রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তো। উঃ! কি ভাল তুমি! কত মহৎ!”

অপরূপে সুশীল ও নীলিমা রোগীর দুই পাশে দুই

জন বসিয়া ছিল। রোগী যুগাপূর্ব নিদ্রাচ্ছন্নবৎ পড়িয়া আছেন। অশুকুল ঘরে চুপিলেন। তাঁহার হাতে এক কোটা চা এবং একটা বড় মোড়কে বাঁধা কয়েকটা জিনিষ-পত্র। ছেঁড়া ছাতাটা এক স্থানে ঠেস দিয়া রাখিয়া তিনি নীলিমাকে বলিলেন, “এই চা নে; যা দেখি খুব ভাল করে এক কাপ চা তৈরী করে সুশীলকে দে’, দেখি। আহা, দিনরাত খেটে বাছার মুখটি শুকিয়ে গেছে!”

নীলিমা কিছু বিস্মিত, কিছু গ্রীতভাবে বাপের হাত হইতে মোড়কগুলি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিতে গেল। তাহার মূল্যে সংগৃহীত চা চিনি সবই আজ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই ভাবিয়া তাহার মনে সুশীল থাকার আনন্দটাও যেন অঙ্গহীন হইয়া পড়িতেছিল। এ কম দিন কত দুঃখই যে সে এ দুই জনের চা, জলখাবার ও লুচির ময়দা খি যোগাইয়াছে, তাহা সেই জানে। তাহার আর তো কোনই সম্বল নাই।

কাঠ-কুটার উনান ধরাইয়া সেই আগুনে একটা ঘটিতে জল ঢেইয়া নীলিমা পাথরবাটিতে চা ভিজাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, চটিজুতার শব্দে বৃকের সঙ্গে হাত কাঁপিয়া পাথরবাটিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া এই কাণ্ডটা চোখে পড়িতেই সুশীল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—“বাঃ, বাঃ, বাঃ,—খুব কাজের লোক তো দেখছি! এ দিকে জ্যেষ্ঠামহাশয়ই আমার তাড়া দিয়ে দিয়ে তুলে দিলেন যে, চা নাকি প’রে প’ড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি, চা জুড়িয়ে পাথরবাটি হয়ে গেছে। উঃ, কি ভাশ্চর্য্য! তুমি ম্যাজিক করতে জান, নীল?”

নীলিমা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাটি লুকাইয়া ফেলিয়া পাত্রান্তরে চা ভিজাইতে দিল ও কোন মতে বৃকের দ্রুত তাল সংহত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “বসুন, এখনই আমি চা তৈরী ক’রে দিচ্ছি।”

সুশীল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “বাঃ, ‘বসুন’ বললে বড়? তা হ’লে তো বসাই হবে না, দেখছি। ভদ্রলোকরা কি আর রান্নাবরে বসতে পারে? আমি তো বাইরের লোক, বৈঠকখানায় বসি গে’ যাই।”

নীলিমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নত চোখে চা ঢালিতে ঢালিতে ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিল, “তা হ’লে কি বলবো?”

সুশীল পুনশ্চ হাসিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, “বাঃ,

তাই বলবার মত নেই? কেন, ‘বস’ বলো, রো না কি? চিরদিনই আমি বুঝি তোমার কাছে বাইরের লোক হয়েই থাকবো? আমার অত পর পর মনে কর কেন বল তো? কৈ, আমি তো করি না? করি কি? হাঁ, নীল! সত্যি ক’রে বলো? আমি কি কিছুতেই তোমাদের পরের মতন করেছি? ও কি করছো? বাটিতে আর ধরছে না, তবু ঢালতে হবে? কেন, ওটা আর একটা বাটিতে ঢেলে নেওয়া কি যায় না?”

নীলিমা এ কথার অর্থ না বুঝিয়া সরলভাবে কহিল, “আচ্ছা, তাই দিচ্ছি, না হয় আপনি ওটা আগে খান, তার পর ঐতেই বাকিটা আবার ঢেলে দেবো।”

সুশীল গরম চায়ে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করিয়া ত্বরিতস্বরে বলিয়া উঠিল, “বাঃ, আবার সেই ‘খান’ ‘খান’ বলে কিছ আর একটুও খাবো না, তা’ এই ব’লে দিচ্ছি দেখে নিও। বল ‘খাও’, না হ’লে এই রইলো তোমার চা, আমি জ্যেষ্ঠাইয়ার কাছে চলুম ফিরে।”

নীলিমা লজ্জায় ও আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিয়া স্মিতমুখে মৃদু মৃদু কহিল, “আচ্ছা, আর বলবো না। খাও,—হয়েছে ত? যান, আপনি ভারী ছুটু!”

সুশীল কোতুকে করতালি দিয়া উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল, “ধান ধান—আপনিও বড় কম ছুটু নন। এবার থেকে এই শাস্তি! ও কি! আমার আবার দিচ্ছেন যে, ওটা তো আমি চাই নি, ওটা তুমি খাবে, না আপনি খাবেন,—তোমার অভ্যাস নাই? না-ই থাকলো? রাত জাগা তো আর এর আগে কখন অভ্যাস ছিল না? লক্ষ্মীটি! সত্যি তুমি খেয়ে ফেল। তোমার খাওয়া বড় কম হয়। আমি দেখেছি, কাল রাত্তিরে তুমি কিছু খাওনি, অথচ আজ সেই দুপুরবেলা একেবারে খেলে। রাত্তিরে আবার কি করবে, সে তুমিই জানো।”

নীলিমার চোখে জল আর চাপা থাকে না। এমনই হইয়া উঠিল। এত করিয়া তাহার মত তুচ্ছক যত্ন করা! তাহার কার্য্যকলাপ এমন করিয়া উল্টিয়া দেখা, এও কি কখন সম্ভব? এই স্মৃদর্শন, তরুণ, শিক্ষিত ধনি-সন্তানের পক্ষেও সম্ভব? সহসা নীলিমার মনে হইল, এও তো হিন্দুর ঘরেই জন্মিয়াছে! মা-বাপ তো এরও হিন্দু! তবে এর মধ্যেই বা এমন উদারতা কোথা হইতে আসিল?

নীলিমাকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া সুশীল উড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চা-পাণের বাকি চা-টা একটা মার্জিত পাত্রে ঢালিয়া লইয়া মুহূর্তমধ্যে তাহার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল, “লক্ষ্মীটি! খেয়ে ফেল, না খেয়ে খেয়ে এত খাটলে তুমি মারা পড়বে যে! না, নীল! তা করলে হবে না, সে আমি শুনবো না। আমার কথা শোনো, খেয়ে ফেল।”

নীলিমার বক্ষ-শোণিত যেন কল-কল্লোলে সমুদ্রের তরঙ্গের মতই উতাল হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সর্বশরীরে যেন সহস্র তড়িৎশিখা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। হাত বাড়াইয়া সে চায়ের বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিতেই তাহার মনে হইল, ইন্দ্রদেবতার হস্ত-পরিবেশিত স্বর্গীয় সুধাপাত্র সে যেন নিঃশেষ করিল। তাহার দেহ প্রাণ মন আত্মা সকলই যেন সেই সুধামারে প্রাবিত হইয়া সুধাস্রোতে তলাইয়া সুধামাখা হইয়া গেল। তাহা চিরদিনের দুঃখ-দারিদ্র্য অত্যাচার-অবিচার সমুদয় যেন আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়া তাহাকে কোন অজ্ঞাত পুলকের আলোকের মহাসাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল। তাহার পৃথিবী আর ধূলার ধরণী রহিল না, তাহার জীবনকে আর জীবন-সংগ্রাম মনে হইল না, তাহার অপরিতৃপ্ত বাসনারূদ্ধ কুমারী জীবনকে সুপরিতৃপ্ত কল্যাণপূর্ণ মহীয়সী মহিলার বরণা জীবন বলিয়া সে আনন্দাপ্লুত গর্ভানুভব করিল।

সুশীল কিন্তু অত কথার কোন ধারই ধারিল না। সে নিজের ভাবে ভোর রহিয়াই হান্তদীপ্ত উৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিল, “দেখ দেখি কেমন হলো! যাই বল বাপু, চাটি শুধু নিজেকে খেয়ে কিন্তু সুখ হয় না, বেশ দুই তিন জনে ব’সে ব’সে গলে সলে ‘সিপ’ ক’রে ক’রে খাওয়া যাবে, তবে না! হ্যাঁ, একটা কথা, জ্যোঠাইমা আজ বেশ ভাল আছেন। কেমন ক’রে জানলুম? বাঃ, আমি ডাক্তারী পড়ছি না? তা ছাড়া আরও শোনো, তুমি চ’লে এলে একটু পরেই জ্যোঠামশাই যখন আমার চা খেতে আসতে বলেন, জ্যোঠাইমা তখন বে কি ভয়ানক চমকে উঠেছিলেন! একেবারে ছ’ চোখ ঠিকরে চেয়ে আমার যেন মিনতি ক’রে কি বলেন! অবশ্য কি বলতে চান, সেটা ঠিক বোঝা গেল না; আমার তো মনে হলো, যেন না যাই বলছেন,—কিন্তু

জ্যোঠামশাই ঠিক তেমন উল্লেখ করেননি। বা হোক, এই বুঝতে পারাগুলোও তুমি পরই লক্ষণ বলতে হবে?”

নীলিমা এই বর্ণনা শুনিয়া কিন্তু মনে মনে বিশেষ-ভাবেই উৎকণ্ঠা-চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার বাপের এই আকস্মিক মুকহস্ততা—সুশীলকে ঠেলিয়া চা পান করিতে পাঠান এবং সেই সঙ্গে সেই সংবাদে তাহার মায়ের অর্দ্ধমূর্চ্চিত চিত্তে আকস্মিক উদ্বেগের সঞ্চার! এ সকলই কি কোন অর্থহীন তিপূর্ণ বড়বড়? অথবা—আর কিছু না ভাবিয়াই সে ত্বরিতপদে উঠিয়া বলিল, “মার কাছে যাই। এতক্ষণ—”

বলিতে বলিতেই তাহার নজর পড়িয়া গেল মায়ের প্রান্তে প্রস্থানোত্তত পিতৃমূর্তির উপরে। ও অপমানে তাহার মুখ কালো হইয়া গেল। তাহা অস্তরে তখনই একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু বাপের উপর বিদ্রিষ্ট বিরাগে ইন্ধন চড়াইতে গিয়া সে অকস্মাৎ সবিস্ময়ে দেখিল যে, কোথা দিয়া সেই পর্কতপ্রমাণ বিরক্তি ও অভিমানের বোঝা গলিয়া পড়িয়া সেখানে একটা কৃতজ্ঞতার ক্ষটিকনির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে। সুখাপ্লুত ও বেপথুমানা হইয়া সে মনে মনে পিতৃচরণোদ্দেশে সেই বোধ হয় সর্ব প্রথমই আন্তরিক প্রণিপাত জানাইয়া অন্তর্যামীর কাছে আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল, “আমার কি এত বড় কপাল-জোর আছে, ঠাকুর? যদি স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও কোন জাগ্রত দেবতা থাক, তবে আমি যেন ঠুকে পাই। আমার বাবার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, তিনি যা চাইছেন, তা আমি বুঝেছি! কিন্তু আমার কি সেই ভাগ্য!”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম সূর্য্যোদয়পতন্ত ধরণীবক্ষে সে দিন প্রথম বারিপাত হইয়াছিল। তাহাতে ধরণীর ধূলিধূসরিত মলিন অঙ্গ মার্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধূলি-মলিন আকাশের স্নানিমা অপসৃত হইয়া সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জল নীলিমায় দিগন্তের সমুদয়টুকুই নয়নরঞ্জন শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের শুষ্কতা এত দিন পরে সুলভতর ধূলিজাল ভেদ করিয়া আজই প্রথম লোকলোচনে আত্মপ্রকাশ করিতে অবসর পাইয়াছে।

মনে হইতেছিল, বরবর্ষিনী প্রকৃতি সতী এত দিন পরে তাঁহার ধূসর ওড়নাখানি অঙ্গ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া যেন নীল আঙ্গিয়া ও হরিৎ বসনে বরবপু সুসজ্জিত করিয়াছেন।

অনন্ত পরিশ্রমে ও দারুণ গ্রীষ্মে সুশীলের একটু স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়াছিল। দুই দিন জ্বর লুকাইবার পর আজ তিন দিনের দিন তাহার জ্বরটা একটু বেশীই হইয়াছিল। অনুকূল জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নীলিমাকে দিয়া বিছানা করাইলেন, মাথার দিয়া দিয়া সুশীলকে শয়ন করাইয়া নীলিমাকে আদেশ দিলেন, “ওর মাথায় ব’সে ব’সে বাতাস দে।”—নিজেই তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া গেলেন। সুশীলের কোন ওজরআপত্তিই সেখানে টিকিল না। ইহা দেখিয়া নীলিমার সন্তোষিত চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীল বিমর্ষমুখে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। বারকতক পাখার বাতান কপালে ঠেকিতেই উদ্ধতস্বরে বলিয়া উঠিল “খবরদার! বলছি, তুমি জ্যোঠাইবার কাছে যাও,—কথা শুনছো না কেন?”

নীলিমা স্মিতমুখে উত্তর করিল, “ক’জনের কথা শুনবো, বল?” বলিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হাতের কাজ বন্ধ করিল না।

সুশীল দ্বিগুণ চটিয়া তাহার হাতের পাখাখানা ধরিয়া ফেলিয়া গন্তীর মুখে বলিল, “তায়ের পক্ষেই জয় থাকা সম্ভব! আমার তো কিছুই হয়নি, সত্যি সত্যি তুমি আসল ফেলে নকল নিয়ে বসলে চলবে কেন? না না; লক্ষ্মীটি যাও।”

নীলিমার আজকাল সাহস বাড়িয়াছিল। নিজের মনের ছরাকাজ্জায় পিতৃবৃত্ত ইচ্ছার বলে সে এখন নিজেকে যথেষ্ট বলীয়ান বলিয়াই মনে করিতেছিল, তাই সে জোর করিয়া পাখাখানা চাপিয়া ধরিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুশীলের সম্মুখে অসঙ্কোচে উন্নত করিয়া দীপ্তমুখে কহিল, “নাও দেখি কেঁড়ে কেমন পারো, কক্ষনো পারবে না।”

“পারবো না! দেখ তবে,”—সুশীল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া এমন টান মারিল যে, পাখা ত কত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, নীলিমাও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল সামলাইতে না পারিয়া সম্মুখে ধরাশায়ী হইল।

“ছি ছি! কি করলুম!” বলিতে বলিতে সুশীল এক লম্ফে খাট হইতে নামিয়া নীলিমাকে

টানিয়া তুলিল। নীলিমার একটা হাতে একটু বিশেষভাবেই চোট লাগিয়াছিল। সে তাহা স্বীকার না করিলেও সুশীল সেই আহত স্থানের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শুশ্রূষায় যত্নবান হইল। দুই একবার মৃদু আপত্তি করিয়া নীলিমা অগতাই থামিয়া গেল। ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন রোগীর জ্বর বড় একটা ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে নীলিমার বাঁহাতে “বাড়” বাঁধিতে হইল। সুশীল গভীর অপরাধিতাবে ত্রুণে লজ্জায় স্রিয়মান হইয়া রহিল। ঐ ভাঙ্গা হাতে কেমন করিয়াই বা নীলিমা রান্নাবান্না করিবে ভাবিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। অবশেষে সে থাকিতে না পারিয়া অনুকূলকে গিয়া বলিল,—“নীলিমা তো রাঁধিতে পারবে না, একটা বামুন খুঁজে আনলে হয় না?”

অনুকূল তৎক্ষণাৎ কহিলেন, “বিলক্ষণ! তুমি আবার কোথায় খুঁজতে যাবে? আমি এখনই আনছি।”

এই কথাটা স্বর্ণলতার ঘরের মধ্যেই হইল। স্বর্ণলতার ডাগর চোখের দৃষ্টি ইহাতে ভগ্নার্তের মত দেখাইলেও সে দিকে কিন্তু কেহই দৃষ্টিদান করিল না। তাহার দরখাস্ত এত শীঘ্র মঞ্জুর হইল দেখিয়া সুশীলের আর খুমীর সীমা রহিল না। মনে মনে সে বলিল, “জ্যোঠামশাই মানুষ ত নেহাৎ মন্দ নন! সকলকার পরেই তো যথেষ্ট যত্ন আছে।”

নীলিমার হাত সারিতে দিন পাঁচেক লাগিল। ইতোমধ্যে স্বর্ণলতার অবস্থা অনেকখানি উন্নত হইলেও তাঁহার বাকশক্তি যে আর কখন ফিরিয়া আসিবে না, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। সুশীলের এখানে আসার পর তিন সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে সুশীলের পিসীমা পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে বাড়ী ফিরিবার জন্ত আদেশ ছিল। ভুবনবাবুর শরীর তেমন সুস্থ নহে, এ দিকে বিনতার বিবাহের কথাবার্তাও চলিতেছে, তরু স্বামীর কর্মস্থান হইতে ছেলেমেয়ে সঙ্গে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। এই সব নানা কারণে সুশীলের শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরা অনিবার্য হইয়াছে। সে যেন আর অনর্থক বিলম্ব না করে।

পত্র পাঠাণ্ডে এক দিকে বাড়ীর জন্ত, দিদির জন্ত, পিতার জন্ত উদ্বেগ এবং অপর দিকে স্বর্ণলতার এবং

নীলিমার জন্ত উৎকর্ষা, দুই দিক্ হইতে দুইটা তরঙ্গ আসিয়া যেন সুনীলের মনকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর যেন একটা অশান্তির মেঘ আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

অনুকূলের কাছে পত্রের উল্লেখ করিবামাত্র তিনি যেন একেবারেই আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, “সে কি কখন হয়? গিন্নীর এ রকম অবস্থা, মেয়েটা কোন্ দিকে কি করবে? আরও কিছুদিন থেকে যাও।”

থাকিবার উপায় নাই শুনিয়া তিনি তখন যেন একটু বিশেষ চিন্তিত ভাবেই কহিলেন, “তা হ’লে আগামী কালকেই একটু হলুদ দিয়ে আগামী পরশ্ব দিনেই,—কি কালই না হয় শুভকার্যটা সম্পন্ন ক’রেই দিই?”

সুনীল বিষয়ে নির্বাক হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার বাক্যের অর্থ বোধ করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া অনুকূল পুনশ্চ সুস্পষ্ট স্বরেই কহিলেন, “নীলিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই আমার তো তোমার বাপের কাছে পাঠাতে হ’বে! তার পর এই আশ্বিনা স্ত্রী নিয়ে আমার যা দশা হয়, তা না হয় হোক, সে আমি বুঝবো—কিন্তু বিয়ের দেয়ী তো তা ব’লে আর কোনমতেই করা চলে না।”

সুনীল তখন কোনমতে ভাষা খুঁজিয়া লইয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল, “বিয়ের কথা আপনি কি বলছেন? কাল পরশ্ব বিয়ে আপনি দেবেন বলছেন, এর মানে কি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে!”

অনুকূল শান্ত ও সংযত স্বরে উত্তর দিলেন, “নীলিকে তুমি যে পছন্দ করেছ, তা আমি জানি; সেও তোমার জন্তে যে ছটফটিয়ে মরছে, তাও আমার সব জানা আছে। বিয়ে তোমাদের তো দিতেই হবে।—তা’ ছাড়া আর এর উপায় কি?”

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া সুনীল যেন কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল। ক্ষণকাল সে নির্বাক বিষয়ে বাক্যহারা হইয়া থাকিবার পর, সেই অশেষ বিষয়ের তরঙ্গ তাহার বক্ষে ঈষৎ সংহত হইয়া আসিয়া কণ্ঠ-মধ্য হইতে একটা শিথিল শ্লিষ্ট ধ্বনি উথিত হইয়া আসিল—“তা হ’লে আমার বাবার মত আপনি জিজ্ঞাসা ক’রে তাঁরই সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কো’ন।”

অনুকূল একটি ডাবা হুকায় তামাক টানিতে-ছিলেন। একরাশি ধোঁয়া মুখে জন্মিয়াছিল, সেগুলোকে বাহির হইতে দিয়া তাহার পর কহিলেন, “ওহে! তা’ কি আর আমি না করেছি? তিনি কোন্ জমীদারের মেয়েকে নাকি কবে বাগদত্ত হয়েছেন, তাই আর গরীবের মেয়েকে বউ করতে রাজী ন’ন।”

সুনীলের সহসা যেন একটা ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। চটকাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সে এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন বর্তমানের বাহিরে দূর অতীত দিনের মধ্যে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেখানে তাহার মনের সিংহাসনে অতি উজ্জল ভাস্বর মূর্তিতে আলোকময়ী বালিকা-প্রতিমার সমুজ্জল মূর্তিখানি তেমনই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—সে দেখিতে পাইল। সেই চাবুক খাওয়ায় দিনের কথা মনে পড়িল,—তাহার পর আরও কত দিন দুই জনের চাক্ষুষ হইয়াছে। দেশের বাড়ীর নিমন্ত্রণে, কলিকাতার চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, একজিবিসনে, বায়স্কোপে, তাহাদের কলিকাতার বাসায় নিমন্ত্রিতা সুলেখা তাহার মা-বাপের সঙ্গে কতবারই যে আনাগোনা করিয়াছে। সে সব কি ভুলিবার? ভুবন বাবুর সেই প্রাণভরা ‘মা! মা!’ ডাক। সে যে তিনি কতই প্রাণের মধ্য দিয়া ডাকেন, সুনীল অপ্রবীণ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সুলেখার মুখের সেই স্নোহিত রক্তোচ্ছ্বাস, সেই সলজ্জ মন্দ হাস্য, সেও যে চির-অবিস্মৃত স্মৃতির মতই বুকের মধ্যে আলো হইয়া আছে। নীলিমার সঙ্গে থাকিয়া কয় দিন সে তাহার কথা ভাবিবার অবসর না পাইলেও তাহার সে ভাস্বর ছবি এতটুকুও তো ম্লান হয় নাই! বিশেষ তাহার পিতার মনোনীতা বাগদত্তা সে। মনে মনে নীলিমার জন্ত সুনীলের একটা বাথা বোধ হইল; এত দিন এ ভাবে সে একটি মুহূর্তের জন্তও তাহার কথা ভাবিয়া দেখে নাই। কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িয়াছে, তখন তাহার বারেকের জন্ত মনে হইয়া গেল, তা হইলে কিন্তু মন্দ হইত না! চিরদুঃখিনী নীলিমা হয় তো ইহাতে সুখী হইত। প্রকাশ্যে কুণ্ঠিত মুছবাক্যে সে কহিল, “বাবা যখন অমত করেছেন, তখন আর আমার তো কোনই হাত নেই জ্যোষ্ঠা-মশাই!”

অনুকূলের তামাকুবর্ণে অনুরঞ্জিত ওষ্ঠাধরে একটা ভীক্ষু হিংস্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পূর্বের সেই শাস্ত্রসংঘত ভাব পরিত্যাগপূর্বক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, “তোমার বাবা না হয় অমত করতে পারেন, কিন্তু তুমি কেমন ক’রে পারবে? ভদ্রসন্তান হয়ে একটা ভাল লোকের মেয়ের মাথা খেয়ে তাঁকে পরিত্যাগ ক’রে যাবে, এ কি কখন ধর্ম্মে সহিবে? না এ ছায়ে রাজ্যে আমরাই তা সহ ক’রে নিতে পারবো?”

সুশীলের সর্কশরীরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন জলন্ত তরল ধাতুর প্রবাহ বহিয়া গেল, কর্ণে তাহার যেন কোথা হইতে কে একসঙ্গে সহস্র কামান দাগিয়া দিল। সে ভগ্নাৰ্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে আৰ্ত্তনাদের মত অশ্রুট চীৎকার করিয়া উঠিল “এ কি বলছেন! আমার? আমি?—আমি—আমাকে, এ সব কথা আপনি কি আমার বলছেন?”

এই বারংবার “আমি” ও “আমার” শব্দ দিয়া কি বোর বিষয়, কি নিরতিশয় অভিমান, কি তীব্র উগ্র ব্যথিত ভৎসনা ও অকথ্য ভীতি সে প্রকাশ করিতে গেল, তাহা বুঝাইবার নহে। সমস্ত প্রকৃতি যেন সেই অকথ্য অভিযোগের অপরিমীম লজ্জার মুহূর্ত্তান ও বিষমাতঙ্কে সুশীলেরই সহিত সমানভাবে বজ্র-স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সুশীলের বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ শ্বাস যেন জগতের সমুদয় বায়ুস্তরকেই সেই মুহূর্ত্তে চিরক্লব্দ অনুভব করিয়া মহাতারে স্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের রাশি রাশি লজ্জায় তাহার সম্মুখের সমুজ্জল ও ধর সূর্য্যাকিরণ যেন একেবারে আচ্ছাদিত ও মসীবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু প্রকৃতি যে লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন, মানুষ যে তাহা নিজের হাতেই দান করিয়াছে! তাহার পাষণ চিত্ত ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এবার উগ্র ও ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্নেহের স্বরে অনুকূল উত্তর করিলেন—

হ্যাঁ তুমি! তুমি! তুমিই! তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়েকে কোলে জড়িয়ে নিজের কোঁটার কাপড়ে তার গাল মুছাওনি? তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়ের সঙ্গে এক বাটির চায়ে দু’জনে মিলে একসঙ্গে ব’সে চুমুক দাও নি? তোমায় সে তার মা-বাপকে লুকিয়ে বাপের টাকা চুরি ক’রে মাঝরাাত্র গরম লুচি ভেজে চব্বাচোষা রেঁধে বেড়ে খাওয়ায় না? তোমার শোবার ঘরের খাট থেকে প’ড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙ্গে যায় কি? আমি ও সবের ‘আই

উইটনেস,’ আদালতে হলপ ক’রে সাক্ষী দেবো, আমরা মেয়ে নিজের মুখে এ সব—আরও অনেক কথাই স্বীকার করবে। তখন তুমি করবে কি? আর তোমার বাপের মুখখানিই বা তখন কতটুকু হয়ে যাবে? সে কথাটা ভেবে দেখ, আমি অমনি ছাড়বো, তা মনেও ভেবো না।”

যদি সুশীলের ভাল করিয়া কিছু মনে করিবার অবস্থা থাকিত, তবে সে হয় ত ধরনীকেই শুধু বিধা হইবার জন্ত সকাতে অরুরোধ করিত। কিন্তু তাও তাহার নাকি ছিল না, তাই সে শুধু অতলজলে অর্দ্ধমগ্ন অভাগা ব্যক্তির মতই অর্দ্ধ স্বরে উচ্চারণ করিল— “ভগবান!”

অনুকূল স্লেষপূর্ণ কণ্ঠের কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই কহিয়া উঠিলেন, “কি করবে তোমার ভগবান? তোমার হয়ে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে কি? কিন্তু আমি তা নিজে দেবো,—কেন না, এই চোখেই সব দেখেছি যে! আর আমার মেয়েও দেবে। মনে ক’রো না, সে তোমার দিক নেবে। সে তোমায় পাবার জন্তে যে মরছে, সে কি আর আমি বুঝিনি মনে কর! তুমি চ’লে যেতে সে বুকে ব্যথা পায়, বুক পেতে দিতে চায় তাও বুঝি।—তার চেয়ে বিয়েটা ভালয় ভালয় ক’রে যাও। বাপ দু’দিন না হয় একটুখানি বিরক্তই হ’বে, তার পর একমাত্র ছেলে তুমি, বউও তার খুব কুৎসিত হবে না, সব ভুলে যাবে এখন।”

সুশীলের চক্ষুর অন্ধকার রাশি ও বক্ষের অনিষদিত রক্ত বায়ুপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া তাহার ভিতরে বাহিরে যেন একটা প্রলয়ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল। তাহার বক্ষের শোণিততরঙ্গ তুফানের বেগে গভীর কলকল নাদ করিয়া উঠিতে লাগিল! অশ্রুর নিব্বার ঠেলিয়া কোনমতে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে সে উত্তর করিল—“আমি নীলিমার সঙ্গে বিনতার চেয়ে ভিন্ন ভাবে কোন ব্যবহারই করি নি—” তাহার পর আর কোন কিছুই সে বলিতে পারিল না। ইহার চেয়ে বেশী কথা বলিতে তাহার আত্মমর্যাদা, অভিমান এবং মনের অবস্থা কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না। আর বলিবার মত তাহার ছিলই বা কি?

অনুকূলের চোখ দুইটা আভ্যন্তরিক উল্লাসে বাধের চোখের মতই উজ্জল দেখাইল। তিনি আবার বেশ সহজ হির কণ্ঠেই কথা কহিলেন, বলিলেন, “কোলে ক’রে চুমু খাওয়া অত বড় পনের মেয়েকে—তার পর

যে ডাক্তার নীলির হাতে 'বাড়' বেঁধেছিল, সে নীলিকে কোথায় দেখতে পেয়েছিল, সে কথাও তো বলতে বাধ্য? তা' এ সবগুলোকে আদালতে দাঁড়িয়ে কি বোনের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রমাণ করতে পারবে, সুশীল?"

সুশীল আতঙ্কে ভরা স্বর মুখে নিঃশব্দে বারেক তাহার আততায়ীর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল এবং দুই জাহুর মধ্যে সেই ঢাকা মুখ সে লুকাইল। অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগকে সে আর কোনমতেই যেন ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এ কি অকথা কলঙ্কের ডালি নিরপরাধে তাহার মাথায় চাপিয়া বসিল? ইহার বিপুল লজ্জা, নিদারুণ ভয় ও অপমান তাহার তরুণ কিশোর প্রাণে আর যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

সুশীলের কান্না আসিল। কিন্তু না, না, না। কাঁদিলে সে কাহার কাছে? পাষণ পাষণ পাষণ! একটা নির্মম রক্তলোলুপ রাক্ষসের মত, অথবা মনুষ্যচর্যাবৃত প্রসূরসূপের মত এই অমানুষের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সে ইহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে? কখন না—কখন না, তাহার অপেক্ষা নীলিমাকে বিবাহ—সেও বরং সহস্রবার শ্রেয়।

ইহা ভাবিতে গিয়াও ঘুণায় সুশীলের সর্বশরীর মন যেন গুটাইয়া এতটুকু ছোটো হইয়া গেল। নীলিমার উপরও মনটা তাহার একেবারেই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। এই পিশাচের মেয়ে, সেও কিছু কম পিশাচিনী নয়! তবে আগগোড়াই হয় তো তাহাকে লইয়া ইহার একটা মস্ত বড় ঘণিত চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছে। নীলিমা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যবর্তিনী। সে নিশ্চয়ই সমস্ত জানে এবং স্বেচ্ছায় ইহার প্রধান ভূমিকা লইয়াছে। তাহার অহেতুক জড়িমা, অকস্মাৎ লালিমা, অনাবশ্যক লজ্জাভিনয় এ সকলেরই আজ এই মুহূর্ত্তে সুশীল যেন একটা মূল দেখিতে পাইল। এ সকলই অভিনয়োৎকর্ষ। তাহাকে ফাদে ফেলিবার প্রচেষ্টা! সে যখন ভগিনীর মত স্নেহভরে তাহার সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা করিয়াছে, এই পিশাচের দল তখন তাহার সেই সরল বিশ্বস্ততার এই এত বড় একটা নির্মম প্রতিদানকল্পনায় নিষ্ঠুর চক্র গঠন করিতেছিল। তবে কি স্বর্ণলতার ঐ রোগের মধ্যেও কোন হীন কৌশল, হের অভিনয়—

সুশীল নিজের চিন্তার আঘাতে নিজেই আহত হইয়া মাথা তুলিল। সে নিজের মনকে পীড়ন করিয়া বলিল, 'না না, তুমি এত ছোট, এত নীচ হইয়া না! জ্যোঠাইমা বেচারী নিশ্চয়ই এর মধ্যে নাই'— তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া তুলিয়া সহসা মনের মধ্যে সেই সে দিনের ব্যাকুল দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সেই যে দিন বড় আদরে গৃহস্বামী—এই জটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা নিজে ষাচিয়া ঠেলিয়া মেয়ের কাছে তাহাকে চা খাইতে পাঠাইতেছিলেন! সে দৃষ্টি যে একান্ত মিনতিভরা নিষেধদৃষ্টি, সে দিনও এ সংশয় তাহার মনে জাগিয়াছিল। আজ তাহা নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। জ্যোঠাইমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা এ চক্রান্তের কোন আভাস তাঁহার অর্দ্ধচেতনার মধ্যে জাগ্রত হইয়াই যেন তাহাকে সে দিন সাবধান করিয়া দিতে চাহিতেছিল। মূঢ় সে, মূঢ় সে; তখনও কেন সে কথা বুঝিতে পারিল না?

শিকারী যেমন সানন্দ আগ্রহে শিকারকরা পাখীর মৃত্যুযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করে, তেমনি করিয়াই প্রসন্ন মুখে অশুকুল আবৃতমুখ সুশীলের যন্ত্রণার্ত্ত মূর্ত্তির প্রতি স্থিরচোখে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওষু ঠিক ধ'রে গেছে!" প্রকাশে মনের প্রফুল্লভাব দমনে রাখিয়া পরম গম্ভীর মুখে তিনি কহিয়া গেলেন,—“বেশ ক'রে ভেবে দেখ, সুশীল! হয় কালই তোমার নীলিকে বিয়ে কর্ত্তে হয়, না হয় কালই আমায় ফৌজদারীতে তোমার নামে নালিশ দায়ের ক'রে দিতে হয়। এর আর তৃতীয় পন্থা নেই। ও মেয়ে আর কেউ তো বিয়ে করবে না! আর না কেনে করলেও তাতে মেয়ের পক্ষে অন্তর্পূর্ণ দোষ হ'বে। বিয়ে কর, সব ঢাকা প'ড়ে যাবে। বিয়ে না কর, খবরের কাগজে শুধু এই কেলেকারী ব্যাপারে নামটি উঠে যাবে। আমার তাতে কোনই লজ্জা নেই। আমরা গরীব মানুষ, বড়লোকের অত্যাচার আমাদের উপর কি রকম ভাবে পড়ে, সেটা দশেধর্ম্মে দেখতে পেলে তা'তে আমাদেরই সমূহ লাভ। ধরো, তোমাদের চেষ্টায় আদালত জোর ক'রে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে যদি নাও দেয়, অথ কোন দেশতন্ত্র ছেলে ওকে 'মর্যাদা কারেজ' দেখাবার জন্তে সেইখানে দাঁড়িয়েই হয় ত তখন বিয়ে ক'রে নেবে। কিন্তু তোমার তো অন্ততঃ পাঁচটি বছর খানি টানাটি বন্ধ করতে কার বাপেরও সাধ্য হবে না! সেইটি তো

তোমার বাকী থাকবেই!—আচ্ছা, তুমি এখন বেশ ক'রে চিন্তা কর, আমিও ততক্ষণ সবাইকে খবরটা জানিয়ে আর পুরুতের, নাপিতের, টোপর মালা আর আভ্যাদিক জিনিষের ব্যবস্থা পত্র ক'রে আসি। পরশু দিন তখন তোমাদের ট্রেনে চাপিয়ে তোমার বাপকে 'তার' ক'রে দিলেই হবে।—আর না হয় তো একেবারে গিয়ে দাঁড়ানই ভাল। ছেলে বউএর মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবেন এখন।”

এই বলিয়া বারেক সুশীলের যথাপূর্ব করায়ত্ত লুকাইত মুখের উদ্দেশে একটা তুরকটাক্ষ ফেপণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অনুকূল প্রস্থান করিলেন। আর সুশীল তেমনই কর্তব্যবিমূঢ়, ব্যথাহত, আর্ত—সেই স্থানে ঠিক সেই একই অবস্থায় বসিয়া রহিল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ঐক, জরাগ্রস্ত, পুষ্পঝরা, শীর্ণ শাখায় নব বসন্তের নবীনগমে নবপত্রমুকুলে যে নূতনতর শোভাসম্পদের সমাবেশ করে, কোকিলের কুহুতে, পাখিয়ার প্রিয়মু-সন্ধানে, গ্রামাদোয়েল বুলবুলের আনন্দগীতির মধ্য দিয়া যে উৎসব-সমারোহ চলিতে থাকে, তরুণ জীবনে যখন নব বসন্তের সমাগম হয়, তখন সেখানেও ঠিক তাহারই অনুকরণ চলে। নীলিমার শীতশীর্ণ হৃদয়-কাননেও এই বসন্তাগম ঘটয়াছিল। তাহার অনাদৃত জীবন যৌবন এত দিন পরে সহসা আজ ফাল্গুনসমাগম লাভ করিয়া সার্থক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তরের সুপ্ত কামনারাশি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রেমের মুকুলকে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সেই বসন্তপুষ্পা-ভরণ জীবনোত্তান ভরিয়া আশারূপী কোকিলের পঞ্চম স্বর, কলনারূপিণী বাণীর বীণার ঝঙ্কার, নব নব বাসনার পুলক-সঙ্গীতে পাখিয়া দোয়েলের মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছিল, আর শীতল-স্নিগ্ধ নির্ঝরধারার মত অপ্রতি-হতগতিলাভে ছুটিয়া চলিয়াছিল প্রেম! ইহার মধ্যে নীলিমা কতখানিই না তাহার মনের মন্দির সাজাইয়া তুলিয়াছিল! পিতার ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া, সুশীলের নিকট অপৰ্যাপ্ত আদর-বহু লাভ করিয়া নিজেকে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরমে উন্নীত করিয়াছিল। তাই সকল কর্মের মধ্যে আজকাল তাহার আগ্রহ, আনন্দ ও উন্মাদ-নার অন্ত ছিল না। প্রভাতোদয় হইতে দিবসান্ত-কালাবধি তাহার যেমন হস্তপদের বিশ্রাম ছিল না,

মনের ভিতরেও তেমনই তরতর বেগে কল্পনা ও আন-ন্দের স্রোত সমান গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। এ বাড়ীর চিরনিয়মিত কদম্ব সে কোন দিনই সুশীলের পাতে পরিবেশন করিতে পারে নাই। অনেক রাত্রিতে ইচ্ছাবিলম্বে পিতার শয়নের পর গরম লুচি, বিবিধ বাজ্ঞন সম্বন্ধে রন্ধন করিয়া সে কি পরিতৃপ্ত সুখেই যে তাহা সুশীলের সম্মুখে নিবেদন করিয়া দিত, সে আনন্দ তাহার জানাইবার স্থান কোথায়? এই সকল সংগ্রহ কত দুঃখেই যে তাহাকে করিতে হয়, সুশীল যদি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত তো কখনই সে ইহার কনিকামাত্র গ্রহণ করিত না। কিন্তু সে যে তাহার এই গোপন দুঃখ জানে না, তাহার জন্তই সে শুধু নিজেকে যে এত বড় দুঃসাহসের কার্য্যে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে, এই-টুকুই যে তাহার সকল কষ্টের একমাত্র সাহুনা, পরম পুরস্কার! সুশীল চিরসুখাভ্যস্ত, এ সংসারের সকল নিয়মের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই নাই; সে স্বপ্নেও জানে না, তাহাকে ঐটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে নীলিমা কত বড় ত্যাগস্বীকার এই দিনের পর দিন ধরিয়া করিয়া চলিয়াছিল। তাই সে অবলীলাক্রমেই সেগুলি সহজভাবে গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু নীলিমার আত্মা পর্য্যন্ত যেন এই দানের মোহে ও ত্যাগের সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল।

কখন কখন বড় সঙ্কটে পড়িয়াই এক একবার সে এমনও ভাবিয়াছে যে, ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়াই উহাকে গিয়া বলি, আমার কিছু টাকা দাও তো, খরচের জন্ত কিছু হাতে নাই। আবার দারুণ লজ্জায় তাহার কৌষারচিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মনে মনে নিখাস ফেলিয়া সে কল্পনা করিয়াছে, সেদিন তাহার কত দিন পরে আসিবে, যে দিন ঐ কথাগুলি নিঃসঙ্কোচ অধি-কারে সে তাঁহাকে বলিতে পারিবে? এমন কি, সুশীলের খোলা সূট-কেশটা তাহার অসাক্ষাতে গুহাইয়া রাখিতে রাখিতে তাহার প্রত্যেক বস্তুটিকেই সে যেন নিতান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে করিয়া সম্বন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছে। তাহার জুতা দু'পাটি ধূলা ঝাড়িয়া কতদিন সেট ধূলা সে মাথায় মাখিয়া পুরুকণ্টকিতশরীরে মানসনেত্রে ধ্যান করিয়াছে—সুশীলের সেই গৌর সুন্দর সুগঠিত সুকোমল পা দুখানি। সে দিন কবে আসিবে, যে দিন সেই দুইটি পা'কে সে সম্বন্ধে বুকে তুলিয়া লইয়া সেবা করিতে পারিবে।

সে দিন অনুকূল বাড়ী ফিরিলে যে সকল ঘটনা

ঘটিয়াছিল, নীলিমা তাহার কোন সংবাদই জানিত না। সে রান্নাঘরে তখন বাটা ছানার সনেশ ও নিমকি প্রস্তুত করিতে একান্তমনে নিযুক্ত ছিল। কখনও এ সকল কার্য্য স্বহস্তে না করিলেও প্রবল ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহায়তায় সে আজকাল অনেক বস্তুরই প্রস্তুতপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তৈয়ারি খাবার একখানি, পরিমার্জিত রেকাবে সাজাইয়া একবার তৃপ্তনেত্রে সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক একটা সুখের নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সে প্রফুল্ল স্মিত মুখে সুশীলের সন্ধানে চলিল।

বেলা তখন অবসানের পথে চলিয়া পড়িয়াছে। সুবর্ণোজ্জ্বল আলোকের বস্ত্রায় ধরিত্রী স্নাত হইতেছিলেন, আকাশের অঙ্গেও সে আলোর লহরী ইন্দ্রভবন বা স্বপ্নলোক রচনা করিয়া দিতেছিল। দিকে দিকে কোকিলের আনন্দকুঞ্জন শ্রুত হইতেছে। জনবিরল বাড়ীটার কোথাও কোন সাড়া নাই। নীলিমা নিজ অন্তরের পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া মুহুমুহু গাহিয়া উঠিল—

“অস্তর মম বিকসিত কর, অস্তরতর হে!”

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সামনের দালানের একটুখানি মাত্র দূরে দেওয়ালের গায়ে পিঠ রাখিয়া কে এক জন রহিয়াছে! কে এক জন? না, কে এক জন হইবে কেন—সুশীলই ত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মুহুমান হইয়া পড়িয়া আছে।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটার সমস্ত ছাত প্রাচীর একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে সে যত না স্তম্ভিত হইত, এই অভূতপূর্ব দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া নীলিমার পুলকচঞ্চল চিত্ত তদপেক্ষাও বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেল। তাহার হাশ্বোদ্ভাসিত মুখ মুহূর্ত্তে কালিমাময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক বদ্ধদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর সে সন্দেহ-শিথিল শ্লথ চরণে ধীরে ধীরে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গেই তাহার বিকসিত হৃৎপদ্ম মুদিত হইয়া আসিয়া তাহার বোধ হইল, অকস্মাৎ যেন একটা প্রলয়ের অন্ধকার মাথা তুলিয়াছে।

অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াও যখন সে সুশীলের দিক্ হইতে কোনই সাড়াশব্দ পাইল না, তখন কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে বিনা বিচারেই এবার তাহার মনের মধ্যে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গেল। কিন্তু সেটা যে কি, কোথা হইতে ঘটিল, এ রহস্য তাহার

কাছে একান্ত জটিল ও অভেদ্য বোধ হইলেও, সে বিস্কৃত চিত্তে ও শঙ্কিত মুখে শুধু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। সহসা সুশীল মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বারেকের জন্ত কঠোর কক্ষনেত্রে নীলিমার পানে চাহিয়া দেখিল। এই ঘণাতরা ত্রুদ দৃষ্টি একটি ক্ষণের মধ্যেই যেন তাহাদের হৃৎজনকার এই মাসেক কালের সকল ঘনিষ্ঠতা, সকল পরিচয়কেই আড়াল করিয়া দিয়া পাষণ-প্রাচীরের মত উত্তত হইয়া উঠিয়া তাহাদের মাঝখানে অর্ধহস্তপরিমিত জমীটুকুকে চাপিয়া রহিল। তাহার অদৃশ্য অটল অভেদ্য দেহ নীলিমার গতি ও বাক্য একসঙ্গেই রোধ করিয়া দিল।

দুই জনের কেহই কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণাবধি সুশীল তাহার আরক্ত ও কঠিন দৃষ্টি বাহিরের শূন্যপথে সংতুষ্ট রাখিয়া অবশেষে আর একবার তাহা অকারণ শুদ্ধ অজ্ঞানা ভয়ে আড়ষ্ট নীলিমার মৌন নত মুখে স্থির করিয়া ধরিল। সার্চলাইট যেমন করিয়া নদীর তলদেশাবধি ভেদ করিতে চায়, তেমনি করিয়া তীক্ষ্ণ কক্ষ দৃষ্টি যেন এই পাষণে পরিবর্তিতা মূর্ত্তিরূপিণী নারীর অন্তরদেশ পর্য্যন্ত উলটিয়া দেখিতে চাহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া অনুসন্ধানে বিরত হইয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল ও তাহার রোষ-ঘণাপূর্ণ চিত্ত যেন-নূতন করিয়া আর একবার ইহার উপর গভীরতর ঘণার তরঙ্গে প্রাবিত হইয়া গেল। তাহার বাপের উপরকার সকল বিদ্বেষ, সকল বিরক্তি, সমস্ত ক্রোধই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া ইহারই উপরে নিপতিত হইল। সুশীলের জ্বালাতরা নিরতিশয় অপমানপীড়িত চিত্ত নীরব কোপে জলিয়া জলিয়া নিজের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, এই ঘণিত বড়যজ্ঞে নীলিমা নিঃসংশয়ই জড়িত আছে। উহার মুখে যে অপরাধের কালি মাখান। আর উহার ব্যবহার কি লজ্জাহীন ও কাপট্যপূর্ণ! এই অপরাধিনী বিশ্বাসহীনের অঙ্গপৃষ্ঠ বাতাস, তাহার নিশ্বাসের মুহু শব্দ, তাহার শুদ্ধ স্থির পাষণমূর্ত্তি অসহনীয় বোধ করিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে উঠিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমার চোখের সামনে সারা বিশ্বটা ভূমিকম্পে তুলিয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল, তাহার পদতলের অবলম্বন কোথায় সরিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কি হইল? কেন হইল? কিসের জন্ত হইল? ইহার কিছুই যদি খুঁজিয়া না পাইয়াও কাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে কার্যের চাইতেও কারণটার জন্তই সে যেন সমধিক ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে।—কি করিলাম যে, আমার তুমি অমন করিয়া গেলে? এই প্রশ্নটাই নীলিমার মনে সব চেয়ে প্রবল স্বরে বাজিয়া উঠিতেছিল বলিয়াই সেই প্রশ্নটাকে বাহিরে পাঠান আজ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কিছু যে একটা ঘটনা আছে, সেটা যে সামান্য কিছুও নয়—বড় অসামান্য, বড় অনাদারণ কোন কিছু এবং সেটা যে নীলিমারই সর্বনাশের আয়োজন, সেই কথাটাই শুধু এই আকস্মিক ব্যাপারের, এই অনুভূতিত গভীর রহস্যের তলদেশে হইতে সহজেই ভাবিয়া উঠিতেছিল। আর সবই ইহার প্রচ্ছন্ন। সেই আসন্ন সন্ধ্যার আলোছায়াভরা সন্ধিক্ষণে নীলিমার শত উদ্দীপনাভরা সহস্র কল্পনালোকে সমুজ্জ্বল পরিপূর্ণ চিত্ত একেবারে অতলের অন্ধকারে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আঁর্ত উর্ধ্বস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, “আমার সব গেল! ওরে আমার সব গেল রে!”

যাহার থাকে, তাহারই যার। যাহার কিছু ছিল না, তাহার কোথা হইতে কি যাইবে? এই যে সাধারণ একটা হিসাব পড়িয়া আছে, কি আশ্চর্য্য, নীলিমার মন একবারের জন্তও তো সে দিক ঘেঁষিয়া গেল না! তাহার ছিল কি, তাহার গেল কি? তাহার কোন হিসাবই সে করিল না। শুধু তাহার বেদনা-তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ প্রাণ হু-হু করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে দারুণ জ্বালায় সহিত অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহার সব গেল! সব গেল! সব গেল! সে যে কতখানি পাইয়া বসিয়াছিল, এই হারানোয় সেটুকুও সমস্তই যেন ভাল করিয়াই অনুভব করিতে পারিল।

অপরূহ সায়াছে ও সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল। জনবিরল পল্লী প্রায় নিঃসাড় হইয়া আসিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে পাদচারী পথিকের গমনাগমন পথচারী কুকুরের সতর্ক চীৎকারে অনুস্থচিত হইতেছিল মাত্র। অদূরে আশ্রয়কাননে শৃগালের দল কোলাহল করিয়া উঠিতেই কুকুরগুলি তারস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া উহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। বাড়ী নিস্তব্ধ—ঘোর

নিস্তব্ধ ইহার কোথাও সাড়াশব্দ নাই, আলো নাই। ইহার মধ্যে জীবিত জীবের নিবাস কল্পনা করাই কঠিন। নিবিড় অন্ধকারে সাবধানতাস্ত পদক্ষেপ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। আর একটু হলেই আগন্তুক সেই একই স্থানে একই ভাবে অবস্থিত অসাড় অস্পন্দ নীলিমার ঘাড়ের উপরেই পড়িয়া যাইত। কিন্তু ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া সে গতি রুদ্ধ করিয়া দিল এবং একটুখানি বুঁকিয়া পড়িয়া চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, “জেগে নীলি? জেগে আছিস? আচ্ছা, একটা আলো জেলে আন দেখি, চট ক’রে।”

কোন অন্ধকার-গুহাগহ্বরপ্রাপ্ত পলাতক মনটাকে টানিয়া আনিয়া নীলিমা যখন পিত্রাদেশ পালনার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিজের উপর দিয়া এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই যে কত বড় একটা বিপ্লব ঘটয়া গিয়াছে, তাহা সে তখনই যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল। কি দুর্বল, কি অবসন্ন, কি অপরিণীত অবসাদগ্রস্তই তাহার সমস্ত শরীর-মন ইতোমধ্যে হইয়া পড়িয়াছে!

প্রদীপ হাতে ফিরিয়া আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে হাতের প্রদীপ তো তাহার পড়িয়া গেলই, নিজেও যেন সে সেই সঙ্গে সঙ্গে পতনোন্মুখী হইল। হয় তো মুচ্ছিতই সে হইত, যদি না সেই মুহূর্তে বাপের কঠোর তৎসনার আঘাত তাহার অবসাদে অবসন্ন চিত্তকে ব্রিষ্টারপ্রয়োগের মতই চেতাইয়া তুলিত। অমূল্য মেয়ের কাছে একান্ত বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া চাপা তর্জনে গালি দিয়া উঠিলেন—

“দিন দিন কচি খুকী হচ্ছিস্ নাকি? ভাবলি পিটীমটে? বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চি ব’লে সেই আহ্লাদে কি মাথারও ঠিক নেই না কি? যা শীগ্গির যা, একটা লঠন জেলে নিয়ে এসে এই টোপর, চেলি, কলা, পান, হলুদ, বাতাসা সব ভাল ক’রে তুলে পেড়ে রেখে দে। আর খাবার দাবার যদি কিছু তোমার গুপ্তীর পিণ্ডী থাকে তাই নিয়ে এস। কাল আবার উপোস ক’রে মরতে হবে তো তোমার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডী চটকাতে। যাও না, উদাসিনী রাজকন্তার মতন অবাক হয়ে দেখছো কি আমার মুণ্ড? টোপর কখন চোখে দেখ নি, না আমাকেই কখন চেনো না?”

নীলিমা এ আদেশও পালন করিল। কেমন করিয়া যে করিল, সে কথা সে নিজেরও বুঝিল না। কাপ্তেনের হুকুমে অকূল সমুদ্রের ভীষণ ঝটিকার সময়েও যে অভ্যাসে ভীত নাবিকরা হাল ছাড়ে না, সেনাপতির আদেশে গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াও সৈন্যদল যে অভ্যাসে অগ্রসর হয়, শুধু সেই চিরাত্যস্ত বাধ্যতার ফলেই নীলিমাও নিজের শরীর-মনের সেই প্রবলকম্পন ও অচলতার মধ্য দিয়া এই সকল কার্য সমাধা করিয়া রান্নাঘরে গেল। রান্না আজ কিছুই হয় নাই। সেই সূশীলের জন্ত সমস্ত প্রস্তুত রেকাবে ভরা খাবারগুলি মাত্র অবশ্যে পড়িয়া আছে। নির্বিচারে তাহাই আনিয়া সে বাপের সামনে ধরিয়া দিল। তাহার মায়ের ঘরে দাঁড়াইয়া তখন তাহার বাপ হাত-মুখ নাড়িয়া তাঁহাকে কোন কথা বুঝাইতেছিলেন। লণ্ঠনের আলোতে নীলিমা দেখিল, স্বর্ণলতার মুখের চেহারায় অকথ্য ভয়ের ও অস্বাভাবিক লজ্জার ছায়া দেদীপ্যমান। তিনি প্রহারভীত বালকের মতই ভয়ানক চক্ষুতে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তখন নীলিমার মনে পড়িল, আজ মধ্যাহ্নের পর হইতে এই মা যে তাহার বাঁচিয়া আছেন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না।

অনুকূল মেয়ের দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া আপন মনের উৎসাহেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“ছোড়াটা কি কম বজ্জাত! কিছুতেই রাজী করতে পারিনে। শেষকালে বাপিলের ভয় দেখিয়ে তবে না তার মুখ-খানা বন্ধ করি। বলেছি, যদি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে, তা হ'লে পাপেটীতে মিলে তা'র নামে ফোজ-দারী করবো। সমস্ত পৃথিবী জান্বে, ভুবন রায়ের ছেলে সূশীল রায় কি জঘন্ত চরিত্রের মন্দ লোক। তখন কোথায় থাকবে তোমার পিতৃভক্তি আর কোথায় থাকবে বড়লোকের মেয়ে সুলেখা!—এখন কোন গতিকে কালকের দিনটায় হ'হাত এক ক'রে চারটে মন্তর পড়িয়ে দিতে পারলেই সকল পাপের শাস্তি হয়ে যায়। আজই দিভুম—তা যদি বে-আইনী হয়েছে ব'লে বিয়েটা 'ক্যানসেল' করিয়ে নেয়, সেই ভয়েই শুধু আমার ভরসা হলো না।”

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্ত হিমশিলায় জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার চলন্ত হৃৎপিণ্ড দম-ফুরানো ঘাড়ের মত সহসা থমকিয়া থামিয়া পড়িল। তার চারি দিকের বায়ুস্তর অকস্মাৎ কঠিন পদার্থেরই মত ভারী হইয়া উঠিল। অসাড় হাত হইতে খাতভরা

রেকাবখানা কোন্ সময় যে ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া খাবারগুলা কক্ষভূমির ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই; সে খবরটা জানিতে পারিল পিতৃমুখের কঠোর তিরস্কারে—

“বলি আহ্লাদের চোটে কি আমার ঘরকন্নার কিছু আর রেখে যাবে না? বলি তুমিই না হয় বড়মানুষের বউ হচ্চো, আমার কি তা ব'লে রাজা ক'রে দেবে যে আমার সর্বস্ব ভেঙ্গে ছড়িয়ে লোকসান করে দিয়ে যাচ্ছে?—বলি ব্যাপারখানা কি বলতে পার?”

বাপের খাবারগুলা কুড়াইয়া দিয়া কোন রকমে নীলিমা সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। নিজের ঘরে খিল দিয়া অন্ধকারে শয্যাহীন তক্তাখানায় গিয়া বাসিতেই চারিদিক হইতে একসঙ্গে একত্র বাঁধতাজা জলরাশির মত বিবিধ ও বিভিন্ন চিন্তাস্রোত তাহার বুকের মধ্যে বিচিত্র তালে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ঘোর বিস্ময়ের স্থলাধিকার করিল—অপরিমেয় আনন্দ। এই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে যখন মায়ের আর্ন্ত চক্ষু ও বাপের চাতুরীভরা বাক্য দর্শন-শ্রবণের অতীত হইয়া গেল, তখন শুধু একান্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল, এতদিনের সংশয়সঙ্কর্ণ কীণ কল্পনার পূর্ণ পরিণতির সার্থকতা ও সুখ। সর্বদেহে মনে আহ্লাদে কণ্টকিত হইয়া নীলিমা মনে মনে সূশীলের তরঙ্গরূপ ধ্যান করিল। কি সুন্দর সূঠাম দেহ! কি উদারব্যঞ্জক গভীর দৃষ্টি! আর কি সুমিষ্ট হস্তরঞ্জিত সেই গোলাপী অধর! সে হাসির সুখ যে নীলিমার চিত্তচকোর কি দ্রুত ক্ষুধায় মনে মনে গ্রাস করিয়া লইয়াছে! তাহার মুদিত হৃদয়কোরক সেই হস্তরাশ্মিবিভাসিত হইয়াই আজ এই সহস্র দলে বিকসিত হইয়া তীব্র লোতাকুল দৃষ্টিতে সেই গগনব্যবধান দীপ্ত সূর্যের পানে গোপন আকাঙ্ক্ষায় শুধু চাহিয়া ছিল। উঃ, কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ রে!—আজ সেই তার মরুমরীচিকা সত্য হইতে, স্বপ্ন সফল হইতে চলিল! কি আনন্দ! নীলিমার জীবনে আজ অপ্রত্যাশিত কল্পনা-ভীত এ কি বিপুল আনন্দ রে! এ কি অসীম সুখ! স্বর্গরাজ্য বাস্তবিকই কি মর্ত্যমানবীর উপভোগে ধরণীর এক প্রান্তে নামিয়া আসিল না কি?

নীলিমা আনন্দোন্মত্ত বন্ধে মনে মনে অহুতব করিতে লাগিল। সূশীলের সুকোমল তপ্ত স্পর্শ, তাহার সেই প্রণয়গভীর দৃষ্টি; সেই মেহ

সুশীল দৃষ্টি সে নিজের পিপাসিত দেহ-মনে মর্মে মর্মে উপভোগ করিয়া লইল। নিজেকে তাহার ঘরের নবোঢ়া বধু, গৃহলক্ষ্মী, সন্তানজননী—সকল ভাবেই এক একবার ভাবিয়া লইল। জীবনে এ কি সার্থকতা! স্বপ্নে এ কি সুবিপুল সুখ! এ কি অবাচিত করুণা, হে দয়াময়!

ঈশ্বরের নাম লইতে গিয়া নীলিমার মনে পড়িয়া গেল, যীশুকে। এই মাসাবধি কাল স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং সেই জন্ত এ নামও সে লয় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, সুশীলের ভিন্ন কোন দেব-মানবেরই স্মৃতি এই প্রায় একটি মাস ধরিয়াই তাহার মনের ভিতর প্রবেশাধিকার পায় নাই। তাই আজ এমন সময়ে আনন্দসাগর যখন কূলপ্রাবী হইয়াছে, সেই সময় এই স্মৃতি স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইয়া তাহার ভরাচিত্তে সামান্য একটা দোল খাওয়াইয়া দিল। যীশু?—না, না, আর ও নাম নয়!—ও নাম, ও স্মৃতি, এ জীবনের অতীত হইয়া বাউক! ভ্রমেও আর কখন যেন উহা তাহার মুখে উচ্চারিত না হয়। সে চকিত হইয়া উঠিল—আঃ কি ভাগ্যেই সে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে! ভাগ্যে মিস হর্ণের কথায় সে ব্যাপটাইজ হইয়া বসে নাই, হইলে কি আজ সে সুশীলকে পাইত? সুশীলের মুখে সে গল্প শুনিয়াছে, তাহার পিসীমা নিত্য শিবপূজা করেন, তাহার পিতা দুই বেলা সন্ধ্যার্চনা করিয়া থাকেন; সে দেখিয়াছে, সুশীলও প্রাতে গায়ত্রী জপ করে। সে মনে মনে স্থির করিল, সরোজিনী-পিসীমার নিকটে সেও শিবপূজাবিধি শিখিয়া লইবে, ভুবনবাবুর আফকের স্থান সে সময়ে সাজাইয়া দিবে। কোন্ দেবতার ইহারা উপাসক, তাহা জানিয়া লইয়া সেও অপরিমিত ভক্তিতে তাহাকেই উপাস্ত করবে। কে বলে, হিন্দুর ধর্মে মুক্তি নাই; তাহাদের জীবনে উদারতা নাই, ত্যাগ নাই—সংযম নাই? যে বলে সে দেখুক—সুশীলকে। তাহার ত্যাগ—তাহার—তাহার—

নীলিমার হর্ষোদ্গীর্ণ আনন্দাস্তিত মুখ সহসাই সেই ঋনাককারে তাহারই মত কালিমাতা হইয়া গেল। তাহার মানসেন্দ্র তন্মুহূর্তেই অপরাহ্নালোকে দৃষ্ট সুশীলের সেই ভৎসনাকঠোর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিল। সে দৃষ্টির অগ্নিকণা নীলিমার চিত্তে দক্ষ ক্ষত সৃষ্টি করিয়া যে ভিতরে ভিতরে আনন্ধান হইয়াই রাহিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তখনই প্রমাণ হইয়া গেল। কেন

যে সুশীল অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শের মতই তাহার হাঁতের ছোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া লইয়া তীব্র বিরাগে তাহার সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, এইবার সেই জটিল রহস্যের জাল আপনা আপনিই মুক্ত হইয়া গেল। উঃ, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নন্দন? কোথায় আনন্দ-লোক? জালা—জালা! চারিদিক ব্যাপিয়া এ যে শুধু রাশি রাশি অগ্নিদাহ! অফুরন্ত আগুনের দাহ-করী জালা! সুশীল তো স্বেচ্ছায় তাহাকে গ্রহণ করিতেছে না।

নীলিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া লুটাইতে লাগিল। সেই দৃষ্টি! সেই ঘৃণা! সেই অকথ্য ঘৃণা! তাহার বিনিময়ে এই সুখাকাজক্ষা? সুখ—কোথায় সুখ? পাগল—সে পাগল! যার চোখে ওই বিদ্রোহের লেখা—যার মনে ঐ ঘৃণার অবহেলা, তাহাকে চক্রান্তে জড়াইয়া আত্মসাৎ করিলেই সে কি তাহার আপন হইবে? অসম্ভব! নীলিমার আশা যে অসম্ভব আশা! নীলিমার পিতার ছরভিসন্ধি তদপেক্ষাও অসঙ্গত অকার্য্য! জোর করিয়া তিনি তাহাকে উহার গলায় ঝুলাইয়া দিখেন, কিন্তু সে তার তাহার সহিবে কি?

সারারাত্রি ধরিয়াই সেই শুষ্ক নিবুস নিরালায় নিরালোকে একাকিনী বসিয়া সে ভাবিল। প্রথমে বিস্মীর ব ভিন্ন তাহার সেই অমীমাংসিত চিন্তার দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্য রহিল না। তাহার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদনে কোথাও হইতে কোন সাড়া আসিল না। অন্তরের সংশয়বৃন্দের কোনই সমাধান হইল না। একবার তাহার মন দাক্ষণ বিদ্রোহভরে এই ছরস্ত্র লোভকে দুরীভূত করিয়া দিয়া বলে, কি হইবে অমন হীন মূল্যে হেয় হইয়া দস্যুর মত লুটিয়া লইয়া? তেমন করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া কেহ কি চিরদিন কাহাকেও আপন করিয়া রাখিতে পারে? আবার মন বলে, ছ'দিন ছ'দিনই সহি! ছ'দিনের স্মৃতিকেও তো চিরদিনের সঞ্চল করিয়া রাখিতে পারিবে? স্বর্গ যখন মর্ত্যলোকের দ্বারে আসিয়াছে, তখন কেনই বা তাহাতে না প্রবেশ করিবে?

সহসা পূর্বদিকের জানালা দিয়া পীতাম্ব আলোর রেখা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্রূপবৎ নীলিমা সবেগে উঠিয়া পড়িয়া ঘন খাসে আত্মগতই বলিয়া উঠিল, “না না, সে আমার কাজ নেই, সে সুখ আমি চাইনে, দুঃখই আমার থাক!”

হার খুলিয়া সুশীলের দ্বারে আসিয়া সে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না, পূর্বাকাশের প্রান্তটি মাত্র গোলাপের অর্ধফুট মুকুলদলের মতই আধখোলা হইয়াছে। নিদ্রাঘতপ্ত নিশার তাপদাহ প্রশমিত করিয়া মিষ্ট শীতল বায়ু সবেমাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সশঙ্কনেত্রে চারি দিকে চাহিয়া নীলিমা পুনশ্চ সেই রুদ্ধ দ্বারে অধীর করাঘাত করিল। দ্বারের ফুটায় মুখ রাখিয়া যতটুকু সম্ভব স্বর উঠাচ্চ কবিতাই বলিল, “যদি চ’লে যেতে চাও, এখনই ট্রেন ছাড়বে। আর দেহী করো না।”

ঘর নিঃশব্দ। কোথাও কোন শব্দমাত্র নাই। তবে তো সুশীল নিদ্রা যাইতেছে। সে তো তবে মনের এই অবস্থাতও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিয়াছে? তবে বুঝা কেন নীলিমার এ সঙ্কোচ? না না, বুঝাই এ সন্দেহ! সুশীল তাহাকে ভালবাসে,—নিশ্চয়ই সে তাহাকে ভালবাসে এবং তাহার চুইতে তাহার এমন কিছুই আপত্তি নাই। কিন্তু তাই কি? নাঃ, এত আর ভাবা যায় না, যদিই থাকে, তবে তা থাকুক, এ লোভ নীলিমা কিছুতেই দমন করিতে পারিবে না। না না, নিজের এ সর্বনাশ কেনই বা সে করিতে যাইতেছিল? এত বড় নির্বোধ সে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তরুণতা স্বামীর কর্মস্থান হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া। প্রথম, বাপ ভাইয়ের সঙ্গে দেখাশুনা, দ্বিতীয়তঃ, তাহার ছোট দেবর শশিকান্তের সহিত বিনতার বিবাহসম্বন্ধ পাকা করা। এ বিবাহের কথা অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে, শুধু ছেলের ডাক্তারীর ফাইনাল পরীক্ষার জন্তই এত দিন বিবাহ আটকাইয়া ছিল। এইবার পরীক্ষায় সমস্যানে উত্তীর্ণ হইয়া শশিকান্ত মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে হাউস-সার্জনের পদ পাইয়াছে, বিলাতে গিয়া আরও কোন একটা বিষয় অধ্যয়ন করিবারও তার ইচ্ছা আছে। সেই জন্তই তাড়াতাড়ি বিবাহটা হইয়া যায়, পাত্রপক্ষের এই বকমই আগ্রহ। বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে।

ভুবনবাবু সব কথা শুনিয়া বলিলেন, “বেশ তো.

তাই হোক। বিপ্রদাসও সুলেখার বিয়ের জন্ত ব্যস্ত হইছেন, দু’জনকারই এক মাসে হয়ে যাক না।”

ধবর শুনিয়া বাড়ীর ও পাড়ার লোক আনন্দ প্রকাশ করিল, কেবল করিল না বিনতা এবং শুভেন্দু।

বিনতা প্রথমে আকারে ইজিতে, পরিশেষে স্পষ্টাকরেই পিসীমা’কে গিয়া জানাইল যে, দিদির দেবরকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না, কোন মতেই না।

পিসীমা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠোট উন্টাইয়া বিনতা জবাব দিল—“আহা, যে ভূতের মতন মূর্তি! অন্ধকার স্বত্রে দেখলে খোকসের বাচ্চা ব’লে ভয় করবে না? বেহায়াই বল, আর যা-ই কর, আমি বাবু স্পষ্ট কথার মানুষ; শুকে বিয়ে করা আমার কর্ম নয়।”

পিসীমা প্রথমতঃ মেয়েকে উপদেশ ও ভৎসনায়, অবশেষে তোষামোদে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং সে সকলে অকৃতকার্য হইয়া তরুকে সব কথা জানাইলেন। তরু আসিয়া বোনকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিল। পরে বিরক্ত হইয়া বলিল—“কেন বাবু, ছোট ঠাকুপোর চেহারা এমনই কি মন্দ না কি? রংটাই তার বা একটু শামলা।”

বিনতা থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—“বা রে বা! ঐ তোমার ‘একটু শামলা’!—তা তুমি আর তা ছাড়া কি-ই বা বলবে? তোমার বাড়ীতে যে বার মাস অমাবস্তা লেগেই আছে! যা হোক, তা ব’লে তোমার শান্তদীর কিন্তু বাবু ঐ ছেলের শশিকান্ত নাম না রেখে মসীকান্ত নাম রাখাই উচিত ছিল। থাকে বলে কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন, এ ঠিক তাই!”

তরু এ বিজপে রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল,—“হ্যা রে হ্যা! আমার ঐ অমাবস্তাই ভাল। তোম মনে না ধরে, কোথায় তোম পূর্ণিমার টাঁদ আছে, তুই সন্ধান ক’রে নি’গে যা।”

বিনতা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না,—অসঙ্কোচেই সে হাসিয়া কহিল—“সন্ধান তো করাই রয়েছে! ঘরেই তো আমাদের চির-পূর্ণিমা হয়ে রয়েছে, তাও কি তোমরা দেখতে পাও না?”

বিশ্রয়োত্তেজিত মুখে সংশয়ের সহিত তরু জিজ্ঞাসা করিল—“ঘরে আছে? কে? না না,—শুভেন্দু নয় তো?”

বিনতা দীপ্তমুখিত মুখে উত্তর দিল—“হ’লেই বা, তাতে দোষ কি?”

বোনের মুখের এই সুস্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তরুণতার মুখ স্নান হইয়া গেল। তাহার এই স্বাধীন পতিনির্বাচনটাকে সে বেশ সুনির্বাচন বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিল না, এবং ইহার বিরুদ্ধে সে দুই দিন ধরিয়া তাহার সহিত সমানেই তর্ক চালাইয়া চলিল। তার পর যথাসাধ্য চেষ্টাতেও অবশেষে বিনতার পণ ভাঙ্গিবার যখন কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অগত্যা খবরটা তাহার ভূবন-বাবুকে দিতে হইল। সংবাদ শুনিয়া ভূবন বাবুরও মাথায় ঘেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আকাশ-পাতাল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনিও পুনঃ পুনঃ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। তাঁহার সে দিনকার ডায়েরীর পাতায় এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—“সরোজের মুখে, তাহার পর তরুর মুখেও খবর পেলেম, বিনতা না-কি শশীকে বিয়ে না ক’রে শুভেন্দুকে বিয়ে করতে চায়! ওরা না কি অনেক বুঝিয়েছিল, কিছুতেই তার মত বদলায়নি। সকলই ভাগ্য! শশীর মত সুপাত্রকে তুচ্ছ ক’রে ঝোঁকের মাথায় শুধু রূপে মুগ্ধ হয়ে শুভেন্দুকে বিয়ে করা বিনতার নিতান্তই ছেলেমানুষী কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমিও তো আর তা ব’লে এ সম্বন্ধে তাকে বিশেষ জোর করতেও পারি নে। পারি কি? মেয়ে বড় হয়েছে, তার স্বাধীন মতামত জন্মেছে!—অজ্ঞ দেশের শাস্ত্রে তো বটেই, হিন্দুশাস্ত্রমতেও এ বয়সে মেয়েকে অনুচা রাখলে সে মেয়ের স্বয়ং পতি-নির্বাচনের অধিকার জন্মে থাকে।—এ ক্ষেত্রে সে আমাদের পছন্দকে যদি ঠেলে ফেলে নিজের পছন্দ ক’রে থাকে, সে ক্ষেত্রে আমার আপত্তি করা তো চলে না। হয় তো তাতে তার মানসিক শাস্তি চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষতঃ মনে মনে এক জনকে সে যখন পতিত্ব বরণই করেছে, তখন কোন সুযোগের খাতিরেই আর অপর জনের স্ত্রী হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও তো হবে না!—অথচ এ কি ভুল নির্বাচনই সে করলে! চারু, চারু! আজ যে তুমি নাই! তুমি থাকলে কি আমার এ সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারতেন না? তবে কি এই জন্মই মেয়েদের বিবাহকে কৈশোরের সীমাবদ্ধ মাথার নিয়ন্ত্রণে আমাদের সমাজে হয়েছিল?

আমাদের এই জাতিভেদের, শ্রেণীভেদের সমাজে অপরাপর সমাজের মত স্বাধীন নির্বাচনের পথ তো মুক্ত নয়! তবু আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে, নিতান্তই অ-কুলীন হ’লেও শুভেন্দু জাত্যাংশে হীন নয়।”

তরু আর একবার বোনকে ভয় মৈত্রী প্রদর্শনে বশীভূতা করিবার চেষ্টা করিল; বলিল—“রূপটাই কি সব? ছোট ঠাকুরপোর মত বিজ্ঞা, বুদ্ধি, মান-মর্যাদা, পরমা সে সব কি শুভুর কিছু আছে? ওর কি দেখে তুই ভুল্লি? শুধু আলতাগোলা রং, শুকপাখীর মতন নাক, চোখ দুটো পটল-চেরা আর পাতলা রান্ধা ঠোঁট? এ পৃথিবীতে এই কি সমস্ত?”

বিনতা জ্রুটী করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার পর উত্থলিত ক্রোধকে জঁবন্ধমন করিয়া লইয়া সবিরক্ত হান্তে উত্তর দিল—“বলেইছি তো রূপের তর্কে তোমার অধিকার আমি কোন দিনই স্বীকার করব না! তোমার পক্ষে কটার চাইতে কালো চামড়াই ভাল লাগা সম্ভব এবং হয় তো সম্ভবও হ’তে পারে, তাই ব’লে সবাইকেই বা তা মানতে হবে কেন? তার পর তোমার ছোট ঠাকুরপোর চাইতে উনি বিস্তর কম হ’তে পারেন। বুদ্ধিতে যে কম, তাও হয় তো আমি মনে করিনে। এত অল্প সময়ে এমন আত্মোন্নতিসাধন করতে ক’জন লোকে পেয়েছে? ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যদি যান, নিশ্চয়ই সেখান থেকে পাশ ক’রেই কিরবেন এবং তখন হয় তো এমনও হ’তে পারে যে, তোমার ছোট ঠাকুরপো ওঁর চেয়ে ঢের নীচেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। লোকটা যে একটা ‘জিনিয়াস’, তাতে কোনই সংশয় নেই।”

তরু মনে মনে বলিল—“জিনিয়াস হ’তে পারেন;” প্রকাণ্ডে পুনশ্চ অজ্ঞ পণ ধরিল, বলিল—“বেশ তো, ছোট ঠাকুরপো ছাড়া কি আর দ্বিতীয় পাত্র ভূ-ভারতে নেই? সুন্দর ছেলে শুভুর চাইতেও অনেক অনেক পাওয়া যায়,—বাদের চাল-চুলা আছে, নাম-খ্যাতি আছে, বিজ্ঞাও আছে। বাবাকে বলি, তাই তিনি খুঁজে দেখুন না। বিশেষ শুভুদের ঘর যে বড় ছোট! শ্রোত্রিয়ের ঘর! ওদের মেয়ে আনা গেলেও, ওদের ঘরে আমাদের ঘরের মেয়ে তো একে-বারেই দেওয়া যায় না।”

বিনতা বিরক্তি-বিরস কঠিন স্বরে কহিয়া উঠিল

—“ঘর-দোরের অত খবর আমি জানি টানি নে। শ্রাক্ষণের ঘরে জন্মেছে,—সেই চের। আর তা’ না হ’লেও আমি কিছু আর কারকে বিয়ে করতুম না,—আর এখনও তা কারক কোন কথাতেই করবোও না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।”

ভুবনবাবুর সে দিনের ডায়েরীর পাতায় লিখিত হইল—“নাঃ, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিনতার পণ অটল। হয় তো এই ভাল।—একজনকে মনে স্থান দিয়া বাহিরে অন্তরে হওয়া কোন দিক দিয়া দেখিলেই আমারও সমস্ত বলিয়া মনে হয় না—উপায় নাই। এ বিবাহ আমার দিতেই হইবে। শুভ্রকে বলিলাম,—সে-ও সব কথাই জানে দেখিলাম। উহার দুই জনে অনেক দিন হইতেই না কি বিবাহের জন্ত বান্ধস্ত আছে বলিল। আমিই অন্ধ ও অবিবেচক। মেয়ে বড় করিয়া রাখিয়া তাহাকে অন্ত বাড়ীর ছেলের সঙ্গে অবাধে মিশিতে দিয়া অন্তায় করিয়াছি।—শুভেন্দুকে প্রথমাবধি হোষ্টেলে রাখাই আমার সমস্ত ছিল। যাক্, ‘নির্বাণদীপে কিম্ব তৈলদানম্’—এখন আর ব্যথা অনুতাপে যাহা হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিবে না।—বিবাহের দিন স্থির করিতে তর্করত মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র দিলাম। সুশীলের বিবাহটাও এই সঙ্গেই হইয়া যাউক। বিনতার বিবাহে সম্ভবতঃ একটু গোলযোগ হইবে। জ্যেষ্ঠাঙ্গী আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার ক্রোভের সীমা থাকিত না।—বিবাহটা যত শীঘ্র সম্ভব দিতে হইবে এবং—এখানেই দিব। বিপ্রদাস আবার কোন গোল করিবেন না তো ?—চাক্ !—তুমি থাকিলে হয় তো এসব হইত না। মা’ যা’ পারে, বাপ হয় তো মেয়ের সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি পারে না। কিন্তু ছেলেকে মায়ের চেয়ে বাপেই হয় তো ভাল রকম শিক্ষা দিতে পারে। সুশীলের বিষয়ে আমার কোন ভ্রুটি হইয়াছে মনে হয় না। ভগবান্ এও আমার মনে কম সাস্তনা দেন নাই।”

পরদিনের ডায়েরীতে লিখিত হইল—“অনুকূলকৈ খবর দেওয়া শুভেন্দুর আদৌ ইচ্ছা নহে। সে বলে, ‘বাপ আসিয়া হয় তো কোন বিলটি ঘটাইবেন। ভদ্রসমাজে হয় তো আপনাদেরও তাহাতে অপমান হইতে হইবে।’ সে বলে, ‘বাপের তো আমার উপর টান কতই। সুশীলকে জিদ্ করিয়া রাখিলেন, আমার প্রথম দিন হইতেই বিদায় দিতে ব্যস্ত।’—

আমার মনে হয়, বাপের চেয়ে ছেলেরই এ সম্বন্ধে দোষ বেশী। এই তো সুশীল সেখানে এক মাস হইতে যায় রহিয়াছে। মা যে মৃত্যুশয্যায়, তাহাতে দৃকপাতও নাই। চাক্ষুশি! এ কি হইল? মনের মধ্যে এত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস লইয়া তাহারই হাতে আমার কন্তাদান করিতে হইবে? বীণাকে কি নিজেই আবার একবার ভাল করিয়া বুঝাইব? না, না, সেই বা কেমন করিয়া হয়? তা’কে কি বলিব? সে যে নিজে বলিতেছে, সে শুভেন্দুকে বিবাহ করিবে বলিয়া তাহার কাছে পণে বন্ধ, তার কি আর বদল হয়?—হয় কি তা?

“সরোজ বলে, ‘কেন হইবে না? কত বর তো ছান্দাতলা হইতেও ফিরিয়া যায়, আবার অন্ত বরে বাপ মেয়ে সম্প্রদান করিয়া থাকে।’ এটা তার বুঝিবার ভুল। সে কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! সে বিবাহের দাতা যে মেয়ের বাপ। মেয়ে নিজে তো নহে। মেয়ে যাহাকে আত্মসমর্পণে প্রতিশ্রুত, ভালমন্দ নির্বিচারে তাহাকেই তাহার নেওয়া সম্ভব। না হইলে যে সাবিত্রীর আদর্শ হিন্দুনারীর ভিতরে থরক হইয়া যাইবে! মেয়ে বড় করলে নিজের মতকে ছোট করিতেই হইবে। নহিলে তাহা অত্যাচাররূপে গণনীয় হইবে। নারীত্বের—সতীত্বের অমর্যাদা ঘটিবে। হয় তো ইহার ফল ভালই। হয় তো সাবিত্রীর মতই আমার বীণা মা শুভেন্দু-চরিত্রের সকল অশুভকে জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। চাক্! চাক্! তুমি স্বর্গ হ’তে উহাদের আশীর্বাদ করিও। সতী তুমি, তোমার আশীর্বাদে তাদের ভাল হইবে।”

“বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গেল! বিবাহের দিন এ মাসে ঐ একটি ভিন্ন আর একটিও নাই।—তা হোক, যা হইবার, তা হইয়া যাউক। সুশীলকে আজ একটা ‘তার’ দিতে বলি।—এ’ কি, সুশীলের নাম ধরিয়া ডাকে কে? সরোজ না? হাঁ, তাই তো।—আমার সুশীল! আমার জীবনের আশাজ্যোতিঃ! আমার সকল দুঃখের শীতল সাস্তনা! আমার বংশের প্রদীপ! আমার চাক্ষুশীর ধন! এসেছ তুমি? এই একটি মাস তোমায় ছেড়ে দীর্ঘতম যুগান্তর ব’লে যেন মনে হচ্ছিল। কৈ, দেখি সে কেমন আছে? বুকে নিরে এই আর্ন্ত বুকটা একটুখানি জুড়িয়ে আসি। বীণা যে মনের মধ্যে আমার বড়ই আঘাত দিয়েছে। ওকে দেখে হয় তো একটু ভুলতেও পারবো। আঃ, সুশীল! এলি তুই!”

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির অন্ধকারে বাহা অসন্তুষ্ট ও আশাহীন বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, দিবালোকের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অখণ্ডনীয়ত্বের আস্থা খণ্ডিত হইয়া তাহাকে সম্ভাবনীয়রূপে প্রতীয়মান হয়। সুনীলের যে সাহস ও শক্তি গতকালকার অপ্রত্যাশিত মিথ্যা অপবাদে আঘাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ দিবসাদিপের অভ্যাসসূচনার সহিত আবার তাহার কিছু অংশ যেন তার বিক্ষুব্ধ ও বিপন্ন হৃদয়প্রান্তে জাগিয়া উঠিল। নিদারুণ শাক্যশেলে বিদ্ধ তাহার আহত শোণিতাক্ত চিত্ত যেন সারা রাত্রির প্রলয়াককারের পর এতক্ষণে এই তরুণ উষার অভ্যাসে তাহার কনককীর্ণিতে আশা-রূপ রাগে আবার অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে দৃঢ় এবং স্থির চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিল, এত বড় অজ্ঞানের মূল্যে সে কোনক্রমেই ইহাদের হস্তে আত্ম-বিক্রয় করিবে না। ইহাতে ভবিষ্যতে বাহা ঘটবার, তাহাই ঘটুক। এই চিন্তার পর তাহার শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণ যে ঘুমাটয়াছিল, তাহা মনে নাই, যখন সে ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। পিছন দিককার খোলা জানালা দিয়া তপ্ত হাওয়া এবং গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্র উভয়ই অপরিাপ্ত পরিমাণে গৃহে প্রবেশলাভ করিতেছে। জানালার বাহিরে ভাঙ্গা কার্ণিসের উপরে কয়েকটি কাক বসিয়া সাবধানসূচক তীক্ষ্ণরে হয় তো বা তাহার এই অকাল-নিদ্রার জন্ত তাহাকেই তিরস্কার করিতেছিল! ঘুম ভাঙিতেই আবার সকল কথাই তখন সুনীলের মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িতেই নিজের এই অবিস্ময়কারিতার জন্ত মনে মনে সে অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, এমন বিপদ মাথায় লইয়াও মানুষের চক্ষুতে ঘুমও তো আইসে? সে তখন উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি একটা জামাটানিয়া গায়ে দিল ও স্ট্রটেক্স খুলিয়া মনিব্যাগটা ও ঘড়িটা পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

“এস, এস, বর! এতক্ষণে তোমার ঘুম ভাঙলো! এ দিকে আত্মদিক করতে ব’সে পুরুত মশাই ছটফট করতে লেগেছেন যে।”—এই সুসংবাদ প্রদান পূর্বক পুরোহিত ঠাকুরের দ্বিদি ঠাকুরানী চারটি

সধবা মেয়ে সঙ্গে লইয়া সুনীলকে চারিদিক হইতে বেড়িয়া ধরিলেন। হাতে তাঁহাদের খানিকটা করিয়া বাটা হলুদ।

দ্বিদি কহিলেন, “ওলো বউ! মেয়েটার পাতাচাপা কপাল লো! কেমন মদনমোহন বরটি জুটেছে দেখ!”

পুরোহিতগৃহিনী অর্দ্ধাবগুষ্ঠন একটুখানি সরাইয়া অনিমেয়ে মুগ্ধ চোখে সুনীলের নিম্প্রভ প্রভাতচন্দ্রের মতই দীপ্তিশূন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুলকিত স্বরে উত্তর করিলেন, “আহা, বেঁচে থেকে ভোগ করুক গো! স্বর্ণ ঠাকুরঝি আমাদের বড় দুঃখী গো! আর নীলি মেয়েটারও কখন কোন সুখ হয় নি। মা মঙ্গলচণ্ডী যদি কৃপা ক’রে দিয়েইছেন, তা’ পাকা মাথায় সিঁদুর প’রে ছুটিতে একটি হয়ে যেন সুখে থেকে ভোগ করে।”

পাড়ার চণ্ডীদাসীর এই আশীর্বাদের ঘটা শুনিয়া তা’ সহ হইল না। সে তাহার পার্শ্ববর্তিনীর কানের কাছে চুপি চুপি বলিয়া উঠিল, “জুটবে না কেন লো? ঘরে এনে পুষে রেখে—এখন দায়ে পড়েই না বিয়ে করছে! এমন বর জোটানর প্রবৃত্তি থাকলে আমাদেরও ঢের জুটতে পারতো। পোড়া কপাল!—পোড়া কপাল!”

কথাটা সুনীলের কানে গিয়া আবার তাহাকে কর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল এবং সেই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে নারীর দল তাহার লগাটে হলুদ লেপিয়া দিয়া একসঙ্গে হলু ও শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রোষক্ষুব্ধ সুনীল সঙ্কোপে কহিয়া উঠিল, “এ কি করছেন আপনারা?”

মহিলাসংলগ্নী উচ্চ হাস্তে ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রোপ তাহাকে বিব্রত করিয়া একটা স্মিষ্ট কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সুনীল বিস্তর আপত্তি করিয়াও ভদ্রতার সীমায় পা রাখিয়া তাহাদের হস্তমুক্তির কোন উপায় মাত্র না দেখিয়া শেষে নিরুপায়ে মস্তনিরুদ্ধবীৰ্য্য সর্প-শিশুর মতই কুলিতে লাগিল। নারীর নিকট পুরুষের পৌরুষকে যে পরিহার করা ভিন্ন উপায় নাই!—সে আর করিবে কি?

বরপক্ষের আত্মদিক করিতে বসিয়া পুরোহিত মহাশয় আগাপোড়াই না হয় তাঁহাদের তিরস্কালের জীবিত মৃত ব্যক্তিবর্গকে নির্কিঁচরে যথাসমিগোত্র দিয়াই সারিয়া লইলেন; কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ বেখানে

অধিবাসী বরকে প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে ফাঁপরে পড়িয়া যাইতে হইল। বর সেই গাত্রহরিদ্রা সমাধা হইবার পর কন্তাকর্তাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত কি কথাবার্তা কহিবার পর হইতেই স্বর্ণলতার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও সে সেখান হইতে নড়ে নাই। প্রথমে ইহাকে উহাকে দিয়া, পরিশেষে অনুকূলচন্দ্র নিজের গিয়া তাহার হাত ধরিয়া পর্যন্ত টানাটানি করিয়াছেন, উঠাইতে পারেন নাই। তাহার কারণ শুধু সুশীলেরই উঠিতে আপত্তি মাত্র নহে, স্বর্ণলতা দুই দুর্বল বাহু দিয়া তাহাকে নিজের কাছে এমন করিয়া আগলাইয়া ধরিয়াছিলেন, ও যে কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিতেছিল, এমন জলন্ত আগুনে ভরা ভৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিতোছিলেন যে, এমন কি, ইচ্ছা থাকিলেও সে ইহার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না।

অনুকূল রাগে আগুন হইয়া মুমূর্ষু স্ত্রীকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিল, তাঁহার হাত জোর করিয়া ছাড়াইতে গেল,—কিন্তু শাবক-অপহরণকারীর প্রতি ব্যাত্রা যেমন করিয়া চাহিয়া শাবককে প্রাণপণ বলে বন্ধে চাপিয়া ধরে, তেমনই করিয়া যেন তাঁহার মৃত্যুবলে বলীয়ান চিত্ত অসীম শক্তি সংগ্রহ করিয়া সুশীলকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। ইহা দেখিয়া সুশীল বলিল, “আপনার কি রক্তমাংসের দেহও নয়? মানুষটাকে মেরে ফেলবেন না কি?”

অনুকূল অস্পষ্ট তর্জনে উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক অকথা কুকথা কহিতে কহিতে ফিরিয়া গিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, “মরুক গে; নেও, তবে অমনই অমনই সেরে নেও। মাগীর আজ মরণরোগে ধরেচে, জোর করতে গেলে পাছে ম’রে গিয়ে সব পণ্ড ক’রে বসে, তাই শুধু পারুলুম মা—না হ’লে আজ একটা এম্পার ওম্পার হয়ে যেত। দাঁড়াও না, গোত্রটা একবার বদলে যাক। তখন এর শোধ তুলবো কি না, দুজনকাই ওপোরেই!”

পুরোহিত হতভম্ব হই। করিয়া থাকিয়া আপত্তির স্বরে বলিলেন, “তা কেমন ক’রে হবে? বর না এলে কখন এ সকল কার্য্য হয়ে থাকে? তাঁকে একবার তো আসতেই হবে, যেমন করেই হোক—”

অনুকূল ভীষণভাবে চটিয়া উঠিয়া মুখ খিঁচাইয়া

বলিয়া উঠিলেন, “আরে নেও।—হয় না তো কি হয়? কুলীনদের ঘরে যে ঘাটের মড়া ধ’রে মেয়েদের বিয়ে দিত। তারা কি উঠে ব’সে অধিবাস করতে আসতো না কি? এ’ও না হয় তেমনই করেই হয়ে থাক না।—ভারী তুমি পণ্ডিতী করতে এসেছ আমার কাছে! আমার জানা আছে সব।”

অগত্যা সেই রকম করিয়াই সকল কন্ঠ সমাধা হইল। কেবল অধিবাসের ফোঁটা এবং সূতায় বাঁধা দুর্বা সুশীলকে সেইখানে বসিয়াই অনিচ্ছাসহ পরিতে হইল। স্বর্ণলতা সেই চিহ্নগুলি অতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। কিন্তু সে অশ্রুতে যেন আনন্দাশ্রুও একটু মিশ্রণ আছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, অথচ ইহার সহিত বিরক্তিরও প্রাচুর্য্য ছিল না তা’ নয়।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাহিরে সবুজ জন পনের লোক মিলিয়া বিবাহ-বাড়ীটাকে একটু সরগরম করিয়াছে; আর বাড়ীর ভিতরে সেই পাঁচ জন এয়ো, আর বিনা নিমন্ত্রণে অনাহুতভাবেই আসিয়াছিল নীলিমার স্কুলের সঙ্গিনী সাবিত্রী। এই কয়টি মাত্র নর-নারীর সমাগম। বিবাহে “দীপ্ততাং ভূজ্যতাং” প্রভৃতির কোন জঞ্জালই নাই। বাজারের কিছু মিষ্টান্ন ও চিড়ে-দইয়ের সামান্ত রকম আয়োজন করা আছে। বাহাদের নিতান্তই পেটের জালা, তাহারাই এ বাড়ীতে ঐ সকল খাইবে।

লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরা, আললাট হরিদ্রা-রঞ্জিত, বাম হস্তে হলুদরঙ্গা সূতায় দুর্বার রাশি বাঁধা আর দুই হাতে দুইগাছি রান্ধা শাঁখা এই মাত্র সাজে সাজিয়া বিয়ের কনে এতক্ষণে মাজলিক কার্য্যাবসরে সকল লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক জোর করিয়া নিজের অশান্ত হৃদয়কে ও অবাধ্য চরণকে শাসনের পাশে বাঁধিয়া লইয়া মা’কে খাওয়াইতে ঘরে ঢুকিল। গত রাত্রি হইতে মায়ের যে তা’র খাওয়া হয় নাই, সে কথা সে একেবারে না ভুলিয়া গেলেও নিজের চিন্তা, অবসরহীনতা এবং সকলের উপর সুশীলের সেখানে উপস্থিতি এই সকলে মিলিয়া আর খাবার লইয়া আসা ঘটনা উঠে নাই। এখন নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া এক হস্তে দুধের বাটি, অপর হস্তে সামান্ত ফলমূল ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া কুণ্ঠিত স্নেহচরণে সে আসিয়া মাতৃমন্দিরে দেখা দিল।

তাহার মা দুটি শুষ্ক লতাবৎ শীর্ণ হাতে তখনও স্নানার্থে হাত দুখানি ধরিয়া ব্যাকুল মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাহার আতপতপ্ত কচি কিসলয়ের মত নরম মুখখানির পানে পলকহীন চক্ষুতে চাহিয়া আছেন। নীলিমাও চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, স্নানার্থে মূর্তি যেন এই একটি রাত্রিদিনের মধ্যেই আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের সেই শিশুসুলভ সরলতা কমনীয়তা সক্রিয় স্নেহে ভরা সেই উদার দৃষ্টি সে সব আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া উহাকে যেন রুদ্ধ শুষ্ক ও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। সে স্নানার্থে যেন এ স্নানার্থে নয়। সেই সদা সহানুমুখ আজ কি দীপ্তিশূন্য! সেই আনন্দ-চপল স্নানার্থে আজ তাহার এই বিবাহদিবসে কি অসীম ব্যথাকাতর চিত্তে স্তব্ধ মলিন বিষম মুখে নীরবে বসিয়া আছে! নীলিমার বুকের মধ্যে অবরুদ্ধ বেদনা টনটন করিয়া উঠিল।

আজ প্রথম প্রভাতের ব্যর্থ চেষ্টার পর এই অপ্রত্যাশিত বিবাহব্যাপারের সকল অনুষ্ঠানপর্ব যতই অগ্রসর হইয়া সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, নীলিমার দ্বিধাগ্রস্ত মনের সংশয়-মেঘ ততই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার আশেপাশে আশা ও আনন্দের চন্দ্রালোক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ প্রদীপ্ত করিয়া ছুড়াইয়া পাড়তেছিল। গ্রীষ্মের গুমোট কাটিয়া যেন নৈশ শীতল বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাতপ্ত অন্তরকে স্নান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার কুণ্ঠিত চিত্ত এই বলিয়া আত্মসান্ত্বনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, স্নানার্থের যেমন প্রকৃতি, তাহাতে সে কখনই নিরপরাধে তাহার প্রতি একান্ত অবিচার করিতে পারিবে না। এই দুই দিনের বিরাগ এক দিন অন্তর্হিত হইবেই। কিন্তু এখন দুই জনের চোখে চোখে বারেকের মিলন ফুটিতেই স্নানার্থের দৃষ্টি হইতে এমনই গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের কঠোর জ্বালা ঠিকরিয়া পড়িল যে, সেই দৃষ্টিবাণাহত হইয়া নীলিমার বুক যেন খান খান হইয়া ভাঙিয়া গেল।

স্নানার্থে যখন স্বর্ণলতার হাত হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল এবং নীলিমা মা'কে দুধটুকু খাওয়াইতে বসিল, তখন সর্বপ্রথম স্নানার্থের মনে পড়িল, সন্ধ্যার আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য সে তখন শরীরমানে একটুখানি বল সংগ্রহ

করিয়া লইয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু অনুরূপের কাছাকাছি হইতেই তাহার বুকটা যেন বিশ মণ ভারে ভারী হইয়া আসিল, কঠোর কাছে অশ্রুনির্ঝর যেন তার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, কোন কথা না বালিয়াই সে তাই তাড়াতাড়ি তার পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। সে তখন আশ্চর্য হইয়া ভাবিল যে, এই লোকটার বাড়ীতে কেমন করিয়াই সে এত দিন বাস করিতে পারিয়াছিল?

অনুরূপ মনে মনে হাসিয়া আত্মগতই বলিলেন, “বাবাজীবন এইবার একটু একটু ক’রে বাগে আসছেন! কেমন দাওয়াইটা খাইয়েছি,—হবে না?”

ত্রিশ পরিচ্ছেদ

সারা দিনের গুমোটের পর অপরাহ্নে খুব মেঘ উঠিল। ঘোলাটে আকাশে, স্তব্ধ গাছপালায় দেখিতে দেখিতে কালবৈশাখীর চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সন্ধ্যার পরেই মেঘের সেই ধোঁয়ার বর্ণ নিকষ কালো পাথরের পর্বতশ্রেণীর মতই চিকণ কালো রূপে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইল।—সন্ধ্যার পরেই গুরুপক্ষের জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়া কেবল অন্ধকারের রাশি জাগিয়া উঠিল। বড় বড় গাছগুলো সেই অন্ধকারে অসংখ্য প্রেতমূর্তির মতই স্তব্ধ হইয়া রহিল। কোথাও বাজুড়ের ঝটাপট, কোথাও আসন্ন বিপদভীত নীড়াশ্রয়ী পাখীর করুণ কিচিমিচি ভিন্ন আর কোন সাড়াশব্দই রহিল না। সমস্ত পৃথিবী যেন কোন আসন্ন বিপদের ভয়ে সেই অসীম অন্ধকাররাশির মধ্যে আত্মগোপন করিল।

স্নানার্থে তাহার জন্ম নির্দিষ্ট সেই ঘরটার মধ্যে শ্রান্ত শরীরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার! দুই হাতে চোখ মুছিয়া সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বাহিরেও অন্ধকার স্ফুটিভেদ, কালো মেঘে আকাশের সহিত ধরণীও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের সহস্র লোল শিখা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্মত্ত ভঙ্গীতে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। মেঘের গর্জনে, বাজুড়ের হুঙ্কারে নৈশপ্রকৃতির বক্ষে যেন একটা প্রলয়কাণ্ডের সূচনা চলিয়াছিল। স্নানার্থের নিজের বক্ষেও বোধ করি এর চেয়ে কিছু কম বিপ্লবসংঘাত

বাধে নাই! বাতাস যেমন রুদ্ধ তাগুবে সংহার-মুক্তিতে মাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনের মধ্যেও তেমনিই ঝড়ের হাওয়া তাহার আগ্রহ ও সংশয়কে লইয়া ঐ রকমই তীব্র ইচ্ছারূপে চারি পাশের অসহায় গাছপালাদের মতই আছড়াপাছড়ি করাইতেছিল। মন বলিতেছিল, এমন অসহায় শিশুর মত অত্যাচারীর অত্যাচার পাশে নিজেকে বাধিতে দিতেছ? আর তা, চিরদিনেরই মত? ধিক তোমার ভীকৃতায়! আবার অত্র দিক হইতে সংশয় বিপুল বলে সংগ্রাম করিতেছিল। তা'র যুক্তি—দুর্নাম! কলঙ্ক! সে যে কোন কিছু দিলেই ঢাকা পড়িবে না! না; উদ্ধার নাই—তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই!

গুরু গুরু গুরু গুরু রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে বন্ বন্ বন্ বন্ শব্দে জীর্ণ বাড়ীর জীর্ণতর দ্বারজানালাগুলো কাঁপিয়া উঠিল। সুশীলের বক্ষও তাহাতে কম্পিত হইল। বাতাসে ঘরের পিছনে আমগাছের পাতা সরু সরু ঝরু ঝরু করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল, ঝড় তাহার বিশাল দেহ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে অউহাসি হাসিয়া বলিতেছিল, —সন্ সন্ শোন্ শোন্ শোন্ শোন্!—তাহার পর আবার মুহুমুহঃ মেঘগর্জনের শ্রুত হইয়া বৃষ্টির চড় চড় চড় চড় শব্দ আরম্ভ হইল। এই বিবিধ এবং বিচিত্র ঐক্যতানিক শব্দলহরী মিলিয়া সুশীলের পিষ্ট ও ক্রিষ্ট অন্তরটাকে যেন আর্দ্র করিয়া তুলিল। তাহার মনে পড়িল, আজ তাহার বিবাহ! এ সবই তাহার বিবাহবাপ!—ঐ আকাশের মেঘ তাহার বিবাহসভার চন্দ্রাংশ। ঐ মেঘের গর্জন ব্যাঙের বাজনা! ঐ ঝড়ের হুঙ্কার বরষাত্রীর কলরোল!—ঐ গাছপালার সন্মুখানি তাহার বিবাহের ব্যাগপাইপ!—আর ঐ জলের ধারা দিয়া বৃষ্টি তাহাকে বিদ্যুতের রোসনীতে বরণ করিতে আরম্ভ করিল?—এই সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, শত শত সুখ এবং ঐশ্বর্য্যে সমাকীর্ণ তাহার নিজ গৃহ! সেই ইচ্ছালয়ের অধিপতি সে, আজ তাহার এই বিবাহসজ্জা? তাহার বিবাহের এই সমারোহ? সুশীলের বুক চিরিয়া, চোখ ফাটিয়া অশ্রুপ্রবাহ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই আর্দ্র অন্ধকারে নির্বাক্বে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে একান্ত অনভ্যস্ত, সহায়হীন, কলঙ্কভীত, আর্দ্র বালক মর্ম্মস্থদ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিল। তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উৎস ছুটিতে লাগিল।

মে (খ) — ১২

সেই অশ্রুবাষ্পমধ্যে দুইখানি উজ্জল মুখ নিমেষে নিমেষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং সে অনিমেষে বদ্ধ ব্যাকুল নেত্রে সেই মুখ দুইখানার দিকে চাহিয়া তাহাদের যন্ত্রণার্ত্ত বুকের মধ্যে যেন সবলে চাপিয়া ধরিতে গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সংসারের আর যেখানে যাহা হোক, শুধু এই দুটি মুখ—এই একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম—প্রাণতম এই দুই জনই শুধু তাহার জীবন হইতে দূরে—বহু—বহুদূরে অপস্থত হইয়া যাইতেছে। সে যেন কোন প্রকারেই আর এই কালরাত্রির অবসানের পর ইহাদের দুই জনের কাছে তাহার এ জীবনের মধ্যে কোন দিনই পৌঁছিতে পারিবে না! সে দুই জন তাহার পিতা এবং স্নেহা!—সুশীল সজলকাতর মুহু স্বরে আত্মগতই উচ্চারণ করিল, “স্নেহা!—স্নেহা!”—

ঝড়ের প্রচণ্ড একটা দম্কা হাওয়া হাফা শব্দে সারা বিশ্বে প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া এই অন্ধকার ঘরের মধ্যেও ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত ধুলার রাশি মিশ্রিত ছিল। সুশীলের অশ্রুসিক্ত চক্ষুতে সেই ধুলিবৃষ্টি ক্ষণেকেই জন্ম একটা বেদনার সৃষ্টি করাতে তাহার ব্যথাবিকল চিত্ত মুহূর্ত্তেকের জন্য বাহিরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণ হইবামাত্র তাহার চোখে পড়িল শুধু ঝড়ই নহে, তাহারই সহিত তেমনই চঞ্চল, তেমনই বিস্মৃত কেশবাস, তেমনই উদ্বেগাকুল মুক্তি লইয়া আরও কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।—বিদ্যুতের সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণিকালোকেই সুশীল চিনিল, সে নীলিমা!

নীলিমা স্বরিত দ্রুতপদে সুশীলের নিকটবর্ত্তী হইল, বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়াও তাহার ঘনশ্বাস স্পষ্টতর হইয়া শুনা যাইতেছিল। সে একটুও দ্বিধা বা বিলম্বমাত্র না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, “তুমি কি এখানে থেকে পালিয়ে যেতে চাও?”

সুশীল চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রাণে তাহার যেন নিবস্ত আশার আলো একটা ক্ষুদ্র দীপশলাকার সাজেই জলিয়া উঠিল। কে এ কথা বলিতেছে, তাহার কোন বিচারই সে না করিয়া, বন্দীর কাছে কারাগৃহ-ত্যাগের প্রস্তাবের মতই তৎক্ষণাৎ উগ্র ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিয়া উত্তর করিল, “যাবার কি কোন উপায় আছে?”

নীলিমার মনের মধ্যের শেষ ক্ষীণ আশারশিটুকু এক ফুৎকারেই নিমেষের মধ্যে নির্বাপিত ও অন্তর

তাহার বাহিরের মতই গাঢ় তমসাবৃত হইয়া গেল। কিন্তু তখনই সেই প্রচণ্ড বেদনার নিদারুণ কষ্ট সংবরণ করিয়া লইয়া রুদ্ধপ্রায় স্বরে সে উত্তরে কহিল,—“আছে, খিড়কির দিকে এখন তো কেউ কোথাও নেই; লগ্নের এখনও তিন ঘণ্টা দেবীও আছে, সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে তোমার খোঁজ-খবর কেউ করবেও না। এই বেলা এই পথে চ’লে গিয়ে ৯টার গাড়ীতে পশ্চিমের দিকের টিকিট নিয়ে,—তার পর কোথাও নেমে অনায়াসেই আবার বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।”

সুশীলের সমস্ত শরীর-মন যেন এই পরামর্শটুকু পাইবামাত্র আগুনঠেকা তুবড়ীর মতন মুহূর্তে উৎসাহ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া আসিয়া নীলিমার কাছে দাঁড়াইল।

“তবে—তা হ’লে এক্ষণই আমি চলেম।”

বলিয়াই ঈষৎ ভগ্নোৎসাহে সন্দিগ্ধ স্বরে থামিয়া থামিয়া কহিল, “কিন্তু—”

নীলিমা ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল—“আর কিন্তু দেবী করলে হবে না। কে কখন কোথা থেকে এসে পড়তে পারে।”

সুশীল নিজের বিপন্নাবস্থা বুঝিয়া জোর করিয়া লজ্জা সংবরণ পূর্বক এক নিশ্বাসেই উচ্চারণ করিয়া গেল—“কিন্তু আমি চ’লে গেলে যদি তোমার বাবা আমার নামে নালিশ করেন?—যদি—যদি—”

নীলিমা কোনরূপ সঙ্কোচমাত্র না করিয়াই সহজ স্বরে কহিল—“তুমি ত জানো,—তুমি নির্দোষ।”

সুশীল আন্তরিকভাবে রুদ্ধ নিশ্বাস টানিয়া লইল—“সে তো আর আমি আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে পারবো না!—আর এ সকল কুৎসিত জিনিষ একবার বাইরে বেরিয়ে গেলে—উঃ! না, না, তা’র চেয়ে মৃত্যু ভাল! নাঃ,—আমার বাঁচবার উপায় নেই।”

এ পরিতাপে নীলিমার বুকে বজ্রসূচি বিদ্ধ হইল। সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে সেই কঠিন আঘাত-ব্যথা উপভোগ করিয়া তাহার পর আপনাকে দৃঢ় বলে দমন পূর্বক পূর্ববৎই স্থির স্বরে উত্তর করিল—“সে ভাবনার তোমার কোন মূল্য নেই। আমি যদি অস্বীকার করি, আমার বাবা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারেন না। সব যখন আমার উপরই নির্ভর করছে, তখন অনর্থক এ বৃথা চিন্তায় তুমি কেন সময় নষ্ট করতে লাগলে?”

ইহা শুনিয়া এইবার সুশীলের চলচ্চিত্রটা প্রশমিত

হইয়া আসিল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস জোর করিয়া মোচনপূর্বক সে শান্তভাবে শুধু কহিল—“তবে চল”—বলিয়া সে সেই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারে আগেই অগ্রসর হইল।

তখন নীলিমাও তাহার সঙ্গ লইল। কাছে আসিয়া মুহূর্তে সে কহিল—“এসো, তোমায় দোর খুলে দিয়ে আসি, অন্ধকারে হয় ত তুমি পথ ঠিক পাবে না।”

দুই জনে সেই অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া চলিল। দুই জনেই চিন্তাকুল—উভয়েই নীরব।

তড়িতের অচিরস্থায়ী শিখা মধ্যে মধ্যে তাহাদের পথ-চলার যেটুকু সাহায্য করিতেছিল, নীচের তলায় নামিতেই সেটুকু ফুরাইয়া আসিল। এই পরিত্যক্ত ভিতরমহলটা যেমন অন্ধকার, তেমনই ভাঙ্গাচোরা। একটা অর্দ্ধভগ্ন পৈঠায় পা বাধিয়া সুশীল পতনোন্মুখ হইয়াই অনেক কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল। নীলিমা আপনার চিন্তাশ্রোতে ডুবিয়া এতক্ষণ নীরবেই ছিল; তাহার মনের মধ্যের তারে তখনও দুই বিভিন্ন সুরের রেষ বাজার দিয়া উঠিতেছিল। ব্যথায় ও আনন্দে তাহার বক্ষে দুইটি তরঙ্গ সমতালে উঠা-নামা করিতেছিল। সুশীলের পদস্থলনশব্দে চকিত চঞ্চল হইয়া সে ত্বরিতে নিজের সেই অসীম ভাবনা-সমুদ্র হইতে হাবুডুবু খাওয়া চিত্তকে উদ্ধার করিয়া লইয়া ক্ষিপ্ৰচরণে তাহার নিকটবর্তী হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—“দেখবেন, প’ড়ে গিয়ে যেন সব মাটি করবেন না।—তা’র চেয়ে পরং আমার হাতটা ধরুন, আমার এখানকার সব জানা, কি না,—আপনার এতে অনেকটা সুবিধা হবে।” সুশীলকে সে এবার “আপনি” বলিয়া কথা কহিল।

সুশীল নিরাপত্তিতে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। তাহার মনেও ধরা পড়ার ভয় প্রচুরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে নীলিমার হাতখানা বেশ দৃঢ় করিয়াই ধরিল। সুশীলের যদি নিজের বক্ষের কম্পন তখন কম থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, নীলিমার সেই কন্ম-কঠিন হাতখানা কি শীতল, কি ঘর্ম্মাপ্লুত ও কি কম্পিত।

অল্পদূর আসিয়াই নীলিমা আবার কথা কহিয়া বলিল—“জুতোর শব্দ হচ্ছে, ও দুটো খুলে আমার হাতে দিন।”

সুশীল তৎক্ষণাৎ জুতা খুলিয়া হাতে লইল, বলিল

—“তুমি জুতো বইবে! সে হয় না,—আমিই নিচ্ছি।”

নীলিমা আন্দাজে হাত বাড়াইয়া জুতা দুইটা ধরিল, মিনতি নহে, হুকুমের সুরেই বলিল,—“আমার দিন!”

সুশীলের মনে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি জাগিলেও সে আর তখন জুতা দিতে আপত্তিটুকুও করিতে পারিল না।

মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে আসিয়াই সুশীল সহসা বলিয়া উঠিল—“ঐ বাঃ! টাকা তো আনা হয় নি! কি হবে এখন?”

এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষটাকে এত বিলম্বে মনে হওয়ায় নীলিমা মনে মনে দুই জনের উপরেই অত্যন্ত রাগ করিল! ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিল—“টাকা কি আপনার ব্যাগে আছে?”

সুশীল তখন নিজেকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেছিল। সে প্রায় হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল—“সে আর আমি পেয়েছি! আমার কোটের পকেটে মনিব্যাগটা রেখেছিলুম; সকালবেলা সেই যে কারা—জানি না, আমার গা থেকে জোর করে সেটা খুলে নিলেন। কোথার আছে এখন বলবো কি করে? সব টাকা যে তাতেই ছিল!”

নীলিমার মনের তারে আশার রাগিণী বিপুল ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। মাথার উপর প্রবল বৃষ্টির ধারা ঝগ্ ঝগ্ নিনাদে যেন সেই সুরেরই তাল দিতে লাগিল। হ্রস্ব ঝড়ের হাওয়া ইহারই পোষকতা করিয়া তাহার কানের কাছে বলিতে লাগিল—“তবে আর উপায় কি? তোর কাজ তুই তো করিলি!”—আকাশের দীপ্ত বিছাতের পিখা নীলিমার চিত্তে আবার একটা লোভের আগুন ধরাইয়া দিল। সে নিশ্চল ও নীরব রহিল।

“নীলিমা!”

নীলিমা ভড়িতাহতের মতই দেহে-মনে চমকিয়া অস্থব করিল, সুশীলের হাত তাহার কাঁধের উপর। সে তাকে নাড়া দিয়া ঐ ব্যাকুল মিনতিভরা কণ্ঠে ডাকিতেছে—“নীলিমা! নীলিমা! যাঁটে এসে আমার নৌকা ডুবে যাবে? আজকের মতন আমার অন্ততঃ দশটা টাকাও এনে দাও, গিয়েই আমি তোমার

ওটা পাঠিয়ে দেব। এত করলে যদি—সামান্য কাজটাও আমার জন্তে করো।”

নীলিমার গলা বুজিয়া শব্দ আর বাহির হইবার পথ পাইল না। সে কি একটা অস্পষ্টভাবে বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেটাকে আশারই বাণী বুঝিয়া সুশীল সেই ঝটিকাতাড়িত বৃষ্টি-অধুষিত, ঘোরাকারমধ্যে অনাবৃত আকাশতলে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে উৎকণ্ঠা-উদ্বেল-বক্ষে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এ দিকে বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই যেন অসহনীয় বোধ হইতেছিল। বারিপাত শব্দে ঝড়ের গর্জনে, ক্ষণে ক্ষণে মেঘের কড় কড় নিনাদে, বজ্রাগ্নির ক্ষণিকোত্তবে নৈশ প্রকৃতি ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন। সুশীলের মনে হইল, দক্ষ-বজ্র বিনাশের জন্ত স্বয়ং রুদ্র আজ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অমনই চকিতে তাহার সতীর কথাও স্মরণ হইল। সেই পিতৃনির্ঘাতিতা সতীর মতনই যদি—

“এই নিন।”

“কৈ? কোথায়? পেয়েছ? আঃ! আমার কেবলই ভয় করছিল যে, হয় তো তুমি ধরা পড়ে যাবে। কত পেলে? দশই আছে! আচ্ছা এতেই চের হবে—ওঃ, তোমার কাছে আমি চিরদিনের মতই কেনা হয়ে রইলুম! এ উপকার আমি কখন ভুলতে পারবো না। তা হ’লে যাই? নীলিমা! জ্যোঠাই-মানে আমার সত্ৰিক্তি প্রণাম দিও—তিনি আমায় বড্ড ভালবেসেছিলেন। আচ্ছা, যাই, তা হ’লে?”

জ্যোঠাইমাই শুধু ভালবাসিয়াছিলেন!—আর কি কেহই বাসে নাই?—হায় নিষ্ঠুর!

সুশীল অগ্রসর হইল। সেই অবিরল জলধারা ঠেলিয়া, বাতাসের ঝাপটা ভেদ করিয়া, ঘনতমসাবৃত ধরণীর অদৃশ্য পথরেখায় দিশাহারা হইয়াও সে কোনমতে একটুখানি অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু আবার কি কথা তার মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাকে আর একবার ফিরিতে হইল।

“নীলিমা! আচ্ছ কি?—কই তুমি?”

বাতাসের হুকুরে প্রথমতঃ সে ডাক নীলিমার কানে পৌঁছায় নাই। সে তখনও গতিহারা হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় আহ্বান কানে ঢুকিতেই বুক তাহার উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

সুশীল তাহা হইলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

বিদ্যুতের আলোয় সুশীল দেখিল, নীলিমা ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া। সে তখন দ্রুতপদে তার কাছে আসিয়া অস্থির স্বরে কহিয়া উঠিল—“কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমায় পীড়ন ক’রে সাক্ষী দেওয়ান? তিনি জোর করলে তুমি কি তাঁকে বাধা দিতে পারবে?”

—হরি! হরি! এই তাহার এত বড় আত্মত্যাগের শেষ পুরস্কার! এই তাহার সর্বত্যাগের সমস্ত পরিণাম! এখনও সেই স্বার্থচিন্তা! সেই আত্মরক্ষার ক্ষুদ্রতম সতর্কতা! নীলিমার জন্ত প্রাণের কোণেও এতটুকু একটু সহানুভূতি—করণা—কৃপা বিন্দুমাত্র—কণা-মাত্রও কি জাগে নাই!—নীলিমা এখনও তোমার কাছে—সেই তুচ্ছতম, ক্ষুদ্রতম, হীনতম গরীবের মেয়ে? আর তাই-ই সে এতখানি দানের পরেও রহিয়া গেল? এই তাহার এ জন্মের চিরস্থায়ী পরিচয়? কোন মূল্যেই কি ইহার আর বিস্মৃতি নাই? —পরিবর্তন নাই?

নীলিমাকে বাক্যহারি দেখিয়া সুশীল মনে মনে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল।

“তা হ’লে কি হবে, নীল? তোমার উপরেই যে আমার সমস্ত নির্ভর করচে! তুমি নিজেকে তখন কঠিন রাখতে পারবে ত?”

নীলিমার একবার মনে হইল, উচ্চ চীৎকারে এই ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টির উন্নত চীৎকার, অশনির কড় কড় নিনাদ এই সমস্তকেই ডুবাইয়া দিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির কর্ণপটহ দীর্ঘ-বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়া সে তাহার ফাটান বৃকের রক্তঝরা আর্ন্তনাদটাকে বাহির করিয়া দিয়া বলে—“ওগো নিষ্ঠুর! ওগো কঠিন! ওগো পাষণ! আর নয়,—আর নয়—সাদ্ধ কর,—সাদ্ধ কর, সাদ্ধ কর গো! তোমার এ ক্ষুদ্র স্বার্থের খেলা তুমি সাদ্ধ কর। তাহা না হ’লে হয় তো আমার মনের প্রাণপণে বাধা বীণার চড়ানো তার কাটিয়া খান খান হইয়া পড়িয়া যাইবে। হয় তো কোন সময় বলিয়া ফেলিব, ‘না, আমি পারিব না।’ আমিও মানুষ—রক্তমাংসে আমারও এই শরীর একদিন একই ঈশ্বরের হাতে গঠিত হইয়াছিল। বৃকে আমারও ঐ রকম অজস্র বাসনা-কামনার রাশি, বরং সকলই তাহার অতৃপ্ত ও অনুরক্ত। লোভকে আমি জয় করিতেছি বলিয়াই

সে যে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে, সে ভরসাও আমার খুব বেশী নাই। হয় তো কোন সময় সে প্রবল প্রতাপে জাগিয়া উঠিয়া, আমার সকল ত্যাগের মূল কাটিয়া, চিন্তে আমার জয়ের আসন পাতিয়া বসিবে। এই-বার তুমি যাও—আর কেন?—যাও, সুলেখার স্বর্ণমন্দিরের মরকত-আসনে তোমার বিরামশয়া তো বিস্তৃতই আছে। তবে আর কি? তবে আর বিলম্ব কি জন্য? কেন এ ফিরে আসা? হে পথিক! তোমার এই শ্রান্ত ক্লান্ত সংগ্রামপথের যাত্রা শেষ করিয়া ইহার লজ্জাম্বিল হেয় স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া তুমি নিঃশেষেই ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে পারিবে।—তাই দিও!—হে অতিথি! অভাগার এই দৈন্তে পূর্ণ হৃদিনের আতিথ্যকে দুঃস্বপ্ন বলিয়াই—যদি কখনও বা মনে পড়ে ত মন হইতে সূদূরে ঠেলিয়া দিতে দ্বিধা করিও না। তবে আর কেন? যাবেই যদি তো যাও!—এ সন্দেহ, ভয়, সংশয় কি তোমার শেষ হইবে না? না—এখনও লোভীকে—দ্রিষ্টকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? তা তোমার দোষ নাই! লোভ যে দারিদ্র্যের ধর্ম।

বৃষ্টির শিলাবতিন ধারা মাথার উপর মুহূর্ত্তঃ মুহূর্ত্তঃ কবিত্তেছিল, ভয়ানক শব্দে হুল, হুল, আকাশ, পৃথিবী কাঁপাইয়া অদূরে বজ্রপাত হইল। ক্ষণকালের জন্ত তাহারই সহস্র বৈজ্ঞাতিক আলোক-প্রবাহ সেই লণ্ডভণ্ড দীর্ঘবিদীর্ণ বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর প্রকৃতির আর্ন্তমূর্ত্তি সুপ্রকট করিয়া তুলিল। সুশীল সে আলোতে নীলিমাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহার মনটা যেন সহসা চম্কাইয়া উঠিল। সে মুখ যেন মৃত্যুপাণ্ডুতায় ভরা স্বর্ণলতারই মুখ!

“নীলিমা!”

“না না, ভয় নেই! আমি ত বলেছি! তবু কি বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না? যান যান, চ’লে যান। কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন? ট্রেন ফেল করলে হয় ত আবার বিপদে পড়বেন। ওঃ না, না,—আর না,—এখনই যান,—এখনই যান।”—নীলিমা ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

এক মুহূর্ত্ত মাত্র পরেই সুশীল আবার সেই দুর্যোগে ভরা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনিশ্চিত পদক্ষেপে যাত্রারস্ত করিয়া মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে বলিল—“বাক্, বাঁচা গেল।”

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয় হয়, আকাশ মেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, মেঘের গায়ে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছিল। সেই অন্ধকার আকাশে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অকুলকন সহকারে অকুল বলিলেন, “দিনটে আজ শুভদিনই বটে!—দিব্যি একটি পুরোমাত্রায় ঝড়-বৃষ্টি হ'বারই লক্ষণটা দেখছি।”

বিবাহে উপকরণ-দক্ষিণাদির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ, বিশেষতঃ বিবাহবিধির আগাগোড়াই অব্যবস্থায় বিরক্তচিত্ত পুরোহিতমহাশয় কস্তা-কর্তার এই অদ্ভুত মন্তব্যে শ্লেষ-গম্ভীর মুখে কহিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ, আপনার মেয়ের বিবাহে দেবতারাই বর-যাত্রী হয়ে আসছেন দেখছি! মানুষকে ত আর নিমন্ত্রণ করা হ'ল না। অগত্যা!”

কথাটার মধ্যে বিজ্ঞাপন তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া অকুলকন ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। গম্ভীর মুখে ঝড় নাড়িয়া বলিলেন, “না হে, ঠাট্টা নয়! এই ঝড়-জল হওয়াটা বড়ই সুলক্ষণ! দেখ, আমি নেমস্তন্ন করলেও এই কাল-বৈশাখী মাথায় নিয়ে কেউ কি আর আমার বাড়ী পেট টালতে আসত? ভাগ্যে ভাগ্যে আমি তেমন ধারা উষ্মাগটি করিনি, তাই, নইলে দেখতে দাঁড়িয়ে লোকসানটি হয়ে যেত!”

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্যন্ত আকাশে বাতাসে মিলিয়া যতই মাতামাতি করিল, অকুলকের মনের ভিতর নিশ্চিন্ততার শান্তি ততই নিবিড়তর হইল। সারাদিনটা ধরিয়া তাঁহাকে যে স্ত্রীলের উপর নজরটি রাখিতে হইয়াছিল, এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া শান্তচিত্তে কলিকাটা চালিয়া সাজিলেন এবং পরম আনন্দে উহা উপভোগান্তে সম্প্রদান-ঘরেরই এক পাশে একটা মাত্র বিছাইয়া একটুখানি আরাম করিতে শুইবামাত্র তাঁহার নাসিকা ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিবাহবাড়ী বৃষ্টির সমতালের সহিত ঐক্যতানিক হইয়া উঠিল, দিকে দিকে নানা স্রবের নানাবিধ নাসিকা-ধ্বনি।

যখন বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত ও ঝড়ের দাপাদাপি ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন বিবাহলগ্নও উত্তীর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হইল পুরোহিত বেণী ভট্টাচার্য্যের। তিনি তখন চোখ

রগড়াইয়া, এক টিপ নশ্র লইয়া, প্রথমে শুধু গলায়—তাহার পর গা ঠেলিয়া অকুলকে জাগাইলেন।

“কতা! বলি কতা! মেয়ের বিয়ে কি কাল সকালে দেবেন? রাত যে এ দিকে ভোর হয়ে গেল।”

চোখ মুছিতে মুছিতে অকুল তাড়াতাড়ি বর কনে আনিতে উপরতলায় ছুটিলেন।

কনে একখানি খাটো লাল ঢেলী পরিয়া, চতীর পুথি কোলে করিয়া সেইমাত্র পিড়ির উপর বসিয়াছে। স্বল্পমাত্র পূর্বেই বেণী ভট্টাচার্য্যের বোন ও গৃহিনী তন্ত্রা ভাসিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি মেয়ে-সজ্জায় মন দিয়াছেন। অকুলকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী মাথার কাপড় একটুখানি টানিয়া দিলেন, ভগিনী আধা-ঘোমটার মধ্য হইতে মৃদুস্বরে কহিলেন, “বর তুমি নিয়ে যাও, কনেকে এই চন্দনটুকু পরিবে আর পায়ে একটু আলতা দিয়ে দিলেই সব হয়ে যায়।”

এই বলিয়া শয্যালীন্য স্বর্ণলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সোনা-রূপোর আঁচড় ত আর কোথাও পড়বে না?”

তাঁহার মৌন দৃষ্টিতে কোন ভাষা না পাইয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, “না হোক, ভাগ্যে থাকে ঢের পরবে—এই নে নীলি! এই ‘গো’টা (গুয়া) গালে দিয়ে রাখ। বাসরঘরে বরকে কেটে খাওয়াতে হ'বে। বউ, দেখ ভাই, চিতের কাঠি, ধুঁতরো, পীদিষ, এ সব ঠিক আছে ত? তালা-চাবিটে দিস্ বাপু, তুলিস্নে যেন ওটা—মায়েঁর মতন মেয়েকে যেন চিরকালটা মুখ বন্ধ ক'রেই না বাটাতে হয়। এবার ওটা একটু বদল হোক।”

অকুল স্ত্রীলের অনুসন্ধান করিতে আর কোথায় বাকী রাখিলেন না। তাহার পরও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন তিনি অনেকক্ষণ যেন ইতি-কর্তব্যতা খুজিয়া পাইলেন না। এত বড় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া যে স্ত্রীলের মতন স্ত্রীল ছেলে এই মধ্যরাত্রে তাঁহার বাড়ী হইতে পলাইতে পারে, এ যেন সহজে বিশ্বাসই হয় না। আবার একবার এ ঘরটা সে ঘরটা খুঁজিয়া দেখিতে হইল। নাঃ, সে এ বাড়ীর কেনখানেই ত নাই! কখন গেল? তা'র চামড়ার ব্যাগ হুইটাই পড়িয়া আছে। তাহার মনিব্যাগ? নাঃ, সে-ও ত আজ সকালে শতাবধি যুঁজা সমেত তাঁ'রই হস্তগত

হইয়াছিল, মেটা—হ্যাঁ, এই ত রহিয়াছে! তবে কি লইয়া গেল সে?

বিশ্বয়বিমুঢ়বৎ তিনি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকেই প্রশ্ন করিলেন, “সুশীল কোথা গেছে রে?”

নীলিমার ততক্ষণে আলতা-চন্দনের সাজ শেষ হইয়াছিল। তাহার সলিলার্দ কেশের রাশি হইতে তখনও জল ঝরিতেছে বলিয়া তাহা শুধু বাঁধা হয় নাই। আর সকলে কার্য্যান্তরে গিয়াছে, একা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পিছনে বসিয়া শুক বস্ত্রে সেই রাশিকরা ভিজা চুল ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া দিতেছিলেন। বাপের প্রাণে আসন্ন বিপদের ছায়ায় নীলিমার মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল, কিন্তু প্রথম বারের এই প্রশ্নটিকে এড়াইয়া গিয়া সে যথাপূর্ব্ব স্থিরভাবেই বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

তখন মুখ খিঁচাইয়া রোষতীব্র কণ্ঠে অমুকুল বলিয়া উঠিলেন, “আবার লজ্জা করা হচ্ছে! ঝাঁটা মার অমন লজ্জার মুখে! যা’ জিজ্ঞেস করচি, তা’র তো এখন সোজা জবাব দে, এর পর তখন স্বপুত্র-বাড়ী গিয়ে যত পারিস লজ্জা করিস!—বলি সেই নবাবপুত্রটিকে এমন সময় গেলেন কোথা? এ দিকে যে লম্ব-টম্ব সব ভস্ম হয়, তা’র খোঁজ আছে কিছু তোমাদের? আমিই না হয় একটু ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলুম। তোমরা তো আর মর নি, ডাকলেই তো হ’ত আমাকে। তা’ এখন তিনি গেলেন কোথা?”

নীলিমা মুখ তুলিয়া দ্রুতস্বরে বলিল, “চ’লে গেছেন।”—বলিয়াই এবার সে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইল এবং তাহাতে দেখিল যে, স্বর্ণলতা এই সংবাদে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই কথাটি ঐমম্বই আকস্মিকভাবে শ্রুত হইল যে, অমুকুল প্রথমটা যেন তাহার মনঃগ্রহণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিশ্বয়বিহ্বলবৎ হাঁ করিয়া মেয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। নীলিমা সে দৃষ্টি অনুভব করিয়া মনের মধ্যে অস্বস্তি হইয়া উঠিল।

বিশ্বয়ের প্রথম বেগটা দমনে আসিলেও তাহার রেষ তখনও যেন দুরায় নাই, তাই অমুকুলের বিশ্বয়ে শুক কণ্ঠ হইতে যেন আপনা আপনিই স্ফুলিত হইয়া পড়িল, “চ’লে গেছেন! কোথায় গেলেন?”

নীলিমা আবার সুধীরে তার নত দৃষ্টি উত্তোলন

পূর্ব্বক মূহ অথচ পরিষ্কার স্বরেই প্রত্যুত্তর দিল,—
“বাড়ী।”

এতক্ষণে অমুকুলের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। আহত শার্দূলের শ্রায় ক্রোধরক্ত নেত্রে তিনি নীলিমার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হইল যেন, তাঁহার সেই আগুনের গোলায় মত চোখ দুইটা ঠিকুরাইয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া গিয়া এইবার নীলিমাকে বিদ্ধ করিবে। রোষগন্তীর তীব্র স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“তার হাতে তো টাকা ছিল না, বাড়ী যাবার টাকা সে পেল কোথায়? নিশ্চয় তা হ’লে তুই দিয়েছিস?”

তাঁহার সেই রোষকঠোর দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়াই নীলিমা বলিল, “দিয়েছি।”

“আমার টাকা চুরি ক’রে তাকে দিয়েছিস?”

নীলিমা নীরবে চাহিয়া রহিল। অমুকুলের সিংহনাদ পদশ্রবণে সমস্ত ঘরখানা তখন অকস্মাৎ ঝন্-ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিজে শুদ্ধ প্রচণ্ড ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“সয়তানি! বেইমানি! যা’র জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর! তোর ভাল করুতে গেলুম, আর তুই-ই কি না আমার এই করুলি? কি হ’ল তোর এ কাজ ক’রে? বল শীগগির, কিসের জন্তে তুই এত বড় আহাম্মুকি করুলি? বল শীগগির, বল!—না হ’লে আজ তোকে পাঁটা কাটা ক’রে আমি কেটেই ফেলবো। বল শীগগির বল—”

বাঘের মত গর্জন করিতে করিতে মেয়ের ঘাড়ের উপর পড়িয়া লাথি, চড়, কিল দুহাতে দুপায়ে অজস্র ধারে বর্ষণ করিতে করিতে অমুকুল এই কথা বলিতে লাগিলেন। নীলিমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও কহিল না। অথবা এ কার্য্যে তাহাকে বাধামাত্রও সে প্রদান করিল না। সম্পূর্ণই নিঃশব্দে রহিল। আর ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীও ঠিক সেই খানে ও সেই ভাবে গামছা হাতে কাঠের মতই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁরও এতটুকু প্রতিবাদের ভরসা হইল না।

এ দিকে ত্রুতর্জনে অমুকুল টোঁটাইতে লাগিলেন—
“মুখে আজ তোর রক্ত তুলে তবে ছাড়বো!—
এখনই তোর হয়েছে কি! মিশনরী ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে বিবি হয়েছেন! বরের সঙ্গে

লুকিয়ে লুকিয়ে কোটশিপ করছিলেন, জানতে পেরে আমি বিয়ে দিতে গেছি, এই আমার মন্ত অপরাধ হয়েছে, না? শেষে আমারই পয়সা ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে দিলি! অ্যা! কেন এ কাজ করলি? কেন করলি? এর মানে আমি যে এখনও বুঝতে পারচিনে! অ্যা!—বল রাঙ্কুসি! শীগগির ক'রে বল? কেন করলি?”

“ওগো! স্বর্ণদিদি যে মূর্খা গেছে, তোমরা ও করচো কি?” ভট্টাচার্য্য-গৃহিনীর সত্তর চীৎকারে অনুকূল তখন অর্দ্ধমৃত্যু নীলিমাকে ছাড়িয়া দিলেন।

বেণী ভট্টাচার্য্য একটু কাসিয়া মাথাটাকে বারকতক কণ্ঠস্বন পূর্ব্বক কহিলেন, “তা হ'লে চক্রবর্তী মশাই! এই রাত্রেই তো অল্প বর আমাদের খোঁজ করতে হবে। এ মেয়ের তো আর রাত পোয়ালে বিয়ে হ'বে না, আর আপনারও তা'তে জ্ঞাত যাবে।”

মন্তব্য শুনিয়া অনুকূল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ক্রোধপূর্ব্বক কণ্ঠে জবাব দিলেন, “ও মেয়ের বিয়ে আবার দেবে কে, যে হবে? ও হারামজাদী মরুক গে, চুলোয় যাক্ গে, ওর কোন খবরে আর আমি নেই! এত বড় ছোটলোকের মেয়ে, আমার টাকা চুরি ক'রে ক'রে সেটাকে এত দিন ধ'রে থাইয়ে দাইয়ে আবার আমারই টাকা চুরি ক'রে কি না পালিয়ে যেতে দিলে! কলিকাল বটে!”

ভট্টাচার্য্য এক টিপ নম্র লইয়া বিশ্বগন্তীরস্বরে কহিলেন, “সমাজ তো তা' শুনবে না, ভায়া! রাত পোহাবার পূর্ব্বকই কন্যাসম্প্রদানটি করবার ব্যবস্থা হওয়া চাই-ই চাই। তা যদি আপনার সম্মতি থাকে, তা হ'লে বরং আমি বরের জোগাড়টা কোন রকমে ক'রে দিতেও পারি। আপনারই স্বঘর, আমার ভগ্নীর ভাসুর হন, সম্প্রতি জীবিসোগ হয়েছে।—এই আপনারই সমবয়সী হবেন আর কি। বিবাহে একান্তই ইচ্ছা আছে, কেবল পুত্র-কন্যা আর পুত্র-বধূদের ভয়েই পারেন নাই। তা' এ রকম অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি সানন্দে সম্মত হবেন এবং একটু কৌশল ক'রে আনিয়ে নিজেই ঘরের লোকেরাও কিছুই জানতে পারবে না। দেখুন, যদি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তা' হ'লে না হয় চেষ্টা করি, সময় সংক্ষেপ।”

অনুকূলের মনের মধ্যে ক্রোধের বহি তখনও উর্দ্ধ-নীর্ষে জ্বলিতেছিল এবং সে ক্রোধের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড

বিদ্বেষেরও তীব্র জ্বালা মিশ্রিত ছিল। তাই জাতি হারাইবার ভয়ে নয়, শুধু নীলিমাকে জব্দ করিবার লোভে তিনি এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎই সম্মত হইলেন। তাহার পর আর একটা কথা মনে পড়িতেই অমনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে ততক্ষণে স্বর্ণলতার হৃদসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য-পরিবার তাঁহাকে বেড়িয়া বসিয়া, নানা আক্ষেপোক্তি শুনাইয়া, মড়ার উপর খাঁড়া চালাইতেছিলেন এবং নীলিমা নীরব নতমুখে মা'কে পাথার বাতাস করিতেছিল। তাহার মুখে মাথায়-শূলা ও স্থানে স্থানে শোণিত-চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে ঝড়ের আকাশের মতই স্থির ও স্তব্ধ দেখাই-তেছিল।

অনুকূল আসিয়াই এয়োদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা স্ত্রী-আচারের জোগাড়-যন্ত্র ক'রে রাখুন গিয়ে,—পুরুতদাদা বর নিয়ে এই এখনই এলেন ব'লে!”

মেয়েরা বিশ্বাসচমকিতভাবে ত্রস্তে উঠিয়া গেলেন। বর কে? ইহা জানিবার আগ্রহ অবশ্য সকলেরই চিত্তে সমান থাকিলেও ভরসা করিয়া কেহ আর তাঁহাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করতে পারিলেন না।

সবাই উঠিয়া গেলে অনুকূল ডাকিলেন—নীলি।”

নীলিমা সুদীর্ঘ দৃষ্টি উঠাইয়া বাপের মুখে তাহা নিবন্ধ করিল। দৃষ্টিতে তাহার ভয় বা ভাবনা কিছুই ছিল না।

পিতা কহিলেন, “তোমার সামনে দু'টা রাস্তা প'ড়ে রয়েছে। এক, কাল সকালে সুশীলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করা—যে, সে তোমার সঙ্গে অবৈধ ব্যবহার ক'রে—তোমার বিয়ে করতে রাজী হ'য়ে, অবশেষে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। এ মোকদ্দমা হ'লে খুব সম্ভব ভূবনবাবু হয় তোমায় বউ করবে, না হয় ঢের টাকা দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করবে।—বোধ করি শেষেরটারই বেশী সম্ভব। তার পর যদি সে বলে, তুমিই তা'কে যেতে দিয়েছ—তা' হ'লে তোমায় বলতে হবে যে, তোমায় মেয়ে ফেলবার ভয় দেখিয়ে তোমার হাত থেকে জোর ক'রে সে টাকাটা কেড়ে নিয়েছিল। কেমন, এতে রাজী আছ তো? এতে ঢের টাকা পাবে। অন্ততঃ

পাঁচ ছ' হাজারের কম তো নয়, 'চাই কি জোর করলে তখন হয় তো দশ হাজারও হ'তে পারে। —কেমন, রাজী আছ ?"

নীলিমা ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল, —“না।”

অমুকুলের মুখ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, শ্বেদপঙ্কজ কণ্ঠে পুনশ্চ কহিলেন, “আর এক পথ,—এই যে, নিমাই ভট্টাচার্য—আমাদের ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতির বড় ভাই, তা'কে বিয়ে করা। বর ওরা আনতে গেছে, —এখনই এলো ব'লে, কেমন ? তাতে, তুমি রাজী আছ ত ?—যেমন তোমার বরাত ! অমন সোনার চাঁদের মতন বর তোমার তো পছন্দ হলো না। বলছি, নালিশ ক'রে না হয় টাকাটাই নিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে চিরজন্মটা ব'সে কাটা, তা-ও তো গুণবিনে। তা' হ'লে আর আমি কি করবো বল ? মর্ এখন নিমাই ভট্টাচার্যকে বিয়ে ক'রে, তার শ্রাদ্ধ পিণ্ডি রেঁধে”—

নীলিমা অবিচলিত দৃষ্টিতে যথাপূর্বই চাহিয়া রহিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্প হইল। সহসা রোগীর খাটখানা মচ, মচ, শব্দ করিয়া উঠিল। পিতা ও কন্যা উভয়েই একসঙ্গে সন্নিহনে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, তা'র উপর সেই মাসাধিক কালের অনড় রোগী তখন ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন।—ভাঁহার দুই বিস্ফারিত নেত্রে কেবল অকথ্য ভীতি।

অমুকুল সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই নিজ বক্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন—“কি বলিস্ ? নালিশ করবি ? আমি যা' যা' শিখিয়ে দেব, তুই শুধু সেই কথাগুলো ঠিক ক'রে ব'লে যাবি,—আর কিছুটাই তোকে করতে হবে না, শুধু এইটুকু। দেখ,—এখনও বল, করবি ? নিমাই ভট্টাচার্যের বয়েস কত জানিস্ ?—ছাপ্পান বছর ! দেখ, আমার পরামর্শটা নে, তোরই তাতে ভাল হ'বে। দশ হাজার টাকা কি সোজা টাকা ! মনে ক'রে দেখ দেখি, তাতে তোর কতটা সুবিধা হবে ?”

নীলিমা নিঃশব্দে দৃঢ়পদে উঠিয়া মা'কে শয়ন করাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, বাপের কথার জবাবও দিল না।

“কি বলিস্, করবি ? কথা ক' !”

“না।”

এমন সময় ঘরের নিকট হইতে বেনী ভট্টাচার্য উৎসাহপ্রবল মুখে ডাক দিয়া বলিলেন, “ওহে ভায়া ! বর এনেছি যে ! এখনই কনে নিয়ে চট্ ক'রে চ'লে এসে ছুটো মজ প'ড়ে যাও। জীআচার-টাচারের আর সময়ও নাই,—আর কি জানো, ওগুলো ঠিক শাস্ত্রীয়ও নয়,—না হ'লেও কিছু আসে যায় না। চট্ ক'রে চ'লে এস ভায়া, সকাল হ'তে আর বাকী নেই।”

এইবার সহসা বাক্শক্তিহারা স্বর্ণলতা উর্ধ্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—“নীলা ! মা আমার ! বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যে পুণ্যটুকু তুমি সঞ্চয় করেছ, তা'র এই পুরস্কার—তোমার বাপ হয়ে উনি তোমায় ভাল মতেই আজ দিচ্ছেন ! কিন্তু আমি বলছি,—তোমার মা হয়েও বলছি যে, তুই ম'রে যা—তুই ম'রে যা !—কোন দিনই বুক ভ'রে তোদের কোন কিছুই দিতে পারি নি, আজ এই অস্তিমকালের বুকভরা আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে গেলুম—কসাইয়ের হাতে বিক্রী হওয়ার চেয়ে মরণকে তুই বরণ কর। একজন উপরে নিশ্চয়ই আছেন—যিনি কার্যের ভিতর কারণ খুঁজে দেখেন। তিনি তোকে নিশ্চয়ই তার জন্তে ক্ষমা করবেন।—কিন্তু এ অত্যাচারের দণ্ড কিছুতেই মাথায় নিস নে, চিরকাল জলে মরবি।”

বাতাহত কদলীকাণ্ডের মত অকস্মাৎ ভাঁহার প্রাণহীন দেহ খাটের উপর হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ষাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পর্বতের কঠিন বক্ষ বিদারিত করিয়া স্রোতস্বিনীর স্নিগ্ধ ধারা যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন পর্বত যেমন কোনরূপ কঠোরতা দিয়াই তাহাকে রুদ্ধ রাখিতে পারে না, পরন্তু বাধা দিতে গেলেই সে ক্ষুদ্র ধারা শতগুণ ক্ষীতবক্ষে জলপ্রপাতের আকার ধারণ পূর্বক সেই প্রস্তরকারী উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীষণ গর্জনে ধরণীবক্ষে আছড়াইয়া পড়িয়া বিশালকায়্য নদীরূপ

ধারণ করে, সুশীলের অন্তরে নীলিমার স্মৃতি তেমনই যতই বাধা পাইতে লাগিল। ততই যেন তাহা বর্ষা-বারিপুষ্ট তটিনীর তায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তবে সে রাত্রে পশ্চিমের টিকিট কিনিয়া সে যখন একখানা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চাপিয়া বসিল, তখন তাহার শরীর-মনে কোন কিছুই চিন্তা করিবার মত সামর্থ্য ছিল না। তাই সে ভিজা সার্টটা খুলিয়া ফেলিয়া আর্দ্র-প্লুথ যথাসাধ্য নিংড়াইয়া পরিয়া একখানা গদিশূণ্য ধূলি-ধূসরিত বেঞ্চির উপর বাহতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং প্রায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা তেমনই নিদ্রাহীন, চিন্তাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিল। অপ্রত্যাশিত জটিল ও ভয়াবহ ঘটনাচক্রে আকস্মিক ষাত-প্রতিঘাত, তাহার উপর অনাহার, দুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও পরিশ্রম মিলিয়া তাহার সুখ-লালিত কোমল দেহ-মনকে যেন কেমন একটা সুগভীর ক্লান্তিতে সমাচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথম উত্তেজনার পরেই বিষম অব-সাদের আক্রমণ অনিবার্য। সুশীলেরও সমুদয় অন্তরাঙ্গ তাহার দেহের সহিত সমভাবেই সেই একান্ত অব-সাদের মহাভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প-স্বল্প অনুভব করিতে পারিল সে * * * ছাড়াইয়া। তখন বড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—অথবা এত দূরপথে তাহারা সে দিন দেখাও দেয় নাই। খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাইতেছিল; গভীর কালো আকাশের গায়ে উজ্জ্বল তারকাগুলি শতনরী হীরকহারের মত ঝকঝক ঝলঝল করিতেছিল। মাঝে মাঝে কেন্দ্রবিন্দু এক একটা উজ্জ্বল অগ্নিগোলকের ত্রায় অন্ধকার ব্যোমপথ প্রদীপ্ত করিয়া দেবরোষাগ্নির রূপে ধরণীর পানে ছুটিয়া আসিতেছিল। মুক্ত গবাক্ষপথে দৃষ্টি মেলিয়া সুশীল স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল। নৈশ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চিন্তাতপ্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল। সে স্নিগ্ধ স্পর্শে সুশীলের ক্লান্ত চক্ষু আবারও ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া আসিল, নানিবার কথা তার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল না।

সকালবেলা সেই তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেলে সুশীল দেখিল, ট্রেনখানা * * * পৌছিয়া থামিয়াছে। রাজির নিবিড় অন্ধকার তখন দিবসের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া গত রজনীর সেই দুর্ভাগ্যময়ী প্রকৃতি এবং

দুর্ভাগ্যে পূর্ণ জীবনের স্মৃতি সহসা তাহার হৃৎস্পন্দ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তাহার পর একে একে ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহার বিস্ময়বিকল চিত্তে উদ্ভিত হইতে লাগিল এবং ইহার বাখাখা নব্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিল—তাহার নিজের এই অনির্দিষ্ট পথের যাত্রা এবং কর্দমাক্ত মলিন জুতা-কাপড়! সজাগ হইয়া তাড়াতাড়ি সে ট্রেন ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। যে স্টেশনের টিকিট কেনা হইয়াছিল, সেখান হইতে সে আরও কয়েকটা স্টেশন বেশী আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার জ্ঞান দগ্ধ দিতে হইবে। তাহার পর কলিকাতা ফিরিবার মত সম্বল তো তাহার হাতে থাকে না! সুশীলের মাথা টিপটিপ করিয়া উঠিল। এ কি বে-হিসাবী কাণ্ড করিয়া সে আবার একটা জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিল! একেই তো মাথার উপর সেই আসন্ন বিপদ তাহাকে অশনি প্রহারে উত্তত হইয়া রহিয়াছে; তাহারই বীভৎস কুৎসিত মূর্ত্তি স্মরণে আসিতেই সমুদয় হৃদয়-শোণিত তাহার শীতল হইয়া উঠিতেছিল, আবার এট একটা ছোট বাপার লইয়া না জানি কত ভোগই বা তাহাকে ভুগিতে হয়! ক্ষোভে ও লজ্জায় তাহার যেন কান্না পাইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর তার উপায়ই বা কি? একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটাকে অবলম্বন করিবার কথা মনে পড়িতেই সুশীলের সমুদয় মনুষ্যত্ব যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ছি ছি, মন তাহার এত বড় হীনতার কথাও ভাবিতে পারিল! এ কি তবে সেই হীন সংস্রবেরই ফল?

এই হীন সংস্রবের স্মরণে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া সুশীলের স্মৃতিপথে অজস্র বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। পিতার কথা, নিজের সুখময় স্মৃতিময় গৃহের কথা, বিপ্রদাস ও সুলেখার কথা। বিপ্রদাসের কথা মনে পড়িতেই তাহার আকপোল-কণ্ঠ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। স্বতঃই মনে মনে একটা তুলনামূলক সমালোচনা দেখা দিল অনুকূলের সঙ্গে। তখন তাহার শুক ওষ্ঠাধরে একটুখানি ঘৃণা ও পরিতাপের মুহু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। স্বপ্নরভাগাটাই কি তাহার এই রকম! সেবারেও বেত্রাঘাতে ইহার আরম্ভ। আর এবারে?—তাহার পর সে ভাবিল সুলেখাকে। সেই নির্জন সাক্ষ্য অন্ধকারে নিতান্ত অবমানিত লাঞ্চিত বালকের লজ্জিত ভয়াব্ধ অন্তরে কোন ছদ্মবেশী দেববালার মতই তাহার আকস্মিক

আবির্ভাব! সে দিনের স্মৃতিকথা স্মৃতির হৃদয়ে উজ্জলতর সূর্য্যাকরে ক্ষোদিত হইয়া আছে, কালের ধূলিজাল তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সময়ের বিস্মৃতি-হস্ত তাহাকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিতে অপারগ। স্নেহে, শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে কণ্ঠকিত হইয়া সে নিজের সেই মানস-প্রতিমাকে মনের মধ্যে স্মরণ করিল। বিপ্রদাসের সকল কলঙ্ক ঐ অকলঙ্ক পূর্ণিমাচন্দ্রের অম্লান জ্যোতি-স্তরঙ্গে যে বিধৌত হইয়া গিয়াছে। বিপ্রদাস নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও গৰ্ব্বাক্ত হইলেও স্মরণ্য যে মুক্তিমতী দেবী!

স্মৃতির তরতরবেগে প্রবাহিত এই একটানা চিন্তাশ্রোতে সহসা একটা বিরুদ্ধ তরঙ্গ কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া আঘাত করিল। সহসা স্মরণ্য সেই অনিন্দ্য জ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানাকে আড়াল করিয়া আর একটা পরিচিত—অতি পরিচিত মূর্তি অমনই স্পষ্টভাবেই যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। স্মৃতি সন্নিহনে দেখিল, সে মুখ সম্বন্ধকৃতি অপরাধিনী নীলিমার। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেন আজ আর সেই পূর্ব্বকার ত্রস্ত, ভীত, কুণ্ঠিত মূর্তি নহে, আজ ইহার কোথাও কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, এ যেন নিজের অধিকারবলে আজ দৃঢ়পদে স্থিত-মুখে আসিয়া তার মুখের সামনে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। স্মৃতি ইহার সমুজ্জল স্থিরদৃষ্টির আঘাতে যেন একটু অস্থির হইয়া উঠিয়া দৃষ্টি নত করিয়া লইল। সহসা তার মনে হইল, যদি বিপ্রদাসের আচরণ স্মরণ্যকে কলঙ্কিত না করে, তবে অমূল্যের পাপেই বা নীলিমা পাপী হইবে কেন? তখন স্মৃতির চিন্তাশ্রোতে উল্টা হাওয়ায় বিপরীত মুখেই বহিতে লাগিল। বিগত রাজ্যের বিচিত্র ঘটনাটা এতক্ষণ তাহার আধ-জাগ্রত চিন্তে যেন বৈচিত্র্য-ভরা স্বপ্নজালের মতই একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু এখন সেটা সকল স্মৃতিরথাকে অস্পষ্ট করিয়া দিয়া ফুটতর হইয়া উঠিল এবং সেই অপূর্ব্ব ঘটনাজালের জটিল গ্রন্থিগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ঐ একটি মুখই তাহার মনের চোখে ভাস্বর হইয়া উঠিতে লাগিল। স্মৃতির এতক্ষণকার আত্মচিন্তার স্থল অতি সহসাই পরার্থপরতার অতি সমুজ্জল দৃষ্টান্তটা অধিকার করিয়া লইল। তখন বিশ্বয়ে অভিভূত প্রায় হইয়া গিয়া তাহার মনে পড়িল যে, নীলিমা কাল নিজেকে কতখানি বঞ্চিত করিয়াই তাহাকে এই মুক্তিদান করিয়াছে।

স্মৃতি স্মৃতি একটা নিশ্বাস সজোরে টানিয়া ফেলিল। যে কথাটা অতর্কিত বিপদের পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া তাহার একবারও মনে পড়িতে পার নাই, এখন এই নিরালস্য একা বসিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতে গিয়া তাহাই তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইল। তাহা নীলিমার বিপর্য্যবস্থার আশঙ্কা। স্মৃতির চিন্তে কেমন একটা মানির মতই কি একটা জিনিস যেন তাহার মনটাকে এই বলিয়া পীড়িত করিতে লাগিল যে, তুমি তো বাঁচিলে, এখন সেই হতভাগীর কি দশা তাহার বাপে করিবে, তাহার কি কিছু ঠিকানা আছে? সেই যে স্মৃতির পলায়নের সহায় হইয়াছিল, এ কথা জানিতে পারিলে, চাই কি মেয়েকে সে রাক্ষসটা খুনও তো করিতে পারে!

এ চিন্তায় স্মৃতির আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে সবই পারে—যদি তাই হয়, সত্যই যদি স্মৃতিকে বাঁচাইতে গিয়া নীলিমাকে প্রাণ দিতে হয়? ওঃ!—ওঃ! কেন সে এই কথাটা কাল রাতে একবারটিও ভাবিয়া দেখিল না? কি নিশ্চিত মনেই চলিয়া আসিল। উঃ, বড় অজ্ঞান হইয়াছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ক্ষুদ্র টেননের ক্ষুদ্র প্ল্যাটফর্মের একটা ধারে শুক হইয়া বসিয়া বসিয়া স্মৃতি এই রকম কত কি আকাশপাতাল ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সকল পরস্পরবিরোধী চিন্তার সে কোথাও যেন কূল খুঁজিয়া পাইল না। নীলিমার অদৃষ্টে এতক্ষণ না জানি কি হইয়াছে! ভাবিয়া মন তাহার ব্যাকুলতার অধীর হইয়া উঠিতেছিল—এমন কি, নিজের স্বার্থে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া পুনশ্চ সেখানে ফিরিয়া গিয়া অমূল্য-প্রদত্ত অত্যাচারের অংশগ্রহণে এই কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের কথাও এক এক-বার তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ নিজের মায়াকে বড় সহজে তো কাটাইতে পারে না। এই চিন্তায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত ভাবের তরঙ্গ চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া যুক্তি দেখাইল যে, নিশ্চয়ই নীলিমা তাহার সাহায্য করার কথা স্বীকার করে নাই এবং তাহাকে এ ক্ষেত্রে সন্দেহ করিবার তো কথাও নহে। অতএব এই বৃথা আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এই চিন্তায় গুরুভারাত্মক হৃদয় অনেকখানি যেন লঘু হইলেও একটা ক্ষুদ্র অচ অতি তীব্র অমৃত্যুপের বেদনা স্মৃতিতে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিয়াই রাখিল এবং নীলিমার নিকট হইতে সে আগাগোড়াই

যে নির্বাক ও নিঃস্বার্থ সেবা-বস্তুগুলা পাইয়াছে, তাহার সেবাকুশলতার, স্বার্থশূন্যতার, কর্মশক্তির, ধৈর্যের যে সকল পরিচয় সে এ যাবৎ পাইয়া আসিয়াছে, আর তাহার উপর সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া নিজেকে কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরেই এই যে এত বড় বলিদানটা সে করিল, এই সকল একত্র মিলিত হইয়া তাহার কৃতজ্ঞ হৃদয়কে তাহার প্রতি স্নেহে, শ্রদ্ধায় এবং হয় তো তদপেক্ষাও সমধিক বেগবানু আরও কোন কিছুতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। স্নেহের উজ্জল মূর্তি ইহার পাশে আজ যেন একটুখানি নিম্নতর হইতেছিল। তার মনে হইল, যদি এই স্নেহকে তার বাপ বহু পূর্বাধিই ষাণ্ডস্তা বধূরূপে নির্বাচন করিয়া না রাখিতেন, তবে হয় তো তার পক্ষে ভালই হইত। নীলিমার প্রতি তাহাকে এরূপ অমানুষিক নিঃস্বার্থতা প্রদর্শন করিয়া আসিবার প্রয়োজন হইত না। মনটা তার নিতান্তই ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিতে স্নানান্তের প্রায় সপ্তাহকাল বিলম্ব ঘটিল। এই দিন সাতকের ইতিহাসটা মোটামুটি এই রকম,—

সে দিন * * * ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খার্ড ক্লাস-যাত্রীরা সকলেই চলিয়া গেল। বহুবিলম্বিত ছ'তিনখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন গতায়ত করিল, কিন্তু স্নানান্ত ঠিক সেই একরকমই গভীর চিন্তাতারাতুর আচ্ছন্ন অভিভূতবৎ বসিয়াই রহিল। উঠিল না, নড়িল না বা সে সম্বন্ধীয় কোন চিন্তাও হয় তো তখন তাহার মনের মধ্য হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর রুদ্ধ বৈশাখের খরতপ্ত রৌদ্র লইয়া ঘর্মাক্ত শরীরে শুষ্ক কণ্ঠে আর কর্তব্যবিমূঢ় চিন্তা লইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল।

ষ্টেশনমাষ্টার নিজের কর্তব্য সমাধা করিয়া নিকটবর্তী বাসাবাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের জন্ত যাইতেছিলেন, দৃষ্টি স্নানান্তের প্রতি বদ্ধ হইল। তাহার কর্ণমাত্র চট্জুতা, তাহার কাদামাথা ধূতি-পিরাম, রক্ত ও বিপর্যাস্ত কেশ, এ সকলে দেখিবার

কিছুই ছিল না, ছিল শুধু তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিতে বাঁধা হৃদয়ে স্তায় শুষ্ক কয়েকটি দুর্বাদল। বিস্মিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে হে তুমি? সেই ভোর থেকে ব'লে আছ? যাবে কোথায়?”

স্নানান্ত এই অতর্কিত সম্বোধনে চকিত হইয়া চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া উত্তর করিল, “কলকাতা।”

“কলকাতা যাবে? তবে ঐ ৯টার প্যাসেঞ্জারটার গেলে না কেন? ওটার চাইতে সুবিধার ট্রেন তো আর একটাও নেই।”

স্নানান্ত শুষ্কমুখে চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের কৌতূহল বাধা মানিল না। সহসা তিনি স্নানান্তের সেই স্তম্ভিত হাতটার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশপূর্বক সন্মুখের দিকে প্রায় করিয়া উঠিলেন, “তোমার হাতে বিষের স্তম্ভ বাঁধা দেখছি, কিন্তু”—বাক্যের পাদপূরণ করিলেন অদৃশ্য বধুর বৃথামেষণ চেষ্টায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালনপূর্বক।—তাহার পর স্নানান্তের জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঙ্গে বউ তো কে দেখাছেন?”

স্নানান্তের শান্তিমলিন মুখ এই কথায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, সে নিরুত্তরে শুষ্ক হইয়া রহিল। তা' দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের সহসা সন্দেহ হইল যে, হয় তো লোকটা পাগল, মা-বাপ ছেলের পাগলত্ব গোপন করিয়া কোন নিরীহ বালিকার স্বপ্নে ইহাকে চাপাইতে-ছিল, কিন্তু তাহার ভাগ্যের জোর থাকায় ভগবানু ইহার মাথায় পলাইয়া আসার খেয়াল চাপাইয়া দিয়া থাকি-বেন।—এই কথাটা মনে হওয়ার তাহার মনটা একটুখানি প্রশস্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি কোমল স্বরে স্নানান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু খেয়েছ?”

আবার একটা ঘরিত রক্তোচ্ছ্বাস তড়িৎবেগে স্নানান্তের কর্ণ, কপোল ও কর্ণমূল রক্তিম করিয়া দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু অকস্মাৎ কি ভাবিয়া সে-ও যেন আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল—“না।”

“খাবি কিছু?”

স্নানান্ত এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া হাসিয়া মাথা হেলাইল।—খাইবে।

বাস্তবিকই তখন তাহার জঠরানল যেরূপ প্রচণ্ড-বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার অপেক্ষাও তুচ্ছভাবে

কেহ তাহাকে এ প্রস্তাব জানাইলে তাহাতেও হয় তো সে নিমন্ত্ৰণ গ্রহণে সে দ্বিধা করিত না।

“আয় তবে আমার সঙ্গে আয়”—বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং সুশীলও অসঙ্কোচে তাঁহার সঙ্গ লইল। তিনি যে উহাকে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থ বলিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া সে অনেকখানি আশ্বস্ত এবং একটা বেশ কৌতুক বোধও করিতেছিল। পথে সে হাতের সূতাটা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। খুলিবার ও ফেলিবার সময় আর একবার নীলিমার মুখখানা তাহার মনের আকাশে তড়িৎস্পর্শের মতই চকিতে উঠিয়া মিলাইয়া গেল। অন্তরের মধ্য হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠিত হইয়া আসিল।—আহা বেচারী!

ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহে আসিয়া আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এত বেলায় এক পূর্ণবয়স্ক অতিথি সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারগৃহিণী স্বামী প্রাতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় বা মুখে আসিল, তাই বলিয়া অবশেষে উঁচু গলায় শব্দ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “এনেছ সখ ক’রে, নিজের ভাত-গুলো ধ’রে দিয়ে এক খালা ছাই বেড়ে এনে দিচ্ছি, তাই খাওসে।”

স্বামীটি বিনতির সুরে অনেক মিনতি স্তুতি করিতে লাগিলেন, বাহিরে থাকিয়া সে-সকলের ভাষাগত অর্থবোধ না হইলেও তাহার ভাবার্থ বুঝিতে সুশীলের পক্ষে বাধা ঘটিল না। তাহার সঙ্গে আরও একটা শব্দ অকস্মাৎ তাহার কানে আদিয়া বাজিতে সে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও সেই সঙ্গেই মনে মনে ইহাতে অপরিমিত কৌতুকও বোধ করিল। সে শুনিতে পাইল, ষ্টেশন-মাষ্টারটি তাঁহার কুপিতা প্রিয়ান মনস্তত্ত্বের জন্ত মানা কথার মাঝখানে বলিয়া বসিলেন, “ওকে কি আর শুধুই এনেছি? তুমি যে সে দিন এক জন রাঁধুনির খোজ করতে বলেছিলে না, তারই জন্তেই না এনেছি।”

এ কথায় গৃহিণী সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়া উঠিলেন, “আহা, তাই বল! তা এতক্ষণ বলনি কেন ছাই? আচ্ছা, নাও, এখন মুখহাত ধুয়ে খেতে বসো, ওলো বিমল! নে, চট্ ক’রে, তোর বাবাকে একটা ঠাই ক’রে,—বলি গেলে কোথা? আছ না মরেছ?”

“যাই না,” বলিয়া একটি বছর তেরোর মেয়ে

আধখোলা কক চুলের বেণী ছলাইয়া ছুটিয়া আসিল। সে তখন পাড়ার ছুটি হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কড়ি খেলিতে ব্যস্ত ছিল। মা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “খেড়ে মেয়ের দিনরাত কেবল কড়ি-খেলা। যা, শীগ্গির ঠাই ক’রে দিয়ে, একখানা খাল ধুয়ে দে দেখি—ভাতটা বেড়ে ফেলি। হ্যাঁগা! তোমার ঐ রাঁধুনীটাকে ছুটা ছাতুটাতু দিলে এ বেলাটা আর চলবে না? ভাত তো আর রাঁধা হয় নি ওর জন্তে।”

সুশীলের মনটা একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ছাতু! সে কেমন লাগিবে? তাহার পরই সে মনটাকে সহজ করিয়া লইল। তাই বা মন্দ কি? বরং সেইটাই তাহার এই রাঁধুনী-জীবনের সহিত অধিকতরই খাপ খাইবে। ছাতু খাইবার জন্তই সে মনে মনে প্রস্তুত হইয়া উৎসুক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, ছাতু ছাড়িয়া আস্ত ঘোড়ার দানা পাইলেও সে এখন খাইতে পারে। ক্ষুধার জ্বালা ও তৃষ্ণার কষ্ট ক্রমেই তাহার পক্ষে অসহ্যতর হইয়া উঠিতেছিল।

যা হউক, অবশেষে একমুঠা হাঁড়িটাটা ভাতের সঙ্গে চারিটি ছাতু, একটু গুড় ও এক ঘটা ঠাণ্ডা জল সে খাইতে পাইল। সেই ‘বিমল’-নামধারিণী অনুচ্চ কন্ঠাট এই সকল ভোজ্য বস্তু তাহাকে আনিয়া দিয়া আদেশ করিয়া গেল, “খেয়ে উঠে বেশ ক’রে গোবর দিয়ে ‘ঝুটা’ মুক্ত করো, আর বাসন-মাজা নোংরা হয় না দেখ! তা হ’লে ‘দোহরায়কে’ মলতে হবে।”

গোবরে হাত দিতে অত্যন্ত ঘণা বোধ করিলেও আলগোছভাবে কোনমতে সুশীল সে আদেশও পালন করিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে মোটে দুখানি ঘর। একখানি কর্তার শয়নগৃহ, অপরখানি প্রয়োজন-মত বাহিরের ঘর হয়, আবার রাত্রে ছেলেমেয়েদেরও কেহ কেহ সে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে। ইহারই এক প্রান্তে খালি মেজের উপর হাতে মাথা দিয়া সুশীল শুইয়া পড়িল এবং তাহার এই সম্পূর্ণ নুতন কৌতুকপ্রদ অবস্থার কথা সকৌতুকে মনে করিতে করিতে অতি সস্তরেই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। বিছাইবার জন্ত একটা মাত্র চাহিয়া পাঠাইতে উত্তর পাইয়াছিল যে, রাঁধুনি মানুষের আবার বিছানার কি

দরকার? নবাবের বেটা তো আর এ বাড়ীতে রাধিতে আসে নাই!

সন্ধ্যার পরে যখন সুশীলের ঘুম ভাঙিল, সে তখনই অনুভব করিল, বাড়ীর মধ্যে খুব একটা সোরগোল চলিতেছিল। একটুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারা গেল যে, সেটা তাহারই উদ্দেশ্যে। গৃহিণী গৃহান্তর হইতে সপ্তমে গলা চড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, “ও মা! এ কেমন রাধুনী নিয়ে এল গো! এ যে দেখি কুস্কর্ণের পিস্তুল তো ভাই! এর কানের কাছে ঢাক পিটোলেও সাড়া দেয় না যে! মিন্বে ম’রে গেল না কি? ওলো ও বিমল! এক ঘটা জল এনে ছোড়াটার মাথায় ঢেলে দে তো দেখি, জাগে কি না জাগে! এ সব ভিটকিলিমী আমার ঢের ঢের দেখা আছে।”

এই মন্তব্য কানে চুষ্টিতেই ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া তাহার চারি পাশে জমা হওয়া একপাল ছেলেমেয়ে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং জলের ঘটা হাতে সন্ত-প্রবিন্টা বিমলা এই আকস্মিক রমভঞ্জে স্কোপ তীক্ষ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল, “মা যে অত চোঁচিয়ে মরছিল, নিশ্চয়ই তুমি তা হ’লে ‘বল্ল’ ক’রে প’ড়ে-ছিলে? ‘বুটো’কে আমার জল ভোগালে? ভারি বদ-মানুষ তো তুমি দেখতে পাই।”

সুশীল প্রথমে বিরক্তি-সূচক ক্রকুটি করিল, পরে স্মিতমুখে এই অপবাদকেও শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল সে রাধিতে বসিয়া। প্রথমে তাহার মনে হইয়াছিল, রান্না আর এমন শক্ত কাজ কি? যখন অবস্থা এই রকমই ঘটিল, তখন আর কি করা যাইবে? দু’দিন রাধিয়া দু’টাকা পাইলে তাহার বাড়ী ফিরিবার একটু সুবিধা হইবে তো। কিন্তু কাজটাকে বাহিরে থাকিয়া যতটা সহজ দেখায়, কাৰ্য্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখা গেল সেটা আদৌ সে রকমই নহে। সর্ব্বের চাইতে অসুবিধা ঘটিল ভাত রাধা লইয়া। ভাত সিদ্ধ করিতে কি আন্দাজ জগ ঢালিতে হয়, সুশীলের সে বিষয়ে কোনই অভিজ্ঞতা নাই। সিদ্ধ হইল কি না, বুঝি-বারই বা উপায় কোথায়? তাহার পর ফেন গড়ান? সে যে এক বিষম বিপদ! অশেষ চেষ্টার পর সে যখন পাকপিওবৎ-ভাতের হাঁড়িটা জলন্ত চুল্লী হইতে কোনমতে ভুমে নামাইল, তখন পোড়া

ভাতের গন্ধে পাড়া মাতিয়া উঠিয়াছে এবং হাঁড়ি উটাইবার ব্যথা শ্রম তাহার যে উপায়ে বাঁচিয়া গেল, তাহার ফলে তাহাকে চির-অনভ্যস্ত এতই কঠিন কথা শুনিতে হইল যে, ধৈর্য্য রাখা তাহার পক্ষেও দায় হইয়া উঠিল। সেই চোঁচির হওয়া ভাতের হাঁড়ি, গরম ফেনের স্রোত এবং পোড়াভাতের দুর্গন্ধের মধ্যে হেঁটমুখে লজ্জাক্ষুণ্ণ চিত্তে বসিয়া সুশীল তাহার নূতন অবস্থার সকল কৌতুক-প্রলোভন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া লইল! না, নিশ্চয়ই তাহাকে উপরাস্তর খুঁজিতে হইবে!

ষ্টেশন-মাষ্টার ষ্টেশনে নিজের নির্দিষ্ট কার্য্যে নিমগ্ন ছিলেন, সুশীল গিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইল।

“কি রে? রান্না শেষ হয়েছে? খেতে ডাক্তে এলি না কি?” বলিয়া কৌতুকস্মিতমুখে ভদ্রলোকটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

সুশীল বিষম হাসি হাসিল। ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, “আজ্ঞে, মাপ করবেন, রান্না আমি করতে পারলেম না।”

“অ্যা। পারলি নে? কেন রে?—ওরা দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়নি বুঝি? দুটো দিন দেখে নিলেই খামা শিখে নিবি। বকুনি খেয়ে পালিয়ে এসেছিস্ বুঝি? তা দেখ্, আমার বাড়ীর ভিতরের ওরা একটু বকতে ভালবাসে, তা বকলেই বা? বকুনি খেলে তো আর কারু গায়ে ক্ষোভ পড়ে না—কি বলিস্? এই দেখ না কেন, আমাকেই তো সে কত বকে। আমি চুপটি ক’রে শুনে যাই, কথাটি কই নে’। কি আর করবে? বকে বকে মুখ ব্যথা হয়ে গেলে নিজেই তখন খামে। তুইও ঠিক তাই করবি। বুঝলি? আর, আমি দেখে আসছি, কি হয়েছে। আর, আমার সঙ্গে আর।”

সুশীলের আশ্রয়হীন চিত্ত এই সরল নিরীহ লোকটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করিল। সে তাহার পক্ষে সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে বুঝিয়াও তাই আর ‘না’ বলিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া মনিব-ভৃত্যের সংকারটা যে কিরূপ সাদরে ও সাড়সরে হইল, তাহা অমূল্য মাত্র।

প্রভাতে নিদ্রোথিত হইয়া সুশীলের মনটা আজ প্রথমেই নিরানন্দে ভরিয়া উঠিল। আবার সারাদিন সেই হীনতার ছায়াবেশে হীনাত্মন করিয়া তাহাকে

কাটাইতে হইবে! নিজের প্রতি ইহাতে একান্ত বিরক্তি ধরিল। একবার মনে হইল, দূর হউক, বাড়ীতে টেলিগ্রামে টাকা পাঠাইবার জন্ত আরজেন্ট তার দিই। আবার মনটা কেমন গুটাইয়া আসিল। বাড়ীতে এতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে যে কি কথাই না রটিয়াছে, কি সংবাদই না পৌছিয়াছে, তাহারই বা স্থিরতা কোথায়? সে সব খবর সঠিক না জানিয়াই সে তুচ্ছ করিয়া টাকার জন্ত সহসা সেখানে হাত পাতিতে যাইবে না। যদি অনুরূপ তাহার বাপকে সেই তাহার হের চক্রান্তের হীনতম কথা সত্য সত্যই লিখিয়া থাকে? ওঃ ভগবান! সে-তাহা হইলে তাঁহাকে আর মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? আর এ কথা শুনিবার পরে তিনিই কি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন?

সুশীলের বুকের মধ্যে দারুণ অশান্তি তুমুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি পিতা সে সব কথা বিশ্বাস করিয়া লয়েন? যদি তিনি সুশীলকে দোষী মনে করেন? যদি তাহাকে আর কখন ক্ষমা না করেন? তবে সেই বা বাঁচিবে কিরূপে? পিতা যে তাহার চিরজীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আদর্শ। পিতা যে তাহার শুধু পিতা নহেন, একাধারে পিতামাতা দুই-ই। যদি এত বড় কঠিন আঘাতে সেই অগাধ পিতৃ-স্নেহ তাহার বিপর্যস্ত হইয়া উঠে? সুশীল সে ক্ষতি তো সহিতে পারিবে না। বাড়ী ফিরিতে ভয় ও সঙ্কোচের সহিত ফিরিবার অগ্রহও তাহার যেন সীমাহারা হইয়া উঠিতে লাগিল। অথচ ফিরিবারই বা উপায় কোথায়? ফিরিবেই বা সে কেমন করিয়া?

এই আশঙ্কা-উদ্বেলিত, হুশিভ্রা-পীড়িত, উত্তেজিত শরীর-মন লইয়া কোনমতে দুইটা দিন কাটাইয়া তৃতীয়া দিবসারম্ভে শরীর-মন দুই-ই সুশীলের যেন তাহার নিজের বিরুদ্ধেই বিষম বিদ্রোহ করিয়া বসিল। এই অনভ্যস্ত অক্ষম দাসত্বের বন্ধন তাহার যেন অসহনীয় বলিয়া মনে হইল এবং তাহার সঙ্গে মনে পড়িল যে, এই ক্ষুদ্র কার্যের ক্ষুদ্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতে গেলে তাহার পক্ষে কত দিনই যে এই দুরবস্থা ভোগ অনিবার্য হইবে, তাহাও তো বলা যায় না। মনটা যেন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। প্রথমতঃ সে একটু কৌতুকবোধও এই চাকরী-স্বীকারের মধ্যে অনুভব করিতেছিল; কিন্তু সেটুকু দিনে দিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ

আর কোনমতেই তাহার গৃহাভিমুখী চিত্তকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। একবার মরিয়া হইয়া মনে করিল, বিনা টিকিটেই না হয় চলিয়া যাই—কিন্তু অন্তায় কার্যের অনভ্যস্ততার বিবেক ইহাতে কিছুতেই সাহায্য দিতে পারিল না।

বিমলা আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—“এই পাগলা! হাঁ ক’রে ব’সে ব’সে ধ্যান করছিস্ কি? রান্না কখন চড়বে শুনি? তোর মত সবারই তো আর হাওয়া থেয়ে পেট ভরবে না? ভাল এক খাপা এসে জুটেছে বাপু!”

সুশীল অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সবিস্ময়ে সে মনে মনে কহিল—“এই সব মেয়ে ভদ্রসংসারেরই, পড়িবেও কোন ভদ্রঘরে; কিন্তু ইহাদের কোনরূপ শিক্ষাসহবতের কোন আলাই নাই! —ইহার তুলনায় নীলিমা কত ভাল। অথচ ইহার বাপ তাহার বাপের চাইতে অনেক ভদ্র।”

তখন তাহার মনে পড়িয়া গেল স্বর্ণলতাকে। আহা, নিরীহ বেচারী! সুশীলের বুকেটা ব্যথায় টন-টন করিয়া উঠিল। কত মহৎ মন তাঁহার। নীলিমা মায়ের সেই মহত্বের অংশ কি না পাইতে পারে! নীলিমার মহত্বের কথায় নিজের অনুদারতা স্বরণে মনটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সুশীলকে নিরন্তর দেখিয়া বিমলা বিষম রাগিয়া গেল। ক্রুদ্ধ তর্জনে মুখ খিঁচাইয়া বলিল, “বলি, কানে কথা যাচ্ছে?—শীগগির ওঠ্ বলছি। না হ’লে ছিপটা নেরে তুলবো।”

সুশীল ক্ষুণ্ণ স্বরে জবাব দিল,—“আজ আমার ভাল লাগছে না, আজ আর আমি রাঁধবো না।”

বিমলার মুখ ক্রোধে পুরুষ হইয়া উঠিল, “কি আদ্যার গো!—ম’রে যাই আর কি! রাঁধবেন না! —ওঁর ভাল লাগছে না! লাট সাহেব এয়েছেন! —আম্পর্ক! তো বড় কম নয়!—মা! ও মা! শুনতে পাচ্ছো—তোমার আত্ম-গোপাল আজ রাঁধতে পারবেন না, তাঁর মন ভাল নেই।”

গৃহান্তর হইতে গৃহিণীর ক্রোধ-গম্ভীর কণ্ঠের সাদা আসিল,—“যাচ্ছি কি না চালা কাঁঠ নিয়ে, মন ভাল ক’রে দিবে আসছি। হতছাড়া ছোড়ার সকলই বায়না।”

রাত্রি ৯টার মধ্যেই এ বাড়ীর রান্না-খাওয়া চুকিয়া যায়। ডাউন প্যাসেজার প্রায় মধ্য-রাত্রে এখানকার

ট্রেন ছাড়ে। আহা! সমাধা করিয়া আসিয়া ট্রেন-মাষ্টার নিজাববুদ্ধিত নেত্রে টেবলের সামনে বসিয়া চুলিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ ঘটিকা-যন্ত্রের প্রতি চকিত কটাক্ষ স্বতঃই পতিত হইতেছিল। সুশীল আসিয়া বিজড়িতভাবে এক পাশে দাঁড়াইল।

“কি রে? এত রাত্রে কি করতে এলি?”—বলিয়া নন্দবাবু সম্মুখস্থ তাহাকে সম্বোধন করিলেন। তাহার বিষয় মুখের দিকে চাহিতেই মনটা যেন তাঁহার করুণামখিত হইয়া গেল। এই নিরাশ্রয় তরুণ ও সুন্দর ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে যে তিনি একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশেষ অজ্ঞাত ছিল না। আজ যে একটা বড় রকম ঝাপটা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, ইহাও তাঁহাকে জানিতে হইয়াছিল। কারণ, তিনিই তো গৃহিণীর উপর শত্রুতা-সাধনের বদ মতলবেই এটাকে জুটাইয়াছেন।

সুশীল আজ সকল দিককে পরাস্ত করিয়া স্থিরসঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিল। সঙ্কোচে কণ্ঠ তাহার বোধ করিতে চাহিলেও সেই নিষেধাজ্ঞা ঠেলিয়া ফেলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া ফেলিল,—“আমার আপনি বা দেখছেন, আমি ঠিক তা নই।—আমার নাম সুশীল-কুমার রায়, আমার বাপ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় অবস্থাপন্ন লোক, দৈববিড়ম্বনায় আমার এ রকম বিপন্ন হ’তে হয়েছে। আপনি যদি আমার ৭টি টাকা কর্জ দেন,—আমি বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে পৌছেই আপনার টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো।”

নন্দবাবু বিস্মিতনেত্রে সুশীলের গভীরভাবে উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কণ্ঠে অধুনার যে সত্যের সুর ঝঙ্কার দিয়াছিল, তাহার মুখ-চোখের উৎকণ্ঠিত আগ্রহের মধ্য হইতে সহজ সত্যের যে অমিশ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে নিতান্ত অন্ধ ব্যতীত আর কেহই যে অবিশ্বাস করিতে অপারগ।

উত্তেজনাক্রম্বে আগ্রহবাকুলকণ্ঠে সুশীল পুনশ্চ কহিল, “পারবেন কি বিশ্বাস করতে? আমি ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তুম, আমার আমি কি জানি? এক মাস আপনার বাড়ী রাঁধতে পারলেও হয় তো ঐ সাত টাকা আমার হবে না, আর আমি তা পারবোও না, অত দেরী করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবাকে এ সব কথা জানাতে ইচ্ছা করি না, না হলে—”

সুশীলের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। উদ্বেলিত লজ্জা অভিমানটাকে দমন চেষ্টায় সে এইবার বিশেষ-ভাবেই মনোযোগী হইয়া পড়িল।

নন্দবাবু একটি কথাও না বলিয়া বাক্স খুলিয়া এক টাকার করিয়া সাতখানি নোট গণিয়া লইয়া তাহার হাতে দিলেন।

ঢং ঢং ঢং ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ট্রেন-মাষ্টার সুশীলের হাতে টিকিটখানা দিয়া বলিলেন, “আমার বাড়ী অনেক দূরখি তুমি পেয়েছ, সে সব ভুলে যেও।”

সুশীল সাক্ষ্যনেত্রে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অশ্রুগাঢ় স্বরে কহিল, “আমার আপনি ভুলবেন না। যদি কখন সুযোগ পাই, আবার একবার আপনার কাছে আমি আসবো।”

নন্দবাবু স্নেহ-করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। হইশেল দিয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে নৈশ অন্ধকারাশির মধ্যে সেই দু’দিনের রহস্যময় অপরিচিতকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরীর এক সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর উদ্যানমধ্যবর্তী প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি যত্ন-সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া দুইটি সুন্দরী তরুণী মিলিয়া কথোপকথন করিতেছিল। মুক্ত জানালার উপর ঝালরদার পর্দা আঁটা, দরজার উপর মোটা কাপড়ের পর্দা ফেলা, ঘরের মার্বেলের মেঝে পুরু-গালিচায় মণ্ডিত, আশপাশে টেবল, চেয়ার, কোচ, ইহার এক পাশে একখানা বড় সোফার উপরে বসিয়া বিনতা ও সুলেখা।

সুলেখা এখন আর সেই ক্ষুদ্রাকৃতি বালিকাটি নাই। সে এখন বর্ষাবারিপরিপূর্ণা স্রোতস্বিনীর মতই অভিনব শ্রী ধারণ করিয়াছে। গোমুখীনিঃসৃত স্বচ্ছ নির্ঝরধারাটুকু এখন যমুনাসঙ্গমের জাহ্নবীরূপিনী সেই হিমগোরতপ্তকাঞ্চনবর্ণ এখন যেন বয়সের উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বলতর ও আভাযুক্ত হইয়াছিল। সর্বদলের পূর্ণতা ও মন্থণতা যেন তাহাকে নিপুণ হস্তের রচনা করা দেবী-প্রতিমার মতই অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। চিরচঞ্চল হরিণীনেত্র যেন আজ ঈষৎ সরমসঙ্কোচে

নত হইয়া আসিতে শিক্ষা করিয়াছে, গণ্ডেও তাহার এখন মধ্যে মধ্যে লজ্জার লালিমা গোলাপের বর্ণকে গাঢ়তর করে।

তুই জনে কথা হইতেছিল। বিনতা বলিতেছিল, “তুই বলতে পারবি কেন? নিজে রূপের ডালি সাজিয়ে ব’সে আছি কি না, রূপতৃষ্ণা কি জিনিস, তা তো কখন জান্‌লি না। আমি নিজে কালো মানুষ, আমার নিজেকে নিয়ে তো কোন দিনই আশ মেটেনি, তাই আমি অপরকে নিয়ে সেইটে মেটাতে চাই, তুই নিজের রূপেই নিজে মসৃণল হয়ে থাকবি, তোর কি?”

সুলেখা লজ্জাস্থিত মুখে উত্তর করিল, “তাই নাকি হয়? নিজে কালো কি ভাল, তা বুঝি আবার দেখা যায়? না ভাই! তা ব’লে তোমার ও কথাটা ঠিক নয়। রূপে মন মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু সেটা কখনই স্থায়ী হ’তে পারে না, এক দিন না এক দিন মানুষের মন থেকে রূপের মোহ কেটে যায়ই যায়। কিন্তু গুণের আদর চিরস্থায়ী।”

বিনতা সন্দেহ-স্থিত মুখে একটু অনুযোগের সুরে কহিল, “তবে কি তুই বলতে চাস্‌ তোর হবু-নন্দাইয়ের কোন গুণই নেই? সেটি মাকালফল?”

সুলেখা অপ্রতিভের একশেষ হইয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে এই অনুযোগটাকে সে অস্বীকার করিতে না পারিলেও প্রকাশে আবার উহাকে স্বীকার করাও চলিল না, তাই ঘাড় হেঁট করিয়া ঈষৎ নম্র মধুর হাস্যের সহিত সে কেবলমাত্র কহিল, “তাই কি আমি বলছি?”

বিনতা আবেগের সহিত কহিল, “বলছিস্‌ বৈ কি, তা শুধুই কি তুই? সবাই তো এই কথাই বলছে, বাবার মন তো খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে,—সেও আমি বেশ টের পাচ্ছি। দিদি তো আমার সঙ্গে বাক্যলাপই ছেড়েছে। জামাইবাবু এ বিয়ে তো আসবেনই না, কারণ, তাঁর ভাইকে অপমান করা হয়েছে,—দাদার যে কি মতলব, তা সেই বলতে পারে। এ দিকে তো দেখি তুই জনে হরিহর-আত্মা! কিন্তু গরীবকে বন্ধু বললেও নিজের ভগ্নীপতি বলতে হয় তো তাঁরও বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে না।—আচ্ছা, কেন বল ত ভাই, গরীব ব’লে বুঝি বেচারার বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসতেও অধিকার নেই? আমি কালো, আমার বেঁওর ভাল লেগেছে, সেই তো ওর কতখানি উদারতা।”

সুলেখা বিস্মিত নেত্রে বিনতার ভাব-গস্তীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া বিনতা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিল।

“আচ্ছা ভাই স্ন! তোরও তো দাদার সঙ্গে কত দিন থেকে বিয়ে কথা হয়ে রয়েছে, দাদাকে তোর খুব দেখতে ইচ্ছে করে? দেখতে ভাল লাগে? বিয়ের দেবী হচ্ছে ব’লে মনটা বিরক্ত হয় তো? আচ্ছা ভাই, ঠিক ক’রে বল।”

সুলেখার গালছটি ডালিমফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। চঞ্চল হইয়া সে নিজের অঞ্চল হইতে রেশমী সূত্র টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। কোন কথাই কিন্তু সে একটুও প্রতিবাদ করিল না। ইহা দেখিয়া বিনতা সকৌতুকে উচ্চহাস্য করিল।

বাহিরের দিকে একটা গোলমাল শুনা গেল। অলক্ষণ পরে নিতাই চাকরটা উচ্চকণ্ঠে কাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে শুনা গেল—“ওরে, পিসীমাকে ব’লে আয়, ছোটবাবু এসেছেন।”

বিনতা ও সুলেখা একসঙ্গে তুই জনেই এ সংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুলেখার পদনখ হইতে উখিত হইয়া মাথার কেশমূল পর্য্যন্ত একটা পুলকের হিলোল প্রবাহিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার রক্তিমায় তাহার হিমগুত্র ললাট ও কধুকণ্ঠাবধি আরক্তিম হইয়া উঠিল। বিনতা তাহার ফুলা চোঁট একটুখানি বাঁকাইয়া সান্ত্বনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করিল, “ঘরের ছেলে ঘরে এলেন তা হ’লে; আমি বলি, নীলিমা বুঝি তাঁকে ভুলিয়েই বা নিলে!”

সুলেখার কানে এ ব্যঙ্গোক্তিটা বড় ভাল লাগিল না। সে ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্ন তাহার মনে জাগিলেও, কিন্তু ইহাকে প্রকাশ করিতে তাহার প্রয়াস জন্মিল না; একটু লজ্জা বোধ হইল।

সুশীলকে দেখিয়া দ্বারবান, সরকারমহাশয় ও নিতাই খানসামা যতটা বিস্মিত হইয়াছিল, ঠিক ততখানিই সে তাহার ঘরের লোকেদের দান করিতে ইচ্ছুক হইল না। তাড়াতাড়ি স্থানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া সে নিতাইয়ের সাহায্যে স্নানাদি সারিয়া তাহার স্বাভাবিক বেশে যখন পিসীমার ও তাহার পরই ভুবনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, তখন তাহাকে কিছু রোগা দেখাইলেও তাহার উপর দিয়া কত ঝড় বে বহিয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন প্রকটিত ছিল না। পিসীমা তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে

বুলাইতে মনে মনে কৃপণ বুড়ার আশ্রয়প্রার্থীর ব্যবস্থা করিলেন। মুখে বিশেষ কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হইল না; কারণ, সেই সর্বনেশে কৃপণটার জালা তাঁহার সংসারে যে ভাবে পতিত হইয়াছে, তাহার কাছে এটুকু তো সামান্যই।

সুশীল এ বিবাহের সংবাদে স্তম্ভিত হইল। এ কি দৈববিড়ম্বনা, না প্রকৃতির পরিশোধ? যে দুর্দশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে ফিরিল, সেই অবস্থায় পতিত হইল, তাহারই বোন বিনতা!

বিনতাকে অনুকূলের পুত্রবধূ হইতে হইবে, মনে করিতেই সুশীলের মনটা বিরক্তিতে একেবারে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। না, এ কখন হইতেই পারে না। বিনতা সে ঘরের সহিত সম্পর্কিত হইলে, তাহাদের সংস্রব রাখা অনিবার্য হইবে। তাহা সম্ভবে না। এ বিবাহ এখনই বন্ধ করিতে হইবে।

তাহার পর শুভেন্দুর কথা মনে করিতে গিয়া সুশীলের মনে পড়িল যে, সেই বা কোন্ ভরসায় তাহাদের সেই মলিন সংসারের সংস্রবে তাহার বোনকে টানিতে চাহিতেছে! তাহার পর এ কথা মনে করার জন্য তাহার মনে মনে হাসিই পাইল। অনুকূলচন্দ্রের পুত্রই তো সে—তাহার পক্ষে আর বিনতাকে বিবাহ করিতে চাওয়া এমনই কি দুঃসাহস?

কতকটা সরোজিনীর অনুরোধে, কতকটা স্বেচ্ছায় সে একবার বিনতার সহিত শেষ চেষ্টায় আসিতে সম্মত হইল।

“বিন্!”—বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই সুশীলের সর্ব-প্রথম দৃষ্টি পড়িল সুলেখার জবাকুসুম সদৃশ আরক্তাভ মুখের উপর। চকিত বিস্ময়ের একটা বিপুল আনন্দ শিরায় শিরায় বহিয়া গেল! সুলেখাকে এখানে অতর্কিত দেখিয়া তাহার সারাপ্রাণ যেন আশ্বাসে ও পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সে যেন নিজেরও অভ্যাসে ভিতরে ভিতরে ইহাকেই খুঁজিতেছিল। নিজের মনকে সামলাইয়া লইবার জন্য আজ ইহাকে তাহার একান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারিয়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই তাহার প্রার্থিতাকে নিকটে দেখিয়া তাহার স্রুথের সীমা রহিল না। এ ভিন্ন নীলিমার চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

“কি গো দাদা! বাড়ী ফিরলে যে? নীলিমা

যে বড় ছেড়ে দিলে? আমরা বলি, একেবারে গাঁটছড়া বেঁধেই বা বুঝি আসছে!”

বিনতার এই সহজ বিজ্ঞাপন সুশীল যেমনই ভীষণভাবে চমকিত, তেমনই রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যে অপরাধীর লজ্জা রক্তস্রোতে তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তা হ’লে হয় তো অনুকূল বাবাকে চিঠি লিখিয়াছে। তিনি কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তিনি তো কখনই কিছু বলেন না। সহসা অপরিমিত মানসিক লজ্জায় সে সুলেখার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুলেখাও কি সে সব কথা জানে?

বিনতা সুশীলের বিজড়িত অবস্থা দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া উঠিল, “খোকাছেলের বুঝি রাগ হয়ে গেল? হ্যাঁ, রাগ শুধু উনিই করতে জানেন, আরি তো আর জানি নে! এত দেবী ক’রে আসা হলো কেন বল তো? সুলি শুধু তোমার পথ চেয়ে ব’সে রয়েছে—বাবুর আর সেই ‘কিপটে বামুনের’ ভাতের মায়া কাটে না—সাধ ক’রে কি আর বলতে হয় যে, নীলিমা সেখানে তোমায় ‘তুক’ করেছে।”

সুশীলের সর্বদা হইতে একটা দারুণ লজ্জার খোলস খসিয়া পড়িল। সে নিচিন্ত স্নিতমুখে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—“কে’ কাকে কি করেছে—সে তো বাড়ী এসেই দেখতে পাচ্ছি!”—বলিয়া সুলেখার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই সলজ্জ স্নিতমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

“ভাল আছ সুলেখা?”

রঞ্জিতমুখী সুলেখা ষাড় নাড়িয়া এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। বিনতা বলিল—“ভাল এত দিন ছিল না, আজ এই এখনই ভাল হলো। পোড়ারমুখী ক’দিন ধ’রে কেবল কান পেতে পেতে মোটরের শব্দই শুনেছে। বিশ্বের আর কোন শব্দই ক’দিন ওর কানে গিয়ে পৌঁছায় নি।”

সুলেখা বিনতার বাহুল্যে একটা কঠিন চিন্তা কাটিয়া চাপা তর্জনে উহাকে শাসন করিল—“খবরদার!”

সুশীলের ভারাক্রান্ত চিত্ত ক্রমেই লঘুতর হইয়া আসিতেছিল। সুলেখা!—তাহার সুলেখা!—তাহার অন্তরাসনের চির-প্রতিষ্ঠিত দেবী—তাহার সঙ্গে কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবে না।—এত রূপ—এত গুণ—এত স্নেহ, আর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা! এত দিন বিবাহের

কথা চলিলেও সুশীল কোন দিনই ইহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে নাই। সেই বাল্যে পরিচিতা, ইদানীং কদাচিত্ দৃষ্টা, নিকট-আত্মীয়া হিসাবেই সে এই সুন্দরী মেয়েটির কথা স্মরণে রাখিয়াছে। এই ঘটনাতেই সর্বপ্রথম সে তাহাকে তাহার মানসী-প্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া, মনে মনে বিপুল নির্ভরে তাহাকে নিজের-অত্যন্ত নিকটবর্তী করিয়া লইয়াছিল। আবার আজই সে তাহাকে নিজ চিত্তের দুর্বলতার—চঞ্চলতার রক্ষাকবচ বলিয়া একান্ত বিশ্বাসে আঁড়িয়া ধরিতে চাহিল। তাহার মনে হইল, আগামী পরশ বিনতার পরিবর্তে যদি তাহারই বিবাহটা প্রথম হইয়া যাইত!

বিবাহের ইচ্ছা মনে জাগিতেই অনিবার্যরূপে সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণে আসিল নীলিমা। সেই নির্জন পথপ্রান্তে অবিরল বৃষ্টিধারামধ্যে পরিতাক্তা নীলিমার অশ্রুপ্লাবিত দীনমূর্তি! সুশীল ক্লিষ্ট চিত্তে স্মৃতির দিকে পাশ করিয়া দাঁড়াইল।

“কি গো দাদা! দাঁড়িয়ে রইলে যে, বসলে না? না—হার হাইনেসের হুকুম না পেলে বসতে পারছো না? ইওর হাইনেস! দাদা বেচারীকে কুপা করে একটুখানি বসবার অনুমতি দিয়ে দেন।”

“বাঃ, আমি চ’লে যাচ্ছি”—বলিয়া স্মৃতি একটু নড়াচড়া করিল, কিন্তু বাস্তবিকই সে চলিয়া গেল না।

সুশীল অপ্রস্তুতভাবে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলিল—“তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।”

এই প্রস্তাব শ্রবণে বিনতার স্বপ্ন অধর স-বিরক্তি মুহূর্তে হস্তে কুণ্ঠিত হইল।—“ব’লে ফেল।”

সুশীল অপাঙ্গে স্মৃতির দিকে চাহিতে স্মৃতি আপত্তি বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে বাইতেই বিনতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—“তোকে যেতে হবে কেন? যা কথা হবে, তুইও উপস্থিত থেকে তা’ শুনেই যা। কথা যা, সে তো আর নূতন কিছুই নয়, আর গোপনেরও তাতে আমার কিছুই নেই।—দাদা, তুমি এই বলবে তো যে, এ বিয়ে আমার পক্ষে লজ্জা!—আর তোমাদের পক্ষে অপমান?—কেমন এই তো?”

সুশীল ঠিক এ রকম জেরায় পড়িলে, তাহা ভাবে নাই, তাই কিছু কাল একটু বিপর্যয় থাকিয়া পরে নিজেকে কঠিন করিয়া লইল; দৃঢ়স্বরেই কহিল,—“জ্যা—হ্যাঁ! তা তার চাইতে খুব তফাতও নয়।”

উত্তরটা সুশীলের স্বভাববহির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বিনতা একটু যেন বিষয়ানুভব করিল। তাহার পর তাহার একজেরী স্বভাবের বশে উৎখলিত ক্রোধাভি-মানে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া গভীর পরুষকণ্ঠে “হোক গে যাক্,—তাতেও কিন্তু আমার মত বদল হবার নয়।”—বলিয়াই ক্রোধ-সজল চক্ষুতে তড়িদবেগে উঠিয়া গেল। তাহার দাদা যে তাহার বন্ধুর বিরুদ্ধে এত বড় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে, এ যেন তাহার ধারণাতেও ছিল না। আর কেহ না করুক, সুশীল আসিয়া তাহাকে যে নিশ্চয়ই সমর্থন করিবে, এ বিশ্বাস তাহার অন্তরে দৃঢ় ও বদ্ধমূল ছিল।

বিনতা অমন করিয়া কান্নাভরা চোখে ও বিহ্বলকণ্ঠে পলাইয়া গেলে সে আঘাত সুশীলকে বড় কম বাজে নাই। কিন্তু এ কম দিনের অভিজ্ঞতা তাহাকে এমনই কঠিন করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ স্নেহের বোনের ঐ মাতিমান বেদনাটুকুর তাহার কাছে আর তেমন আদর ছিল না। গুণ্ডমুর মধ্যে কত দুর্বলতা, কত অশ্রু-য়ের বীজ নিহিত, আজ সে সব কথা মনে করিয়া তাহার মন কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, জোর করিয়াও এ বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব। পিতার প্রতিও একটু অভিমান হইল। এ কি অসম্মত আবদার রক্ষা? তিনি অসম্মত হইলেই ত সব চুকিয়া যাইত।

প্রস্থানোত্তর স্মৃতির চুড়ির ঝনৎকার সুশীলকে সমাজ করিয়া তুলিল। ব্যগ্রভাবে চোখ ফিরাইয়া সে অসঙ্কোচে ডাকিল, “স্মৃতি!”

স্মৃতি দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল।

“এস, ব’সো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

স্মৃতি পূর্বস্থানে আসিয়া বসিল। সুশীলের সঙ্কোচহীন ব্যবহারে সেও তাহার নবজাত সলজ্জ ভাবটা দমন করিয়া লইয়াছিল। স্বভাবে সে তো কখনই সঙ্কুচিতা নহে। বয়োধর্ম ও মাতৃশিক্ষা মাত্র তাহাকে লজ্জাবরণ পরাইয়া দিতেছিল।

তুই জনে বহুকণ নীরবে বসিয়া থাকার পর স্মৃতিই প্রথম কথা কহিল, “কৈ, কি কথা আছে বলেন যে? বলচেন না?”

সুশীলের মুখ চিন্তামান। স্মৃতিতে যে কথা জানানো তাহার আজ প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছিল, এবং জানাইবার এমন প্রশস্ত অবসরও

আপনা হইতে ঘটিয়া গিয়া সে বিষয়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এখন বলার সময় দেখা গেল, বলিবার পক্ষে তাহাতে যথেষ্ট সঙ্কোচ আছে। নীলিমা-ঘটিত সকল কথা হয় ত সে তাহার বাগদত্তা এই কুমারী মেয়ের কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারিবে না। বাস্তবিকই তো আর সে তাহার এখনও স্ত্রী হয় নাই।

সুশীল নিজের ফাঁদে নিজেরই জড়াইয়া পড়িয়া বিমূঢ়ভাবে উত্তর দিল, “কি বলা উচিত, ভেবে পাচ্চিনে, লেখা!”—তাহার পর একটুখানি উৎসাহিত ভাবে সহসা প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, লেখা! মনে কর, কেউ আমার খুব নিন্দা করলে—তুমি কি সে কথায় বিশ্বাস করবে?”—এই কথা বলিয়া ফেলিয়াই সুশীল গভীর আগ্রহভরে সুলেখার বিষয়াপন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুলেখা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঈষৎ হাসিল। সে মিষ্ট হাসিতে তাহার চকিত হরিনীচকল কালো চোখের সবটুকু বিষ্ময়লেখা ধৌত হইয়া একটি অতি কোমল স্নিগ্ধজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইল। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে সে জবাব দিল, “শুধু পেয়ারা চুরি ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করি না,” বলিয়াই সে মুখে সলজ্জভাবে আচল চাপিয়া দিল।

তখন সুশীলও মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে ঘোড়হাত করিয়া বলিল, “ভুলে গেছলেম, সত্যিই তো, ও বিষয়ে যে আপনি আমার ‘আই উইট-নেস্’ ও কুকীর্তিটা আর আমার এ জন্মে চাপা দেবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু দোহাই আপনার, —ধর্ম্মাবতার! পেয়ারা চুরি করেছিলুম বলেই—‘যা কিছু হারাবে, কেউ বোকাই চোর’—এ সিদ্ধান্ত স্থির ক’রে রাখবেন না যেন!”

দুই জনেই অনেকখানি হাসি হাসিল; কিন্তু সেই হাসির শেষদিকে দুই জনেরই মন দুই রকমে ঈষৎ গভীর হইয়া আসিল। সুলেখার হঠাৎ মনে হইল, যাহার সহিত তাহার আজও বিবাহ হয় নাই, তাহার মুখ হইতে এ ধরণের কথাবার্তা বেশীক্ষণ তাহার শুনা সম্ভব নহে। আর সুশীলের স্বরণপথে অতর্কিতে সহসা ভাসিয়া আসিল—নীলিমা। তাহার সঙ্গেও কত দিন এমনই কোন হাসির কথায় এমন হাসিই যে সে হাসিয়াছে। আজ সে কোথায়! এই ক্লেশক্লিষ্ট আলোচনাকে সে নিজের মনে স্থান দিতে ব্যথা পায়, ভীত হয়, তাই ইহাদের সে সম্বন্ধে পরিহার করিয়াই

চলিতে চাহে, অথচ ইহারাও যে সময় নাই, অসময় নাই একটা ভৌতিক ব্যাপারের ছায়ার মত তাহার চিত্তকে সর্বদা অনুসরণ করিতেও তো ছাড়ে না এবং সুযোগ পাইলেই মহা উপদ্রবও উপস্থিত করে। এখন এই প্রিয়সমাগমের মধ্যে একে প্রশ্রয় দিতে কোন মতেই মন সায় দিল না। তাই মনটাকে সহজ করিয়া লইবার জন্ত তাড়াতাড়ি একটা কিছু সে বলিয়া উঠিতে গেল। যেটা প্রথম মুখে আসিল, তাহাই বলিল।

“লেখা! লেখা! আমার তোমাকে বড় দরকার হয়েছে—ভারী দরকার। তুমি আমার কাছে থাকলে আমি জগতের সমস্ত বিপদকে—সব প্রলোভনকেই ঠেলে ফেলে দিতে পারি। আমার জীবনে তুমি ক্রবতারা হয়ে থেকে, আমার রক্ষা করো! করবো তো?”

সুলেখা বিষ্ময়ে চমকিয়া উঠিল। এ কি কাতর স্বর, এ কি ক্লিষ্ট মুখ! সে চকিতে উঠিয়া সুশীলের কাছে আসিল। মমতা-মুখা তরল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমার মনে হচ্ছে, আপনার কোন বিপদ ঘটেচে, আমায় বলুন, আমার যথাসাধ্য আমি সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হব না।”

সুশীলের আর্তচিন্তে সহানুভূতির এই প্রলেপ যেম তাহার সকল আলা জুড়াইয়া দিল। এই অপার মেহ-সমুদ্রের নীতল জলে ডুবিয়া যাইতে তাহার সারা মন-প্রাণ যেন আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া হাত বাড়াইল। তাহার মনে হইল, যদি সুলেখা আজ তাহার—সম্পূর্ণ-ভাবে তাহার হইয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার অপেক্ষা ভাল আর তাহার পক্ষে কোন কিছুই হইতে পারিত না। ঐ করুণাক্রপিলীর বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া সে তাহার জীবনের এই জটিল রহস্যের কথা তাহাকে জানাইতে পারিলে আজ ঝাঁচিয়া যায়, কিন্তু কাছে থাকিয়া যে সুদূরবর্তিনী, তাহার কাছে মন খুলিতে চাহিলেও মুখ যে লজ্জার বাধা কিছুতেই কাটাইতে চাহে না।

তখন নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়া লইয়া স্নানমুখে কহিল, “বিপদ আমার আছে, সময় এলে তোমায় তা আমি জানাবো, তখন এমনি ক’রে আমার তোমার রক্ষাবাহ বাড়িয়ে দিও। এখন এই তোমায় অনুরোধ যে, এর মধ্যে যদি কিছু আমার সম্বন্ধে শোন, আমায় না জানিয়ে তুমি তা’ বিশ্বাস করো না।”—অনুকূল যে কখনই নীরবে থাকিবে না, তাহার পক্ষে কোন ভীষণ প্রতিশোধ সে যে লইবেই, এ চিন্তা

তাহার মন হইতে একবারও অপসৃত হইতেছিল না এবং মন তাহার যেন ক্রমাগতই একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলেরই প্রত্যাশায় শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল।

সুলেখা মাথা হেলাইয়া তাহার ভাবী স্বামীর অনুরোধে স্বীকৃতি প্রদান করিল। তাহার পর দুই জনে কিছুক্ষণ চিন্তিতচিন্তে নীরবে থাকার পর অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া সুলেখাই কথা কহিল,—“তা হ’লে এখন তো আর কিছু বলবার নেই? আমি এখন যাই? যখনই আবশ্যক বোধ হবে, আমায় আপনি জানাবেন।”

এই বলিয়া স্মিতমুখে সে সুলীলের পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

“ও কি করছো লেখা!”—সুলীল অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, কিন্তু আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। সুলেখার সমস্ত আচরণে তাহার ব্যথিত বক্ষ যেন নূতন একটা অজানা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, এখন সেটা প্রবলভাবেই টন টন করিয়া উঠিতেছিল। তাহার চোখের কোণে যেন গোমুখীর জলস্রোতঃ প্রবল উচ্ছ্বাসে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সুলেখার হাত সে এক মুহূর্ত্ত কালের জন্ত ছাড়িয়া দিতে তুলিয়া গেল! প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতে করিতে জলভারাক্রান্ত শ্রাবণ মেঘের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ওঃ সুলেখা! আমার অন্তরের বিপ্লব তুমি যদি দেখিতে পাইতে!

সুলেখা দীর্ঘ লজ্জিতা ও রঞ্জিতা হইয়া হাত তানিয়া লইয়া কখন যে চলিয়া গেল, সে বুঝি তাহা জানিতেও পারিল না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিনতার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পূর্বদিন অনুরূপকে পত্র লেখা হয়, বিবাহের দিন টেলিগ্রাম যায়, কিন্তু সেখান হইতে কোন উত্তরই আইসে নাই। বিবাহের বর ইহাতে উল্লসিত। কতাকর্তা দীর্ঘদ্বিগ্ন হইলেও অনেকখানি তৃপ্ত। কেবল একা সুলীলের মনেই এ ঘটনা কোন দুর্ঘটনারই পূর্বাভাসরূপে অশান্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। অত বড় ধূর্ত যে নিরুপদ্রবে এ দাবীটাকেও অগ্রাহ করিবে, সে যে নিজের চোখে দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

বিনতা বিবাহের পর পিতৃ-গৃহেই রহিল। কোথায়ই বা যাইবে? বিনতা ও শুভেন্দুর অবস্থা ইচ্ছা ছিল যে, ভুবনবাবু খরচপত্র করিয়া তাহাদের জন্ত এখনই স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দেন, কিন্তু ভুবনবাবু এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। তিনি শুভেন্দুকে নিজের আফিসে কাজ শিখিবার জন্ত ভর্তি করিয়া লইয়া নিজের কাছেই রাখিলেন। বিনতার মনে প্রথম ধাক্কা লাগিল এইখানেই। তাহার অবিবাহিত জীবনে ও বিবাহিত জীবনে বিশেষ কোন কিছুই প্রভেদ ঘটিল না।

ফুলশয্যার রাতে শুভেন্দুর স্বামিত্বের প্রথম পরিচয়েই সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে যে কাঞ্চনবোধে কাচ কিনিয়াছে, সেই একটি দিনেই সে বিষয়ে তাহার চিন্তে ঘোরতর সংশয় জাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা গভীর বিবাদের যনমেঘ অন্তরাকাশকে ব্যাপ্ত করিল।

বিনতার বিবাহব্যাপার চুকিলেই সুলীলের বিবাহোৎসব আরম্ভ হইবে, এইরূপই সকলের ইচ্ছা ছিল। এমন কি, সুলীলের নিজের মনেও এ সম্বন্ধে আগ্রহ অপর কাহারও অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের শুভ তিথি দুই মাসের মধ্যে আর পাওয়াই গেল না। অগত্যা এইটুকু বিলম্ব ঘটা অনিবার্য্য হইল এবং সপরিবারে বিপ্রদাসবাবু আরও এক সপ্তাহের জন্ত ভাবী বৈবাহিক-গৃহের আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া প্রায় প্রতি রাতে থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং এমনই কোথায় কোথায় ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সত্যবতী সরোজিনীর সহিত কালীঘাট, সর্বমঙ্গলা, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতিতে এবং বিনতা, শুভেন্দু, সুলীল, সুলেখা প্রভৃতি তরুণের দল দক্ষিণেশ্বর হইতে বায়স্কোপ, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোন কিছুকেই তুচ্ছ করিল না। প্রভাতে মোটরারোহণে যশোহর এবং সাক্ষা নদীতে স্টীমারভ্রমণে দুই এক দিন ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্তই তাহারা ঘুরিয়া আসিল।

শেষ যে দিন স্টীমারে করিয়া বেড়ান হইল, ফিরিবার সময় শুভেন্দু ও বিনতা কথায় কথায় কি লইয়া তর্ক করিল এবং তাহার ফলে বিনতা রাগ করিয়া উপরের কেবিনে গিয়া কোচে গুইয়া রহিল, তখন শুভেন্দু গেল তাহাকে সাধিতে। অগত্যা সুলীল ও সুলেখা মাত্র একা রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধকান্তি নীল আকাশে অগণ্য তারকার দীপালোক মর্ত্যবাসীর অবনত চিত্তকে উর্দ্ধপানে আকর্ষণ করিতেছিল। ধবলা জাহ্নবী দেবী আহোরাত্র স্তীমারচক্র-মথিতা হইয়া ইদানীং মলিনা হইয়াছেন, তবু তাঁহার সেই মলিনা-প্রেমই বা কি অপক্লপ রূপদ্যতি! বর্ষাবারিমাশি-পরিপুষ্ট নীলধারা মুহুর্তলোকে অব্যাহত গতিশালী। নদীবক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে নক্ষত্রচ্ছায়া নর্তিত, বর্জিত ও বিভক্ত হইয়া জলকে আলোকরঞ্জিত করিয়াছিল। দুই তীরে কোথাও শ্রামল বিটপীনীর্ষে জোনাকির সহস্র ভাতি, কোথাও কলবাড়ীতে অভ্যাজল বিদ্যাদালোকের লহরীমালা, কোথাও গৃহস্থ-গৃহে রক্তাভ ক্ষুদ্র সান্ধ্য-দীপটুকু। চারিদিকেই যেন আলোকের আর পুলকের একটানা ধরপ্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে।

সুশীল খোলা ডেকের উপর বেঞ্চের পিঠে বকের ভর দিয়া সামনে বুঁকিয়া পড়িয়া নদীতীরের দিকে চাহিয়া বিষম চিন্তে ভাবিতেছিল, বিনতা কি ভুলকেই তার জীবনে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইল! ঐ অসহিষ্ণু প্রকৃতির আত্মে মেয়ে কেমন করিয়াই এই বিড়ম্বিত জীবন কাটাইবে?

সুলেখা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—“কি সুন্দর!”

সুশীল নিজের মনকে চিন্তাজালবিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তাহার ঐ দুটি কথার প্রতিধ্বনি তাহারও জিহ্বাগ্রে ফোটো ফোটো হইল।—কি সুন্দর!—প্রকাশেও সে সহাস্তে প্রশ্ন করিল—“কি সুন্দর?”

সুলেখা কহিল—“কেন, এই গঙ্গার জল—আর ঐ গঙ্গাতীর! খুব সুন্দর নয়?”

সুশীল বিকসিতনেত্রে সুলেখার জ্যোৎস্না-সমুজ্জল আনন্দজ্যোতিবিভাসিত প্রফুল্ল সুন্দর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্মিতহাস্তে কহিল—“তোমার চাইতেও কি সুন্দর লেখা?”

সুলেখার হিমগৌর ললাট মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তাভা ধারণ করিল। জ্ঞানোদয়াবধি সে তাহার দৈহিক রূপশোভার সম্বন্ধে অনেক উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন তাহা এমন করিয়া তাহার হৃদয়কে সুখপ্রদীপ্ত করে নাই। এই স্তম্ভিতটুকুতেই তাহার যেন নারীজন্ম সফল বোধ হইল। প্রীতি-মধুর চক্ষুতে এক লহমার অস্ত্র দ্বিধা অনুরোধের দৃষ্টি হানিয়া

সে কলসেরে প্রতিবাদ-চেষ্টা করিল—“যান! তাই বৈ কি! আমি তো ছাই!”

সুশীল হাসিতরা স্নেহনেত্রে একটু মধুরদৃষ্টি আনিয়া তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে চাপাহাসির সহিত কহিতে লাগিল—“তুমি ছাই? ওঃ, তা হবে! তবে বোধ হয় স্বর্ণভস্ম! ঘুঁটের ছাই ব’লে তো মোটেই বোধ হচ্ছে না।”

দুই জনেই তখন খুব হাসিল। সুশীল অপর বেঞ্চিখানা দেখাইয়া বলিল, “ব’সো।”

সুলেখা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। তাহার পর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন? কোন কথা আছে কি?”

সুশীল প্রথমে ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল, “কথার শেষ আছে কি?” পরক্ষণেই তাহার হাসিমুখ দ্বিধা গভীর হইয়া আসিল। সে দিনকার সেই কথাগুলো মনে পড়িয়া গেল। সুলেখা সে কথা ভুলিয়া যায় নাই। নিজের সেটুকু দুর্বলতা প্রকাশ সহসা সে দিন না করিলেই বুঝি ভাল ছিল। যখন বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না, তখন অহেতুক এই নিষ্পাপছন্দয়া সরলা বালিকার চিন্তে ঐটুকু সংশয়ের বীজবপনেরই বা কি সার্থকতা ছিল?

সুলেখা সেই কথাই ভুলিল। বলিল, “সে দিন যে কথা বলবেন বলেছিলেন, সেই কথাই আজ বলবেন কি? তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। সে কথা বলার আর কি তা হ’লে দরকার নেই?”

সুশীল মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার পর সেটা চাপা দিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—“বোধ হয়, আর তার দরকার হবে না। সে ভালই হয়েছে। অবশ্য কোন দিন না কোন দিন এ কথা তোমার আমি জানাবো, তবে এখন নয়। সে এর পরে।”

ইহার পর দুই জনেই নীরবে রহিল। আকাশে তখন চাঁদ দেখা দিয়া অজস্র জ্যোৎস্না ফুটাইয়া ভুলিয়া-ছিলেন। শুভ্র জলরাশি সেই স্বর্ণরাশিবিমণ্ডিত হইয়া চক্রমথিত সুবর্ণপিণ্ডবৎ প্রতীক্ষমান হইতেছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে নদীতীর বিদ্যাদালোকখচিত হইয়া মণিময় কর্ণহারের মতই দ্যতি বিকীর্ণ করিয়া জলিতেছিল।

বিনতা ও শুভেন্দু আসিয়া দাঁড়াইল। শুভেন্দুর মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তিচিহ্ন, বিনতার নেত্রে ক্রমশঃ স্নিগ্ধহাস।

বাড়ী ফিরিয়া বিনতা সুলেখাকে পীড়ন করিয়া ধরিল, “তোরা যখন দুজনে একা ছিলি, দাদা তোকে কি সব কথা বলছিল, বল না ভাই?” সুলেখা তাহা না বলিলে—“তা গরীব ননদকে বলবে কেন?” বলিয়া তাহার প’রে তীব্র অভিমান জানাইল।

সুলেখাকে অগত্যা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইল। কথায় কথায় সে দিনের সে কথা-শুলাও তাই আর বাদ গেল না। শুনিয়া বিনতার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল এবং ক্ষণপরে সে উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ কথা শুনে তোর কি মনে হলো? কি আন্দাজ করুলি?”

এ আলোচনা চালাইতে সুলেখার ভাল লাগিতেছিল না, বরং সুনীলের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া অপরকে এ সব কথা জানাইতে যাওয়ায় সে নিজের মধ্যে একটা অশান্তিই অনুভব করিতেছিল। তাই এই প্রশ্নে ঈর্ষ্য অপ্রসন্নমুখে জবাব দিল, “কই, কিছুই তো মনে হয়নি, —আর আন্দাজই বা এর জন্ত আমি করতে যাব কেন?”

বিনতা বলিল, “না করলেই ভাল। আমিও একদিন তা’ করতুম না, লোকে চোকে আগুুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও এতটুকু দোষ দেখিনি, কিন্তু এই ক’দিনেই দেখছি যে, পুরুষ জাতটাই মন্দ। অবশ্য আমার বাবা ছাড়া—হ্যাঁ, আর জামাইবাবুও।”

সুলেখার মনটা এ কথায় যেন একটু ভার হইয়া উঠিল, সে আর কোন কথাই কহিল না; কিন্তু মনে মনে বিনতার প্রতিই সে ইহাতে একটু অসন্তুষ্ট হইল। তাহার যেমন তুলনা করা! শুভেন্দুতে আর সুনীলে! সুনীলের ছোট বেলার সেই যত কিছু বিপত্তি, সে তো সবই ওই দুর্দান্ত শুভেন্দুরই জন্ত, সে কথা নাকি সুলেখা জানে না! তাহার বাপ নিজেরই যে ভাল করিয়া সে কথা জানিয়া তবে না এই বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বিনতা নিজের ভাইকে চিনিল না, অথচ পর সে, সেও জানে সুনীল কত ভাল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া প্রথম প্রথম কয়েক দিন সুনীলের মন সদাসর্বদাই ভয়চকিত ও ত্রস্ত হইয়া থাকিত। পিতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে সে সর্বপ্রথম সভয়-স্পন্দিত বন্ধে তাঁহার মুখের দিকে চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিত—তাঁহার মুখে হাসি আছে কি না। তবে বিনতার এই অযোগ্য বিবাহব্যাপারে হাসি প্রায় তাঁহার মুখের সীমানা-ছাড়া হইয়াই গিয়াছিল এবং অনেক সময় এই অচেনা গাভীর্ষ্যপূর্ণ ক্রিষ্ট মুখ সুনীলের অপরাধভীত সঙ্কুচিত চিত্তকে সংশয়াকুল করিয়াও তুলিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া অতীত দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন সুনীলের চিত্ত হইতে মুছিয়া আসিতেছিল। অতীত তবে প্রতিশোধ লইল না? গভীর স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার তত বড় উৎপীড়কেরও প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিল এবং তাহার পক্ষ নিশ্চিত হইয়া সে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিল। অবশ্য নীলিমার কথা সে এত শীঘ্র এতখানি ভুলিতে পারিত না—যদি না এই সময় সুলেখা তাহার এত কাছাকাছি থাকিত। সুলেখাকে সে দেখিতে পায়, কদাচিৎ দুই জনে কথাবার্তারও সুযোগ ঘটে। ভুবনবাবু ও বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে প্রতিদিনই তাদের মধ্যে দেখা শুনা ঘটে; সুনীলের সমস্ত মন-প্রাণ তাই এই সুযোগে একান্ত আকর্ষণে তাহার এই চির-প্রিয়তমাকে আশ্রয় করিতে ছুটিয়া গেল। এত দিন ভাবী সম্বন্ধের মধুর সম্পর্কমাত্র স্মৃতির মধ্যে খাড়া ছিল, আজ সে প্রতিমা প্রাণময় হইয়া উঠিল, যখনই নীলিমার সেই আনন্দশূন্য ফুর্তিহীন নিপ্রভ মুখখানা বৃকের মধ্যে ব্যথার আঁচড় কাটিতে থাকে, তখনই প্রতি নিজের ব্যবহারের স্মৃতি অন্তরে গ্লানির কালিমা মাখাইয়া দেয়, তখনই সে প্রাণপণ শক্তিতে সুলেখার স্তব্ধময়ী মূর্তি স্মরণ করে, সম্ভব থাকিলে সমস্ত এক মুহূর্তকালের জন্তও তাহার সান্নিধ্যলাভ-চেষ্টা করিতে থাকে, তাহার চিত্ত হইতে বেদনার মোচড় প্রায় থামিয়া যায়, কালির লেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া আইসে। এমনই করিয়া তাহার সকল চিত্ত যখন বিগত দুঃস্বপ্ন বিশ্বতপ্রায় হইয়া সুলেখাময় হইয়া গিয়াছে, নীলিমা সেখানে চকিতোদয় অনধিকার প্রবেশের বিরক্তিতে পর্য্যবসিতপ্রায়, এমনই সময় একদা প্রভাতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটয়া উঠিল।

সুলেখার জন্ম বিপ্রদাসবাবু ভুবনবাবুর জহরত-ওয়ালা এক ভাটিয়া-বুড়বণিকের নিকট কতকগুলি অলঙ্কার গড়িতে দিয়াছিলেন। সে দিন সেইগুলি গড়া হইয়া আসিয়াছিল। দুই ভাবী বৈবাহিক মিলিয়া সেই সকল দেখাশুনা করিতেছিলেন এবং দুইজনেই সুলেখাকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে সেগুলি কেমন মানায়, তাহারও পরীক্ষা হইতেছিল, এমন সময় ডাকহরকরা কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়া গেল। তাহার মধ্যে দুইখানির উপর স্বতঃই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে দুইখানি একই হস্তাক্ষরে বাঙ্গালার ঠিকানা লেখা, ঠিকানায় বাড়ীর ঠিক নম্বর দেওয়া নাই, তাই সেগুলি পঞ্চাশটি ছাপ-মারা হইয়া ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া অনেকদিন পরে যথাস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

হীরার মুকুট একখানা ভুবনবাবু ভাবী বধূর জন্ম পছন্দ করিতেছিলেন, সেখানা সুলেখার হাতে দিয়া বলিলেন, “দেখ তো মা, ডিজাইনটা তোমার বেশ পছন্দ হয় কি না?” বলিতে বলিতে সর্বপ্রথম এই চিঠিখানা ছিঁড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সুলেখা ও বিপ্রদাস দেখিল, চিঠিখানার একটুখানি পড়িবার পরই তিনি পাতা উল্টাইয়া লেখকের নামটা আগে ভাগে দেখিয়া লইলেন, তখনই তাঁহার মুখ বিশেষরূপ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। পাতা দুয়েক পড়া হইলে পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া যখন কপালের ঘাম মুছিয়া আর্ন্তহাসের সহিত “মাঃ!” করিয়া একটা উৎকট যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন কোন অন্তর্ভাষকায় সুলেখার বুকের মধ্যেও সজোরে ঐ কাতর শব্দের একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, তাহার কোমল চিত্ত সেইক্ষণেই প্রবল সহানুভূতির সহিত তাহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বপুত্রের অভিমুখে ছুটিয়া গেল, গহনাগুলা খুলিয়া নামাইয়া রাখিয়া বাপের দিকে চাহিয়া বলিল, “আজ এ সব নিয়ে যাক বাবা! কাল উকে না হয় আসতে বলে দিন।”

ততক্ষণে ভুবনবাবু আবার সেই অকথা যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ পত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। সব চিঠিখানা যখন পড়া শেষ হইয়া গেল, তখনও তিনি সেই চিঠির দিকেই বন্ধচক্ষুতে চাহিয়া আছেন, সে পত্র যেন কাহার অশরীরী মূর্তি! সে যেন কোন অন্তরতমের মৃত্যুসংবাদ, সে যে কি,—সে যে কি, সে যার এ দুর্দশা ঘটিয়াছে, সেই শুধু জানে!

সুলেখা কাছে গিয়া গায়ে হাত দিল, নিম্ন মধুরস্বরে কহিল, “অস্বস্ত করো কি?”

ভুবনবাবু ভয়ার্তচক্ষুতে তাহার দিকে কণকাল আড়ষ্টভাবে চাহিয়া থাকিবার পর সহসা প্রায় আর্ন্তনাদের মত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, —“মা গো আমার! আমি বুঝি, তোকে হারালুম!” বলিতে বলিতে দুই হাতের মধ্যে তাহার হাতটা সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন।

“কেন আপনি অমন করছেন? আমার কেন হারানেন? এই যে আমি।” সুলেখা সেই ছোটবেলার মত করিয়াই তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া গেল। তখন ভুবনবাবুও তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, এবং তাঁর চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাপারটা যে কি ঘটিল, তাহা না বুঝিলেও কিছু ভয়ানক কাণ্ড যে একটা ঘটয়াছে, একটা সহজ বুদ্ধিতে কে না বুঝবে? ভুবনবাবুকে কতকটা সময় শান্ত হইতে দিয়া বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্রদাস সুলেখাকে বিশেষ চেষ্টা পূর্বক বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি মুহূর্তন ও বাক্যহীন ভুবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চিঠি আমি পড়তে পারি?”

ভুবনবাবু সচেষ্ট ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যেমন তেমনই অনড়ভাবেই আরাম-চৌকির উপর পড়িয়া রহিলেন!—ওঃ, কি তীব্র,—কি অসহনীয় যন্ত্রণার মুহূর্ত্তও মানুষকে যাপন করিতে হয়! কি অসহ্য, কি অসহ্য সে জালা! প্রাণপ্রিয়ের মৃতমুখ দেখার অপেক্ষাও এ বুঝি অসহ্যতর! তথাপি মানুষের কঠিন প্রাণে তাহাও সহ হইয়া যায়! এ কি রহস্য দিয়া গড়িয়াছে মানবচিত্ত হে ভগবান! যেখানে ভয়রপদভার সহিত না, সেখানে বজ্রাঘাতও যে সহিয়া গেল! ভুবনবাবুর জ্বালাভরা চিত্তে এমনিধারা এলো-মেলো কতকগুলি কথা ওতপ্রোতভাবে উঠানামা করিতেছিল, সব কথা ভাল করিয়া তাঁহার মনে গুছাইয়া আসিতেছিল না, শুধু নিদারুণ শোকের মত মনের মধ্যে বজ্রবলে বাজিয়া উঠিতেছিল—তাঁহার আদর্শ ফুরাইয়া গিয়াছে! তাঁহার সুশীল আজ এত বড় কলঙ্কে কলঙ্কিত!

বিপ্রদাস সেই দীর্ঘ পত্র যথেষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ শেষ করিয়া সম্পূর্ণ সংযত কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “এত্রে এত ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন

রায়? একটা বাজে লোকের বাজে ভয়-দেখান। শ'ত্বেই টাকা পাঠিয়ে দাও আর লিখে দাও যে, এ নিয়ে যদি ফিরে ঘান-ঘান করতে আসে, তা হ'লে ছেলেকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে বিয়ে দিচ্ছিল ব'লে আমরাই ওর নামে উট্টো নালিশ দায়ের ক'রে দেবো। কিছু ভেবো না তুমি, বরং ওটা তুমি আমার হাতেই ফেলে দাও, আমি ওসব ছু কথায় মিটিয়ে দিচ্ছি।”

ভুবনবাবু একান্ত বিষয়ে তড়িৎস্পৃষ্টের স্থায় উঠিয়া বসিলেন। বিস্ফারিত বিহ্বল চক্ষুতে বিপ্রদাসের স্থির চক্ষুর উপর চাহিয়া তেমনই বিহ্বলতর ভাবেই তিনি সান্ধ্যকাল কহিয়া উঠিলেন, “তুমি মিটিয়ে দেবে?—তুমি?”

বিপ্রদাস কহিলেন, “তা বোধ হয় তোমার চাইতে আমি ভালই পারবো। এ সব কাজ তোমার মতন অমন কোমলহৃদয়ের কর্ম নয়।”

বিপ্রদাসের অবিচলিত ভাবে ভুবনবাবুর নিজের বিকলতা যেন একটুখানি প্রশমিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সহসা আবার নুতন করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যের ধুমাসিত যন্ত্রণানল তীব্র শিখায় জলিয়া উঠিল।

“বিপ্রদাস! লেখা—মা'কে আমার... আমি যে তরু-বিলুর উপর ক'রে স্নেহ করেছিলুম ভাই!”

বিপ্রদাসের মুখে বা ভাবে কোন বিপর্যয়ই দেখা গেল না। তিনি যথাপূর্ব্ব শাস্ত্র স্বরেই কহিলেন, “বেশ তো, চিরদিনই তাই করবে। তোমার বউ তুমি তো স্নেহ করবেই, সে আর এমন বিচিত্র কি?”

ভুবনবাবুর ব্যথাহত প্রাণ এ আশ্বাসে কি যে করিয়া উঠিল, তাহা যেন তাঁহার প্রকাশেরও অনেক দূরের বস্তু। ক্ষণকাল নির্ঝাঁকু বিষয়ে বিমূঢ়বৎ থাকিয়া পুনশ্চ একটা বুকফাটা হাহাকাবের মতই কাতর আর্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—“সুশীল আমার এ কি করলে! আমার সুশীল!”

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ আহতগর্ক অপমানাহত শোকাক্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া সতর্কভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন।

“দেখ ভাই! এ নিয়ে তুমি খুব বেশী একটা বাড়াবাড়ি মন খারাপ-টারাপ করো না। বয়েসকালে এমন সব ঘটনা সকলকারই এক সময় না এক সময় ঘটে থাকে। আবার বিয়ে-থাওয়া হয়ে ছু একটি সন্তান-টন্তান জন্মালে ওসব সেরে সুরেও যায়। ও

কি আর অত ক'রে ধরতে আছে? পুরুষমানুষ কে'না অমন একটু আধটু ভুলচুক করচে সংসারে। সবাই তো আর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আসেনি।”

ভুবনবাবু কি শুনিতেছেন, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুলেখার বাপ—তাঁহার ছেলের ভাবী স্বশুর, সে এমন অবিচলিত-ভাবে এই এত বড় কুৎসিত ঘটনাটাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিল, যে অপরাধের ক্ষমা বাপ হইয়াও তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না!

মাহুষের মনের মধ্যে এত প্রভেদ! বিশ্বয়ের সহিত তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল;—

“তবে কি তুমি এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবে না? তাকে এত বড় দোষে দোষী জেনেও তার হাতে তোমার অমন লক্ষ্মী-রূপিনী মেয়ে দিতে পারবে?”

বলিতে বলিতে ক্ষোভে ঘৃণায় তাঁহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। উঃ, কি লজ্জা! কি লজ্জা! কি অপমান রে! সুশীল!—সুশীল!

বিপ্রদাস তেমনই বিষয়াশ্চর্য্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলেন, “বল কি রায়! বিয়ে ভেঙ্গে দেবে? বিলক্ষণ! সাত বৎসর ধ'রে যে কথা চলেছে, আজ এক মুহূর্ত্তেই তা ভেঙ্গে প'ড়ে যাবে? বলেছি তো, কম বয়সের ভুল-ভ্রান্তি বয়েস পাকলেই সব সামলে যায়, ওর জন্তেও আবার অত মন খারাপ করতে আছে? এখন যাতে বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়, তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর এ দিকে মিটমাট—সে-ও আমি সব ঠিকঠাক ক'রে নিচ্ছি, ওর জন্তে তুমি একরত্তিও মাথা খরচ ক'রে অনর্থক দুঃখ পেও না,—যত সব ছালাকাভুরের ব্যাপার!”

ভুবনবাবু ধীরে ধীরে সুগভীর একটা আর্তশ্বাস মোচন করিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরে যন্ত্রণার তীব্র হাহাকাব-ভরা যে অগ্নিময় ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা যদিও এই সান্ত্বনায় একটুকুও প্রশমিত করিতে পারিল না, তবে সুলেখার জন্ত তাঁহাকেও যে তাঁহার গুরু অপরাধী পুত্রকে অন্ততঃ প্রকাশভাবে কতকটা ক্ষমা করিতে হইবে, ইহা তখনই মনে মনে স্থির হইয়া গেল।

সে দিনের ডায়ারিতে স্থলিত কলমের লেখায় এই কয়টি কথা লিখিত হইল;—

“চাক্রশশি!—কোথায় আছ? লজ্জায় মুখ

লুকাও! আমার আদর্শ, আমার আনন্দ, আমার আশা, আমার আজীবনের সকল সাধনা আজ অতল জলে বিসর্জন দিয়াছি! আমার মেয়ে স্বৈচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া কুবিবাহে নিজেকে অবনত করিয়াছে— আর আমার ছেলে—ওঃ ভগবান! সুশীল! সুশীল! তুমি আমার এ কি করলে!—কেন মরিলাম না!”

সপ্তদ্বিংশ পরিচ্ছেদ

গোলমাল এইখানেই মিটিয়া যাইতে পারিত— যদি না সেই দিনের ডাকেই অনুকূলের নিকট হইতে আর একখানা চিঠি শুভেন্দুর নাম লইয়া এই বাড়ীতেই আসিত। সেই চিঠিখানা পড়িয়া শুভেন্দু তখন এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল।—বড়লোকের জামাই হইয়া শুভেন্দু নিজেকে সম্মানিত বোধ না করিয়া বরং পদে পদে অপমানিতই বোধ করিতেছিল। তাহার বিশ্বাস, সে গরীব বলিয়া সকলেই মনে মনে তাহাকে অগ্রাহ্য করে। ভুবনবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর নূতন ঝিটা পর্য্যন্ত এই অভিযোগে তাহার কাছে অতি ভীষণভাবেই অভিযুক্ত। দুই জন লোক একসঙ্গে দাঁড়াইয়া কোন কথা কহিলেই শুভেন্দুর মনে হয় যে, তাহারা তাহারই কথা বলিতেছে। কেহ কোথাও হাসিলে তো আর রক্ষাই নাই। সে হাসি নিশ্চয়ই তাহাকে উপহাস করিয়া হাসা—বিনতাকে সে সর্বদাই এ কথা শুনাইতে ছাড়ে না এবং তাহার কলে দুইজনে সদাসর্বদা কলহ চলিতেই থাকে। বিনতা কখনও স্বামীর পক্ষ লইয়া পরিজনবর্গের প্রতি অভিমান করে, কখনও ক্রমাগত একই অভিযোগে উত্থাপিত হইয়া বলে—“বেশ করে,—তাচ্ছিল্য করে। যাতে না করতে পারে, সে যোগ্যতা অর্জন কর না কেন, তখন ওরাও আর করবে না। তাচ্ছিল্যের যোগ্য কি তুমি নও, যে করবে না?”

সুশীলের উপরেও শুভেন্দুর ঈর্ষ্যা ও বিরক্তির অন্ত ছিল না। সুশীল বড়লোকের ছেলে বলিয়া বরাবরই সে তাহাকে মনে মনে তীব্র ঈর্ষ্যা করিত, এখন নিজে বড়লোকের জামাই হইয়া সেটা তার বন্ধিতই হইয়াছে। জামাই আর ছেলে যে কিছুতেই এক হ’তে পারে না, তা সে খাওয়া পরা সকল বিষয়ে একতলাভেও নয়, এই অভিজ্ঞতাটুকুর লাভ হইতে এই ঈর্ষ্যাটাও তাহার মনে নিত্যই প্রবলতর হইতেছিল।

বিশেষতঃ এবার কিরিয়া অবধি সুশীল কোনরূপেই শুভেন্দুর কাছে তিষ্ঠিতে পারিত না। ইহার অবশ্য নানা কারণই বর্তমান ছিল, কিন্তু শুভেন্দু তাহার এই একটা কারণই ধরিয়া লইয়াছিল যে, সে গরীব বলিয়া সুশীলেরও ঘৃণা হইয়াছে, বন্ধু হিসাবে সুশীলের কাছে তাহার এতদিন দর থাকিলেও ভগ্নীপতি হিসাবে নাই। শুভেন্দু তাই মনে মনে এতদিন ধরিয়া গুমরিয়া ছিল।

আজ সুযোগ পাইবামাত্র সে তাহার অপব্যয়ও করিল না। খোলা চিঠিখানা হাতে করিয়া একেবারেই সে সুশীলের উদ্দেশ্যে তার ঘরে গেল। সুশীলের বসিবার ঘরে তখন স্নলেখা ও বিনতা দাঁড়াইয়া উদ্ভিগভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল। ভুবনবাবুর শরীর বিশেষ অসুস্থ; তিনি আজ স্নানাহার করেন নাই। সেই কথাই হইতেছিল। স্নলেখা বলিল, “এক জন ডাক্তার আনা কিন্তু খুবই দরকার ছিল।”

বিনতা কহিল, “দাদা সে কথা বলেছিল, তা’ তাতে বাবার আর তোমার বাবারও কি জানি কেন মত হ’ল না।”

এই সময় শুভেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ব্যাঘ্রস্বরে গর্জিয়া উঠিল,—“কই, সে হতভাগাটা কোথায়? কোথায় গেল সে রাফেলটা? তাকে আমি আজ একবার দেখে নিতে চাই! পাতি ডায় শূয়ার!”

এই ভীষণ আশ্ফালনযুক্ত আক্রমণে দুই জনেই ভীত হইল। বিনতা কিছু নম্রস্বরেই কহিল, “কাকে খুঁজচো? মাধবকে? সে তো এ দিকে আসেনি। কি করেছে সে?”

ক্রোধ-পরুষ কণ্ঠে বাঙ্গ করিয়া শুভেন্দু বলিল,— “মাধবকে নিয়ে আমি কি করবো? খুঁজছি তোমার গুণধার দাদাকে। পাতি, বজ্জাত, ছোটলোক, জানে না সে, আমাদের সে কি সর্বনাশটা ক’রে এসেছে? গরীব ব’লে এত অত্যাচার? উঃ! দেশে কি আইন-আদালতও নেই? রাজা নেই? আমি ওকে পুলিশে দেবো, জেলখাটাবো, ঘানি টানাবো, পাথর ভাঙ্গাবো—তবে আমার নাম শুভেন্দু চক্রবর্তী!—অল্পে ছাড়বো ওকে? সাধু পুরুষের ডুবে ডুবে জল খাওয়া বার ক’রে দিচ্ছি এইবার, দেখ না! আমরা যা’ করি—দেশের সাক্ষাতে জানিয়ে করি, ধর্মের খোলস প’রে লুকিয়ে লুকিয়ে করিনে।”

নারী দুই জন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বিনতা দুই একবার মুখ খুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই বন্ধমুষ্টি,

ঘূর্ণিতচক্ষু ও ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার গলা কাঠ হইয়া গেল, কথা কহিবে কি, আতঙ্কে সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

শুভেন্দু দুইটি অসহায় নারীকে নিজের নির্দাক শ্রোতারূপে পাওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিতই এ দিকে নিজের বাক্যশ্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল—
“ছোট লোকটা যখনই সেখান থেকে আসতে চাইলে না, তখনই আমি এই সন্দেহ করেছিলুম! গরীবকে দয়া দেখিয়ে নিজের ছেলের চাইতে আপন হয়ে এই কুমতলবেই তাদের বুকে চেপে বসেছিলেন! অ্যা, এ কি অমানুষিক অত্যাচার! আমরা গরীব হ’তে পারি, এঁদের মতন অত পাশও করি নি; কিন্তু এত বড় নৈতিক অবনতি তা ব’লে আমাদের ভিতর হয় নি। আমরা ও সব ভণ্ড তপস্বীদের চাইতে লাঞ্ছিত ও উপরে, তা এই বড় গলা ক’রে বলতে পারি! ভণ্ড তপস্বী এ দিকে—”

“বাপার কি শুভুদা! সকালবেলায় অমন করে চোঁচাচোঁচা কেন?”—বলিতে বলিতে ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে সুশীল আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।—“বাবার আজ শরীরটা বড় ভাল নেই, গোলমাল কানে গেলে হয় তো কষ্ট পাবেন। কি, তোমাদের হয়েছে কি, বিন্?”

“হয়েছে কি? পাজি! রাঙ্কেল! জানো না কি হয়েছে? হুধ দিয়ে কালসাপ পুষে রেখে এসেছিলুম! একেবারে বুড়-বুড়ীর বুকে ছোবল মেরে এসেছি! সমতান!”

এক নিমেষের মধ্যে সকল ব্যাপারই সুশীলের স্বদয়ঙ্গম হইয়া গেল। একই মুহূর্তে তাহার চোখে পৃথিবীর বর্ণ পরিবর্তিত বোধ হইল, তাহার পারের নীচের মাটি ছলিয়া উঠিল, তার কানের পাশ দিয়া বেন কামানের গোলা চলিয়া গেল। একটি কথাও না কহিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একবারটি মুখ তুলিয়া চাহিলও না এবং তাই সে দেখিতেও পাইল না যে, তাহারই অনতিদূরে গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুপিতা সিংহী-সদৃশী বালিকার অগ্নিবর্ষী অনিমেঘ দৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কি তীব্র ক্ষোভের লজ্জার ধরাতল-শায়ী হইতে চাহিল।—সে বালিকা স্নলেখা।

শুভেন্দু যখন দেখিল, তাহার এতখানি বীরত্বের কেহ প্রতিবাদমাত্রও করিল না, তখন তাহার সাহসও বর্ধিততর হইল। সুশীলের উপর সকল ক্ষোভের জ্বালা মিটাইতে চাহিয়া সে তখন পুনশ্চ তুচ্ছ তর্জনে চোখ

পাকাইয়া বলিল, “ভদ্রলোক জেনে মা-বোনের কাছে বিশ্বাস ক’রে রেখে এসেছিলুম, তা’র এই প্রতিফল দিলে! বিশ্বাসঘাতক! নীচ! কুচরিত্র! পশু!”

সুশীল সবেগে দুই পদ শুভেন্দুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া আহত সিংহের ছায় উন্নত গ্রীবায়া আরক্ত মুখ তুলিয়া রোষগুরু স্বরে বাধা দিল, “সাবধান শুভেন্দু!”

“কিসের সাবধান সুশীল? আমার বোনের সর্বনাশ ক’রে, আমার মাকে হত্যা ক’রে, চোরের মতন লুকিয়ে পালিয়ে এসে নিজের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে, তারই জন্তে কি আমাকে সাবধান হ’তে হবে?”

“তোমার মাকে হত্যা ক’রে!”

“হ্যা, আমার মাকে! এই চিঠিখানা নিজেই প’ড়ে দেব,—নীলির সর্বনাশ ক’রে তাকে ফেলে তুমি চোরের মতন পালিয়ে এলে, বাবা কেলঙ্কারীর ভয়ে একটা বুড়োর সঙ্গে রাতারাতি তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু বিয়ে হবার আগেই, মায়ের হার্টফেল করে—নীলিও তখনই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়—এ সব কার জন্ত?—কে তাকে লুকিয়ে রেখেছে?”

সুশীল সহসা অধোমুখ হইল। স্বর্ণলতা মরিয়াছেন! সেই রাতে! নীলিমা পলাইয়াছে। ‘কার জন্ত’? ‘এ সব’ কার জন্ত? সত্য কথাই! এ সব তারই জন্ত নহে কি? সে যদি সে বাড়ীতে কোন দিনও না ঢুকিত!

সুশীলের এই অসহ্য নীরবতা এই সময় দুই স্থানেই অগ্নুৎপাত করিল, তাহার মধ্যে শুভেন্দু সহসা হিতাহিতজ্ঞানহারা হইয়া প্রমত্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের হাত চাপিয়া ধরিল, চীৎকারশব্দে কহিল,—
“নীলিকে নিশ্চয়ই তুমি কোথাও লুকিয়ে ফেলেচ। তাকে বিয়ে করতে পার না, কিন্তু নিজের বিলাসের সাথী, সেবাদাসী করতে তো আর কোনই অনিচ্ছা নেই। বল সে কোথায়? বার ক’রে দে’ তাকে। কেন, আমরা গরীব ব’লে আমাদের পরে এত বড় অত্যাচার! কেন আমরা তা সহিব?”

সুশীল কথা কহিল না, মুখ তুলিল না, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মতই অমড় অচল হইয়া সে শুক্ক রহিল। এত বড় অপবাদও তাহার মাথায় তুলিয়া দিল? এও কি সম্ভব? উঃ, মানুষে এ কাজও পারে?

“তবে এই দেখ, তোকে দিয়ে সত্যকথা স্বীকার

করাতে পারি কি না!”—বলিয়াই শুভেন্দু তাহার কঠিন মুষ্টি বন্ধ করিয়া সজোরে সুনীলের নাকের উপর একটা প্রচণ্ড মুঠাঘাত করিল।

এই কাণ্ডটা সে অত্যন্ত অতর্কিতেই করিয়া ফেলিলেও ইহা দেখিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ স্বরে বিনতাও চীৎকার করিয়া উঠিল,—“বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে! দাদার গায়ে তুমি হাত তুলতে সাহস কর? এত বড় স্পর্ধা তোমার?”

সেই প্রচণ্ড আঘাতে সুনীল একবার ঘুরিয়া পড়ার মত হইয়া দেওয়াল ধরিয়া নিজের পতন সামলাইয়া লইল। তাহার পর কৌচার কাপড় নাকে চাপিয়া নিকটবর্তী একটা কোচের উপর সে মাতালের মতন টলিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার কাপড়খানা চলির কাপড়ের মতই রক্তে লাল হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চোখের সামনে একটা ভাঁটার মতই বন্বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, তাহারই মধ্যে সে তাহার প্রায় অন্ধকার চোখের দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার সম্মুখে রহিয়াছে সুলেখার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ এবং সেই মুখের মধ্যের চোখ দুইটা যেন দুইটা লাল বাতির মতই কি অস্বাভাবিক তেজে জলিতেছে।

* * * *

সুলেখা তাহার বাপকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, “আজই আমি বাড়ী যাব বাবা! সব গুছিয়ে নিয়েছি, একগুই গাড়ী ডাকতে ব’লে দাও।”

বিপ্রদাস একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, “আজই কি করতে যাবি? দাঁড়া, কা’ল গহনাগুলো আসুক, আর—”

সুলেখা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, “না বাবা! আমার আজ যেতেই হবে। আমার শরীর ভারী খারাপ বোধ হচ্ছে। কলকাতায় আর এক দিনও আমার থাকা চলবে না। ওসব এর পরে হবে তখন, আমার আগে এখন রেখে এস।”

বিপ্রদাস সকালের ব্যাপারে নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়াও ছিলেন। মেয়ে বা আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারে, সে ভাবনা তাহার মনে বিলক্ষণই ছিল। সেই জন্তই তাহার এখান হইতে সরিয়া যাওয়ার তিনি আর আপত্তিমাত্র করিলেন না, বলিলেন,—“আচ্ছা, রাগকে তা হ’লে বলি গিয়ে, সে যদি মত করে তো গাড়ী আনাহঁগে, তার

আবার আজ মাথাটা কেমন হঠাৎ একরকম হয়ে গেছে। একটা মস্ত মোকদ্দমা হারার খবর পেয়েছে কি না আজ সকালে—”

সুলেখা একবার তীক্ষ্ণচোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া অরিতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সমস্ত বাড়ীটাই কেমন যেন একটা অস্তবিস্ময় বেদনাতারে ভাবাক্রান্ত ও ধমধমে হইয়া রহিল। অথচ কেন যে, তাহার প্রকৃত কারণটা অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত। বাবু অমৃতা এবং দাদাবাবুর সহিত জামাইবাবুর ভয়ঙ্কর একটা ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।—তা হবোই ত, নির্ধনের ধন হইলে জগৎকে সে যে তৃপ্তজ্ঞান করিয়াই থাকে,—এ তো আর কিছু নতুন কথা নয়! তা’ ঠিক, এই রকমই ঘটনা অমুক অমুক সংসারে এর কত আগে আগেই যে ঘটয়া গিয়াছে। তা ছোট দিদিমণিও না কি এবারে ছেড়ে কথা কয় নি, সেও আজ খুব যাচ্ছে তাই করেছে।—বাবুসাহেব গোসা ক’রে তখনই তো ফরকে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন।—গেছেন, যেতে দাও না, পিস্তি চুই চুই করলেই আবার লাজ মুখে ক’রে আপনিই ফিরে আসতে পথ পাবেন না! হতো সেই সময় গর্দানা দেওয়া, তা হ’লে দু’দিন জাজে-গোবরে হয়ে মেজাজ একটুখানি ঠাণ্ডা হতো।—ছোট দিদিমণির যেমন বেয়াদু সখ, মাকালফলটাকে কি না খামোকাই ইচ্ছে মাঝে বেছে নিলে!

চারিদিকে চাকরদাসীমহলে চুপি চুপি এই সকল নানাবিধ আলোচনা চলিতেছিল।

সুনীল সারাছুপুর সেই ঘরের সেই কোচখানার উপরেই আড়ষ্ট অভিভূতবৎ পড়িয়া রহিল। একই সময় বিনতা, শুভেন্দু ও সুলেখা তাহাকে একা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শুভেন্দু বিনতা যে কলহ করিতে করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সেই সরব গর্জন তখন সুনীলের কানের বা মনের মধ্যে প্রবেশও করিতে পারে নাই; কিন্তু আর এক জনের নিঃশব্দ প্রস্থানকালীন সেই একটুখানি নীরব ঘণার চাহনি আজ তাহার ব্যাথাভারাতুর শরীর-মনের উপর যেন সহস্র মণ ভারের মতই বিরাট হইয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। সুলেখা—যে সুলেখা একদিন অপরিচিত বালক সুনীলের প্রতি তাহার বাপের দেওয়া শাস্তিকে সহিতে পারে নাই, সেই সুলেখা আজ তাহার সাত বছরের পরিচিতা

বিবাহপণে বন্ধা, বুঝি এই সামান্যিকালের অনিষ্টতার সম্বন্ধে স্বেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধা, সেই সুলেখা আজ তাহাকে এইরূপে অবমানিত ও শোণিতাপ্রসূত দেখিয়াও অনায়াসে অবহেলায় মুখ ফিরাইয়া চাওয়া গেল! আর চোখে তাহার সে কি সম্বন্ধ দৃষ্টি!—উঃ, সুলেখার বুক এখনও লজ্জার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না কেন?

সহসা সুলেখার মনে পড়িল তাহার বাপের কথা! তবে তিনিও কি এই সংবাদেই আজ শয্যালীন হইয়াছেন? আচ্ছা, সুলেখা তখন ঘরে ঢুকিতেই তিনি না তাহার দিকে তখনই পিছন ফিরাইয়াছিলেন? তাহার সঙ্গে একটি কথাও তো কই তিনি আজ কহেন নাই? সামনে গেলে অমনই চোখ ঢাকা দিয়াছিলেন না!—ঠিক তাই—ঠিক তাই—

নিশ্চয় নীলিমার পিতা তাহার উপর এই অতি হীন প্রতিশোধ লইয়াছেন! স্বর্ণলতাও মরে নাই—নীলিমাও পলায় নাই—মাত্র আরও একটা মিথ্যা ক্রান্ত গড়িয়া তাহাকে নুতনভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। সুলেখার সর্বশরীরের শোণিতপ্রবাহ যেন মসহায় রক্তরোবে তরল অগ্নিপ্রবাহের মতই তাহার হৃদয়ে অরতপ্ত করিয়া তুলিল। মানুষ এত ক্ষুদ্র হয়? মন হীন হয়? এত ছোট হয়? উঃ!—উঃ!—উঃ!

ধীরে ধীরে ধীরে আবার আর একটা নিবিড় অভি-
মানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবারও কি কাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না? সুলেখার চরিত্রে কবে কি সন্দেহজনক প্রশ্ন পাওয়া গিয়াছিল যে, এক কথায় তাহাকে এত বড় একটা অমানুষিক অজ্ঞানের পাপে পী-
পী বিনা বিচারেই সাব্যস্ত করা হইল? আর যে করে করুক, তাহার বাপের এ অবিচার যে তাহার ক্ষে একান্তই অসহ্য! আর সুলেখা—সেও কি এই সে দিনও বলে নাই যে, সে তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না?

ঘরের দরজা খোলার একটুখানি শব্দ হইল। সুলেখা নিজের চিন্তাতারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও সেটুকু কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিল; অতি কষ্টে সে মাথা ফিরাইয়া দেখিল, মুক্তদ্বারপথে সুলেখা গৃহপ্রবেশ করিতেছে। সে মুহূর্ত্তে কি আনন্দ, কি আশ্বাস, কি আশাই যে তাহার ভগ্নচিত্তে বিছাটমকে জাগিয়া উঠিল, সে শুধু সে-ই জানে! অতি কষ্টে সে তখন উঠিয়া বসিল। বসিতে গিয়া রক্তপাতজমিত দৌর্যলো

মাথা তার আবার ঘুরিয়া উঠিল; চোখে অন্ধকার বোধ হইল, তথাপি সে তাহাতে ক্রক্ষেপমাত্র করিল না। সুলেখা তাহাকে অবিশ্বাস করে নাই! সে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই! সে তাহার কাছে ফিরায়া আসিয়াছে! আঃ!

সুলেখা আসিয়া টেবলের আর একধারে সুলেখার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের সেই মিষ্ট স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ হাস্যটুকু আর সেখানে নাই। সে স্থির অপলক নেত্রে সুলেখার মুখের দিকে চাহিল, এখনও সেখানে অচপল গাভীর সন্থিত যে একটা অক্ষমণীয় যুগার ভাব অমিশ্রিতভাবে দেদীপ্যমান রহিয়া গিয়াছে, তাহা চিনিতে কোনরূপেই বাধে না। সুলেখা বারেক সে চোখের দিকে চাহিয়াই তাই অপরাধীর মত নিজের মাথা নত করিল। প্রথমে সূর্য্যের দিকে চাহিতে যেরূপ রূপ হয়, তাহারও আজ এই পুণ্যজ্যোতি-
র্ময়ীর বিচারদৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইতে তেমনই কষ্ট বোধ হইল। এ মিথ্যা কলঙ্কের মধ্যে যতটুকু সত্য, যেটুকু কাপুরুষোচিত, তাহাই যে তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

সুলেখা নিজেই কথা কহিল। স্থিরস্বরে সে কহিল, “আমি আজ বাড়ী যাচ্ছি। এক দিন তুমি আমার বলেছিস, ‘আমার সম্বন্ধে যদি কিছু শোন, আমার না জানিয়ে বিশ্বাস করো না।’—আমিও সে দিন তাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। যদিও আজ সকালে যে সকল ঘটনা আমাদের দু’জনেরই সাক্ষাতে ঘটে গেছে, তার পর আর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার আমার কোন প্রয়োজন ছিল ব’লেই আমি মনে করি নে, কিন্তু তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের হিসাবেই আমি এই শেষবার জেনে যেতে এসেছি, আর জানিয়ে যেতেও এসেছি যে, যা আমি আজ জেনেছি এবং তুমি নিজেও যাহার কিছু-
মাত্র প্রতিবাদ না করেই মাথা পেতে যাকে স্বীকার করে নিয়েছ, তার উপর আর আমাদের মধ্যে কখনও কোন সম্বন্ধ থাকতেই যে পারে না, সে কথা তুমিও অবশ্য অস্বীকার করবে না এবং আমিও তা করি নে।”

কার এ কথা? কার এ ভাষা? এ ভয়ানক কথাগুলো কে আজ এমন অনায়াস-সহজে উচ্চারণ করিতে পারিল? এ কি সেই সুলেখা? সেই বনচারিণী কপালকুণ্ডলা? সেই শরীরিণী দয়ামূর্ত্তি? আবার এই সে দিনেরই সেই ঈশ্বরভ্রমণের সঙ্গিনী, সেই জ্যোৎস্নাজড়িত স্নেহময়ী, প্রেমময়ী নারী?

আর আজ এ কোন্ পাষণী এত বড় নির্মম বাক্য এমন করিয়া মুখের উপর বলিয়া বসিল? নারীর মধ্যে সর্বত্রই কি দশমহাবিচার দশ রূপ বিद्यমান? কোথাও সে মোহিনী ভুবনেশ্বরী, কোথাও শিব-বন্ধারূঢ়া করাগবদনা কালী! সুনীল আহত বিষয়ে নির্বাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

তাহার চোখের সেই ভাষাহীন দৃষ্টি সুলেখাকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিল। এতটুকু প্রতিবাদ নাই? এ লোক যে নিশ্চিত অপরাধী, তাহাতে আবার সংশয়ের স্থান কোথায় আছে? ওরে নির্বোধ, লোভী সুলেখা! এখনও তোমার মোহ বুচে না? কত বড় রক্ষাই যে তুমি পাইয়া গিয়াছ, এখনও সে কথা না ভাবিয়া অতীতের পানে, সেই সাধের স্বপ্নের অতীতের পানেই লুক্ক চোখে চাহিয়া দেখিতেছ—তোমার কি মরণ নাই? ছি ছি ছি, তোমার নারীমর্যাদার অবমাননা করিয়া ফেলিও না! এখনও মনকে তোমার দৃঢ় কর।

তখনও সুনীল তেমনই অনড়, তেমনই স্তব্ধ ও নতনেত্র। তাহার পানে বারেক রোষতীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিরাগ-শুদ্ধকণ্ঠে সুলেখা বলিল, “তা হ’লে এই শেষ! তোমার আমার মধ্যে এ জন্মে বোধ হয় আর কখন কোন দিনই দেখা হবে না, তাই যাবার সময় একটা কথা ব’লে যাই, যদি সম্ভব মনে কর তো শুনো—এর পর যে যতই চেষ্টা করুক, আমি তোমায় বিয়ে করবো না, এটা স্থির!—তাই বলি,—তোমার এখন উচিত, সেই যে মেয়ের তুমি সর্বনাশ ক’রে এসেছ, তাকেই ফিরে গিয়ে বিয়ে করা। আর এ করতে তুমি ভ্রাতৃত্ব ধর্ম্যতঃ বাধ্যও। এ যদি না কর, জেনো, এ জীবনে তো নয়ই, জন্মজন্মান্তরেও তুমি কখন ঈশ্বরের ক্ষমা পাবে না।—মামুষের তো নয়ই।”

সুলেখার মুখে এই প্রস্তাব উচ্চারিত হইবামাত্রই সুনীল ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সুলেখার কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন সত্যই সে অপরাধী—নীলিমার কাছে ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। আর এ অপরাধের বিচারক তাহার সম্মুখ-বর্ত্তিনী ঐ মহিমময়ী নারীমূর্ত্তি—ঐ সুলেখাই। এই কঠোর দণ্ডদেশে সে শুক থাকিয়া শুনিল, একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও তাহার কণ্ঠে, তাহার জিহ্বা উচ্চারণ

করিতে সমর্থ হইল না। তাহার মনে হইল, আদেশ যেন অলঙ্ঘ্য, ইহার পরিবর্তন যেন কো কালে কাহারও দ্বারা আর কখন হইতেই পারে না।

সুলেখা এবার মুখ ফিরাইল। চলিয়া যাই উদ্ভতা হইয়া পুনশ্চ একবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল দেখিল, সুনীল তখনও যেমন তেমনই একই ভাবে বসিয়া আছে। দেখিল, তাহার নাসিকা ক্ষীত, চু-ক্ক, মুখ শুক, দৃষ্টি যেন পৃথিবীর কোন পরপাশে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে, এমনই তাহা বিকল বিপর্যাস্ত। অসীম ককণার বস্ত্রাধারার প্রচণ্ড বেগ সে নিজের অন্তরের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তেই যেন অমৃত করিল। তাহার মনপ্রাণ উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ঐ লাঞ্ছিতকে, লজ্জিতকে মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা জ্ঞাপন করিতে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু না, তাহাতে যে আত্ম অপরের প্রতি অবিচার করা হইবে। নীলিমা আজ ইহার জন্ত কলঙ্কলাঞ্ছিতা, আশ্রয়বিচ্যুতা, স্বজন ও সমাজত্যাক্তা, এখনও হয় তো ইহার প্রতীকার আছে কিন্তু আর বিলম্ব হইলে একটি জীবন হয় তো চিরদিনের মতই দুরবস্থার চরমে গিয়া পৌঁছাবে। না জানি, সে অভাগীর শেষ পরিণাম কত ব ভীষণকারই না ধারণ করিতে পারে না—না—সুলেখা! নিজের ক্ষতিকে গ্রাহ করি না। নিজেকে না হয় জন্মের মতই বিসর্জন দিয় দাও। অত্যাচারিতা নীলিমাকে তাহার অবশ্যপ্রাপ্ত অধিকার ফিরাইয়া দিতে যদি তোমার বুকের একখানা পাঁজরা খসাইয়া দিতে হয়, তাও দিয়া ফেল। অপরাধীকে ক্ষমা করিও না!—তাই হোক, তাই হোক, দণ্ড তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্য করিতে নিশ্চয়ই সে বাধ্য করিবে—এই তাহার পণ। নারী হইয়া নারীমর্যাদাকে পদদলিত হইতে দিতে পারিবে না!—না, কখনই না। তাহা করিলে সত্যী নারীর রক্ত তাহার মধ্যে কলুষিত হইবে যে।

মুহূর্ত্তকালমধ্যেই তাহার ককণাদারা মরুবাসুমধ্যে ক্ষীণ জগদধারার মতই বিলুপ্ত হইয়া গেল,—ক্ষমা!—কাহাকে সে ক্ষমা করিবে? বিশ্বাসহস্তা চরিত্রহীনকে? সুনী তাহার সঙ্গেই বা কি ব্যবহার করিয়াছে? অতদূর অত্মায় করিয়া আসিয়া অনায়াসে তাহার মন লইয়া খেলা করিতে সে দ্বিধা বোধ করে নাই!—ছি ছি! না, কখনই না!—সুলেখা ফিরিল।

“লেখা। লেখা।—ওনে যাও—আমায় অবিচারে
৫ বড় দণ্ড দিয়ে চিরদিনের মতন চ’লে যেও না—
গে ভাল ক’রে একবার সকল কথা শোন, বিচার
রে দেখ।”

সুশীলের আত্মস্বপ্ন সমস্ত জড়প্রকৃতিকে কাঁদাইয়া
রয়ের মধ্যে তীব্র ক্রন্দনের সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়া
ঠিল।—আর তাহা সুলেখার বুকের মধ্যেই কি
ইল না? কিন্তু তথাপি সুলেখা দাঁড়াইল না, আর
কবার সে ফিরিয়াও চাহিল না, কঠিন আদেশের
রে সে চ’লিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—“বিচার
করিব। নীলিমাকে তোমায় বিয়ে করতেই
বে। আর তা যদি কর, তবেই আমার কাছে ও
কালের কাছে তুমি ক্ষমা পাবে, এ না হ’লে কখনও
পাবে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ।”

এই বলিয়া সুলেখা চলিয়া গেল। হতবুদ্ধি
সুশীল মুহমানবৎ পড়িয়া রহিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার জীবনের সকল আশার অবসানের সঙ্গে
সেই তাহার জন্ম যে চিতামজ্জা হইতেছিল, অকস্মাৎ
গলতা নিজের জীবনকে তাহাতেই আছতি প্রদান
কিলে অল্পকালের গৃহে একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটয়া
ঠিল। এই মৃত্যুসংবাদটা অতর্কিত রাষ্ট্র হইয়া পড়ায়
বাহটা কোনমতেই আর ঘটয়া উঠিতে পারিল না।
দুয়ার লোকের মধ্যে জানাজানি হইতে আর কিছুই
খন বাকি ছিল না, দেখিতে দেখিতে ঘরে ঘরে তীব্র
আলোচনা আরম্ভ হইল এবং পাড়ার এক রসিকা ঠান-
দি এতদুপলক্ষে ছড়া কাটিতে বসিয়া গেলেন—
“ছুই বারেও হ’লো নাকো পতি-সম্মিলন।

পোড়া বিধি এই দিলে কপালনিখন।” ইত্যাদি।
সন্ধ্যার পূর্বে মড়া উঠিল না। জন কয়েক
সুশীলানী ব্রাহ্মণ যোগাড় করিয়া অল্পকাল স্বর্ণলতার
গুটিমাঝ সার শবদেহটাকে বাঁশে বাঁধিয়া তীরস্থ
কিতে পাঠাইয়া দিল, নিজে সঙ্গে গেল না, গেলে
গৃহ আগলাইবে কে? নীলিমাকে কেহ না
কিতেই সে আপনি উঠিয়া শব-বাহীদের সঙ্গে লইল।

গভীর রাত্ৰিতে চিতা নির্দোষিত হইল।
শবদাহকারীরা অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় শব ফেলিয়া বাড়ী

ফিরিতে উত্তত হইলো, নীলিমা তাহাদিগকে বাকি
কার্য্যটুকু সমাধার জন্ত বিস্তর মিনতি করিল। কিন্তু
সেই সব নীচচরিত্রের স্বয়ংহীন লোকরা তাহার
অনুয়ে কর্ণপাত করিল না, কেহ ভদ্রভাবে, কেহ
অভদ্রভাবে হাসিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, অসমাপ্ত-শবদাহ
ফেলিয়া প্রস্থান করিল। কেবল এক জন মাত্র
নীলিমার সম্পূর্ণ অচেনা লোক সঙ্গীদের আহ্বান
উপেক্ষা করিয়া চিতাধিমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ পূর্বক
দাহকার্য্য সমাধা করিতে মনোযোগী হইল, সেই শুধু
গেল না।

স্বর্ণলতার চিরজ্বালাময় জীবনের সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন
করিয়া দিয়া, তাহার চিতাচিহ্ন নিঃশেষে ধুইয়া
ফেলিয়া নীলিমা শুষ্ক চোখে নদীগর্ভে নামিয়া নান
করিল। ডুব দিবার সময় তাহার মনে হইল, এই
সুশীতল জলতল হইতে মাথাটা আর না তুলিলেই তো
এখনই সব কিছু চুকিয়া যাইতে পারে? কি প্রয়োজন
আর তাহার এখান হইতে উঠিবার? পৃথিবীর
তপ্তবক্ষ হইতে এই নদীগর্ভ কত শান্ত, কতই শীতল!
আঃ!—প্রবল লোভ তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে
লাগিল।

একবার সে অনেকক্ষণ জলতলে ডুবিয়া রহিল;
কিন্তু তাহাতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতেছিল,
বুকে একটা বিষম চাপ যেন সবগে ঠেলিয়া উঠিতে
লাগিল। কেবলই হাঁপাইয়া ভাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা
হয়। না, ডুবিয়া মরা বড় সহজ নহে, এ বড় যন্ত্রণাকর
মৃত্যু! যন্ত্রণার হাত হইতেই যে সে মুক্তি চায়।
তাহার পর আরও একটা কথা—নারী সে, মরিলেও
সে দেহ নারীদেহ। কোথায় কি ভাবে ভাসিয়া
গিয়া সে দেহটা কোথাকার কূলে লাগিবে; জলপুলিসে
সেটা না জানি কি অবস্থায় টানিয়া তুলিবে।
মুর্দাকরাসে হাঁদপাতালে লইয়া গিয়া সেটাকে চিরিবে,
ফাঁড়িবে। তাহার পর কোথায় ফেলিয়া দিবে না
কি করিবে। তার উদ্দেশ্যে কতই হয় তো তীব্র
ব্যঙ্গোক্তি সকল বর্ষিত হইবে! না, তাহার অপেক্ষা
তো কেরোসিনে পুড়িয়া মরাই শ্রেয়! এমন করিয়া
আগুন ধরাইবে যে, যাহাতে নিজের আগুনেই তার
সমস্তটুকু ভস্ম হয়। কাহারও কিছু আর করিবার বাকি
না থাকে।

নীলিমা যেন এইবার একটা পথ পাইয়া জল
হইতে উঠিয়া আসিল। নদীতীরে কেহ কোথাও

ধাঁই। রাত্রির সঙ্গী ব্রাহ্মণটির স্নান শেষ হইয়াছিল, বলা যায় না, কি উদ্দেশ্যে সে তখন কোথায় গিয়াছে। নীলিমা কিন্তু ইহাতে বড় অস্তিত্বই বোধ করিল। জনসঙ্গ তাহার পক্ষে এখন যেন বিষ খাওয়ার অপেক্ষাও তিক্ততর ঠেকিতেছিল।

নদীতীর ধরিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যে দিক্ হইতে তাহার আসিয়াছিল, তাহার বিপরীত পথে চলিল। বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়িতেই আতঙ্কে ও ঘৃণায় তাহার সমস্ত দেহ-মন কঁকড়াইয়া যেন এতটুকু হইয়া গেল। সেই বাড়ীতে আবার সে কিরবে? কেন—কিসের গোভে? লোকে নিন্দা করিবে? হয় তো কত ছর্নাও রটিবে? তাহাতেই বা তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? সে তো মরণপথের যাত্রী। সে মরিতেই বসিয়াছে, তাহার আবার লোকলজ্জা, মান, ভয় কিসের?

নীলিমা লক্ষ্যহীন হইয়াও শুধু নদীতীর লক্ষ্য করিয়াই বহুপথ অতিক্রম করিল। ইহার মধ্যে প্রথম দিকে দুই একখানা ক্ষুদ্র বস্তি ভিন্ন কোথাও অপর কোন লোকালয়ের চিহ্ন সে দেখিতে পাইল না। নদীর গায়ে চর পড়িয়া গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে বালিরাশি ধূ—ধূ করিতেছে, তাহার অনেক দূরে প্রায় নদীমধ্যভাগে অতি শীর্ণ ক্ষীণ জলধারা সূর্য্যকরোজ্জ্বল শুক্লিমাল্যের মতই তাহা শুভ্র দেখাইতেছে। শ্রান্ত পক্ষী বহু দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু ডুবাইয়া জল পান করিল; চরণশীল গাভী মহিষ দল বাঁধিয়া চড়া ভাঙ্গিয়া জলে অবগাহন করিতে গেল; বস্তির নিকটে কৃষকপত্নীর পল্লীবধু বালিকা ও গৃহিণীগণ ঘট-কক্ষে স্নানার্থী হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। নীলিমা যুগ্মনেত্রে চাহিয়া রহিল। ক্রমে প্রথর রৌদ্রতেজে প্রবল পশ্চিমে বাতাসে তপ্ত বালি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণের মতই নীলিমার সর্বদেহের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। তৃণশূন্য বালুকাময় মৃত্তিকা তাহার নগ্নপদ ঝলসিত করিয়া দিল। তখন ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া সে একটা সুবৃহৎ তুঁত গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, যেন অস্তিত্ব বিল কোশ পথও সে আজ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। আর একটি পাও হাঁটিতে গেলে সে যেন সেইখানে মুখ খুঁড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। নীলিমার বুক ফাটিয়া এক ফোঁটা হাসি তাহার শুকনো ঠোঁটের কোণে

ফুটিয়া উঠিল। যে মরণকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পক্ষে এইরূপেই তাহার সাক্ষাৎ লাভে লোকসান কি?—কিন্তু যুক্তির সহিত মন সব সময়ে ঠিক আপোষ করে না। অগত্যাই তাহাকে সেই ছায়া-সুশীতল-বৃক্ষতলাশ্রয়ী হইতে হইল।

আহা, কি সুমিষ্ট ঐ বাতাসটুকু! কি শীতল এই ছায়া! গাছের উপর গলায় চিত্রকরা কয়েকটা চন্দনা কিচির-মিচির শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নীলিমার মনে হইল—কি সুন্দর তাহাদের রূপ! আহা, ইহার একটিকে ধরিতে পারিলে—আবার সেই দুঃখদীর্ঘ বন্ধের তীব্র ব্যঙ্গ হাস্য! হ্যাঁ, মরণের উপযুক্ত সঙ্গী বটে।

সহসা মৃত্যু-চিন্তাকে অন্তরাল করিয়া দিয়া বাঁচিয়া থাকার সাধ দেখা দিল। সহসা তাহার মনে হইল, মরণেরই বা তাহার এত কি প্রয়োজন ঘটিয়াছে? জগতে এত লোক, সকলেরই যদি বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার থাকে, তবে সেই কি শুধু তাহা পাইবে না? কেন? কিসের অপরাধে?

অপরাধ খুঁজিতে গিয়া কিছুই সে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না! এক মন্ত বড় অপরাধ সে করিয়াছে বটে, তাহা রূপণের ঘরে, হিন্দুর ঘরে, গরীবের ঘরে কল্যা হইয়া জন্মান। ইহাকে যদি অপরাধ বলিতে হয়, তবে এ অপরাধের হয় তো এই-ই যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু এ পাপের জন্ত সে তো নিজের দায়ী নহে। যে পিতৃকর্তব্য-বিচ্যুত নিহর্ষ পিতা তাহাকে এ পৃথিবীতে আনিয়াছে, তাহার জন্ত দায়ী সে! যে পিতা সন্তানকে কেবলমাত্র নিজের পোষা জানোয়ারের মতই খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া চারিটি চারিটি আহার্য—তাহাও সহস্রবার খোঁটা দিয়া—প্রদান মাত্রেরই পিতৃ-কর্তব্য সমাধা করে, সন্তানের কোন শিক্ষা, কোন উন্নতির জন্ত কোন দিন এতটুকু চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, যাহার নিজের জীবনই পশুজীবন হইতে সামান্তমাত্র বিভিন্ন—তাহাকে সন্তানজননের অধিকার দেওয়া সামাজিক দুর্বলতা—সমাজের পক্ষে তাহা মহা পাপ। সে জন্ত আর যে দায়ী হয় হোক, সে প্রায়শ্চিত্ত কেন সেই সন্তানকেই শুধু করিতে হইবে? এ বিড়ম্বনার কি কোন প্রতীকার নাই? কেন সেই অপরের কৃত অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মরিতে হইবে তাহাকে? নির্দোষ—নিরপরাধ—সবেমাত্র এই আঠার বৎসর বয়স—এই কি তাহার মরিবার সময়? না, সে মরিবে না—মরিতে পারিবে না।

নীলিমার মরণপ্রত্যাশী নিশ্চিত হৃদয় এইবার সত্য সন্দেহে সঘনে ছলিয়া উঠিল। আচ্ছা না হয় সে নাই মরিল! কিন্তু বাঁচিতে হইলে তো তাহার একটা আশ্রয়েরও প্রয়োজন আছে।—যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইয়া বাঁচবে? এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া মরিলে তো মরণের বাড়ী দুর্দশা ঘটাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাহার মতন বয়সে ও রূপে যে অনেক বিপক্ষ-পক্ষের হস্ত-লাঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা জগতে বর্তমান আছে, সে কথা তো তাহার অজানা ছিল না। তবে যাইবে সে কোথা! পিতৃগৃহে?—পিতার কথা স্মরণে আসিতেই সভয়ে সে একবার তাহার সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্ঞন প্রান্তরের চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। না, কেহ কোথাও নাই। প্রচণ্ড মধ্যাহ্নসূর্য্য যেন চারিদিকে পীতভ অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া পৃথিবীকে যেন দগ্ধীভূত করিতে-ছিলেন, কাহার সাধ্য নিজ নিজ আশ্রয়ের বাহির হয়!

নীলিমার মনে হইল, এখন যদি তাহার বাপের সঙ্গে তার চোখোচোখি হইত তো নিশ্চয়ই সে তখনই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত। বাপের বাড়ীর অপেক্ষা যমের বাড়ী যাওয়া তাহার পক্ষে খুবই কঠিন নয়; বরঞ্চ অনেকই সহজ এবং নিঃসন্দেহ শাস্তিকরও। মরিবার জন্তই বরং সেখানে যাওয়া চলে, বাঁচিবার জন্ত নহে।

সারাদিন সে সেই গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া ভাবিল। ক্রমে তাহার চিন্তাশক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। অবসাদগ্রস্ত, শোকাবুল ও ক্ষুৎ-পিপাসাতুর শরীর-মন কেমন একটা নেশার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত চেতনাকে অপহরণ করিয়া লইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সংজ্ঞাহীন থাকিয়া কাটাইয়া আবার সন্ধ্যার বাতাসে রৌদ্রতপ্ত লতার মতই কাহারও গুরুত্ব ব্যতিরেকেও আপনা আপনি স্তম্ভ হইয়া উঠিয়া বসিল।

তখন নির্জ্ঞন নদীতীরে সন্ধ্যালোক ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। নদীর তীর, তীর-বালুকা, জলধারা, পরপার সব একই অন্ধকারাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়া একমাত্র অন্ধকারই সর্বত্র অভেদ ও অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝিল্লীর এবং শৃগালের সমুচ্চ চীৎকারধ্বনি না থাকিলে সমস্ত জগতের জীবিতচিহ্ন এই অমিশ্র অন্ধকারে বুঝি বা

খুঁজিয়া পাওয়াই ভার হইত। নীলিমার পায়ের তলা দিয়া কি যেন একটা খস-খস শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। সেই খস খস শব্দে তাহার সমস্ত চেতনাপ্রাপ্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া নিজের শরীরের দারুণ দুর্বলতা অনুভব করিয়া সে বিস্মিত এবং কিছু ভীতও হইল। এই শরীরকে টানিয়া তুলিয়া বহিয়া লইয়া আর কি কখন সে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে? সম্ভব তো মনে হয় না। অথচ এক ফোঁটা জল না পাইলে আর তো বাঁচিবার কোন উপায়ই তাহার নাই। মাথার উপর গাছের ডালে কয়েকটা বাছড় ঝুলিতেছিল, তাহার ঝপ-ঝপ করিয়া ডানা ঝাড়া দিল ও উড়িয়া গেল। একটা কালপেঁচা শ্রুতিকণ্ঠের তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। একটা শৃগাল কাছ দিয়া যাইতে যাইতে বারেক দাঁড়াইয়া পড়িয়া নীলিমাকে আশ্রয় করিয়া গেল, জীবিত প্রাণী জানিয়া চকিতে ছুটিয়া পলাইল। মহাভয়ে নীলিমা তখন স্থলিতপদে উঠিয়া অতি কষ্টে এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মরণ যখন দূরে থাকে, আলস্যের আলোর মতনই তখন তাহা অতি উজ্জ্বল মনে হয়, হৃদয়কে সে আকৃষ্ট করে; কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসিতে হইলে বীরের প্রাণ চাই।

কখনও বসিয়া, কখনও চলিয়া অনেকখানি পথ অতিক্রম করিবার পরও যখন কোন লোকালয় পাওয়া গেল না, তখন হতাশা ও অবসন্নতা মিলিয়া নীলিমার হাতপাগুলো অসাড় করিয়া দিল। সে তখন জীবনের আশামাত্র বিসর্জন দিয়া সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল; এবং তৎক্ষণাৎ অবসাদপূর্ণ গভীর নিদ্রা আসিয়া তখনকার মতন তাহার সকল যন্ত্রণারই অবসান করিয়া দিল।

ঘুম ভাঙিল পরদিন সূর্য্যের আলো চোখে পড়িয়া। স্থপ্তিভঙ্গে অনেকখানি স্তম্ভদেহে সে অভ্যাস মত উঠিয়া বসিতেই তাহার বিস্মিত দৃষ্টিতে এক অপূর্ণ দৃশ্য প্রতিভাত হইল।

যেখানে সে শুইয়া ছিল, তাহারই ঠিক পাশ দিয়া নদীর গতি বক্র হইয়া গিয়াছে। নদীজল সেখানে কিছু গভীর এবং তীরদেশ সজল শ্রামল তৃণশম্পাবৃত। ধূ ধূ মরুবৎ বালুকারাশি পরপারে সাদা চাদর বিছানোর মতই স্থির পড়িয়া আছে। অদূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। আপাদ-মস্তক তাহার রক্ত-পুষ্পে ভরিয়া আছে;

নীল-আকাশের নীচে শ্রাম পত্রাবলীমধ্যে তাহার সে লোহিত শোভা বৈচিত্র্যময় ও সুন্দরতম !

নীলিমা নিজের দেহপ্রতি নেত্রপাত করিল। তাহার অঙ্গে আজও সেই বিবাহরাত্রে পরিধৃত রক্তবস্ত্র রহিয়া গিয়াছিল। সে রাত্রি রং আজ অমত্রে অবহেলায় মলিন হইয়া গিয়াছে, যেন কত দিনেরই পুরাতন। তাহারও মনে হইল, সে রাত্রিটা যেন কত—কত কালই পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে ! তাহার সেই দাহময় অথচ মধুমাখা স্মৃতি—এ জীবনে যে স্মৃতির আগুন কখন তাহার বুক হইতে নিবিবার নহে ; যে স্মৃতির সুখ তাহার এই মৃত্যুবাণাহত বজ্রাগ্নিদগ্ধ হৃদয়কে অমৃত-নিষেকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, সেই ভীষণ মধুর রাত্রি সে যেন কোন্ এক যুগান্তরের অবিস্মৃত স্মৃতিমাত্র ! নীলিমা যেন তাহার পর হইতে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়াই এই প্রকার গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, আশাহীন জীবনতরঙ্গী মহাকালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অনির্দিষ্ট পথে অহোরাত্রই ভাসিয়া চলিয়াছে ; ইহার শেষ কোন দিনই যেন সে খুঁজিয়া পায় নাই—এবং বুঝি বা পাইতে চাহেও নাই।

সুশীলের কথা এ দুই দিনে নীলিমার অনেকবার বারে বারেই মনে হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ সে বিষয়-টাকে সে ক্রমাগতই তার মন হইতে সমস্তে বিদায় দেবারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মন যখন তাহাতে বড়ই পীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, সে তাহাকে তখন এই বলিয়া কখন ধমক দিয়া কখন বা মিনতি করিয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছিল যে, সে তোমার কে ?—তুমি গরীবের মেয়ে, সে ধনীর সন্তান ! তাহার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ? বামন হইয়া কে কবে আকাশের চাঁদ ধরিতে পারিয়াছে ?—আজ এখনও সে সেই যুক্তিই প্রয়োগ করিয়া নিজেকে তাহার সেই একান্ত ক্লেশজনক—সেই অত্যন্ত সুখকর চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বর্গ্যতাপ প্রথর হইবার পূর্বেই আজ তাহাকে একটা আশ্রয়ের সম্মান করিতে হইবে। আবার জিজীবিষা তাহার মনে প্রবল হইয়া দেখা দিল। নদীতে নামিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া সে অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করিল, কিন্তু তিন দিনের উপবাসের পর সে জল তাহার পেটে থাকিল না—বমন হইয়া গেল। তখন আবার সেই দুর্বল চরণ কোনমতে কূলে উঠাইয়া সম্মুখ লক্ষ্যে পুনরাপি সে চলিতে আরম্ভ করিল।

৫ম (খ) ১৩

কি অসীম এ যাত্রাপথ ! ইহার কি কোথাও সমাপ্তি নাই ? এ কি তাহার মহাযাত্রা ? নীলিমা যে আর পারে না। তাহার পা টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুর সম্মুখে খর রৌদ্র-জাল যেন ধোঁয়ার মত ধূসর, মেঘের মত নিকষ কালো হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সেই চলারও আর বিরাম নাই।

দ্বিপ্রহরে অগ্নিতপ্ত ধূলাবালি উড়াইয়া প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। যেন শতধারে তীক্ষ্ণ শরাঘাত সর্বদা তার ভেদ করিয়া দিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখী হইয়াও শুষ্ককণ্ঠে দগ্ধপদে ঘর্ষিত দেহ টানিয়া লইয়া চলিল, তখনও নীলিমা গতি বন্ধ করিল না। কিন্তু এইবার বুঝি সব শেষ !—সুশীল !—সুশীল !—

অদূরে ঐ না একটা বাড়ী ! ধূলিমেষজাল ভেদ করিয়াও তাহার উজ্জল রাত্রি রং ঐ যে সুস্পষ্টতর দেখা যাইতেছে না ? না না, চলিতেই হইবে—বাঁচিতেই হইবে—বাঁচিয়া থাকিলে হয় তো—হয় তো কখনও না কখনও দেখা হইলেও হইতে পারে। একবার—একবার—এক নিমেষের দেখা—আর একটবার—জন্মের শোধ একটবার—না না, আর দেখা নয়—না না—আর বাঁচা নয়—না না, আর চলা নয়—আর পা উঠিতেছে না—দেহ বহিতেছে না—আর বাঁচিবার উপায় নাই—কোনই উপায় নাই—ওঃ, সুশীল !—সুশীল !—সুশীল !

নীলিমার সংজ্ঞাহারা অচেতন দেহ দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিতপ্ত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার উপর দিয়া দূরন্ত গ্রীষ্মের আগুনে ঝড় উদ্দাম ভাবে তপ্ত বালুকারাশি উড়াইয়া হাঃ হাঃ শব্দে অট্টহাস্য করিতে লাগিল, তাহার মাথার উপর কেবলমাত্র পরি-শ্রান্ত চিলের আর্দ্রশ্বর কদাচিৎ এক একবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এ ভিন্ন আর কেহ কোথাও তাহার এ ভয়াবহ অবস্থার সাক্ষিমাত্র থাকিল না।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ইহার পর নীলিমা যখন চোখ চাহিল, তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তখন স্বপ্নাভিভূতের স্থায় দৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত স্বরূপকে সম্যকরূপে ধারণা করিতেই পারিল

না। চারিদিকেই তাহার ঘেন সমুদয়কেই অজানা অচেনা বলিয়া বোধ হইল। সে কোথায় ছিল? কোথায় আসিয়াছে? কেমন করিয়া এখানে আসিল? এ সকলের কোন ধারণাই ঘেন তাহার মনে ছিল না, মনে করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু সবই ঘেন শূন্যময়! কিছুতেই কিছু মনে পড়িল না। অগত্যা সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

এক জন হিন্দুস্থানী ‘দাই’ তাহার পরিচর্যা করিতেছিল, নীলিমা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে মনে করিল, কিন্তু কি ভয়ানক তার দুর্বলতা! এমন কি বাক্যস্মরণের সামর্থ্যটুকুও তার মধ্যে বর্তমান ছিল না। ঠোট তাহার নড়িল কি না, বুঝা গেল না, শব্দ যে বাহির হয় নাই, তাহা নিজেও সে বুঝিয়াছিল।

আরও কয়েকটা দিন গেল। ক্রমে তন্ত্রার ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল, ভীষণ দুর্বলতা অতি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। এখন চোখ চাহিতে আর ততদূর ক্রেশ বোধ হয় না, কানেও সে কিছু কিছু শুনিতে পায়। গুপ্তাচারিণীর সহিত দুই একটা কথাও বলিয়া থাকে, কিন্তু দুই একটা শব্দের অধিক একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারে না। এইবারে সে দেখিল, প্রাতে ও অপরাহ্নে একটি বর্ম্মসী মহিলার সহিত এক জন তরুণবয়স্ক পুরুষ তাহার কক্ষে প্রত্যহই আগমন করিয়া থাকেন—উভয়েই তাহার শরীর পরীক্ষা করেন। গুপ্তাচারিণীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থিত হইলেন। মহিলাটি প্রায়ই একটি সুগন্ধি পুষ্প আনিয়া নীলিমার রোগ-শয্যার উপর স্থাপন করেন, বিদায়কালে তাহার মুখের দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন দিন একটু স্নেহ জানাইয়া যান। তাঁহার চাওয়া গেলোও নীলিমা বহুক্ষণাবধি তাঁহাদের প্রস্থানপথের অভিমুখে নিনিমেষে চাহিয়া থাকে। এই শান্ত সৌম্যমুর্তি নারীর মধ্যে ঘেন তাহার দুঃস্বপ্ন স্নেহ-ক্ষুধা অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আইসে। তাহার গুপ্ত আলাপনে নেত্র অশ্রুর ঈষৎ আভাস অকস্মাৎ দেখা দেয়, তাহার প্রায়-রুদ্ধ চিত্তে সুদূর অতীতের স্মৃতির মতই ক্ষীণভাবে জাগিয়া উঠে তাহার মার কথা।

ক্রমে নীলিমা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। এখন তাহার সব কথাই মনে পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, সে মরণের খুব নিকটবর্ত্তীই হইয়াছিল, কিন্তু

আবার সেখান হইতে ফিরাইয়া তাহাকে বাঁচাইল কে?

যে দিন ঘরের মধ্যে দুই এক পা করিয়া নীলিমা হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারিল, সেই দিন ষথানিয়মে সেই পুরুষ ও বর্ম্মসী মহিলা তাহাকে দেখিতে আসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইঁহারা যুরোপীয়, সম্বন্ধে ভাইবোন, জাতিতে আইরিশ,—মহিলাটি এই স্থানের ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান কত্রী। অপর জন সুদূর সিন্ধুপ্রদেশে পাদরীর কার্য করেন, ভগ্নীর অসুস্থতা সংবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

মিস্ ওকবর্ণ অতি মধুর স্বরে ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিলেন, “বাছা! তুমি যে জীবন পাইলে, এ শুধু দয়াময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিয়া জানিও। এরূপ অসম্ভব ঘটনা যোশাস-ক্রাইষ্টের সময়েই শুধু তাঁহারই দ্বারায় সম্ভব হইয়াছিল।”

মিষ্টার ওকবর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে মন্তব্য করিলেন, “অসম্ভব সত্য।”

নীলিমা কিছুই না বুঝিয়া হতবুদ্ধিভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় কে বাঁচালে?”

মিস্ ওকবর্ণ উর্দ্ধে চাহিয়া মুদিত নেত্রে উত্তর করিলেন, “নিশ্চয়ই ঈশ্বর!”

মিষ্টার ওকবর্ণ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেলেন, “তাহাতে কোনই সংশয় নাই।”

নীলিমা যখন ঘটনাটার আত্মোপাত্তা শুনিল, তখন ইঁহাদের বিশ্বাসের সহিত তাহাকেও একমত হইতে হইল। না হইয়া ঘেন আর কোন উপায় রহিল না। সেই জনমানবপরিশৃঙ্খল মরুভূমি স্থানে তপ্ত বালুকা ঝড়ের মধ্যে শোকাহতা, লাঞ্ছিতা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা, অনাথা বালিকার আসন্ন মরণের ঠিক সন্ধিস্থলে কে আর এই বিদেশী পুরুষকে অকস্মাৎ প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাকে জীয়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন? যদি তিনি ঈশ্বর নাই হইলেন? যে করুণা নীলিমা তাহার কোন স্বদেশীর নিকট, এমন কি, নিজের বাপের কাছেও কোন দিন পায় নাই, সেই সংসারের সার, সুখাসমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ করুণাধারা কে আর এই বৃদ্ধা বিদেশিনীর অন্তরে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত নিজগৃহে তুলিয়া আনিয়া সুরচিকিৎসায় ও সমস্ত গুপ্তাচার পুনর্জীবনের সহায়তা করিল? নীলিমার নিম্নলিখিত নেত্র দিয়া প্রবলবেগে কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা ঝরিয়া

পড়িল। সে সহসা সেই সেবাত্রাধারিণীর পদতলে নতজানু হইয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গদগদ স্বরে কহিয়া উঠিল, “আপনি আমার মা, আপনার আমি চিরদাসী হয়ে থাকবো।”

মিস্ ওকবর্ণের নেত্রও জলপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার স্বভাবমধুরভাবে নীলিমার মস্তকে পৃষ্ঠে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া স্নিতমুখে কহিলেন, “নিশ্চয়ই! তুমি আমার মেয়ে। কিন্তু আমার অপেক্ষা ঈশ্বরের কাছে আর আমার এই ছোট ভাই জর্জের—মিষ্টার ওকবর্ণের কাছেই তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া সঙ্গত। আমি কিছুই করি নাই। সে দিন সেই ঝড়ের সময় যদি আমার ভাই জর্জ তোমায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে মোটর থামিয়ে তুলে না নিত, তা হ’লে কারও সাধ্য ছিল না যে, তোমায় বাঁচাতে পারে। অবশ্য করুণাময় ঈশ্বরই তাকে সে কার্যের সুযোগ দান করেছিলেন।”

মিষ্টার ওকবর্ণ যন্ত্রচালিতের মতই প্রতিধ্বনি করিয়া গেলেন, “তাতে আর সন্দেহ কি!”

নীলিমা তখন অশ্রুপ্লাবিত মুখ তাহার অদূরবর্তী আইরিশ যুবকের দিকে ফিরাইল। অবিভক্ত ইংরাজীতে বলিল, “আপনাকে কি ব’লে কৃতজ্ঞতা জানাব, আমি জানি না।”

যুবক মৃদু হাসিয়া উত্তর দান করিলেন, “তুমি শুধু ঈশ্বরের কাছে তোমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাও।”

নীলিমাকে ইংরাজী বলিতে শুনিয়া মিস্ ওকবর্ণ সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি ইংরাজী বলিতে পার! এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা একটা হিসাবেও পড়ে না। জর্জ! তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, বিপন্ন বালিকা নিশ্চয়ই ভদ্র-বংশীয়া।”

নীলিমার প্রতি মিস্ ওকবর্ণের স্নেহ-বস্ত্র প্রতিদিনই যেন বর্দ্ধিততর হইতে লাগিল। সুখাত্ম বলকারক ঔষধ ও মনে ভরসা পাইয়া নীলিমার দুর্বল শরীরে অতি শীঘ্র শীঘ্রই বলাধান হইতে লাগিল। এমন কি, জীবনে কখন যে স্বাস্থ্যের মুখ সে দেখিতে পায় নাই, লালকুঠী মিশনের কর্ত্রীর পোষাকজ্ঞা হইয়া সে মাস-খানেকের মধ্যেই তাহা লাভ করিল। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ঝলসিত লতা শ্রাবণবারিধারাপুষ্ট হইয়া যেমন নবীন ও সতেজ হইয়া উঠে, শ্রাবণ পত্রাবলীতে বিভূষিত

হয়, নীলিমার অযত্নবর্দ্ধিত, অখাঞ্চে অপুষ্ট, ক্ষীণ দেহলতা তেমনই তাহার নূতন আশ্রয়ের স্বাচ্ছন্দ্যলাভে ও উৎকট রোগমুক্তির পর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির একটা সুযোগ তাহাকে যেন এবার নূতন করিয়া গড়িল। নীলিমার গৌরবর্ণ রক্তাঙ্গতার পূর্বে পাণ্ডু দেখাইত, এখন তাহাতে যেন গোলাপের আভা মিশ্রিত হইল। তাহার টানা চোখের দুর্বল দৃষ্টি কুণ্ডায় স্বতই নত হইয়া থাকে, এখন তাহাতে প্রাণশক্তির স্ফুর্তি হওয়াতে তাহা উজ্জল ও চঞ্চল দেখাইল। তাহার অস্থিসার ক্ষীণ দেহ সুপুষ্ট ও সুললিত ভাবে স্ফুর্গিত হইয়া উঠিল।—মরা গঙ্গায় জোয়ার আসিল।

লালকুঠীর আশ্রয় নীলিমার পক্ষে এক সুখস্বপ্ন। রোগশয্যায় প্রায় দুই সপ্তাহ কাটাইবার পর রোগমুক্ত অবস্থায় তাহার এখানে তিন মাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই মাসত্রয় তাহার কাছে যেন আরব-রজনী হইতে ছানিয়া আনা তিনটি রাত্রি! মিস্ ওকবর্ণ তাহাকে বাস্তবিক কণ্ঠাস্নেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত অল্প দিনের পরিচয়ে মানুষকে যে মানুষ এতই ভালবাসিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে, মানুষের এ উদার মহৎ পরিচয় নীলিমার কাছে চির-অজ্ঞাত ছিল। আজ তাহা প্রকটিত হইল—এক বিদেশিনীর মধ্য দিয়া! নিজের দেশকে সর্বাস্বঃকরণে তীব্র ঘৃণা করিয়া সে কায়মনে সেই ভিন্নধর্মী ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা-ভাষিণীর প্রতি তাহার সকল কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত করিয়া দিল। নিজেকে ইহার কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়া সে সেই স্নেহ-করুণার স্রোতকে বর্দ্ধিত ও বেগবান্ করিয়া তুলিল। মিস্ ওকবর্ণ নিজের বাক্সের চাবি, হিসাব-পত্র সমুদয়ই তাঁহার পোষাকজ্ঞার হস্তে তুলিয়া দিলেন। নিজে তাহার ইংরাজী ফরাসী পিয়ানো শিক্ষায় সবিশেষ মনোযোগী হইয়া ভাইকে তাহার ল্যাটিন শিক্ষায় নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং সর্বদা তাঁহাকে সে বিষয়ে অমনোযোগ জ্ঞান অহুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না। অথচ সে বেচারারও এ সম্বন্ধে কোনই ক্রটি ছিল না, বরং বিশেষরূপ উৎসাহই ছিল। সেটা আবার এত বেশী যে, নীলিমাকে তাহার জ্ঞান সময় সময় বিব্রত হইতে হইত। অথচ প্রাপ্তদাতাকে ঘৃণাকরেও কিছু জানাই-বারও উপায় নাই।

কেবল একটি বিষয়ে নীলিমার এখনও দ্বৈধমত ঘুচে নাই। মিস্ ওকবর্ণ তাহাকে দুই চারিবার

বলিয়াছেন, মিষ্টার ওকবর্ণ তাহাকে প্রায় প্রত্যাহই দুই চারিবার করিয়া খুঁটখুঁটী দীক্ষা লইবার কথা মনে পড়াইয়া দেন, ইদানীং তাহার সংশয় মিটিতে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মিষ্টার ওকবর্ণ একটু অসহিষ্ণু হইয়াও উঠিয়াছিলেন এবং লাটিন পড়াইতে বসিয়া দুই বেলাই বাইবেল-বর্ণিত বিষয়ের উপরও অনেকখানি কল্পনা যোগ করিয়া অ-খুঁটানের অ-স্বর্ণ সম্বন্ধে খুবই ভীষণ-ভাবে আলোচনা করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি নীলিমার মন হইতে এতটুকু চলচ্চিত্ততা দূর হইতেছিল না। হিন্দুধর্মের সে কোন খবরই জানে না, হিন্দুদের কোন শিক্ষাই কোন দিন সে পায় নাই— তাহার মা-বাপই সে সম্বন্ধে এতটুকু আলোক পাইয়া-ছিল কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সংশয়মূল। উচ্চ হিন্দুদের উদার শিক্ষা দূরের কথা, হিন্দুধর্মের অভ্যন্তর বহিরে যে আচারনিষ্ঠাপরায়ণতা মাত্র, তাহাও এখনকার বাসাবাড়ীর ক্ষুদ্র পরিবার-পদ্ধতির মধ্যে বড় একটাই দেখা যায় না। বার-ব্রত, দানধর্ম, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অতিথি-সেবা, তীর্থযাত্রা একানবর্তী পরিবারের মধ্যে ত্যাগশীলতা, সংসার প্রভৃতি যে সকল সদাচার ও সদুত্তম হিন্দুসমাজের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচুরতরুরূপেই বর্তমান ছিল, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলিমা যে বাড়ীতে জন্মিয়া যে সঙ্কীর্ণ পরিবৃত্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে, তাহাতে সকল শিক্ষাই তাহার অদম্পূর্ণ। মানুষকে সে হীন, স্বার্থপরতাপূর্ণ, নির্মম —অথবা ভীক, সঙ্কুচিত, অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত —ইহার বাহিরে আর কোন মূর্তিতেই দেখিতে পায় নাই। তাই স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ তাহার ছিল না, বরঞ্চ তাহার মনে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অনেক বেশীই ছিল, কারণ, এটাকে সে ভাল করিয়া না চিনিলেও ইহার একটা লোভনীয় বাহ্যশোভা তাহার ছটো চোখকে ধাঁধিয়া দিয়াছিল। মিশনারীদের মধ্যে জীবনের অনেক অংশই তাহার কাটিয়াছে। ইহাদের ভিতরে আর কিছুই না থাকুক, দয়াদাক্ষিণ্যের কোনই যে অভাব নাই, তাহাতে আর সংশয় কি? সে দেখিত, এই খৃষ্টধর্মাবলম্বী সমস্ত জাতটাই কোন্ সুদূরে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর জন্ত একান্ত আগ্রহে চিন্তা করিতেছে। জগতের সর্বত্র তাহারা নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক নিঃস্বার্থ ও সত্যতা প্রচারমাত্রই নহে, অনাথ শিশুদের রক্ষার জন্তও যত্নেহ প্রচেষ্টার কিছুমাত্র

ক্রটি রাখে নাই। শত সহস্র অনাথশিশুর প্রতিষ্ঠা পূর্বক কত মানবশিশুর অকালবিয়োগ প্রতিরোধ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কত শতকেই চোর, দস্যু ও ভিক্ষাপঞ্জীবি হওয়া হইতে রক্ষা করিতেছে। আর্ন্ত ব্যক্তি ওদের দ্বারা ঔষধপথ্য ও সেবালাভে কৃতার্থ হইতেছে; বিদ্যা, জ্ঞান, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম সফল করিতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমস্ত মানব-সমাজের জন্তই ইহাদের চিন্তে করুণার অপার বারিধি যেন স্বতঃই উৎপলিত হইতেছে। এ দয়ার জন্ত জাতি নাই, ধর্ম নাই, পাত্রাপাত্রজ্ঞান নাই —যেখানে অভাব ও অত্যাচার, সেইখানেই ইহাদের সেবাকুশল করুণাম্পর্শ। এই করুণার উৎস ইহাদের নিজ দেশভূমি, আত্মীয়বন্ধু সর্বত্র ত্যাগ করাইয়া অপার জলধিগর্ভ হইতে বালুয়র মরুস্থান পর্য্যন্ত পৃথিবীতে হেন স্থান নাই—যেখানে ঠেলিয়া না পাঠাইতেছে। এ ধর্ম মানুষকে উদার করে, উন্নত করে, মানুষকে মানুষ বলিতে শিক্ষা দেয়। ইহার অপেক্ষা বড় ধর্ম আর কোথায় আছে? নীলিমার প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল। এই ধর্মই অতঃপর তাহার নিজের ধর্ম হোক, ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সে নূতন ভাবে জীবন গড়িবে। সে জীবন মিস ওকবর্ণের মতই নির্মল নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ ও সেবা-ব্রতধারী হইবে। নীলিমার আশাহত অন্ধকার প্রাণ যেন নব-রবির নূতন রশ্মিলাভে আলোকোদীপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সে মনের মধ্যে কতই না গড়িয়া তুলিল। কিন্তু ঐ যে একটুখানি ক্ষুদ্র সঙ্কোচ, মূলে তাহার এতটুকু একটুখানি ছরাশা, সেটুকু যে কিছুতেই মরিতে চায় না। সে যে কিসের কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়া নিজেকে কঠিন করিয়া দাঁড় করায়, তাহাকে তো নূতনের সহস্র প্রলোভনও বশীভূত করিতে পারে না।

সুশীল! সুশীল এ কথা শুনিলে কি বলিবে? সুশীল যদি তাহাকে লোভী বলিয়া, অসহিষ্ণু প্রতি-হিংসাপরায়ণ বলিয়া মনে করে, বিধর্মী বলিয়া ঘৃণা করে? মন অবশ্য বলে যে, তাহার জন্ত এতই ভাবনা কেন? তাহার সঙ্গে এ জীবনে দেখাই কি আর কখন তোমার হইবে? কিন্তু এ যুক্তিতে মনর কোনই সাহসনা খুঁজিয়া পায় না। দেখা যদি কখন না-ই হয়, তথাপি মনে মনেও যে সুশীল তাহাকে ঘৃণা করিতে থাকিবে, সে স্বত্তিও যে তাহার চিন্তে

অসহ্য দাহ আনি । দেয় । সুশীল তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে, সে হুংখ নীলিমা প্রাণপণে সহিতেছে, কিন্তু তাহার ঘৃণা সে কেমন করিয়া সহ করিবে ? না না, তাহা হইতে পারে না । নীলিমার মন হইতে তাহার সকল সাধ সব আশা মুছিয়া যায় । মিষ্টার ওকবর্ণ দিনের পর দিন হতাশা লইয়া ফিরিয়া যান ।

এক দিন—সে দিন মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার পাঠ-সমাপ্তির পর যথাপূর্ব্ব তাহার খুঁটান হওয়ার সপক্ষে ঝাড়া দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পরও তাহাকে সংশয়চ্ছন্ন ও চিন্তাকুল দেখিয়া খুব জোর করিয়া ধরিলেন, বলিলেন, “তুমি হিন্দুধর্ম্মে নিজের শ্রদ্ধা নাই বলিতেছ, অথচ খুঁটান হইতেও চাও না, —ইহার ভিতরকার কথাটা কি আমার বলিবে ? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে । সম্ভবত অ্যাফেয়ারস্,—আই থিন্ক ?”

এই সুস্পষ্ট বুদ্ধবোধগায় নীলিমা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল ।

মিষ্টার ওকবর্ণের মুখের উপর সত্যতত্ত্বাবিকারের একটা হর্ষের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে উঠিতে সহসা মধ্যপথেই বাতাহত দীপশিখার মতই সেটা নিবিয়া গেল । তিনি সন্দেহগস্তীরমুখে অনুসন্ধিৎসুনেত্রে কণকাল নীলিমার নতমুখে চাহিয়া থাকিয়া পরে অল্প মুহূর্ত্তে কহিলেন, “আমার সন্দেহই তবে সত্য, মিস্ চক্রবর্তী ?”—তাহার পর তথাপি তাহাকে বাক্যহার্য্য ও প্রতিবাদবিমুখ দেখিয়া সহসা মিষ্টার ওকবর্ণের গুত্র মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার স্বর উত্তেজিত এবং আবেগপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল । তিনি কহিয়া উঠিলেন, “ও, না—না, ও সকল পূর্ব্বদুর্কলতা মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেল । ‘লেট্ দি ডেড্ পাষ্ট্ বেরি ইটস্ ডেড্, এণ্ড অ্যাঙ্কি অ্যাঙ্কি, ইন্ দি লিভিং প্রেজেন্ট্, হার্ট্ উইদ্বিন এণ্ড গড্ ওভারহেড্ ।’—অতীত বিন্ধুত হও এবং ঈশ্বরের কার্য্যে মনোনিবেশ কর, বিগতের পানে আর ফিরে চেও না, মিস্ চক্রবর্তী !”

নীলিমা তথাপি নিরুত্তরেই রহিল । মিষ্টার ওকবর্ণের মর্ম্মস্পর্শ বাক্যগুলো তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গস্তীর বেঘমল্লাঘ্নে সঘনে বাজিয়া উঠিতেছিল ।—‘লেট্ দি ডেড্ পাষ্ট্ বেরি ইটস্ ডেড্ ।’—‘ডেড্ পাষ্ট্ ।’—তাহার অতীত তাহার কাছে

তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু নয় । মৃত—একেবারেই মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন-নিবন্ধ—নিঃসার,—প্রাণহীন । কি আছে তাহাতে ? এতটুকু রূপ রস গন্ধ তাহার মধ্যে আছে কি ? না, না—পিছনে ফিরিয়া চাহিবাক্ষ্য মত তাহার কোথাও কিছু বাকি পড়িয়া নাই । তবে সে কিসের মোহে অন্ধ হইয়া এই “লিভিং প্রেজেন্ট্”কে, এই আশা-আনন্দ-সুখসম্মে ভরা জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করিতে পারে ? ইহাদের অবহেলায় ফিরাইয়া দিয়া সেই মৃত অতীতকেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে ? কি আছে তাহার মধ্যে ? কে আছে তাহার সঙ্গে ?—সহসা নীলিমার চিন্তাকুল সমস্ত অন্তরকে মথিত ব্যথিত করিয়া তাহার মাঝখানে ফুটিয়া উঠিল একখানা মুখ—সে মুখখানা সুশীলের । অতীত তো তাহার মরে নাই । সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাপানে অমর হইয়া আজও দেহ-বিচ্ছিন্ন রাহুর মন্তকের মতই মৃত্যুঞ্জয়রূপে বাঁচিয়া আছে । কই, মরণের কূল হইতে এই নবজীবনের মাঝখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তো তাহার মনের এই সমুজ্জল স্মৃতিটুকুর এতটুকু উজ্জ্বল্য নাশ বা হ্রাস হয় নাই ! এ যে তেমনই সুন্দর—তেমনই ভাস্বর হইয়াই আজিও অনিমেঘে জাগিয়া আছে । এই চিন্তায় নীলিমার চিত্ত বেন চন্দ্রোদয়ে ক্ষীতবন্ধ জলধির মতই সুখোদ্বেল হইয়া-উঠিল । তাহার অন্তরের সেই সুখস্রোতের তরঙ্গ তাহার বাহিরের ও সারা দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল । তাহার বকের সেই সুধাসিকুর আলোড়নে তাহার সুপুষ্ট গণ্ডর্য্য সরস রক্তিমায় সমুজ্জল হইয়া উঠিল, সেই সুখস্মৃতির স্মরণমাত্রে তাহার চির-হাস্তবিরহিত অধরপ্রান্ত স্নিতহাস্তে উদ্ভাসিত হইয়া রহিল তাহার নেত্রকল সলজ্জ জড়িমায় অবনত হইয়া আসিলেও তাহার মধ্য দিয়াও সুকোমল দীপ্তি বিভাসিত হইতে লাগিল ।

আইরিশ যুবকের আরক্ত মুখ তাহার সমুখবর্ত্তিনীর আনন্দস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ গুত্রতর হইয়া গেল । সুখস্মৃতির আন্দোলনে হর্ষদীপ্ত সেই সমুজ্জল ও সলজ্জ মূর্ত্তি তাঁহার বকের মধ্যে একটা বেদনার আঘাত প্রদান করিল । সংশয় নিশ্চিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল । তিনি কণকাল নিকর্য্য মুগ্ধনেত্রে নীলিমার অপূর্ব্ব লজ্জাশ্রীবিমণ্ডিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কণপরে ঈষৎ ঈর্ষ্যা-বিদগ্ধ শ্লেষের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি বাহার কথা খান করিয়া ঈশ্বরের ডাক

কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিন কর্ণপাত করিবে বলিয়া আশা কর ?”

এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া মিঃ ওকবর্ণ পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, “আমার মনে হয় যে, সে বিষয়ে তোমার চিন্তেও নিশ্চয় কিছু সন্দেহ আছে। নিশ্চয়ই তাই—নতুবা তুমি সে দিনের সেই অগ্নি-বৃষ্টির মধ্যে কখনই অমন করিয়া অনাহার-ক্লেশ, চলচ্ছক্তিহীন, অসহায় ভাবে মরণের সমুদ্রত আলিঙ্গনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে না। সম্ভবতঃ তোমায় প্রণয়ী (ইওর-লাভার) পিতৃব্যসল, পিতার দয়াজীবী (ফাদারস্ চ্যারিটি-বয়) তোমায় বিবাহ করিলে ঘোতুক পাইবে না বলিয়া কোন দিন তোমায় সে তার পিতার অনিচ্ছায় বিবাহ করিবে না—সম্ভবতঃ সে তোমায় ভালবাসেও না, অন্তরে প্রেমে হয় তা তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া আছে—সেই অল্প-পরায়ণ, অথবা ভীক, অথবা তোমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন—একটা অযোগ্য নরের জন্ত তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শুধুই অবস্থা বিলম্ব করিতেছ না—সংশয় করিতেছ, ইহা তোমার একান্ত সন্ধীর্ণ-চিত্ততা এবং ইহার শাস্তিও তোমায় ঈশ্বরের নিকট হইতে অবশ্য পাইতে হইবে।”

নীলিমার সেই বর্ণ-সমুজ্জ্বল আনন্দম্রাত মূর্তি ঘোর বিষাদের আলিমায় লিপ্ত হইয়া একান্ত মলিন হইয়া গেল। ‘অন্তরে প্রেমে চিত্ত তাহার পরিপূর্ণ হইয়া আছে’,—তা আছেই তো! স্নেখাই তো তাহার সব। নীলিমা তাহার কে? সেই স্নেখার জন্তই গাত্র-হরিদ্রা অধিবাসের পরেও বিবাহ-রাত্রির মন্ত্রপাঠ করেকটামাত্র বাকি রাখিয়া সে উল্লসিত চিত্তে তাহার উদ্দেশ্য ছুটিয়া পলাইয়াছে। আর সে মুক্তি লইয়াছে কাহার হস্ত হইতে? শতবার চিন্তিত এই অসহনীয় বাথিত চিন্তা আবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া নীলিমার সমস্ত আনন্দ-উৎসের মুখগুলাকে নিশ্চয় করিয়া চাপিয়া ধরিল। হায় স্নীল! এতটুকু ভালবাসা যদি তাহার জন্ত তোমার হৃদয়প্রান্তে পড়িয়া থাকিত! এতটুকু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, কিছুই কি, এক বিন্দুও কি ছিল না? বিন্দুমাত্র না? না, না—তা থাকিলে কেহ কি তেমন করিয়া কাহাকেও ফেলিয়া যাইতে পারে? ওঃ স্নীল! স্নীল! কি নির্ধুর, কি কঠোর তুমি! তোমার স্নেখা—যাক, বুঝা কেন আর ভাবনা? বাহা গিয়াছে, তাহা

চিরদিনের মতই তো চলিয়া গিয়াছে। বাহা চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা কখনই ফিরিবে না। তবে কেন বুঝা সেই হ্রাশা-স্বপ্নের ধ্যানে মরীচিকার সন্ধানে আকাশকুসুমের কল্পনার সারা জীবনটাকেই মিথ্যা অপব্যয় করিয়া ফেলা?

মিষ্টার ওকবর্ণের বাস্তবতা তীব্রবাক্য কাঁটার মতই নীলিমার মনের বুকে বিধিয়া উঠিল—‘তুমি যার কথা ধ্যান করে ঈশ্বরের ডাক কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিনই কর্ণপাত করিবে আশা কর?’ না, কোন দিন না।—কোন আশা নাই—কোন আশাই নাই! ওঃ স্নীল! স্নীল! স্নীল! কেন তুমি এমন নিশ্চয় হইলে? কেন তোমার চিত্ত স্নেখাময় হইয়া রহিল? যদি স্নেখার সহিত তোমার কোন দিন দেখা না হইত, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহের বাগদান না থাকিত, তবে হয় তো বা তুমি আমায় অমন করিয়া অবহেলা করিতে পারিতে না; অথবা তাহাও হয় তো করিতে, যেহেতু, তুমি ধনীর সন্তান—আমি গরীবের মেয়ে। উঃ স্নীল! কেন তুমি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলে?

গভীর নৈরাশ্রের অনিবৃত্ত হাহাকারে নীলিমার বক্ষ যেন দীর্ণ হইতে চাহিতে লাগিল। মিষ্টার ওকবর্ণের শ্লেষোক্তিগুলি তাহার গুপ্ত-হৃদের আচ্ছাদন বড় নিশ্চয় হস্তেই ছিড়িয়া দিয়াছিল। ইহাতে তাহার কল্পনাসরস চিন্তাধারা আবরণমুক্ত কঠোর সত্যের নগ্ন-মূর্তি যেন ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং ঈর্ষ্যা, শোক ও নিরাশায় প্রাণ সহস্রধা হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন নীলিমার চিত্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল! স্নীলের প্রতি মনে পাছে কোন বিরাগ দেখা দেয়, সেই ভয়ে সে পূর্বে তাহার কথা ভাল করিয়া স্মারিতেও ভরসা করিত না। মাত্র তাহার স্নন্দর মুখ, তাহার স্নেহের বাণী—তাহার আদরের সম্ভাষণ এইটুকুই স্মরণে আনিয়া নিজের অন্তরকে সুখপ্রদীপ্ত রাখিতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। কিন্তু মিষ্টার ওকবর্ণের সহিত সে দিনের সেই আলোচনার পর সেই আবরণের পর্দাখানা অকস্মাৎ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মনকে এখন আর আঁখি ঠারিয়া রাখিলে

চলে না। সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় আর তার হাতে নাই। সুশীলের স্মৃতিতে আর তাহার মনে সুখের লেশ জাগে না—জাগিয়া উঠে প্রচণ্ড ব্যথা-ভরা তীব্র অভিমান। স্বার্থপর ভীকৃ কাপুরুষ সে—তাহাকে বিপন্ন করিয়া তাহারই হাতের মুক্তি লইয়া চোরের মতন পলাইয়া গেল। কি যুগা! ছি, ছি, নীলিমার কে সে যে, নীলিমা তাহার কথা ভাবিবে? তাহার বুখা চিন্তায় নিজের জীবনকে চির-ব্যর্থতার হস্তে তুলিয়া দিবে? এ কি বুদ্ধিলেশ তাহার? না, না, এ তাহার দুর্বুদ্ধি; এ দুর্বুদ্ধি যেন কখন না হয়।

মিষ্টার ওকবর্ণ একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার দিদির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ক্লারা ওকবর্ণ নিজেও নীলিমাকে অনেক আশার বাণী শুনাইলেন। খুষ্টানের পরমার্থ যে সুরক্ষিত, তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রলোভন নীলিমা দেখিতে পাইল এবং ইহলোকটাকেও তাহার এখন আর পূর্বের মত তুচ্ছ বোধ হইল না। সে খুষ্টান হইতে এইবার কৃতনিশ্চয় হইল।

এই উপলক্ষে লালকুঠীতে একটু আনন্দ-সমারোহ পড়িয়া গেল। এখানকার দাসদাসী এবং অনাথা মেয়েরা, তাহাদের শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই এই কয় মাসের মধ্যে নীলিমাকে বিশেষভাবে মেহ করিয়াছিল। এত দিন তাহাকে একটু পর পর বোধ করিয়া সকলেই কিছু সঙ্কুচিত থাকিত, এখন তাহাদের মনে হইল, সে যেন তাহাদের আপন জন হইয়া গেল। মিষ্টার ওকবর্ণ আজ কয়দিন হইতে এতদুপলক্ষে এতই আনন্দোত্তেজিত হইয়া আছেন যে, তাহা দেখিয়া নীলিমার অবসাদগ্রস্ত চিত্তেও সময় সময় একটা বিস্ময়-কৌতূহলের উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

যথাকালে শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নীলিমার প্রাণ তাহার অন্তরের মধ্যে তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। উর্দ্ধস্বরে সে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বলিয়াছে—সুশীল! সুশীল! সুশীল! কোথা তুমি? কোথা তুমি? দেখ, জন্মজন্মান্তরের মতই আজ আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম! আর সে শুধু তোমারই জন্ত! তুমি যদি আমায় এক বিন্দুও ভালবাসিতে! যদি অভাগিনী বলিয়া—অত্যাচারিতা অনাদৃত্য দেখিয়া তোমার সুখস্পর্হচিত্তে এতটুকু ত্যাগের মহত্ত্ব দেখা দিত, তাহা হইলে আমার আজ এমন করিয়া তোমার

কাছে পরের অপেক্ষা পর হইতে হইত না। ইহজীবনে নাই হোক, তবু পর-জীবনে, পরলোকে তোমার পাইবার আশা লইয়া সেই সাধনাতেই এ জন্মটা না হয় ক্ষম করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা তো হইল না। আমার জন্ত তোমার অন্তরে বা বাহিরের কোথাও এতটুকু তিলমাত্র স্থান নাই—বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই—আমার জীবনের মূল্য তোমার কাছে কাণা কড়িও নয়! আমার মৃত্যু তোমার পক্ষে তুচ্ছ অপেক্ষাও তুচ্ছ বস্তু। তবে আমিই বা কেন অনর্থক চিরদুঃখকেই শুধু বরণ করিব? নিজের মঙ্গল-চেষ্টা কে না করে?

কিন্তু দুঃখকে ত্যাগ করিব মনে করিলেও সেই চিরসার্থী হুশিষ্টা নীলিমাকে ত্যাগ করিল না। সুশীলের চিন্তাতে আজও তাহার চিত্তে ক্ষণিক সুখপ্রদীপমাত্র জলিয়া উঠে, আর সবই যেন তেমনই অন্ধকার। আর সেই সুখচিন্তাটুকুও আজ সম্মুখ সঙ্কোচ-মলিন, লজ্জা-প্রিয়মাণ। নীলিমা যতই তাহার হৃদয়স্থিত সুশীলমূর্ত্তিকে তাচ্ছিল্য অবহেলায় দূরে সরাইয়া দিতে যায়, ততই যেন তাহা দৃঢ় হইয়া বসিয়া স্বতঃই আপনার পূজা আহরণ করে। আর সে পূজার অধিকার আজ নীলিমার নাই—প্রাণ তাহার হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে। তাই নূতন জীবনে বিবিধ সুখের উপাদান সত্ত্বেও সে সুখ পায় না।

জর্জ ওকবর্ণের যত্ন আদর দিন দিন যেন সীমাহারা হইয়া উঠিতে লাগিল। মিস্ ওকবর্ণের পীড়া বৃদ্ধির জন্ত তাঁহার করাচি ফিরিয়া যাওয়া ঘটয়া উঠিতেছিল না। সহসা একদিন বর্ষায়সী মিস্ ওকবর্ণের পীড়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর এ ঘটনায় সকলেরই অপেক্ষা অধিকতর ভীত হইল নীলিমা।

অক্লান্ত সেবা ও চিকিৎসার ফলে আয়ুমান্ ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু আয়ু যাহার নাই তাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। মিস্ ওকবর্ণের পবিত্র জীবনদীপ দিনে দিনে নির্ঝাঁগোশুখ হইয়া আসিল। মহা ভয়ে নীলিমা অনাহারে অনিদ্রায় দিব্যাত্রি তাঁহার শয্যাপ্রান্ত আশ্রয় করিয়া রহিল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া জীবন ও আশ্রয়দাত্রীর গুণ্ধায় অন্তরের অজস্র কৃতজ্ঞতা-ধারা সে ঢালিয়া দিতে লাগিল, ফল কিন্তু কিছুই হইল না।

এক দিন মিস্ ওকবর্ণ নীলিমাকে তাঁহার পার্শ্বে একা পাইয়া ক্ষণকণ্ঠে কহিলেন, “নেল! আমার মৃত্যুর পর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?”

নীলিমার যত্নবদ্ধ অশ্রুশাশি এই কথার একান্ত উদ্ভাস বেগে উথলিয়া উঠিল। অশ্রুর বজ্রাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া সে শুধু অর্ধফুটস্থরে উত্তর দিল,— “আমি তা’ জানি না।”

মিস্ ওকবর্ণের রোগযন্ত্রণামলিন শুষ্ক অধরে স্নেহের মুহূ হস্ত ফুটিয়া উঠিল, তিনি নীলিমার অশ্রু-আবেগে বিকম্পিত দেহে ক্ষীণ হস্তাবমর্ষণ করিয়া স্নিতমুখে কহিলেন, “শান্ত হও বৎসে! তুমি বালিকা, তোমার সম্মুখে অপার সংসারসমুদ্র প্রবাহিত, একা অসহায় ইহাতে পার হওয়া বড়ই কঠিন। যদি আমার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা কর, তবে আমি বলি, তুমি ইহার সহায়-রূপে এক জন সঙ্গী লইও। বিস্মিত হইতেছ? সঙ্গী হিসাবে আমি বলিতেছি স্বামী—যিনি তোমার সকল কার্যের সহায়ক ও রক্ষাকর্তা হইবেন।”

নীলিমার পতনশীল অশ্রুনিঝর সহসা যেন অচল-তার হাওয়া লাগিয়া নিথর হইয়া গেল। ক্ষণকাল তাহার বাস্তব-নিষ্পত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ধীরতর বিস্ময়াভিভূতভাবে কহিল, “আমায় আপনি বিয়ে করিতে বলছেন? আমি যদি বিয়েই করবো, তা হ’লে নিজের সমাজ, ধর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করে এখানেই বা রইলুম কেন? বিয়ে করিতে আমায় আপনি আদেশ করবেন না।”

মিস্ ওকবর্ণের নিম্প্রভ মুখ এই উত্তরে চিত্তাশ্রয় দেখাইল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্বক কিছু হুঃখিত স্বরে কহিলেন, “নেল! আজ আমার আর কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিয়া আশ্রয় বা পর কাহাকেও প্রবঞ্চনার দিন নহে, সরলভাবে সত্যকে স্বীকার করাই আজ আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তাই আমি বলিতেছি,— তোমার মত রূপসী ও তরুণীর পক্ষে সকল সমাজেই বিবাহ আশ্রয়কার প্রশস্ত উপায়। অবশ্য, আমি যদি বাঁচিয়া থাকিতাম, তবে অবস্থা অন্তরূপ হইতে পারিত। এখন তোমায় আর তেরনি ভাবে কে রক্ষা করিবে? তোমার সমাজও করিবে না, আমার সমাজও করিবে না। তাই আমার পরামর্শ লও, যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, বিনা বিধায় তাহা গ্রহণ করিত কুঠা বোধ করিও না। জানিও—

সুযোগ মনুষ্যজীবনে দুইবার আইসে না, কদাচিৎ একবার দেখা দেয় মাত্র।”

এ অবাচিত উপদেশের প্রকৃত অর্থবোধ সে দিন নীলিমা করিতে পারে নাই। তাই সে নীরবেই রহিল। তাহার মৌনকে সম্মতিলক্ষণ বোধেই বোধ করি অতঃপর মিস্ ওকবর্ণ তাহার সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা-হুতব করিয়া আর এসম্বন্ধে কোনই আলোচনা করিলেন না। কেবল মাত্র মৃত্যুর পূর্ব দিবসে তিনি তাঁহার ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার মায়ের যে চেন-ছড়া আমি ব্যবহার করিতাম, সেটি তোমার ভাবী বধুর জন্ত তোমায় দিয়াছি, তাহা আনিয়া আমার সাক্ষাতে তুমি নীলিমাকে পরাইয়া দাও।”

নীলিমা কুণ্ঠিত ভাবে এ দান গ্রহণ করিলে আশী-র্বাদ করিয়া মিস্ ওকবর্ণ কহিলেন, “আমার মার মতন গুণবতী হইও।”

জর্জ ওকবর্ণ ভগিনীর হাত ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, “আর এই ক্লারার মত।”

নীলিমা নীরব কৃতজ্ঞতার মস্তক নত করিল।

* * * *

মিস্ ওকবর্ণের মৃত্যুর পর কয়েক দিন নীলিমা একান্তই শোকাভিভূত হইয়া রহিল। এক রকম সে শয্যা-গ্রহণই করিল। এই ঘটনায় নিজের মরা মায়ের শোক যেন এত দিনে সে ভাল করিয়া অনুভব করিতেছিল! আবার যেন সমস্ত জীবনটাই তার শূন্যময় হইয়া পড়িল। সব যেন এলো-মেলো ও বিপর্যস্ত।

নীলিমাকে আত্মচিন্তায় ফিরাইয়া আনিল দুইজন। ইহার মধ্যে প্রথম ধাক্কা খাইল সে মিস্ গোল্ডেনরীচের কাছে। এই মহিলাটি সম্প্রতি লাল কুঠীর প্রধান কত্রীরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফেরৎ হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে পদার্পণ করিয়াই সর্বপ্রথম তাঁহার চোখে ঠেকিল নেটিবের মেয়ের আধিপত্য! মিস্ ওকবর্ণের পার্শ্বে ঘরে সম্পূর্ণ যুরোপীয় সাজ সজ্জায় সজ্জিত উত্তম গৃহে নীলিমার বাস এবং জর্জ ওকবর্ণ ও যুরোপীয় সহকারিণীর সহিত তাহার একত্র পান ভোজন মিস্ গোল্ডেনরীচের নিকট একান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত স্পর্দান্বচক বোধ হইল। ফলে জর্জের সহিত এ লইয়া তাঁর কিছু কলহও হইয়া গেল। সহকারিণী মিস্ প্যাক্ উড মিস্ ওকবর্ণ ও জর্জের উপর ইহার সমস্ত দায়টা চাপাইয়া দিয়াও অবশ্য সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না। এ সকল ঘণ্য সংসর্গ জোর করিয়া

তাহার ছাড়ানো উচিত ছিল, নতুবা কর্মে ইস্তফা দেওয়া সম্ভব—ইত্যাদি যথেষ্ট কঠিন তিরস্কার সহিয়া তাহার মন নীলিমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমন কি, যে সকল দাসদাসীরা এত দিন নীলিমার প্রতি একান্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল, কত্রীর মনোভাবের অনুবর্তনে তাহারা পর্যন্ত তাহাকে নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখিতে লাগিল। নীলিমার এখন সর্বত্র হইতে পদে পদে তাঁর তিরস্কার অবমাননা লাঞ্ছনা উপভোগ আরম্ভ হইল। তত বড় সুখের পরক্ৰমেই একসঙ্গে সর্ববিধ দুঃখ এবার নীলিমাকে যেন আবার অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতে লাগিল। সে বারংবার বিস্মিত হইয়া ভাবিল, তবে কি সকল সমাজেই তাহার পিতৃ-আদর্শ বর্তমান? তবে কি খৃষ্টান-সমাজেও হিন্দুসমাজের মতই সঙ্কীর্ণচেতার অভাব নাই?

সে দিন মিস্ গোল্ডেনরীচ নীলিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নীলিমা আসিয়া পূর্বের অভ্যাসমত অভিযান-শেষে একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিতে বাইতেই তিনি ভীষণমূর্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে যথেষ্ট কটু ভাষা প্রয়োগ করিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, “মিস্ ওকবর্ণ তোমায় ভয়ানক অসঙ্গত প্রশ্ন দিয়া গেছেন, দেখিতেছি। নন্দমার নোংরা জলকে তিনি পান করবার আধারে তুলে রেখে গেছেন। আর তাঁর স্বজাতীয়েরাও এখন পর্যন্ত তাঁর সেই নিষ্কণ্টক কার্যের পোষকতা করিতেছে! আমার মনে কর্তেও শরীর শিহরিতেছে যে, আমি এক জন নেটিব নিগারের সঙ্গে একত্র এক বাড়ীতে বাস করিতেছি। তুমি যদি এখনও ভাল চাও, অরুণোজের যে কোন কামরা ঠিক করিয়া লইয়া এই মুহূর্তে উঠিয়া যাও।”

নীলিমা সে দিন অশ্রুভারাতুর চক্ষে ও গভীর আহত চিত্তে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একখানা সুকোমল কুসুম আঁটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। একবার সে অশ্রু-অন্ধ নেত্র চারিদিকে ফিরাইয়া তাহার এই কয় মাসের আশ্রয়, তাহার নবজীবনের স্থিতি-সুখ-ভরা গৃহস্থালীর সমুদয়টি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। স্নেহ-করণাময়ী মিস্ ওকবর্ণের কথা মনে আসিতেই দুই চোখ দিয়া তাহার পাহাড়ভাঙ্গা বরণাধারার মত অজস্র অশ্রু-নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। যে সুখের, যে সম্মানের স্বাদমাত্র সে কোন দিন অনুভব করে নাই, তিনি যে অবাচিত করুণায় তাহাকে অপরিপাণ্ডুরূপে

তাহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একবার এই সম্মান ও ভোগৈশ্বর্যের আশ্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনশ্চ সেইখানেই আবার দুঃখের ও অসম্মানের মধ্যে অবনত হওয়ার মত অপমান ও দুঃখ তাহার যেন অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। তাহার জীবনে যে সুখস্বপ্না আজও একান্ত প্রবল হইয়াই রহিয়াছে, কোন সাধই তো তাহার আজও পর্যন্ত ভাল করিয়া মিটে নাই।

“আমি কি ভিতরে বাইতে পারি?”—এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়াই জর্জ ওকবর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নীলিমা ইতোমধ্যেই ত্রস্তে নিজের মুখের অশ্রুচিহ্ন-মাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে, তাহার চোখ দিয়া তখনও অশ্রুবিন্দুর পতন সে নিবারণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিষ্টার ওকবর্ণ নিকটে আসিয়া নীলিমার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন—“কান্দচো তুমি নেল? কান্নার কিছু কারণ নাই—আমার বোনের কিছু টাকাকড়ি এখানে ছড়ানো ছিল, তারই জন্ত আমার এ কয় দিন বিলম্ব হলো, না হ’লে তো এত দিন আমরা এখান থেকে চলেই যেতাম। এখন সে সব মিটে গেছে, আগামী কল্য আমরা যেতে চাচ্ছি।”

নীলিমা ভয়চকিত নেত্রে চমকিয়া জর্জের প্রতি ফিরিল, তাহার মুখ দিয়া আন্তর্ভাবে বাহির হইয়া গেল,—“আপনিও আমার এখনই ছেড়ে চলে যাবেন?”

নীলিমার মনে হইল, তাহার বর্তমান অবস্থা যেন সেই চিরপুরাতন দিনেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! সেই নিরাশ্রয়, নিঃস্বর্ণ ও অসহায় সে একা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবল তাহার পূর্বের সেই আত্মসম্মানটুকুই আর তার মধ্যে বর্তমান নাই—যাহার বলে নিজেকে সে এক দিন সুনীলের উপরেই স্থান দিতে পারিয়াছিল। আজ সে স্বধর্মত্যাগী, পরপদলেহী, পরের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। মন তাহার যেন কোন অন্ধকারের ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে।

জর্জ ওকবর্ণের গান্ধীধামস্ব মুখমণ্ডলে সহসা আনন্দের স্মিতরশ্মি প্রতিভাত হইল। তিনি প্রকল্প-স্মিতমুখে কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “তোমার ছাড়িয়া বাইব, সে কথা তো আমি বলি

নাই নেল? ‘আমরা’ কথায় তুমি শুধু আমার সহিত যাইবে, ইহাই কি বুঝায় না? তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব?”

নীলিমা বিস্মিত স্মিতমুখে ক্ষণকাল তাহার প্রাণ-দাতা বিদেশী যুবকের আনন্দ-বিকশিত মুখে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিয়া পরে কিছু কুণ্ঠাবিজড়িত বাক্যে কহিল, “আমায় কি আপনি এখান হইতে অত্র কোন মিশনে আশ্রয় দিয়া দিবেন? কোথায় আমার লইয়া যাইবেন?”

মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার চেয়ারের পাশে অপর চৌকিখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, “কোথায় নিয়ে যাব জিজ্ঞাসা করছো কেন নেল? আমার মিশনের বাড়ীতে আমার গৃহেই তোমায় আমি প্রতিষ্ঠা করিতে নিয়ে যাব। সেইখানে পৌছেই তো আমাদের বিবাহ হবে।” এই বলিয়াই জর্জ নীলিমার একখানা হাতে টানিয়া লইয়া তাহার করতলে সাগ্রহ চুম্বন করিলেন।

নীলিমা আচম্কা একটা অর্ধস্মৃতি ধ্বনি করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; বর্ষ্ঠা, জিহ্বা, ওষ্ঠ বাক্যচ্চারণে তাহাকে সাহায্য করিতে যেন একান্তই অশক্ত বোধ করিতেছিল, তথাপি কল্পিত, রুদ্ধ ও বিজড়িত স্বরে সে কোনমতে কহিয়া ফেলিল,—“এ কি অসম্ভব ও অসম্ভব প্রস্তাব মহাশয়?”

জর্জও এই কথায় যেন ঈষৎ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাহার সুনীল স্বচ্ছ চোখে সে বিস্ময় স্পষ্ট হইয়া উঠিল, কণ্ঠেও তাহা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, “আমি তো কোন অসম্ভব বা অসম্ভব নূতন প্রস্তাব তোমায় জানাইতে আসি নাই নেল! আমার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যায় যে প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করিয়া আমার সাহসী করিয়াছিলে, আমি সেই স্থিরীকৃত বিষয়েরই পুনরালোচনা করিয়াছি মাত্র। তুমি তো এ বিবাহে তোমার অসম্মতি জানাও নাই এবং সে দিন আমাদের মায়ের স্মৃতিপুত অলঙ্কার গ্রহণে আবেদন গ্রহণও তো করিয়াছিলে, তবে এ কয়দিন তোমায় নিতান্ত শোকাবুল দেখিয়া এ বিষয়ে আমি কোন কথা কহি নাই।”

নীলিমার এখন সে দিনের সকল কথাই অর্থগ্রহ হইল, “যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, তবে বিনা বিধায় তাহা গ্রহণ করিও।” সেই উপযুক্ত

স্থানের লক্ষ্য ছিলেন তাহা হইলে ইনিই? নীলিমার সর্বশরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। তবে কি তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে—বিদেশীয় বিজাতীয় বিভিন্নভাষাভাষী এই খৃষ্টধর্মপ্রচারক পাদরীকে? হিন্দুর মেয়ে হইয়া সে এক জন আইরিশকে বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রী হইবে? নিজের দেশ, নিজের জন সকলই তাহার চিরদিনের মত সত্যসত্যই পর হইয়া যাইবে? নীলিমার চোখ ফাটিয়া যেন জল আসিতে লাগিল।

তাহার পর আবার তাহার মনে হইল, কিন্তু তাহা ভিন্ন আর তার উপায়ই বা কি? তাহার এমন একটা আশ্রয়ও তো চাই। সে খৃষ্টান, কোন হিন্দু তো তাহাকে আর বিবাহ করিবে না? যদি বিবাহ করিতে হয় তো খৃষ্টানকেই করিতে হইবে। কোন ভদ্রবংশীয় দেশীয় খৃষ্টানের পক্ষেও অনাথা নিরাশ্রমকে বিবাহ করিবার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে এই পরম রূপবান্ ভদ্রবংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত ধার্মিক আইরিশ যুবকের প্রস্তাবগ্রহণই কি ভাল নহে? তাহার মনে পড়িল, ‘সুযোগ বহুযজ্ঞী’ দুইবার আসে না, কদাচ একবার দেখা দেয়।’ তাহা সত্য! আজ জর্জকে ছাড়িলে কা’ল যে সে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহারই তো একটা স্থিরতা নাই! বিশেষ তিনি তার প্রাণদাতা।

নীলিমাকে নির্বাকু দেখিয়া জর্জ একটু অসন্তোষের সহিত কহিয়া উঠিলেন, “আবার সেই বিধা নেল! আমি দেখিতেছি, তুমি এখনও তোমার সেই বিধর্মী পূর্ব প্রণয়ীকে ভুলিতে পারিতেছ না! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই মিছামিছি পশ্চাতে চাহিয়া তোমার লাভ কি? তুমি কি জান না যে, হিন্দুরা খৃষ্টানদিগকে কত বেশী ঘৃণা করে? সে কি আর তোমার হাতের ছোয়া জল খাইবে?” তোমায় ছুঁলে হয় তো সে এখন গল্গলান করিবে।”

ঈর্ষাকণ্ঠের নেত্রে জর্জ ওকবর্ণ নীলিমার সহসা পাণ্ডু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে আহত বুঝিয়া মনে মনে কিছু উল্লসিত হইল। তাহার মনের ভাবটা এইরূপই হইতেছিল যে, একটা ড্যাম নেটিবের স্মৃতি আর মন হইতে মুছা যায় না? এ কি রকম মন?

কিন্তু জর্জের এই স্বেচ্ছাচক বাক্য নীলিমার সংশয়-বিধাগ্রস্ত অন্তরে বিরুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করিল।

তাহার সমস্ত মনটা যেন এই কথায় হু হু করিয়া জলিয়া উঠিল। কথাগুলো যে নির্ঘাত সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায়মাত্র না থাকিলেও তাহার অন্তর-পুরুষ যেন ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সুশীল তাহার হাতের ছোয়া খাইবে না? তাহার দেহে অঙ্গস্পর্শ হইলে সে গঙ্গানান করিবে? উঃ, উঃ, ভগবান! এ কি অবস্থা তাহার! এ কি ভীষণ দুঃস্বপ্নের পক্ষে সে নিজেকে বিজড়িত করিয়াছে! আর সেই কথা—তাহার পক্ষে সেই মর্মভেদী—প্রাণঘাতী বার্তা তাহাকে হাসি-মুখে শুনাইতেছে কে, না, এক জন পরদেশী!

নীলিমার হৃদয়-প্রাণ তারস্বরে তীব্র অস্বীকার করিয়া উঠিল—না—না—না,—সুশীলের ঘৃণাই সে কোনমতেই হইতে পারিবে না!—সে ঘৃণা যে তাহার পক্ষে অসহনীয়। সুশীলকে সে ভুলে নাই। সুশীলকে সে কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না—কখনও না—সুশীল! সুশীল!—সুশীল! ওঃ, সুশীল!

নীলিমার সর্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, যামে তাহার সমস্ত অঙ্গবস্ত্র ভিক্রিয়া উঠিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া যন্ত্রণার্ত্ত অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। মিষ্টার ওকবর্ণ অবাক হইয়া স্তম্ভিত-নেত্রে তাহার সেই মানসিক দুর্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন। মনের মধ্যে তাঁহার সুপ্রচুর উদ্ভা জন্মিতে থাকিলেও কিন্তু অতখানি ব্যাকুল কাতরতার প্রতিবাদে তিনি তাঁহা প্রকাশ করিতেও সমর্থ হইলেন না।

বহুকণ পরে নীলিমা যখন কতকটা সংযত ও শান্ত হইতে পারিল, তখন অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া সে সুস্পষ্ট দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, “আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনার অহুগ্রহ লইতে পারিলাম না। আপনার অহুমানই সত্য, আমি তাহাকে ভুলিতে পারি নাই, —আর কখনও তাহা পারিব না।”

মিষ্টার ওকবর্ণ সম্মোহিত বিরক্তিতে অধর দংশন করিলেন, অপ্রসন্ন নীরস কণ্ঠে কহিলেন, “তুমি কি তাহাকে পাইবে আশা কর?”

এ বিজ্ঞপের কঠোর আঘাতে নীলিমার গভীর বিষাদাচ্ছন্ন চিত্ত ঘন ছায়ে কালো মেঘে ছাইয়া উঠিল। আসন্ন বর্ষাশেষ জলধারার মতই সুপ্রচুর অশ্রুগাঢ় ভগ্নস্বরে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “না, কিন্তু

তাহার স্মৃতির পূজা তো করিতে পারিব। তাহাতে তো কেহ বাধা দিতে পারিবে না।”

“তাহাতে আমি বাধা দিব।—এক জন বিধর্মীর ‘স্মৃতিপূজা’ করা খৃষ্টানের ধর্ম নহে। তুমি যে এখন আর হিন্দু নও, সে কথা তোমার স্মরণ আছে কি? তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে আমি বাধা, সে জন্ত আমার তুমি ক্ষমা করিও।”

ব্যাধ-বাণাহতা অন্তর্বিদ্ধা বিহঙ্গীর মতই নীলিমা এই নির্ঘাত বাক্যবাণাহত হইয়া বুরিয়া পড়িতে গেল। কি ভয়ানক কথা! ‘বিধর্মীর স্মৃতিপূজা’ আজ তাহার ধর্মহানি হইবে! আর সে বিধর্মী কে? না, সে সুশীল!—ওঃ, ওঃ, ভগবান! এ কি হইল!

মিষ্টার ওকবর্ণ তীব্রদৃষ্টিতে নীলিমার মরণাহত মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “বিধর্মীর ‘স্মৃতি-পূজা’ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত খৃষ্টানের কার্য্য কর, প্রভুর আহ্বানে কর্ণপাত কর। আমি তোমার প্রাণদাতা, সে প্রাণে আমারই আজ সম্পূর্ণ অধিকার, আর কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। সে প্রাণ তুমি আমাকেই সমর্পণ করিয়া আমার সহিত একাত্ম হও। ইহা হইতে তুমি ত্রাণতঃ বাধ্য কি না বল? বাস্তাবধি আমি মিশনের কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি। বিবাহে আমার কোন দিনই অভিক্রুচি ছিল না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিশিয়া আমি তোমাতে আকৃষ্ট হইয়াছি—কেন হইয়াছি জানো? আমি দেখিয়াছি, তোমার মধ্যে ঐশ্বরিক প্রেরণা আছে। ভোগভুকা ও সাংসারিকতা তোমাতে বড় কম। আমি এই প্রকারেরই স্ত্রী চাই—তাই তোমায় চাহিতেছি। এখন এস, আমরা দুই জনে মিলিয়া একান্তমনে ঈশ্বরের কার্য্য করিব। তোমায় যে পথের মধ্যে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার জন্ত এমন সু-অবসর তুমি কেনই বা ত্যাগ করিবে? জীবন সার্থক করিয়া কেন দয়াল প্রভুর সেবা করিবে না? ছিঃ, ছিঃ, এ দুর্বলতা ত্যাগ কর। মানুষ হও! মনুষ্যত্বের অবমাননা করিও না।”

নীলিমার চিতে আর যেন শক্তিবিন্দু নাই। তাহার মনে হইল, সে ওই বলীয়ান আইরিশ যুৎকের ফাঁদে যেন এখনই জড়াইয়া পড়িবে, আত্মরক্ষার সামর্থ্য যেন ক্রমশঃই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, জর্জ যেন তাহাকে ক্রমেই সম্মোহন-বিদ্যায় বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে। সে আড়ষ্ট অভিভূতবৎ স্থির হইয়া

বসিয়া রহিল। ভালমন্দ কোন একটা কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, এমন কি, মনের মধ্যটাও যেন তার দেখিতে দেখিতে অসাড় হইয়া গেল।

এমন সময় উভয়েরই পশ্চাতে জুতা-পরা পারের গুরু শব্দে দুই জনেই একসঙ্গে পিছনে ফিরিয়া দেখিল যে, মিস্ গোল্ডেনরীচ আসিয়াছেন এবং তাঁহার সেই স্বাভাবিক সুগোল ও আরক্ত মুখ অধিকতর রক্তোজ্জ্বল। তিনি কোনরূপ ভূমিকাযাত্র না করিয়াই ক্রোধপঙ্ক-কণ্ঠে কহিলেন, “মিষ্টার ওকবর্ণ! এটা পবিত্র মিশন হাউস, থিয়েটারঘাটী নয়, এবং স্মরণ রাখিবেন, আপনি এক জন শ্রদ্ধাঙ্গন পাদরী।”—নীলিমার দিকে চাহিয়া কৰ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আন্তাকুড়ের ময়লা জল পানপাত্রে ভরে রাখলে কখন কখন তাতে জীবনসংশয় হয়েও উঠে—সে জানা কথাই। যা, তুই এখনই এখান থেকে দূর হয়ে যা।”

নীলিমা নতমস্তকে বসিয়া রহিল। এ অপমানে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, ইহা সত্ত্বেও সে তাই উঠিতে পারিল না। জর্জ ওকবর্ণ বারেক ব্যথিত নেত্রে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া মুহু গম্ভীর স্বরে মিস্ রীচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“আমার পদমর্যাদার কথা আমার স্মরণ আছে মহাশয়! আমি আমার বাগদত্তা স্ত্রীকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে বলতে এসেছি মাত্র। নেল! আর রিলক্ষ কেন? উঠে চ’লে এস, আমরা এখান হ’তে এখনই চ’লে যাই।”

মিস্ গোল্ডেনরীচের তাম্রবর্ণ মুখ এই কথায় স্তম্ভোহিত হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা তাঁহার যেন অনলদীপ্ত দেখাইল। তিনি কহিলেন, “আপনার বাগদত্তা স্ত্রী! অসম্ভব! এক জন উচ্চবংশীয় আই-মিশ-ম্যানের সহিত একটা পথের কুকুরের বিবাহ! এ কখনই হইতে পারে না। আজকাল এইরূপেই এ দেশে বৃটিশ-সম্মান নষ্ট হইতে বসিয়াছে। না, আমি ইহার সমর্থন করিতে পারিব না। মিষ্টার ওকবর্ণ! আমার মিশনের মেয়ে আপনি আমার বিনা অনুমতিতে লইয়া যাইতে পারিবেন না। আমি উহাকে কখনই আপনার হাতে ছাড়িয়া দিব না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সম্পূর্ণরূপেই ইহাতে আমার অধিকার আছে।”

জর্জের ললাটের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠিল, তাঁহার দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। পরে ভীষণ ক্রোধকে

কোনমতে দমনে রাখিয়া তিনি কহিলেন, “আমার বাগদত্তা স্ত্রীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে আপনার কোনই অধিকার নাই।” ক্রোধে তাঁহার আর বাক্য-সৃষ্টি হইল না।

মিস্ গোল্ডেনরীচ সক্রোধ ব্যক্তোক্তি সহাস্তে উত্তর করিলেন, “একটা পথের কুটা যে আপনার মত এক জন ভদ্রলোকের বাগদত্তা, এটা যে কোন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রমাণ করিতে পারিবেন ত? আপনার সাক্ষী কে? আমি অবশ্য আপনাদের মধ্যে একটা অবৈধ প্রণয় স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, কিন্তু বৈধ বাগদান স্বীকার করিব না এবং সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অবমাননাকর এ বিবাহ বাহাতে না ঘটতে পারে, তাহারই জন্য সমস্ত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বাধা দান করিব জানিবেন। নীলিমা! এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, আজ হইতে তোমার আমার নজরবন্দী থাকিবা এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এত দূর স্পর্ধা যে নিজের কুক-মন্ত্র ইউরোপীয় যুবকেও বশীভূত করিতে চেষ্টা কর! —মিষ্টার ওকবর্ণ! ওডবাই মহাশয়। এস নীলিমা! তোমায় চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসি। বাহিরে রাখা তোমায় নিরাপদ হইবে না।”

নীলিমা অচঞ্চল পদে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মনে হইল, স্বয়ং মুক্তিদেবী আসিয়া যেন তাহার সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। জর্জের স্ফটিকমুখ বাক্যবাণে তাহার সারা অন্তর প্রায় জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জর্জের জিহ্বাসাবৃত্তির পরিপোষক প্ররোচনায় চিত্তে তাহার হিংস্র প্রতিশোধম্পৃহা উন্মাদ তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রলোভনে সন্দেহ-দোলায়িত মন সঞ্চালিত তালবৃন্তের মতই সঘনে আন্দোলিত হইতেছিল। মিস্ গোল্ডেনরীচের আগমনে ও প্রতিবাদে সে যেন আত্মচিন্তার অবসর পাইয়া সেই আত্মরক্ষার অবকাশও লাভ করিল। দণ্ডকে মুক্তি বোধ করিয়া তাই সে প্রসন্ন শান্ত চিত্তে উঠিয়া মিস্ গোল্ডেনরীচের অন্ত-গমনোত্ততা হইল।

জর্জ ওকবর্ণ তৎক্ষণাৎ সবেগে সম্মুখে আসিয়া পথ আঙুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“এক মুহূর্ত্ত! শোন নেল! আমার প্রস্তাবে তোমার সম্মতি আছে, শুধু এইটুকু তুমি স্বীকার কর, তার পরের সমস্ত কর্তব্য আমার। আমার বিবাহ করিতে তুমি প্রস্তুত আছ—এইটুকু মাত্র আমার বলিয়া যাও।”

গরীবের মেয়ে

নীলিমা গমনোদ্ধত চরণকে সংযত করিয়া লইয়া কপণেকের জন্ত দাঁড়াইল, সামান্য কণ পরেই স্থির অবিচল নেত্র জর্জের প্রতি স্থির রাখিয়া তেমনই অকম্পিত দৃঢ়কণ্ঠে সে উত্তর করিল, “আপনি আমার প্রাণদাতা, আমার চিরস্মরণীয় হইয়া চিরদিনই আমার অন্তরে বিরাজিত থাকিবেন। কিন্তু আপনার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণরূপেই অসম্মত। আমি আপনার সহিত যাইব না।”

মিস্ গোল্ডেনরীচ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জর্জের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “উত্তর শুনিলে তো? এখন যদি ইহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে চেষ্টা কর, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগও অত্যন্তই কঠোর হইবে, জানিয়া রাখিও।”

বিমূঢ় প্রায় জর্জকে একা ফেলিয়া রাখিয়া নারী দুই জন বাহির হইয়া গেল।

সকীর্ণ গৃহের অতিশয় সকীর্ণ ও সামান্য শয্যায় বন্দি নীলিমা নয়নাশ্রুতে ভাসিয়া কাতরচিত্তে ডাকিতেছিল,—“সুশীল! সুশীল! যদি একবার তুমি আমার কথা ভাবিতে! আমি তোমার জন্ত কত সহিলাম, কিছুই তুমি জানিলে না—এই আমার বড় দুঃখ।”

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার যথারাত্রি। সেই সুগভীর অন্ধকার-রাশিকে ভেদ করিয়া একখানা মেল ট্রেন সুদূর পশ্চিমাভিমুখে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার গমনপথের দুই দিকে সুনিবিড় বন, তাহার মধ্যে গাঢ় অন্ধকার জমাটবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তৃণ-শুল্কগতচ্ছাদিত অসমতল উচ্চাবচ সুদূরবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে মিষ্ক-সলিলা সুপ্রশস্তা ও অপ্রশস্তদেহা নদীসকল আসিয়া আবার ইহার পশ্চাৎভর্তা হইতেছিল, সে সকলই কিন্তু সেই প্রগাঢ় অন্ধকার-মাগরের মধ্যে অস্পষ্টপ্রায়ই রহিয়া যাইতেছে। আর তেমনই অন্ধকারে ভরা ছিল সেই গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর আরোহী একটি যুবকের চিত্ত। পথিপার্শ্বের অন্ধকার-নিবিড় বন বনে জোনাফির পুঞ্জ জলিতেছিল, কিন্তু সেই আরোহী যুবকের অন্তরের কোথাও যেন আলোকের রেখাটুকু পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাহিরে অন্ধকার, কিন্তু গাড়ীর কারবার তাঁকোজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর প্রভাব যথেষ্টই বহু ছিল। অপর এক জন আরোহী নারিয়া যাই যুবক উঠিয়া একটিমাত্র আলোর উপর ‘সেড’ টাফ দিয়াছিল। এখন সে আবার উঠিয়া তাহা বিমূঢ় করিল এবং পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানা পত্র খুলিয়া তাহা মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল—

“ছয় মাস কাল উত্তীর্ণপ্রায়। এত দিনেও তুমি তোমার অন্ত্রায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলে না? তুমি সংবাদ লইয়াছ যে, নীলিমা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে—আমার তৎহাতে কোনই আস্থা নাই। আমি * * * লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইয়াছি, জানিয়া গিয়াছে যে, নীলিমাকে শ্মশান হইতে কেহ ফিরিতে দেখে নাই। ইহাতে এমন কোন প্রমাণ হয় না যে, সে বাঁচিয়া নাই। তোমার এ সম্বন্ধে দায়িত্ব বেশী, তুমি ধর্ম্মতঃ তাহার স্বামী, কোন্ কর্তব্যবুদ্ধিতে তুমি তোমার স্ত্রীর সন্ধান না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছ? স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহার প্রতি সকল কর্তব্য সম্পাদন না করিলে আমার কাছে তুমি ক্ষমা পাইবে। তবে এমন হইতে পারে যে, এখন হয় তো তুমি আর আমার ক্ষমা চাহিবে না; কিন্তু স্থির জামিও যে, সে হত-ভাগিনীর প্রতি সুবিচার না করিলে তোমার ঈশ্বরের জ্ঞান-বিচারে চির-অপরাধী হইয়া থাকিতে হইবে। ইতি
স্বলেখ্য।”

এই পত্রখানা বহুবার পঠিত হইলেও ইহা পুনরায় আর একবার পাঠ করিল। তাহার পর খানা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আর একখানা পত্র বাহির করিল—

“তুমি নিজে * * * গিয়াছিলে, অনুসন্ধান বাকী হইয়াছে, শবদাহকারী ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপিত দেখিয়াছিল, উঠিতে কেহ দেখে নাই। ইহাতে যত্ন নিশ্চয় করা অসম্ভব নহে বটে, কিন্তু তথাপি আমার মন বলে যে, সে মরে নাই। সুখহীন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া—আহা, না জানি সে অভাগী কোন্ মহা-বিপদের সাগরে—কোন্ বিষম দুর্গতির মধ্যেই ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে!—তুমি তাহাকে রক্ষা কর, আবার যাও, ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর। যদি তাহার ভাগ্যে কোনরূপ অকথ্য দুর্গতিই ঘটয়া থাকে, তাহার জন্ত একমাত্র তুমিই যে দায়ী, তাহা তুমি নিজেও তো জানো। তবে কেন অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়া তাহাকে উদ্ধার

অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

না ? এ কাজ একমাত্র যে তোমারই, আমিও
এর জন্ত হয় তো কতকটা দায়ী, কারণ,
ইহার মধ্যে না থাকিলে তুমি হয় তো তাহাকে
বেই পাইতে চেষ্টা করিতে, অত্যাচার দ্বারা নহে।
সেই প্রায়শ্চিত্তে আমাকেও স্থান লইতে হই-
তেছে। আমার বাবার এ সম্বন্ধে এতটুকুও সহানুভূতি
থাকিলে আমি তো নিজেই একবার সেখানে যাইতে
পারিতাম। কিন্তু এক দিন এই কথার উল্লেখ তাঁহার
কাছে যেরূপ তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে, তেমন এ
জীবনে কখন হয় নাই। ইহার উপর তিনি আমার বিবা-
হের জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, বলিতেছেন, আমার এই
সকল 'সেন্টিমেন্টালিটিতে' তাঁহার বিন্দুমাত্রও সহানু-
ভূতি নাই। তিনি আমার কোন ওজর আপত্তিই আর
শুনিতেন না, তোমার মত সুপাত্রের হস্তে তিনি
আমায় জোর করিয়াই সম্প্রদান করিবেন ! হিন্দুর
মেয়ের বিবাহ কতবার মতামতের অপেক্ষা রাখে না—সে
কথা সত্য।—কিন্তু সে বাল্য-বিবাহে। আমি এখন
আর বালিকা নই, আমার মন এখন অস্ত্রের পরিচালনা-
ধীন নহে, তিনি এটা বুঝেন না। তিনি প্রবল,
আমি দুর্বল। আমার মার যেটুকু আপত্তি ছিল,
এক দিকে আমার বাবার শাসন, অপর দিকে তোমার
পিতৃঐশ্বর্য্য সেটুকুকে ক্রমশঃই নাশ করিতেছে।
কিন্তু এ বিপদে আমি তোমার কাছেই শরণাপন্ন
হইলাম। তুমি তাঁহাদের এই খেলাল-খেলার মধ্যে
যোগ দিও না। কারণ, আমি তোমায় নীলিমার
বানী বলিয়াই মনে করি। তুমি দেশ ছাড়িয়া যাও,
না হয় বিবাহে অসম্মতি জানাও, যাহা হয় কিছু কর,
শুধু আমার আশা ছাড়। নতুবা তোমার বাবাকে আমি
নিজেই আমার দৃঢ় আপত্তি জানাইয়া পত্র লিখিব,
তিনি আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আমায় নিশ্চয়ই
বাঁচিতে দিবেন। ইতি

সুলেখা।”

সুন্দর হস্তাক্ষরে সুচারু ছাঁদে লেখা এই ভীষণ
‘পত্রখানা’ সুশীল ইতঃপূর্বে একবারমাত্র পাঠ করিয়া
রাখিয়া দিয়াছিল, ইচ্ছা হইলেও আর সে ইহা পাঠ
করিতে পারে নাই। এখন এই পত্র দ্বিতীয়বার
পাঠ করিতে বসিয়া তাহার মনে হইতেছিল যে, চোখ
ছুইটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেহ-মন যেন তাহার
কে আগুন দিয়া দগ্ধ করিতেছে। সমস্তই যেন তাহার
বিষম জ্বালাময় বোধ হইতে লাগিল। প্রাণটা যেন

ধুধু ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। খোলা চিঠি
সামনে রাখিয়া সে নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল। ট্রেন
থামিয়া ষ্টেশনে আইসে, আবার সে চলিতে থাকে,
আবার দাঁড়ায়, আবার চলে। সুশীলের ইহাতে
দৃকপাতও নাই। সে শুধু অবাক হইয়া ভাবিতেছিল,
তাহার এই জটিল ও ভীষণ অদৃষ্টের কথা। এ যেন
এক রহস্যময় উপজ্ঞাস ! এ যেন একটা শ্বাসরোধকর
হঃস্বপ্ন ! নতুবা মানুষের ভাগ্যে, ভদ্রসন্তানের ভাগ্যে
কি কখন এমন ঘটনাও ঘটে ? তাহার মনটা অত্যন্ত
তিক্তভাবে নীলিমার প্রতি বিদ্রিষ্ট হইয়া উঠিল।
তাহার সংশ্বে আসিয়াই তাহার যত কিছু দুর্ভাগ্য
ঘটিয়াছে। অথচ ঈশ্বর জানেন, তাহার কি অপরাধ ?
অনুকূলের কথা মনে আসিতেই মন তাহার গভীর
বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। পুতিগন্ধবিশিষ্ট
মলিন বস্তুর মতই তাহার চিত্তকেও সে চিত্তে প্রবেশ
করিতে দিতে যুগা বোধ করে। * * * গিয়া সে
সংবাদ পাইয়াছিল, স্ত্রী-কন্ডার মৃত্যুতে পরম নিশ্চিত
হইয়া সে নিজের অর্ধসকলের প্রতি কামমনোবাক্যে
আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে আপশোষ
করিয়া ইহার উহার কাছে বলিতেছিল যে,
মেয়েটা যে আহাশ্বকের মত ম’রে গেল, না হ’লে তুবন
রায়ের কাছ থেকে দশটি হাজার মারে কে ? আর সেই
মরুলিই যদি তো ছটো দিন বাদে মরুলেই তো হ’তো ?
নীলিমার নিরুদ্দেশটাকেও সে সুশীলের উপর ফেলিবার
চেষ্টা করিয়াছিল। বিপ্রদাস-প্রেরিত লোক সেটা
অনেক কষ্টে মিটাইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞ
বিপ্রদাসের অর্থব্যয় সে জন্ত বড় বেশী হয় নাই।

সুশীলের বন্ধ চিরিয়া একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস
উখিত হইল। এবার নীলিমার প্রতি বিদ্রোহজ্বালা
মন্দীভূত করিয়া চিত্ত তাহার জলন্ত হইয়া উঠিল
সুলেখার প্রতি। তাহার এত দুর্গতি ঘটিল না—
যদি সুলেখা অমন একরোখা জেদালো স্বভাবের মেয়ে
না হইত ! * ভাল বলিয়া অতটাই ভাল হওয়া আবার
কাহারও পক্ষেই ভাল নহে। যে নীলিমা বাঁচিয়া
নাই, তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এমনই
তাহার অসঙ্গত জিদ্ ! তাহার পিতা বিবাহ দিবার
জন্ত চেষ্টা করিতেছিল, সে শুধু শুধুই একটা খেলার
বশে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। সব কথাই
তো সুশীল তাহাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল, সে
পত্র সে বিশ্বাস করে নাই। সুশীলের মনটাকে লইয়া

সে এ কি নির্যম খেলা খেলিতেছে! সে যেন তাহার একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নকমাত্র! সুনীলের পীড়িত চিত্ত নুতন ব্যথায় ভারি হইয়া উঠিল। বুক তাহার দীর্ঘশ্বাসে ফুলিয়া রহিল, তবু কৈ, তাহার কথা তুলিতেও পারা যায় না তো? মনে যাহার এত অবিশ্বাস, যাহার প্রাণে এতটুকু সহানুভূতি নাই, স্নেহ নাই, তাহার জন্ত বুক এমন তীব্র বেদনায় কাটে কেন? অনায়াসে যে তাহাকে পরের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা দান করিতে পারে,—তাহারই জন্ত প্রাণপণ করিয়া বসে, তাহার স্মৃতি মন হইতে একটি মুহূর্তের জন্তও কি মুছিতে পারা যায় না? তাহার এ অবিচারের দণ্ড মাথায় তুলিয়া লইয়া বৃথা চেষ্টায় পাগলের মত দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়াও তাহার এ প্রায়শ্চিত্তের কি শেষ হইল না? আবার তাহারই খেলার খেলায় দেশত্যাগী হইতে হইল। তথাপি তাহারই জন্ত প্রাণের মধ্যে বেদনার পুঞ্জ ও অশ্রুনিঝর আজও অসংবরণীয় হইয়া দেখা দেয় কেন? সেই কঠোরহৃদয়া পাষাণীই যে তাহার কৈশোর যৌবনের ধ্যানের দেবী, তাহার মানব-মন্দিরের করুণা-প্রতিমা। কাহার শাপে তাহার ভাগ্যে সেই মমতাময়ীকে মমতাহীনা করিয়া দিল? তবে তাই দিক—সুনীলকে সে যখন এমন করিয়াই ত্যাগ করিতে চাহে, তখন সে-ও আর তাহার কৃপাকণার জন্ত লালায়িত হইবে না। তাহার দুঃখের জীবন চির-অন্ধকারাবৃতই থাকুক। স্নেহা স্নেহে থাক—সুখী হোক, অপর কোন ভাগ্যবানের হৃদয়লক্ষ্মী হোক সে। সুনীল তাহার পথ ছাড়িয়া চিরদিনের মতনই এবার সরিয়া যাইতেছে।

• ষ্টেশনের পর ষ্টেশন আসিল। * * * ষ্টেশনে এক জন দীর্ঘাকার ইংরাজ পাদরী, বয়সে সুনীলের চেয়ে কিছু বড়, সুনীলের মতই প্রায় সে-ও তখন চিন্তামান ও স্নেহহীন, সে সুনীলের কামরায় উঠিল। কিন্তু সুনীল তাহার দিকে চাহিয়া দেখা দূরে থাকুক—তাহার অস্তিত্বও জানিতে পারিল না। তাহার মন তখন তাহার পিতার প্রতি একটা অকথ্য অব্যক্ত নিগূঢ় অভিমানের স্মৃতিতে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা তাহাকে এত বড় ভুল করিলেন! এক দিনের জন্ত তিনি তাহার সহিত এ বিষয়ে এত-টুকুমাত্র আলোচনা করিলেন না, একটা ভাল মন্দ কোন কথা পর্য্যন্ত তুলিলেন না, যাহাতে করিয়া

প্রকৃত ঘটনার কথা সে তাঁহাকে জানাইতে পারে, তাহার জন্ত একটুখানি স্বেযোগমাত্র তিনি তাহাকে এই সাত মাসের মধ্যে দিলেন না, অথচ কি ভীষণ মর্মব্যথাই যে তিনি তাহার জন্ত অন্তরে অন্তরে দিবারাত্রি উপভোগ করিতেছেন, তাহাও তো সুনীলের অজ্ঞাত নহে। পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন লোক সে অসীম মনোবেদনার সাক্ষী নাই, সেই নির্ঝক নিঃশব্দ মানসিক যন্ত্রণার সহানুভূতিকারী কেহ বর্তমান নাই, সে শুধু তাঁহার নিজের বক্ষশোণিত গুণিয়া লইয়া দিনে দিনে তাঁহাকে কীটদষ্ট ফলের মত ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কেবল মৃত্যুর আত্মানের সাড়া সেই আনন্দলেশহীন ও সর্বনিষ্পৃহ মূর্ত্তি হইতে সকলেই অল্পবিস্তর পাইতেছিল মাত্র। সুনীলের প্রাণ যেন তাহার গৃহের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এর চেয়ে পিতা তাহাকে যদি কঠোর তিরস্কার করিতেন, সে তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাদিত, তাহার সকল ব্যথা প্রশমিত হইয়া যাইত। যদি তিনি তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিতেন, তাহাকে ত্যাগ করিতেন, সে মরিত, তাহার সকল আলা জুড়াইত। ইহার কিছুই না করিয়া সমস্ত দুঃখটাকেই যে কালানলের মতই নিঃশব্দে নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও সেই প্রাণঘাতী বিষজালস্য নিজেকে নিঃশেষে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছেন, এ যে অদ্ভুত! অথচ ইহার কোন উপায় করাও যে আবার তেমনই অসম্ভব। তিনি তাহার সঙ্গে কথা কহেন, দেখা হইলেও আর ত মুখ ফিরাইয়া লয়েন না। কিন্তু সে দেখাই হয় তাহাদের মধ্যে কি কদাচিত! কথা হয় কত সামান্য ও এক বা দ্বিবর্ণাত্মকের বেশী কথা প্রায়ই কখন আর হয় না। সেই অসীম স্নেহসম্বন্ধ বুচিয়া এই সম্পর্কই কি তবে তাহাদের মধ্যে চিরদিনের মতই দাঁড়াইল? এই যে প্রচণ্ড বাধাটা, দুর্লভা গিরিশিখরের মত উন্নতশীর্ষে পিতা-পুত্রের প্রাণঢালা একাত্মার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিল, ইহাকে মধ্যে রাখিয়া বাঁচিয়া থাকা যে দুজনকারই পক্ষে দিন দিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা দুজনেই সুস্পষ্ট বুঝিতেছিলেন, তথাপি এ বাধার প্রতীকার করা যেন দুই জনের কাছেই আজ অপ্রতিবিদেয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে যে কিছুতেই আর সরাইতে পারা যাইতেছিল না।—শেষে স্নেহের ঐ কুলিশকঠোর পত্রে—যাহাতে তাহার নির্ঝাসনের আদেশ আছে, তাহা

পাইয়া অসংবরণীয় হৃদয়বেগে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। আজ যে, যে কোনখানে যাওয়ার জন্তই তাহার পথ খোলা। পিতার অনুমতি পাইবারও কোন বাধা নাই, আর লইবার প্রবৃত্তিও বুঝি ঠিক ভেদনই কম! উঃ, কি এ অবস্থা!

আগন্তুক বিশেষী যুবক যদিও চিন্তামলিন-মুখেই এই কামরায় প্রবেষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি স্ত্রীলের এই মুহূর্ত্তমান ভাবের কাছে তাঁহার সে অবস্থা যেন কিছুই নহে। ইহার এই মৃত্যু-বিবর্ণতা ও গভীর অবসাদ-গ্রস্ততা তাঁহার চিত্তকে যেন ক্ষণকাল পরেই ইহার অভিমুখে স্বতঃই টানিয়া আনিল। তিনি তখন বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, ইহার সকল আত্মীয়জন নিশ্চয়ই একসঙ্গে হয় নৌকাডুবি, না হয় অগ্নিদাহ এই দুই কোন একটা ভীষণ দৈবজরুরিপাকে মরিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে কোন আশা রাখিয়া মানুষ এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতে পারে না। ইহার সম্বন্ধে মনে তাঁহার কোতূহল ও কল্পনা একত্র জাগিয়া উঠিল। দুই একটা কথা কহিবার চেষ্টাও তিনি করিলেন। ইহার আত্মানে স্ত্রীল প্রথমটা চমকিয়া উঠিল, তার পর সে বাহিরের দিকে বারেক চাহিয়া দেখিল, দেখিল সেই সুবিস্তৃত অন্ধকারাশি। তাহার মনে হইল, উহারা এই যে প্রাণপণে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, এ শুধু তাহারই সঙ্গ হারাইবার ভয়ে। তাহার মনে হইল, তাহার অন্তরের মধ্যে যেন এই অন্ধকার-সমুদ্রের তরঙ্গগুলাই প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজ সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তর সে নীরবেই এড়াইয়া গেল, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার তখন আদৌ ছিল না।

আগন্তুকের দৃষ্টিটা স্ত্রীলের সম্মুখস্থিত সেই খোলা চিঠিখানার উপর পতিত হইল। বাজালা হাতের লেখা পড়িবার মত বিজ্ঞা তাঁহার ছিল। কতকটা এই অদ্ভুত ভাবের লোকটির সম্বন্ধীয় কোতূহলের বশেও বটে, আর কতকটা নূতন বিজ্ঞার পরীক্ষাচ্ছলেও বটে, সেই পত্রের প্রতি তাঁহার চিত্ত একটুখানি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই দৃষ্টিটা একটু বদ্ধ হইয়াই রহিল। উহারই মধ্যের কয়েক পংক্তি পড়িয়াই তিনি সচমকে মুখ তুলিয়া উগ্র আগ্রহে সবেগে কহিয়া উঠিলেন, “তুমিই ‘নীলিমার স্বামী’!”

এই আকস্মিক ও অদ্ভুত প্রশ্নে স্ত্রীলও আচমকা

চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরক্ষণেই ইহার ধূষ্টতার তাহার মনের মধ্যে প্রচুরতর উত্তাপ জাগিয়া উঠিল। সে-ও তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “এ কিরূপ প্রশ্ন মহাশয়?”

আগন্তুক জর্জ ওকবর্ণ। জর্জ ওকবর্ণ এ কথায় বর্ণপাতমাত্র না করিয়া আপন মনেই বলিয়া ফেলিলেন, “আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। কারণ, আমার নীলিমার তো স্বামী নাই। যার জন্ত আমার সে প্রত্যাখ্যান করলে, সে তার স্বামী নয়, তার ভালবাসার লোকমাত্র। আপনার স্ত্রীরও বোধ করি ঐ নাম?—আমি ভুল ক’রে তাকে নীলিমা চক্রবর্তী মনে করে-ছিলাম।”

“নীলিমা চক্রবর্তী! আপনার নীলিমা। আপনি কার কথা বলছেন? আমিও এক জন নীলিমা চক্রবর্তীর অনুসন্ধান করছি যে! আপনি যে নীলিমার কথা বলছেন, সে এখন কোথায়?”

স্ত্রীলের কণ্ঠ যেন আগ্রহে রুদ্ধ হইয়া আসিতে-ছিল, উত্তরের প্রতীক্ষা যেন অসহনীয় বোধ হইতে-ছিল। তবে কি সুলেখার সন্দেহই সত্য? এত দিনে কি তবে—

মিষ্টার ওকবর্ণ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, এই যদি নীলিমার প্রণয়ী হয়, তবে তাহার রুচিকে নেহাৎ নিন্দা করাও যায় না। নেটিভের পক্ষে ইহার চেহারা ভালই এবং ইংরাজীর উচ্চারণ প্রায় ইংরাজেরই মত। তিনি কহিলেন, “সে নীলিমা এখন * * * মিশনে আছে, প্রায় সাত মাস পূর্বে এক দিন পথের ধারে তাহাকে আমি মরণ-পর অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া আমার বোনের কাছে লালকুঠীতে লইয়া আসি। সেখানে অনেক কষ্টে সে পুনরুজ্জীবিত হয়। আমার বোনের মৃত্যুর পর ইচ্ছা ছিল, আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া আমার কৰ্ম্ম-স্থলে করাচিতে লইয়া যাইব, কিন্তু সে কোনরূপেই চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। যে হৃদয়হীন পাপিষ্ঠ প্রণয়ী তাহাকে জ্যেষ্ঠ-মধ্যাহ্নের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে জন-হীন মাঠের উপর মরিতে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখনও সে তাহারই জন্ত প্রাণ দিতে চায়! আশ্চর্য্য উপাদানেই যে ঈশ্বর নারীচিত্ত গঠন করিয়াছেন!—সে আমার স্পষ্টই বলিল যে, তাহাকে সে ভুলিতে পারে নাই—কখন পারিবে না!”

জর্জ ওকবর্ন আর একবার তীক্ষ্ণভেদ্য দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সম্মুখস্থিত ভূতাহতবৎ সুশীলের পাণ্ডুযুগ্ম পর্যবেক্ষণ করিলেন। সুশীলের শরীরে তখন সংজ্ঞা আছে কি না, এ বিষয়েও তাঁহার মনে সংশয় জাগিল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, লোকটা উন্মাদ অথবা মৃগী-রোগগ্রস্ত হইতেও তো পারে ?

গাড়ীর বেগ এ দিকে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ষ্টেশন নিকটবর্তী হইয়াছে জানা গেল; সহসা সুশীল আপনার সঘন কম্পিত চরণদ্বয় স্তব্ধ করিয়া লইয়া সজোরে ভূমে স্থাপন পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। বন্ধের দ্রুত স্পন্দন যন্ত্রে বোধচেষ্টা করিয়া অস্পষ্ট স্বরকে ফুটাইয়া তুলিয়া বিনীত শাস্ত স্বরে কহিয়া উঠিল—“পুরা ঠিকানাটা আমায় দিন, আমি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। আমি যাহাকে খুঁজিতেছি, সে ঐ নীলিমাই। আর দয়া করিয়া কাহারও নামে একটু পরিচয়পত্র আমায় দিবেন কি ?”

জর্জ ওকবর্ন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “অমন কাজটিও করিবেন না। সেখানে গিয়া কাহারও নিকট আমার নামোল্লেখ করিলে তাহার সঙ্গে আপনার দেখা পর্যন্ত হইবে না। আপনি শুধু গিয়া বলিবেন যে, আপনি তাহার বিশেষ আত্মীয়, কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।”

“তবে আমি এই ষ্টেশনেই নামিলাম। একখানা গাড়ী বা একা অথবা যেমন করিয়া হোক, এ পথটুকু ফিরিয়া যাইব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! বড় ভাগ্যে ভাগ্যে আপনার সহিত আজ সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। সাত মাস ধরিয়াই আমি ইহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছি।”

“এই নিন ঠিকানা লেখা কাড’। নীলিমাকে বলিবেন, ‘জর্জ ওকবর্ন তাহার প্রতি তাহার অকুজতার এই প্রতিদান দিয়াছে!—এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, সে সুখী হোক, আমার আর কিছুই বলিবার নাই’—শুভরাত্রি!”

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকখানি সুখের পর দুঃখ যখন আবার ফিরিয়া দেখা দেয়, তখন তাহাকে সহ্য করা কঠিনতর হইয়া উঠে। পূর্বের দারিদ্র্যের কথা, পূর্বাভাস, মায়া বড় সহজেই তুলিয়া যায়। কিন্তু দুই দিনেরই হোক,

আর দশ দিনেরই হোক, সুখের দিন কমটা তাহার বৃকে একটা রজনীন নেশায় রঙিয়া এমনই মায়ায় জলি বুলিয়া রাখে যে, সে দিনগুলো আর কখন বিস্মৃতির কালো মেঘে ঢাকা পড়ে না। নীলিমা চির-অনাদৃত জীবনের পরেই মস্ত বড় ধাক্কা খাইয়া এমন একটা স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল যে, সে স্থানের সঙ্গে তাহার পুরাতনের কোন সংযোগ ছিল না। তাহা নূতন—একেবারে সম্পূর্ণরূপেই নূতন। সেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, শ্রম, প্রেম, সম্মান সমস্তই সে যেন অপ্রত্যাশিতরূপে অপরিয়াপ্তই লাভ করিয়াছিল। এত বেশীই পাইয়াছিল যে, ততটা বেশী সে বরং লইয়া উঠিতেই সমর্থ হইল না। তাহার পর সহসা আবার সমস্তই বদল হইয়া গেল। মিস্ ব্রীচের কঠোর শাসন তাহাকে পুনর্মুখিক করিয়া দিল এবং এই ঘটনার নিজের প্রকৃত মূল্য আজ কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা দেখিয়া সে মনে মনে আতঙ্কে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল—উচ্চবংশজ খাঁটি আইরিশ-পরিবারের সহিত সমকক্ষভাবে বাস করিতে পাইয়া। মিস্ ওকবর্নের নিকট অসীম মেহলাভে ও তাহার উপর জর্জ ওকবর্নের সজ-সাহচর্য ও পরিশেষে বিবাহ-প্রস্তাব পর্যন্ত লাভ করিয়া সে নিজের যথার্থ অবস্থা এতদিন বুঝিতে পারে নাই। তাহার মনে হইয়াছিল, ইহা বৃষ্টি ঋতুশ্রেরই প্রভাব। এ উদারতা—এ মহত্ত্ব—সমস্তই যেন খৃষ্টান-জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। যীশুর মানব-প্রেমে ইহাদের চিত্ত স্বতঃই যেন ভরপুর। কিন্তু মিস্ গোল্ডেনব্রীচের তীব্র ‘নেটিব-বিদ্বেষ’ সে বিশ্বাসটাকে অনেকখানিই নাড়া দিয়া গেল। তাহার পর তাহার লক্ষ্য পড়িল, লাল কুঠীর আরও কয়েকটি ইংরাজ মহিলার প্রতি। মিস্ ওকবর্নের সময়ে ইহারাই নীলিমাকে কৃত মেহাদর দেখাইয়াছেন; তাহার অনন্তসাধারণ রূপের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন; তাহার বিনীত ব্যবহারে—ধর্মপ্রাপ্ততার মুগ্ধবৎ ব্যবহার জানাইয়াছেন; আর আজ ইহারাই মিস্ ব্রীচের বিরাগভয়েই হোক, অথবা মিস্ ওকবর্নের অপসরণ-সুযোগেই হোক, তাহার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যবহার দেখাইতেছিলেন। তাহার স্বপক্ষে একটামাত্র কথাও কেহ জ্বায়ের মর্যাদা-রক্ষা হিসাবেও কহিতেন না, বরং নিজেরাও যথাসাধ্য নিলিপ্ত এবং ওদাস্তপূর্ণভাবে চলিতে লাগিলেন। নীলিমা দেখিল, সকল জাতি এবং সকল

সবাইকেই মানবপ্রকৃতি একইরূপ হইয়া থাকে। ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সর্বত্রই পাশাপাশি হইয়া আছে। কোথাও বা নিছক ভাল এবং কোথাও বা নিছক মন্দ টিকিয়া থাকিতেই পারে না। সকল ধর্মই মানুষকে ভাল হইতে শিখায়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তাহার মধ্য হইতে যেটুকু গ্রহণক্ষম হয়—সেইটুকুই সে গ্রহণ করিয়া থাকে। নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া সে যেটুকু লাভের আশা করিয়াছিল, সেইটুকু তাহার কুরাইয়া আসিল। সেই সন্ধীর্ণচিত্ততা—সেই হীন সন্দেহ—সেই ঘৃণাবিদ্ভিষ্ট জাতিভেদ! তবে কিসের জন্তই সে তাহার স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিল?

তাহার পর নীলিমার সমস্ত চিত্ত তীব্র ঘৃণায় গুটাইয়া ছোট হইয়া গেল—যখন লাল কুঠীর আশ্রয় ছাড়িয়া তাহাকে থাকিতে হইল, অনাথাশ্রম ও স্কুল-বোর্ডিংয়ের মধ্যস্থ হইয়া। সেখানে মেথর, ডোম, চামার, হাড়ি, মুচি, মূর্দাকরাস প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির একতা সাধিত হইয়া একমানবতার সৃষ্টি হইতেছে বটে! ইহার মধ্যে অবৈধজাত মাতৃপরিত্যক্ত শিশু, বৈধজাত ও সকল ধর্মীর সংমিশ্রণ সমস্তই আছে। আবার ইহারই ভিতর নীলিমার মত ভদ্রবংশীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা, কায়স্থমহিলা, বৈষ্ণবজায়া কেহ জুটিলে তাহাদেরও ভর্তি হইতে হয়। ঘৃণায় নীলিমার যেন গা বমি-বমি করিতে লাগিল। চিরকালের সংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রথম প্রথম মিস্ ওকবর্ণের টেবলে খাইতেও যে তাহার মনে ঘৃণার ভাব না জাগিত, তাহা নহে। তথাপি সে স্থানের পরিচ্ছন্নতা ও ইহাদের ভদ্রবংশ আর সব কথা যেন কতকটা ঢাকা দিয়া রাখিত, এখন তাহারই নগ্ন রূপটা স্পষ্ট-করিয়া চোখে পড়িতে লাগিল। একটা মেথরালী কুঠীর ‘কমঠ’ সাফ করে, আবার সেই-ই আসিয়া বাবুচিখানায় জাঁকাইয়া বসিয়া কাট্লেট গড়িয়া দেয়, হাতটাও কখন ধোয় না। বাবুচিখানা একটুখানি মাংস তুলিয়া লইয়া দিব্য করিয়া চাখিয়া দেখিল এবং তাহারই বাকিটা রন্ধন-পাত্রে ফেলিয়া দিয়া সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই রহিয়া গেল। নীলিমা এগুলো এত দিন না দেখিয়া খাইয়াছিল, চোখে দেখিয়া আহারম্পূর্ণ তাহার আর বিন্দুমাত্রও রহিল না। তবে এ স্থানের ব্যবস্থায় এখন আর তাহার জন্ত এ সকল আহার্যের বন্দোবস্তও তো নাই; সাধারণ মোটা চাউলের ভাত, ডাল, চচ্ড়ি, এক টুকুরা মুরগীর ডিম বা কদাচিৎ কোন দিন একটু মুরগীর

মাংস। রান্নাও তেমনই কদর্যা—একটা মুসলমানীর সহিসের সেটা নিকা-করা স্ত্রী, সেই তাহাদের জন্ত রাখিয়া দেয়। একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া এক একখানা কলাইকরা সান্ধি হাতে লইয়া খাইতে খাইতে হয়। খাইবে কি, ঘৃণায় শরীর যেন শিথিল হইয়া আইসে, হাতের আঙ্গুলগুলো পাতের ভাতের গায়ে ঠেকিবে কি, সে যেন খিল ধরিয়া গুটাইয়া যায়। তিন বেলা উপবাসী থাকিয়া অবশেষে অনেক কষ্টে গ্রাস কতক খাইয়া আসিয়া উহা উদ্দিগরণ পূর্বক নীলিমা নিজের বিছানায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন করিয়া সে কয় দিন বাঁচিবে? না খাইয়া যে মানুষের বাঁচিয়া থাকা চলে না, সে শিক্ষা তো তার এর আগেই একবার হইয়াও গিয়াছে। তাহার এখন আর বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনই বা কি? বাঁচিয়া তো কেবল এই ঘৃণা জীবন বহন করা! তাহার মনে হইল, যুরোপীয়রা যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন করতালি পায়, সেগুলো একেবারেই ফাঁকি। জাতিভেদ উহারা নিজেরা খুব বড় রকম করিয়াই মানে। তবে অপরের জাতি নষ্ট করিয়া দেয় বটে!—জাতিভেদ না মানার ইহাই অর্থ দেখা যায়। যাহাদের উহারা খুঁটান করে, তা হোক তাহারা ব্রাহ্মণ, আর হোক তাহারা মেথর, তাহাদের এক ঘানিগাছে ফেলিয়া দিব্য করিয়া মিশাইয়া লয়। নিজেরা অভিজাত্যগর্বে অন্ধপ্রায়, নিজেদের আচার-ব্যবহারে এতটুকু চুল কোথাও পরিবর্তন করে না, কিন্তু অন্যের অভিজাত্য উহাদের চোখে কুসংস্কার মাত্র! নীলিমাও বাহির হইতে উহাদের এই সব শেখান বুলি শুনিয়া শুনিয়া তাহাই হৃদয়স্থ করিয়া নিজের দেশের সকল সংস্কারকে ‘কু’ ধরিয়া লইয়াছিল। আজ তাহার মনে হইল, যদি এক জন ভদ্র আইরিশ বা ইংরাজ যুবক কোন ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিলে ‘ব্রিটিশ প্রেস্টিজ’ নষ্ট হয়, যদি ইহার ফলে সেই দম্পতির সামাজিক অবনতি ঘটে, অর্থাৎ ক্রাব বন্ধ হয়, সেই স্ত্রীর কোথাও নিমন্ত্রণ হয় না, সরকার হইতে প্রমোদন বন্ধ থাকে, নিন্দার সীমা পরিসীমা থাকে না, বাপ ত্যজ্যপুত্র করে, তবে হিন্দুরই বা নিজ ধর্মের বা জাতির বাহিরে বিবাহ সমর্থন না করায় এতই কি পাপ? সমাজ থাকিলেই তাহার একটা স্বতন্ত্র ধর্মও থাকে। বিভিন্ন সমাজের দোষ-গুণ সকলেই সচেষ্টিয় বর্জন-ব্যবস্থা করিয়া থাকে, নতুবা সমাজধর্ম নষ্ট হইয়া

গিয়া আদিকাল দেখা দেয়—যে সময় লোকে বিবাহও করিত না—পরন্তু সম্মানের জন্মাদিও হইত। আজ বড় অসময়েই তাহার মনে হইল, না জানিয়া না ভাবিয়া অনর্থক বড় বড় কথাই মালা গাঁথিয়া বাহারী তরুণ চিত্তকে গরল মাখায়, তাহারী তাহাদের মহাশত্রু! ‘মহামানব’ শুধু মুখের কথা নহে। ‘প্রত্যেক মানবের মনে স্বাধীন চিন্তার উদয় না হইলে মুক্তি নাই’—এই সকল বাক্য উন্মাদের প্রলাপমাত্র। উন্মাদ ব্যতীত কোন সুস্থ ব্যক্তি এমন আশা করিতেই পারে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে ও স্বতন্ত্রভাবে চলিবে। সেটা এক পাগ্‌লা গারদেই সম্ভব ও সম্ভব। সাধারণতঃ স্থির-মস্তিষ্ক নরনারীর জন্ত মহাজনের অনু-সৃত পথই অনুসরিতব্য এবং ইহাতেই মুক্তি। নতুবা তরুণ-তরুণী দলের প্রত্যেকের স্বাধীন চিন্তা ও স্বেচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে জগতে কোন সুমঙ্গল আনয়ন করিতে পারা একান্তই অসম্ভব।

নীলিমা গভীর বেদনায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ফাটাইয়া অনেক কান্নাই কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মনে পড়িল সুশীলকে। আজই সর্বপ্রথম তাহার মনে হইল, তাহার সম্বন্ধে সুশীলের ব্যবহার হয় তো খুবই নিন্দার্ক নহে। তাহার বাপ যে কত মন্দ, তাহা কি সে জানিত? কিন্তু উঃ, সুশীল তাহাকে বিবাহ করিলে আজ তো তাহার এ দুর্গতিভোগ ঘটিত না। স্বার্থপর সুশীল নিজের সুযোগটাই দেখিল, তাহার অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাহাও তো তাহার দেখা উচিত ছিল?

পাশের ঘরের চন্দ্রমুখী গুহ আসিয়া কাছে বসিল। “কি, এখনও তুমি মুখ গুঁজে প’ড়ে কাঁদচো? তবেই তোমার হয়েছে! নাও, উঠে বসো, মনটাকে ভাল ক’রে ফেলো, কি করবে? যখন এখানে পা দিয়েছ, তখন এই সব তো করিতেই হবে। নিজে রেঁধে যে খাবে, কি আমিই দুটি রেঁধে দোব, তাও তো এখানে উপায় নেই। সে মেমরা মত দেন না, ভারি রাগ করেন, বলেন, ‘ওসব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারি না।’ ওঁদের খাওয়ার-জাতি-ভেদটা নেই কি না, অবশ্য পাশে ব’সে কারু খান না, নেহাৎ বাছা লোকটি না হ’লে; তবে সেদ্ধ ক’রে যে দেয় দিক, তাতে আপত্তি নেই, তাই এটা ওঁদের কাছে বড়ই ছোট জিনিষ। নিজে যা না করি, তাই তো মন্দ কি না? তা ভাই, খেতে খেতে আবার অভ্যাস হ’য়ে যাবে। আমারই কি কম ঘেরা করতো! তাতে আবার

আমি হিঁহুয়ের বিধবা ছিলাম। সাত বছর মাছ-ভাতই খাই নি।”

নীলিমা এই সহামুভূতির বাণী শুনিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল—নিজের দুঃখ যেন সে অকস্মাৎ সব ভুলিয়া গেল। সকৌতুহলে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি এখানে কি ক’রে এলেন? কেন এলেন?”

চন্দ্রমুখী একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল—“কেন এলুম? কপালে ছিল ব’লে। আর কি ক’রে এলুম?—তার ইতিহাস এই—আমি * * উকীল প্রকাশ গুহর মেজো ভাদ্রবউ, আমার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, তখন ঐ আমার মেয়েটি সুধারানী, ও আমার সাত বছরের। বাপের বাড়ী এক ভাই ছাড়া কেউ ছিল না, তাইও তেমন নয়, আর ভাসুর বাপের বাড়ী যেতেও আমার দেন নি, তাঁর বাড়ীতেই বরাবর ছিলাম। জায়ের আমার বছর বছর ছেলেপুলে হয়, নিজেও মাথার রোগে, স্নতিকার রোগে একেবারে অসমর্থ, সমস্ত সংসারের খরচপত্র—টাকাকড়ির সব ভার একরকম আমারই হাতে। খাটিতে হতো অবশ্য তাতে বড় বেনী। শরীর যেন বইতো না। এখন পাশের বাড়ী থেকে জানাশুনা হয়ে এ’রা আমাদের ওখানেও যেতে আসতে আরম্ভ করলেন। আমার বোনা শেখার খুব ঝোঁক ছিল; এটা সেটা শিখে নিতুম। বছর দুই ধ’রে এই আসা-যাওয়া, প্রাইজ দেখতে মেয়েদের নিয়ে কুঠীতে আসা, এমনি ক’রে ওঁদের ওপোর ভক্তিতা খুব বেড়ে গেল। আর ওরাও এদিকে ক্রমাগত আমার ভজাচ্ছে যে,—যীশু ভজ, চলে এস, ওখানে থেকে দাসীর মত কেবল খাটুছ, একাদশী করলে কারু মৃত স্বামীকে সম্মান দেখান হয় না, দেহকে অনর্থক ক্রেশ দিয়ে মাত্র পাপ করা হয়। এ শুধু বিধবাদের দুর্বল ক’রে, আধ মারা ক’রে রাখবার জন্ত সমাজের প্রবল অত্যাচার! তার পর দেখ, তোমার মেয়ের এখানে উচ্চশিক্ষা হবে না, হয় ত শিশুকালেই একটা অযোগ্য বিবাহ দিয়ে দেবে। এই সব নানা কথায় মনটাও ক্রমশঃ বিগড়ে যায়। বিশেষ মেয়ের জন্তই মনে করেছিলুম যে, এতে বুঝি ওর বিশেষ কোন লাভ হবে! তাই এক রাত্রিতে ওঁদের সঙ্গেই লুকিয়ে পালিয়ে আসি। ওরা আমার দুদিন ধ’রে লুকিয়ে রাখে, তার পর পাদরী এসে আমার ও রাণীকে খুঁটান ক’রে দিয়ে ছেড়ে দেয়। প্রথম প্রথম খুবই আদর

দেখাত। সুধার জন্ত খেলনা, পোষাক, খাবার কতই না দিত। ভাস্কর আমার অনেক হাঙ্গামা করলেন; বল্লেন, বাড়ীতে নিতে আর পারবো না, তবে কানীতে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো, ওখান থেকে চ'লে এস। একা বলে, তোমায় নিয়ে গিয়ে ঘেরে ফেলবে।—ভয়ে গেলুম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, তখনও তো মতুনের নেশা আমার ছোট্টে নি।—তার পর দেখতে দেখতে উপরের খোলস খুলে গেল।”

“আপনার এখন বাড়ীর জন্ত হুঃখ হয়?”

“তা আর হয় না? সেখানে সবাইকার উপরে ছিলুম। ভাস্কর পর্য্যন্ত কোন পরামর্শটি না নিয়ে কাজ করতেন না। ছেলেমেয়ে সবই কাকীমা বলতে অজ্ঞান হতো। এক খাটুনী, তা আর এখানেই বা খাটুনিটাই বা কি এত কম? পরমা রোজগার করবো, তবে তো পেট চালাবো? নৈলে তো আর কেউ বসিয়ে খাওয়াবে না ভাই! মাইনে তো মোটে সতেরটি টাকা, তাতে হুঃজনের খাওয়া-পরা সমস্ত চালানো কি মুখের কথা? তার উপর যেখানে একখানা ঠেঁটি প'রে চপতো, সেখানে নিজের গায়েই এতটি চড়াতে হবে, তার উপর আবার ঘেরে আছে।”—চন্দ্রমুখী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, “চলে কি ক'রে?”

“কি ক'রে? থাকতে থাকতেই দেখতে পাবে। দিনরাতে যখনই সময় পাচ্ছি, মেশিন ঘুরাচ্ছি, নয় তো কাঠির বোনা, নয় তো সূচের কাজ করছি। রাণীটার পড়াশুনা এখানে আর খুব বেশী কি হবে? যতটা হ'তে পারে, প্রাপণে সে তা করচেও। শরীরও ওর ভাল নয়, নিতাই ভোগে। সেও ক্রুশের কাজটা ভালরকম পারে, ওই সব বিক্রী করি। লেসটা অনেকেই নেয়। কাটা কাপড়ও বড় মন্দ বিকোর না। এইতেই অনেকটা সাহায্য হয়। তা' তুমি কিছু জান তো? না জান তো শিখে নিও, আমি শেখাবো এখন। এ সব না করলে চলবে কি করে? এ দিকে অপরিচ্ছন্ন বা কম কাপড়ে চালাতে গেলেও বকুনি খাবে।”

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, ইহার জন্ত স্বধর্মত্যাগের কোন প্রয়োজন আছে কি না? তাহার মনে হইল, হিন্দু সমাজ যদি অস্ত্রাজ জাতির উন্নতির জন্ত একটু চেষ্টা করে? প্রত্যেক সহরে এক একটা অনাধাশ্রম স্থাপিত হয়, আর নারীশিক্ষার

সুব্যবস্থা করা হয়, তবে খৃষ্টান মিশনের কাজ অনেকখানিই কমিয়া যায়। অনাথ, পতিত অন্ত্রাজের মধ্য হইতে খৃষ্টান হইলে অনেকখানি সুযোগ পায়, তাই তাহাদের এ বিষয়ে লোভ স্বাভাবিক। হিন্দু থাকিলে তাহারা তো এতখানিও পাইত না।—কিন্তু এই যে উচ্চশ্রমীর হিন্দু বিধবা চন্দ্রমুখী গৃহ অথবা নীলিমা চক্রবর্তী—ইহারা কিসের লোভে এখানকার প্রলোভন কাটাইতে পারে না? ঘরে ইহাদের না হয় অভাব ছিল, কিন্তু অভাবেই কি শুধু স্বভাব নষ্ট হয়? তাহা নহে। ইহার কারণ, তাহাদের ভিতরে অভাব ঘটিয়াছে শিক্ষার। ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা এবং উন্নত চরিত্রের সাহচর্য্যভাবেই ইহাদের মনে প্রলোভন কাটাইবার মত নৈতিক বলেরই অভাব ঘটিয়াছিল। তাহার উপর ভিন্ন জাতি, ভিন্নধর্মী ও বিভিন্ন সমাজবাসীকে দূর হইতে বড় সুন্দর, বড় উজ্জল, বড়ই মহৎ ও উদার বলিয়া বোধ হয়। ইহারা আবার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যবান। ধনীর ঘরের দিকে কান্দাল যখন চোখ ফিরাই, সে কি তাহার মধ্যে কোনই অভাব দেখিতে পায়? নীলিমার অশ্রুতক দুই চোখ জলন্ত হইয়া উঠিল। ইহার কি কোনই প্রতিবিধান করা যায় না?

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন মিস্ রীচের অনুস্থতা জন্ত তাহার পরিবর্তে যিনি কাজ করিতেছিলেন, তিনি নীলিমাকে খবর পাঠাইয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে তাহার এক জন বিশেষ আত্মীয় আসিয়াছেন, তিনি তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চাহেন।

নীলিমা তো শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার আবার আত্মীয় কে আছে যে, তাহার সঙ্গে সে দেখা করিতে আসিবে? তাহার উপর আবার ‘বিশেষ’ আত্মীয়! জর্জেরই প্রেরিত কেহ নয় তো? জিজ্ঞাসায় জানিল, আগন্তুক বাঙ্গালী বাবু, বয়সে তরুণ এবং গায়ের রং বেশ ফরসা। তখন “কলিকাতা হইতে” কথাটা তাহার মনের মধ্যে জোর করিল। তাই তো, সে কথাটা যে সে একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল! কলিকাতার এক জন আত্মীয় তাহার আছেই তো। সে তাহার ভাই গুডেনু। সেই হয় তো কেমন করিয়া সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এটাও

যেন বিশ্বাস করা কেমন কঠিন হয়। শুভেন্দু তাহার খবর লইতে আসিবে, তাহার খোঁজ করিবে, ইহাও কি কখন সম্ভব? কিন্তু তাহা ভিন্ন আর কি-ই বা হইতে পারে? আর একটা সম্ভাবনার কথা চকিত বিজ্ঞাতের মতই তাহার মনের কোণে উদ্ভিত হইয়া পরমুহূর্তে আবার মিলাইয়া গেল। সে যে ততোধিকই অসম্ভব!

তবু নীলিমার মনে একটু সুখও হইল। এ পৃথিবীকে তাহার যেন জনহীন মরুভূমি বলিয়াই বোধ হইতেছিল, তবু যেন তাহারই মধ্যে একটিমাত্র জীবের অস্তিত্বও আজ হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

আশা, আনন্দ ও তাহার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত অনেকখানি সন্দেহ ও আশঙ্কা হৃদয়ে বহন করিয়া লইয়া নীলিমা সংশয়জড়িত দীর্ঘপদে আসিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। দাদার যে প্রকৃতি, তাহাতে সে যে তাহাকে কোন্ মূর্তি ধরিয়া কোন্ ভাষায় সম্ভাষণ করিবে, তাই ভাবিয়া সে যেন কতকটা হতভম্ব হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও অনেক বেশী স্তম্ভিত হইল, সে তাহার কল্পনাকে পরাভূত হইতে দেখিয়া। কে এ সমুখে তাহার? এ তো সে নয়! শুভেন্দুর উগ্রমূর্তি এবং তাহার ভেতর তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপ-বিষে ভরা ভীমকলের হলের মতই বিধান বাক্য প্রত্যাশা করিয়া সে-ও নিজেকে মনে মনে তরুণযুগ্মরূপে কঠিন করিয়া লইয়াই গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রতীক্ষাকারী আগন্তুককে দেখিয়াই ঘোর বিস্ময়াভিত্ত প্রায় হইয়া সে একটা অর্ধফুটধ্বনি উচ্চারণ পূর্বক পিছন দিকে ছুই চারি পা পিছাইয়া আসিল। শরীরধারী প্রাণীকে দেখিয়া এমন বিস্ময়াবিষ্ট বোধ করি কেহ ইহার পূর্বে আর কখন হয় নাই।

সুশীল তাহা বুঝিল। সে-ও আর এক রকমে অনেকখানি বিস্মিত হইয়াছিল। সে যে নীলিমাকে চিনিতে, ইহাকে দেখিয়া এখন সেই নীলিমা বলিয়া চিনিয়া লওয়াই কঠিন। প্রথমবারের মতপাতে তাহার মনে এ বিষয়ে প্রচুর সংশয়ও জাগিয়াছিল এবং সে তাহা জানাইতে উদ্বৃত্ত হইয়া পুনশ্চ একবার ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া অবশেষে তখন সাদৃশ্য লক্ষ্যে চিনিলা যে, বহুলাংশে পরিবর্তিতা হইলেও এ সেই নীলিমাই বটে। সে তখন বিস্মিত, বিস্ফারিতনেত্রে উহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই ধূসরপ্রায় অসজ্জিত রুক্ষ কেশের রাশি চিকণ-কালো চিকুয়াজালে পরিবর্তিত হইয়া এখন তাহা

তাহার মাথার উপর নবরুচি অলুয়ারী সুরহং বেণীতে নিবদ্ধ। তাহার সেই রৌদ্রতপ্ত তামাটে বর্ণ এখন আগুনে পোড়া খাঁটি সোনালি মতই সমুজ্জল ও প্রভাদীপ্ত। তাহার গালের, চিবুকের অস্থিগুলি কোথায় যেন লুকাইয়া তাহাদের সুগোল ও সুডোল করিয়া তুলিয়া সেই সুমঙ্গল ও কোমল গণ্ডে রক্তের রং যেন ধাক্কা পড়িবার উপক্রম করিতেছে। গায়ে তার গোলাপী ছিটের হাল ফ্যাসনের প্রণালীতে জ্যাকেট শাড়ী পরা। পায়ে চটজুতা। এই অপূর্ব রূপদী নারীকে কাহার সাধ্য বিশ্বাস করিতে পারে যে, এ সেই অলুকুল চক্রবর্তীর মেয়ে নীলিমা চক্রবর্তী!

তা সুশীলের মনে যদিই বা এক-আধটুকু সংশয় থাকি পড়িয়া থাকিত তো নীলিমারই ব্যবহারে সেটুকু তাহার মন হইতে চলিয়া গেল। সে যে সেই দরজার সামনে অচলাপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহার মুখের উপর এক মুহূর্তে সমস্ত শরীরের ভিতরকার সমুদয় রক্তোচ্ছ্বাসটা উথলাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কপাল দিয়া চুল বহিয়া এই শীতের দিনেও যে ঘামের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল, অথচ নিজে সে একটা কথা পর্যন্ত কহিবার সামর্থ্যশালিনী ছিল না, তাহা বেশ বুঝাই বাইতেছিল।

একটুখানি নড়িয়া দাঁড়াইয়া সুশীল কহিল, “আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।”

কণ্ঠে—তাহার আগ্রহ বা অনাগ্রহ—কিছুই প্রায় ধ্বনিত হইল না। শুধু বিস্ময়ের একটা আমেজ মাত্র পাওয়া গেল।

এতক্ষণে নীলিমা নিজের নতমুখ উঠাইল, তুলিয়া দৃষ্টি তুলিয়া সে কম্পিত দৃষ্টিতে সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল তখন বিচলিতভাবে আবার একটু নড়িয়া উঠিল। কহিল, “আমি তোমায় নিতে এসেছি, নীলিমা! আমার সঙ্গে যেতে বোধ করি তোমার কোন আপত্তি হবে না?”

সুশীলের কণ্ঠ এবার যেন করুণা-কোমল হইয়া উঠিয়াছিল।

নীলিমা তাহার পাশের দরজার কবাটটাকে নিজের ধরকম্পিত দেহভার রক্ষার অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ পূর্বক একটুখানি চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে তাহার শ্বাস লইতে অক্ষমপ্রায় বন্ধকে, শব্দোচ্চারণে প্রায় অসমর্থ কণ্ঠকে এবং ভাষাহারা জিহ্বাকে

কোনমতে স্বপ্নে আনিয়া অর্ধক্ষুণ্টে উচ্চারণ করিল,
“আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?”

সুশীল নীলিমার মুখের দিকেই স্থিরনেত্রে চাহিয়া ছিল, সে একটি নিমেষের জন্য মাত্র একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তারপর শান্ত ও সংযত স্বরে করিল,
“আমায় ‘আপনি’ ব’লে কথা কইবার তোমার দরকার নেই নীলিমা! আমি তোমায় আপাততঃ কানীতে নিয়ে গিয়ে সে রাত্রির সেই বাকী আধখানা কাজ সেয়ে ফেলবো; তার পর যে রকম হয়, সে সব আবার পরে স্থির করা যাবে।”

সুশীলের কথার ধরণ নীলিমার কানে বড় বেশী পরিবর্তিত ঠেকিল। সে যেন আর কাহার কথা, আর কে যেন বলিতেছে! তাহার পর ঐ হেয়ালিতাবের কথাটারও যেন ঠিক অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, অবাক হইয়া সুশীলের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া সুশীল কিছু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, “বুঝতে পার্ছো না নীলিমা! আমি তোমায় আধখানা বিয়ে ক’রে সেই যে পালিয়ে গিয়ে-ছিলুম, আমার সেই অসমাপ্ত কাজটাকে এবার শেষ ক’রে ফেলতে এসেছি। এক দিন তোমায় যে অপমান করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—সে অবসর আমার দেবে কি নীলিমা?”

নীলিমার পদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের শোণিত-স্কন্ধতায় সর্কশরীর তাহার শিলা-কঠিন শীতল ও নিশ্চল হইয়া পড়িল। বক্ষের মধ্যে বেদনার গুঞ্জ জমাট বাঁধিয়া যেন গুরুভারাতুর মন্দর পর্কতের মতই কণ্ঠ অবধি ভীষণ বলে চাপিয়া ধরিল। তাহারই আর্জতায় তাহার মুখ প্রথমে মর্মরশুল হইয়া গিয়া, তাহার পর শরৎমেঘের বিচিত্র খেলার মতই মুখ তাহার ক্ষণে রক্ত, ক্ষণে স্বেত ও পরিশেষে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বক্ষের মধ্যে খাঁস তাহার যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এ কি তাহার অদৃষ্টের পরিহাস, না, না এ পরিহাস সুশীলের স্বেচ্ছাকৃত নিঃস্বপ্নতা? না, তাহার মুখের দিকে চাহিলে ইহা তো বিশ্বাস হয় না!—

চেষ্টাস্থিতমুখে সচেষ্ট সংযমে সে প্রাণপণে শান্ত-কণ্ঠেই কথা কহিয়া সুশীলকে বলিল, “আপনার স্ত্রী সুলেখা, আর কেউ তাঁর স্থান অধিকার করতেই পারে না। তবে কেন এ কথা আজ বলছেন?”

এইটুকু বলিতেই সেই যেন নিজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। বলা শেষে ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল।

সুশীল এ কথার পর কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তাহা দেখিয়া নীলিমার বক্ষোশোণিত প্রায় নিশ্চল হইয়া গেল।

পরে একটা ক্ষুদ্র খাঁস মোচন পূর্বক সুশীল ঈষৎ বিম্বাদিতকণ্ঠে উত্তর করিল, “সে সব চুকে গেছে নীলিমা। সুলেখা আমায় চিরদিনের জন্যই বিদায়-দান ক’রে তার সব পাওনা-দেনা মিটিয়ে নিয়েছে। তাই আদেশে আজ আমি সাত মাস ধ’রে তোমায় দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার বিশ্বাস, তুমিই আমার স্ত্রী।”

এভক্ষণে নীলিমার অর্ধমুচ্ছিতপ্রায় চিত্তে সব কথা যেন ভাল করিয়া প্রবেশপথ পাইল। সুলেখার আদেশ! সে বিমুখী হইয়াছে বলিয়াই আজ এই একান্ত অসময়ে, জীবনের এই অত্যন্ত অবেলায়, পরিত্যক্তা নিখ্যাতিতা নীলিমাকে সুশীলের অমুগ্রহ পূর্বক স্মরণ হইয়াছে! এ মহত্ব তবে সুশীলের নয়, ইহা সুলেখার! আর এখনও সুশীলের মনপ্রাণ যে সুলেখাময়, সুলেখার জন্যই যে তাহা হাহাকার করিতেছে, সুশীলের ঐ মর্মভেদী বিলাপবানীই তাহার সাক্ষ্য। একটা হিংস্র ক্ষুব্ধ জ্বালাময় বিদ্রোহের বাহি-শিখা নীলিমার মনের বৃকে ক্রুদ্ধতেজে দীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল! তাহার বৃকের রক্ত সঘনে ছলিয়া, কেনাইয়া, মাতিয়া উঠিল। তাহার সেই হৃদয়-শোণিতের প্লাবন সমস্ত দেহের উপর সতেজে ছড়াইয়া পড়িয়া—তাহাকে যেন রক্তালোকে উদ্ভাসিত প্রভাত-সূর্য্যের মতই অগ্নিময়ী মনে হইল। আঘাতের প্রথম মেঘপরিবাপ্ত আকাশের মত জলভরা তাহার কালো হুঁচোখে একই ক্ষণে অশনি-ভরা বিদ্রোহের তীব্র তীক্ষ্ণ আলো যেন চক্‌মক্‌ চক্‌মক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর ক্ষণকাল ঝটিকাপূর্ব্বের শুষ্ক, ত্রুষ্ক, তৃষিত অশনিভরা কালো মেঘের মতই শুষ্ক থাকিয়া সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে কহিয়া উঠিল, “কিন্তু আর একটা কথা হয় তো তুমি না জেনেই আজ আমায় এই কুপাটুকু করতে এসেছ! আমার বেঁচে থাকার—এখানে থাকার খবর তুমি যার কাছ থেকে পেরেছ, সে কি তোমায় আমার সব কথাই বলে নি?”

সুশীলের মনের মধ্যে একটা অনাগত আশঙ্কার আভাস জাগিয়া উঠিয়া তাহার বুকটাকে মেঘমেঘর আকাশের মত ছক্ ছক্ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল। সে সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ঈষৎ সন্দিক্তকণ্ঠে উত্তর করিল, “জর্জ ওকবর্ণ ব’লে এক জন পাদরীর কাছে তোমার খবর আমি পেয়েছি। তিনি—”

“জর্জ ওকবর্ণ! কি আশ্চর্য্য! কোথায় দেখা হলো?”

সুশীল সব কথাই বলিল, পরিশেষে যে কথা জর্জ নীলিমাকে বলিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিয়া এই কথা বলিল, “বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমি তোমায় পাইলে হয় তো এখনও সুখী হইতে পারি। সে দিন তোমায় ফেলিয়া না গেলেই আমি ভাল করিতাম। আমি তোমায় যে ভালবাসি না, তা তো নয়!”

এ কি শুনিলি, ওরে অভাগিনি! এতদিনে তোর মরিয়া বাঁচা কি সার্থক বোধ হইতেছে না? কিন্তু এ কি এ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! কিন্তু যদি জর্জ কিছুই না বলিয়া থাকে, তবে—তবে—তবে—?

নীলিমার মুখে বেদনার প্রগাঢ় মেঘে তীক্ষ্ণ জালাভরা বিদ্রোহ চকিতে চমকিয়া গেল। তাহার মনে হইল—না, সে প্রলোভনে সে কান পাতিবে না, সম্মতান তাহার মনের কানে যে প্রলোভন-বাণী শুনাইতে চাহিতেছে, তাহা শুনিবার প্রয়োজন নাই। বুক তাহার আবার ক্ষুদ্র ঘোষের তীব্র নৈরাশ্রে ধু ধু করিয়া পুড়িয়া উঠিল। আবার একটা আগত অভিমানের মন্দর-মথিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ সমস্ত অন্তর প্রাবিত করিয়া দিয়া প্রবল কলরোলে জীবন-সিদ্ধ মহানারত্ত করিয়া দিল। তাহার রক্তহীন পাংশু মুখ সহসা অরুণবর্ণ ধারণ করিল,—শ্বেদপ্রচ্ছাদিত কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, “কিন্তু তুমি হিন্দু, আর আমি খৃষ্টান, আমার বিষে করলে তোমার যে জাত যাবে!”

এই কথা শুনিয়া সুশীল বজ্রস্তম্ভিতভাবে ক্ষণকাল নির্ঝাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার জিহ্বা যেন তাহার মুখের ভিতরে আটকিয়া গিয়াছিল। ঠোঁট দিয়া তাহার একটুও শব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইতে পারিল না। ভাষা বৃষ্টি তাহার কণ্ঠের মধ্যে হারাইয়া গেল।

নীলিমা সুশীলের হৃদশা চাহিয়া দেখিল। তাহার মনের কথা বুঝিতে তাহার একটুও

আর বাকী রহিল না। বুকিয়া তাই ঝড়ের ঝঞ্ঝার মত একটা উন্নত ক্রোধের তরঙ্গ তাহারও বুকের মধ্যে যেন আহুতাপাহুতি করিতে লাগিল। সে ক্রোধ তাহার নিজের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মকৃত্তক পর্য্যন্ত সমস্ত ভুবনেরই উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সফেন সাগরোন্মিবৎ বুক তাহার ফুলিতে লাগিল। অন্তরেরও অন্তর মধ্য হইতে একটা তীব্র তিরস্কারে নিজের প্রতি স্বয়ং নিশ্চয় হইয়া উঠিল। কম্পিত তীব্র কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, “আমি খৃষ্টান, আমার বিষে ক’রে তুমি তোমার হিন্দুত্বে আমার ফিরিয়ে তুলে নিরে যাবে, সে সামর্থ্য তো তোমার নেই; বরং আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজেকেই নেমে আসতে হবে—তোমার হিন্দুত্ব তুমি হারাবে। কলির ব্রাহ্মণ যে তোমরা! সে ব্রহ্মতেজ তোমাদের কোথায়—যাতে নিজে মুক্ত থেকে অপরকে মুক্তি দেবে, পতিতকে উদ্ধার করবে? হিন্দুসমাজ ত্যাগের সমাজ,—গ্রহণ করবার তো নয়। তাই আমার এই দুদিনের না বুঝবার ভুলে চিরনির্কাসন দণ্ড মাথায় ক’রে আমাকে যে বইতেই হবে; আর আমার এখানে ফিরে আস-বার পথ নেই! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তার জন্তই বা দায়ী কে? আমি কি আমার ধর্মকে জানতে পাওয়ার কোন সাহায্য আমার সমাজের কাছে পেয়েছি যে, তাকে না জানার জন্ত—অজ্ঞতার জন্ত পাপী হব? গীতা কিনে ক’জন কাঁচ ছেলেমেয়ে পড়তে বসতে পারে? তার খবরটা জানেই বা ক’জন? আর ছোট বেলায় অত বুদ্ধি থাকেই বা কার? গৃহে ধর্মশিক্ষা নেই—স্কুলে বৈদেশিক শিক্ষা, তাতে যদি প্রতিকূল অবস্থায় প’ড়ে কেউ হঠাৎ একটা ভুল ক’রে দু’দিনের জন্ত সরেই যায়, আর কি সে ফেরার জন্ত পথ পাবে না? তা যদি না পায়, তবে তার তখন উপায় কি? সে তো তাহার নূতন ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছে না? সে যে তাহার পুরাতনের জন্তই বুক ফেটে ম’রে যাচ্ছে—সে যে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্ত নিজের প্রাণোৎসর্গ করতেও অপ্রস্তুত নয়। তবে কেন সে সুযোগ পাবে না?”

সুশীল অগ্রসর হইয়া আসিল। নীলিমার সম্মুখীন হইয়া ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠে তাহাকে বাধা দিয়া সে কহিল, “নীলিমা! তাই যদি হয়, যদি সত্যি তুমি ভুল শোধরাতে চাও—তবে তুমি অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে

চ'লে এস; আমি আমার সকল অপরিবর্তিতই রাখ-
লেম, তোমার পুরাতনকেই তুমি আমার ফিরিয়ে
পাবে। হিন্দুর স্ত্রী হয়ে আমার তুমি হিন্দুকেই ফিরে
আসবে।”

নীলিমার প্রবল উত্তেজনায় যেন শ্রোতের মুখে
উপলব্ধির মত—ঝড়ের মুখে তুলার শির মত—তখনই
এক মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।
তাহার রুদ্ধদীপ্ত সতেজ মূর্তি অবসাদের অবসন্নতায়
যেন সহসাই গলিয়া রহিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিমেষের
মধ্যে বিবর্ণা অশ্রুময়ী হইয়া যোড়হাতে ও শান্ত মন
কণ্ঠে সে কহিল, “তোমার এ দয়া আমার চিরকালই
স্মরণ থাকবে। কিন্তু তুমি তো তোমার সমাজের
সমাজপতি নও! তোমার এ দানকে লোকে হয় তো
না বুঝে, না ভেবে দেখেই লোভের পর্যায়ে ধরে
নেবে। আর আমি নিজে? আমি জানবো, আমি
ভিক্ষা পেয়েছি। ভিক্ষা! দয়া!—না, তাতে এখন
আর আমার তৃপ্তি হবে না। যদি সমাজ আমার
ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে আমার গুচি গুচ
করে আমার তার নিজের কোলে ফিরিয়ে নেয়,
তবেই আমি সেখানে যেতে পারি, নতুবা গায়ের জোরে
অথবা কপটতার আশ্রয়ে এসে, অথবা মনকে আঁখিঠেরে
—না, এর কোন একটাতেও আমি রাজী নই।”

উত্তেজনায় নীলিমার খাস রক্ত হইয়া আসিয়াছিল
বলিয়াই বোধ করি সে হঠাৎ কথা কহিতে কহিতে
থামিয়া পড়িল, অথবা যে কথাটাকে সে বলিতে চাহে,
সেটাকে ঠিক গুছাইয়া উপযুক্ত ভাষা দিয়া সাজাইয়া,
নিজ মনের সমুদয়খানি জালা দিয়া জালাইয়া, তাহাকে
প্রকাশ করিতে না পারার অক্ষমতার বিপর ও বিব্রত
হইয়াই থামিয়া গেল। তাহার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত
বেদনা ও অভিমানকে সে লোকচক্ষুতে তাহাদের
প্রকৃত স্বরূপে যদি তুলিয়া ধরিতে না পারে, তবে
তাহার লঘুভাবে বহিঃপ্রকাশ যে না হওয়াই ভাল!

সুশীল আনতমুখে, এক মুহূর্তকাল চুপ করিয়া
থাকিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্বক ধীরে
ধীরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর নীলিমার দিকে
ফিরিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “তা হ'লে তোমার
জন্তে আমার কিছুই আর করবার নেই নীলিমা?”

নীলিমা অশ্রুদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের সহসা
অন্তর্হিতপ্রায় মনের বলকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য
প্রাণপণে যুক্তিতেছিল। তাহার গুরুভারে আহত

আতুর চিত্তে প্রতিহিংসার হিংস্র আগুন জালাইয়া
দিয়া পর-মুহূর্তেই তাহার দাহ-জালায় ঘেন্না নিজেই
একান্ত অস্থির—বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে
সে ইতঃপূর্বে যেমন সম্পূর্ণ বলি দিয়া শুধু প্রতিশোধের
একটা উদ্যম উন্নত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল,
যে আনন্দ আত্মঘাতী, তাহার মরণ-মুহূর্তে প্রতিশোধের
পাত্রের অন্ততপ্ত মুখের পানে চাহিয়া উপভোগ করিয়া
যায়, নীলিমাও সুশীলের চিত্তে তেমনই একটা প্রবল
অনুতাপের তাপ অনুভব করিয়া তেমনই আত্মপ্রসাদ
উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু অতি সহসা মনের সেই
সর্বনাশী আনন্দটা তাহার যেন পরিবর্তিত হইয়া
আসিয়া তাহার পদাঙ্ক হইতে কেশাগ্রাবদি তাহাকে
দারুণ লোভে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মন তাহার
কত কি যেন প্রলোভনের মধুর রাগিনী কানের কাছে
গুঞ্জরিয়া তুলিল। জমাট ঘেষের দারুণ গুমোট কাটিয়া
জলের স্রোত ফাটিয়া পড়ে পড়ে হইল। কিন্তু তখনও
প্রাণপণে সে নিজের সহিত বুদ্ধ করিতে ছাড়িল না।
মানবীয় সকল বাসনা-কামনা সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে সবলে
পর্যভব করিয়া, মনের মধ্যে তাহার তীব্র বৈরাগ্যের
শূন্যতাকে জাগাইয়া তুলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া কোন
প্রকারে অবিচল কণ্ঠে সে উত্তর পাঠাইল, “কিছু না।”

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমা চলিয়া যাইবার
জন্তই বোধ করি সুশীলের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে
ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলিয়া
যাইবার আর কোন আগ্রহই তাহার দিক হইতে দেখা
গেল না।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট শ্রুত্যাখ্যানের অপমান সুশীলকে
যেন মনের মধ্যে একটু তীব্র হইয়াই বিধিল। নীলি-
মার গ্রন্থানোত্তত ভাবটাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঈষৎ
চঞ্চল হইয়াও উঠিয়াছিল, তাই তাহাকে অনুসরণ
করিবার ইচ্ছায় পুনশ্চ দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া
আসিয়া একটুখানি ব্যগ্রভাবেই কহিয়া উঠিল, “আমার
কিন্তু আরও একটু কিছু বলবার ছিল।”

নীলিমা ক্ষণকাল তদবস্থাতেই অপেক্ষা করিয়া
তাহার পর সুশীলের দিক হইতে কোন সাড়া-শব্দ না
পাওয়াতে অগত্যাই অনিচ্ছুক মৃদুভাবে নিজের বর্ণ-
লেশহীন বিকৃত মুখ তাহার সামনে ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া
তাতিমিক মৃদু ও স্থলিত কণ্ঠে কহিল, “বল।”

সুশীল তখন একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষ
কহিল, “আমায় বিয়ে যদি তুমি নাই কর, নাই বা

করলে; কিন্তু আমার সাহায্য নিতে তো আর দোষ নেই? আমার বোনের মত থাকবে, আমার যথা সাধা আমি করবো; আমার সঙ্গে চ'লে এস,—এখানে কি তুমি স্থখে আছ?

এ কথায় রাগ করিবার মত কোথায় কি আছে, তাহা না বুঝিতে পারিলেও নীলিমার বুকের ভিতরে যে একটা ক্রোধের প্রসঙ্গ বহুশিখা ধক্ ধক্ করিয়া সুনীলের এই সবিনয় ও সহৃদয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া উঠিতে গেল, তাহার বহিঃপ্রকাশকে যথাসাধ্য দমনে রাখিলেও নিজের কাছে সে সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতে পারিল না। বহুক্ষণের পর আনত মুখ এইবার উন্নত করিয়া সে প্রোজ্জ্বল নেত্রে সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া স্পষ্টস্বরে বলিল, “যে দিন আমার তুমি আশখানা বিয়ে ক'রে ফেলে রেখে চ'লে গেছলে, সে দিনের অপেক্ষা আজ কি তুমি আমার বেশী অস্থখের মধ্যে দেখতে পেলে? এখন তো আমি বাইরে এসে নিজের পথ নিজে তৈরী ক'রে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ! তবে আমার অনর্থক তোমার মতন এক জন নিঃসম্পর্ক লোকের ভিক্ষা নেবার জন্য আমার অনর্থক তুমি ডাকাডাকি করছো কেন? আর তো আমার তার কিছু দরকার নেই।”

নীলিমা এই যে কথাগুলো বলিল, ইহার মধ্যে তাহার স্বেচ্ছাকৃত আঘাত-দণ্ড দেওয়া ছিল না, কণ্ঠে তাহার কলহ-কাকলী ঝঙ্কার করে নাই, তথাপি সুনীলের বুকের মধ্যে ঐ যথার্থ সত্যবাণী যেন তপ্ত শেলের মতই আঘাত করিল। কিছুক্ষণ সে বিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর অত্যন্ত দুঃখিত কণ্ঠে কহিল, “তা হ'লে আমার কাছ থেকে তুমি কিছুই নেবে না?—ধাক্, যদি দরকার না থাকে, তা হ'লে নেবেই বা কেন? আর সত্যকথাই বলি, আমি নিজেই তো আজ পথের কুকুর, আমি তোমায় দেবোই বা কি? আর কোথা থেকেই বা অত দেবো?—কিন্তু একটা কথা ব'লে যাই নীলিমা! আমার বা তোমার বাপের অপরাধে তুমি তোমার সমাজধর্মকে ত্যাগ ক'রে ভাল করনি। শত ক্রটি থাকলেও এ যে তোমার নিজের ধর্ম; এ তোমার পিতৃ-পিতামহের দ্বারা সেবিত নিজের সমাজ; এর যা দোষ ক্রটি আছে, তা সে সমাজের বর্তমান লোকে-দেয়ই দোষে। সেই দোষের সংশোধন-চেষ্টা যার মতটুকু শক্তি, তা দিবে করাই সমস্ত, তাকে ত্যাগ

করবে কি অধিকারে? আপনার জন মূর্থ অজ্ঞ হ'লেও তাকে কি কেউ ফেলে দেয়?”

সুনীল আর অপেক্ষামাত্র না করিয়া নীলিমার পাশ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নিজের জীবনটাকে তাহার তখন এতই নিরর্থক ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছিল যে, এমন ভাবে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতেও যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। এখানে তাহার যে প্রয়োজন ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহ-জীবনের সকল কার্য্যই যেন আজ সম্পূর্ণ হইয়া গেল বলিয়াই সে সেই ক্ষণে অন্ততব করিল।

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া স্নেহে তাহার তির্য্যাস্ত কার্য্যশ্রোতে যখন নিজেকে যথাপূর্ব্ব নিমগ্ন করিয়া দিল, তখন বিপ্রদাস বাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেলেন। দুর্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট বস্ত্র পশুকে যেমন কখন কখন তাহার প্রতিপালকের কাছে নিজের চিরহিংস্র প্রকৃ-তিকে একান্ত বশতায় সংযত ও সংহত করিয়া লইয়া শাস্তমুষ্টি ধরিতে দেখা যায়, বিপ্রদাসেরও এই প্রোঢ় বয়সের একমাত্র অপত্যস্নেহ তাঁহাকে তাহার কাছে তেমনই নিব্বীণ্য ও নিরীহ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুন্দরী তরুণী ভাৰ্য্যা তাঁহার প্রকৃতি দিয়া যে দুর্দান্ত বাঘকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, এই শাস্তমুষ্টি ও দীপ্ত-তেজা বালিকা তাহা অবলীলাক্রমে ঘটাইয়াছিল। বিপ্রদাসের সকল বঠোরতা এইখানেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাই সুনীলসম্বন্ধীয় ওই দুর্ঘটনায় দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহে যখন জিদ করিয়া ভুবনবাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিতে ভরসা না করিলেও মনে মনে দাক্ষণ অস্থিতি অনুভব করিতে লাগিলেন। স্নেহের অকোমল স্নেহময় প্রকৃতি তাঁহার অপরিচিত হইলেও অত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে তাহার তীব্র বিরাগও তেমনই যে তাঁহার সুবিদিত। সে যদি সুনীলকে পাপী বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তবে তাহার সে বিশ্বাস পরিবর্তন ঘটান বড় সহজ হইবে না। তাই বাড়ী ফিরিয়া মেয়েকে সহজভাবে নিজের স্থান গ্রহণ করিতে দেখিয়া

তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্নের হস্তমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন এবং এ ঘটনাটা সত্যবতীর নিকটে উত্থাপন করারও আবশ্যকতা বোধ করিলেন না ; কারণ, তাঁহার জানা ছিল, এই সকল বাস্তবজগতের পুরুষোচিত দুর্বলতাকে সত্যবতীও মনে মনে ঠিক সহ্যভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।

অনুকূলের ব্যাপারটা মিটাইতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। মেয়ে নিরুদ্দিষ্টা, শ্মশানবাটে জলে ডুবিয়া মৃত্যুই প্রমাণ দাঁড়ায়, অগত্যা নগদ দুই শত মাত্র টাকাতেই অনুকূল বিপ্রদাসের ভাবী জামাতার অনুকূলেই পুলিশে এজাহার দিয়া আসিল। মেয়ের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না, সে এক খুঁটান যুবাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিল, তাই সুশীলকে সেই সে কথা জানাইয়া পলাইতে সাহায্য করে, পরে জাতি যাওয়ার ভয়ে পিতাকে অন্ত বরে বিবাহ দিতে উত্তত দেখিয়া কান্নাকাটি দ্বারা মরণাপন্ন মায়ের মৃত্যু ঘটাইয়া সেই সুযোগে জগে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ইত্যাদি।

পূর্বে অনুরূপ সন্দেহ ঘটিলেও ইহাই যথার্থ প্রামাণ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। এ দিকের এই গোলমালাটা মিটাইয়া ফেলিয়াও বিপ্রদাস ওদিকে ভুবনবাবুকে বিবাহের দিন স্থির করিতে অনুরোধ জানাইয়া সত্যবতীর প্রতিও যথাচার্য্যে মনোযোগী হইবার আদেশ দিলেন।

বেনারসীর কারবারী এক খাণ্ডিওয়ালা একরাশি সাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, কয়েকখানা ভাল ভাল সাড়ী বাছাই করিয়া বিপ্রদাস দ্বীর কাছে অন্তরে পাঠাইলেন—তাহার মধ্যে দুই চারিখানা পছন্দ করিয়া লইবার জন্ত। সত্যবতী আপনি পছন্দ করিয়া তাহার পর মেয়েকে ডাকাইয়া বলিলেন, “এই টকটকে লাল সাড়ীতে বড় বড় জরির ঝাড়ের কাজ দেওয়া সাড়ীখানা তোমার বিয়ের জন্ত রাখবোই, তা ছাড়া এর মধ্যে ক’খানা তোমার পছন্দ হয়, দেখু দেখি।”

সুলেখা কাপড়গুলার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, অন্তরিক্তে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া সে শুষ্ক স্বরে উত্তর করিল, “কাপড় আমার একখানাও পছন্দ নয় মা, কাপড় তুমি সবই ফেরত দাও।”

মা বলিলেন, “সে কি রে? এমন চমৎকার কাপড়, তোমার কিছু পছন্দ হলো না? সোনার তারের ওই নক্সাকাটা সাড়ীখানা সত্যি চমৎকার। এইটে রাপু, আমি ফুলশয্যায় দোব। আটশো টাকা দাম,

তা হোক গে। এই রূপার তারে সোনার কাজগুলো, আর নীল রংয়ের বাদলা সাড়ী দুখানা বাক্স দিতে লাগবে, ময়ূরকলী রংটাও কিন্তু তোকে মানাবে বেশী। ওখানাও নিতে হবে। সবগুলোই তো দেখছি সুন্দর!”

সুলেখা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া নিজের আঙ্গুলে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইতেছিল, তেমনি থাকিয়াই সে ধরা গলায় জবাব দিল, “ও সব কেন বলছো মা; তুমি কি জানো না, আমার বিয়ে হওয়া এ জন্যে অসম্ভব! যা হবে না, তার আর মিথ্যা আলোচনার ফল কি?”

সত্যবতী এবার সাক্ষর্য্যে মুখ তুলিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ও নেত্রে সত্তর সন্দেহ অতিমাত্রায় ভরিয়া উঠিল, সাক্ষর্য্যে তিনি বিস্ময়বিহ্বলভাবে কহিয়া উঠিলেন, “সে কি লেখা! এ তুই কি বলছিস্ মা? বিয়ে অসম্ভব! কেন রে? কখন কি হলো এর মধ্যে?”

সুলেখা একটু চকিত হইয়া মার দিকে চাহিল, তাঁহার বড় বড় চোখে ব্যথিত বিস্ময়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া সে সবই বুঝিল, এবং বুঝিল বলিয়াই পিতার প্রতি মনটা তাহার বিষম বিরক্ত বোধ করিল। তিনি কিছুই তাহা হইলে তাহার মাকে জানান নাই। আশ্চর্য্য!

নীরস গুরুকণ্ঠে সে বলিল, “বাবুজীকেই আগে তুমি জিজ্ঞেস করো, তিনি যদি এখনও তোমায় না বলতে পারেন, তা হ’লে আমিই না হয় তোমায় সব বলবো, কিন্তু তাঁরই বলা উচিত।”

এই বলিয়াই সে চঞ্চল হইয়া চলিয়া গেল। মায়ের সেই নিশ্চিত আশাত্ত্বের তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া তাহার নিজের দৃঢ়তাও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে মায়ের সঙ্গ আর সহিতে পারিতেছিল না। সে যে মায়ের এক সন্তান।

এ দিকে স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া সত্যবতীও জিদ ধরিয়া বসিলেন যে, একরূপ অবস্থায় ওখানে তিনি কতাদান করিতে পারিবেন না। সুলেখাকে এক দিন সেই কথাই বলিলেন, বলিলেন যে, সুলেখার পিতা এখনও চিত্ত স্থির করিতে পারেন নাই বটে, তবে তিনি তাঁহাকে যেমন করিয়াই হোক এ বিষয়ে রাজী করিবেন। কেন, দেশে কি পাত্রের এতই অভাব হইয়াছে যে, সুলেখার মত মেয়েকে অমন অপাত্রের হাতে দিতেই হইবে? সে তিনি থাকিতে ঘটবে না। মায়ের মুখের আশ্বাস-বাণী শুনিয়া

সুলেখার মুখের কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটল না, সে মায়ের দিকে তাহার চিরসিকান্তে ভরা অবিচল নেত্র দুটি তুলিয়া ধরিয়া শাস্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি মনে করছো, আবার আর এক জনের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে নেবে, আর তাই আমি করবো?”

সত্যবতী মেয়ের মুখের এই সুস্পষ্ট জেরায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া গেলেও মনোভাব গোপন করিয়া সহজভাবেই জবাব দিলেন,—“সে কি? এক জনের সঙ্গে বিয়ের কথা হ’লে কি আর তার অন্তের সঙ্গে বিয়ে হয় না? একবার ছেড়ে শতবারও এমন বিয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে।”

সুলেখা নিজের চোখের দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর তেমনিভাবেই স্থির রাখিয়া কঠিন স্বরে কহিল,—“আর যে যা বলে বলুক, মা, তুমি আমার ও কথা আর একবারও বলো না। সত্য-সাধবীর মেয়ে আমি, আমার আট বছর বয়স থেকে এক জনের কাছে উৎসর্গ ক’রে রেখে আজ যদি তোমরা সে দান ফিরিয়ে নিয়ে অপরকে আবার তাকেই দিতে যাও, তোমরা দত্তাপহারী তো হবেই, আর আমি হবো—অসতী। তা কি ভেবে দেখেছ?”

“লেখা! লেখা!—অমন কথা বলিসনে!” মেয়ের কথায় সত্যবতীর বুকে যেন কে চাবুক মারিল, ঠিক তেমনিই আর্দ্রব করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে গেলেন,—“বিয়ে তো আমরা দিইনি, শুধু মুখের কথা মাত্র দিয়েছিলুম, তার জন্ত—”

সুলেখার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরই তাহা একান্ত মলিন হইয়া গেল, সে এবার মায়ের দৃষ্টি পরিহারপূর্বক নত নেত্রে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, “তোমাদের পক্ষে হয় তো সেটা শুধু মুখের কথাই হবে, মা, কিন্তু আমি তো তাকে কেবল মুখের কথাই মনে করতে পারিনি। এত দিন ধ’রে যে বাড়ীকে আমার শ্বশুরবাড়ী ভেবে এসেছি, যাকে আমার—”

সুলেখার ব্যাকুল কাতর কণ্ঠ অক্ষুণ্ণ হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া আসিয়াছিল, আবার সেই মূর্চ্ছিত মূর্চ্ছনাকে সন্তর্পণে জাগাইয়া তুলিয়া সে নিজের বক্তব্য সমাধা করিল। কোন বাধাকেই যেন সে মানিয়া উঠিতে পারিল না;—“যাকে আমার স্বামী ভেবেছি, আমি কেমন ক’রে আবার সে সব বদল ক’রে—আর এক জনকে আবার তারই জায়গায়—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে যেন সেই সম্ভাবনার একান্ত ভয়ভ্রস্ত হইয়া উঠিয়া সচমকে বলিল, “তা কোন মতেই হবে না মা, আর কারকে বিয়ের কথা মনে হ’লে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যায়—সে কিছুতেই আমি পারবো না, তুমি বাবাকে সেই কথা বুঝিয়ে বলো। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, তা হ’তে পারে না?”

মেয়ের সেই উত্তেজনাকর সত্যবতীর প্রভাদীপ্ত অনৈসর্গিক মুখের দিকে অনিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া চাহিয়া সত্যবতী মূর্ত্তির মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার প্রত্যেক কথাটি যেন অনির্কলনীয় সত্য, সঙ্কল্প সূদৃঢ় ও অকাট্য, সে বিষয়ে তাঁহারও আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না এবং সত্য নারীর অন্তর দিয়া ইহার যৌক্তিকতাকেও তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

ইহার পর সুলেখার মা-বাপে মিলিয়া কি পরামর্শ হইল, জানা নাই, কিন্তু সুলেখার মায়ের পাত্ৰান্তরে কন্তাদানের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গেল। এক দিন কথায় কথায় তিনি আবার এই কথাটাই তুলিলেন। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, “তা হ’লে সুশীলের সঙ্গেই বিয়ে হোক, তাঁর তো বরাবরই তাই ইচ্ছা। বলেন, বিয়ে হ’লেই সব গুধু যাবে। আর তার খবর নিয়েও জেনেছেন, তাতে তার দোষও তো বেশী নয়—”

শুনিয়া সুলেখা বিদ্যাম্পৃষ্টের মতই ছিটকাইয়া উঠিয়া তেমনি জ্বালাভরা স্বরিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “ও কথা আমার বলো না মা! বিয়ে আমার হওয়া আর সম্ভব নয়! যার মাথায় অত বড় কলঙ্কের বোঝা, তাকে তোমরা কোন্ হিসেবে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও?”

মা তখন ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “তবে আমরা কি করতে পারি, তাই বল মা! ওকও বিয়ে করবি না, অন্তকেও না, এর কি উপায় করি লেখা?”

সুলেখা মুহূর্ত্তে শ্বাস লইয়া উদাস কণ্ঠে উত্তর করিল, “তাই তো বলছি মা, এর তো কোন উপায়ই নেই, তাই এমন করেই কাটাতে দাও মা। করবার পথ এর কোন্‌খানে আছে যে, কিছু করবে তোমরা?”

“চিরদিনই আইবুড় হয়ে থাকবি তুই? লোকে তাতে কি বলবে, সুলু?”

সুলেখা ব্যগ্র হইয়া বলিল, “আর যা বলে বলুক মা! তোমার মেয়েকে দ্বিচারিণী তো আর কেউ বলতে

পারবে না। হিঁদুর মেয়ের পক্ষে সেই যে যথেষ্ট।
এ যে সীতাসাবিত্রীর দেশ মা।”

সত্যবতী বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস
পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার একমাত্র মেয়ের বিবাহে
কত সাধ, কত আশাই যে তিনি মনের মধ্যে করিয়া
ছিলেন। উঃ, পৃথিবীটা কি? যেখানে বেশী আশা,
সেইখানেই কি তেমনি ওজনের মাপে মাপিয়া নিরা-
শার নিরানন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া জমিয়া উঠিবে? কে
জানিত যে, তাঁহার অত আদরের সুলেখার ভাগ্যেই
এমন ধারা বিড়ম্বনা লেখা ছিল!

বিপ্রদাসবাবু নিজেরও বিধিযুক্ত মেয়েকে বুঝাইতে
চেষ্টা করিলেন। সুলেখার এ যে একেবারেই অস্তিত্ব-
হীন অনাবশ্যক খেয়ালমাত্র, তাহাও তিনি বহুতর
গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু
সুলেখার সেই শাস্ত মুখেই বিনীত অথচ সুদৃঢ় বাণী—
“আমি মাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি বাবা, তিনি
আমার হয়ে আপনাকে বুঝাবেন। আর আমি কিছু
বলবো না।”

ইহার আর রদ-বদল হইল না। মা মনের ক্রোধে
অশ্রুপাত সম্বল করিলেন, পিতা ক্রোধকণ্ঠিন মুখে তর-
স্কার করিতে লাগিলেন, মেয়ে নীরব দৃঢ়তায় একনিষ্ঠ-
ভাবেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া রহিল। শুধু তাহার
সারা চিত্ত অসহ্য ক্রন্দনের আর্ততায় ভুল্লিষ্ঠ হইয়া
নীরব হাহাকারে কঁাদিয়া কঁাদিয়া বলিতেছিল,
“তোমায় যত দূরেই ঠেলিয়া ফেলি না কেন, তুমি
আমারই! তুমি আমারই!”

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীতল বর্ষাধারায় চোখের জলের তপ্তধারা মিশা-
ইয়া দিয়া নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি অবসানে ক্লান্তদেহে
প্রান্তচিহ্নে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই
দাসী আসিয়া একখানা খামে মোড়া চিঠি সুলেখার
হাতে দিয়া বলিল, “ডাকপিয়ন ভোরের বেলা দিয়ে
গেছলো, আপনি ওঠেননি বলে এতক্ষণ দিইনি।”
মুখের দিক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, “জামাই
বাবুর চিঠি না দিদিমনি?”

সুলেখার চিন্তামান পাণ্ডু মুখ এই ইঙ্গিতে এক-
বারের জন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার

পরক্ষণেই সেই আকস্মিক তপ্ত শোণিতোচ্ছানটা একে-
বারে নিঃশেষে যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়া তাহার সেই
বেদনাপাণ্ডুর মুখখানাকে কে যেন হৃদে রং মাখাইয়া
দিল। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে মাটির ঠাকুরের স্মৃতি
মুখকে যেমন দেখায়—সুলেখার সুন্দর মুখখানাকেও
ঠিক তেমনই প্রাণহীন বলিয়াই বোধ হইল। একটু
একটু করিয়া তাহার মধ্য হইতে জীবনের তেজ যেন
লুপ্ত দৃষ্ট হইল। দাসী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, সে এক
পা এক পা করিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছা-মহরগতিতেই
নিজের সমস্ত পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্বক দ্বারে
খিল লাগাইয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ
যেন চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিতেও তাহার ভরসা হইতে-
ছিল না, মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা তাহার জন্ত যতই প্রবল-
ভাবে জাগিয়া উঠিল, বাহিরের দিক হইতে হাতের
আঙ্গুলগুলো ততই যেন শিথিল হইয়া পড়িয়া তাহাকে
ঐটুকু সহায়তা করিতেও তাদের দারুণ অনিচ্ছা খ্যাপন
করিতে লাগিল। তাহার কেবলই ভয় করিতে
লাগিল, চিঠি খুলিয়া সে হয় তো দেখিবে, সুশীল লিখি-
য়াছে, নীলিমাকে পাওয়া যায় নাই, আর না হয় তো
লিখিয়াছে—তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং এখন
সে সুশীলের বিবাহিতা স্ত্রী—এই দুটো খবরই যেন
সুলেখার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। একে সুশীলের
দ্বারা নারী-হত্যায় তাহার আশা—তাহার চিন্তা—
তাহার প্রতীক্ষা ইহ-পরলোকে চিরদিনের মত
নিঃশেষ! আর অপরে এ জন্মের মতই তাহার স্নেহের
সকল সম্বন্ধের উচ্ছেদ!

কিন্তু হোক তা, চিরদিনের মত হারানোর চেয়ে
বুঝি সেই ভাল! তবু তো সুলেখা নীলিমার স্বামীর
চিন্তা করিয়াও জীবনের বাকি দিনগুলো এক রকমে
কাটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এই চিন্তা করিয়াই
সহসা সুলেখার সমস্ত জীবনটাই যেন শূন্যময় হইয়া
গেল। তাহার মনে হইল, লোকসমাজে আর সে
বুঝি নিজেকে বাহির করিতেই পারিবে না, এমন কি
নিজের মা-বাপের সাক্ষাতেও না।

এই পত্র আসার সংবাদে মা আসিয়া যখন ব্যথিত
নিঃশব্দ প্রাণে দৃষ্টি তরিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইবেন,
তখন তাঁহাকে সে যে কি উত্তর দিবে, তাহা সে কেনা,
মতেই যেন হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইল না। নিদ্রের
সে ভোশেষ করিয়াই দিয়াছে; কিন্তু বাপ-মায়ের চোরে,
বড় মর্মান্তিক মঙ্গলার সে কারণ হইয়া জন্ম লইয়া

তাহা ভাবিয়াই তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। চিঠি-খানা খুলিবার চেষ্টাও এই প্রকার মানসিক অবস্থায় পড়িয়া সে বহুক্ষণ পর্য্যন্তই করিতে পারিল না। যেন তাহার ভিতরে একটা করাল কালসর্প লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে, খুলিতে গেলেই সেটা তাহাকে বিষদাঁত ফুটাইয়া দিবে, এমনি একটা ভয় তাহার করিতে লাগিল।

বর্ষাদিনের ক্ষণিক সূর্য্যপ্রকাশ ইতোমধ্যেই কজ্জল-কৃষ্ণ মেঘব্যাপ্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রামণ জলদের ঘনচ্ছায়ায় বিশাল বিশ্বকে সঙ্কীর্ণতর প্রতীয়মান হইতেছিল। গুরু গুরু মেঘ-গর্জনে ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সুলেখা পত্র-হস্তে সেইরূপ গুরু স্পন্দিত বক্ষে মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে ফুটন্ত কদম্বগাছের উপর দিয়া প্রমত্ত পবন যেন তাহারই গোপন-সঞ্চিত বেদনা বহিয়া আর্দ্র হা হা রব তুলিয়াছিল। তাহারই নিশ্বাস পীড়নে ফুটন্ত কদম্বকেশর বিরহিণী নারীর অশ্রু-বরিষণের মতই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়া জানালা দিয়া ঝরা পাতা, ধসা পাপড়ি অজস্র পরিমাণে উড়াইয়া আনিল। সূর্য্যলের সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—“সবিনয় নিবেদন—

তোমার অনুমানই সত্য, নীলিমা মরে নাই, সে বাঁচিয়া আছে!”—সুলেখার হৃৎপিণ্ড সহসা দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল, আঃ, তবে সূর্য্যলের কার্য্য নারী-হত্যার সহায়ক হয় নাই? ভগবান!—পরক্ষণেই চলন্ত মেঘের কবলে পতিত সূর্য্যালোকের প্রভার মতই তাহার সেই আকস্মিক লোহিত সমুজ্জলতা একেবারেই যেন স্নান ও মসীময় হইয়া গেল। বোধ হইল, তাহার চারিদিক বেড়িয়া একটা প্রলম্ব-রাত্রির বীভৎস দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রমত্ত প্রমথের চরণভঞ্জে তাহার বকের পাঁজরাগুলো শুদ্ধ যেন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

তাহার পর সুলেখা আবার পড়িল—“সে এখন * * * এর মিশনে বাস করিতেছে। সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, আমার প্রস্তাব সে গ্রহণ করে নাই এবং এখন দীক্ষিত খৃষ্টান—”

সুলেখার হাত হইতে পত্রখানা স্থলিত হইয়া জলে পতিত হইল। তার মনে হইল, সেও যেন উড়া যাইবে। তার স্মৃতির মধ্যে একদিকে দুই

দিক হইতে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের বজ্র হুকুল প্রাবৃত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিল। হর্ষ ও শোক, আশা ও নিরাশা, আগ্রহ ও নিরুদ্ভমতা এই উভয়ে মিলিয়া তাহাকে যেন এইক্ষণে পীড়িত ও প্রকুর করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলিমার ঐ প্রকার একটা ভুল পরিণামই যে শেষ পর্য্যন্ত ঘটিল, সেই জন্ত তাহার এ হর্ষ ও নিরাশা, কিন্তু সেটা যে আরও বেশী মন্দ হয় নাই এবং সুশীল যে তাহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত-চেষ্টা করিয়া অংশেবে মুক্তিলাভ করিতে পারিল, সেই আনন্দে- তাহার সকল দিনের সকল কষ্টই যেন সে তুলিয়া যাইতে বসিল। চিঠিখানার শেষ পর্য্যন্ত আর সে মন দিয়া পড়িবার দরকারও মনে করিল না। সে কথা তাহার আর মনেই পড়িল না। কেবল এত দিন ধরিয়া সে সূর্য্যলের প্রতি যে সকল নিশ্বাস ও কঠোর ব্যবহারগুলা করিয়া আসিয়াছে, সেইগুলার কথাই মনে করিয়া এখন তাহার মর্ম্মের বাঁধন যেন চড়চড় করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল এবং সে একটুখানি স্তথের সহিত বিগত বিরাট শোকের বিপুল অশ্রু একত্র করিয়া দিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আবার তখনই তাহার স্মরণে আসিল যে, আজ সে নিজের কর্তব্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে উত্তত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও যে তাহার সেই ক্ষণিক মোহের জলন্ত স্মৃতি তাহাদের স্বাক্ষরানে পাষণ-প্রাচীর তুলিয়া রহিয়াছিল, আর কি কখন ইহাকে ভাঙ্গিয়া কেলিয়া তাদের মধ্যের এ ব্যবধান দূর করিতে পারা যাইবে? না না, সে ছরাশা বৃথা। বাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। কখনও না, কিছুতে না, নিজের প্রাণ দিলেও না। কিন্তু—কিন্তু তবু—তবু কি কখন সূর্য্যলের সে দিনের সে নিগ্রহ সে তুলিতে পারিবে? পাপ তো করে অনেকই, প্রায়শ্চিত্ত তাহার কয় জনে করে? এত মহত্বে কাহার? সুলেখার আদেশের এ সম্মান আর কে রাখিত? হায় হায়—কি দুর্ভাগিনী সে, যে এমন স্বামী হারাইল।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন নীলিমার সহিত সাক্ষাতের পর সূর্য্যলের মনে হইল, এ জন্মের মত তাহার সকল কার্য্যই এবার সামাধা হইয়া গিয়াছে, অতঃপর এ পৃথিবীতে তাহার

আর কিছুই করিবার নাই, এখন এই অনাবশ্যক জীবনের গুরু ভারটা তার বহিরা বেড়াইলেও চলে, অথবা না বহিলেও আর কিছুমাত্র আসিয়া যায় না! বর্ষার নদী গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে শুকাইয়া গিয়া ক্রমেই যেমন তাহার দুই ধারে বিস্তৃত ধূধু বালুকামাশির অভ্যন্তরে মিলাইয়া আসিতে থাকে, সুশীলের শ্রাবণ-গঙ্গার মতই কুলপ্লাবী মেহ-প্রেম-ভক্তি-প্ৰীতি-পরিপূর্ণ উদার চিত্তও তাহার উপরকার অপ্রত্যাশিত প্রতিঘাতে একেবারে যেন শুষ্কতর হইয়া পড়িয়াছিল! সর্বস্বত্বের আধার-স্থল এই আনন্দময় বিশ্বজগৎ তাহার মনের কাছে এতটুকুও আর বৈচিত্র্য বা আনন্দপ্রদ ছিল না, তাই তাহার সারা চিত্ত যেন নিদাক্ষণ শ্রান্ত ও অবসর হইয়া এখানের কারবার তুলিয়া দিয়া একটা বিরাম-শয্যা খুঁজিতে চাহিতেছিল; আর সে যেন পারিতেছিল না।

বাড়ী ফেরায় তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, কোথাও দূরে—দূর হইতে দূরান্তরে দেশ, ভূমি, পরিচিত সব কিছুকে ছাড়িয়া পৃথিবীর কোন এক নিভৃত প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া, তাহার সুশীল নাম বিস্তৃত হইয়া, জীবনের এই অন্ধকারময় দিনগুলোকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে তাহার অপমান-পীড়িত আহত অন্তরাত্মা তারম্বরে তাহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। বোম্বাই হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া সাউথ আফ্রিকা বা আরও কোন দূরবর্তী সুদূর অজ্ঞাত-অগ্ন্যাত রাজ্যে অদভ্য বস্ত্রদিগের মধ্যে চিরদিনেরই মত আত্মনির্ভরাসন দিতে সে মনে মনে বন্ধপরিকর হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইতেই তাহার পরিত্যক্ত নিজ গৃহস্থিত একটুমাত্র ক্ষীণ দীপশিখার প্রতি তাহার অশ্রু-অন্ধতার প্রায় দৃষ্টি-হীন নেত্রের সঙ্কুচিত দৃষ্টি পতিত হইল। যে মাতৃ-প্রতিমা পিসীমা—মাতৃহীন তাহাকে আশৈশব-যৌবন মাতৃস্নেহের অফুরন্ত নিৰ্ঝর-ধারা ঢালিয়া দিয়া বুকে করিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, সেই একমাত্র বিশ্বস্ত স্নেহই যে আজও তাহার জন্ত তেমনই অকলুষিতভাবে রক্ষিত আছে। তিনি যে আজও সকলকে সগর্বে মাথা খাড়া করিয়া বলিতেছেন, “কখন না, আমার সুশীল সে ছেলেই নয়! প্রাণ দিবে, তবু সে এতটুকু একটু অস্তায় করবে না—এ আমি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলবো!” সেই মহিমময়ী মায়ের কথা কি সুশীল জীবনের শেষ দিনেই কখনও ভুলিবে? এ পৃথিবীতে আজ সে নিঃস্ব নিঃসহায় ফকির!

কাহারও কাছে আজ কোন সম্বলই তাহার নাই, তাই এতটুকু পাওনাই তাহার পক্ষে আজ সাত রাজার ধনের মতই অমূল্য বলিয়া বোধ হইল। তাহার পায়ের ধূলাটুকুকে যে যাবার আগে একবার সঞ্চয় করিয়া লইতেই হইবে। সুশীল তাই বাড়ী আসিল। মনের অতি নিভৃত কোণে আরও কাহার দর্শনা-কাজ্ঞাও হয় তো অতি সূক্ষ্মভাবেই লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু সে কথাটা সে নিজের মনকে ভাল করিয়া বুঝি জানিতে দিল না, দিলে অভিমানের সহিত বিধাবন্ধে হয় তো বা তাহারই জয়পতাকাখানা খাড়া হইয়া উঠিলেও উঠিতে পারে, বুঝি বা মনে সে ভয়ও ছিল।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া বুক আবার সুশীলের যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে বোধ হইল। পিতার অবস্থা যথাপূর্ব্ব। তিনি জরা-বার্দ্ধক্যে জড়াইয়া একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। নিজের ঘর হইতে আর বাহিরও হইতে পারেন না, চোখে দৃষ্টি একান্ত ক্ষীণ, কণ্ঠের কচিং বিরল ভাষা তদপেক্ষাও ক্ষীণতর। সুশীল গিয়া প্রণাম করিতে তাহার ঠোঁট একটুখানি কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও তিনি কহিতে পারিলেন না। অসংবরণীয় ব্যথায় মর্ম্মভেদ হওয়ার অভিমানী বালক বেত্রোহত অপরাধীর মত ভয়চিত্তে আত্ম-বক্ষে ফিরিয়া আসিয়া নিজের নির্জজন ঘরে আলুখালু বিছানার উপর নিজেকে বিবশভাবে লুটাইয়া দিল। না না, এমন করিয়া আর সে বাঁচিতে পারে না! এ অসহ, এ অসহ, ইহার অপেক্ষা শতবার মৃত্যু ভাল! ইহার অপেক্ষা শতবার মৃত্যু ভাল!

চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া কেহ সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কাছে আসিয়া সে তখন সংশয়-ভীতকণ্ঠে সহসাই ডাকিয়া উঠিল, “সুশীল!”

গঙ্গা তাহার এতই কাঁপিতেছিল যে, কাহার যে সে স্বর, তাহাও যেন ঠিকভাবে চেনা যায় না। বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া সুশীল ততোধিক বিস্ময়ের সহিত অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিল, “ওতুদা!”

সুশীলের বুকটা নিম্নিষে ধবক করিয়া উঠিল। না জানি, আজ আবার কি উদ্দেশ্য মনে এইমাই শুভে-ন্দুর এখানে আগমন! তথাপি মন কিন্তু সুশীলের তেমনভাবে শঙ্কিত হইল না। কারণ, ভয়-ভাবনা, জ্ঞাতক আজ-সবই যে তাহার কাছ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাহারও কোন অস্তায় অবিরে, কোন অমানুষিক অপ্রত্যাশিত অত্যাচারে তাহার আর

এখন কিছুমাত্র ধার আসে না, তাহার ক্ষতি যাহা কিছু হইবার, সে তো সবই হইয়া বহিয়া ঢুকিয়া গিয়াছে। আর বেশী করিয়া কোথা হইতে কি হইবে?

শুভেন্দু কিন্তু আজ সে ভাব কিছুই দেখাইল না। সে বরং ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের পায়ে কাছ দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার পা দু'খানাকে দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আতঙ্ককরণের বলিয়া উঠিল, “সুশীল! সুশীল! আমায় বাঁচাও! বাঁচাও ভাই আমাকে!”

শুভেন্দুর এই ব্যবহারে সুশীলের বিশ্বাস তখন সীমাক্রম করিল। ইহাকে সে তাহার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া গালি দিতে দিতে প্রহার করিতে দেখিলেও ইহার অর্ধেকটুকুও আশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু এই যে তাহার পায়ে ধরিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতে দেখিল ও শুনিল, ইহাতে সে যেন একেবারে বিশ্বাস-সাগরের তলদেশে তলাইয়া গেল, বহুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন ভাষাই যেন সরিল না, পরে বাক্যক্ষুণ্ণ হইলে তাহাকে উঠাইবার চেষ্টার সহিত স্থলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “অমন করছো কেন শুভেন্দু? কি হয়েছে?”

শুভেন্দু ঘন ঘন খাস ছাড়িয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, “পুলিস এসে আমায় ধরেছে, চার্জ গুরুতর, জাল সহিতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বার করা—এখনই আমায় নিয়ে যাবে, তুমি আমায় বাঁচাও ভাই, এ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।” শুভেন্দু গভীর ক্রন্দনে ফুলিতে ও ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল।

সুশীল তখনই অতীতের সব কথা ভুলিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া শুভেন্দুর গায়ে হাত দিয়া সম্মুখে সমস্ত তাহাকে সাহসনা দান পূর্বক কহিতে লাগিল, “তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন শুভেন্দু? জাল তো আর তুমি কর নি, সে অনায়াসে প্রমাণ হবে যেতে পারবে। বড় বড় উকীলব্যারিষ্টারের তো আর অভাব হবে না তোমার পক্ষে—”

সহসা ভূতাহতবৎ সুশীল শুভেন্দুর হাত ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি পিছাইয়া গেল। কি ভীষণ ও অকথ্য লজ্জা-জালাপূর্ণ ইজিত সেই মুহূর্তেই শুভেন্দুর দৃষ্টিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিল! সুশীলের চারিদিকের বিশ্বসংসার বিরাট লজ্জায় যেন কালো হইয়া মিলাইয়া গেল।

শুভেন্দু আবার উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সুশীলের পায়ে উপর আছড়াইয়া পড়িল। “আমি সাধ ক’রে কিছু করি নি সুশীল! তোমার বোনকে বিয়ে ক’রেই

আমি মারা গেলুম। সেই এ বাড়ী থেকে আমার জোর ক’রে বার ক’রে নিয়ে গেল, তার এখানে থাকতে লজ্জা করে বলে। মোটে আড়াই শো খানি টাকা তোমার বাবা আমাদের দেন, মায় তাতেই বাড়ীভাড়া পর্যন্ত সবই তো চালাতে হয়, এতে কি কুলোয় সুশীল? তুমিই বল না? এ দিকে রোজগার করি না ব’লে বিনতা চব্বিশ ঘণ্টাই আমার খোঁটা দিচ্ছে! তাই তো ব্যবসা করবো ব’লেই না আমার ঐ ২৫০০০ হাজার টাকাটা আপাততঃ নিতে হয়েছিল। ভেবেছিলুম, লাভ হ’লে ওটা আবার ফিরিয়ে দেব। কিন্তু সংসার-খরচেই যে সব ফুরিয়ে গেল! বিনতাকে খুসী করবো ভেবে তাকে বলেছিলুম যে, ঐ টাকা আমি ব্যবসা ক’রে পাচ্ছি। এমন সময় এই ব্যাপার! এখন কি হবে ভাই? আমি মরতে তোমাদের বাড়ী এসেই জন্মের মত গেলুম! এর অপেক্ষা গরীব হয়ে থাকাও আমার ভাল ছিল লক্ষণে!”

শুভেন্দু হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিনতার উদ্দেশ্যে একটা অকথ্য লঘুভাষা প্রয়োগ করিল। তাহা শুনিয়া সুশীলের সর্বশরীর গভীর ঘৃণা ও বিরক্তিতে যেন বিন্ বিন্ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ইহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেও যেন তাহার অন্তরাখ্যা সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। আর এ তাহারই ভগ্নীপতি!—বোন তাহার মরিল না কেন এর চেয়ে!

সুশীলকে বাক্য-বিমুখ দেখিয়া শুভেন্দু রাগে জলিয়া উঠিল, কিন্তু আজ আর ক্রোধ প্রকাশ করিবার ভরসা তাহার মনে নাই। তাই কোনমতে নিজেকে যথাসাধ্য শাস্ত করিয়া লইয়া সে শ্বেষগভীরস্বরে অনড় অস্পন্দ সুশীলের বুকের উপর সজোরে খড়্গাঘাত করিল।

“আমার মরণে তোমাদের আপত্তি নেই, তা আমি খুবই জানি, বরং তা হ’লে নিশ্চিন্ত হয়ে বোনের আর একটা ভাল দেখে বিয়ে দিতে পারবে। এ’ও হয় তো তোমরা মনে ক’রে খুসী হচ্ছ, বুঝলুম—তা’ও হ’তে পারে, কিন্তু তোমার অভিযানী বোন কি এ অপমানের পর আর বেঁচে থাকবে ভেবেছ? গর্ভে তার এখন সাত মাসের সন্তান, এ অবস্থায় যদি সে আত্মহত্যা ক’রেই মরে—”

সুশীলের অবিচল দেহ সম্মুখে কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল, অতিকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি এতে তোমার কি সাহায্য করিতে পারি? আমায় বলো।—”

শুভেন্দু বিজয়ী বীরের মত সমস্ত বারেক সুশীলের শব-শব্দ মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া বীর-গভীরস্বরে উত্তর দিল, “আমার দোষটা তুমি নিজের ব’লে স্বীকার ক’রে নাও। তোমার বাবা কিছু তো আর তোমার পুলিশে যেতে দেবেন না। তা’ তাঁরই তো টাকা— তিনি মোকদ্দমা তুলে নিলে আর কে চালাবে? এইটুকু উপকার কর ভাই, তোমার পায়ে আমি চিরদিনের মত গোলাম হয়ে থাকবো ব’লে দিলুম, এ তুমি বরাবর দেখে নিও। আর তোমার বোনের প্রাণটা হয় তো এ’তে রক্ষা পাবে। না হ’লে আমার দোষী জানলে সে নিশ্চয় মরবে জেনো। তাকে কি তুমি চেনো না? অত্যায়ে তার কি বিরাগ!”

সুশীলের সেই রক্তশূন্য মুখে তীব্র বেদনার সহিত অকথ্যনীর ঘৃণার রাশি অসীম হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠে তাহার অতি সহজ শাস্তভাবেই উত্তর বাহির হইল, “আচ্ছা, তাই হবে!”

* * * * *

পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট সদলবলে আসিয়া সেলাম দিয়া যখন ভুবনবাবুকে চেক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চেক এবং চেকের উপকার নামসই তাঁহার কি না?”

তখন বিশ্বমুঢ় ভুবন বাবু এ প্রশ্নের কিছুই অর্থ-বোধ না করিতে পারিয়া নিঃসংশয়েই উত্তর দিয়াছিলেন যে, চেক ঠিক তাঁহারই বটে; তবে নাম সইরে কিছু গলদ আছে, উহা নিশ্চিতই তাঁহার হাতের সহি নয়। তাহার পর চেক-বহি বাহির করিয়া দুই জনে মিলিয়া তাহা মিলান করা হয় এবং অকাটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কেহ তাঁহারই চেক ছিঁড়িয়া লইয়া জাল-সইয়ে টাকা বাহির করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মনেও হঠাৎ এই সন্দেহ হওয়াতেই তাহার পুলিশে খবরটা দিয়াছিল। ভুবনবাবু কিন্তু তখন স্বপ্নেও জানিতেন না যে, সেই অনুসন্ধানফলে তাঁহারই এত বড় সর্বনাশের ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে!

* * * * *

সুশীল আসিয়া যখন পুলিশ-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকল্পিত স্থির স্বরে বলিল, “শুভেন্দু নয়, আমিই এ জাল করেছি, আমাকেই আপনারা চাগান দিতে পারেন।”

তখন সকলেই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাহেব বিস্মিত মুহুর্তে

আশ্চর্যভাবেই কহিলেন, “শুভেন্দু বাবু আমাদের এই কথাই বলিয়াছিলেন বটে, যে, খুব সম্ভব এ সই সুশীলের। কিন্তু আপনি শিক্ষিত লোক, সে জাল আমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করি নাই।”

সুশীল জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উত্তর করিল, “যেটা পৃথিবীতে সব চেয়ে অবিশ্বাস্য থাকে, কোন সময় সেইটাই হয় তো আবার সব চেয়ে বিশ্বাসের হয়ে দাঁড়ায়—কেমন, এখন তো বিশ্বাস করলেন? আচ্ছা, এখন চলুন তো, কোথায় যেতে হবে।”

পুলিসের কাছে যে ব্যক্তি মাথার চুল পাকাইয়াছে, তাহার কাছে দোষি-নির্দোষ বড় সহজে ধরা পড়ে। ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রধান পুলিস সাহেব বীরকণ্ঠে কহিলেন, “আপনি হয় তো জানেন না, যে চার্জের নিজেকে জড়িত কচ্ছেন, তার দণ্ড কত বেশী!”

সুশীল পুনশ্চ সেইরূপ বৃকফাটা উচ্চ হাসি হাসিল, —হাসিয়া কহিল, “জানি বৈ কি! হয় তো যাবজ্জীবনও হ’তে পারে, কেমন, না?—চলুন, চলুন।”

ভুবনবাবু দুই হাতে মুখ লুকাইয়া পাথরের মত স্থির বসিয়া আছেন, মুক্ত দ্বারপথে সবই তাঁহার কানে আসিতেছিল। সাহেব ভিতরে আসিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, “আর একবার সেইটা ভাল ক’রে দেখবেন কি?”

ভুবনবাবু তাঁহার মুখের ঢাকা না খুলিয়াই জবাব দিলেন, “না।”

“এ’র জামিন কি আপনি হ’তে চান?”

ভুবন বাবু তদবস্থাতেই উত্তর করিলেন, “না।”

সুশীল শুদ্ধ স্থির দাঁড়াইয়া ইহাও শুনিла এবং ইহার পরই বর্দ্ধিতোৎসাহে জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে-ই সকলেই অগ্রবর্তী হইল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জগতের কর্মপ্রবাহ অনন্ত বলিয়া মানুষ তাহার শরীর মনের কোন অবস্থাতেই কর্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না। যত বড় অনিচ্ছা ও অনাগ্রহই তাহার মধ্যে থাকুক, কাজ তাহাকে করিতেই হইবে, তা বাহিরটা তাহার যদি বা নিশ্চেষ্ট থাকে, মানস-জগৎ একটু ক্ষণেও জন্ত তো সৃষ্টিহীন থাকিবে না।

নিজের বেদনা-বিধুর চিত্তকে কোন উপায়েই যখন আর সাহসনা দিতে পারা গেল না, তখন নিজের সঙ্গে একান্তই বিরক্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়া স্নেহেখা মাকে আসিয়া বলিল, “অনেক দিন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তন দেওয়া হয় নি, পাঁচ জনে শুন্তে চায়, দিলে হয় না?”

মেয়ের মুখে বহুকাল পরে পূর্বের মতই একটুখানি আবদারের কথা শুনিয়া সত্যবতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “কীর্তন ও পূজা আর্চনার কালই আমি বন্দোবস্ত করিয়ে দেব।”

কীর্তনের পালা নির্বাচন লইয়া অনেকখানি গোল বাধিল। মেয়ের ইচ্ছা—মাথুর, কিন্তু ঐ পাণ্ডার না কি বড়ই কাঁদিতে হয়, তাই সত্যবতী কোনমতেই উহাতে রাজী হইলেন না। তখন মানই স্থির হইল।

যথাকালে প্রশস্ত অঙ্গনে আসর সাজাইয়া কীর্তন-গান আরম্ভ হইল। পাড়া প্রতিবাসী নারী-পুরুষ দলে দলে আসিয়া আসর ভর্তি করিয়া বসিল। তাহাদের সঙ্গে ছোট-বড়, মেজ-সেজ বহু আকারের বহু বয়সের ছেলে-মেয়ে আসাতে ক্রন্দনে, চীৎকারে, কলহে দেখিতে দেখিতে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। কাহার কোলের তিন মাসের খোকার ঘাড়ের উপর দিয়া কাহারও সজের এক বৎসর বয়সের মেয়ের জুতা-পরা পা চলিয়া গেল, ফলে আঘাত পাইয়া কচিটা ও মার খাইয়া এক বৎসরেরটি চোঁচাইতে লাগিয়া গেল। কোথাও বসিবার স্থান হইয়া পরস্পরের বাগ-বুদ্ধ ও ঠেলাঠেলি চলিতেছিল। এক জন বলিলেন, “এ জায়গা আমার, তুমি এসে দখল করলে কেন গা?” অপরা কহিলেন, “কেন, জায়গা কি তুমি ইজারা নিয়েছ না কি যে, তোমারই হরে গেছে?”

ইহার পর এ বিবাদ চরমে গিয়া পৌছিল।

স্নেহেখা এই সকল বিবাদ-বিসংবাদ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার চেষ্টার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, স্থির হইয়া বসিয়া গান শুনা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াই উঠিতেছিল না, তথাপি সে জন্ত সে বিশেষ দুঃখিতও হয় নাই। যেমন করিয়াই হউক, তাহার মনটাকে সে একটুখানি ব্যাপৃত রাখিতে চায় বৈ তো নয়। তা সেটা যে দিক দিয়াই ঘটে ঘটুক না কেন?

সে দিন জ্যোৎস্না-রাত্রি, আকাশে দুই এক খণ্ড

পাতলা মেঘ মন্থরগতি করিশিগুর মতই স্বাচ্ছন্দ্য-বিহারে ইচ্ছানুগে শুভ্র ছলাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ফিরিলেও বিশালকায় গজযুগ দেখা দেয় নাই। তাঁদের আঁ। সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘপথে নানাক্রমে নানা বিচিত্র আকারে ধরণীর বৃকর উপর আলিপনা কাটিয়া রাখিয়াছিল। কীর্তন-সভার চন্দ্রাতপতল স্ফটিক-ঝাড়ের উজ্জল বর্ণি দ্বারা সমুজ্জল আলোকিত। কীর্তনীয়াগণের কণ্ঠমালা হইতে বেল-ঘুঁইয়ের ঘন সৌরভ সঘনে উথিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সুকৌশল কখনভঙ্গী ও মিষ্ট স্বর এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির অপূর্ব রস-রচনা শ্রোতৃবর্গের অনেকেই মনে ভাবাবেশ আনয়ন করিয়া দিয়াছিল। আবার কেহ বেহ তখনও ছুতায়-লতায় কলহের কাকলী তুলিয়া নিজের সঙ্গে অপরেরও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সঙ্গীত-সুধাপানের পরিবর্তে কৰ্কশ চীৎকারে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। কোন কোন সুগৃহিণী এতগুলি শ্রোতীসমাগমে পুলকিত হইয়া এই সঙ্গে আলু-পটলের দরটা জানিয়া রাখিতেছিলেন, কেহ বা রান্নার ফিরিস্তি দাখিল করিয়া নিজের অপরিমিত কার্যশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া গিয়াছিলেন।

স্নেহেখা যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের ভিড়ে বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই, সে সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। তখন শ্রীমাদিকা গভীর মানের দায়ে শ্রাম হারাইয়া অব্যক্ত বেদনায় গুহরিয়া মরিতেছেন—

“ধনীকে জিউ ধসই কীণ ধরনীপর গিরত,
প্রাণ-বঁধুয়ারে মনে পড়ে টুটল মানিনীকো মানে—
আর মান নাই,—

এখন মান গিয়ে বিরহ এল, ধনীর কৃষ্ণবদন মনে
হ’ল।”

স্নেহেখার বড় ভাল লাগিল। বাস্তবিকই তাই নয় কি? অতিমান যতই মনকে অধিকার করিয়া রাখুক না কেন, গভীর প্রেম তাহাকে যে নিয়তই দিকার দিতে ছাড়িতেছে না, সে নিজে আহত হইয়াছে বলিয়াই কি আজ প্রতিশোধ-স্পৃহায় উহাকেও অন-বরত আঘাত দিয়া পাগল করিতে বসিয়াছে?

গায়কেরা আবার গাহিতে লাগিল,—

“যেমন কাজ করেছিলাম, তাহার প্রতিকল পেলাম,

এখন জ'লে-জ'লে জ'লে মলাম,—

এখন বিরহদাব-দহনে—

জ'লে জ'লে জ'লে মলাম।”—

সুলেখা কুকথায়ে শুনিতে লাগিল।

এক জনের কচিছেলে চীৎকার শব্দে কাদিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ছেলে লইয়া ছেলের মা বাহির হইয়া আসিয়া সুলেখাকে চিনিতে পারিয়া অমুখোদের স্বরে কহিলেন, “ছেলের বড্ড জ্বর এসেছে মা, কোনমতে আর কোণে থাকতে চায় না, যদি সঙ্গে একটি লোক দাও মা তো ছেলে নিয়ে বাড়ী যাই। এমন পোড়া বরাত মা, এমন দিনের জন্তে জ্বর যেন বসে ছিঃ!”

সুলেখার আর কীর্তন শুনা হইল না, সে একটা দাসীর সন্ধানে চলিল।

“দিদি! আপনাকে বাবু একবার শীগ্গির ক'রে ডাকছেন গো।”

সুলেখা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “তুই এঁকে একটু আগ-বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আয় তো বাবু! আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।”

দাসীর নির্দেশমত সুলেখা তাহার পিতার শয়ন-কক্ষে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে শুধু তাহার বাপই নয়, মাও রহিয়াছেন। একপ অসময়ের আছান্বে, তাহার উপর মাকে কীর্তন শুনা বন্ধ করিয়া এমন স্তব্ধ ও নতমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। বাপের মুখের স্তব্ধ গম্ভীর ভাব দেখিয়া সে মনে মনে ভয়ও পাইয়াছিল।

“বাবা, আমাকে ডেকেছ?”—সুলেখা থামিয়া থামিয়া ভয়ে ভয়ে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল। পিতার একপ মেঘ-মণ্ডিত পর্কতের মত স্তব্ধ গম্ভীর মুক্তি সে অনেক দিন দেখে নাই। হয় তো বা একপ জলদ-জাল-মণ্ডিত ভীষকাস্ত মুক্তি কখনই দেখে নাই। কি একটা অজ্ঞাত মহাভয়ে তাহার বালিকা-চিত্ত শিহ-রিয়া উঠিল। না জানি, আবার কি অমঙ্গলের এ সূচনা!

বিপ্রদাস কথা কহিলেন, তাহার কণ্ঠশব্দে সুলেখা সুস্পষ্ট চমকে চমকিয়া উঠিল। যেন ২৪ঘণ্টা ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশে অকস্মাৎ গুরু গুরু শব্দে মেঘ-গর্জন হইল।

“সুলেখা! ভুবন বাবুর পুত্র জাল সহী দ্বারা ব্যাধে—কোনমতেই যেন তাহার চিত্র সাং দিতে পারিতেছিল টাকা ভাঙ্গা চার্জে অভিযুক্ত, তুমি ভালই করেছিলে না। সুশীল এত বড় পাপিষ্ঠ! এও কি সম্ভব? যতই

যে, তাকে বিয়ে করনি, আজ থেকে আমি তোমার জন্ত পাত্রাঙ্কুরের চেষ্টা করবো, তার সমস্ত স্মৃতি আর থেকে মন হ'তে নিঃশেষে মুছে ফেলে দাও; মর্জী-পাপীর স্মৃতিপুজার পুজার অবমাননা কোরো না।”

স্তম্ভিত সুলেখার চক্ষুতে সহসা সমস্ত বিশ্ব যেন আবর্তিত হইয়া উঠিল। বিপুল জগৎ যেন ভূমিকম্পে নাড়া পাইয়া সজোরে এদিক ওদিক হুলিতে লাগিল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সমুদয় যেন তাহার স্তিমিত নেত্র-সমক্ষে ঘন-ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল। সেই স্তম্ভিত নিঝুমভাবে রূপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই গর্জিত মেঘের মধ্য হইতে নিম্নুক্ত অশনি ভাঙ্গিয়া যেন তাহারই মাথার উপর পড়িয়াছিল।

ঘব গভীর নিস্তব্ধ, গৃহবাসী তিন জনেরই অন্তরাজ্যে তখন প্রবল বিপ্লবস্রোত বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহারা ঐ আকস্মিক ভয়ভীত মুক জড়-প্রকৃতির মতই নির্বাক হইয়া পড়িয়াছিল। এই তিনটি প্রাণীর মনের কথা পরস্পরে বিনিময় করিবার মত ভাষা আজ তাহারা যেন একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বলিবার রহিয়াছে বলিয়াই যেন বলিবার ভাষা তাহাদের নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে।

বাহিরের এই ছিন্নভিন্ন মেঘগুলা ততক্ষণে একসঙ্গে জমা হইয়াছিল, ততক্ষণে যেন কোন অদৃশ্য হস্তধৃত বিদ্রোহ বরষার মুহুমূহঃ প্রহার-ব্যথায় জর্জরিত হইয়া উঠিয়া তাহারা একান্ত অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঝড়ের বেগে পৃথিবীর উপর আছাড়ি-পাছাড়ি লাগাইয়া দিল। চারিদিক দিয়া একটা উদ্ভাস শোকের আর্তনাদ যেন ক্ষণে ক্ষণেই গুম-রিয়া ফুটিয়া উঠিল। অন্তর্বাহিরের সেই অফুরন্ত ভরাবহ শোক ও হতাশা লইয়া এই তিনটি প্রাণী নির্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া কাছাকাছি বসিয়া নীরবে অসহ্য ব্যথা উপভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু একটি কথার আদান-প্রদান করিয়া পরস্পরের কাছে কোনরূপ শাস্তি বা সান্তনা লাভ করিবার শক্তি বা সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত যেন কহারই রহিল না।

* * * *

পরদিন অনেকখানি সুস্থ ও সংযত হইয়া সুলেখার সর্বপ্রথম মনে হইল, এ সংবাদ হয় তো বা মিথ্যা।

সুশীল জাল সহী দিয়া টাকা ভাঙ্গিয়াছে, এ কথায় কোনমতেই যেন তাহার চিত্র সাং দিতে পারিতেছিল টাকা ভাঙ্গা চার্জে অভিযুক্ত, তুমি ভালই করেছিলে না। সুশীল এত বড় পাপিষ্ঠ! এও কি সম্ভব? যতই

ঘণার সহিত সেই আহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে যায়, ততই যেন তাহার সঙ্গে সেই শেষ বিদায়-দৃশ্যটা চোখের উপর তার সম্মুখে ছবির মতই জ্বল-জ্বল করিয়া জাগিয়া উঠে, দুই কান ভরিয়া যেন সঘন-বাঞ্জিয়া উঠে,—“সুলেখা! অবিচারে দণ্ড দিয়ে চ’লে য়েয়ো না।” কি সে আত্মশ্রবণ! ওঃ! সুলেখার কান যেন তাহার কাঁজে পুড়িয়া গেল!

কতবারই সে নিজের মধ্যে জোর করিয়া বল আনিতে চাহিল, বিচার-বিতর্ক আত্মপ্রবোধার্থ অনেকই করিল, কিন্তু কিছুতেই আজ আর সে নিজের মনকে বুঝাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার আগাগোড়াই যেন একটা অত্যাশ্চর্য্য অবিচার, ইহার আগাগোড়াই যেন একটা অসম্ভব প্রকাণ্ড ভুল! আর সেই দণ্ডিতের জন্ত তৈরি করা দণ্ডটা যেন তাহার নিজেরই বুকের উপর পড়িয়া তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ অস্থির করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

অবশেষে কোনমতেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে না পারিয়া, সুলেখা এক সময় সকল বিধাকে পরাস্ত করিয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস তখন অন্তমনস্ক-ভাবে ফুরসীর নলে টান দিতে দিতে কি একটা কথা ভাবিতেছিলেন। হয় তো তারই কথা।—অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে কাছে সরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে সুলেখা ডাকিল, “বাবা!”

বিপ্রদাস মুখ তুলিলেন, মুখখানা আজ বড়ই স্নান দেখাইল। তা’ দেখিয়া সুলেখা কিছুই আর বলিতে পারিল না।

সে যাহা বলিতে চায়, বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিপ্রদাস নিজেই কথা কহিলেন,—“কি রে লেখা?”

সুলেখা একবার মুখ তুলিয়া আবার তাহা নত করিল, সঙ্কোচ ও লজ্জায় তাহার কণ্ঠ হইতে ভাষা বাহির হইতেছিল না, অথচ এসব বিষয়ে মায়ের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নহে জানিয়া এই একমাত্র উপায়কেই তাহার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

“কি বলবে বল মা! এসো, আমার কাছে এসে বসো।”

বাপের স্নেহ-সস্তাষণে ভরসা পাইয়া মেয়ে আসিয়া হেঁটমুখে পায়ের কাছে বসিতেই পিতা তাহার হাত ধরিয়া কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইলেন; স্নেহভরে কহিলেন, “কোথাও যাবি?”

এই কথার স্রোত পাইয়া সুলেখা তখন ঘাড় না তুলিয়াই অধোদৃষ্টিতে অস্পষ্টভাষায় একনিশ্বাসে কহিয়া ফেলিল, “আমাদের একবার কলকাতায় গেলে হয় না বাবা?”

“কলকাতায়? কোথায়? কেন?” বিপ্রদাসের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

সুলেখা তাহা বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই তাহার মনের সঙ্কোচ আরও অনেকটা বর্ধিত হইল, তথাপি সে কোনমতে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “তাদের এমন বিপদের সময় একবারটি যাওয়া কি উচিত নয়?”

বিপ্রদাস মেয়ের কথার অর্থ বুঝিয়া হৃৎকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, “তাদের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কি লেখা?”

সুলেখার মুখ আরও খানিকটা নানিয়া আসিলেও তাহার সেই নত মুখের নতদৃষ্টি সহসা উজ্জল ও কঠিন হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, যেন অনেকখানিই সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া, নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইয়া একটুখানি স্পষ্টস্বরে কহিয়া উঠিল, “কিন্তু এ তো মিথ্যাও হ’তে পারে বাবা?”

“কি মিথ্যা হ’তে পারে, মা?”

“এই জাল করার কথা?”

“কেমন ক’রে তা হবে মা? সে যে নিজমুখেই দোষ স্বীকার করেছে। খবরের কাগজে এসব কথা যে বেরিয়েছে, তুমি কি দেখনি? দেখতে চাও?”

সুলেখা দুই হাতে তাহার সেই নত মুখ ঢাকা দিল, তাহার সেই হাত দুখানা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—সে অসহায়ভাবে শুধু সবেগে মাথা নাড়িল। ওমনি করিয়াই শুধু তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে, না, না, সে দেখিতে চাহে না।—

হৃচ্চিন্তাগ্রস্ত দুঃখের দিন মানুষের বড় সহজে কাটিতে চাহে না, কিন্তু সুলেখার সে দিন-রাত্রিও অবশেষে কাটিয়া গেল। কাটিল বটে, কিন্তু কি করিয়াই যে কাটিল, সে শুধু সে-ই জানে। এত দিন অত্যাচারিত নীলিমার প্রতি করুণায় সে যে নিজের কথা ভাব করিয়া ভাবিতেও অবসর পায় নাই, বরং তাহার স্মৃতি দেখিলেই সঘরে তাহাকে পরিহারচেষ্টা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে দিন হইতে জানা গিয়াছে যে, নীলিমার ক্ষতি আজ প্রতীকারের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে এত সযত্ন-রুদ্ধ আত্মচিন্তাটাই যেন তাহার কাছে বড়

বেশী প্রবলমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, নিজেরও যে তাহার কত বড় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, সেই কথাটা এত দিনের পরে এখনই তাহার কাছে ভাল করিয়া ধরা পড়িল। আর তাহার অসহ বিয়োগ-দুঃখে প্রাণ তাহার যেন ফাটিয়া পড়ে পড়ে বোধ হইল। তাহার উপর আবার এই সংবাদটা যেন তাহার সহের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ে মত অতি কঠোরতায় তাহার মনে প্রাণে আর সহিবার শক্তি ছিল না। স্মৃতির প্রতি এক দিকে যত বড় প্রচণ্ড বিরাগ, আর এক দিকে কি না তেমনই প্রবল ক্রোধ! ইহার মাঝে পড়িয়া সে যেন পাগল হইয়া যাইতে বসিল। সেই বিপন্ন, অপমানিত, যুগিত লোকটাকেই একবারটি চোখের দেখা দেখিবার জন্য তাহার সারা চিত্ত কি বুদ্ধিত ভাবে তীব্র হাহাকারে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে! সে আর্তনাদকে—সে আকাজ্জকে, সে যে কোনমতেই দমন করিতে পারিতেছে না। সে যেন যুগুর দিয়া তাহাকে মারিতেছে, অথচ এ কি ভীষণ লজ্জা! ইহা যে লুকাইবার ও স্থান কোথাও নাই।

কিন্তু এক দিন ইহারও কতকটা সমাধান ঘটয়া গেল। হঠাৎ সে দিন ভোরে সে এই চিঠিখানা পাইল। চিঠিখানা অপরিচিত হাতের অক্ষরে লেখা, কিন্তু লেখিকা তাহার আদৌ অপরিচিতা নহে। সে সাগ্রহে পড়িল :—

“স্নেহের ভগিনী শুলেখা!

হতভাগিনী নীলিমাকে তুমি তো জান? আমি সেই নীলিমা। আমার জন্য তুমি যা করিতে চাহিয়াছ, জগতে দ্বিতীয় কেহ তাহা কখন করে নাই, তাই সে তোমার সেই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতায় একমাত্র তোমারই নিকট চিরবিক্রীত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

“কিন্তু আমার অবস্থা আমি নিজের বুদ্ধির দোষে অথবা শিক্ষার দোষে কিম্বা ভাগ্যের দোষে—যারই দোষে হোক, এমনই অপ্রতিবিদ্যে ও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছি যে, সে জটিলতার পাক ছাড়াইয়া ইহাকে বাহিরে আনা আজ কাহারও পক্ষে আর সম্ভব নহে। যাক সে কথা, স্বকর্মের ফলভোগ—যাহার কর্ম, তাহারই করা অনিবার্য, সে জন্য আমার কাহারও সম্বন্ধে আজ আর কোনই অমুযোগ করিবার নাই। বড় বেশী চড়াদাম দিয়াই এই জ্ঞানটুকু আমি লাভ

করিয়াছি যে, মানুষ স্বকর্মফলেই মুখদুঃখ ভোগ করে এবং অদৃষ্ট যাহার জন্মক্ষণেই বাস হইয়াছে, তাহার পরিণাম কখনই শুভ হইতে পারে না। এখন আমার বলিবার কথা এই যে, আমি যে দুঃখ পাইতেছি, তাহা না হয় আমারই থাক। আমার সঙ্গে নিরপরাধে তোমরা শুদ্ধ কেনই যে এত বড় দুঃখ ভোগ করিতেছ, ইহা কার ভাগ্যলিপি, তাহা জানি না। আমি যেন তোমাদের জীবনের ছুঁইগ্রহ, তাই আমার সংস্পর্শে তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের অনেকগুলি দিন যোর দুর্ভিক্ষপকের মধ্যে জড়াইয়া বিপ্লবময় হইয়া গেল! কিন্তু বোন! আমি যদি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতাম, তবে হয় তো এত কষ্ট তোমাদের পাইতে দিতাম না। আমার পোড়া অদৃষ্টের লেখা লইয়া আমিই তাহার যা কিছু বিড়ম্বনা ভোগ করিব, আমার জন্য জগতের আর কোথাও অপর আর কাহাকেও তাহার অংশভাগী করিতে আমার কোন অধিকারও নাই এবং প্রবৃত্তিও ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি সরিয়া গেলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

“স্মৃতি বাবুকে আমি আমার জীবনে কদিন মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি না কি তাঁহার চিরপরিচিতা? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলে যে, তাঁহার ঘরা অমন যুগিত কাজও ঘটতে পারে? তুমি না হয় ছেলেমানুষ, মানুষ চিনিবার শক্তি তোমাতে আজও না হয় দৃঢ় হয় নাই, কিন্তু তোমার অভিভাবকরাই বা কেমন? তাঁর নিজের বাপ? তিনিও এই হেয় চক্রান্তে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছেন না কি? হায় হায়! সেই বাপের ও তোমার মনোভঙ্গের ভয়েই যে তিনি আমার বাপের কবলে পড়িয়া সব চেয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন! পিতৃ-বৎসলতার যে তাঁর সীমা দেখি নাই! আমার মত দুর্ভাগ্য জীব তাঁর এ ভক্তি ভালবাসার কোন অর্থবোধ করিতেই যে পারে নাই! বিশ্বাসে, ঈর্ষ্যায়, অভিমানে স্তব্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, না জানি সে কেমনই বাপ, মার পরে সন্তানের এত বড় নির্ভর শ্রদ্ধা! কিন্তু কমা করিও, এই কি তার পরিচয়? নিজের সন্তানকে না চিনিয়া তাহার পরে এত বড় কঠিন আঘাত তিনি দিতেও ত পারিলেন? ধন্ত তিনি!—তবে কি তোমাদের বিশ্বাসে দেবতাও পিশাচে পরিণত হইতে পারেন? অথবা অত বড়কে ধারণা করা বুদ্ধি স্বাভাবিক নয়। আমিও তো এ বয়সে অনেক দেখিলাম, কিন্তু এমন

পবিত্র হৃদয় কর্তব্যনিষ্ঠ মেহময় দেবপ্রতিম দৃঢ় চরিত্র দেখিলাম কৈ ?

“আরও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যে, এ রটনা—আমার বাপের এই ঘৃণ্য রটনা—সর্বৈব মিথ্যা ? বিনা খরচায় কতাদায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তিনিই তাঁহাকে এই কলঙ্করটনার ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া বিবাহে বাধ্য করেন, অসম্মত হইলে আদালতে মিথ্যা নালিশ করার ভয়ও দেখান। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই আমি তাঁহাকে গোপনে পলাইবার সহায়তা করি। কেন করি ? তাঁকে তোমা-ময় জানিয়া। যদি তিনি আমারই ক্ষতিকারক হইতেন, আমিই কি নিজের সেই তত বড় সর্বনাশের সমর্থন করিতে পারিতাম ? নারী তুমি, তুমিই ইহার বিচার করিও, আর করিতে দিও, তোমার যদি মা থাকেন, তবে তাঁহাকেই। সুশীল বাবুর মা থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ছেলেকে এত বড় অবিচার করিতে দিতে পারিতেন না।

“আর কি বলিব ? বড় নির্কোষের কাজই তোমরা করিয়াছ ! সোনা খাদ থাকিলে তাহাকে পোড়াইতে হয়, তেঁমাদের খাঁটি সোনা তোমরা কিসের হুংখে পোড়াইলে জানি না। বেশী পাইলে হয় তো সে পাওয়া বুঝিতে পারা যায় না। বাক্য, যার মা ভাগ্যে ছিল, তা ঘটয়াছে, এখন তোমার হারানিধি তুমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে ফিরাইয়া লও। আমার আর তাহাতে লোভ নাই। আমার করতলায় রত্ন আমি যে বহুদিন পূর্বেই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সে শুধু তোমারই জন্য। তোমাহীন জীবনে তাঁহার সুখ হইবে না বুঝিয়াই সে কাজ করিয়াছি, নতুবা ভিখারী কি কখন অমূল্য রত্ন ত্যাগ করে ?

“আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ লইও। আমার স্নেহ-প্রতিমা ছোট বোনটি ! ঈশ্বর তোমার সমস্ত অমঙ্গল মুছিয়া লউন। ইতি

তোমার অভাগিনী দিদি
নীলিমা।”

পত্রপাঠশেষে এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে অধীর হইয়া উঠিয়া স্নেহা প্রাণপণে ছুটিয়া স্প্রিঙ্গমা মা-বাপের শয়ন-গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। জোরে ধাক্কা দিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, “মা ! মা ! বাবা ! বাবা !”

একসঙ্গে দুজনেরই ঘুম ভাঙিল। সত্যবতী ধড়মড়

করিয়া উঠিয়া বলিলেন, “কি লেখা ? কি হয়েছে, মা ? অমন করচো কেন ? কি রে ?”

“দেখ কি চিঠি পেলুম,—মা ! মা আমি আজই এফনি আমার খণ্ডরের কাছে যাবো, বাবা, তুমি দুজনেই আমার সঙ্গে চল।”

নীরবে পত্রপাঠ সমাধা করিয়া একসঙ্গেই দুজনে হর্ষবিষাদে মুখ তুলিলেন। পিতা কহিলেন, “এ তো বুঝলুম, তবে এর জন্য আমার আপত্তিও তো খুব বেশী ছিল না ; কিন্তু এবারকার এটা যে এর চেয়েও ঢের বেশী শক্ত, জালিয়াতের হাতে তো আর মেয়ে দেওয়া যায় না।”

স্নেহা তাহার স্বভাবের বহির্ভূত একান্ত অসহিষ্ণু ও অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, “মেয়ে দাও না দাও, সে সব পরের কথা ; এখন আজিই সেখানে গিয়ে ক্ষমা তো আমাকে চাইতেই হবে, আমি যে তার সকল দুর্দশার মূল ! এস মা, শীগ্গির ক’রে তৈরি হয়ে নাও। আমি বলছি, দেখ, এটাও একেবারে মিথ্যা কলঙ্ক, এ কখনই সত্য হ’তে পারে না। আমার উপর রাগ করেই হয় তো—মা, মা, তুমি কিছু বল না মা ! বাবা, তুমিও সবটা বুঝে দেখ।”

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত উত্তেজনার পরই একটা সুগভীর অবসাদ বড় অতর্কিতে আসিয়া দেখা যায়। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে সারাদিন অগ্নিতপ্ত ধূলি-বালির রাশি উড়াইয়া ঝড়ের বাতাস তাহার যথাসাধ্য দাপাদাপি করিয়া নিজেও জলে, পরকেও জালায় ; কিন্তু তাহার পর সন্ধ্যার স্নান শিথ বিমগ্নতার মধ্যে সে একেবারে যখন শুক হইয়া থাকিয়া যায়, তখন খাস টানিবার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত যেন তাহার বাকি থাকে না। সুশীল এত দিন তাহার মনের কোঁকে এবং স্নেহের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য-সাধন করিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সে কর্তব্য যেই তাহার সমাধা হইয়া গেল, অমনই তাহার বোধ হইল, যেন তাহার এ জীবনের কর্মসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার তাহার এই নষ্টশ্রী ও কর্মভ্রষ্ট জীবনটাকেও শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই চুকিয়া যাইবে। তাই যখন অকস্মাৎ সেই সুযোগই মিলিয়া গেল, হাজতে

বসিয়াও সে যেন এত দিনে অনেকখানি একটা পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছিল। সংগ্রামবিধবস্ত ক্লান্ত মৈনিক যুদ্ধশেষে শান্তি উপভোগে যেমন নিজের অসহ্য ক্ষত-জ্বালাকেও বিস্মৃত হয়, তেমনই একটা সর্বনাশের শান্তি যেন সে নিজের সর্ব শরীর-মনের উপর বড় স্থির মতই এত সর্বনাশের মধ্যেও অনুভব করিল। সে তো খুঁজিতেছিল মরণকেই, তা তাহার অপেক্ষাও তাহার ভাগ্যে এ বড় বেশী পুরস্কার মিলিয়া গিয়াছে। হয় তো বা ইহা ভালই হইল। মরিলেই তো সব চুকিয়া যায়, জীবনের শাস্তিটা তো আর ভোগ করা হয় না। নাঃ, বিধাতা-পুরুষের হাতের লেখায় মৌলিকতা আছে বলিতে হইবে।

লোহার শিক দিয়া আঁটা ছোট একটুখানি জানালার দিকে মুখ করিয়া সুশীল মাটির উপর স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। বাহিরে তাহার দৃষ্টি ছিল না, একবার নিজের দীর্ঘবাপী ভবিষ্যতের দিকে নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখিল; সে আজ গৃহহীন, মেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা-সুনামহারা, হীনচরিত্র, অপরাধী। সুশীলের গুপ্তপ্রাপ্ত একটা অতি তীব্র আলাময় মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার শীর্ণমুখে কালিমালিপ্ত দুই চোখের তারা একটা অস্বাভাবিক উজ্জল্যে এক মুহূর্ত দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। কঠোর বাঞ্চে আপনাকে আপনিই অভিনন্দিত করিয়া সে মনে মনে নিজেকেই নিজে বলিল, “জগতে বেশ পরিচয়টা রেখে যাচ্ছি সুশীল! খুব একটা নাম পেলি। এমন ক’জনের কপালে জোটে!”

সুশীলের মনে পড়িল সুদূর অতীতের একটা সুবিস্মৃত ইতিহাস। সুলেখাদের চাকর গোপাল আগুন দেওয়ার মিথ্যা অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, সে এক দিন ভয়ে-লজ্জায় যেন মরিতে বসিয়াছিল! তাহার মনের মধ্যে বিষয় যেন উথলিয়া উঠিল। সেই মানুষই কি সে?

বন্ধ দ্বার মুক্ত হইল। কারা-প্রহরীর যথারীতি নিত্য কার্য্যে আগমন মনে করিয়া সুশীল মুখ ফিরাইল না, নিজের সেই সহস্রাঙ্গি চিন্তাধারাকে সংবৃত্ত করিয়া লইয়া পুনশ্চ আত্মচিন্তায় প্রত্যাবর্তন করিল; কিন্তু সে ধারা সে আর অব্যাহত রাখিতে পারিল না। সহসা এই অন্ধ-অন্ধকার কারাকক্ষে একটি দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার মতই এক রূপসী তরুণী ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

“এ কি, সুলেখা!”

স্বপ্নাভিভূতের ভ্রায় বিস্মিত মুহূর্তে কোনমতে কথা কয়টা বলিয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। তাহার পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং শুধু পা-ও নয়, দেখিতে দেখিতে সেই কম্পনটা তাহার সমস্ত শরীরেই ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সে উঠিতে পারিল না, প্রাণপণ বলে তাহার পা দুখানা তখন সুলেখার দুহাত দিয়া বাঁধা এবং সেই পায়ের উপরেই তাহার মুখখানা সবলে লুকানো। সুশীলের সর্বশরীর সেই স্পর্শ শিথিল হইয়া আসিলেও সে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিল যে, সেই মুখখানা হইতে উষ্ণ অশ্রুস্রোত ঝরিয়া পড়িয়া তাহার সেই ধূলি-মলিন শুক রুক্ষ পা-দুখানাকে ধৌত করিয়া দিতেছে। সুশীল কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পর নিজের এই অবস্থায় যেন ফাঁপরে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া বলিল, “ওঠো সুলেখা!”

সুলেখা দ্বিগুণ বলে পা-দুখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর নিজের মুখ বসিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, “আমায় ক্ষমা করতে পারবে না?”

সুশীল তখন একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, “তুমি আগে উঠে বসো সুলেখা।”

সুলেখা উঠিয়া বসিল, কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যে শ্রাবণ-ধারা বহিতেছিল, তাহা সে রোধ করিল না, নত-মস্তকে নিঃশব্দে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সুশীল ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, “তুমি এখানে কেন এলে সুলেখা?”

সুশীলের কণ্ঠে প্রচুর বিষয় ফুটিয়া উঠিল।

সুলেখা এবার আঁচল দিয়া বসিয়া নিজের চোখ দুইটা মুছিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে অশ্রু-স্তম্ভিত ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল, “তোমায় আমার যা বলবার আছে, সেই কথা কটা শুধু বলে যেতে এসেছি। তুমি দয়া ক’রে শুনবে কি?”

“তোমার বাবা যে তোমায় এখানে আসিতে দিলেন?”

সুশীলের কণ্ঠ তখনও তাহার সেই অকথ্য বিষয়ের ভার বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

“সহজে কি আর দিয়েছেন? দুদিন উপোস ক’রে প’ড়ে থেকে তবে পাঁচ মিনিটের জন্ত দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি”—সুলেখার কণ্ঠ সহসা অস্পষ্ট হইয়া থাকিয়া পড়িল।

“কেন এলে, সুলেখা ?”

সুলেখা উত্তর দিল না, নীরবে তাহার গাঙ বহিয়া জলধারা আসিয়া ঘরের মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুলেখার বিস্ফারিত সান্দ্র্য নেত্র সেই দৃশ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহিল, সে-ও আর কোন কথা কহিল না।

ছোট জানালাটার বাহিরে তখন পংবহল একটা প্রকাণ্ড নিম-গাছকে অসংখ্যজাতীয় পাখীর দল বহুবিধ কলতানে শব্দমুখর করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতায় অপর শব্দসমূহকে এখানের দুঃপ্রবেশ করিয়া তুলিলেও ঐ আনন্দ-কলরবটুকুকে ইহার মধ্যে চাপিয়া রাখা যায় নাই। গাছটির মাথার উপর দিয়া সেটুকু নীল আকাশ দেখা যায়, সেটুকু আজ গভীর নীলিমায় নিবিড় দেখাইতেছিল, ক্ষুদ্র এক খণ্ড পীতাম্ব সূর্যালোক মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া অনাবৃত ভূমিতে এ গৃহের আগত অতিথিকে বুঝি স্বাগত জানাইবার জন্তই আসনের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘর গভীর নিস্তব্ধ, সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা কাহারও সফল হইতেছিল না ;—যদিও দুজনেই বুঝিতেছিল যে, বলিবার সময় প্রতি মুহূর্তেই নিশ্চয়ভাবে গত হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা দুই জনেই জানে যে, তাহাদের বলিবার গুনিবার দুই-ই এখনও যথেষ্ট বাকি রহিয়াছে, আর হয় তো এ জীবনে এ সুযোগ কখনও দ্বিতীয়বারের জন্ত তাহার মধ্যে আসিবে না।

অবশেষে সেই অন্তর্গুঢ় অসহ্য নীরবতা সুলেখাই ভঙ্গ করিল।

“আমার এই বলবার আছে যে, তোমার আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, তুমি এর পর যেখানেই থাক বা যাও, শুধু জেনে রেখো যে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে রইলুম। এক দিন আমাদের মিলন হবেই ;—তা হোক সে এই জন্মে, হোক বা জন্মান্তরে। আমি তোমায় যে অত্যাশংস ক’রে অনর্থক দুঃখ দিয়েছি, সে দোষ তুমি আমার যদি ক্ষমা করতে পার, করো। যদি না পার, তাতেও আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই। এ জন্মটা না হয় তার প্রায়শ্চিত্তেই আমার কেটে যাবে। কিন্তু তোমায় আমি পাবোই পাবো। তোমায় হারালে আমার চলবে না।—যদি এ জন্মে আর দেখা না হয়, জেনো, মরবার সময় তোমায় পাবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও একান্ত কামনা নিয়েই আমি মরেছি। এর আর কোনমতে কখনই কোন পরিবর্তন

হবে না। আর আমার তোমায় কিছুই বলবার নেই।”

“সুলেখা ! কেমন ক’রে জানল আমি—”

“নির্দোষী ? সে আমি জেনেছি !—নীলিমার চিঠি পেয়ে জেনেছি—”

“কিন্তু এই জাল করা, টাকা ভাঙ্গা, এর তো তুমি কোন—”

“না, প্রমাণ পাই নি,—জানি না, হয় তো তা’ কোন দিনই পাবোও না, কিন্তু এ যে তুমি করো নি, এ আমি প্রথম দিন শুনেই বুঝেছিলুম। এ শুধু আমার উপর আর তোমার বাপের উপর অভিমানে তুমি অত্যাশংস অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়েছ, কেমন ? নিশ্চয় তাই !—নয় ? তা’ তুমি বলো আর নাই বলো,—এ আমি সমস্ত পৃথিবী এক দিকে হলেও কখন বিশ্বাস করবো না, কেউ তা আমায় করতে পারবে না। কিন্তু কেন তুমি আমার কাছে সে দিন সব কথা খুলে বলে না ? কেন বিনা দোষে শুভেন্দুর দেওয়া দণ্ড মাথায় তুলে নিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলে ?”

সুলেখার কণ্ঠ শেষের দিকে যতই লজ্জা, ততই বেদনায় অশ্রুট ও করুণতর হইয়া আসিল। সে একখানা হাত সুলেখার পায়ের উপর রাখিয়া ব্যগ্র ছুটি চক্ষু তাহার মুখের উপর সূধীরে তুলিয়া ধরিল—“কেন আমায় ভুল বুঝতে দিলে ? কেন বুঝিয়ে দিলে না ? ছি ছি, এত শাস্তিও কি মানুষকে দিতে আছে ?”

সুলেখা ব্যস্ত সুলেখার হাতখানা নিজের পায়ের উপর হইতে খুলিয়া তাহা হাতের উপর লইল, একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা তাহার শুষ্ক অধরপ্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল—“বলেই কি তোমরা তখন বিশ্বাস করতে ? সে যা’ হবার হয়েছে, সুলেখা ! যদি আমি যাই, তুমি—”

যে কথা বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, সহসা সে কথা সুলেখা সংবরণ করিয়া লইল। তাহার পিতাকে দেখিতে ইহাকে অনুরোধ করা হয় ত অসম্ভব এবং—এবং হ্যা—নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে নিশ্চয়োজনও !

“আমি তখন কি করবো, কৈ বললে না ত ? না তোমায় বলতেই হবে। হ্যা, বলবে বল ?”

ঘরের নিকট হইতে সুলেখাদের পুরাতন সরকার ও ঝি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “জমাদার সাহেব বলছেন, আর সময় নেই, চ’লে-আসুন দিদি, হয় তো ওরা রাগ করবে।”

সুলেখা চমকিয়া উঠিল দাঁড়াইল, “চল্লেম! আর আমার মনে কোন ছুখ নেই, তোমার স্মৃতি নিয়ে— যদি দরকার হয়—এ জন্মটা আমি খুব কাটিয়ে দিতে পারবো। আজ যে মানির মধ্যে তোমায় আমরা নামিয়ে দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্তও ত আমাদের একটু আধটু হওয়া চাই! হোক তাই।—কমার কথা তোমায় যে ব’লে ফেলেছিলুম—সে আমার ছেলে-মানুষী—কমা পেলো আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। পার তো কমা আমায় করো না।”

“দিদিমনি! জমাদার বলছেন—”

“এই যে যাচ্ছি—”

সুলেখা নত হইয়া সুশীলের পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল —“আবার দেখা হবে—হয় এখানে, না হয়—না হয়—ঐ-ঐখানে—”

বন বন শব্দে লোহার শিকল যথাস্থানে আঁটিয়া বসিল। নির্জন স্তব্ধ গৃহে অশরীরিকপে প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিল, “না হয়—ঐ-ঐখানে—”

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সুশীল চলিয়া গেলে কি অসহ্য শোকাহত শরীর-মন লইয়াই যে নীলিমা তাহার নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিল, তাহা শুধু সেই জানে, আর যদি কেহ তাহার চিরদিনের কঠোর সাধনার পর সিদ্ধির গুণ্ড মুহূর্তে তাহার ইষ্টদেবতাকে এমনই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তবে সেই শুধু একমাত্র তাহার এ ক্ষতির পরিমাণ বোধ করিতে পারিবে। শয্যাহীন তরুণপুষের উপর সে অসহ্য যন্ত্রণায় অব্যক্ত রব করিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং তাহার পর সে কি করিয়া! তখন নিখিলের সমুদয় বেদনা যেন এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়া তাহার দুই নেত্রপথে অজস্র ধারাকারে প্রবাহিত হইতে থাকিল, আর সে করিয়া যেন অফুরন্ত, তাহার যেন আর কোনখানেই শেষ নাই! তাহার করতলগত অমূল্যনিধি, তাহার চির-সাধনার সিদ্ধি, সে যে আজ নিজের হাতে অতল জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, চির জন্মজন্মান্তরের মতই তাহার যথাসর্বস্ব সে বিসর্জন দিয়া দিয়াছে, তাহার এ ছার ও বুখা জীবনেই বা আর এখন প্রয়োজন কিসের? কি লইয়াই বা এই দীর্ঘ-দীর্ঘতর, সুখহীন, শান্তিহীন, নির্ভর্য্যব,

নির্জন জীবনভারকে সে বহন করিয়া বেড়াইবে এবং তাহা করিয়া লাভই বা কোথায়?

নীলিমার মনে পড়িল, এক দিন সে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই, পূর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও মরণের দ্বার ঠেলিয়া আবার সেই জীবন্ত জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখন হয় তো সে তাহা পারে। তাহার মনে হইল, এমনই কঠিন প্রাণ তাহার যে, মরণও তাহাকে ছুঁই ছুঁই করিয়াও ছুঁইতে পারে না। যে মৃত্যুর ভয়ে উচ্চ নীচ সমুদয় জীবজগৎ সর্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহাকেই সে সমাদরের সহিত বরণ করিয়া লইতে উদ্বৃত, অথচ সে-ও তাহাকে আলিঙ্গনদানে ঘোরতর অসম্মত। এ রহস্য বড় মন্দ নহে! অথবা যে অনা-বশুক, মৃত্যুর রাজ্যেও বোধ করি, তাহার মূল্য নাই।

এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে মিস্ রীচের আহ্বান পাইয়া নীলিমা তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিল, শুধু তিনিই নহেন, তাঁহার সঙ্গে সে ঘরে আজ * * * এর পুরোহিত মহাশয়ও উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহার উপস্থিতিতে নীলিমা মনে মনে কিছু সঙ্কোচ বোধ করিল। যেহেতু, মিস্ রীচ তাহাকে আদর করিতে যে ডাকান নাই, সেটুকু তো নিশ্চিত জানা কথাই;— অথচ এক জন অপর লোকের সান্নিধ্যে অনর্থক অপ-মানিত হওয়া কে-ই বা পছন্দ করিতে পারে? এই দুই জনের প্রতিই তাই নীলিমার জ্বালাভরা, অসহিষ্ণু চিত্ত সমানভাবেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সে একটা আসন্ন সংগ্রামের জন্তই নিজেকে কতকটা তৈরী করিয়া লইয়া মাটি চাপিয়া দাঁড়াইল। কারণ, নিজের ভিতর-কার অবস্থা হইতেই বেশ স্পষ্টরূপে সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, আজ যদি মিস্ রীচ তাহার প্রতি কোনরূপ অন্ত্যায় ব্যবহার করিতে যান, তাহাকেও সেই মুহূর্তে তাঁহার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সমর-ঘোষণা করিতে হইবে; শরীর-মনের এত বড় মন্দ অবস্থায় আর কোন কিছুই তাহার সহ্য হইবে না।

মিস্ রীচ তাঁহার স্বতঃই গভীর ও কঠিন কণ্ঠে কথা কহিলেন; বলিলেন, “মিস্ চক্রবর্তী! তোমার বিষয়েই এঁর সঙ্গে আমার এতক্ষণ কথাবার্তা হইতেছিল। তোমার যেমন চরিত্র, তাহাতে বিবাহই তোমার পক্ষে একমাত্র প্রতিষেধক। তাই আমরা তোমারই মঙ্গলের জন্ত তোমার বিবাহ-বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি; অতএব তুমি প্রস্তুত হও, এই সপ্তাহেই মিস্ চিনিবাস পলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে।”

নীলিমার বিদ্রোহ-বিবে বিদগ্ধ চিত্ত ঘোরতর
বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সে এ
দিক্ দিয়া আক্রমণের ভয় আদৌ করে নাই। নিশ্চিতই
সে ভাবিল,—“এই খুষ্টধর্ম! উদার ও মহৎ বলিয়া
এরই এত বড় নাম, এতেই এদের এত গর্ব? সে
যে এ কথা বিশ্বাস করিতেই পারে না। না না, হয়
তো তাহার বুঝিবার ভুল, মিস্ রীচ যতই যা হউন,
নিশ্চয়ই এমন কথাটা তাহাকে বলেন নাই।” সে
প্রায় নিরুদ্ভাসে মিস্ রীচের বাহুগস্তীর মুখের দিকে
চাহিল,—না, কই না, কিছুই বুঝা যায় না; মুখ সেই
যথাপূর্ব পাথরের মতই কঠিন ও নির্ভিক্স। তখন
সাহসভরে সে প্রশ্ন করিল, “বিবাহের কথা আপনি
কি বলিতেছেন? আপনি জানেন, আমি জর্জ
ওকবর্ণকেই যখন বিবাহ করি নাই—”

“ওঃ, তোমার তো বড়ই স্পর্ক দেখিতে পাই।
নেটিব নিগার হইয়া উচ্চবংশীয় আইরিশম্যানকে তুমি
বিবাহ করিতে চাও না কি! বামন হইয়া চন্দ্র ধরি-
বার জন্য উদ্ধাহ হওয়া আর কি! শোন নীলিমা!
তোমার কু-চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমি আমার মিশনের
মেয়েদের তো আর নষ্ট হ’তে দিতে পারি না, কাজেই
তোমায় এক জন শক্ত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া এই
মিশনবাড়ীর বাহিরে পাঠাইতেই হইবে। এমনই
মায়াবিনী তুমি যে, তোমার হাতে আইরিশ যুবক,
বান্ধালী যুবক কাহারও কোথাও রক্ষা নাই! কি
লজ্জা! যাও, এখন নিজের স্থানে যাও, বিবাহের
পোষাকের জন্য কাপড় আনাইয়া দিব, ভাল করিয়া
শেলাই করিয়া লইও।”

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্তে ক্রোধের অগ্নি
বাড়বাড়ির মতই দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল।
সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আমার বিয়ে দিতে চান জোর
ক’রে? যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে আমি কখন
দেখিও নি, সে-ও আমায় নয়। হিন্দুসমাজ এর চেয়ে
বেশী আর কি ক’রে থাকে? তবু তো তারা আত্মীয়,
আর তোমরা সম্পূর্ণ পর। যাহাই হউক, বিয়ে আমি
কিছুতেই করবো না।”

মিস্ রীচের ভূগোলশাস্ত্রের প্রদর্শিত ভূ-গোলের
মতই সূর্যহং এবং সূর্যগোল মুখমণ্ডল কঠোরতর হইয়া
উঠিল, গস্তীরতর স্বরে তিনি সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন,
“তা করবে কেন? তা হ’লে যে প্রজাপতির পাখা
খসিয়া বাইবে। কিন্তু আমিও বলিতেছি যে, বিবাহ

তোমায় করিতেই হইবে। বর তোমায় দেখিয়া পছন্দ
করিয়াছে, আর তোমার পছন্দের জন্য কিছুই আসি
যায় না। পল তোমায় ঠিক জুড় রাখিতে পারিবে,
ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে আখমাড়ার চিনির
কুঠীতে কুলী খাটার, আর তোমার মত একটা মেয়ে-
মানুষকে সোজা করিতে পারিবে না? তা ভিন্ন সে
মরিসসেও অনেক দিন কুলী খাটাইয়া খুব পাকা
হইয়া আসিয়াছে। জানেন রেভারেণ্ড মশাই! মিঃ
চাঁনবাস পল সেদিন তার অনেকগুলি আপনার
জাতের বাগ্‌দীকে খুঁটান করেছে, ভারী ভাল লোক
সে।”

নীলিমা সাপের মত গর্জিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে
কহিল, “বাগ্‌দীর সঙ্গে আপনারা আমার বিয়ে দিতে
চান?”

মিস্ রীচ প্রসন্ন আননে প্রতিহিংসার বক্র হাসি
হাসিয়া পরিতুষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আমরা তো
জাতিভেদ মানিনে। ব্রাহ্মণ বা বাগ্‌দী আমাদের
কাছে প্রভেদ কি? তুমিও তো খুঁটান, তোমার
পক্ষেও সেই একই কথা।”

এ যুক্তি শুনিয়া আর নীলিমার মাথার ঠিক রহিল
না, সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল, “মিথ্যা কথা!
জাতিভেদ আপনারা খুবই মানেন! আইরিশম্যানের
বিবাহ বান্ধালী ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে হওয়ায় আপ-
নার এবং আপনাদের অধিকাংশেরই ঘোরতর আপত্তি
আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্ডার বিবাহ বাগ্‌দীর সঙ্গে হওয়ায়
আপনার বা আপনার জাতির আপত্তি নাই। কেন?
আমরা কি আপনাদের সঙ্গে তুলনার তাদেরও অধম?
কিসে শুনি? রংয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে
তফাৎ, আমাদের সঙ্গে বাগ্‌দীদেরও প্রায়ই তাই।
আপনারাও এ দেশে থেকে খুব বেশী পূর্বের রং বজায়
রাখতে পারেন না, তাও তো স্বচক্ষে সর্বদা দেখেছেন!
তবু তা বজায় রাখতে কতই না প্রাণপণ চেষ্টা, কত
না অসাধারণ যত্ন! পাহাড়ে ঘোরা, মধ্যে মধ্যে
‘বাড়ী’ ঘুরে আসা। তার পর শিকার, সংগ্রহ, চরিত্র
কোন বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যত প্রভেদ,
আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশের অতি নিম্ন শ্রেণীর
লোকদের তার চেয়ে কি কম প্রভেদ? আমরা অর্ধো-
লঙ্গবেশে নর-নারী মিলে—তাও পরপুরুষ ও পরনারী
— মদ খেয়ে অর্ধ-প্রমত্তভাবে উদ্‌দাম নৃত্য করতে পারি
না, পুরুষের উচ্চ স্থলতা এখানেও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হলেও

নারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমাদের সমাজ, সমাজধর্মের অধিকতর বিরোধী বোধ করে, সমাজকে সতী-গর্ভজাত রাখতে চায়, এরই জন্ত আমরা আপনাদের কাছে অর্দ্ধশিক্ষিত ব'লে যদি গণ্য হই, তবে ওদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ তো এখনও গণ্য শেষ করতে পারা যায় না। আমি অবশ্য আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে শোণিতসম্বন্ধে মিশ্রিত হ'তে বলিনে, কিন্তু আমাদেরও আপনারা সেই দয়াটুকু দেখালেই তো চুকে যায়। এই রঙ্গিন খোলস, এই কথার মালায় আমাদের দেশের যে সর্বনাশ হ'তে বসেছে। ছাড়ুন এ সব অভিভাবক-ত্বের ভাণ! এই ভুল পথের ভুল শিক্ষা ছালা ভ'রে এনে ছোট ছোট মাথায় ইন্জেক্ট ক'রে দেবেন, আর—” উত্তেজনা নীলিমার কণ্ঠরোধ হইল; সে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

রেভারেণ্ড গিলবার্ট অটোম্যান এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন। পুরোহিতোচিত ধীর-গম্ভীর স্নিগ্ধ কণ্ঠেই তিনি নীলিমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বৎস! ধৈর্য্যহারা হইও না, তুমি নিশ্চয়ই সেন্ট ম্যাথিউএর সেই মূল্যবান কথাগুলি স্মরণ করিবে যে * * * and gathered the good into vessels, but cast the bad away. And shall cast them into the furnace of fire there shall be wailling and gnashing of teeth—, অতএব স্মৃতির চিত্তে সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখ। দেখ,—ভুল করা মানবধর্মের বাহিরের বস্তু নহে। To Err is human, এটি একটি তারই বিশেষ প্রমাণ। আর যীসাস্ ক্রাইষ্ট এই ভুলক্রান্ত পাপীদের জন্তই সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার কারিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কাঁটার মুকুট পরিয়া নিদাক্ষণ যন্ত্রণাজনক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণদান করিলেন, তাহা কেবলমাত্র জগতের পাপি-কুলের মুক্তির জন্তই। অতএব তুমি নিজের জীবনের ভুলের জন্ত অনুতপ্ত হও এবং সম্পূর্ণভাবে যিনি তোমাদের জন্ত প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ পূর্বক তোমার জন্ত বিহিত তোমার এই একমাত্র উদ্ধারের পথকে তুমি সর্বাঙ্গতঃ করণে গ্রহণ কর। হিন্দুর জাতিভেদে ও খৃষ্টানের জাতিভেদে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। হিন্দু তাহার সহিত সমানধর্মী, সমবর্ণ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যেও আহার পর্যন্ত করে না, আর আমরা নিগ্রো, বাগ্দী বা তোমাদের

সবার হাতেই নির্বিকার ভাবে থাই। ও সব সঙ্কীর্ণতা, মিথ্যাভেদবুদ্ধি মন হইতে পরিত্যাগ কর। পলকে আমিও চিনি, সে তাহার কুলীদের খুব খাটায় ও তাহাদের মধ্যে বাইবেল প্রচার করে। এতে তাদের খুব ভাল হয়। উপার্জনও সে কম করে না। আমার বিশ্বাস, এ বিবাহে তোমার আত্মারও কল্যাণ হইবে এবং সুখীও যে হইবে না, তা নয়। আর কি আশা করিতে পার? নেটিবের মেয়ে হইয়া এর বেশী কি পাইবে?”

এরই নাম উদারতা! আর এই সমুদ্রত যুরোপীয় উদার সমাজ! এতটুকুমাত্র সঞ্চয় লইয়াই ইহার পরধর্মের প্রতি পদে পদে আক্রমণ পূর্বক পরের শাস্তিপূর্ণ সমাজ-ধর্মকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছেন? যুরোপীয়ের জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপেই বর্ণভেদ, একজন ইংরাজ এক জন ইটালিয়ানকে বিবাহ করিলে তাহার জাত যায় না, কিন্তু এক জন ভারতবর্ষীয়কে করিলে যায়। আর অবস্থাভেদেও এই জাতিভেদের একটা প্রধান অঙ্গ। লর্ডের ছেলের গরীবের মেয়ে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী যুরোপের—মিশ্রজাতির—আমেরিকানের ঘরে বিবাহে দোষ হয় না। অথচ তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধ অন্তরে অবজ্ঞা নিতান্ত কম নয়। তার পর বিবাহে স্বামী নিরীচ-চনটাও যতদূর হইতে পারে, তাহাও এই জর্জের ব্যাপারেই তো সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে। নিজ সমাজ-মধ্যেও গভী ছাড়াইবার পথ ইহাদের কাহারও নাই। রাজার ছেলের বিবাহ রাজবাংশে হওয়া চাই, সকল ক'নেই বরের ধনৈশ্বর্য্যের মূল্যে আত্ম-বিক্রয় করিতে নিজেকে পণ্যের মতই বিবাহ-বিপণির ঘারে নিয়মমত সাজাইয়া আনে। পিতার ঐশ্বর্য্যমূল্যে বিক্রয় সহজ হয়। এ সমাজও সেই তো একই সঙ্কীর্ণচিত্তের সমাজ। সমাজ-ধর্ম সর্বত্র কি তবে এক নহে? মানুষের ঐক্যতির মধ্যে অমুদারতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, এ কি সর্বত্র একই ভাবে বর্তমান নাই? বরং ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু কিছু উদার, সে পরধর্ম হস্তক্ষেপ করিতে চুটে না।—অপর ধর্মে সেটুকুরও অভাব।

বিরিক্ত-পুরুষ মুখে পুঞ্জীভূত মহাশয়ের দিকে মুখ তুলিয়া নীলিমা সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, “আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তবে আপনারা যে নিষেধের বিজ্ঞপ্তি

বিজিত জাতির বিষয়ে কখনও এবং কোন বিষয়েই ছবিচার করিতে সমর্থ নহেন, এ কথা এখন এ দেশে সবাই জানে। এ দেশের মেয়েরা, স্বজাতির বাহিরে তো দূরের কথা, স্বদেশীর বহির্ভাগেই সাধ্যপক্ষে বিবাহ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এমন কি, যাহারা মুখে জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও মনের এ সংস্কার সহজে দূর হয় না। বাহা হউক, আমি আপনাদের নিকীর্ষিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি। তাহা অপেক্ষা বরং আপনারা আমার বিদায় দিন, আমি অন্ত্র চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইলে আমার কুণ্ঠান্তে অন্য মেয়েরা তো আর মন্দ হইতে পারিবে না।”

এই বলিয়া নীলিমা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই মিস্ রীচও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে পদাঘাত পূর্বক সরোষকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “বিদায় তোমাকে নিশ্চয়ই দিব। কিন্তু তাহার পূর্বে তোমার বিধদাত তুলিয়া লইয়া তবেই তোমার ছাড়িব। তোমার মত কুহকিনীকে বাহিরে পাঠাইলে অল্পবয়স্ক যুবকবৃন্দের সর্বনাশসাধন করা হইবে, সে কার্য জানিয়া শুনিয়া আমি করিতে পারিব না। শত্রু হাতে তোমার বাধিয়া দিয়া তাহার শাসনে রাখিতে পরিলে তোমার কতকটা ঠাণ্ডা করিতে পারিব আশা হয়। যাও, আর কোন কথা বলিও না; বিবাহের পোষাক তুমি তৈরী না করিয়া লও, আমি চন্দ্রমুখীকে করিতে দিব—যাও—তুমি এখন এখান হইতে শীঘ্র দূর হইয়া যাও!”

নীলিমা একবার কি বলিবার জন্ত মুখ তুলিতে গিয়াই আত্মসংবরণপূর্বক আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সঘন-স্থাসে তাহার বুক তখন জোয়ার লাগা নদীতরঙ্গের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, গরলে ভরা সর্প খাসের মতই প্রবলবেগে খামপ্রখাস বহিতেছিল; ছই চোখ তাহার আঙনের ভাঁটার মত দীপ্ত হইয়া জ্বলিতেছিল। পাছে মিস্ রীচের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুটি টিপিয়া ধরে, পাছে এই প্রবল উত্তেজনার বশে তাহার জিহ্বাটা বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বসে, তাই কোনমতে প্রাণপণে সে নিজেকে জোর করিয়া ঠেলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, আর এক মুহূর্তও এখানে নিজেকে রাখিতে তাহার ভরসামাত্র হইল না। না—পাণের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তার স্ত্রী! তার স্ত্রী!

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলিমা চোরের মত সতর্পণে নিজের মূল্যবান জব্বাদি একটি ছোট পুঁটুলীতে বাধিয়া লইয়া নিঃশব্দপদে ঘর খুলিল এবং এদিক ওদিক দেখিয়া ধীরসতর্কপদে পিছনের বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, এ দিকের ছোট দরজাটা খুলিলেই সে মুক্তি পাইবে, কিন্তু কাছে আসিয়া তাহার সে ভুলটা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল, সেই ক্ষুদ্র দ্বারে একটা বড় রকমের পিতলের তালা লাগানো রহিয়াছে। তখন হতাশায় তাহার সমস্ত মনপ্রাণ যেন মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, শরীরের সবটুকু শক্তি যেন তাহার কোথায় নিঃশেষ হইয়া চলিয়া গেল, সে সেই কপাটের কাছেই ছই হাঁটু ভাঙ্গিয়া একেবারে বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং আত্মনাদের মত করিয়া মর্মান্তিক বিলাপ-স্বরে কহিয়া উঠিল, “হে ঠাকুর! তোমায় ছেড়েছি বলে তুমিও কি আমায় ছাড়লে? শেষে কি স্ত্রীলকে ছেড়ে বাগদীর গলাতেই আমায় মালা দিতে হবে? আমার এত বড় স্বার্থত্যাগের কি এই এত ছোট পুরস্কার!”

পিছনে কাহার যেন মৃদু পদশব্দ হইল, অমনি নীলিমা সভয়ে আতকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা হইতে মাথা অবধি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, ধরা পড়িলেই তো তাহার সকল আশারই আজ এখনই সমাধি ঘটবে, এ কথা সে ভালমতেই বুঝিয়াছিল। মিস্ রীচের যে প্রকৃতি, অতঃপর তিনি যে তাহাকে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ কি অহেতুক বিদ্বেষ! সে ত তাঁর কোন কতি কল্প নাই! ইহাই হিংস্র স্বভাবের গুণ। তার বাপ যা করিতেন, তারও একটা অর্থ আছে—সেটা স্বার্থ। কিন্তু মিস্ রীচের এ অত্যাচারস্বার্থ অধীনস্বকে পীড়ন করার সুখ মাত্র, আর কিছুই না।

“নীলিমা! ভয় পেয়েছ? আমি চন্দ্রমুখী। তুমি কি এখানে থেকে পালাতে চাও? পালাবে? আচ্ছা, এসো, এ পথে ত যেতে পারবে না ভাই। মোমের বাথ-রুমের দোর দিয়ে তোমায় বার করে যেন আমি দিতে পারি;—কিন্তু তার পর?”

নীলিমার সর্বশরীরের সে প্রবল কম্পন তখন পর্যন্তও ভাল করিয়া থামে নাই, সশেষ তাহার মনকে তখনও পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া আছে, তথাপি অন্তর

পরিবর্তে চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া এবং তাহ'র মুখের এই আশ্বাসবাণীতে কথঞ্চিৎ আশস্ত হইয়া সে উত্তেজনা-রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সাগ্রহে উত্তর করিল, “তার পর যা হয়, আমার হবে, আমার তুমি দয়া ক’রে এই নরক থেকে উদ্ধার ক’রে দাও দিদি! আমি যদি আর কোন উপায় না দেখি, এবার না হয় ম’রে গিয়েও বেঁচে যাব, তবু বিষে করতে আমি কিছুতেই পারবো না; স্বর্গের দেবতাকেও না, তা ঐ বাগ্‌দী খুঁটানকে।”—

চন্দ্রমুখীর অধরে ঈষৎ সহানুভূতিপূর্ণ হৃৎখের হাসি ফুটিয়া তখনই আবার তাহা অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল, সে শুধু সংক্ষেপে কহিল, “এসো।”

বাহিরের মুক্ত বাতাসে রুদ্ধশ্বাস গ্রহণ পূর্বক নীলিমা চন্দ্রমুখীকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। অঙ্গ গদগদস্বরে কহিল, “দিদি! তুমি আজ আমার ম’র বাড়ী হ’লে! নিশ্চয়ই তুমি আমার জন্মান্তরের মা ছিলে, নয় তো বোন ছিলে ভাই! উঃ, কি হৃর্ভাগা থেকেই আমার তুমি আজ বাঁচালে বল দেখি?”

চন্দ্রমুখীর দুই চোখ ছলছল করিতেছিল, সে নীলিমার ভয়পাণ্ডুর ও শীতল গণ্ড দুই হাতে ধরিয়া তাহার ভয়, উত্তেজনা ও সংশয়ে শবন্ত্র ললাটে সম্মেহ চুষন করিয়া সজল গাঢ়স্বরে কহিল, “নিজে ম’রে যে মরণের বিতীষিকাকে চিনেছি রে ভাই! ঐ থেকে কেউ যদি বাঁচতে পারে, মনে হয়, তাতে বুঝি নিজেও একটুখানি শাস্তি পাব। যাও ভাই, দেবী করো না। কিন্তু একটা কাজ কর না হয়, হিন্দুস্থানীর মতন ক’রে শাড়ীটা না হয় প’রে নাও, আর একটা শাড়ী ছিড়ে ওড়না ক’রে মুখে মাথায় ঢাকা দাও; আর এই দাই-এই হাঁকা-কলকেটা এনেছি, এটিকেও হাতে ক’রে নাও দেখি। দেখো ভুলে যেও না, হিন্দীতে কথা কয়ো। বাঙ্গালীর মেয়েকে একা এত রাত্রে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে বেশী। আচ্ছা, মন্দ হয়নি, হ্যাঁ,—যদি কখন নিরাপদ হ’তে পার, তখন আমার একটু খবর দিও,—দাঁড়াও, সব কথা ব’লে দি, এখন যেন দিও না।”

দুই জনে তখন দুই দিকের পথ ধরিল।

কোন দিকে ষ্টেশন, তাহা নীলিমার জানা নাই। মিস ওকবর্গের জীবিতকালে কয়েকদিন গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া সে গহর কোন দিকে, তাহা দেখিয়াছিল, পোষ্ট-অফিসেও এক দিন তাহাদের গাড়ী থাকে, জাদাজ করিল, ষ্টেশন সেই দিকেই হইবে। উত্তরের

পথকে সে সময়ে বর্জন করিল, সেই পথ দিয়াই সে এমনই অসহায় অবস্থায় আর এক দিন এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেই কথা আজ আবার ভাল করিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল।

ট্রেনের থার্ড ক্লাস টিকিটই সে কিনিয়াছিল। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার পূর্বেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল,—যাহাতে সে গাড়ীতে তাহার উঠা ঘটিল না। সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের একটা খোলা জানালা দিয়া একটা বঙ্গনারীর অনাবৃত মুখ বাহিরের দিকে খানিকটা বুঁকিয়া ছিল, তাহার ঠিক সাম্নাসাম্নি হইতেই নীলিমার মাথা হ’তেই তাহার অনভ্যন্ত ওড়নাখানা বাতাসের একটা প্রবল ঝাপটায় হঠাৎ খসিয়া পড়িল, এ দিকে সে তাহা শব্দবাস্তে কুড়াইয়া লইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবার পূর্বেই সেই বাতায়নমধ্যবর্তিনী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে এক-মূহূর্ত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর অথচ সুস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন, “নীলিমা!”—এই অতর্কিত সম্বোধনে নীলিমা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের সেই ব্রাহ্ম গার্লস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুলোচনা দিদি।

সুলোচনা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গম্ভীর, অথচ শাস্তকণ্ঠে পূর্ণ আদেশের স্বরে কহিলেন, “এখানে এসো।”

নীলিমা একবার মনে করিল যে, সে ইঁহার সম্মুখে হইতে না হয় খুব ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু সে কাজ করিতে আদৌ তার ভরসা হইল না। তাই অনিচ্ছুক ও বিপন্নভাবেই তাঁহার নির্দেশমত তাঁহার কামরাতেই শেষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। মনটা তার অতিরিক্ত বিপন্নতায় বিরক্তিতে ভরা। না জানি তার ভাগ্যে আবার কি না কি বিড়ম্বনা ঘটিয়া যায়! এ যে ভাজনা খোলা হইতে আগুনে পড়া ঘটিল! মিস রীচকে এড়াইয়া বাঘের খপ্পরে!—কথা প্রায় একই।

সুলোচনা নীলিমার আপাদমস্তক বার দুই তিন চোখ বুলাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কথা কহিলেন; বলিলেন, “তবে যে শুনেছিলুম, তুমি ম’রে গেছ?”

নীলিমা চিরদিনের অভ্যাসমত এই গম্ভীরপ্রকৃতি শিক্ষয়িত্রীকে ভীতিদৃষ্টি প্রেরণ করিল, মুখে তাহার কথা সরিতেছিল না; মূলে থাকিতেও সে কখনও

ইহার সহিত বেশী কথা কহে নাই। এমন কি, পাণ্ডনা টাকার তাগিদে তয়ে বরং তাঁহাকে দেখিলেই তাহার হৃৎকম্প হইত।

স্বলোচনা পুনশ্চ বলিলেন, “দোষ তোমার বাবারই, কিন্তু তার ফলে তুমি আর যা হোক করলেই পারতে, এটা ভাল হয় নি।”

এতকণে নীলিমা তাঁহার তিরস্কারের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল এবং তাহা পারিয়া তাহার মনের সমস্ত সঙ্কোচকে কাটিয়া দিয়া তাহার অন্তরের সত্যীভাজ্য তাহাকে দীপ্ত করিয়া তুলিল, সে তখন একটু যেন সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ও অকুণ্ঠস্বরে সহজভাবে তাঁহাকে বলিল, “কোনটা ভাল হয়নি, স্বলোচনাদি? মা ম’রে যাওয়াতে বাপের কাছে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না জেনে শ্রমণ থেকেই আমি নদীর ধারে ধারে চ’লে চ’লে ক’দিন পরে আশ্রয় অবস্থায় * * এর মিশন-কুটীর কাছে পৌঁছে সেইখানে মাঠের মধ্যে প’ড়ে ছিলাম। তারা নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে আমার খুঁটান করেছে! কিন্তু তাদের মধ্যে আমি মোটে টেকে পারছিলাম, তাই আমি আজ সেখান থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতুম বলুন?”

স্বলোচনা আবার চশমার মধ্য দিয়া ভাল করিয়া নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে আন্তে আন্তে বলিলেন, “তুমি কি খুঁটান?”

“হ্যাঁ, তাই আমি হয়েছিলুম, এই দেখুন না”— বলিয়া সে তাহার পুঁটলী খুলিয়া কাল রং-করা কাঠের ছোট্ট ক্রুণ ও একখানা বাইবেল বাহির করিয়া তাঁহাকে সেই দুইটি জিনিষ দেখাইল। স্বলোচনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,— “সুখ পেলে না?”

নীলিমা স্তানমুখে মাথা নাড়িল, “না।”

“কোথায় যাচ্ছো? বাপের কাছে কি?”

নীলিমা এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। বাপের কাছে? হ্যাঁ, সেটা তাহার যাইবার মত স্থানই বটে! যত্নের জ্বারেও তাহা হইলে পৌছানটা সহজ হয়। কিন্তু প্রাণের উপরকার মমতাটাও যে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। সে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, “না, সেখানে নয়। কলকাতার টিকিট নিয়েছি।”

“সেখানে কি কেউ আছে?”

নীলিমার মুখ শুকাইয়া ছোট্ট হইয়া গেল,

বিপর্যয়ে সে নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তরে কহিল, “কেউ না, শুধু—কোথায়ই বা যাব, তাই জন্তেই নিমুস। শুনেছি, সেখানে না কিছু অনেক উপায় আছে। স্থল আছে, বোডিং আছে, কিছু না কিছু উপায় হয় তো হয়ে যেতে পারে।”

স্বলোচনা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিত হইলেন, তাহার পর একটা ছোট্ট রকম শ্বাস নিশ্বাস পূর্বক স্বভাবসিদ্ধ গাভীরোঁয়ের সহিত কহিলেন, “তোমার বাবা যে দিন তোমায় আমাদের স্থল থেকে ছাড়িয়ে নেন, আমার মনে তোমার জন্তে কষ্ট হয়েছিল।—যা হোক, তুমি আসতে চাও তো আমার কাছে আসতে পার। ইচ্ছা হ’লে আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করতে পার, আর সেই সঙ্গে ইনক্যান্টরাসটার পড়াতেও পার। কিছু কিছু পাবে তাতেও। আর কিছু পড়াশুনা করেছিলে কি?”

এই অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বে নীলিমার দলিত হৃদয় যেন সক্রতজ হর্ষোচ্চ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল লাগিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার চোখের কোণ ছাপাইয়া পড়া জলের ধারাকে রোধ করিতে চাহিয়া জোর করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, “আমি ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, এমন কি, একটু একটু ল্যাটিন পর্য্যন্ত শিখেছি।—আমার আপনি স্থান দেন তো আমি নিশ্চয়ই যাব,—আপনার কাছে।—কিন্তু আমার বাবা যদি আমায় সেখান থেকে জোর ক’রে ধ’রে আনেন, আর আপনাকেও যদি আমার জন্ত তিনি অপমান ক’রে বসেন, সেই আমার ভয়। জানেন তো তাঁকে—”

স্বলোচনা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাধা দিলেন, বলিলেন, “তুমি হয় তো জান না, তোমার বাবা যে এখন মৃত্যুশয্যায়। ঝড়ঝুড়িতে পুরাণ বাড়ীর একটা দিক ভেঙ্গে পড়ছিল, তারই মধ্যে থেকে লোহার সিন্দুক টেনে আনতে গিয়ে একটা মোটা কড়িকাঠ ভেঙ্গে প’ড়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে। তিনি এখন হাসপাতালে, পরশু আমি এসেছি, সে দিনও তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।”

নীলিমা এই সংবাদে ক্ষণকাল স্থির স্তব্ধ হইয়া রহিল, সে যে এ খবরে খুসী হইল অথবা হতাশিত হইল, সে কথাটাও সে যেন কয়েক মুহূর্ত্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার পর মনের মধ্যে কিসের যেন একটা দ্রুত তৃষ্ণা দেখা দিয়াছে বলিয়াই সে সহসা অনুভব করিল। সেটা যেন সেই

চিরঅত্যাচারী, নিশ্চয় প্রকৃতি পিতার প্রতি সমবেদনা ও তাঁহাকে একবার শেষ দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বলিয়াই তাহার আর বুঝিতে বাকী থাকিল না। আর এই অভিনব আবিষ্কারে যেন বিশ্বয়ে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল এবং তাহার পরই কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা অশ্রু-সজল গাঢ় স্বরে সে কহিয়া উঠিল,—

“যাই হোন, আর যাই করুন, তবুও তো তিনি আমার বাপ,— আমি আগে একবার তাঁরই কাছে যাব সুলোচনাদি’! তার পর যদি যায়গা দেন, তবে আপনার পায়ে তলায় বসে সেই আপনার মত পায়ের জন্তাই নিজেকে উৎসর্গ করে দেবো। আমার এ জন্মটার আর ত আমার কিছুই করবারও নেই! কিন্তু একটি কথা সুলোচনাদি! আমি যে একদিন খুঁটান হয়েছিলুম, এ কথা যদি সম্ভব হয়, তবে আমি তা জুলতে চাই, আপনিও দয়া করে তাতে একটুখানি সাহায্য করবেন। আপনি এ কথা কাহারও কাছে বলবেন না, আমিও বলব না। আমি ত আর গৃহস্থ সংসারে ঢুকতে যাচ্চিনে যে, এতে পাপ হবে? সমাজের ও সংসারের বাইরে থেকেই তো আমি আমার জীবনটাকে কাটাতে চাই। এতে আর কার কি ক্ষতি হবে? আমি হিন্দু। কামরুনে আচার-নিষ্ঠায় আমি হিন্দু হয়েই থাকব, আপনি সে সুযোগ আমায় দিতে পারবেন না কি? বলুন, তবেই আমি যাব।”

সুলোচনা কথায় ইহার জবাব না দিয়া শুধু নীলিমার মাথার উপর নিজের দক্ষিণ হাতখানি রক্ষা করিলেন।

তখন সম্পূর্ণরূপে আশ্রুতা ও আশান্বিতা হইয়া উঠিয়া নীলিমা তাহার সেই কালো রংএর ক্রশ ও কালো চামড়া বাধা বাইবেলখানা তুলিয়া লইয়া জানালার মধ্য দিয়া ভূগাত্ত মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিল। গাড়ী তখন রীতিমত ছুটিয়া চলিয়াছে।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ভুবনবাবুর ঘরে আলোক জ্বলিতেছিল না। বাহিরে ভূতাবর্গ অতি সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিতে থাকিলেও কোন এক জনও এ ঘরে প্রবেশ করিতে ভরসা করে নাই। কলিকাতার রাজপথ ব্যতীত আর সমস্ত প্রকৃতিই যেন

আজ একটা আকস্মিক বিরাট শোকভারে অভিভূত হুত ও ভয়ানক। আকাশ ঘোলাটে, বাতাস গুমোট, গাছপালা নিরুন্ন হইয়া আছে। গৃহবাসী ততোধিক হুত ও স্থির।

ভুবনবাবু যে সোফায় সচরাচর দৈপ্রহরিক নিদ্রাবেশ হইলে কখন কখন শয়ন করেন, তাহাতেই অর্দ্ধচেতনবৎ বহুক্ষণাবধি পড়িয়া আছেন। আহা! তাহার আজ কয় দিন ধরিয়াই প্রায় ছিল না, আজ আর তাহা একেবারেই হয় নাই, আহারের কথা বলিতে আসিবার প্রবৃত্তি অথবা ভরসাও এ বাড়ীর কাহারও মনে ছিল না। এই চিরসহিষ্ণু সহৃদয় কোমল-প্রকৃতি মনিবের উপর আজ কত বড় বিপদের বজ্রই যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া এ বাড়ীর প্রত্যেক পরিজন আজ কেবলমাত্র গোপনে অশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছিল। আর সুনীল? সেও যে এ বাড়ীর ছোট বড় সকলেরই বড় প্রিয় ছিল। সকলেরই মনের মধ্যে অশ্রুট অবিখ্যাসে সুনীলের নির্দোষিতা সম্বন্ধে পূর্ণ সন্দেহই যে আজও তেমনই জাগ্রত রহিয়াছে। হুই এক জন স্পষ্টই তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদও করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের সেই অসহিষ্ণু প্রতিবাদে বাহিরের কোন পরিবর্তনই তো ঘটাইতে পারে নাই। কাল সুনীলের বিচারের দিন, এ সংবাদ তাহার জন্ত নিযুক্ত উকীল-ব্যারিষ্টারের কাছেই সরকার জানিয়া আসিয়াছে।

একখানা ভাড়াটে খার্ডরুশ গাড়ী আসিয়া থামিলে গাড়ীর মধ্য হইতে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ক্রিষ্টভাবে নামিয়া আসিল বিনতা। বিনতার সেই সগর্ভ সন্নত চলনের ভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট উন্নত দেহ অনেকখানিই নমিত হইয়া গিয়াছে, পায়ে তাহার জুতা নাই, কেশ ক্রক, বেশভূষা অসংবৃত, মুখ তাহার অস্বাভাবিক পাংশুবর্ণ, চক্ষু দুইটা অসাধারণ উজ্জল। এই ভয়াবহ নারীমূর্তি দেখিয়া সে বাড়ীর সকলেই যেন সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া সরিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্তোষের কোন একটি ভাষাও সে দিন কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না—কেহ কেহ একটু বিদ্বিষ্টভাবেই মুখ সরাইল। বিনতাও কোন দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া সোজা তাহার বাপের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার দৃঢ় পাদক্ষেপ ও কাঠিন্যকঠোর মুখভাষে তাহাকে বে দেখিল, সেই মনে মনে আসন্ন আর একটা কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল

গর্জনোন্মুখ বজ্র যেন সেই মেঘবাপ্ত মুখখানার কণে কণে চকিত চপলার মধ্য দিয়া উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছিল। সেটা ভাইয়ের জন্ত শোক নহে, পিতার প্রতি সহানুভূতিও নহে; এ সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত অপর আরও কোন একটা নূতন জিনিষ, তাহা যে কোন দর্শকই বেশ বুঝিতে পারিল।

বিনতা ঘরে ঢুকিবার পূর্বেই একবার এবং দ্বারে পা দিয়াই আবার একবার তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিল, “বাবা!”

ভুবনবাবুর অসাড় আচ্ছন্নবৎ মনের ভিতরে সে ধ্বনি একটুখানি যেন স্পন্দন মাত্র তুলিল। এই ‘বাবা’ ডাক যেন কোথা হইতে কোন্ স্বদূর হইতে আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—এ যেন তাঁহার বহু বহু দিন অশ্রুত! এমনই হৃদয়-মনে চমকিত—উচ্চকিত হইয়া তিনি সহসা লোভাকুল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ঘরের দিকে চোখ ফিরাইয়া চাহিতেই সেই অমুজ্জল সন্ধ্যা-লোকে একটি অস্পষ্টপ্রায় নারী-মূর্তি তাঁহার সেই উদ্বেগ-ব্যাকুল চক্ষুতে পড়িল। এমনই গভীর হতাশার হাহাকারে সমস্ত মনপ্রাণ যেন কোন্ পাথারে তলাইয়া যাইবার উপক্রম করিল। কৈ, কোথায় রে! কে কোথায়! কাহার অলীক প্রত্যাশা করিয়া এ স্বপ্ন দেখা! সে কোথায়? আজ সে কোথায়?

আবার স্পষ্ট পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান আসিল—“বাবা!”

“কে?” বলিয়া ভুবন বাবু বিস্মিত-স্তম্বিত দৃষ্টি মেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর মূর্তির প্রতি স্থিরভাবে চাহিয়া রাহলেন। মাথার ভিতরটা যেন কি একরকম গোল-মাল হইয়া গিয়াছিল, তাই এ যে তাঁহার কোন দিনের পরিচিত, কিছুতেই যেন এই কথাটাকে তিনি স্বরণে আনিতে পারিলেন না। বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, “কে তুমি?”

অভিমানিনী বিনতার বকের ভিতর বারেকের জন্ত অভিমানেরই উৎস উৎপলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বারেকমাত্র, তাহার পরই সে শান্ত দৃঢ়পদে পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আলোটার স্নাইচ টিপিয়া ঘরটাকে আলোকিত করিল, এবং হঠাৎ এই তীব্র আলোকরশ্মি প্রতিহত হইয়া পিতাকে সচমকে চোখ টাকিতে দেখিয়াও সে জন্ত একটুকুও ব্যস্ত না হইয়া কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্থিরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, “চেয়ে দেখ, বাবা! এই সইটা কি তোমার নিজের হাতের?”

ভুবনবাবুকে কে যেন বকের উপর বোমা ছুড়িয়া মারিয়াছে, তিনি তেমনই ভয়ান্ত বিবর্ণ মুখে প্রায় আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিলেন, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে সবেগে উচ্চারণ করিলেন, “আবার এ কি খেলা তোমাদের!—আবার আমাকে কেন এমন ক’রে মারতে এলে তুমি?—এর মানে কি?”

বিনতা বাপের চোখের সামনে একখানা বড় ফুলস্বেপ কাগজ অকম্পিত হস্তে প্রসারিত রাখিয়া, তাহাতে আঁটা প্রথম সইটার উপর তেমনই অকম্পিত অঙ্গুলী রাখিয়া বাপকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল। সেই ভাবই বজায় রাখিয়া অস্বাভাবিক স্থির ও ধীরকণ্ঠে সে বাপের ঐ কাতর আবেদনের জবাবে উত্তর করিল, “মানে আমি তোমার এখনই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, বাবা। বেশী সময় তাতে লাগবে না, আগে তুমি শুধু ঠিক ক’রে দেখে বল দেখি, এ সই করা তোমার নিজের হাতের কি না? কৈ, তোমার চশমা কৈ? এই যে—পড় তো, বেশ ক’রে দেখ।”

ভুবনবাবু যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মতই তাঁহার এই চির-স্বপ্নভাবিণী ও দৃঢ়প্রকৃতি মেয়ের অলজ্জা আদেশ নিঃশব্দেই প্রতিপালন করিলেন, তাহার পর অনেকক্ষণ পরে কাগজের লেখা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া প্রায় অশ্রুট ও একান্ত ভয়কণ্ঠে কহিলেন, “এত আমারই।”

বিনতার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে এতটুকু একটু সঙ্কল-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ-হাস্ত উদ্ভাসিত হইবার পর-মুহূর্ত্তে তাহা তাহার ঘন মেঘাচ্ছন্নবৎ গভীর মুখের মধ্যেই নিঃশেষে আবার লয় হইয়া গেল। সেই হাসিটুকু দেখিয়া মনে হইল, যেন একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি এক মুহূর্ত্তের জন্ত বলকিয়া উঠিয়াছিল মাত্র।

কাগজের উপরে লেখা দ্বিতীয় সইটার উপর পুনশ্চ নিজের আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া সে আবার কহিল—“এটা?”

বারেকমাত্র বিস্মিত নেত্রের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ করিয়াই এবার ভুবনবাবু মাথা নাড়িলেন, “না—এ আমার নয়।”

তাঁহাকে যেন এতটুকু শ্রম করিতে হওয়াতেই একান্ত অবসন্ন দেখাইল। তিনি ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ফেলিতে লাগিলেন। বিনতা তবুও নিবৃত্ত হইল না, সে ইহার পর পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতটা ঐরূপ সইএর উপর আঙ্গুল বুলাইয়া বাপকে ক্রমাগত

ঐ একই প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল—“এইটে ?—এইটে ?”

নাম সব কয়টাতেই ভুবনবাবুরই সহি বটে, কিন্তু লেখার ছাঁদ ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতে হইতে সব শেষ লেখাটা একেবারেই অন্য ছাঁদের। তাহার সহিত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মিলিয়া যায়—এমনই আর একটা হাতের নাম-সহি ইহার ঠিক পাশাপাশি কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই লেখাটার উপর চোখের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া আসিতেই ভুবনবাবু নিজের শরীরমনের সকল দুর্বলতাকে পরাস্ত করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন—সেই সহিটা তাঁহার ছোট জামাই শুভেন্দুর।—নামও তাহার, লেখাও তাহার। এই লেখকের লেখার ছাঁদ যে ক্রমে ক্রমেই বিশেষ চেষ্টা ও যত্নসহকারে লুপ্ত হইতে হইতে সর্বশেষ লেখাটার প্রায় ভুবন বাবুর লেখার ছাঁদে মিলাইয়া আসিয়াছে, তাহা সব কয়টা সহি পর পর দেখিয়া গেলেই বেশ সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

ভুবন বাবুর সহসা বোধ হইল, তাঁহার বুকের উপর হইতে যেন ঠিক বিশ মণ ওজনের সূত্রঃসহ ভারি এক খানা পাথরের ভার হঠাৎ কে টানিয়া নামাইয়া লইয়াছে। বহুকালের শ্বাসকূচ্ছকর অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণা অকস্মাৎ কোন দৈবী শক্তিতে যেন একটি মুহূর্তেই নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু এই অত্যন্তকৃত্য কিছুরূপ পর্যন্ত তিনি অপরিণীত বিশ্বাসের আবেগে একটিও শঙ্কোচ্চারণ করিতেই পারিলেন না, অথবা ভাল করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসও টানিয়া লইতে বা ফেলিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।

বিনতা স্থির কটাক্ষে বাপের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণভেদ্য অপলক দৃষ্টি তেমনই করিয়াই সেইখানে মেলিয়া রাখিয়া অকম্পিত স্থিরত্বের সঙ্গে ডাকিল—“বাবা।”

ভুবনবাবুর সর্ব-বিস্মৃত স্বপ্ন-বিতোর চিত্ত যথার্থ সত্যের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আবার একবার প্রবল শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার সুশীল নিরপরাধ, তাহা সত্য বটে। ইহার অপেক্ষা বড় কথা আর কিছুই নাই, তাঁর পক্ষে এও ঠিক। কিন্তু তাহার সে নির্দোষিতা প্রমাণ করা এখনও তাঁহার পক্ষে যে প্রায় সমানই কঠিন রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ডিত করিতে হইলে, সুসদৃশ—তাঁহার পক্ষে যতই বাহা হউক, কিন্তু এই নির্দোষী বালিকার ওহাভে কি

দশা ঘটবে? উঃ, তবে কি, বাহা হারাইয়াছে, তাহা আর ফিরানো যাইবে না?—তাঁহার পর তিনি বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কি মহৎ, কত উচ্চ, কতই অসাধারণ চিত্ত তাঁহার ছেলে সুশীলের! পরের জন্ত কত বড় ত্যাগ তাহার! আর সেই কি না এ জগতে চিরকলঙ্কিত নাম লইয়া, অসহনীয় লালিত জীবন বহন করিয়াই কি সব শেষ করিবে? এ কি অপ্রতিবিধেয় অবস্থা দাঁড়াইল! ইহার কি কোন উপায় নাই? এ কি নিজের প্রাণবিনিময়েও আর কোনমতে ফিরানো যায় না? কার কোন মহাপাতকের এ অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত!

বিনতা বাপের মনের লেখা তাহার কালো চোখের আলো দিয়া সুস্পষ্টরূপেই পাঠ করিতেছিল, সে তাঁহাকে বাক্য-বিমুখ ও চিন্তাবিমনা দেখিয়া তাঁহার মানসিক চিন্তার প্রকৃতি অনুভবও করিয়াছিল। হাতের কাগজখানা ভাঁজ করিতে করিতে অকুণ্ঠিত মুখে মুখ তুলিয়া সহজ-কণ্ঠেই কহিল—“দাদার উকীলকে ডেকে পাঠাতে বলবো, না আমিই শীল ক’রে কাগজখানা তাঁকে পাঠিয়ে দেব?”

এই নির্জজন ঘরের একাকিত্বের মধ্যে নিজের মেয়ের মুখের এই কয়েকটি সহজ কথাঃ অত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকটা এমনই বিশ্বাসাত্মক শিহরিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল, ঐ কথাগুলো যেন তাঁহার মেয়ের মুখের নহে—তাঁহার রূপ ধরিয়া যেন কোন ছদ্মবেশী নিশাচরী রাক্ষসী আসিয়া এই দুষ্ট প্রলোভনের জালটা তাঁহার মনের উপর পাতিতে বসিয়াছে! তাঁহার যন্ত্রণাভারাতুর চিত্ত এ সব যেন আর সহিতে পারিতেছিল না, তাই দারুণ অসহিষ্ণুতার বিরক্তিতে তাঁহার মন যেন অকস্মাৎ একান্তই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন সেই আকস্মিক উৎখলিত অসহায় ক্রোধে তাঁহার মনের যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া গেল—সেই গভীর উত্তেজনা তাঁহার দুর্বল দেহে অকস্মাৎ বল আনিয়া দিল। তিনি উঠিয়া সহজভাবে সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চ তীব্রকণ্ঠে কঠোর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “তুই কি বলছিস, তুই কি বুঝতে পারছিস? তোর ভাইকে বাঁচাতে গেলে তোকে যে স্বামিঘাতিনী হ’তে, হবে, তা কি তুই ভেবে দেখেছিস, রাক্ষসি? তুই না হিন্দুর মেয়ে—তুই না সতীর মেয়ে? তোর গর্ভে না তোর স্বামীর সন্তান?”

যে পিতা জীবনে কোন দিন কখন কোন

অন্ত্যায়ের বিরুদ্ধেই একটি রুষ্ট বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই, যে পিতা সন্তানের সকল আদ্যাকারকেই অস্তায় জানিয়াও নীরবে সহিয়া গিয়াছেন, বিবাহের অন্ত বড় মতভেদেও যাহাকে একটিবারের জন্ত রুঢ় ভাষা ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই, তাঁহার মুখ দিয়াই আজ এমন কঠিন তিরস্কার বাহির হইল! বিনতা তিরস্কৃত হইয়া একবারের জন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাঁহার গভীর অনুযোগে সহসা সে মাথা হেঁট করিল। দারুণ বিষয়ে সে স্তব্ধ হইয়া গেল। এই পিতৃস্নেহ-কেও সে তার এই কু-বিবাহের পর হইতে স্বামী কথায় কতবার সন্ধিগত চক্ষুতে দেখিয়াছে! এই পিতৃ-বন্ধেও সে কি লজ্জার আঘাতই না প্রদান করিয়াছে! আর আজ এই যে সর্বনাশের চিতা—সেই-ই ত তাঁহার বুকে সাজাইয়া দিয়াছে—তবু সেই তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার এত বড় ত্যাগ!—উঃ, বাপ রে! না না, সে উহা সহিতে পারিবে না,—এত বড় ত্যাগ—এত বড় সহিষ্ণুতা—এত বড় নিঃস্বর্ণ কৰ্ত্তব্যপরায়ণতা তাহার মধ্যে নাই।—ওঃ!—অসম্ভব!—অসম্ভব! স্নেহের পত্র সে পিতার নিকট হইতে দেখিয়াছে, তাহার স্বপ্নের তাহার দাদাকে যুথলষ্ট করীর মতই দ্রষ্ট-শ্রী ও লাঞ্ছনা-কশাহত যত দূর যাহা করিবার, তাহা তো করিয়াছিল,—আবার কি না তাহার বাকীটুকু তাহারই স্বামী তাহাকে শোধ করিয়া দিল!—না না, না,—তাহাকে এত বড় আত্মবিসর্জন, এমন ভাবে আত্মহত্যা কখনই সে করিতে দিবে না,—দিতে পারিবে না। বরং সে নিজে মরিবে, তবু না।

বাপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া সে প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়-কণ্ঠে তাঁহার তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া জবাব দিল—“হ্যাঁ, আমি হিন্দুরই মেয়ে—আমি সতীকন্যা ও সতী-স্ত্রী, সেই জন্তেই তো আমার স্বামীকে তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাই। আর এতে শুধু আমারই অধিকার আছে। তুমি না পারো,—পেরো না, আমিই সমস্ত পারবো।”—

সে ভাঁজকরা কাগজখানা আঁচলে বাঁধিয়া দূতপদে সে ঘর হইতে সে তৎক্ষণাৎ গমনোত্ততা হইয়া ফিরিতে গেল। কি নিঃস্বর্ণ, কি দার্দ্র্যতাপূর্ণ তাহার কণ্ঠ! তাহার সে স্থির পদবিশ্বাস!

“বিনা!”—

—“বাবা!”

“এ কি করছিস্, মা? সে যে তোরই জন্ত এত

মে (থ) ২২

বড় কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল, আর আমি তোর বাপ হয়ে”—

বিনতা ফিরিয়া আসিয়া বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া শাস্ত মধুরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক বলিল,—“হ্যাঁ বাবা! তুমি আমার বাপ বলেই তো আমার সহধর্মিণীর ধর্ম আমার তুমিই সহায়তা করবে। সেবারও তাই করেছিলে, অস্তায় জেনেও তো আমার সতীধর্ম বজায় রাখতে শুধু এ বিয়েতে বাধা দাও নি। এবারও আমার ধর্ম আমার রাখতে দেবে—সে ছেলেমানুষ, তাই কোন্টা বড়, তা দেখতে পারিনি, কিন্তু তুমি ত সবই জানো? তুমি কেমন করে নির্দোষীকে এমন করে মারতে দেবে? মনে কর, সে যেন তোমার ছেলে নয়, কিন্তু একটা মানুষ। একটা মানুষের জন্ত তুমি আর একটা মানুষের ক্ষতি করতে তো পারো না। সে যে একান্তই অবিচার!”

বিনতা আর তিলান্বিত বিলম্ব না করিয়াই দ্বিপ্র-চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া সোজা চলিয়া গেল।

কাছের বাদামগাছে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ অন্তঃকণ্ঠে শব্দ করিয়া উঠিল, তাহার পরই শ্রামল গভীর পত্রান্তরের মধ্য হইতে বিকট স্বরে ‘ঝিঁ ঝিঁ’ পোকা ডাকিতে লাগিল; আকাশের গায়ে গভীরভাবে ছিটানো, কোথাও এলোমেলো ভাবে ঢালিয়া রাখা, কোথাও সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্মজিত আলোর বিন্দুগুলি নিজেদের অনন্ত রহস্যময় প্রকৃতির মধ্যে মানব-ভাগ্য-লিপির অন্তঃসত্ত্ব দর্শন করিয়াই যেন তাহাদের সাস্বনা দিতে ফুলিলরূপে কয়েকবার অধোমুখে ঝরিয়া পড়িল। সেই নির্জন কক্ষের গাঢ় নিস্তরতা ভেদ করিয়া তথ-চিত্ত পিতার সেই ক্ষোভহর্কল কণ্ঠের সমুদয় হর্কলতা পরিহারপূর্বক বারেকমাত্র ভাসিয়া উঠিল—“চাক্ষশি! দেবি! এ আমার যা-ই হোক, তোমার সন্তানদের মহত্ত্ব আমি আজ ধন্য হয়েছি, তুমিও তাদের গর্ভে ধারণ করায় সার্থকজন্মা হ’লে! সুশীল! বিনা! আমিই সকল সন্দেহকে তোরা ক্ষমা করিস্! ভগবান্—তুমিও—ক’রো।”

স্তব্ধ নিশীথিনীর অব্যাহত শান্তিধারার মধ্যে আর কোন শব্দমাত্র শুনা গেল না, সব শান্ত, সব স্তব্ধ। সব স্থির!!

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীর শেষ আলোক রশ্মিটুকুকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া দিতে পারে নাই, তখনও পশ্চিমগগনের আধমুখ দ্বারপথে ঈষৎ একটু রক্তিমচ্ছটা পৃথিবীর দিকে ঊকি দিয়া চাহিতেছিল। পাখীগুলি রাত্রির মত নীরব হইবার পূর্বক্ৰমে একবার তাহাদের শেষ তান ধরিয়া আসন্ন সুপ্তির পূর্বে সাক্ষ্য প্রকৃতিকে একবার শব্দময়ী করিয়া তুলিতেছিল। রাজপথের জনতরঙ্গে কিন্তু তখনও কিছুমাত্র ভাঁটার টান ধরে নাই, বরং কক্ষক্রান্ত জনসমূহের গৃহাভিমুখী চিন্তাগুলি তাহাদের সকল শ্রান্তি বিস্মৃত করাইয়া শ্লথ-গতিকে আগ্রহচপল করিয়া তুলিতেছিল। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মোটরকারের ভোঁ ভোঁ, বাইকের টুং টুং, ট্রামের ঘর্ঘর এবং তাহাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া রিক্সা গাড়ীর টুং টুং—এই সকল মিলিয়া একটা ঐক্য-তানের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

বাহিরে দিনের আলো থাকিতেই বিদ্যুতের তীব্র আলো অনাগত রজনীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নাশ হেতু তখনই জ্বলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই ছানারহস্তময় কাস্তিবিজড়িত অপরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া সুশীল তাহার সুগভীর চিন্তাশ্রোতে ডুবিয়া গিয়াছিল। বহু বহু দিন পরে আজ আবার সুনিবিড় মৃত্যু অন্ধকারময় গভীর যবনিকা তাহার জীবনের উপর হইতে খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া আবার তাহার পরপার হইতে অসুট মিস্ক গোলাপী আলোকের ক্ষীণ রেখাটুকু দেখা দিয়াছে। মাথার উপর যে নিকষ কালো মেঘের স্তর জমাট বাধিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল, একটুখানি ঐ দমকা হাওয়ার বেগে তাহারই মধ্য দিয়া আবার নির্মল নীল আকাশের একটা প্রান্ত দেখা দিয়াছে। তাহার সঙ্গে সমুজ্জল সন্ধ্যাতারাও দুই একটা বুঝি ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সুশীলের অপরিচূর্ণ কিশোর জীবনের অকাল-বিরাগে বৈরাগী চিত্র এতটুকুকেই অবলম্বন করিয়া লইয়া যেন আবার একটুখানি আশার বর্ণে অমুরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। সুলেখার চিত্র হইতে তাহার প্রতি সন্দেহ অপসারিত হইয়াছে—সে তাহার এত বড় বিপদের মধ্যেও দেখা দিতে আসিয়াছিল, দেখিতে আসিয়াছিল; ক্ষমা করিয়া এবং ক্ষমা লইয়া গিয়াছে। আঃ!

এত বড় দুর্দশার ভিতরে আজ এই কি কম ঐশ্বর্য!—

রিক্ত নিঃশ্ব পথের ভিখারীর এ যে অমূল্য মহামণিলাভ

সুশীলের বক্ষভার বহলাংশে লঘুতর করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উখিত ও বহির্গত হইয়া গেল। সুলেখার ক্ষমা, ইহা তো সে এত দিন ধরিয়া একান্ত ভাবে চাহিতেছিল, সে পাওয়া তাহার হইয়াও গিয়াছে—আর কিছু—আর কিছু, তা' সে পাইল বা না-ই পাইল! আর যদি কেহ তাহাকে ক্ষমা না-ই করেন, সে জন্ত তাহার দুঃখ করিবারই বা কি আছে? করেন নাই, হয় তো সে ভালই হইয়াছে। করিলে হয় ত তাহার বাঁচিবার, ফিরিবার, নিজের সুনাম সুখ অকলঙ্কিত রাখিবার লোভ তীব্র হইয়াই হয় তো বা—হয় তো বা—দেখা দিত। হয় তো বা—হয় তো বা—এমন করিয়া অতের জন্ত আত্মোৎসর্গ করা তখন বলাও যায় না,—হয় তো বা সম্ভবও হইত না। আর তাহার ফলে? তাহার ফলে সেই একই কলঙ্কে তাহার পিতৃগৃহ কলঙ্কে, অপমানে, বিষাদে ভরিয়াই উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মরিতে হইত অভাগিনী বিনতাকে। এ শুধু অপরাধী চরিত্রহীন সুশীলই না হয় সবার সব কলঙ্ক একত্র করিয়া লইয়া একাই মরিল! অনেক দিনই ত তাহাদের চোখে তাহার মরণ বাটিয়াছে! তবে আর তাহার এ মরণে সেখানে বেশী কি ক্ষতি করিবে? যাহা অনাগত, তাহাই এ জগতে অসহনীয়, যাহা আসিয়া গিয়াছে, তাহা গৃহীতও হইয়াছে।

সুশীলের লঘু বক্ষ আবার একটা অকুস্তদ মর্শ্বেচ্ছদী অভিমানের ব্যথায় ভারাক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া উঠিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া গৃহভিত্তির উপর মস্তক রক্ষা-পূর্বক কতক্ষণই সে শুষ্ক, স্থির ও মূর্ছিতবৎ হইয়াই পড়িয়া রহিল। এই অভিমানের হাত ছাড়াইবার জন্তই সে যে নিজেকে নিঃশেষে শেষ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ইহার ত আর শেষ নাই। এ যে ক্ষদ্রের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুটিকে পর্যন্ত তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিষের বাতি দিয়া অহরহঃ জ্বলাইয়া রাখিয়াছে, ইহার আর নিষেধ-মাত্র সমাপ্তি নাই। রাবণের চিতার মতই এই অনির্বাক্ত অভিমানি তাহার বুকের ভিতরটাকে ছারখার করিয়া দিল, তথাপি ইহার এতটুকু তেজ ত কই কমিল না!—অথবা ইন্ধন পাইলে অগ্নির তেজ তো বর্জিতই হয়, কমিবেই বা কেন? তার পিতা তো কই তাকে ক্ষমা করিলেন না। অন্ততঃ সুলেখার মুখে শুনিয়া প্রথম

অপরাধের জন্তও তো না? না, এই দ্বিতীয়টাই যে তার এখন প্রধান অপরাধ! কেমন করিয়া ক্ষমা করিবেন?

কারাদ্বারের অর্গলমোচন-শব্দ শ্রুত হইল, হয় তো কেহ দেখা করিতে আসিতেছে। সুশীল মুখ হইতে করাবরণ মোচন করিল না। মনে মনে সে যথেষ্ট অসন্তোষ বোধ করিল। হয় তো আবার সেই সুলেখাই। সে কি তাহার সুনামকে ডরায় না? তাহার বাপ মা নিশ্চয়ই এ কথা জানেন না! নতুবা জানিয়া শুনিয়া কে কাহার বরজ্ঞা অনুচর কতাকে জেলখানার ভিতর ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর সাহচর্য্য পাঠাইতে পারে? বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরের পর্দানশীন মেয়েকে। ইহা কিন্তু সুলেখার অজ্ঞান; অত্যন্ত অজ্ঞান! মরণের উপকূলে দাঁড়াইয়াও কি উহারা তাহাকে এতটুকু একটুখানি শাস্তির মুখ দেখিয়া মরিতে দিবে না? কাল তাহার বিচার, বিচারকলে যাহা ঘটবে, সে তো সবাই জানে। চিরকলঙ্কে দেশ, ভূমি, বংশ, নাম সব ডুবাইয়া দিয়া বৎসরের পর বৎসরের জন্ত পৃথিবীর আলোক হইতে অপসারণ! তাহার পর—তাহার পর আর কি? এই আনন্দময়ী, উৎসবময়ী পৃথিবীর মধ্যে তাহার সেই অনপনের কলঙ্কের কালিমালিপ্ত মুখ সে দেখাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। তবে আবার এ চিরবিদায়ের দিনে শুধু আর একটি নারীর সুনামকে সে কলঙ্কিত করিয়া যাইতে বাধ্য হয় কেন? সুশীলের মনে হইল, এই জন্তই সংসারভিত্তিক যতিগণ নারীকে এড়াইয়া চলিতে আদেশ দিয়াছেন, সে ভালই করিয়াছেন। সুশীলের জীবনে এই নারীর দৃষ্টিই শুধু শনির দৃষ্টির মত তাহার সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য, সমুদয় আনন্দ-গৌরব ও ভবিষ্যৎ আশাকে গণেশের মুণ্ডের জায় নিঃশেষে শেষ করিয়া দিল। আজ এ পৃথিবীর সকল বন্ধনই যখন কাটিয়া আসিয়াছে, এখনও আবার সেই দুর্গহরুপিণী নারী তাহাকে অক্লুসরণ করিতে ছাড়িল না!

যে আসিয়াছিল, সে ভিতর হইতে কক্ষদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল এবং অগ্রসর হইয়া আসিয়া একেবারে সুশীলের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণামচ্ছলে তাহার পায়ের তলায় নিজেকে লুটাইয়া দিল। তখন বন্ধনত্র সুশীল সবিস্ময়ে অহুভব করিল, সে নিশ্চয়ই সুলেখা নহে, আর কেহ, এবং সেই বিস্ময়ের তাড়নায় মুখ হইতে হাত সরাইয়া সে সেই

দিকে চাহিতেই চিনিতে পারিল, এই যে একরাশি চম্পকফুলের অঞ্জলির মত তাহার পায়ের উপর নষ্ট হইয়াছে, সে সুলেখা নহে, নীলিমা!

দেখিয়া সুশীলের চিত্তে এক দিকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি, তাহারও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই আর একটা দিক ঠেলিয়া একটা গোপন উল্লাস তাহার অবসাদখিন্ন চিত্তকে একটুখানি পুলকিত করিয়া তুলিল। এইক্ষণেই সর্বপ্রথমবার যেন সে অহুভব করিল, এই নীলিমা কে সে দূরে ফেলিয়া আসিলেও, এই নীলিমা তাহাকে সুদূর প্রত্যাখ্যান দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিলেও, বিধাতার বা ভাগ্যের কাহার অমোঘ বিধানে জানি না, তাহার পরস্পরকে আর বাস্তবিকই একান্তভাবে আপনাদের জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। কর্তব্য ইত্যাদি যেখানে যতই বাধা দিক, হৃদয় তাহার নিভৃত কোণে গোপনে কোন্ সময় যে এই নৈকট্য স্বীকার করিয়া বসিয়া আছে এবং সেইখানে তাহাকে অতি সজোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া বুঝি আর একবার কামনা করিতেছিল, সেই যেন এই সন্দর্শনের ফলে তৃপ্ত হইল! সুশীল ইহাতে বিস্মিত হইলেও আজ আর ব্যথিত হইল না, বরং তাহার মনে হইল, তাহার পক্ষে এই বুঝি সঙ্গত! সুলেখা তাহার জীবনে চির-আদর্শ থাকিবে, কিন্তু এ অপরাধের কালি গায়ে থাকিতে সে তাহার কামনার ধন আর থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ মরিতে গেলে নীলিমাই যখন একরকমে তাহার স্ত্রী।

দুই হাতে নীলিমার পদলুপ্তিত মস্তক ধরিয়া সুশীল তাহাকে উঠাইল। তার পর বিস্ময়লেশহীন স্নেহস্বরে বলিল—“আর একবার তোমায় দেখে যাবার সাধ ছিল, তাও বাকী থাকুল না দেখছি! ভাল আছি নীলিমা?”

নীলিমা সুশীলের কাছে একটুখানি সরিয়া আসিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিজের কথাই কহিল; বলিল,—“তুমি সে দিন আমার বা দিতে চেয়েছিলে, আজ আমি তাই আদায় করতে এসেছি, যেখানেই যাও, আমার প্রাপ্য না দিয়ে তো যেতে পাবে না”—এই বলিয়া সে কাপড়ের মধ্য হইতে একটা সিন্দুর-কোটা বাহির করিয়া মৃদু-মন-হাস্তান্ত্রিত মুখে অথচ প্রায় যেন আদেশের স্বরেই কহিল, “এই থেকে একটু সিন্দুর নিয়ে আমার সীঁথের তুমি নিজের হাতে পরিয়ে দাও—আর এই লোহাটা এই আমার বা-হাতে—”

“নীলিমা! এ তো ছেলেখেলা! এর কিছু দরকার আছে কি?”

নীলিমা তেমনই প্রফুল্ল স্মিতমুখে সুনীলের মুখের উপর উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া নিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর করিল, “তোমার না থাক, আমার আছে যে! আমি নিজের পথ স্থির ক’রে নিয়েছি। তুমি জানো না বোধ হয়, ঝড়-বৃষ্টিতে বাড়ী ভেঙ্গে চাপা প’ড়ে আমার বাপের মৃত্যু হয়েছে। মরবার সময় খবর পেয়ে আমি হাঁসপাতালে দেখা করি, তাঁ’র অনেক কষ্টে জমান প্রায় হাজার সাতেক টাকা তিনি আমায় দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে আমি একটা স্কুল খুলবো, স্কলোচনাদি’ও আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন, বাড়ীঘরের কোন আড়ম্বর আমাদের এখন থাকবে না, শুধু কাজ। হিন্দুর মেয়েদের হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেবার জন্ত আমি প্রাণপাত করবো, যা’রা আমার মত অজ্ঞতার দোষে বা প্রলোভনাদি অশু কারণে ছ’দিনের ভুলে দূরে স’রে যা’বে তাদের ফিরবার পথ দেবার জন্ত একটা স্থান যাতে হয়, তা’র উপায় করবো, এর জন্ত ধনি-দরিদ্রের দ্বারে, দ্বারে ফিরে অর্থ, সামর্থ্য ও সহায়তার চেষ্টায় নিজেকে আমি উৎসর্গ করতে চাই, অবশ্য নিজেকেও তাঁ’র আগে উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়াতে হ’বে। কিন্তু এ সবার আগে আমার নিজেকে একটু সুরক্ষিত ক’রে নেওয়ার দরকার। তাই তোমার কাছে এসেছি—”

সুনীল মস্তমুগ্ধের মত নীলিমার কথাগুলি শুনিতো-ছিল। মনে মনে তাহার প্রতি অজস্র প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ঈষৎ বিষ্ময়ে সে উচ্চারণ করিল, “আমার কাছে! কি পা’বে নীলিমা! আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্চো! আমি—”

নীলিমা অকুণ্ঠিত মুখে মৃদু হাসিয়া কহিল, “আমার যা কাম্য, সে দেবার সামর্থ্য তোমার আছে, না হ’লে তাই বা আমি চাইব কেন? আমি যে কাজ নিচ্ছি, তা’তে আমার লোকসঙ্গ করতে হ’বে, এতে নিজের কুমারী পরিচয়ে বিপদ বেশী, আর কিছু বললে সে আমি পারবো না—তা’তে তোমার অকল্যাণ হ’বে, তাই আমি লোকের কাছে নিজের সধবা পরিচয়টাই প্রচার রাখতে চাই, অবশ্য তা’তে স্বামীর পরিচয় কেউই জানবে না। তাই সে দিনের সেই অসমাপ্ত কাজটা যদি আজ সেরে দাও, তা হ’লে আমার পক্ষে বড়ই উপকার করা হয়।”

সুনীলের বক্ষ এ প্রস্তাবে সঘনে আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠও প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল—গলা ঝাড়িয়া গাঢ় স্বরে সে উত্তর করিল, “আমি তো তা তোমায় দিতে চেয়েছিলুম, নীলিমা! তখন নিলে না, এখন সেটুকু দেবার শক্তিই বা আমার কই? আমি তো আর স্বাধীন নই দেখতেই পাচ্চো।”

সিন্দুর-কোটার ঢাকনি খুলিয়া নীলিমা তাহার সামনে ধরিয়া হাসিমুখে কহিল, “যথাশাস্ত্র পানিগ্রহণ, সে তো আমি তোমার কাছে চাইনি, শুধু এই সিন্দুর পরার, সধবা বলার অধিকারটুকুই মাত্র চেয়েছি, এটুকু তুমি অনায়াসেই তো দিতে পারো। আমার বাপ আমায় সে দিন তোমায় দিয়েছিলেন, কাজেই সম্প্রদান এক রকম আমার হয়ে গেছে, এখন এই সিন্দুর দিয়ে আজ আমার তোমার স্ত্রী ব’লে স্বীকার ক’রে যাও, তা হ’লেই আমি জানবো, আমি তোমারই। এ জীবনে সামাজিক বা ব্যবহারিক জগতে আমি তোমার আর হ’তে পারি না—সে আমি জানি। কারণ, আমি ছ’দিনের জন্তও নিজের ধর্মসমাজকে ত্যাগ ক’রে বিধর্মী হয়েছিলুম, সে তো আমার ভোলবার নয়। সেই জন্ত যথাশাস্ত্র বিবাহ আমায় তুমি করতেও পারো না—আমিও তা তোমার কাছে দাবী করি না। এই শাস্ত্রবিধিটাই সেই জন্ত আমাদের মিলন-পথের ব্যবধান হয়ে থেকে এ জন্মের মত আমাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে রাখুক। কিন্তু আমি জানবো, আমি হিন্দু, আমি হিন্দুর স্ত্রী, আমি তোমার এবং জন্মান্তরে তোমায় পা’বার তপস্তা ক’রে মরতে তো আমি পারবো? এ জন্মের জন্ত আমার একমাত্র কর্তব্য শুধু ঐ, হিন্দু কন্যাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের মর্ম্যকথা প্রচার করা, আর পথপ্রদর্শীদের পথের সীমানায় ফিরিয়ে আনা।”

সুনীল ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিল, একবার চোখ তুলিয়া নীলিমার সমুৎসুকতায় ঈষৎভেজিত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, আবার ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর ঈষৎ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে মোচন পূর্বক সিন্দুর-কোটা হইতে অঙ্গুলীতে সিন্দুর লইয়া নীলিমার তরঙ্গায়িত সুপ্রচুর কেশরাশির মধ্যবর্তী স্থান সরল রেখাবৎ শুভ্র সীমন্ততটে তাহার অরুণাত দীর্ঘ রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল, তাহার প্রভাত-গগনের মতই সমুজ্জ্বল ললাটে বালার্কবৎ বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দিল।

তাহার পর নীলিমা নত হইয়া তাহার পারের ধূলা

লইতেই সে সহসা আবেগমণ্ডিত বক্ষে দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাহার সিন্দূরচর্চিত ক্ষুদ্র ললাটে গভীর স্নেহে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া গভীর স্বরে কহিল, “তোমার ব্রত সফল হোক! তোমার মহৎ জীবন আমার মত ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতর কার্যের জগুই সৃষ্টি হয়নি, তাই আমাদের মিলনে বিধাতার অভিসম্পাত রয়েই গেল, তা থাক—কিন্তু এর পর থেকে তোমার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি চিরদিনই অফুরন্ত হয়ে থাকবে। বাহিরে আর যদি বা কখনও আমাদের দেখাও না হয়, তবু তুমি জেনে রেখ, আমি তোমায় আমার জী ব’লে—শুধু তাই নয়—দেবী ব’লে মনে মনে চিরদিন ধরে পূজা ক’রে যাবো। যদি কখন আমার সামর্থ্য হয়, তোমার আরক্ত কর্ণে তোমার সহায়তাও আমি করতে কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু হয় তো সেটা আর সম্ভব নয়।”

নীলিমার নবসাজে সুশোভিত আরক্ত সুন্দর মুখ তাহার আত্যন্তরিক হর্ষোচ্ছ্বাসে সমুজ্জ্বলতর ও লোহিতাভ হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে গভীর বলে সংযত করিয়া সে স্নানিলের পায়ের উপর হাত রাখিয়া মৃদু

গুঞ্জে পুলকাস্পষ্ট, অথচ সঙ্কল্প-দৃঢ় স্বরে ইহার প্রত্যুত্তরে উত্তর কহিল, “তাই করো—কিন্তু আমার এই মিনতি রইল যে, সম্ভব হ’লেও শুধু আমার আর কখন তুমি দেখা দিও না। অথবা যদি দেখা-ও দাও, তবে আমার এত কাছে এসো না, আমার তোমার বেশী কাছে যেতে দিও না, হ’জনকে দূরে দূরে সরিয়ে রেখ।—আর এই যে সম্বলটুকু আজ তুমি আমার দিয়ে দিলে—এ দান আমার পক্ষে এ জন্মের মতই যেন তোমার শেষ দান হয়—এ’ না হ’লে হয় তো আমার সকল সঙ্কল্প কোথায় ভেসে চ’লে যাবে। শুধু তাই নয়—তাতে স্নেহের কাছে তুমি, আর সমাজের এবং ধর্মের কাছে আমি চির-অপরাধী হয়ে পড়বো! এই-বার তবে বিদায় নিই! শুধু দয়া ক’রে মনে দেখ,—আমি তোমারই জী, আর কায়মনপ্রাণে আমি হিন্দু-জীর্ন ধর্ম পালন ক’রেই জন্মটাকে কাটিয়ে যাব, কিন্তু এ জন্মে তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধই থাকবে না, পরস্পরের কাছে আমরা এখন থেকেই চিরঅপরিচিত পর হয়ে গেলাম—আচ্ছা—এখন তবে বিদায়—”

সমাপ্ত।

হারানো খাতা

(উপন্যাস)

শ্রীমতী অনুকম্পা দেবী

উৎসর্গ

শ্রীমান্ কুমারদেব মুখোপাধ্যায়

কল্যাণভাজনেষু—

পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা,

জীবনখাতার প্রতিপৃষ্ঠা অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রাখিয়া পিতৃ-পিতামহের
পদাঙ্কানুসরণ পূর্বক অক্ষয় যশের তুল্যাংশ গ্রহণ করিও। কীর্তি দ্বারা
চিরজীবী হও।

তোমার শুভার্থিনী

ছোট দিদি ।

হারানো খাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বার খোল ওগো দ্বার খোল ওগো,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,—
ঘর-ছাড়া মোরে যে করিল ওরে,
তারই ঘর খুঁজি দেশ দেশ ।

—পরিমল ।

সমস্ত দিনের আমোদপ্রমোদ পরিসমাপ্ত করিয়া তখন সপারিষদ রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুর প্রমোদোত্তান পরিত্যাগপূর্বক গৃহাগমনকল্পনায় লাল কঙ্কর-যুক্ত—ঝাউ, কামিনী, করবী এবং অরোকেরিয়া কুঞ্জছায়াসুশীতল—উদ্যানপথ অতিক্রমপূর্বক ফটকের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সবেমাত্র সরসরাগজড়িত শিথিলচরণে সন্ধ্যাদেবী সেই কাননপথে নামিয়া আসিতেছেন ।

বসন্তের অপকূপ সজ্জাসস্তারে সে দিন রাজোত্তানের আগাগোড়া ভরিয়া আছে । কেয়ারি করা ঘুঁই, মল্লিকার আপাদমস্তকের সবটুকুই ফুলে ভরা—গন্ধের পিচকারী দিকে দিকে ছুটিতেছে । রাজা বাবুর বড় সাধের গোলাপ-বাগানে বর্ণ-গন্ধের সমারোহটা সব চেয়ে বেশী । টকটকে লাল ‘মটিকুঞ্চ,’ বহুদলযুক্ত সুবৃহৎ ‘ভিক্টোরিয়া,’ হলুদে গোলাপ, সাদা গোলাপ এবং মোমে গড়ার মত ছোট ছোট গোলাপী গোলাপগুলি সত্য সত্যই বাগানটাকে আলো করিয়া রাখিয়াছে ।

একধারে বিশেষ নামজাদা কলমের আমগাছে মুকুল দেখা দিয়াছে, ওদিকে সখের ঝিলে সাধের তরুণী “পরিমল” ভাসিতেছে ; বাবুর দল এতক্ষণ উহাতেই জল-বিহার করিতেছিলেন । এদিক সেদিকে ছুচারিটা কণ্ঠিতিলকপরা উড়িয়াবাসী মালী ক্ষিপ্ৰহস্তে এগাছ ওগাছ হইতে ফুলপাতা ছিড়িয়া লইয়া বাবুদের জন্ত তোড়া প্রস্তুত করিতেছিল । রাজা বাহাদুরের বন্ধুবর্গ অন্তমনস্কভাবে অলসকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন,—

হেলা ফেলা সারাবেলা
একি খেলা আপন মনে,—
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে ।

ফটকের বাহিরে একখানা মটর গাড়ী ও হাতীর মত বড় কালো ঘোড়া যোতা একখানা বাক্মকে ল্যাগে ইহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল । বাবুদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার চামরঝুলান বুটাজরিচ চমকদার পোষাকপরা সহিস কোচম্যান, মায় যাত্রার দলের ভীমসেনের মত গালপাট্টাওয়ালা, দীনদরিদ্রের সাক্ষাৎ শমনসদৃশ বাগানবাড়ীর দ্বারপালের আভূমি নত হইয়া সেলাম ঠুকিল ।

তখন রাজা নরেশচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“তা হ’লে নলিন ! আজ বাড়ীই ফেরা যাক—সন্ধ্যাও তো হয়ে গেছে ; আর এক দিন তখন তোমাদের গান শোনান যাবে, কি বলা হে ?”

নলিন বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল, সেই সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোকটি ঈষৎ অভিমানভরে অন্তরিকে মুখ ফিরাইয়া ছাড়াছাড়া কথায় জবাব দিলেন, “সে আপনার অভিরুচি । আমি জ্ঞাতো কি বলবো বলুন ? তবে দেখুন, সব বিষয়েরই তো একটা সীমা আছে । ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনি যেন সেই সীমাটা না ছাড়িয়ে যান, এই টুকুই আমাদের মনে করিয়া দেওয়া ।”—এই বলিয়া অ একজনের দিকে চাহিয়া নলিনবাবু নিজের যুক্তিটো আর একটুখানি জোর দিবার জন্তই যেন স’মানিয়া কহিলেন,—“কি বল হে ননীবাবু ! বাড়াবাড়িই কি ভাল ?”

ননীবাবু এইভাবে সম্বোধিত হইয়া এক বিপর্যয় বোধ করিতেছিলেন । এই লোকটি চন্দ্রের ধাতুর সহিত আজীবন ধরিয়া বিপরিচিত ছিল । সকল বিষয়েরই চরমে গিয়া

ওই মাহুঘটির প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বা দোষ এ
র সে জানিত, তাই ইহার বিপক্ষে মত দিতে
ও তাহার বাধিল।

নরেশ একটু অসহিষ্ণুভাবে হাস্য করিয়া কহি-
—“ভাবের উচ্ছ্বাসে সীমা যদি কোথাও ছাপিয়ে
আমি তাতেও কোন দোষ দেখিনে। মাপ-
দিয়ে মেপে মেপে যে পথচলা, তার চেয়ে আমার
অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প’ড়ে সাঁতারে পার
ওয়াও ঢের সহজ।”

কথার সুরে ও ভাবে অসন্তোষের আবেগ বুঝিয়া
সহচরেরা নিজেদের পথ চিনিয়া লইল। ননী বলিল,
“আমারও সেই মত। আমাদের রাজার এখন
‘স্বষমাকুটীরের’ চাইতে ‘রাণীসদনে’ হাজির হয়ে পড়া
ঢের বেশী সঙ্গত।”

রাজার প্রবীণ বন্ধুট এতক্ষণ স্রোতের গতি পর্য্য-
বেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; এতক্ষণে নিজের আসরে
নামিবার সময় আগত বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া
হাসিয়া কহিলেন,—“তা বই কি! নাতি আমার
এখন ঘরে নূতন রাণী এনেছেন, কুটীরবাসী হ’তে
গেলেন এখন কোন্ হুঃখে! ও সব পচা পরামর্শ তুমি
কানে তুলো না হে ভায়া, চটপট গাড়ীতে উঠে, গাড়ী
হুটিয়ে দিয়ে একেবারে সেই পদপল্লবে গিয়ে হাজির
ওগে। যদি-ইতিমধ্যেই সেখানে মানভঞ্জনর অবস্থা
ট উঠে থাকে, তা হ’লে সেই রাঙ্গা পা-হুটি বুকে
ল নিয়ে এমনি ক’রে গাইবে,—

‘ভাঙ্গবো বাঁশি ভাঙ্গবো প্রাণ,
রাধে! এই বেলা তোর ভাস্কর মান,
নহে,—এই পায়ে নুপুর বেঁধে গলে—
আমি পশিব যমুনা-জলে—’

“আরে দাদা, এ যে রীতিমত কেতন সুরু ক’রে
দিলে। তবে না হয় আর একটু ব’সে গানটার শেষ
ঘ্যস্ত শোনাই যাক না।”

“ঠাকুর্দা আমাদের যত বুড় হ’ছেন, ততই যেন
রসের ধারা প্রাণের মধ্যে থেকে উথলে উঠে
ডিয়ে গড়িয়ে উপচে পড়ছে।”

“ঠিক বলেচ দাদা ভাই। এরই জন্তেই না শিং
এই সকল বৎসবৃন্দের মধ্যে বিরাজ কর্চি,
চ, যৌবনের ওই সহস্র বাতির মুখ থেকে একটু
নুঁকিও যদি উড়ে এসে এই পোড়া শল্য-
ন গতিকে ঠেকে যায়।”

হাসিত কৌতুকহাস্তে শব্দবিরল কানন-পথ
কীয়া উঠিল।

২য় (খ) ২৩

ক্ষণপরে নরেশজ্ঞ বসিলেন,—“কি গ্রহ! আজ
কি এইখানেই রাত কাটাতে নাকি?”

ঠাকুর্দা আলস্যবিজড়িত ভঙ্গীতে কহিয়া উঠি-
লেন, “তা যদি বললে ভায়া, তবে বলি,—তোমার
ঠান্দির স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়ার ঘরটান তো আমার ফুরি-
য়েই গেছে। আজ এই কুঞ্জবনটার মায়া যেন আমার
কাটতেই চাইছে না।”

“নিকুঞ্জ কাননে রাধা শ্রামসোহাগিনী,” “আপনি
এখন রাধাভাবে আছেন নাকি?”

“তা না হয় থাকলে,—কিন্তু এখানে তো
অপর্যাপ্ত ফুলের গন্ধ ও মলয় সমীরণ সেবন ক’রেও
তোমার ও রাঙ্গুসে পেট ভরবে না দাদা। সেটার
সম্বন্ধে—”

“আঃ পাগল! তোরা এখনও নেহাৎ নাবালক
আছিস, দেখতে পাই! ওরে হরিধন ঘোষালকে কি
তেমনই কাঁচা ছেলে পেয়েছিস তোরা? এই
ক্যাথিসের ব্যাগে যা ভ’রে নেওয়া গেছে, সে তোদের
মতনচারটে জোয়ানমর্দর খোরাক। তার উপর
এবেলা তোরা মুখুরা যখন সববতের গেলাসে চুমুক
দিচ্ছিলি, আমি সেই স্রোতের ওবেলার অবশিষ্ট তাল-
শাঁস সন্দেশগুলো আর গোলাপজলভরা রসগোল্লা
গুণ্ডা আষ্টেক পার ক’রে দিয়েছি।”

“শোন কথা! ঠাকুর্দা বলে কি রে? এ কুন্তকর্ণ
দাদাটিকে ঘাড়ে নিয়ে পুষতে ভাই তোমাদের মতন
রাজারাজড়াদেরই পোষায়। আমাদের মত হাক্কা
কাঁধে—”

“ব্যাঃ—আমাকে কি তেমনি ছাবলা পেয়েছিস
রে! যে আমি নিজের ভার সহবার মতন একটা
আশ্রয়ও খুঁজে নিতে পারিনে? জান না কি,
মাধবিকা সহকারতর ব্যতীত অপর কাহাকেও
আশ্রয় করে না—”

আবার একটা তরল হাস্যতরঙ্গ উখিত হইয়াই
মধ্যপথে অকস্মাৎ কিসের একটা বাধায় চকিত হইয়া
থামিয়া গেল।

ফটকের পাশেই যে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটি
অনেকখানি স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন বিস্তৃত করিয়া দাঁড়া-
ইয়া আছে, তাহারই ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ হইতে একটা
আকস্মিক ক্ষৌণ্ডর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, “অনাচারে
প্রাণ ধায়, যদি কেউ একটুখানি দয়া করেন—”

একসঙ্গে সব কয়টা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি
সেই দিকেই ধাবিত হইল। তা, ব্যাধির এমন
কিছুই অসাধারণ নয়। সদাসর্বদা যে রকম ছিন্ন-
বস্ত্রপরিহিত দীন ভিখারীকে ওই রকম জাহ্নগাতেই

দেখিতে পাওয়া সম্ভব, এও ঠিক সেই একই ব্যাপার। ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়পরা একটা অনশনক্লিষ্ট কঙ্কাল-শীর্ণ ভিখারী পথিক পথের ধারে দারুণ নৈদাঘ রৌদ্রের তাপদাহ কথঞ্চিৎ নিবারণাশায় গাছের ছায়ার আশ্রয়ে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে নিজের প্রবল অভাব জ্ঞাপন করিয়া ধনিবৃন্দের প্রচুর ধনৈশ্বৰ্য্যের এক কণা মাত্র ভিক্ষা করিতেছে।

এই তো জগৎ! সংসারের নিয়মই তো এই! সৰ্ব্বৈশ্বৰ্য্যমণ্ডিত রাজসিংহাসনের পদতলে অনশনব্রত ভিখারীর ধূলিশয্যা এ তো আজ নূতন নয়। এ সংসারে জন্মিয়া এই দৃশ্যের মাঝখানেই মানুষের যে প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। এ দৃশ্যে মানুষ অহরহই তো ডুবিয়া আছে। এর চেয়ে সহনীয় তাহার বলিতে গেলে আর কিছুই নাই। যে ঐশ্বৰ্য্যের উচ্চসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সে ভ্রমেও কখন মনে করে না যে, তাহার সেই সম্মানের আসন কত দুঃখার্জের যুগের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া রচিত। কখন ভাবিয়া দেখে না যে, যে দীন-দরিদ্রের বক্ষ আদ্য সামান্ত কীটাপুর মতই অনায়াসদৰ্পণতরে নিজের মোটরের চাকার তলার পিষিয়া দিয়া সে অবিচলিতভাবে চলিয়া যাইতেছে, তার সে দৰ্পণ শুধুই সেই অবহেলিত নগণ্যেরই কৃপার দান। বস্তুতঃ দরিদ্র বড় সহিষ্ণু, সে নিজে অনাহারে থাকিয়াও ধনীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়; তাই না তারা তাদের এমন করিয়া দলিতে অবসর পায়। এরা যদি একবার নিজের শক্তি বুঝিয়া ধনীর অত্যাচারের প্রতিবিধান চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তবে মহামহৈশ্বৰ্য্যময় সিংহাসনও যে সেই দারিদ্র্যশক্তির পদতলে চূর্ণিত হইয়া ধূলিধূসর হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারও প্রমাণাভাব নাই। তা যাক্ সে কথা,—সেই ভিখারীটার প্রতি নজর পড়িতেও একটা তাজিল্যভরা অধরকুঞ্জেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারিত, যদি না ঠিক সেই সময়েই রাজাবাবুর দ্বারবান ও পদাতিকদ্বয় রাজাবাবুকে সেই অভাগার দিকে চোখ ফিরাইতে হওয়ায় নিজেদের কর্তব্যের ক্রটিবোধে উহার কালনার্থ সেই হতভাগ্য ভিখারীর দিকে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইত।

“এই বদমাস! এই শালে! হিয়া কাহে বৈঠা হো! জলদি নিকালো হিয়াসে”—এবং ইহাতেও তাহাকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া দুইজনে তাহার দুইটা হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টভাষায় “নিকালো শালে,” “ভাগো হিয়াসে,” “তু চোটা হায়,” ইত্যাদি প্রিয় সম্ভাষণও চলিতে লাগিল।

লোকটা উঠিল না, পরন্তু নিঃশব্দে মাটি পড়িয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়াই বড়লে নিমকহালাল ভৃত্যবর্গের বজ্র-কঠিন হস্ত হইতে পাইল না।

“এঃ চোটা আদমি, ঢং দেখাতে হো—” এই যত্নবান চৌবেজী নিজের সরল শালযষ্টিবৎ (ঈষৎ বক্র করিয়া তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে গিয়া সহসা পিছনে একটা অশ্রুতপূৰ্ব্ব কঠোর সম্বোধনে বিষয়ে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল সেই—“ভুঝা, চৌবে, তফাৎ যাও!” বলিয়া তাঁদের অক্ষুণ্ণ মহিমার ধ্বংসকারী, স্বয়ং তাহাদের রাজাবাবু!

ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা শিকার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নরেশচন্দ্র সেই লাজিত ভিখারীটার নিকটে আসিয়া ব্যগ্র-করণকণ্ঠে বলিলেন, “এরা তোমায় লাগিয়ে দিয়েছে কি? আহা, তোমার দুদিন খাওয়া হয়নি বল্ছিলে না? এই নাও,—কিছু দিচ্ছি।”

কোন সাড়া নাই, সন্ধ্যার ছায়ার বৃক্ষপত্রের সমাবেশে ভাল করিয়া দেখা গেল না, তথাপি যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে বুঝা গেল যে, গাছের তলার লোকটা পড়িয়া আছে, বক্ষে তাহার স্পন্দন নাই নরেশচন্দ্রের সর্কশরীরে একটা অতর্কিত ভয়ের বে তড়িৎ হানিয়া গেল,—এই মুষ্টিভিক্ষার কা হতভাগ্যকে, মাত্র তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাও অপরাধে তাঁহারই অন্নপুষ্টি লোক দুইটা মাটি ফেলিল নাকি?

তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে তাহার পাশেই গাড়িয়া বসিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া আলিতেই তাঁহার অন্তরের সমস্ত মমতাসাগর এক কালে বিমথিত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া যে মুখখান চোখে পড়িল, তাহা তাঁহার শরীরে মনে ঈষৎ এক অজ্ঞাত শিহরণও আনিয়া দিল।—কত ক্ষীণ, ২ পাণ্ডুর এবং কি ভীষণই সে মুখ।—উঃ কি ভীষণ! মানুষের যে তেমন মুখ হয়, তাহা যেন ইহার পু ভাল করিয়া তাঁহার অমুভূতিই ছিল না। লহমার সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়া সেখানার চাক্ষিত গভীর মমতা, বেদনা এবং আতঙ্কের এই ভাবটাই তাঁহার মনে জাগিল। পরক্ষণেই চিত্রাপিতের স্তায় দণ্ডায়মান দ্ব সম্বোধন করিয়া “জলদি পানি লে আও”— দিয়া ততোধিক বিষয়গুস্তিত বন্ধুবর্গের দিবে ডাকিলেন “করুণা! একবার এস তো”

। দেখে যাও তো ।” তাঁহার স্বরে তখন বিশ্বয়ের বর্তমান নাই ।

তার করুণানিধানবাবু সঙ্কোচের সহিত কাছে বলিলেন, “কে তার ঠিক নেই, কি রোগ আছে, কাপড়-চোপড় যাচ্ছেতাই, ওকে । করাটা কি ঠিক ?”

নরেশচন্দ্র কহিলেন, “তোমরা হাসপাতালের মড়া বাঁচ । এ হয় তো এখনও জ্যান্ত মানুষ । একে ত দোষ কি ?”

করুণাবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে সমস্কোচে সেই ভিখারীটার হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “না, তা নয় ; —আমরা ডাক্তার, আমাদের সবই করতে হয়, সে আমি বলছি, তোমার কথাই বলছি । হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছে বটে ; তবে বড়ই দুর্বল,—কিছু খেতে না পেলে বোধ হয় বেশীক্ষণ আর বাঁচতে পারবে না ।”

সত্যপ্রত্যাযুক্ত চৌবের নিকট হইতে জলের লাটাটা লইয়া মুচ্ছিতের মুখে জলের কাপটা দিয়া, নরেশ উহাকে আদেশ করিলেন, “চৌবেজি, বহুত লুদি গরম দুধ লেআনে হোগা ।”—

হুকুম শুনিয়াই চৌবেজীর মনের উন্মাদ বাষ্পাকারে হর হইয়া আসিল—“আরে মহারাজ ! আপ তো দে দিয়া—লেকিন হাম কাঁহাসে এত গরম দুধ কা বনবস্ করে ? ইয়ে আপ্কা ত্রা সহর হায় কি যো যো—”

নরেশ বিরক্ত হইয়া কি বলিতে বাইতেই করুণাবাবু কহিলেন, “সত্যি তো এখানে একুনি দুধ পার কাথায় ? তা কাজ নেই সে চেষ্টায়, আমার কাছে ক শিশি ‘স্ট্রিমলেট’ আছে, তাই থেকে আউসটাক ল মিশিয়ে খাইয়ে দিলেই বেঁচে যাবে খন ।”

মূর্ছাহত ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক পাশ লিল, অল্প পরে চোখ মেলিল এবং পদাতিকের ত গাড়ীর লগ্ননের তীব্র আলোকে স্বপ্নদৃষ্টের অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল । তাহার মুখের নত হইয়া নরেশ ডাকিলেন,—“একটু বল পেলে কিছু ভাল বোধ হচ্ছে ?”

কটি ক্ষণকাল নির্বাকবিশ্বয়ে তাঁহার মুখ করিয়া পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর

আবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য রলেন,—“বাপ ! মানুষের নাড়ী এত ঠিক যেন একগাছি চুলের খাইয়ের মত নড়ছে, আছে কি না আছে । এখন ! ওহে, আজ রাতটা এইখানেই চুপ

ক’রে প’ড়ে থেকো,—দেখ চৌবেজি ! কাল সকালে ওকে একটু দুধ-টুধ খেতে দিতে পারবে তো ? সকালবেলা —এখন বলছি না ।”

চৌবে অসন্তোষের মধ্যেও কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল, “জি হুজুর !”

‘বাস, তা হ’লেই এক রকম চালিয়ে নেবে আর কি । এসো হে রাজা, রাত হয়ে যাচ্ছে । আমাদের আজ আবার একবার বর্ষগদের ওখানে ৯টার সময় যেতেই হবে । কত হলো ? এঃ সাতটা পঁচিশ—এসো এসো ।”

নরেশচন্দ্র বন্ধুর ব্যস্ততা গ্রাহ্য না করিয়া ভিখারীর সহিত কথা কহিয়া বলিলেন,—“দেখ, এই দরওয়ান-গুলো বড় পাজী, ওরা আর একটু হ’লেই তো তোমার মেরে ফেলেছিল, ওদের হাতে দেওয়া আর এই গাছ-তলার ফেলে দেওয়া একই কথা ; তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পারবে ? তা হ’লে দুচার দিন একটু খেয়ে দেয়ে জোর পেয়ে যেতে পারবে ? দেখ না একটু চেষ্টা ক’রে, যদিই পারো ।”

কথাটা শুনিয়া নরেশচন্দ্রের সঙ্গীদের মধ্যে গভীর বিশ্বয়ের স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিয়া ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল ; আর সেই মুমূর্ষু ভিখারী— সে যেন এই অপ্রত্যাশিত অঘাচিত সম্মান সহ্যহুত্বিতে দ্রবীভূত হইয়া তড়িৎ-স্পৃষ্টের স্তায় নিজের সকল দুর্বলতা এক মুহূর্তে বিশ্বত-প্রায় হইয়া গিয়া সচমকে উঠিয়া বসিল এবং কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—“কে আপনি মশাই ? এত দয়া তো মানুষের দেখি নি ! নিশ্চয়ই ভগবান্ নিজে ডেকে আপনাকে এ হতভাগ্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।”

নরেশ চিত্রপুস্তলিকার স্তায় দণ্ডায়মান চৌবের দিকে ফিরিয়া আদেশ করিলেন,—“যত্নবান ! হাওয়াগাড়ী ইধার লেআনে কহো,—ইস্কে হুঁসিয়ার হোকে সাম্না আসনপর উঠায় দেও ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

“ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আজি এসেছি তোমারই দেশে,
আমি, অতিথি তোমারই দ্বারে, ওগো বিদেশিনি !”

—রবীন্দ্রনাথ ।

পরদিন প্রভাতরক্তের সমাধাস্তে খবরের কাগজ হাতে লইবামাত্র গত রাত্রির সেই ভিখারী অতিথি-টার ভীষণ মুখখানা অকস্মাৎ নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে উকি মারিয়া গেল । মনে করিতেই সমস্ত শরীরটাই

তাহার ঈষৎ যেন শিহরিয়া কাটা দিয়া উঠিল এবং নিরতিশয় লজ্জার সহিত মনে হইল যে, লোকে যে বলে তাঁর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি,—তা বড় মিথ্যাও নয়! সত্যই তো ওই রোগজীর্ণ ভয়ানক মূর্তি ভিখারীটাকে যেমন তাহার দ্বারবানেরা অকারণ নিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার জন্ত সেটাকে কিছু খাইতে দিয়া, দুইটা টাকা দিয়া অথবা না হয় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তো হইতে পারিত। তা নয়, একেবারে পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলের মর্যাদা খর্ব করিয়া সেটাকে নিজেদের সঙ্গে গাড়ী চড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসা হইল। গাড়ীতে আবার সে মূর্ছিত হয়, ধরাধরি করিয়া নামাইয়া নীচের একটা ঘরে বিছানা পাতিয়া শোয়ান, ডাক্তার ডাকা, হুধ, বরফ, বলকারক ঔষধ এ সব তখন না করিলেও কি আর চলিত না? এ লইয়া স্ত্রী একটুখানি চটিয়া উঠিলে তাহার তাহার চেয়ে বেশী চটিয়া তাহাকে কটুবাক্যে তিরস্কার,—আবার তার পরই অর্ধ রজনীব্যাপী চেষ্টায় মানভঞ্জন;—নাঃ—এতটা না করিলেও চলিত।

কিন্তু তখন যেটা না করিলে চলিত,—সেটা যখন করা হইয়া গিয়াছে,—এখন আর মনে মনে লজ্জিত হইলেও চারা নাই। যা হোক, ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে। লোকটাকে গাড়ী ডাকাইয়া সরকার মশাইকে সঙ্গে দিয়া হাঁসপাতালেই পাঠান যাক। মধ্যে মধ্যে খবর নেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে, সুস্থ হইয়া উঠিলে কিছু টাকা দিয়া দেওয়া যাইবে।

নরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

রোগী তখনও বিছানায় পড়িয়া ছিল। ঘরের সব দরজা-জানালাই বন্ধ ছিল, নরেশচন্দ্র কাছাকাছি কাছাকেও না দেখিয়া, একহাতে নাকে সুগন্ধি ক্রমাল চাপিয়া স্বহস্তেই একটা জানালার কবাট মুক্ত করিয়া দিবানাত্র প্রভাতসূর্য্যের এক বলক কনকরশ্মি অঞ্জলিতরা স্বর্ণরেণুর মতই সেই তাপিতের শীর্ণ এবং পাণ্ডু দেহের উপর যেন উপহাসের বক্র হাসির মতই ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সেই আলোর ঝিলিক যেন ওই বিশীর্ণ আড়ষ্ট শরীরটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া বলিতেছিল,—“এ ঘরে তুই কে’ রে? এর মধ্যে কি তোকে মানায় না কি?”

নরেশ ডাকিলেন, “কি রে, আজ কেমন আছি?” চমকিয়া চোক মেলিয়া চাহিতেই দুজনকার চোখেই ছরকমে বিশ্বয়ের ঘন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে প্রচুরতর করুণার সহিত আর যে ভাবটা অর্ধ জাগ্রত হইল, সেটাকে

ঈষৎ ঘণা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। ভি একটিমাত্র দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন নেত্রতারকায় নরেশ ও সুসজ্জমূর্তি কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসেরই আলোক করিয়াছিল।

ভিখারীর মুখে ও সর্বদেহে গভীর বঃ মুখের দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ নেত্র, ললাট এ অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ঐ অংশটি কোনরূপে হইয়া গিয়া থাকিবে। জীবিত মানুষের মধ্যে ছরবস্থা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু—ওই সর্বহারা ভীষণ অগ্নিদগ্ধ মুখমণ্ডলে আরও কিছুই দেখা যায় না? যায়। বাহা দেখা যায়, বুদ্ধি সেইটে দেখাই আরও ভয়ানক।—তাহা এই যে, এ ব্যক্তির চিরদিনই এ অবস্থা ছিল না। এক দিন সে যে মানুষের মধ্যে—শুধু তাই নয়, সুপুরুষের মধ্যেই গণ্য ছিল; সেই সক্রমণ সংবাদটুকু ওই দগ্ধ উপবন তুল্য মুখখানার আশে-পাশে বেদনা-ব্যথিত ইন্দ্রিতে আজও সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে যে একটি চক্ষু আজও বর্তমান আছে, সেইটিতে বিশাল ও বুদ্ধিব্যঞ্জক বলা যায়; মস্তকের বিরল কে কি সুন্দর কুঞ্চিত! দেহ যে এক দিন সুপুষ্ট ও দীর্ঘায়ত ছিল, আজও তাহার করুণ ইতিহাসে অকালজরায় জর্জরিত শরীরে স্পষ্টভাবেই হইতেছে। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরিতে ভগতের অত্যুৎকৃষ্ট চাক্ষুশিল্লের ধ্বংসাবশেষ চোখে ও দর্শকের সমস্ত প্রাণটা মথিত করিয়া চক্ষে স্বঃই জল আসে, বিধাতার এই উচ্চাদর্শে গঠিত মূর্তির পরিণামফল দর্শনেও তেমনই করিয়া প্রাণ কাঁদিতে থাকে। নরেশচন্দ্রের কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির্গত হইয়া আসিল। তাহার আপনা-আপনি কেমন মনে হইল, আজ অবস্থার মধ্যে এ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতেছেন লোকের ঠিক সে অবস্থাপন্ন হইবার কথা নয়। ইহার কোন অজ্ঞাত গুরুলজ্জনজনিত পাপের কোন অজানিত দুর্কসার অভিশাপে, দেব ছাড়িয়া এ একেবারে নরশরীর ধারণ করিতে হইয়াছে। বয়সই বা ইহার কি? তাহার কম হওয়া বিচিত্র নহে। সহানুভূতি ও বিগলিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নামটা কি বল তো?”

লোকটি একটু চিন্তিতভাবে নীরব র। একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস মোচন করিয়া মৃদু উত্তর করিল,—“নিরঞ্জন।”

“নিরঞ্জন,—কি? তোমরা?”

লোকটি আবার ভাবিল ও পরিশেষে কহিল
‘বড়,—আমরা দাসগুপ্ত।’

“আমারও সেই রকম একটা ধারণা হচ্ছিল;
মার অবস্থা হয় ত চিরদিন এ রকম ছিল না।

দিন—উচ্চ সমাজেরই একজন ছিলে তুমি, না?”

নিরঞ্জন একটুখানি যেন উত্তেজনার সহিত, ঈষৎ
ধন ভীতির সঙ্গে, তাহার উপকারকের স্নেহমণ্ডিত
মুখের দিকে চকিত হইয়া চাহিল, ত্রুণের কহিয়া
উঠিল, “না না, ও সব কিছু অসম্ভব করতে যাবেন
না, আমি চিরভিখারী—আমার আবার ভাল দিন
ছিল। ওঃ! সে সব এ জন্মের নয়!”

নরেশচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। ইহার এই
দৃষ্টান্তের স্মার ভয়াবহ জীবনের মধ্যে যে তেমনই
ভীষণ কোন একটা রহস্য নিহিত আছে, ইহা যেন
তিনি স্পষ্টচক্ষেই দেখিতে পাইলেন। হয় তো কোন
দৈব বিড়ম্বনা, হয় তো কোন হত্যাকাণ্ড, হয় তো বা
রাজনৈতিক কোন কিছু—হাঁ, তাও তো বিচিত্র নয়,
নাইটিক অ্যাসিড, পিকরিক অ্যাসিডের পরিণাম
—থাক, এ সব অসম্ভব কোনই ফল নাই, বৃথাই
মস্তিষ্কশক্তির অপচয় মাত্র। যাই হোক, এ ব্যক্তি
ভদ্রসন্তান, অদৃষ্টবিড়ম্বিত;—দৈবক্রমে তাঁহার
দ্বারস্থ। থাক দুটো দিন এই আশ্রয়েই, কাজ কি ইহাকে
হাঁসপাতালে পাঠাইয়া? ডাক্তার তো বলিল যে, ইহার
শরীরে রোগ বলিতে কিছুই নাই, সকল রোগের মূল
কারণ বাহা, তাহারই প্রচুরতায়ই ইহার এমনত অবস্থা,
অর্থাৎ অনাহার ও অযত্নবশতঃ সমস্ত শরীরবস্তুরই
অত্যন্ত দুর্বলতা ঘটিয়াছে। থাক দুদিন, হয় তো এ
জীবনে বেচারী অনেক দুঃখই পাইয়াছে! হয় তো দুটো
দিন বিশ্রামের কাল এর আসিয়াছে, সেই জন্তই হয়
তো আমার মনেও এমন করুণা আসিয়া
পড়িতেছে,—

চাহিয়া দেখিলেন, ক্রান্তিভরে নিরঞ্জন আবার
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(আমি) অকৃতী অধম বলেও তো, কিছু
কম ক’রে মোরে দাও নি।

—বাণী।

কয়েক দিন নিরঞ্জন শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল।
দৈনন্দিক চিকিৎসক যথারীতিতে দুইবেলাই দর্শন
এ। যেমন গৃহস্থানী, গৃহস্থামিনী এবং তাঁহাদের ভৃত্য-
গণ শারীর-স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অকারণ জেরা করিয়া যান,

সেইরূপ যথাকর্তব্য সম্পাদনার্থ দর্শন দিয়া দু’বার
ইহার ঘরটাকেও পায়ে ধুলায় বঞ্চিত করেন না।
প্রথম দু’ এক দিন তেমন মন দিতে পারেন নাই এবং
এই দীনহীনের একশেষ ভিক্ষুকটাকে হাঁসপাতালে
পাঠানর জন্তও তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন। কিন্তু
ইদানীং গৃহকর্তার রুচিপ্ৰবৃত্তি অনুযায়ী সে চেষ্টা
ছাড়িয়া দিয়া উহার জন্ত একটা টনিকের ব্যবস্থা
করিয়াছেন এবং হুবেলা আসিয়াই “কি রে, একটু বল
পাচ্ছিস? আচ্ছা, ওষুধটা যত্ন ক’রে খেয়ে যা’তো,
দেখবি কি না কি রকম কাজ করে। নিকীচনটা
যা করেছি, সে একেবারে এক্সসেলেন্ট!”—ইত্যাদি
দু’টা কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া যাইতেও ক্রটি
করেন না।

ডাক্তার বাবুর এমন অসাধারণ ঔষধ সেবনান্তেও
যে সে হতভাগা সারিয়া উঠিতে বিলম্ব করিয়া রাজ-
বাড়ীর ভৃত্যবর্গের গলগ্রহ হইয়া রহিল, সে যে কেবল
তাহার জুয়াচুরী-বুদ্ধিরই খেলা, ইহাতে বামনঠাকুর,
পেঁচোর মা বা হারাধন খানসামা—ইহারা সর্বদা
পরস্পরের সহিত সকল বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও
এ বিষয়ে—সম্পূর্ণরূপেই একমত ছিল। আর ইহাদের
নালিশ-করিয়াদ শুনিতে শুনিতে এই দুর্ভাগ্য
অতিথিটার প্রতি, এই বাড়ীর সর্বময়ী কত্রী যিনি—
তাঁহার মনটিও বেশ ভাল ছিল না। বাড়ীর গৃহিণীটির
নাম পরিমল, বয়স তাঁহার বাইশের উর্দ্ধে নয়; কাজেই
সংসারের কুপোষ ইত্যাদির জন্ত মাথা ঘামাইয়া,
তাদের চিন্তায় সময় নষ্ট করা তাঁহার ভাল লাগা খুবই
সম্ভব নহে। তবে দরিদ্রের প্রতি কোন অযথা বিদ্বেষ
তাঁহার চিত্তে পোষিত ছিল না, সে জন্ত ঐ অশক্ত
ভিখারীটাকে বাড়ী হইতে এখনই দূর করিয়া তাড়া-
ইয়া দিবার কোন বিশেষ আগ্রহ যে তাঁহার মনের
মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন কথাও বলা যায়
না। কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন?—বামুন ঠাকুরের
দল যখন তখন ভিড় করিয়া আসিয়া রুগ্ন অসন্তোষের
সহিত সমস্তরূপে গলা ছাড়িয়া জানাইয়া যায়, “এমন
করিয়া তাহাদের পরে অবিচার হইতে থাকিলে
তাহারা তেমন চাকরীর মুখে ‘হুড়া’ জালিয়া দিয়া
যে দিকে ছুঁচক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিয়া যাইবে।
‘গতর’ স্তখে থাকিলে চাকরীর না কি এ সহরে অভাব
আছে? তাহারা রাজবাড়ী জানিয়া কাজে বাহাল
হইয়াছিল, ভিখারীর সেবা করা তাহাদের পেশা নয়।
তা’ও কি একটা সোজাসুজি ভিখারী! না আছে
তার না’বার চাড়, না আছে তার খা’বার চাড়, ও মা
এমন তো কোথাও দেখা যায় না। তুই ভিখারী

মানুষ, তোর আবার অত কেন ? যা' পেলি হাঁস-
হাঁস ক'রে গিলে-কুটে নিয়ে বর্তে যা। তা নয়,
পাতের ভাত পাতেই প'ড়ে থাকলো, উর্দ্ধমুখে হাঁ ক'রে
ঘরের কড়িকাঠ পানেই তাকিয়ে রইলেন, আবার মনে
পড়িয়ে দিলে তবে থাকেন। অত কার গরজ রে
বাপু ? ওর কত কালেরই মা-বোন পাশে ব'সে ব'সে
থাওয়াচ্ছে কি না ?”

পেঁচোর মা'র গায়ের জ্বালাই সর্বাপেক্ষা অধিক।
প্রথম যে দিন সে নিরঞ্জনকে দিয়া উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার
করাইয়া লয়, তখন নিরঞ্জনের শরীর একান্ত দুর্বল-
থাকাপ্রযুক্ত সে বাসন মাজিয়া উঠিয়াই পতনোন্মুখ
হয়। কপালক্রমে কি না ঠিক সেই সময়টিতেই সেই
স্থানে নরেশচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটিল ! রাজাবাবুর
ঘণাপিত্ত তো সবই চলিয়া গিয়াছে। ঐ কদাকার
মুখপোড়া হনুমান্টাকে নিজে হাতে ধরিয়া ফেলিয়া,
এতটুকু বিবেচনা না করিয়াই, নিরপরাধিনী পেঁচোর
মা'কে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' কি বকুনিটাই না বকি-
লেন ! শেষে ছকুম দিয়া বলিলেন, ঐ পোড়ারমুখোটা
যখন জাতে বদ্ধি, তখন ওর এঁটোকাঁটা কয়েতবাজীর
দাসীচাকরে কিসের জন্তাই বা ছুঁতে না পারবে ? ও
গুরুঠাকুরের মতন এবার থেকে ব'সে ব'সে গিলবে,
আর ওর পাত কুড়োবে এই ছাই ফেলতে ভাস্কাকুলো
কাজালের কাজাল পেঁচোর মা।—বিচারটা দশে পাঁচে
দেখুক একবার !

এই সব নানা কথা শুনিতে শুনিতে উত্থান হইয়া
উঠিয়া এক দিন সন্ত নাগিশের যন্ত্রণার পরক্ষণেই
স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া পরিমল তাঁহাকে ধরিয়া বলিল,
“অনেক দিন তো হয়ে গেল, এত দিনে অবশ্যই গায়ে
জোর পেয়েছে, এইবার ওটাকে যেতে বল্লেই হয় না ?”

নরেশ প্রথমতঃ কথাটার অর্থবোধ করিতে না
পারায় জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়াই সহসা ইহার ভাবার্থ
হৃদয়ঙ্গম হইতেই কহিয়া উঠিলেন, “কার কথা—নির-
ঞ্জনের কথা বল্চো ?”

পরিমল ক্র কুঞ্চিত করিয়া তাকিল্যস্বরে উত্তর
করিল, “কি-রঞ্জন তা জানিনি, আমি ঐ হাড়-
জালানে ভিখিরীটার কথা বল্ছিলুম। ওর জালায়
পাড়ীর সব কি, চাকরগুলো তো জালাতন হয়ে ছেড়ে
যতে বসেছে।”

নরেশচন্দ্রের নেত্রে বিরক্তির ঘন-ছায়া পড়িল।
সন্তোষের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন,
দেয় কি পাকাধানে ও মৈ দিচ্ছে শুনি ?”

পরিমলও কিছু উৎসাহে কহিল, “মৈ দিচ্ছে
কি করচে তা তারাই জানে। মোট কথা, তারা

বলেচে যে, ও যদি থাকে, তবে ও-ই থাক, আর
আর তা হ'লে কেউ এ বাড়ীতে চাকরী কর
থাকবো না। তা সেই কি ভাল, যে খামকা এ-
যে সে ভুতুড়ে লোকের জন্তে বাড়ী শুদ্ধ সব কি-চা
বামুনগুলো ছেড়ে চ'লে যাবে ?”

নরেশচন্দ্র প্রথমতঃ রাগ করিয়া বলিলেন,
যাগ গে ! অমন সব হিংস্রটে পাজীলোকগুলো বা
ছাড়লেই আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।”

পরক্ষণেই সেই বিদ্রোহী পরিজনবর্গের অগ্রবর্তিনী-
স্বরূপে গৃহিণীকে—“বেশ তবে ওকে নিয়েই থেকো”—
এই কথা মানভরে বলিয়া গ্রন্থানোন্মুখী দেখিয়া সহসা
বিরক্তি ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার চাবিশুদ্ধ
আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে কহিলেন—

“এ কি ! তারা যায় যাবে, তা ব'লে তুমিও যাচ্চ
কি জন্তে ? তুমি তো আর পেঁচোর মা নও যে,
তোমায় তার এঁটো মাজতে হয়,—হারাধন নও যে,
তার বিছানা পেতে দাঁও,—তবে, তোমার অত চটবার
কারণটা কি, আমার বল তো ?”

বস্তুতঃ হিনাবমত চট্‌বার তাঁর কোন কারণই
ছিল না। কথাটা কানে গিয়া তাই পরিমলকে ঈষৎ
লজ্জা দিল। সে দেখাইবার মত কোন যুক্তিও না
পাইয়া শুধু একটুখানি অপ্রতিভের মূহূহাস্ত হাসিয়া
সবেগে কহিয়া উঠিল—

“ধেং,—আমি কেন চটবো ? আমার আবার
এতে কি ? তবে অতগুলো লোক সর্বদাই ওর জন্ত
চ'টে রয়েছে, যখন তখন চ'লে যেতে চায়, তাই, না
হ'লে—”

নরেশ কহিলেন, “দাঁও না চ'লে যেতে, কেমন যায়
দেখ না। কখনো যাবে না—কখনো না ; সে আমি
হলপ ক'রে বলতে পারি। এমন দিলদরিয়া মেজাজের
গিন্নীটি আর ওরা পাবে কোথায় যে যাবে, শুনি ?
তা নয়, ওই যে একটা গরীব মানুষ না খেটে দুবেলা
হ' মুটো ভাত খাচ্ছে ; এইটেই হয়েছে ওদের সব-
কার চক্ষুশূল,—তা আমি খুব জানি। যারা নিজেরা
অভাবগ্রস্ত, তারাই যেন আরও বেশী ক'রে পরকে
অভাবের মধ্যে দেখতে ভালবাসে। তাই বা বলবো
কি, আমার ভদ্রলোক বন্ধুবাই তো সে দিন ওই
আমারই চাকরের দুর্ব্যবহারে মুর্ছিত, মরণাপ-
লোকটাকে একটু বর দেখানর জন্ত আমার উ-
এতই মর্শাস্তিক রকমে চটেছিলেন যে, হু'তিন f
আমার সঙ্গে কেউ আর দেখাটি পর্যন্ত করেন f
দেখা হ'লেও একটি কথা কন নি। অথচ স্বকণে
সবাই ডাক্তারের মুখ থেকে শুনেছিলেন যে, এক

ও যত্ন না পেলে লোকটা খুব শীঘ্রই মারা
বে।”

শুনিয়া পরিমলের মনের মধ্যটা যেন একটা অতি
লজ্জার কণ্টকে বিধিয়া উঠিল। ছি ছি, সেও
প্রায় এই মমতাহীন ভদ্রাভদ্র লোকেদের সহিত
গট হইয়া তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে
ছিল! তাহার এতবড় করুণার সমুচিত গৌরব
দূরে থাক, তাহাতে নিজেকে গৌরবাঘিতা মনে
করিয়া উঠাইয়া তাহার কার্যকে বাড়াবাড়ি বলিয়া
অভিহিত করিয়াছে, বাধা দিতে গিয়াছে। স্বামী
বাধা মানেন নাই বলিয়া নিজেকে তাহাতে হতমান-
বোধে অভিমান করিয়াছে। মা গো! এমন নীচু
মনটা তাহার কি করিয়া হইল? নিজের ইতিহাস-
খানা তখন মন হইতে মুছিয়া কোথায় চলিয়া গিয়া-
ছিল। যদি তাহার এই উচ্ছদয় স্বামীর মধ্যে এত
বড় দরিদ্র-প্রীতি না থাকিত, তবে এই যে আজ রাণী
পরিমলকুমারী মিত্র সর্কৈশ্বর্যমণ্ডিতা হইয়া সহরের
বুকের মাঝখানে হীরকদ্বারের মতই ঝলমল করিতে-
ছেন, এ কোথা হইতে হইত? আজ সে দরিদ্র
ভিখারীর প্রতি স্বামীর অতটুকু সহনশীলতাকে ‘বাড়া-
বাড়ি’ বলিয়া নাক সিঁটকাইতেছে, আর যে দিন সেই
ব্যক্তি নিজের সামাজিক পদপ্রতিষ্ঠা, রূপ, যৌবন ও
অতুল ঐশ্বর্য—জাগতিক এই সমস্ত অতুলৈশ্বর্যকে—
ছাড় করিয়া দিয়া, শত শত রাজা, জমীদার এবং বড়
রাজকর্মচারীর প্রলোভনীয় উপহারসমেত পরী,
অঙ্গুরী মেয়েদের ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই ভিখারিনীকে
নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সে দিন তাহার
সেই অনন্তসাধারণ অদ্ভুত কার্যটাকে কতই না বাড়া-
বাড়ি বলিয়া কত লোকেই না ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত
করিয়াছিল!—সেই কথা মনে করিতেই পরিমলের
সমস্ত মুখখানা সহসা টকটকে লাল হইয়া গিয়া গাল
দুইটা তাহার গরম হইয়া উঠিল। স্বামীর একেবারে
গায়ের কাছে বোসিয়া গিয়া সে তাহার বুকের উপর
মাথাটা ঠেকাইয়া সলজ্জ অল্পতপ্তকণ্ঠে কহিল, “বেশ
ফরেছ ওকে এনেছ, তুমি কার না কবে ভাল ক’রে
থাক! তা ওরা যদি চ’লে যায় যাগ গে,—আমি নিজে
তই সব কাজ করবো।”

নরেশ প্রীত হইয়া স্ত্রীর মুখখানা দুহাতে তুলিয়া
সন্মুখচক্ষে চাহিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলি-
“এই তো মানুষের মতন কথা। ভয় দেখিয়ে
বতায় করিয়ে নেবে কেন?”

স্ব একসময় পরিমল স্বামীকে কাছে পাইয়া
নিজের পূর্বকৃত অবহেলা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই উহাকে একটুখানি খুসী করিতে
চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “নিরঞ্জন একটু সেরে
উঠছে?”

নরেশ কহিলেন, “হাঁ অনেকটা, তবে লোকটার
স্বাস্থ্যটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে কি না, শীঘ্র যে
বেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে, সে আশা মোটেই
নেই।”

পরিমল একটু সহানুভূতি দেখাইয়া আবার কহিল,
“ওরা বলে, ওর মুখটা না কি পুড়ে গেছে? কি ক’রে
গেল—আহা!”

নরেশ কহিলেন, “কি ক’রে গেল, সে কথা একদিন
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দেখেলাম, ও সব বিষয়ে কিছুই
সে বলতে চায় না। পূর্বকথা—কোন কিছু উঠে
পড়লেই একেবারে চুপ হয়ে যায়, কাজেই আমিও
আর জানবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র করি নি। যাই
হোক, কোন রকম ভয়ানক দৈব-দুর্ঘটনা যে ওর উপর
দিয়ে ঘটে গেছে, আর তার ফলেই যে ওর আজ
ওই ভিখারীর অবস্থা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!
লোকটিকে আজ আমরা যা দেখছি, ও ঠিক
তাই নয়।”

পরিমল বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, “সে
আবার কি?”

নরেশচন্দ্র ঈষৎ গভীর হইয়া কহিলেন, “সত্যি
পরি, লোকটা বেশ বিদ্বান্ ছিল,—‘ছিল’ বলছি
তার কারণ, এখন ওর মাথাটা ঠিক সহজ অবস্থায়
নেই,—কেমন যেন একটা টলমলে ভাব। বেশী
দুর্বলতা, কি বেশী শোক বা রোগ, অথবা ঐ
আগুনে পোড়া,—এই রকম কোন কিছুতে ওর
শরীরের সঙ্গে ভিতরটাকেও ঠিক অম্নি ক’রেই
দিয়েছে। যেমন শরীরেরও কোন কোন অংশে
পূর্বেকার সৌন্দর্য্য, ভগ্নরূপের অন্তরালে সূর্য্যরশ্মির
মত উকি মারচে;—মনের মধ্যেও ঠিক তেমনি
অবস্থা। সেখানেও অন্ধ-সম্মোহ অন্ধ-বিকলতার
মধ্যে মধ্যে এমন একটা উচ্চশিক্ষার আভাস দেখতে
পাচ্ছি যে, আমি তো আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কত সমস্ত
মনে হয়, যেন কোন অভিশপ্ত ঋষি, কি রাজা, কি
এমনিধারাই কোন একটা বড় লোক, ভাল লোক,
আজ দুর্দশার চরমে প’ড়ে আমার দ্বারস্থ হয়েছে।
তাই ওকে সরিয়ে দিতে আমার মন সেরে না।”

বলিতে বলিতে ভাবপ্রবণ নরেশচন্দ্রের সমস্ত
মুখটা যেন চকচকে হইয়া উঠিল, দুই চোখে সহানু-
ভূতির বাষ্প জমিয়া উঠিল, এবং কণ্ঠ ঈষৎ রুদ্ধ হইয়া
আসিল। স্বামীর এই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অকৃত্রিম

করণার উচ্ছ্বাসে পরিমলের মনের মধ্যেও একটা সহানুভূতির দমকা হাওয়া জোরে বহাইয়া দিল। শুনিতেন শুনিতেন সহসা তাহার স্বকোমল নারীচিত্ত মেহে বিগলিত বিমথিত হইয়া তাহার দুই চোখ করুণার অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিল এবং কখন যে তাহা তাহার অশ্রু গণ্ড বহিয়া স্রুচ্ছিন্ন মুক্তার তায় ঝরিয়া ঝরিয়া তাহারই কোলের উপরে পড়িতে লাগিল, সে বিষয়ে তাহার কোন হিসাবই রহিল না। মনে মনে সে স্বামীর বিশ্বাসের সমর্থন করিয়া নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল যে, এবার হইতে সেও এই বিরাটগৃহপ্রবাসী পাণ্ডববৎ-অজ্ঞাতপরিচয় লোকটির প্রতি অবিচার হইতে দিবে না, নিজেও করিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অতীত দিন স্মরি,

পড়িছে ঝরি-ঝরি,—আধিজল।

—তীর্থরেণু।

ইহার পর হইতে নিরঞ্জন একটু একটু করিয়া কপাল ফিরিল। কর্তার প্রিয়পাত্র হওয়ার অপরাধে সে বেচারার ঔষধ, পথ্য, সেবা কিছুই সমুচিতরূপে জুটিত না; এখন কর্তার মেহলাভ ঘটয়া, তাঁহার খোঁজখবর লওয়ার গুণে সে বেচারী রাজভৃত্যবর্গের হাত এড়াইয়া কিছু কিছু সত্য সত্য ঔষধ-পথ্য লাভ করিতে থাকায় পূর্বাপেক্ষা একটু সহজেই শরীরে বল পাইতে লাগিল। এমনই করিয়া কিছুদিন গেল, একদিন নরেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া সে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বলিল, “এখন তো আমি সেরে উঠেছি, আজ্ঞা করেন তো এবার যাই।”

নরেশচন্দ্রের মুখে একটা স্নগন্ধি সিগারে আগুন জ্বলিতেছিল, সজোরে সেটাতে একটা টান দিয়া, সেটাকে দুই অঙ্গুলিমধ্যে ধরিয়া রাখিয়া, মুখমধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি বাহিরে মিশাইয়া দিয়া, তিনি ঈষৎ বিষ্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনের মধ্যে তাঁহার একটুখানি যে উদ্ভ্রা জাগিয়াছিল, তাহা ঐ নিঃপ্রাণ মধ্যাহ্নস্থ্যে ত্রিপাদ-গ্রামী গ্রহণ লাগারই প্রভাহীন মুখখানার প্রতি চাহিতেই ক্ষণমধ্যে কীথায় চলিয়া গেল; তথাপি হয় তো একটু কঠিনস্বরেই বাহির হইয়া গেল,—“কেন, এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?”

কথাটা বোধ হয় জোতার পক্ষে একটু বেশীই

কঠিন হইয়া থাকিবে। কারণ, ইহা কানে বাইবাম সে যেন বেতাহতের মতই চম্কাইয়া এক পা পিছাই গেল এবং কিছুক্ষণ পর্যান্ত কোন উত্তর দিবার শি বোধ করি তাহার রহিল না। স্বল্পপরে সামলাইয়া লইয়া যখন কি বলিতে গেল, তত নরেশচন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরের নীরসতা নিজেই করিয়া ফেলিয়া উহাতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া শোধরাইয়া লইলেন। তিনি সদয়কণ্ঠেই কহিলে “আমার বাড়ীর চাকরগুলো বুঝি আবার তোমা সঙ্গে লাগতে আরম্ভ করেছে? বদমায়েসের খাড়াই সব!—”

নিরঞ্জন কহিল, “তা’দের কোন দোষ নেই।—”

নরেশ কহিলেন, “তবে কা’দের আছে তাই শুনি।”

মুহু অপরাধী ভাবে নিরঞ্জন পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলা ছুঁকর বুঝিয়াও বলিয়া ফেলিল, “চিরদিনই কি আপনার গলগ্রহ হ’য়ে থাকবো?”

নরেশ পুনশ্চ ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা হ’লে কি করবে শুনি?”

কি করিবে? কই, এ কথা তো নিরঞ্জন একবারটিও ভাবিবার আবশ্যক বোধ করে নাই? কি করিবে? কেমন করিয়া চলিবে? এই যে সব অতি সহজ প্রশ্ন, সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ লোকগুলার মনের ভিতর যে সবেম তোলপাড় অহোরহই চলিতেছে এই লোকটির মনের খাতার পাতা হইতে ঠিক কথাটাই যেন আজ বহুদিন যাবৎ নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছিল। এই সোজা সরল প্রশ্নটাই যে সে নিজের মনের কাছে কোনমতে আর উত্থাপন করিতে পারে না,—এমন কি, অপরে করিলেও যেন কতকটা ভীত হয়। কিন্তু নরেশচন্দ্রের এই কথাটারই বলিবার ভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্যে সে যেন আজ একটুখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নিরন্তরে মুখ নত করিয়া রহিল। যে কথার উত্তরের পূঁজি তাহার নাই, তাহারই জন্ত বৃথা চেষ্টা সে করিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া নরেশচন্দ্র একটু ক্রোধের ভাবে কহিলেন, “আবার সেই রাস্তার ধারে গিয়ে প’ড়ে প’ড়ে মরবার প্রতীক্ষা করবে বোধ হয়?”

তারপর ইহাতেও কোন উত্তর আদায় করিতে পারিয়া একটু উত্তেজিত বিরক্তির সহিত বলিয়া উ’ “বলি, পরের সাহায্য নিতে এতই যদি তে আপত্তি থাকে, তা হ’লে একটা চাকরী করলেও তো হয়। ‘গলগ্রহ’ হবার দরকারই বা যায় কেন?”—

নিরঞ্জন এবার কথা কহিল, বলিল—“হু’একবার করেছিলাম,—মধ্যে মধ্যে আমার মাথার ঠিক না কি না, একবার সেই অবস্থায় যে আফিসে করতেন, তার কি কাগজপত্র নাকি নষ্ট করে তাতেই তারা বিদায় করে দেয়। আরও একটি উকীলের মুহুরীর কাজ পেয়েছিলাম ; হয়—তা ঠিক মনে নেই,—হয় তো বেশী করেছিল, কারণ, যখন থেকে মনে আছে, আমি হাঁসপাতালে ছিলাম।”

এই উত্তর পাইয়া নরেশ লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল প করিয়া থাকিলেন, তার পর হাত দিয়া অদূরবর্তী গানের একখানা বেঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন, “এসো, এখানে বসে একটু কথাবার্তা কওয়া যাক।”—এই লিয়া পূর্বোক্ত আসনে আসন লইয়া পুরাতন আলোচনার প্রত্যাভর্তনপূর্বক পুনশ্চ কহিলেন, “আচ্ছা, শেষ চাকরী যে করেছিলে, সে কতদিন লো?”

নিরঞ্জন মনে মনে হিসাব করিয়া উহার কথার উত্তর দিল, “মনে হয় যেন এক বৎসর পাঁচ মাস পূর্বে।”

“এই এক বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে আর কোন কর্ম কাজই করে নি?”

নিরঞ্জন নিরুত্তর রহিল। পরে কহিল, “পাগলা দর হাঁসপাতালে মাস এগার থাকবার পর ন থেকে বেরিয়ে চেষ্ঠা অনেক করেছিলাম, আর এই চেহারা, এই স্বাস্থ্য, এ দেখে সহজে কেউ করী দিতেই চায় না। ও ছুটিও যে পেয়েছিলাম—ও অনেক কষ্টে।”

নরেশচন্দ্রের পূর্ব-বিরক্তির সবটাই যেন এক মুহূর্তে ঘোরতর অন্ততপ্ত লজ্জায় গলিয়া পড়িয়া জল হইয়া গেল, নিজের হাত দিয়া ক্ষতচিহ্নিত শীর্ণ কথানা হাত সম্বন্ধে ধরিয়া স্নেহকরুণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আমি তোমার যদি চাকরী দিই? তা’ হলে তুমি আর ‘বাই বাই’ করবে না?”—তার পর আর হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া পিঠ চাপড়াইয়া সাহে কহিলেন, “আর ইতস্ততঃ করে না ; সেই হবে, কেমন না?”

নিরঞ্জন যুক্তকর নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তর করিল, “আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ, তাই কথা তুলেছিলাম। আপনার সেবা চিরদিন আর আপনা হ’তেই যে করতে চাওয়া উচিত

হাসিয়া উঠিলেন, তাহার সেই শিশুর মত স্ন-উচ্চ হাস্যধ্বনিতে, পার্শ্ববর্তী ঝুম্‌কালতার বিতান-মধ্যে যে একটা পালিত হরিণ কচি ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিবিষ্ট ছিল, সেটা চকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তিনি ইহা আমলেই না আনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “দেখ তাই নিরঞ্জন! এখন ও সব একটা ফ্যানান উঠেছে বটে, আর অনেক গ্রাজুয়েট দোকানদার,—গ্রাজুয়েট কুলির কথাও শোনা গেছে ;—কিন্তু গ্রাজুয়েট সেবক নিয়ে আমি তো ভাই মারাই যাব। নাঃ! ও সব সেবা-টেবার কথা নয়। তার চেয়েও একটা বড় শক্ত কাজে আমি তোমার জুড়ে দেবো মনে করেছি। দেখ, তখন কিন্তু মনে মনে আমার গাল দিও না ভাই,—”

নিরঞ্জনের স্বাভাবিক ম্লান ও বিমর্ষ মুখে ঈষৎ হাসির তড়িৎ চমকিয়া গেল। সে কহিল, “আমার আপনি যা করাবেন আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।”

নরেশচন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, “দেখা বাবে নিক, সেখানে অনেক-বড় বড় হাতী তলিয়ে গেছে। সে বড় বিষম ঠাই।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনবৈভব, হায় গো, সে সব চক্রের মত ঘোরে ;
কখন তোমার, কখন আমার, স্থির নহে কারো ঘরে।
—তীর্থরেণু।

নিরঞ্জন এ বাড়ীতে থাকিয়া গেল। শুধু থাকাই নয়—বাড়ীর আশ্রিত হিসাবে নহে,—কর্মচারী হিসাবে যে রহিল, সে সংবাদটাও উছ রহিল না। তা এ সমাচারটা গোপন না থাকাই শুভফলপ্রসূ হইয়াছিল। যতক্ষণ কপর্দকহীন ভিখারী নিরঞ্জন এই সুবিপুল রাজবাটীর একটি প্রান্তে অর্দ্ধমৃত্যাবস্থায় পড়িয়া ছিল, ততক্ষণই তাহার ঔষধপথ্য সেবার সর্ব-বিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পাইয়াছে। কিন্তু এখন তো আর সেই দীনাতিদীনাবস্থা নিরঞ্জনের থাকিতেছে না, তাই সংসারক্ষেত্রেও তাহার মূল্য একটা নির্দিষ্ট হিসাবে স্থির হইয়া গিয়াছে। আর তাহাকে তেমন করিয়া অযত্ন অগ্রাহ করিবার প্রয়োজন নাই—ইহা নিশ্চিত! কারণ, এখন হইতে তাহার কাছে মাস-কাবারে মাঝে মাঝে কিছু বখশিস চাহিলে পাওয়া যাইতে না পারে, এমনও নয়। আবশ্যক অনাবশ্যকে দু-এক টাকা কর্জ লইয়া স্ত্রীদ তো নয়ই, শোধও

না দিলে চলিয়া যায়।—ইত্যাদিরূপ অনেক সুরোগ পাওয়া অসম্ভব বা অসম্ভবতই বা এমন কি? বামুন ঠাকুরের দল প্রথম এই খবরটা শুনিয়া দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষে নাসিকা অনেক উচ্চে তুলিয়া প্রস্ফলিত ছড়া কাটিয়া—‘যত ছিল নেড়া-বুনে, সবাই হলো কীর্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খতাল!’—ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গহাস্তে রান্না-মহলটা ফাটাইতে চাহিলেও—পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি মাথায় ঢুকিয়া শীঘ্রই তাহাদের পাকা মস্তী মত গম্ভীর করিয়া আনিল।

হারাদন বলিল, “তা যাই বল, আর যাই কও সর্ব-ঠাকুর, মুখপোড়াটা এ দিকে লোকটা ভাল আছে, ওটাকে হাতে রাখতে পারলে মন্দ হ’তো না।”

অমনি সকলকারই মাথায় চট করিয়া ফন্দিটা খাটিয়া গেল। সর্ব-ঠাকুর হারাদনের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে একমত হইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছিলাম রে হারু, পোড়ামুখোটা হাঁদা গোছের আছে, কে জানে ওটার অমন পাতা চাপা কপাল! ভিক্ষে করতে এসে যে সভাপণ্ডিত হয়ে বসবে, তা’কি ছাই জানি, তা হ’লে কি গোড়া থেকে অমন ক’রে তুচ্ছ করতে যাই? আহা হা, বড় ভুলটাই হয়ে গেছে রে! এখন যে হাতে কামড়াতে ইচ্ছে করচে!”

হারাদন মুখ সিটকাইয়া কহিল, “বামনাই বুদ্ধি এমনিই বটে! তুচ্ছ করেচি তো হয়েছে কি? আজ থেকে অ-তুচ্ছ করতে লেগে যাও না কেনে! ওর যদি অত কথার হুঁস থাকবে, তা হ’লে পাত্রে বসে’ তিনটে বেরালে ভাগ বসায়? দেখতে পাও না, কি রকম যেন আলাভোলা।”

সর্ব-ঠাকুর নরসুন্দর-নন্দনের এ যুক্তিটাকেও সমীচীন বুঝিয়া হঠাৎ তাহাতে সায়া দিয়া বলিয়া উঠিল, “তা বটে! তা হ্যাঁ রে হারু, ও মানুষকে আবার রাজাবাবু কি চাকরী দেবে বল দেখি? ওই তেঁরূপ, আর ওই তো বুদ্ধি!”

হারাদনের পূর্বেই বাবুর খাস খানসামা ইহাদের চেয়ে পুরাতন দলের সাতকড়ের সেখানে আবির্ভাব ঘটয়াছিল এবং তাহার কর্ণেও সর্ব-ঠাকুরের শেষ প্রশ্ন ও মন্তব্যটা প্রবেশ করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ তীব্রব্যঙ্গে ইহার একটা উত্তরও দিয়া দিল, বলিল—“আমাদের রাজা সাহেবের ভাত পেটে পড়লে, অনেকেরই পোড়া রূপ তাজা হয়ে ওঠে। সে তোরা না দেখে থাকিস্ না দেখতে পারিস্। এই সাতকড়ের সে সবই দেখা আছে রে! অনেক জানোয়ার আছে না, যারা উচুতে উঠতে পেলোও, তাহাদের নজর

উপরের দিকে উঠতে চায় না?—জানিস্ না, দেব মুনিবেরও যে ঠিক সেই দশা!”

কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষরূপ তীব্র নিহিত ছিল, সে তত্ত্বের সন্ধান এ বাড়ীর দাসীদের কাহারও কাছেই অজ্ঞাত নয়, তা নূতন আগন্তুক হোক না কেন। তা সেই স্মরণ করিয়া সকলেই তখন একটু একটু হাসি হাসিয়া লইল।

রান্নাঘরের বি পৈচোর মা বলিল, “ঠিক বই হিস রে সেতো! একটা বাক্যের মতন বাক্য ব, করেছিলাম!—সত্যি—বলি, বড়লোক তুমি, বড়লোকের মতন রুচি পিরিষিত্তি হয় না কেনে? দেখেওচি আর শুনেওচি, কত বড় বড় লোক রূপসী-রূপসী মেয়ে নিয়ে দোরে ব’সে হতো দিয়েছে, তা সে সব তখন চক্ষের কোণ তুলেও চেয়ে দেখলে না, একটা কোথা-কার বাইজী না কি, মোছলমান না রিহদী—তাকেই নিয়ে মাথার মণি ক’রে রাখলে। তারই জন্তে ঘর-বাড়ী, সোনাদানা, গাঞ্জী, পাক্কি, কি ছিটি! তা সেও নয় বুঝলুম বাপু বড় লোকের ছেলেদের অমন হয়ে থাকে, তা ওতে তাহাদের অত দোষ হয় না। ভগমান ভোগ করতে দিয়েচেন, করবে না?—তা হয় তা’ নিয়েই থাক, না হয় ও যা আছে তা’ আছি, ওরই সতে একটা বড় দেখে জমীদার রাজা-টাজার ঘর থেকে ক’রে নিয়ে আর, যে পাঁচজনে দেখে শুনে ধস্তি করুক। পাঁচটা তত্ত্ব-তাবাস আশুক যাক, কু সাক্ষেৎ আনাগোনা করুক। আমরাও গরীব-দুঃলোক—ছুটো পরসার পেতোশা ক’রেই না এসেছি এ বড় মানুষের দোরে, তা পাই না হয় টাকাটা সিকেটা! ওমা, এ কোথাকার একটা পথেকুড়ুনো ধুসখাড়ী কালো মেয়ে ধ’রে এনে কি না তাকেই একেবারে রাজ্যিপাটে বসিয়ে দিলে। যুঁটেকুড়ুনী হলো পাটরাণী। অবাক কাণ্ড মা!”

সকলেই এই স্তম্ভব্যে মুখ মুচকিয়া হাসিল।

সাতকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুই আ অবাক কাণ্ড’র দেখলি কি রে মাগি! যে অমন ব গালে হাত দিয়ে বসলি? সে যদি কেউ থাকে তো সে এই ঘোষের পো সাতকড়ে।—তা হ’লে শোন;—সে এক অজ পাড়াগাঁ, চা’ তার জঙ্গল আর জঙ্গল; দিনের বেলা সে জঙ্গলে ছ্যা ছ্যা ক’রে শেয়াল ডাকে, রেতে প্রাণটি হাতে নিয়ে পিঙ্গীমটি সামনে ক’রে স জেগে কাটাতে হয়,—কি না কখন বাঘ এ রক্তটুকু না চুমুক মেরে চুসে খেয়ে যায়।

রী-বাড়ীর ভাঙ্গা চোরা দরজাগুলো ভররাত
ধর বাচ্চারা এসে ঢক ঢক ঢক ঢক ক'রে নাড়া
মাচ্ছে! বাব্বাঃ! সে কি দেশ, না সে দেশে
দুদর নোকেব ছেলের পা দেয়? তা আমাদের
কলি কি না বিপরীত কাণ্ড!—ওয়ার বাপ-
দেবও বোধ করি ওয়ারই মতন কুচি
ছিল, তাই সেই দেশে গেছিলেন তারা
জমী কিনতে।—তা তাই, তাই বা বলবো কি
শুনেছি নাকি—সেখানের একটা বুড়ো প্রজার
ই আমার শোনা—ওয়ার ঠাকুর্দা নাকি বড়ই
গরীব ছিল, ওই অঞ্চলেরই কোন্ এক বড় লোকের
বাড়ী না কি সে গোমস্তাগিরি ক'রে খেতো। তারপর
ওরই হাত দিয়ে কি রকম ক'রে গোলমাল হয়ে না কি
তাদের ঐ সব জমীদারী লাটে চ'ড়ে যায়, আর
বনামীতে ও নিজেই না কি সেই সব কিনে টিনে নেয়।
এত বড় অধম্মে লোক ওরা।”

শ্রোতৃবৃন্দ মহোৎসাহে সাতকড়ির বর্ণিত মানব-
জ্বলের কুৎসা শুনিতেছিল। শ্রোতৃদলের মধ্য হইতে
পেঁচার মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “তা
না গা, ওদের সেই জমীদার মনিবের কি হ'লো গা?
রা বোধ করি খুব গরীব হয়ে গেল? তাদের এখন
আছে গা?”

“শোন একবার ঝাকা মাগীর ঝাকামী কথা!
র কে আছে, তারা কি খায়. গাছতলায় শুতো
ড়ে বেঁধে নিয়েছিলো,—সে-সব ফিরিস্তি না কি
র কাছে তারা দাখিল ক'রে দিয়ে গেছে! আমি
র কি জানি রে বাপু? গরীব তারা অবিশিষ্ট হলো
ই কি! তবে খেতে না পেয়ে মরেই গেল, কি কম
মখেয়ে জ্যান্তো রইলো, সে ইতিহাসের পুঁথিটা
আমার পড়া নেই। এদের কথাটাই সেই ‘শেয়াল
জার’ দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম, তাই তোদের
ছে বলুম,—দেখিস্ তাই, যেন কারু কাছে গল্প
র বেড়াতে যাস্নে সব! যে তোরা কানপাতলা
বাপু, একটা কথা তো কারুর পেটেই থাকে
—ওই যে ছোট দিকের একটা টান আছে না,
ও তো ঐ কথাই বল্ছিলি কি না—তা সেটা
কোথেকে, সেই কথাটাই তোদের শুনিয়ে
বলি? কিন্তু খবরদার! পাঁচ কান যেন না

সুরে এবং চাহনির মধ্য দিয়া মনিববংশের
বন্ধীয় অনেকখানি ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া
রদিকের হাঙ্গ-কৌতুকের সহিত যোগ
ই সাতকড়ি তাহাদের শুনিবারও বটে,

আবার নিজের বলিবার আগ্রহেও বটে পূর্বকথিত
কাহিনীর অ-কথিত অংশটা পুনরাবৃত্ত করিল,—

“হ্যাঁ তার পর, হ্যাঁ, দেখ গে, কি বলে গে, বলছিলুম
কি না—সেই তো দেশ, তা সে অঞ্চলে ওর ঠাকুর্দা
যখন জমীদার হয়, তখন ওদের আমদানী না কি এর
সিকির সিকিও ছিল না, ও দিকটা তখন আরও বন-
বাদাড় ছিল কি না, বাকে বলে সেই ‘অজাগরবিজ’ বন।
তা'ছাড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলা ছিল, খানিকটে
নাকি নদীর গর্ভে ডুবেই ছিল। ওদের কপালগুলো
বড়ই জোরালো কি না, হঠাৎ দুটো নদীর স্রোত
ফিরে গেল,—একটা বেকে এসে ওদের জমীদারীর
পাশ দিয়ে বয়ে চ'লে গেল, তাতে নাকি একদিকে
ডের আবাদী জমীর সৃষ্টি হলো, আর একদিকে বড়
বড় সেগুন গাছের চালানের ভারি সুবিধা হয়ে গেল।
আর একটা নদীর জন্তেও কি সব সুযোগ পাওয়ার
জায়গায় জায়গায় বন আবাদ ক'রে লোক বসিয়ে গাঁ
সব তৈরী হলো, এই ক'রে নাকি যেখানে
দু'হাজার ছিল, সেখানে ছত্রিশ হাজার টাকা
আয় দাঁড়ালো। এমনি ক'রে ক'রে ক্রমেই আরও কত
বেড়ে উঠেছে তা কে জানে? শুনতে পাই, দুলাধ
টাকারও উপরে। মাই হোক, বেশীর ভাগ জমীদারের
জমীদারীই নাকি এই রকমের। শুনেচি, ওদের মধ্যের
কেউ কেউ নাকি আগে ডাকাত পুষেছে, কেউ
মনিব ঠকিয়েছে, কেউ কেউ সরকারকে বড় বড়
রাজতুল্যের সাহায্য ক'রে নিজেরা বড় মানুষ হয়ে
গেছে। তা এদেরই বা শুধু শুধু দুশ্লে হবে কেন?
আবার সে দিন সরকার মশাই বল্ছেল যে, এখন
আবার অনেকে পুগিসে গোয়েন্দাগিরি করে, খুণীর
হাতে খুন হয়ে বউ ছেলেকে জমীদার ক'রেও নাকি
দিয়ে যাচ্ছে! সংসারে কত রকমই যে আছে।”

ইতিমধ্যে বাসনমাজা বি মোহিনীর অভ্যুদয়
হইয়াছিল, সে মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য করিল, “আহা!
সাতকড়ি আমাদের কত সবই না জানে!”

পেঁচার মা এই আকস্মিক রসভঞ্জে মহা বিরক্ত
হইয়া উঠিয়া তাহার পেঁচার মত চোখ দুইটা তেমনি
করিয়াই পাকাইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া
উঠিল, “ভদর নোকেব সঙ্গে সঙ্গে চারটে কালই দেশ
বিদেশে ঘুরছে, ও না জান্বেই বা কেন্ লা? নে'
দাদা সাতু, তুই ও সব কথা কান দিসনে, তাই,
ব'লে যা, যা বল্ছিলি। তার পর?—”

মোহিনী বিরক্ত হইয়া ঝঙ্কার তুলিল, “আ গেল
যা, একটা কথা কথার কথা মাস্তুর করেচি, না মাগী অমনি
আগুনধাক্কীর মতন যেন ছুটে মারতে এলো! বলি,

সাতকড়িকে বলেচি তো তোর অত গায়ের জ্বালা হলো কেন বল তো? কেন তোর একবার সাতকড়ি নাকি যে, কারুর একটা ভাল মন্দ কথা কইবার ঘো নেই, অমনি তোমার গায়ে ফোঁকা পড়ে যায়?”

তখন আর যায় কোথা? রণজ্জ্বার দিয়া প্রায় “যুদ্ধং দেহি” ভাবে ফিরিয়া পেঁচোর মা দাঁত কিড়মিড় করিয়া উঠিল, “আ মর মাগি! গতরের মাথা খেয়ে শুধু শুধু কি না গায়ে পড়ে এলো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! আচ্ছা আর, তবে একবার ভাল ক’রে দেখে নিচ্ছি, কত বড় তুই, আর কত বড় তোর মুখ; আর একবার আজ দেখচি তোকে—”

অদূর হইতে একটা হাঁক আসিল, “সাতকড়ি! রাজাবাবু তোমায় শীগ্গির করে ডাকছেন।”

নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখটি করিয়া সাতকড়িও হাঁকিয়া উত্তর করিল, “আজ্ঞে, এই যাচ্ছি—” কোন্দল-পরায়ণাদের দিকে চাহিয়া একটু দুঃখিতভাবে কহিয়া গেল, “নিজেদের দোষেই তোরা গল্পটা শেষ করতে দিলি নি, তা না দি’গে যা, মরগে যা ছটাতে খাওয়া-খাওয়ি ক’রে, এর পর সাতদিন খোসামোদ না করিয়ে তো আর বলবো না।”

এই বলিয়া সে প্রস্থিত হইল।

পিছন হইতে কোপক্লবন্ধারে মোহিনী চৈচাইয়া কহিল, “বল্বিনি তো সেই ভয়ে আমি ম’রে রইলুম আর কি! কি তোর এমন মহাভারত না ভাগবত যে, সে না কানে গেলে নরকে পচে ম’রে থাকবো? খোসামোদ যে করতে জানে, সে-ই ভাল ক’রে করবে এখন; আমরা যদি খোসামোদ করা জান্তুম রে, তা হ’লে তোর কেন, তোর মূনিবেরই করতুম। ছেরকালটা ধ’রে না শীত, না গ্রীষ্ম বাসন মেজে মেজে মরতুম না রে!”

পেঁচোর মা ছুই পাকান চোখে মোহিনীকে ভয় করিবার মত আগুন ভরিয়া খোঁপাখোলা এলোচুল আঁটিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দাঁত কিড়মিড় করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল—“দেখ মোহী আবাগী! অমন ক’রে ভাল মানুষদের পেছনে লাগিস্বে বল্চি! কেন, আমি কি তোর বুকে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি নাকি যে, এখন তখন তুই আমার ঠোঁকর মেরে কথা কইতে আসিস্?”

নিরঞ্জনর চাকরী হইয়াছে, সে খবর এ বাড়ীর বাসিন্দারা এবং যাহারা এ সংসারের সহিত আসা যাওয়া করিত, তাহারা সকলেই জানিল বটে, কিন্তু কি চাকরী যে তাহার হইল, সে খবরটায় যেমন তাহারা পাঁচজনে,—তেমনি নিরঞ্জন নিজে শুদ্ধ

অজ্ঞই রহিয়া গেল এবং তা অমন প্রায় দিন এই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া কাটিল। চাকরী নিরঞ্জনর মনটা একটুখানি প্রফুল্ল হইল কিন্তু ফলে দেখা গেল, চাকরীর মধ্যে য় সেই আশ্রয়দাতার বাড়ীর নীচের তলায় এই বিশেষ ঘরের মধ্যের নির্দিষ্ট বিছানাটি পড়িয়া অফুরন্ত দুঃখময় চিন্তা-শ্রোতের মত যাওয়া অথবা সেই ঘরের কড়িকাঠ কয়খানায় রাখা,—এ ভিন্ন তো কই তাহার কর্ম-জী কোন সফলতাই দেখা দিল না। আরও দুই দিন অপেক্ষা করিয়া করিয়া একদিন নরেশচন্দ্র নাগাল পাইয়া সে সসঙ্কোচে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় তো কোন কাজই দেওয়া হ’ল না?”

নরেশ তখন কি কাজে তাঁহার স্বভাবজাত অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতেই মগ্ন থাকিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “ব্যস্ত হইয়া না, ছুদিনেই সংসারের কর্ম-শ্রোতে তাঁটা পড়ে যাবে না, কাজ ঠিক থাকবে।”

নিরঞ্জন কিছু বলিবার জন্ত মুখ খুলিতে গিয় আবার বন্ধ করিয়া ফেলিল। কি জানি, বেঁটা পীড়ন করিয়া কাজ আদায় করিতে গেলে হয় সে সেটা আদায় হওয়া অধিকতর দুর্ঘট হইয়া পড় নেহাৎ বিচিত্র নয়! বাবুর যে মেজাজের পনি সে পাইয়াছে, তাহাতে আর যতই ভাল হি থাক না কেন, একটা যে খেয়ালের খেলাও অন্তর্নিহিত হইয়া আছে, সেটাও অস্পষ্ট ন কেহ জোর করিয়া ‘হাঁ’ বলিলে তাঁহাকে প্রায় তেমনি জ্বিদের সঙ্গে ‘না’ বলিতে বাধ্য করা হয়, অতএব যেখানে আগ্রহ অধিক, সেখানে অনাগ্রহই কার্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাটা কিছু সম্ভব বটে।

সে নীরবে ফিরিতেছিল, নরেশ ডাকিলেন, “ও নিরঞ্জন শোন,—শোন—”

নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়াই রহিল। নরেশ একতারা কাগজ দেখাইয়া কহিল “আমার এই পিপড়ের ঠ্যাং লেখাগুলোকে বুঝে। এর একটা “ফেরার কপি” করতে পারবে?”

হারানিধি বা ওম্নি কিছু কুড়াইয়া মানুষের মুখের যে ভাব হয়, ঠিক তেমনি তার ফুলমুখে নিরঞ্জন তাহার স্বাভাবিক অশিথিল গতিকে যৌবনোত্তমপরিপূর্ণ করিয়া এক রকম ছোঁ মারিয়াই যেন নড়ে হইতে সেই কোণ-গাঁথা ফুলক্ষেপ কাগজ লইল এবং সাগ্রহে তত্পরি নিজের নি

স্থিত দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহাতে যে হস্তাক্ষর
স্থিত ছিল, তাহাকে কন্ঠা বলিলেও খুব মিথ্যা
না বলা হয় না। এ বিষয়ে নরেশের মন্তব্যটাকে
নয় বলিয়া ভ্রম করিবার কিছুমাত্র কারণই বিদ্যমান
না। কিন্তু বহুকালের অনাবৃষ্টির পর সামান্য এক
গা জলেও যেমন প্রকৃতির সমস্ত স্নানতা ধুইয়া
তাহাকে চিকণ ও শ্রামল দেখায়, নিরঞ্জনরও
এইরূপ কৰ্মবন্ধনবিহীন ছন্দছাড়া জীবনের সমুদয়
এলোমেলো গ্রন্থিগুলো যেন এতটুকু কাজের নাগাল
পাওয়াতেই একটি ক্ষণের ভিতরে সংযত ও সুসংকল্প
হইয়া উঠিল। সে আর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা
মাত্র না করিয়াই একখানা চৌকী লইয়া বসিয়া
সাদা কাগজ কয়খানা টানিয়া লইল।

সে দিন অপরাহ্নে পরিমল যখন তার বৈকালিক
বেশভূষা সমাধা করিয়া আনিয়াছে, তেমন সময়ে
তাহার নিজস্ব দাসী অন্নদা আসিয়া জানাইল,
রাজাবাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। পরিমল আসিয়া
দেখিল, নরেশ কয়েকখানা বই-হাতে তাহার প্রতীক্ষা
করিতেছেন।

“কি এ গুলো? নতুন কোন গল্পের বই
বেরিয়েছে বুঝি? তা বাঁধানর এমন ছিরি কেন?”
—বলিয়া উহারই একখানা টানিয়া লইয়াই পরিমল
ঠোট উন্টাইল—“ও হরি! আবার এই মাথামুণ্ড
নিরে আসা হয়েছে? আমি তো বলেইছি যে, এ সব
আর আমার দ্বারা হচ্ছে টাচেনা। মা গো, বড়
হয় মরতে যাচ্ছি, এখনও কি না রয়েলরিডার নম্বর
খার্ড পড়া!”

নরেশচন্দ্র হাসিলেন, “ওর চেয়ে যে আর ওপোরে
উঠতে পারলে না সৈ! আমার কি সাধ যে
চারকাল ধরেই তুমি কচি খুকীর পড়া পড়ো?
না, এবার এই ‘রাজকীয় পঠনা’র গভী তোমায়
পার হ’তেই হবে, পরি!”

পরিমল বই কয়খানা সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
দিয়া স্বামীর প্রশস্ত স্থল স্বন্ধের উপর মাথা রাখিয়া
আবদার করিয়া বলিল, “ও আমি আর পড়বো না।”

“কেন পরি?”

“বুড় বয়েসে আর অত শেখা যায় না। দেখলে
তা, পারলুম না।”

নরেশ বলিলেন, “দেখ, তা’ যদি বলো, তা হ’লে
যে হাজারটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি
বুড় বয়েসে সামান্য একটু লেখাপড়া শেখা সে
কিছুই নয়, একেবারে আগা থেকে পাকলা
বিবি ব’নে যেতে পারা যায়।”

পরিমল স্বামীর কথার হাসিয়া ফেলিল, তার
পর ঈষৎ গভীর হইয়া উঠিয়া বিষম্বরে কহিল,
“তারা বোধ হয় আমার মতন পাড়ার্গেয়ে গরীব
ঘরের মেয়ে নয়, তাই পারে।”

নরেশ কহিলেন, “তা’ নয় পরি, ও তুমি একে-
বারে ভুল করলে। অজ পাড়ার্গায়ের ছেলে-
মেয়েরা সহরে এলে ষত বন্ধ সহরে হয়ে ওঠে,
সহরের বুকের মধ্যে সাতপুরুষে বাস ক’রে থেকেও
তার সিকিটুকুও পারা যায় না। সংক্রামক রোগের
মধ্যে সর্বদা যারা বাস করে, তাদের চাইতে
বাইরের লোকদেরই সংক্রামিত হওয়ায় ভয় বেশী
কি না। যাক, ও সব তর্কাতর্কি তুলে রেখে দাও,
তোমায় আমি এম্, এ, বি-এল পাশ ক’রে হাইকোর্টে
ব্যারিষ্টারীর দরখাস্ত পাঠাতেও অনুরোধ করছি, আর
বিলাত ঘুরতেও নিয়ে যাচ্চিনে;—মাত্র
খামের উপর চিঠির ঠিকানাটা লেখা, বা ছোট
ছেলে-মেয়েদের অক্ষর-পরিচয়টা করাবার মতন
পুঁজিটুকু পর্যন্ত না রাখলে চলবে কেন বল
তো? এতটুকু চাওয়ারও কি আমার যোগ্যতা
নাই?”

পরিমলের গাল দুটি ঈষৎ একটু রাঙ্গা হইয়া
আসিল, নতমুখে সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, “চিঠি
লেখবার তো আমার অনেকই আছে। আর
ছোট ছেলে—তা যদি ঈশ্বর আমাদের দেন, তাদের
শেখাবার লোকের এ বাঁড়ীতে কোন অভাব হবে
না।”

“আহা, ঐখানেই যে তোমাদের গলদ পরি!
মা-বাপের কাছে শিক্ষা না পেলে সন্তানের যে প্রকৃত
শিক্ষাই হ’তে পারে না। প্রথম থেকে মাইনে
করা মীষ্টার গুবর্ণেসের ব্যবস্থার মতন ছোট ছেলে-
মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা আর কিছুতেই নেই।
বিদ্যালয়ভাটা একেবারেই তাতে তাদের পক্ষে
বিস্বাদ হয়ে যায়। মায়ের আদরের সঙ্গে মিশিয়ে
অতি সহজ খেলার মতন ঘেঁটা শিখে ফেলে, এক
জন অপরিচিতের শাসন-গান্ধীর্যের মধ্যে কি
সে বস্তু পেতে পারে তারা কখনও?”

পরিমল কিছু ক্ষুণ্ণচিত্তে জবাব দিল, “একটু
আধটু শিখছি তো, কিন্তু ও ইংরেজী বইটাই
আমার পড়তে মোটে সুবিধে হয় না। মনেই
থাকে না যে ছাই।—আর কি বিস্তী উচ্চারণ ও
বানান! সে যাক,—হ্যাঁ গা, আজ আমার পার্সী
থিয়েটারে নিয়ে যাবে? ‘মোহন-মুরলী’ দেখে
আসবো।”

নরেশ জীটিকে একটু সন্তুষ্ট করিয়া কাজ আদায় করাই স্বস্তি বোধে সে দিন ঐ পর্য্যন্তই থামিয়া গিয়া জবাব দিলেন, “বেশ তো, বেও।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের পরাণ মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়, তার সনে যদি তোমার মনের নাহি থাকে পরিচয়। আচরণ তার বিচার করিতে যেও না যেও না তবে, তুমি বাহা ভাব কলঙ্ক, তাহা অন্তের লেখা হবে, হয় ত সে রণে তুমি হেরে যেতে, সে তব্ব হয়েছে জয়ী, ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি।

—ভীর্থরেনু।

হুঁচারজন বন্ধু আসিয়া একটা পুরাতন দাবী দিয়া সে দিন নরেশকে সম্বোধনপূর্বক বলিল, “ওহে রাজা! তুমি এতবড় ফাঁকিবাজ্ হয়ে উঠলে কেমন করেই বলো তো?”

নরেশ তাদের দাবী বুঝিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকিয়া চাপা বিরক্তিতে মন্দ হাস্তের মধ্যে জবাব দিলেন, “কেন, চা দিতে বলতে দেবী হয়েছে বুঝি? ওরে সাতকড়ে!—”

নলিনবিহারী নামে নরেশের এটর্নী বন্ধুটি মুখ বিকৃত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, “এইও! খবরদার! একেবারেই বোকা বোনো না! চায়ের তেষ্ঠা আর সরভাজা রাজভোগের ক্ষিধে নিষ্পেই আমরা রাজদরবারে ভোজের আর্জি পেস করাতে আসি নি হে! যে কথা আমাদের দিয়েছিলে, সেইটে রাখছো কবে, তাই এখন বলো দেখিনি, শুনি?”

নরেশ যেন একেবারে আসমান হুইতেই পড়িয়া ছই চোখ বিস্ফারিত করিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন,—“কথা দিয়েছিলুম; অথচ রাখি নি—এমন তো কিছুই আমার মনে পড়ে না! ‘জোচ্চোর’, ‘গাধা’ প্রভৃতি অনেক মিষ্টি মিষ্টি বচন তো আমার শোনালে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে ছোট্ট আইসক্রিম আর খান দুচার ক’রে খাস্তা কচুরির সঙ্গে ছানার জিলিপি খেয়ে যাও দিকিন, রাণী-সাহেবার খাস তৈরী। খাসা হয়েছে—”

সাতকড়ি হাজির ছিল, বাবুদের ভ্রম জল-খাবারের ফরমায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। হরিধন ঠাকুর্দা ডাকিয়া বলিলেন, “হাককে আমার হুকোটা ফিরিয়ে এক জিলিম দিয়ে যেতে বলে যাস বাবা!”

নলিন নরেশের বাকচাতুর্য্যে কিছুমাত্র ভুলে নাই অসন্তোষের সহিত বলিল,—“সুয়োরানীর খাস মহ তোমার খাসা রকম বজায় থাক, আমাদের সেখ কিছুমাত্র ভাগ চাইনে ভাই! ছয়োর ছয়োর এখনও যে অত ক’রে চেপে রেখে কেনই দিবে সেইটে শুধু আমাদের মতন নিরেট বোকাদের ক’ঠিন হয়ে পড়েছে, সেইটুকুই একটু বঝতে চাই এ দিকে তো খবর পাচ্চি যে, মধু-বাসর সম্পন্ন ক ফেরা অবধি এই তিন বৎসরে দুঃখিনী সুয়োরানী একেবারেই মহারাজের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখ-দর্শনও নাকি আর ভ্রমক্রমেও করা হয় না,—অথচ তাঁকেও দেবে না নরলোকের মুখদর্শন করতে। এ তো তোমার বিষম জুলুম দেখতে পাই! কিন্তু আর সেটি হচ্ছে না! আজ পাঁচ বছর ধ’রে এই যে খোসামোদ ক’রে ক’রে মরচি, একটি দিনের জন্তও যদি অঙ্গুরীর গলার একটা গানও শোনাতে, তা হ’লেও নয় বোকা যেত যে, কথার তোমার কিছু ঠিক আছে, আরে ছোঃ!”

ননীবাবু নলিনকে চোখ টিপিয়া নিজেই তার হইয়া দরবার করিতে আসিল,—“আঃ থামো না নলিন! অত বাস্ত কেন? আমার ছাত্রীর গান শোনবার জন্তে তুমি অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়েছ বটে; তা সুবিধে হ’লেই রাজা তোমায় কি আর না শোনাবেন? সত্যি রাজা! অত ক’রেই যে সুখমাকে সঙ্গীত বিছোটা আমরা শেখালুম, তা সে যদি এমনি ক’রে সব ছেড়েই দেয়, তা হ’লে অনর্থকই উভয়তঃ এতটা পরিশ্রম ক’রে কি ফলটা হলো বল তো? আগেকার মতন কখন-সখন,—এই আমাদের ক’জন্যর মধ্যেই সে যদি একটু আধটু গাইতে টাইতে নাই পেলে, তা হ’লে তারই বা বারমাস এক-ঘেয়ে বন্দিজীবন ভাল লাগে কি ক’রে? এই তিনটে বছর তো আমি বা ঠাকুর্দা পর্য্যন্ত তার ওখানে গেলে ঢুকতে পাইনে। তা ভাই, ছেলে-মানুষের প্রতি এতটা কড়াকড়ি কি করাই তোমার উচিত?”

ঠাকুর্দা হুঁকার নলে মুখ দিয়া একমনে টানিতে টানিতে একবারটি মুখ তুলিয়া ছোট্ট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ছেলেমানুষের পক্ষে বান্ধনটা বড় বেশী কড়া হয়ে পড়েছে বই কি! অল্প একটু ঢিলে দি হয় ভাল—অ—ল্প একটু ”

নরেশ এবার ব্যথিত বিশাল চক্ষু উত্তোলনপূর্বক বৃদ্ধ সহচরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিয়া উঠিলে “আপনিও যোগ দিলেন?—”

তাহার কণ্ঠে অবিচারিতের সুদৃঢ় অভিমান ব্যক্ত
ল।

হরিধন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া গুণ্ডুন্ করিয়া
লেন,—“আরে, না’ রে, দাদা-ভাই! তা’ আমি
নি, সুখমা যে কত ভাল মেয়ে, সে আমি সবই
বই কি! তবে কি না,—তবে কি না, এতটা
যে শিখেছে;—এই তোমারই বন্ধুবান্ধবের
ছে তোমারই সাক্ষাতে ব’সে ছুটো গেয়ে শোনালে
গাতে দোষটা কি? সেই কথাই আমি বলেছি
ভাই! ওরা যে আমার শুদ্ধ খেয়ে ফেলে। বলে,
তুমি তার ওস্তাদ, তোমার কি তার উপর কোনই
দাবী-দাওয়া নেই? তা’ আমি আর কি বলবো
দাদু? তাই—”

নরেশ বন্ধুদের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া জবাব
দিলেন—“আপনি সাফ বলবেন যে তা’ আপনার
নেই—তা’ হ’লে আপনাকে আর কেউ জালাবে না।”

শুনিয়া তবুও নলিন মুখরভাবে কহিয়া উঠিল,—
“‘যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা প’ড়ে যায় নব প্রেমজালে,’
—তা’ হ’লে তাকে বিদায় দিলেই পারো। তা ব’লে
একটা নিরীহ জীবের উপর এতটা অত্যাচারও তো
সহ্য করা যায় না! বলি, আমাদের ঘরে তো আর
নুতনের আমদানী হয় নি।”

নরেশের দুই চোখ রাঙ্গা হইয়া তাঁর কপালের
শিরা সাপের মতন মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিল।
তাঁর সমস্ত শরীরেই যেন একটা প্রবল রকমের টান
পড়িয়া তাহার দুই হাতের মুঠা কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ
হইয়া উঠিল;—কিন্তু তার পরও যখন তিনি অচল
অটল হইয়া নিজের আসনেই বসিয়া রহিলেন, তখন
দেখা গেল, মনের মধ্যের একটা অদম্য উত্তেজনার
স্রোতকে সংহত করিয়া রাখিতে, তাঁহাকে তাঁর
সম্মুখে কল্পিত বিবর্ণ অধরকে দাঁত দিয়া চাপিতে
হইয়াছে।

বন্ধুদেরা পরস্পরে দৃষ্টির ইঙ্গিতে পরস্পরকে
নিজেদের হতাশার খরবটা দিয়া চুকিল। কিন্তু
একান্ত লোভাতুর নলিনবিহারীর এততেও মন মানিল
না, সে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিয়া ফেলিল
“তা হ’লে আমাদের গান শোনানোর আশা যে
য আসছিলে, সেটা শুধু ছেলে-ভুলোনের মতন
বই—”

রেশ ইহার পাদ-পূরণ করিলেন—“অলীক।”

তা হ’লে আশা পূর্ণ হবে না?”

রেশ চোখের দৃষ্টি তাঁর সাম্নাসাম্নি সোজা-
ঠিক রাখিয়া শান্তভাবে উত্তর করিলেন—“না।”

“গোড়া থেকে বলেই হতো।”

“বলেছিলুম অনেকবার, তোমরা সে কথা শুনতে
চাও কই?”

“তুমি বলেছিলে,—সে আমাদের সামনে গাইবে
না। কিন্তু ডাক্তার, ননী—এরা সব বলে যে, তুমি
হুকুম কলেই সে গাইতে পথ পাবে না। সে তোমার
নাকি ঘরের মতন ভয় করে।”

“আমি বলবো না।”

“এ সোজা কথা।”

বন্ধুরা বিদায় লইবার পূর্বে আর একটা খোঁচা
দিয়া গেল।

“ওহে রাজা! তোমার সেই জাম্বুবান মন্ত্রীটি
গেল কোথায়? শুনিছিলুম, সে না কি তোমার
বাড়ীতেই রয়েছে।”

নরেশ কহিলেন,—“আছে বই কি; তাকে যে
আমি চাকরী দিয়ে রেখেছি। খাসা ছেলে সে!”

সব ক’জনেরই চোখে-মুখে বিজ্রপের তীক্ষ্ণ হাসি
উধলিয়া উঠিল।

“কোন্ কাজে বাহাল হ’লেন, বাছাধন?”

নরেশ ভৎসনার ভাবে চোখ ফিরাইয়া অথচ মৃদু
হাসিয়া উত্তর দিলেন,—“আমার স্ত্রীর মাষ্টার ক’রে
দিচ্ছি যে তাকে।”

“তা হ’লে তো কান্নেমী বন্দোবস্তই হয়েছে! কিন্তু
দেখ’ ভাই! ছেলে মানুষ যেন অন্ধকারে ও শ্রীমূর্তি
দেখে আঁকে না ওঠেন।”

বন্ধুরা বিদায় হইলে নিতান্ত অগ্রসর মন লইয়া
নরেশ স্ত্রীর খোঁজে উপরে উঠিলেন। তাহাদের বিদ্বিষ্ট
ও বিজ্রপবাক্যই তাহার উভয় সঙ্কল্পকে অধিকতর দৃঢ়
করিয়া তুলিল।

পরিমল তখন চুল-বাঁধুনির কাছে পরিপাটী সীঁখি-
পাটী করিয়া কেশরচনা করাইতে ছিল। আশে
পাশে আয়না, চিরুণী, গন্ধ তৈল, ভিজা গামছা,
আরও কত কি ছড়ান। পিছনে বসিয়া সোনার
তাগা পরা, হাতখালি, নরুণ পেড়ে ধুতি পরা
আম্রাকালী সাতগুছির চ্যাটা বিনাইতে বিনাইতে
বাগবাজারের রায়েদের বাড়ীর বৌ-বিয়েদের মৌখী-
নত্বের শত শত উদাহরণ জমা করিয়া দিতেছিল।
পরিমল উৎকর্ণ হইয়া সে সকল মুখরোচক কাহিনী
গোত্রাসে গ্রাস করিতে করিতে মধ্য মধ্য দুই একটা
প্রশ্নও করিতেছিল; যথা—“হাঁ গা, তাদের বোঁরা
বিকেল বেলায় বার মাসই বেনারসী, বোখাই সাড়ী
এই সব প’রে থাকে? কোন দিনই কি বাদ
দেয় না?”

আম্মাকালী বলিল, “না ভাই, তারা ও সব রোজই পরে। তা’ পরবে নাই বা কেন বলো না? পরসার তো আর তাদের কমি নেই। অল্প লোকে-দের যেমন আটপোরে কলের সাজী কেনা হয় না, তেমনি তাদের যে গাদা ক’রে ক’রে ওই সবই কেনা হয়ে থাকে ভাই! তা’ তুমিও কেন বিকেল বেলা একখানি ক’রে পাতলা বেনারসী, পাসী, কি জামদানী ঢাকাই পরো না বৌদি! তোমারও তো রাজার ঐশ্বর্য্য, কিদেরই বা কোন্ অভাবটা?”

পরিমলের কাঁচা মনে এই সকল অনাস্বাদিত সুখের প্রবাহ প্রলোভনের ঘন জাল বিস্তার করিতে-ছিল। তথাপি সে ঈষৎ বিজড়িতভাবে কহিল, “আমার কি ও সব প’রে থাকলে মানায়? লোকে হয় তো হাসবে, বলবে, ‘কুঁজোর আধার চিং হয়ে শোবার সাধ’!”

প্রসাধনকারিণী অবাক হইবার অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল,—“হাঁ, হাসবে না, বলে ইয়ে করবে! কেন তুমি কি সেওড়া-গাছের পেত্নী নাকি যে, তোমার গায়ে কিছুই মানায় না? রংটাই তোমার যা শামলা। মুখের কাট টাট কেমন দিয়া! চুপিট ঝাঁপা, মুখখানিও তো তোমার আমি খামা দেখি ভাই! তা’ ভাই, বলবোই বা কি! পরসার হ’লেই তো আর রূপ কিনে আনা যায় না। বড় বড় লোকের ঘরে কটাই বা সুন্দর আছে? যত সব ধনীর ঘরে দেখবে, সবার অঙ্গেই প্রায় ধার করা রূপ, সাবানে-পাউডারে, বিলিতি-রং খড়ির গুঁড়ো, সুরমা, তুরু আঁকবার পেন্সিলের টানে—আর হীরে-মতি-জরি-সিলিক, তার উপরে ইলেক্টি-কের আলোর ঝিলিক আছে। তুমিও ভাই দেখ না, আমার হাতে যখন পড়েছ, ছ’মাসের মধ্যে তোমার গৌরবর্ণ না ক’রে কি আর ছাড়বো মনে করেচ? ওই আপটানটি ভাই! কিন্তু ছুটিবেলা ভাল ক’রে লাগানো চাই। তোমার ও সাবান ফাবানের শুধু কল্ম নয়—”

এমন সময় অনুরূপা দাসী আসিয়া খবর দিল, “রাজাবাবু শীগগির ক’রে একবার আপনারে ডাকতেছেন।—”

ছই দিকে ছইটা বিলুনি কুলাইয়া অসমাপ্ত বেশ-ভূষায় পরিমল স্বামি-সন্দর্শনে ছুটিল। মন অবশ্য এই অ-প্রস্তুত অবস্থায় দেখা দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিল বই কি। ‘আহা, সেই আসিলেনই যদি, আর একটু পরে আসিলেই যে বেশ হইত।’

নরেশ বেশী কিছু ভূমিকা না করিয়াই সোজা

কথায় বলিয়া গেলেন, “দেখ পরি। মিসেস্ বসু কাছে পড়া-শোনা তোমার তেমন তো কিছু এগুচ্ছে না, তাই ভাবছি, তাঁর বদলে যদি এক হ মাষ্টার ঠিক করা যায় তো কেমন হয়?”

পরিমল তার বিলুনি-শুদ্ধ মাথাটি সবেগে ন দিয়া ঠোট ফুলাইয়া জবাব দিল, “একটুও ভাল হয় কেন, মিসেস্ বসু তোমার কি করলেন শু’ নরেশ হাসিয়া কহিলেন,—“ভয়ে কবো, নির্ভয়ে?”

“তা নির্ভয়েই বলতে পারো।”

“তিনি আমার পাড়া-গাঁয়ের নিরাড়ম্বর সাদা-সিঁদে পরিমলকে সহরের ‘ডানা কাটা’ পরীদের পাশে দাঁড় করাবার বন্দোবস্ত আছেন,—এ ভিন্ন আর কিছুই নয়।”

পরিমল বেণী কুলাইয়া বাঁকা চোখে অভিমানের বাণ হানিল,—“ডানাকাটা পরী’ যদি আমি হ’তে পারতুম, তা হ’লে কি না ওই সব খোঁটা আমার তুমি দিতে পারতে? কি আমি করেছি বাপু? ভাল ভাল সাজী, জ্যাকেট গহনাপত্র অত অত সব আমার কিনে দাও কেন? না দিলে তো আর আমি পরতে যেতুম না।”

নরেশ সস্ত্রিতমুখে তার নাকটি ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন,—“আমার কাজ আমি করি, তোমার কাজ তুমি করিলেই পারো। যাক, ও সব কথা নয়।—তুমি জানো লেখা-পড়া শেখাটা আমার পছন্দ। শুধু বিলিতি বিবিদের বেশভূষাকেই অনুকরণ করলে চলবে না তো, তাদের সদৃশ্য লিও সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। তা’ ভিন্ন আমাদের দেশের মেয়েরাও কস্মিন্‌কালে মূর্থ থাকতেন না। বই পড়া কম থাক-লেও এবং না থাকলেও মৌখিক ও দৃষ্টান্তের শিক্ষা সেকালের মেয়েদের অপব্যাপ্তই ছিল। তোমরা ঘরের বাইরের সবই ত্যাগ করচো, শিখে নিচো শুধু বিলিতি বিলাস সুখটুকুই। তা করো না, বড় আশা ক’রে তোমায় নিয়েছি যে, আমার সন্তানেরা যেন নির্মল ও নিখুঁত মা পায়, তাদের তা পেতে দিও, পরি!”

পরিমল মুখটা খুবই প্রসন্ন করিতে পারিল না।

নরেশ আবার বলিলেন,—“যা হোক, আ’ বলতে এসেছি সেটা শুনে নাও; নিরঞ্জন কাজের জন্ত বড়ই ব্যস্ত করচে। তারই যদি তুমি খানিকটা ক’রে পড়ো, সে মন্দ হ বেচারী ভারি ভদ্রলোক। লেখা পড়াও জানে এক রকম।—”

পরিমল ঘোরতর অপছন্দের সঙ্গে প্রবল বেগে ত্রি তুলিয়া বাক্য সমাপ্তির পূর্বেই বাধা দিল—
কি তুমি, ওই মুখ-পোড়াটার কাছে আমার হবে? কক্ষোনা না, কক্ষোনা না।—ওর আমি কিছুতেই পড়ব না। মা গো! ওটা কে মানুষ, তারই যে কিছু ঠিক নেই।”

টা প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাস নরেশের সমস্ত রক্ত ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। আরক্ত মুখে তিনি সববেগে বলিয়া উঠিলেন,—“পরিমল! ও কথা দিয়ে বলতে তোমার লজ্জা হলো না? কেমন ক’রে বললে তুমি? এই তোমার উপরে আমার ভবিষ্যৎ বংশের জন্ত আমার উচ্চ আশা পোষণ করতে হয়েছে! যাকে আজ অত যুগা দেখালে, কেমন ক’রে জানলে যে, সেই লোক এক দিন খুবই সুপুরুষ ছিল না? তোমাদের মতন রূপযোবন-গর্বিতা সুন্দরীদের কারকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েই যে ওর ও দশা হয় নি, তাই কি তুমি জোর ক’রে কিছু বলতে পার? সে হবে না—ওরই কাছে তোমার পড়তে হবে।—কাদছো, কান্নায় শুধু অত্মায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।.....”

বন্ধুদের ব্যবহারে পূর্বাবধিই যে বিরক্তি মনের মধ্যে এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল, দ্বিতীয় সংঘর্ষে তাহা স্ফুটিত করিয়া ফেলিয়া, অসন্তোষের কালিমাচ্ছন্ন গাট ও গভীর মুখ লইয়া নরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ হান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এখনও, এখনও মন সে নায়ে শিহরে কেন?
—অশ্রমতী।

সেই নকল করা কাগজ ক’খানি হাতে করিয়া নরঞ্জন যখন নরেশচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁহার পাঠ্য-বরের দ্বারদেশ হইতে গৃহোত্থানের সবুজ ঘাসওয়ালা পীর ধার পর্যন্ত পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাকে যেন কোন নূতন মানুষ বলিয়াই ভ্রম পারিত। বাহিরের চেহারা অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কোন উপায়ই ছিল না, মুখের একটা দিক ক্ষতচিহ্নে প্রায় গহ্বরবের মতই গভীর হইয়া সে দিকের রংটাও যেন কালির মত কালো, টুকুও বসন্ত-ক্ষতের হস্তে এমনই নিশ্চয়ভাবে রিত যে, সেখানে নাক-চোক প্রভৃতি আর

৫ম (খ) ২৫

যে কিছু আছে, তাও ঠাहर করিয়া বুঝিতে হয়।—
কিন্তু কি আশ্চর্য্য বদলাইয়া গিয়াছিল তাহার ভিতরটা! প্রসন্ন স্মিতহাস্তে সমস্ত মুখখানা তাহার যেন বৈশাখী ঝড়ের শেষে চাঁদের আলোর রেখাটুকুর মতই স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। মুচ্ছাতুর অন্তরের সমুদায় নিদ্রিত বৃত্তিগুলি সহসা যেন কার বাতাসটির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত আনন্দে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, “তবে তো আমরা মরি নাই রে, মরি নাই!”

নরেশ ঘোর অসন্তুষ্ট মনে নীচে নামিয়া আসিতেই নিরঞ্জনের হাতের বাঙালটার উপর নজর পড়িয়া গেল।—

“কি, পেরে উঠলে না বোধ হয়? সে তো আমি তোমায় গোড়াগুড়িই ব’লে দিয়েছিলুম”—বলিতে বলিতেই তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উত্তোষ করিলেন। মনটা তাঁহার প্রথম দফায় বন্ধুবর্গ ও দ্বিতীয় দফে জীর উপর বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই উভয় মনোবাদের প্রধানতম ও মূলীভূত কারণ নিরঞ্জনকেও তাই বেশ মধুর মনে হইল না।

কিন্তু নিরঞ্জন বেচারা সে কথা বুঝিবে কেমন করিয়া, সে নিজের মনের গভীর আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া একমুখ হাসির সহিত কথা কহিয়া উঠিল; বলিল—“পারবো না কেন? আপনার লেখা তা ব’লে অতদূর মন্দ নয়।” এই বলিয়া সে অতি সুন্দর ছাঁদে লেখা কয়েকখানি কোণগাঁথা কাগজ নরেশচন্দ্রের দিকে বাড়াইয়া দিল।

সেই লেখাটার উপর নজর পড়িতেই নরেশচন্দ্র যেন আকস্মিক দণ্ডাহতের মতন চমকাইয়া উঠিলেন। এ লেখা!—এ কি তাঁহার পরিচিত?—বড় পরিচিত নয় কি? ছুই মুহূর্তেরও অধিককাল স্তব্ধ বিস্মিত ছুই নেত্র স্থির করিয়া তিনি সেই কাগজগুলার উপর চাহিয়া রহিলেন। এ লেখা কা’র? কোঁন পুরাতন দিনের সুখ-স্মৃতি জালে জড়িত হইয়া এর প্রত্যেকটি অক্ষরের ছবি তাঁহার মনোদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ যাহার প্রতিবিম্ব, তাহার আসল রূপটুকু কোথায়? কা’র হস্তাক্ষর এ? এত পরিচিত, এত আপনার বলিয়া যাহাকে দেখিয়া চন্দ্রোদয়ে স্মৃতিবন্ধ জলধিবৎ অন্তর তাঁহার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে, সে কা’র হাতের লেখা?—কিছুই স্মরণে আসিল না।

মুখ তুলিতেই একটি সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল। নরেশের দৃষ্টি গভীর এবং অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কই, না, এ মুখ, এ যে

তাঁহার চিরদিনেরই অচেনা। অন্তরের কোণে কানাচে খুঁজিয়া কোথাও তো এর ছায়াটুকুও ভাসিয়া থাকিতে দেখা গেল না! তবে এই হাতেরই লেখা এমন পরিচিত সন্দেহ হয় কিসে? শুধুই এটা অমূলক সংশয়ই নয় কি? না এর ভিত্তি-মূল কোথাও কোন গভীর গহ্বরে নিহিত আছে? কিছুক্ষণ চিন্তাকুল অস্থিতচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে হাল-ছাড়াভাবে নরেশচন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টির আঘাতে বিপর্যায় নিরঞ্জন উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার তাহারই হস্তাক্ষরযুক্ত কাগজখানা দেখিলেন। তার পর হঠাৎ অসাধ্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক সহজভাবে অবলম্বন করিয়াই সপ্রশংস ও সন্মিতমুখে কহিয়া উঠিলেন, “বাঃ বাঃ! ভারি সুন্দর তো হে, তোমার হাতের লেখাটি! আমার সেই কাকের ছানা বকের ছানাগুলি যেন মন্থপূত হয়ে নূতন জন্মলাভ করেছে দেখছি যে!”

নিরঞ্জন সঙ্গীত-সলজ্জহাস্তে দৃষ্টি নামাইয়া কুণ্ঠিত বিনয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিছু কি কপি করবার আছে?”

নরেশ তাঁহার আগ্রহে অকস্মাৎ অত্যধিক উৎসাহিত হইয়াই উঠিলেন,—“কপি করবার সাধ যদি তোমার এতেও না মিটে থাকে নিরঞ্জন, তা হ’লে ভাই তোমার কাছে কি কৃতজ্ঞই যে হয়ে থাকবে ঐ ‘কর্ণধার’ প্রেসের কম্পোজিটারের দল, সে আর তোমায় কি বলবো! আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও না হয়ে উপায়ই নেই। যেহেতু ওদের কাছে গাল খেতে খেতে আমি দিনের মধ্যে কতবারই যে বিষম লেগে মরি। তার ওপরেও আবার আমায় দেখতে পেলেই ম্যানেজার মশাই ভীষণ তাড়া ক’রে আসেন। প্রফ দেখা,—সেও একটা মহামারী ব্যাপার; নিজের লেখা,—সে কি ছাই নিজেই বুঝতে পারি? সাধ ক’রে কি আর এর আর এক রকমের ভয়-ভাবনার আতঙ্কিত হয়ে রবিবাবু বলেছেন,—

“অনেক লেখার অনেক পাতক,

সে মহাপাপ করবো মোচন,

আমায় হয় তো করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।”

কিন্তু সে তবুও বরং পদে আছে, নিজের লেখার প্রফ তার চেয়েও যে ঢের বেশী শক্ত, সে হয় তো তাঁদের জানা নেই।—বলিয়াই নরেশচন্দ্র হো হো করিয়া ঞাণ-খোলা হাসি হাসিয়া ফেলিলেন।

নিরঞ্জন বলিল, “তা ব’লে আপনার হস্তাক্ষর অত

কদর্য নয়; বাই হোক, যখনই দরকার হবে, আমি আপনার লেখা দেবো; ‘ফেরার’ ক’রে দেবো—

নরেশচন্দ্র অকস্মাৎ হাসি বন্ধ করিয়া ঈষৎ গ হইয়া উঠিলেন, “নিরঞ্জন! তুমি ইংরেজীও জানো, না? ও কি চুপ ক’রে থাকলে বেলো না ভাই, ক্ষতি কি তাতে? আমি দেখি দিন তুমি লাইব্রেরী-ঘরে ব’সে একটা কালো বাধা কি বই পড়ছিলে, সে বইটা হয় ডিবে, কোন নভেল, কিম্বা বায়রণের কিছু।”

নিরঞ্জন তাহার নত মুখখানা চকিতে তুলি চাহিল। তাহার সে মুখে যেন আর রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। শ্রান ও শুভ্র অধর তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত অত্যন্ত ব্যথিত বেদনায় আর্ন্তচোখে চাহিয়া থাকিয়া পরিশেষে সে যেন অক্ষুট বিলাপের ভাষায় কহিয়া উঠিল, “কি জানি, কেন, আবার ওই সব জন্মান্তরের স্মৃতিগুলো আমার মাথার মধ্যে এসে জড়ো হচ্ছে! মনে করে-ছিলুম, সবই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; কিন্তু তবু করচে, তা বোধ করি বা যায় নি—যায় নি—উঃ!—” বলিয়াই সে এমন জোর করিয়া কপালটা টিপিয়া ধরিল ও স্থলিত পদে পাশের দেওয়ালে দেহের ভর রাখিল যে, নরেশের বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে আর কিছুই বাকি থাকিল না যে, পূর্বস্মৃতির মতন জালা ময় এ লোকটির কাছে যেন তার সেই মুমূর্ষু নিঃসহ অবস্থাটাও নয়। এইটেকেই সে যেন সব চেয়ে বে এড়াইয়া চলিতে চাহে বলিয়াই নিভেকে শিক্ষা সম্প্রদায়ের সকল সম্বন্ধ হইতে উপড়াইয়া লইয়া একেবারে রাস্তার ড্রেনের ধারে ঠেগিয়া ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। উঃ, না জানি কি সে ভীষণ অতীত—স্মৃতির মধ্যে যার এমন দহনশীলতা!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে,

রূপ না দিলে যদি বিধি তে

পূজার তরে হিয়া, উঠে যে উথলিয়া,

পূজিব তারে গিয়া কি দি

—মা

বিবাহিত জীবনের এই কয়টা বৎসরে পরিচয় পরিমল পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহা আর যতই যা থাক, একটা প্রচণ্ড জিদ যে।

দন্দেহরূপেই সে জানিয়াছে। স্বামী তাহার দন্দ ভোলানাথ, কিন্তু একটুখানি অবাধ্যতার তাঁর সেই সদাশিব রূপে পরিবর্তিত হইয়া তে দেখা যায়। স্বামীর অসঙ্গত খামখেয়ালোর মনে করিয়া পরিমলের মনটা অত্যন্ত উত্থাপিত। তাহার মন বিদ্রোহ করিয়া বলিল, সকল ইচ্ছা ও সকল কাজের উপর দখল—এ যে বিষম অত্যাচার! উচিতের দিক্ দিয়া এই দাবী করা যাক্ না কেন, মানুষ নিজেকে কোন অবস্থাতেই এমন ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না যে, আর এক জনের প্রত্যেক খুঁটিমাটির সকল আদেশকেই সে তার নিজের করিয়া লইতে পারে। অন্ততঃ হাসিমুখে যে পারে না, সেটা সে নিজেকে দিয়াই বুঝিত। নতুবা জুলুমের ভয়ে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে প্রবল পক্ষের প্রচণ্ড ইচ্ছাস্রোতে মগ্ন করা,—সে তো সংসারশুদ্ধ লোকে বাধ্য হইয়াই করিতেছে। পরিমল রাগ করিয়া অনেকক্ষণ বিছানার বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিল। অভিমান করিয়া মনে মনে আহত হইয়া ভাবিল, লোকে যে বলে সমানে সমানে না পড়লে কোন পক্ষেরই ঠিক মান থাকে না, তা ঠিকই। আমি গরীব, অনাথা ব'লেই আমার উপর উনি কল তা'তেই জ্বরদস্তি চালান। হতুম আমি গবাজারের রাগেদের মেয়ে কি চৌ-গাঁয়ের জমীদার-দের কেউ, তা হ'লে কখনই আমার উপর এতটা উনিচ্ছালাতে পারতেন না। আমি দুঃখী, যার কেউ কোথাও নেই, মনে কষ্ট হ'লে যে এক-দল বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখাব, তারও আমার উপায়টুকু যে নেই, সে জানেন কি না, তাই না আমার সব কিছুতেই বাধ্য করতে সাহস করেন!”

পরিমলের দুঃখ যেন বুক তার ছাপাইয়া উঠিতে গেল। তার পর মুখ তুলিতেই হঠাৎ নজর পড়িল, গাঁহার খাটের সাম্নাসাম্নে রক্ষিত কাপড়ের আল-রিটার আয়না আঁটা কবাটের উপর। তুচ্ছোখ জলের উপর আরও খানিকটা জলের আমদানী দিয়া সে সবেগে মুখখানা ফিরাইয়া লইল। তাই এই শরীরে তার খুব খানিকটা রূপই আছে! বিধাতার পরম করুণার দান,—পার্থিব কোন বিনিময়ে যেটা ক্রয় করিবার উপায় নাই ত কত ধনা গৃহের বিলাসী মেয়েরা অসাধ্য রাধনায় সারাজন্ম ধরিয়া লাগিয়া আছেন ন্যে সফল প্রযত্ন হইতে না পারায় ভাগ্য ও ভাগ্যকে মনে মনে অভিষাপ দিতেও ত্রুটি না,—পরিমলও সেই বস্তুটার অভাব

আজ যেন বড় বেশী করিয়াই নিজের মধ্যে অনুভব করিল। এতদিন নিজের রূপহীনতার কথা মনে করিবার অবসরটুকুও তাহার ঘটে নাই বলিয়াই বোধ করি সে কথা তাহার মনে ছিল না। বরং ভোগে ও স্বাস্থ্যে যে দরিদ্র-জীবনের অপরিজ্ঞাত সৌন্দর্য্য সে তাহার এই নবযৌবনোদ্ভাসিত নবজীবনে লাভ করিয়া-ছিল, তাহাই ছিল এতদিন তাহার কাছে পরমাস্বর্ঘ্যের মতই পরম বিস্ময়কর। কিন্তু আজ সে দিক্ দিয়া নহে, আর একটা দিক্ হইতে—অতিরিক্ত পাওয়ার গুরু বোঝার ভারটা যখন মাথার উপর বড় বিষম বলিয়া ঠেকিতে ছিল, তখন নিঃস্ব দেনদার চারিদিকে হাতড়াইয়া ঋণশোধের একটা সিকি পরসা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া না পাইয়া ধনীর ঘরের লোহার সিন্দূকের দিকে তাকাইয়া মনের মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তার উপর স্বামীর চাইতেও বড় বেশী অভিমানী হইয়া উঠিল। সে এই বলিয়া তাঁহার দরবারে নালিশ রুজু করিয়া দিল যে, বড় লোকের মেয়ে, ধানের মা আছে, বাপ আছে, মা বাপের রাশিকরা টাকা আছে, তারা কালো কুৎসিত হইলেও তাদের ভাল ঘরে-বরে পড়িতে এতটুকুও আটকায় না যখন, তখন অনর্থক ও অ-দরকারে তাহাদের বাড়ি বাড়ার ভাগ—রূপের বোঝাগুলা না চাপাইয়া সেগুলো আমাদের মতন অধম, অক্ষম ও অভাগা জীবদের জন্য রাখা কি চলিত না? স্বামী যেমন দয়া করিয়া আমার পথের পাশ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছেন, তা আমার যদি একটুখানি রূপও এই দেহের মধ্যে থাকিত, তো না হয় তাই দেখিয়াই মনে মনে একটু গুমোরও রাখিতে পারিতাম যে, এই দেখিয়াই হয় তো তিনি আমার নিজের করিতে পারিয়াছেন। তাঁর এই অগাধ দয়ার মূল্যে নিঃস্বত্ব-ভাবে বিকাইয়া যাওয়া হইতে হয় তো বা তাহাতে আমি একটুখানিও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম! তিনি অত দিলেন,—একেবারেই যে সমুদয়টুকুই নিঃস্বত্ব-ভাবে দিয়া ফেলিলেন, এর বদলে যে এতটুকু একটু কিছুও ফেরৎ পাইলেন না, এইখানেই যে মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগে। এইখানেই যে এই বিনামূল্যের কেনা বাদীরও অযোগ্য যে, সে তাঁর দয়ার দামে বিকাইয়া যায়।—তাই অভিমান উথলানো বুকে পরিমল মনে মনে ভাবিল, যার জোরে পরাজিত দৈত্যের মেয়ে শচীদেবী ইন্দ্রের পাশে মাথা উঁচু ক'রেই বসতে পেরেছিলেন, মৎস্যগন্ধা জেলের মেয়ে ভারত সম্রাটের মহিষী হ'তে লজ্জা পাননি, সেই রূপ থাকলেও তো আমার একটুখানি মনের ইজ্জতও থাকত। আমার যে একেবারেই দয়া! দেবার তো আমার এতটুকু

কিছুই নেই, কেবল বোঝা বেঁধে নেওয়া মাত্র, মান এতে থাকবেই বা কিসে ?—

রাগের মাথায় সে নরেশচন্দ্রের উদ্ভট দারিদ্র্য-প্রেমকে মনে মনে ষণ্ডপরোনাঙ্কি অপভাষা প্রয়োগ করিল। এমন কি, অন্নদা দাসী, তাহার চুল বাঁধা যে তখনও সমাধা হইয়া উঠে নাই—এই বিস্মৃত সংবাদটা জানাটো আসিলে, তাহারই সহিত সে এ বিষয়ে আলাপ করিতে বসিয়া জোর করিয়া বলিল, “তা ব’লে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি রকমের ‘ভাল’ হওয়াও মানুষের পক্ষে ভাল নয়। যা’ রয় সয়, সকল বিষয়ে সেই মতন চলাই সম্ভব। গরীবকে দয়া দেখাতে হবে ব’লেই কি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে হবে নাকি ?”

অন্নদার সহিত যে তাহার মনিব-পত্নীর মতের এমন সামঞ্জস্যও আছে, ঘৃণাকরেও এ সংবাদটা জানা থাকিলে আর সে বেচারী ইহার সম্বন্ধে বোধ করি পড়সীর বাড়ী বাড়ী গিয়া অনর্থক দশকথা প্রচার না করিয়া বেড়াইয়া তাহার সহিতই উহাদের সম্বন্ধীয় দু’চারটা মুখরোচক আলোচনা ঘরে বসিয়াই চালাইতে পারিত। পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সে হাতমুখ নাড়িয়া মনিব-পত্নীর স্বপক্ষ সম্পূর্ণ সমর্থন-পূর্বক সোৎসাহে কাহিয়া উঠিল, “ও মা, তা’ আর বলতে রাগীমা! রাজাবাবুর আমাদের পছন্দর ছিরিই যদি থাকবে, তা’ হ’লে আর আমাদের ভাবনাটাই বা কি? এই দেখ না, কত কত রাজা জমীদার হেঁটে হেঁটে তাদের পায়ে বাঁধন ছিঁড়ে ফেললে, তা’ তানাদের পরী পরী সব মেয়ে ফেলে উনি কি না কোন পাড়াগাঁয়—মরুকগে, মুখে আগুন লাগুক আমার! ওমা, কি কথা বলতে কি বসি দেখ একবার! এই জন্তই বলে গো, বুড়ো হ’লে বাহাতুরে ধ’রে যায়। কিছু মনে নিও না মা! কার সামনে যে কি কথা হচ্ছে, তোমার দিবি মা; একেবারে নিজস্ব ভুলে গেছি! ঠাও বাছা! এখন চুলটো ফিরিয়ে ঠাওসে, অবলার মা আটকে রয়েছে, তাকে আবার পাঁচ বাড়ী তো ঘুরতে হবে।”

পরিমল ঢিলটি মারিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটকেলটি খাইল এবং খাইয়াই সেটুকু সে তৎক্ষণাৎ বুলিল।

আশ্চর্য! এ’ও আবার মানুষকে কানে ধরিয়া গালে চড় মারিয়া মনে পড়াইয়া দিতে হয়? ‘রাজাবাবুর যদি পছন্দর শ্রীই থাকিবে, তবে বাগবাজারের চন্দ্রায়ের সেজ মেয়ে সুন্দরী সাগরিকা, অথবা চৌগায়ের রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়ে সুখলালিতা

সুখলালতা আজ রাজা নরেশচন্দ্রের রাণী হইয়া এই পথে কুড়ান কুরুপা পরিমল এই আদখল লইল কেন? আজ একটা বসন্তকর্ত-কদাকার ভিখারীর প্রতি সমাদরকে সে যে চক্ষে দেখিতেছে, তাহাকে সে আদর দেখা বলিয়া তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করায় রাগে অভিমানে অভিভূতা হইয়া রহিয়াছে। শত শত ধনী মানী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যা সকলকে তুচ্ছ করিয়া দি নির্বান্ধব এবং এমন কি, পূর্ণ যৌবনে অশন-বসনে অভাবে পরাশ্রিতা, অপরিচিতা এই যুবতীকে আপনি ঘাচিয়া বিবাহ করিয়া এই ধনীর ছলল তাহাকে যে দিন ঘরে তুলিলেন, সে দিন তাঁর পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকার অধরে ও নেত্রপ্রান্তে কি ঘৃণা-তাচ্ছিল্যের হাসি—কি ক্রোধাভাষই না ব্যক্ত হইয়াছিল!—তা, সে কি তা জানেই না? মূর্খ, তাতে পাড়াগাঁয়ে মেয়ে হইলেও এই অপরিচিত ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যময় নগর-নিবাসে, এই খেতাবী রাজার রাজ-প্রাসাদে আনীতা হইবার পর হইতেই পদে পদে যে সেটাকে সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। যখন আসিয়াছিল, এ বাড়ীর দাসী-চাকরদের শুদ্ধ নাকি তাহাকে ও তাহার আচার-ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণালজ্জায়, ধরনীগর্ভ প্রবেশেচ্ছা জন্মিতে ছাড়ে নাই, তা অস্ত্রে পরে কা কথা! তার নিজের সংসারে আত্মী জন বেশী নাই। বৌ-ভাত উপলক্ষে দেশের বাড়ী হইতে সংশাস্ত্রী ও তাঁর মেয়ে অলকানন্দা এই দুজন মা’লোক এখানে আসিয়াছিলেন। সংমা হইয়াও কে তিনি নরুর পাশে অমন বউ সহ করিতে পারেন নাই, এটাও অকৃত্রিম সত্য সংবাদ। তিনিও নাকি গরীবেরই মেয়ে। চেলি-চন্দন ও ফুলের মালায় সাজাইয়া তাঁর গরীব বাপ তাহাকে লক্ষপতি গিরীশচন্দ্রের পঞ্চান বৎসর বয়সের সময় তাঁর হাতে সম্প্রদান করেন। কিন্তু এক হিসাবে যে সেই নিঃস্ব গরীবের মেয়ে অনেক ধনাঢ্য কন্যাকে লজ্জা দিয়া দেশের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, সে তাঁর অনবত্ত সৌন্দর্যের জোরে। সেই জিনিষটারই পরিমলের বিশেষ অভাব ঘটিয়া গিয়াছে। ধনীর মেয়ে না হইয়াও যিনি রাজার মেয়ের নিজের আনমিত রূপের গোরবে, উচ্চ গ্রীবা কটাক্ষে, মাটির জগৎকে তাচ্ছিল্যভরে চাহিয়া অভ্যস্ত, তাঁরও কঠিন নেত্রের অবজ্ঞাসূচক এই নিঃস্ব ভিখারিণী পরিমল ঘৃণা-লজ্জায় পমাটিতে মিশিতে চাহিয়াছে। সে সব কথা

বুঝে আজ তাহার মনের বুকে ফুটিয়া থাকা কাঁটার : আবার খচ খচ করিয়া উঠিল। সেই সময়কার দিনের মাতা-পুত্রের আলাপ দৈবাৎ তার কানে সেই কথা কয়টা ব্যথার উপর তীক্ষ্ণ-প্রলেপের র মতই স্থতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। তাহার ক ডাকাইয়া তাঁর প্রায় সমবয়সী বিমাতা পদ্মাবতী গ করিয়া বলিলেন, “দেশে থেকেই শুনেছিলাম তুমি এক চাটগৈয়ে ধেড়ে মেয়ে কুড়িয়ে এনে তবড় মিত্রির বাড়ীর বউ ক’রে দিচ্চো। কিন্তু তখন ষ্প্রেও ভাবি নি যে, সে মেয়ের রূপের দিকটাতেও এমন কালিঢালা। এ কেলেঙ্কারী করার চাইতে তুমি এত দিন বিয়ে করবে না ব’লে যে পথ নিয়ে চলছিলে—সেও যে ছিল ভাল। সে তবু না হয় বোঝা যায়, এ যে একেবারেই দুর্কোধ্য!”

নরেশচন্দ্র এই ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি-মাত্র বর্ণও ব্যবহার করেন নাই।

সে দিনে কৃতজ্ঞতার মাত্রাটা এত বড়ই হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাতে তাহার মনকে ধাক্কা দিতে পারে নাই। কিন্তু আজ এই গোপনীয় কথার সবটুকুই যখন জানা-শুনা হইয়া গিয়াছে, তখন এত বড় অবমাননা-জনক তুলনাটা স্বরণে আনিয়া এবং এই লজ্জাকর অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বামীর মৌনভাবে সন্তলক্ষণ বোধে তাহার বুকের মধ্যে অভিমানের হুমুল তরঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাঃ—ঠিক তথ্যই ঐ অন্নদা বলিয়াছে। নরেশচন্দ্রের প্রবৃত্তিই—দি নিয়াভিমুখী না হইবে, তবে সেই বা আজ এই ঐশ্বর্য্য-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত কেন? রাগ করিবার কিছুই তো নাই। বা সত্য, তা অস্বীকার করিলেও সে মিথ্যা হয় না।

পরিমল নেহাৎই গরীব-ঘরের মেয়ে। আবার শুধুই যে সে দরিদ্রকন্না। তাহাই যথেষ্ট নয়, এ সংসারে আত্মজন বলিতে তাহার কোন দিক দিয়া কোন বালাই ছিল না। তার উপর বাস তাহাদের সে এক কোন্ সুদূর পূর্ববঙ্গের অজ পাড়ার গায়ে। মলিকাতা সহরনিবাসী আধুনিক সভ্যতা ও নব্য কাপ্রাপ্ত অতুল ধনসম্পত্তির অপ্রতিহত অধিকারী গাবধারী ‘রাজা’ নরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পত্নী-লাভ করিবার মত কোনই সুযোগ বা সামর্থ্য যে একে বিধাতা বা মানুষ যে দান করে নাই, একেবারে অবিসম্বাদী সত্য! তথাপি যে যখনও ঘটয়া গেল, এর জন্ত ভদ্র-ইতর-ংঘে সকলেই খামখেয়ালী বিশ্বনিস্তা এবং সৃষ্টিছাড়া-সৃষ্টিকরা তদপেক্ষাও খামখেয়ালী

নরেশচন্দ্রকেই দায়ী করিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিত।

তা সামাজিক পদমর্যাদা বা ধনরাশি-মণ্ডিত পিতামাতা না হয় না-ই থাক, শিক্ষিত সমাজে স্থানলাভের যোগ্য শিক্ষা-দীক্ষাই কি ছাই তাহার কিছুমাত্রও ছিল? বিদ্যার মধ্যে বাঙ্গালী ভাষার অক্ষরপরিচয়টুকু অবশ্য ঘটয়াছিল, আর বুদ্ধির মধ্যে ভাত, ডাল ও দু তিনটা সাধারণ ব্যঞ্জন রান্নায় যতটুকু খরচ হয়, সেই পর্য্যন্তই। তার পর রূপ,—তা সে। তাহার নিজের দিক হইতে বেশ স্পষ্ট করিয়া জানা নাই। কারণ, সে যে বাড়ীর মেয়ে এবং যে সমাজের মানুষ, সেখানে আয়না ধরিয়া বসিয়া নিজের রূপের পরিমাপ করার সুবিধা বা প্রয়োজনই ছিল না। মা ছিলেন, স্নানের পর দিনান্তে একবার করিয়া চুলটা তিনি মোটা চিক্রণীতে আঁচড়াইয়া একটা আঁটসাঁট শক্ত খোঁপায় বাঁধিয়া দিতেন। শেষের দিকে যখন তাহার রাজা-স্বামীর দৃষ্টি সে আকর্ষণ করে, সে সময়টার মা ছাড়িয়া রক্তসম্বন্ধে সম্বন্ধ কোন প্রাণীর সহিতই তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধের পাঠই উঠিয়া গিয়াছিল এবং বাহিরের বা অন্তরের অবস্থাও তাহার পক্ষে এমনই প্রতিকূল যে, স্বভাবতঃই নারীর সর্বপ্রধান প্রযত্নের ধন যে সৌন্দর্য্য, তাহাকে রক্ষার চেষ্টা তো নহেই, পরন্তু সর্বপ্রযত্নে উহারই ধ্বংসকামনাই তাহার চিত্তে তখন প্রবলতর। কাজেকাজেই তাহার প্রতি এই সুখসৌভাগ্য-সেবিত কমলা-বাণীর বরপুত্রটির যে আকর্ষণ, ইহার ভিতর রূপজ মোহের এতটুকু কণামাত্রও যে স্থান ছিল না, এই কথাটা জোর-গলাতেই বলা যায় এবং গুণগ্রাহিতারও কোন প্রমাণ সে সময়ে তো অন্ততঃ পাওয়া যায় নাই। কাজে কাজেই সেই সুদূর চট্টগ্রামের অশিক্ষিতা অত্যন্ত সাধারণ চেহারার দরিদ্রকন্না—তাহাতে একান্তই অসহায় অনাথাকে গ্রহণ করায় এ পক্ষ হইতে কাহারও কোন সহায়তা লওয়া হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কেহ কেহ বলে নাকি, শুদ্ধমাত্র প্রবল অল্পকম্পা ও উদারতাই নরেশ-চন্দ্রের পত্নীনির্বাচনের ঘটক হইয়াছিল, আবার কাহারও কাহারও মতে নরেশের ঘাড়ে ভূতে ভর করিয়া তাহাকে এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। পরিণত যৌবনে অসহায় নারীর যে সকল আপদ ঘটা অবশ্যস্বাবী, তাহারই বিড়ম্বনায় সে সময়ে এই পর-গৃহবাসিনী পূর্ণযৌবনা মেয়েটি একান্তই বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। মা-মরার পর তাহার পূর্বকার সকল ব্যবস্থাই কোন্ একটা দৈব

দুর্বিপাকবশতঃ একেবারেই আগাগোড়া কাঁচিয়া যায়। যে নিরাপদ নীড়ে সে বাসা বাঁধিবার কল্পনা বহুদিন হইতেই তাহার সমস্ত অস্তঃকরণ দিয়া করিয়া আসিয়াছে, আকস্মিক একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের ঝাপ্টা আসিয়া তাহার সেই আশাতরীখানাকে হঠাৎ মাঝ-দরিয়ার মাঝখানেই বানচাল করিয়া দেয়। তার পর এই নিরালস্য জীবন লইয়া সে অকূল-সাগরের ঢেউ খাইয়া খাইয়া ভাসিয়া বেড়াই-তেছিল, কূল কোথাও পায় নাই। গ্রামের তাহার নূতন বাসিন্দা, পুরাতন সুবাদ কাহারও সহিত ছিল না, আর থাকিলেও হিন্দুঘরের আইবুড় ধাড়ী মেয়ে যে কোন ভদ্রলোকে গলায় বুলাইবে, ততটা উদারতা পল্লীগ্রামে যখন ছিল—সে অতীত যুগের কথা। কাজেই পরিমল শ্রোতের ফুলের মত কেবলই ভাসিয়া বেড়াইতেই ছিল, কোথাও কূল পায় নাই। পূর্বাশ্রয় যখন খসিয়া পড়িল, ধন-দৌলত সব কিছুই বেদখল যারা লইল, তাহা শুধু তাহাকেই বাদ দিয়া গেল, এই খবর শুনিয়া এক জন প্রতিবেশী তাহাকে ঘরে স্থান দিলেন। সে সময়ে তাঁহার গৃহিণীটি স্মৃতিকাগারে আবদ্ধ থাকায় নিজে হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হইতেছিল। গৃহিণী এই অসহায় মেয়েটির খবর শুনিয়া কর্তাকে জানাইলে তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। কিন্তু মেয়েটি কয়েক-দিনের মধ্যেই একটা মধ্যরাত্রে কঁাদো কঁাদো হইয়া অস্পৃশ্য স্মৃতিকাগৃহের আগড় চেলিয়া ব্যাধ-বিতাড়িতা হরিণীর মতই ছুটিয়া আসিল এবং গৃহিণীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কঁাদিয়া কহিল, “মা, আপ-নার বাড়ী বড় নিরাপদ মনে ক’রেই ঢুকেছিলাম, কিন্তু বরং পথে পথে ভিক্ষা ক’রে খাব, তবু এখানে আর থাকতে পারবো না, সকাল হলেই আমি চ’লে যাব।”

গৃহিণী নিজের ঘরের খবরে অনভিজ্ঞা নহেন; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাবে?”

পরিমল চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল, “যে দিকে হু-চোখ যায়।”

গৃহিণী কুণ্ঠিত মুখে কহিলেন, “সে সবখানেই যে মন্দ লোকের কুদৃষ্টি নেই, তাই বা কি ক’রে জানবে মা? আমি বলি কি, তার চাইতে নিজে একটু সাবধান হয়ে এইখানেতেই থাক। রাত্রে না হয় আমার কাছে এসেই শোবে, সকালে নদী চান ক’রে আসবে। আমারও বাছারা তবু সময় মতন ছুটি ভাত পাবে, আর তোমারও—তা বাছা যে বয়েস তোমার,

তাতে এই নির্দাকব অবস্থা, এতে তোমার পক্ষে কোথায় যে ভয় নেই, সে ত আর বলা যায় না।”

পরিমল অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবি-ভাবিয়া ও এই সংসারাভিজ্ঞা গৃহিণীটির স্মৃতি-উপদেশটাকে কিছুতেই মনের মধ্যে মানিয়া ল’ সমর্থ হইল না। সন্তঃপ্রাপ্ত অপমানের আর তাহার অন্তরের মধ্যে আহত-নারীমর্যাদা ও গুমরিয়া ফিরিতেছিল, সে নিঃশব্দেই উঠিয়া আসি-এবং সেই বাড়ীতে দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইবার ভরসা না করিয়াই নিজের পূর্বাশ্রয়েই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই তার বুকফাটান অতীতের সকল-টুকু অমল্য স্মৃতির মাঝখানকেও সে নিজের নারী-মর্যাদাহানির বহু উর্দ্ধে বরণ করিয়া লইয়া কাঙ্গালের মতন কঁাদিয়া আসিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। ঠিক সেই সময়টাতে নাকি ভাগ্যে ভাগ্যে সে বাড়ীর ঝি ছাড়িয়া যাওয়ার বড়ই গণ্ডগোল চলিতেছিল, তাই এবার সেখানের আশ্রয় পাওয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন হইল না। তবে বাড়ীর কর্তা এই জন্ত একটুখানি আপত্তি তুলিতেছিলেন যে, যদি এর পর এই আইবুড় মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তো কি হইবে? তবে এ আপত্তিটা তাঁর টিকিল না, যেহেতু বাটীর গৃহিণী বাসন মাজিতে তখন বেজায় নারাজ থাকায়,—‘নথ’ ঘুগাইয়া ঐ যুক্তিটাকে এই বসিয়া খণ্ডন করিয়া দিলেন যে, “সে জন্ত অত ভাবিতে হইবে না। সে তখন একটা ঝি জুটিলেই উহাকে কোন একটা অছিলায় দূর করিয়া দিলেই হইবে, এখন তো দশদিন কাজ চালাইয়া দিক।” তা ঝি কিন্তু সেই দশদিনে পাওয়া গেল না এবং মাস কতকের পরেই একটা অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য কাজও ঘটয়া গিয়া দেশশুদ্ধ লোককে একে-বারে বজ্রস্তম্ভিত করিয়াছিল।

কলিকাতা অঞ্চলের এক জন বড়লোক, ওই অঞ্চলেরই কাছাকাছি তাঁর জমীদারী—এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উহাদের সম্বন্ধে বিস্তর খোঁজখবর লইয়া হঠাৎ এক দিন নিজেই উত্তোগী হইয়া উহাকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য ইহার জন্ত তাঁহাকে বিস্তর অবাচিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যাহারা ইতঃপূর্বে অনাথাকে অন্ন আশ্রয় দিতে নারাজ ছিল, তাহারাই বিশেষ ক’ি তাহার এই আকস্মিকপ্রাপ্ত সুখ-সৌভাগ্যের বি-যথেষ্ট পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পরাশ্রুত হন—এমন কি, সেখানের একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম অনাহৃত উপদেশে এ বিবাহের বিরুদ্ধে বিস্তর অধ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাপতির এই অ

নির্বন্ধ শত বিব্র ঠেলিয়া ফেলিয়াই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। বৈচিত্র্যময় জগতে কতই না বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে, লোকে এই বিবাহকারী যুবককে পাগল বলিয়াই স্থির করিল। কচিং কেহ বলিল, দয়ালু কিন্তু তাহারাই মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু অতি কিছুই ভুল নয়।

পরিমলের মনটা সেই সব ভয়াবহ পূর্বস্মৃতির তোলাপাড়ার মধ্য দিয়া কোন্ সময় লঘু হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর জিনকে আর ততটা অগ্নায় অত্যাচার ও জুলুম বলিয়া তার মনে রহিল না, বরং চিরদিনের বিপন্নবৎসলতা ও অনন্তসংসার দয়া-গুণের আধার বলিয়া তাহার প্রতি তাহার স্বতঃপ্রবাহিত শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ বিপরীত স্রোতকে প্রতিহত করিয়া উথলিয়া উঠিয়া নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যকে একেবারেই ছোট করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবিচারের শাস্তি লইয়া স্বামীকে তুষ্ট করিতে মন তাহার উৎসুক ও অধীর হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ছোটরে কবিতা ঘণা কবিছ যে পাপ,
তোমারে করেছে নীচ তারি অভিলাপ।
তাদের না কর যদি উচ্চাসন দান,
যুটিবে না কভু তব 'নীচ' অপমান ॥

—প্রবাসী।

সূর্য্যের আলোভরা অলস-মধুর মধ্যাহ্নে কলিকাতার এই কোলাহলবিহীন অংশ প্রায় পল্লীবিজনতা প্রাপ্ত হইয়া একখানি দৃশ্যের মতই প্রশান্ত হইয়া আছে। এই দীপ্ত স্নিগ্ধ দিনটির দিকে চাহিয়া নিরঞ্জন তাহার নিরালা ঘরে চুপ টি করিয়া একটি চৌকীর উপর খোলা-জানালায় ধারে বসিয়া ছিল।

এই জানালার নীচের বাগানে রং বেরংএর কুম্ভকলি, জিনিয়া আর রজনীগন্ধা একেবারে প্রচুর-তরুরূপে ফুটিয়া আছে। ইহারই ঠিক সাম্নাসাম্নি বাড়ীর সীমান্তভাগের প্রাচীরের গায়ে একটা বক-ফুলের গাছ আধহেলা হইয়া রহিয়াছে; তাহার ডাল-পালার মধ্য হইতে একটা লুকানো পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর শিশু দেওয়ার শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ইহারই ঠিক পাশের অপরাজিতার ঝোপ-টাকে নাড়া দিয়া কয়েকটা শালিক কি যেন খুঁটিয়া থাইতেছিল এবং কিচির-মিচির শব্দে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করিতেছিল, সেটা কিন্তু বেশ

বোধগম্য হইতেছিল না। বাগানের জমীটি নববর্ষার কয়েকটি বর্ষন পাইয়াই নয়নশোভন শ্যামলতায় যেন চিকণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই আর্দ্র তৃণ হইতে একটা অতি মুহূ সজল গন্ধ যেন সঙ্কুচিত-ভাবে উথিত হইয়া অনিচ্ছামন্ত্রভাবে বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির বাহ্য জগতের শুদ্ধ আত্ম-সমাহিতভাব নিরঞ্জনের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ত অশান্তি ও নিরানন্দে ভরপুর চিত্তটিকে শুদ্ধ যেন তাহার সেই শান্তির মাধুর্য্যে পরিপূরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যেন ইহাদের হইতে একটি অনির্বচনীয় প্রশান্তি লাভ করিয়া তাহার ভিতরেই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অহোরাত্র, জাগ্রতে এবং নিদ্রাতেও যে সান্ত্বনাবিহীন শান্তিহীন দুশ্চিন্তা বা দুষ্ট স্মৃতির তাড়নায় তাহার প্রত্যেক দণ্ড পলটুকু পর্য্যন্ত দারুণ দুঃখভারাক্রান্ত, সে সবই যেন তাহার মনের মধ্য হইতে এই শান্ত-মধুর প্রকৃতির শান্তিধারা এই মুহূর্ত্ত ধৌত করিয়া দিয়াছে।

ঘরের দরজার কাছে খুঁট করিয়া একটু শব্দ হইল। দোরটা খুলিয়া গেল, পেঁচোর মা মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যটা ভাল করিয়া দেখিয়া তার পর ভিতরে প্রবেশ করিল। একপাশে শয়নের নেয়ারবোনা খাট, আর একধারে একটি ছোট টেবিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ আর তারই মধ্যে কয়েকখানা ছোট বড় নোট একখানা লেফাপার মধ্যে খোলাই পড়িয়া আছে। পেঁচোর মা প্রায় নিঃশব্দে সেইখানে আসিয়া উহার মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া আবার তেমনিভাবে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, গৃহাধিকারী ইহার বার্তা কিছুই জানিতে পারিল না। টাকাগুলা তাহাকে নরেশ-চন্দ্রেরই খাজাশি বেতন হিসাবে দিয়াছিল।

বাবুর খানসামা সাতকড়ি আসিয়া ডাকিয়া উঠিল, “ম্যাষ্টার মশাই!”

প্রথম ডাকে নয়, দু তিন ডাকের পর নিরঞ্জন মুখ না ফিরাইয়া জবাব দিল, “উ?”

—“বলি মাইনে পেলেন, তা আমরা যে আপনার অস্থখে বিস্থখে এতটাই করলুম, বলি আমাদের বকশিস কই?”

নিরঞ্জন তদবস্থাতেই উত্তর দিল “নাও না ভাই! ঐখানেই তো আছে।” সাতু এই উত্তরই আশা করিয়া পেঁচোর মার হয়ে নীতি অবলম্বন করা অনর্থক বোধে উহা হইতে বিরত ছিল। খাম হইতে নোট করখানা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কত নিই?”

“বা তোমাদের খুসী।”

“তা হ’লে এই পঁচিশের মধ্যে পনের আমার বকশিস নিলুম, আর এই দশটা টাকা আমার কাছেই আমানত রইলো, দরকার হ’লে বলবেন, বার ক’রে মোব। বাড়ীর দাসী চাকরদের কারু কারু যে বেশ একটু হাত-টান আছে, সে তো আর আমার কাছে চাপা নেই, কে কখন গের্ডা দিয়ে দেবে বই তো নয়, কি বলেন ম্যাষ্টার মশাই! রাখবো কি আমার সিন্ধুকে তুলে? তাতে খুব ভাল বিলিতি তৈরী কুলুপ লাগান আছে।”

নিরঞ্জন সব কথা—সব কেন, একটা কথাও—কানে না তুলিয়া অমনি অমনিই জবাব দিয়া চুকিল, “বেশ।”—

বোকারাম ম্যাষ্টারের নির্বুদ্ধিতা এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিতে করিতে প্রসন্নমনে সাতকড়ি টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, “বাবু তো পঁচিশটা টাকা দিয়েছিলেন, আর দশটা কোন চিলে এর মধ্যেই ছোঁ মারলে? অ্যা! আমার মুখের গরাস কেড়ে খায়, সে তো সামান্য নয়! যা হোক, সন্ধান করতে হচ্ছে।”

বকফুলের গাছের ডালে সুখসমাসীন পাখীটা একটা তীক্ষ্ণ উচ্চরব করিয়া ডানা-বাড়া দিতে দিতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। সেই আকস্মিকশব্দে চকিত হইয়া উঠিতেই নিরঞ্জনের কর্ণে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি প্রবেশ করিল, “ম্যাষ্টার মশাই!”

আহ্বান নারী-কণ্ঠের এবং তাহা যে ‘পেঁচোর মা’ শ্রেণীর কাহারও নহে, তাহা নিরঞ্জনের স্বাভাবিক বুদ্ধিই তাহাকে জানাইয়া দিল। সে তার স্বভাবের বিরুদ্ধ একটু বিস্মিত ও উত্তেজিতভাবে মুখ ফিরাইতেই এক সুদর্শনা নারীর সহিত মুখামুখী হইয়া গেল। রমণীর সাজসজ্জায় ও হাবভাবে তাহাকে উচ্চ জগতের জীব বলিয়া চিনিয়া লইতে উহার বিলম্ব ঘটিল না এবং এই পরিচয়ে একধারে বিপন্ন, বিরক্ত ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়া নিরঞ্জন যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, হাত তুলিয়া ইহার উদ্দেশ্যে সে একটা ভদ্রতার নমস্কার পর্যন্ত জানাইতে সমর্থ হইল না।

ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল বাড়ীর কত্রী স্বয়ং। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছিল বলিয়াই সে নিজের সেই ভুল শোধরাইয়া লইবার সদিচ্ছায় তাহার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আনিয়াছিল,—কিন্তু সে যে এত কঠিন, এ ধারণা তার একটু পূর্বেও ছিল না। নিরঞ্জনের মুখের দিকে সে চাহিতে ভরসা করে নাই,

তাহার জুতাখোঁলা পায়ের দিকেই তার চোখ ছিল। বসন্তের গভীরতর ক্ষত চিহ্নের সেখানেও অভাব ছিল না। তার উপর সেই দুর্বল শীর্ণ পা দুখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে লক্ষ্য করিয়া কিছু দয়ার্দ্ৰ ভাবেই বলিয়া ফেলিল, “আমি আপনার কাছে পড়তে এসেছিলুম, যদি আপনার শরীর ভাল না থাকে, তা হ’লে আজ থাক।”

এই বলিয়াই সে উহার দিকে পিছন ফিরিতে গিয়া পশ্চাৎ হইতে এমন একটা সুর শুনিতে পাইল এবং তাহাতে এমন করিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল যে, যেন সেই ক্ষীণ দুর্বল ও ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একটা আকস্মিক বর্ষার মতই আসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের হাড়ের মধ্যে তার তীক্ষ্ণ ফলাটাকে সবেগে বিধিয়া দিয়াছিল। ভয়ানক মুখের পাংশু ছবি লইয়া আবার সে সচকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সামনে তাহার কীটদষ্ট পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মতই এক বসন্তক্ষত-বিকৃত এবং আগুনে বা অপর কোন দাহ পদার্থের দ্বারায় অধিকতর বিকৃতিপ্রাপ্ত অপরিচিত মুখ! তবে সেই তাহার পরিচিত স্রবের লেখা কোথা হইতে অকস্মাৎ এই অজানােকে আশ্রয় করিয়া আজ এত দিন পরে আবার এই জাগ্রত মধ্যাহ্নে ভাসিয়া আসিল? সে কি স্বপ্ন না সত্য? পরি-
মলের বকের মধ্যে সন্দেহ, আশঙ্কা ও তার সঙ্গেই মিশ্রিত একটুখানি যেন আগ্রহও একসঙ্গে একটা অজানা তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্ন—স্বপ্ন ইহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে? মানুষ কখন জাগিয়া থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারে? সে উৎসুক নেত্রে উৎকণ্ঠা ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া করিয়াই নিরঞ্জনের নতমুখ দেখিতে লাগিল এবং অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া পর্যবেক্ষণ-দৃষ্টিকে ভূমিলগ্ন করিয়া ফেলিয়া পূর্ণ অবিধানে, দীর্ঘ করিয়া একটা শ্বাস গ্রহণপূর্বক কহিল, “বই তো আমি কিছুই আনি নি, যা হোক একটু পড়ান; ইনি বলে গেছেন, আপনার কাছে পড়তে।”

নিরঞ্জনের যে কথার স্রব সে চমকিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই, “আপনি কি পড়তে চান বলুন, আমি পড়াচ্ছি।”

এবার নিরঞ্জন এই কথাটার মধ্য দিয়া অনেক-খানিই অনুভব করিল। তাহার চাকরীটা যে কি, এতদিনের পর সেইটাই এবার তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, তা সেটা যে এমন মূর্ত্তিতেই দেখা দিবে, এ সংশয় সে অভাগার মনের কোণেও কখন উদ্ভিত হয় নাই। নরেশ অবশ্য কাজটাকে খুব

কঠিন বলিয়াই স্বীকার করিয়া প্রথমাবধি এতৎসম্বন্ধে তাহার কৃতকার্যতারও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্য দোষ দেওয়া চলে না,— কিন্তু সেটা যে এমনই কঠিনরূপে প্রকাশ পাইবে, তাহা জানা থাকিলে, নিরঞ্জন হয় ত—তা' জানা থাকিলেই বা নিরঞ্জন কি করিতে পারিত? জীবন ও আশ্রয়-দাতাকে সে কি মুখের উপর বলিতে পারিত যে, তাঁহার এই সামান্য কাজটুকুও তাহার দ্বারায় ঘটা সম্ভব নয়? প্রাণপণে নিজের সকল সঙ্কোচকে সে মনের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিল, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের কম্পনকে যথাসাধ্য নিরোধ-চেষ্টার সহিত সসম্মানে উত্তর করিল, “তা হ'লে লাইব্রেরি থেকে কোন বই বেছে দেবেন চলুন; এখানে তো কোনই বই নেই।”

পরিমলের পায়ের তলা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত প্রবলবেগে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া চলিয়া গেল। সে আবার বুধাই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই ভস্মস্তুপবৎ ভীষণদর্শন দন্ধ-মুখের রহস্য-জটিলতা যেন উলটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছু না, কোন নিদর্শনই ত নাই! তবে কোথা হইতে, কেমন করিয়া সেই পরিচিত,—বড় পরিচিত কণ্ঠের শব্দটুকু, আজ বারে-বারেই স্মদূর অতীত, করুণ কঠিন ভয়াবহ অতীতের—মধ্য হইতে তার সমস্ত বিস্মৃতির ধূলি-জঞ্জাল ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে? এ কি তবে পরিমলের কল্পনামাত্র? এ কি সত্য নয়? এ কি তার মনের মধ্যের স্মৃতির তারে যে অবিস্মৃত অতীত আজিও দিনে রাতে সকল সময় সকল সুখ-সম্পদের মধ্য দিয়াও করুণ ও কাতর মূর্ছনায় বন্ধার দিয়া উঠিতে থাকে, তারই একটা রেস, আর কিছুই নয়? আবার একটা দীর্ঘতর নিশ্বাস সে মোচন করিল এবং তার পর নিজের মনকে শান্ত করিবার জন্তই ইহার সাম্রিক্য ছাড়াইতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, “আজ থাক, কাল বই নিয়ে আসবো,”—এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তখন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে নিজের পরিত্যক্ত আসন-খানার উপর সবেগে বসিয়া পড়িয়া উর্দ্ধমুখে শ্বাসগ্রহণ পূর্বক নিঃশব্দে আত্মকণ্ঠে আত্মগত কহিয়া উঠিল, “আবার সেই ছায়া! সে নয়—তবু যেন সেই! নাঃ, মানুষ আমার আর থাকতে দিলে না। আবার দেখছি পাগল ক'রে আমার পথে বার ক'রে দেবে।”

দশম পরিচ্ছেদ

পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায়, বিষম ঝড়ে,
নাই মা, বধু নাই, খেতে কে দেবে ভাই,
কে তা'রে দেবে ঠাই, বৃষ্টি পড়ে ॥

—তীর্থ-সলিল।

পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। যদিও গুরু শিষ্টা উভয়েরই পক্ষে এই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ ব্যাপারের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ বা আনন্দের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না; উভয় পক্ষের সবটুকুই শুধু দায়-ঠেলার খাতির, সুতরাং ফলও ঠিক তদনুযায়ী প্রচুরতররূপে ফলিয়া উঠিতে লাগিল, অর্থাৎ বড় একটাই দেখা গেল না। পরিমল প্রথম দিনের সেই সঞ্চারিত সঙ্কোচকে প্রাণপণে যুক্তি-তর্ক ও সিদ্ধান্তের দ্বারায় কোনমতে তাহার মন হইতে অপসৃত করিয়া-ছিল। নিজেকে সে এই বলিয়াই শান্ত করিতে চাহিল যে, মানুষের মত মানুষ যে কত থাকে; একজনের গলার সুরের মতন কি আর একজনের গলার সুর থাকে না? এর হাসি তো দেখি নি; বোধ হয়, এ মোটেই হাসে না, কিন্তু তাঁর,—তাঁর হাসিটিই যে তাঁর সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য ছিল। এর আড়ন সেই রকমই বটে, কিন্তু সে রং, সে চোখ, সে চুল, সেই বলিষ্ঠ দৃঢ় গঠন—সে সব এর কোথায় কি? তার পর তাহার ঠোঁটের কোণে একটি ফোঁটা হাসি এবং চোখের কোণে ফোঁটা দুই অশ্রু দেখা দিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমিও কি পাগলের বাতাস লেগে পাগল হ'লেম নাকি? কি ছাই ভাবছি? যাকে নিজের চোখে মর্মেতে দেখলেম, পুড়িয়ে পর্যন্ত এলো, তার সঙ্গে কার কতটুকু মিল কোথায় খুঁজলে পাওয়া যায়, সেই ভাবনায় মাথা ঘামিয়ে লাভ? মনকে সে কড়া হুকুমে ঠাণ্ডা করিতে চাহিল। সে দিন পড়িতে গিয়াই সে বই খুলিবার আগে ভাগেই মুখ খুলিয়া এবং মুখ তুলিয়া নিরঞ্জনের বিদগ্ধ ও বিব্রত মুখের দিকে করুণচোখে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনের ভিতরটা যেন করুণায় ও বেদনায় নিবিড়ভাবে ভরিয়া আসিল, তখন সে গভীর সহানুভূতি ও ব্যথার বিজড়িত চিত্তে তাহার সহিত আলাপ করিতে বসিল। নিরঞ্জন নতমুখে তাহার পাঠ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ম্যাকমিলানের ছাপা স্কল-পাঠ্য বইএর মাপাজোকা রচনার পরিবর্তে তাহার কানে আসিয়া সবিষ্ময়ে এই প্রশ্নটা প্রবেশ করিল—

“আচ্ছা মাষ্টার মশাই! আপনার দেশ কোন্-
থানে ছিল?”—

নিরঞ্জন প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তার পর হাতের
আঙ্গুল দিয়া নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল; আরও
খানিক পরে সে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল,
“বসিরহাট।”

“বসিরহাট! তবে তো ঠাকুরঝিদের দেশেরই
লোক আপনি! হারাগচন্দ্র ঘোষেদের জানেন?
নাম শুনেছেন অবশ্য? সেই হারাগ ঘোষের মেজো
ছেলেই আমার নন্দাই। তার নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ
ঘোষ। সে গেল বছর ওকালতি পাশ ক’রে উকিল
হয়েছে। জানেন তাকে? বড় ভাল ছেলে সে।
নেহাং ভালমানুষ, যেন গো-বেচারী একেবারে!”—

পরিমলের মনের মধ্যে বোধ করি, মানুষের পরিচয়ে
তাহার গো-জন্মের আভাসটা একটু বেশী পরিমাণে
সুব্যক্ত হওয়াটাকেই তাহার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া
বোধ ছিল, সেই জন্যই সে স্নঃযোগ পাওয়া মাত্র
তাহার এই নিরীহপ্রকৃতির নন্দাইটির প্রশংসা উচ্চ-
সিতকণ্ঠে করিয়া বসিল এবং ইহার মধ্যে প্রস্তুপ্ত
রহিল যাহারা ‘গো-বেচারী’ নহে, তাহাদেরই সম্বন্ধে
ঈষৎ একটুখানি গ্লানির আভাস।

নিরঞ্জন আবার যেন কতকটাই ইতস্ততঃ করিল।
তারপর সঙ্কুচিতভাবে সে জবাব দিল, “না না, ঠুকে
আমি চিনি, আমি অনেকদিন দেশ-ছাড়া।”

ঈষৎ দমিয়া গিয়া পরিমল তখন ছোট্ট করিয়া
একটি “ওঃ” বলিয়া নিজের পাঠ্যপুস্তকের পাতা
উল্টাইতে আরম্ভ করিল এবং তৎপরে পুনশ্চ একটু-
খানি আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিয়া উঠিল, “আচ্ছা,
আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন? আপনার মা
বাবা নেই বোধ হয়? আচ্ছা, ভাই-বোন নিশ্চয়ই
আছেন? আর কেউ? আর কোন আত্মীয়?”

একটা দীর্ঘ ও ব্যথাভারাতুর নিশ্বাসের শব্দ
তাহার সকল উৎসাকেই দমিত করিয়া দিয়া আরও
একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল,
—“কেউ না।”

পরিমলের বুকের মধ্যে এই আর্ন্ত স্বরটা এমনি
ভীষণবলে বাজিয়া উঠিল যে, সেই নিঃসঙ্গ নিঃশেষিত
মরুভূমির মতই জীবনের ভয়াবহ শূন্যময়তা সে যেন
তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরেরও অন্তরে অনুভব করিল ও
তাহার অকৃত্রিম সহানুভূতি একান্তভাবেই এই সর্ব-
হারা এবং আত্মহারা অভাগাকে বেঁধন করিয়া ধরিল।
সে যে জানে,—এই নিঃসঙ্গ নির্বাক্ষর পরিত্যক্ত
জীবনের দুঃখ যে কি বিষম, কি দুর্বিষহ—সে যে নিজে

তার ভুক্তভোগী! সে যে নিজের বুকের ভিতর
হইতে এ অপরিমেয় দুঃখের রিক্ততা ও তিক্ততা
আজও মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিতেছে! যদি
যে সদয়চিত্ত এই পথপ্রান্তের মরণশয্যালীন দুর্বস্থার
চরমে পতিত ইহাকে কুড়াইয়া আনিয়া সযত্ন সেবার
জিয়াইয়া তুলিলেন, সেই তাঁহারই উদার অন্তর
তাহারও জন্ত না কাঁদিত,—যদি সেই তিনিই
তাহাকেও অমনি করিয়াই পথের ধুলার মাঝখান
হইতে—শুধু তাই নয়—একেবারে নিজের বুকে
তুলিয়া না লইতেন,—তবে আজ তাহার অবস্থা ইহার
চাইতেও আর একটু শোচনীয় হইয়া দাঁড়ইত কি না,
তাও বেশ জোর করিয়া বলা যায় না! স্বামীর দয়া
যে কি অসীম এবং তাঁহার উপরে তার কৃতজ্ঞতা যে
কতই গভীরতর হওয়া উচিত, তাই ভাবিয়াও,
নিজের মধ্যে যে জিনিষটা অপরিাপ্ত হওয়া উচিত
ছিল, তাহা পর্যাপ্ত নহে দেখিয়া, নিজের প্রতি সে
বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মনটাকে অন্ধ দিকে
ফিরাইতে চাহিয়া তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল,
“আপনার হাতের লেখাটি তো খুবই সুন্দর! ইংরেজী
উচ্চারণও খুব কম জানার মত লাগে না। তা হ’লে
আপনি কেন কাজ-কর্ম না ক’রে অত কষ্ট সহি-
ছিলেন? কত দিন বাড়ীছাড়া হয়েছেন আপনি?”

নিরঞ্জন এই প্রশ্নগুলো নতমুখে শুনিয়া গেল।
কিন্তু তাহার ভাবশূন্য নিশ্চল শরীরে ইহার উত্তরের
কোন চেষ্টা জাগ্রত হইতেছে কি না, তাহার কোনই
প্রমাণ পাওয়া গেল না। অগত্যা পরিমল তাহার
কৌতূহলবৃত্তিকে দমনে রাখিয়া নিজের পাঠ্যপুস্তকে
মনোনিবেশ করিল এবং অনেকখানি পড়া হইয়া গেলে
যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মাষ্টার মশাইএর
কানে তাহার পাঠের শব্দটুকু পর্যাপ্ত প্রবেশ করিতেছে
না, এমনি গভীরতর অন্তমনস্কতায় তাহার মনকে
অভিভূতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তখন সে কিছুক্ষণ
নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল
ও তার পরই কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সমস্ত
শরীরে ও মনে ভীষণভাবে শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি
সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার
মনে হইয়া গেল, সে যেন কোন এ জগতের প্রাণীর
সান্নিধ্যে নাই,—এই যে মানুষটির সামনে সে
রহিয়াছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যেন কোথাও
একটু যোগ আছে কিন্তু সে যেন পুরাপুরি এখানের
নয়। চেহারাখানা এর মোটামুটি দেখিতে মানুষেরই
মত বটে, গলার স্বরও এই দেশেরই সম্বন্ধ জ্ঞাপন
করে, কিন্তু না,—তবু না—কিছুতেই ইহাকে যেন

রক্তমাংসের জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না! এ যেন কোথাকার একটা ছায়া, কোন্ দূরান্তরপ্রস্থিতের একটুখানি মায়ামূর্তি এর মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যায়। শুধু সেটুকু—আর বাকি সবখানিই এর অবাস্তব, অসঙ্গত, অনাস্থি! পরিমলের মনের মধ্যটা ছমছমে হইয়া উঠিল। এই শব্দহীন,—স্পন্দনেরও চিহ্ন যাহার মধ্যে বেশ স্পষ্ট নয়—তাহার সান্নিধ্যকে সত্যে বর্জন করিয়া উর্দ্ধ্বাশ্রমে সে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

নরেশ সে দিন অপরাহ্নে তখন বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন, পরিমল খবর দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, “দেখ, নিরঞ্জনকে আর কোন কাজ দিবে আমার জন্য অন্ত কোন শিক্ষয়িত্রী ঠিক ক’রে দিতে পারো না? সেই যদি পরিশ্রমই করবো, তা হ’লে যাতে কাজ হয়, সেই রকমই তো করা ভালো।”

নরেশ ইদানীং পরিমলের মুখে মাষ্টার মশাই’এর বিজ্ঞাবুদ্ধি ও বিনয়ের বিস্তর খ্যাতি শুনিতেছিলেন। আজ আবার হঠাৎ এই অনুরোধে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কেন, আবার কি হলো?”

পরিমল বলিল, “হয় নি কিছুই, তবে পড়া বড় হয় না কি না, তাই বলছি, উনি বড়ই অন্তমনস্ক, আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়।”

নরেশ নিজেও এটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই জ্বর কথার অসন্তুষ্টি হইতে না পারিয়া ঈষৎ চিন্তিত-মুখে কহিলেন, “আচ্ছা, তা হ’লে ভেবে-চিন্তে দেখি, ওকে কি কাজ দিতে পারা যায়। কিছু না দিলে তো ওকে ওম্নি রাখা যাবে না, সেই যে হয়েছে মহা মুস্কিল!”

পরিমল বোধ করি পূর্বাধি এ বিষয়ে কিছু কিছু ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সে প্রস্তাব করিল—“ছাপা-খানার কোন কাজ দেওয়া চলে না?”

নরেশ কহিলেন, “দেখি, তাই না হয় কোন কিছু যদি পারে। বাংলাটা কি রকম জানে বুললে কিছু? ইংরাজী যে মন্দ জানে না, সেটা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু বাংলা যদি তেমন—”

পরিমল মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া গিয়া এক টুকরা কাগজ লইয়া আসিল ও উহা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, “প’ড়ে দেখ।”

নরেশ কাগজটার ভাঁজ খুলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর পৃষ্ঠায় একটা কবিতা লেখা। কোতুলী হইয়া পড়িলেন,—

“কাঁদিতে এসেছি আমি কাঁদিয়াই চ’লে যাব,
এসেছি অনন্ত হ’তে অনন্তেই মিশাইব।

হুঃখের তরঙ্গ তুলি, এসেছি আপনা তুলি,
খুঁজিব বিরাট বিশ্ব কোথা গেলে সীমা পাব।

জগতে হবে না সুখী এ পোড়া পরাণ-মন।

অসীম হুঃখেরে আমি ক’রে আছি আলিঙ্গন।

আপনি নীরবে রহি, আপন যাতনা সহি,

অপরে করিতে হুঃখী চাহে নাকো এ জীবন।

ভবের সুখের আশা করিয়াছি বিসর্জন।

না চাহি কাহারও স্নেহ, কাহারও ভালবাসা,

রাখি নে রাখি নে মনে পার্থিব প্রেমের আশা

কারও উপেক্ষার হাসি, সহিতে গঞ্জনা রাশি—”

কবিতা অসমাপ্ত। নরেশ পাঠশেষে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কে লিখেছে—নিরঞ্জন?”

পরিমল মাথা ছুলাইয়া সায় দিল। তার পর বলিল, “আরও দুটো একটা ওঁর টেবিলে প’ড়ে থাকতে দেখেছি, একটা মোটে ক’টা প্লাইন লেখা। সেটা আমার মনেই আছে।

পাবো কি না পাবো ফিরে কেন বুধা এত ভয়?

কেন, কেন এ সংশয়?

যখন দাঁড়াব গিয়ে তোমার চরণতলে,

আমার গচ্ছিত নিধি ফিরাইয়া দাও ব’লে,

না দিবে পারিবে কি গো ফিরাইতে দয়াময়!

তবে কেন এ সংশয়?

দেখ, মাষ্টার মশাই’এর বউ নিশ্চয় ছিল, ম’রে গেছে, তাইতো ওঁর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না?—কিন্তু জ্বীকে কি রকম ভালবাসে বল তো?”

নরেশ হাসিয়া নিজের জ্বর গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া জবাব দিলেন, “ঠিক যেন মহাদেবের সঙ্গে সমান! জ্বীটিও হয় তো সতী-ঠাকুরগের মতই পতির জন্য দেহ-ত্যাগ ক’রে থাকবেন। তা না হ’লে কি আর অতটাই পারা যায়?”

কথাটির মধ্যে বেশ একটুখানি খোঁচা খাইয়া পরিমলও সেটুকু তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া দিল।—
“তাই কি আর বলতে পারা যায়? এই সে দিন কালীঘাটে একটি মেয়ে স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ দেখে আর ডাক্তারের মুখে ‘আশাহীন’ কথাটা শুনেই স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না ব’লে তক্ষুনি নিজের প্রাণটা নষ্ট ক’রে ফেলে, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোকটি সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন এবং জ্বর অত বড় আত্ম-ত্যাগের মূল্য শোধ করলেন কি দিয়ে জানো?”

বৎসর না ঘুরতেই একটি নূতন বউ ঘরে এনে। এই তো সব তোমরা!”

নরেশ এ ঘটনাটি জানিতেন, কাজেই মাথা পাতিয়া এই নিন্দাটুকু গ্রহণ করিয়া লইতেই হইল এবং হাসিয়া উঠিয়া রহস্য করিয়া জবাব দিতে হইল, “তা মহাদেবও তো শেষটায় পার্বতীকে বিয়ে ক’রেছিলেন। তাঁরটিরও হয় তো সেই রকমই অংশাবতার হয়েছিল টিল, তার কে কি জানে বলা! আচ্ছা, তা হ’লে নিরঞ্জনকে আমাদের ‘কর্ণধারেরই’ কর্ণ ধরিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমার উক্ত কার্যের জন্য এক জুন উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর খোঁজ-খবর করতে হবে।”

পরিমল কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙ্গাইয়া চাপা হাসির মধ্যে তর্জজন করিয়া উঠিল, “যাও।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল তুমি মহীয়ান,
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ।

ওইন্দ্রিয়া দেবী।

আদিগঙ্গার উপরে ছোট্ট একখানি লাল-রংয়ের মোতাল বাড়ীর গঙ্গার ধারের উঁচু পাঁচিল ঘেরা ছাদে কয়েকটি ফুলের গাছ টবে সাজান এবং তারই মধ্যে একখানি কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া একটি মেয়ে সেতার বাজাইতেছিল। টবের গাছগুলি সজলসিক্ত, তখনও ভিজামাটির গন্ধটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। রজনীগন্ধা দু’একটা ফুঁই এবং কতকগুলি ভুঁই-চাপা, জিনিয়া আর কন্মিয়া জাতীয় ফুল অল্প বিস্তর ফুটিয়া রহিয়াছে। গোলাপের গাছ দুটো একটা আছে; কিন্তু ফুল তাহাতে একটাও ফুটিয়া উঠে নাই।

মেয়েটির বয়স সতের বা আঠারোর বেশী নয়। রূপ, হাঁ, তা রূপ তাহার শরীরে নেহাৎ কম ছিল না। গোলগাল গড়ন, অথচ একটু ক্ষীণ দেহ, রং আরমানী বিবিদের মত না হোক, তবু সচরাচর বাহাকে বাঙ্গালীর ঘরে ফরসা রং বলে, তাইতেই একটুখানি জোলুস ছিল। চোক দুটি মাঝারি, নাক, কপাল, ঠোঁট সবই তাহার মাঝামাঝি, শুধু চুলগুলিতে বড় বেশী বিশেষত্ব ছিল।—কৌকড়ান না হইলেও, রেশমের মতন নরম, কাল ও ডেউখেলান খোলা চুলগুলি তাহার বাজনার তালে তালে তাল

দিয়া যখন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, তখন অপ-
রাহের শুভ্র শুভ্র আকাশের একপ্রান্তে আকস্মিক উদ্ভিত প্রাবৃত মেঘের কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। একেবারেই নিরাড়ম্বর বেশভূষণে এই সুশ্রী মেয়েটিকে যেন বেশী করিয়াই সুন্দরী মনে হইতেছিল; বাজনা বাজানর সখ মিটিয়া গেলে সে কোলের উপর হইতে যন্ত্রটাকে নিজের পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া দিয়া বেঞ্চির পিঠের উপর নিজের পিঠ চাপিয়া একটু আয়েস করিয়া বসিল এবং তার পর গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান আপনার মনেই গাহিতে লাগিল। বাজনার সুর যখন চড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশের বাড়ীর ছাদে যে যুবকটি প্রায় প্রত্যাহই তাহার উঁচু পাঁচিলের ছোট ছোট ফুকর দিয়া তাহার অদৃশ্য প্রায় মূর্তিটাকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কৃতার্থ হইবার লোভে উকি-ঝুঁকি মারিয়া শেষে বিরক্তমনে আর এক দিকে চলিয়া যায়, আজও তাহার সেতারের সুর নিজের সেই নিত্যকর্মপদ্ধতিতে ক্রটি রাখে নাই। কিন্তু গানের এ গুঞ্জন সেই উৎসুক পিয়াসীর কর্ণগোচর পর্যন্ত হইল না, এ শুধু এই পুষ্পবাসিত, নিরালা ছাদটির বুকেই একা একা নিজের সকরণ মুচ্ছনায় মুচ্ছিত হইয়া রহিল। সে একেবারেই যেন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অন্তমনস্কভাবে গাহিতেছিল—

“এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে, ফিরে এসো।

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত—

নাথ হে, ফিরে এসো।

ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এসো, ওগো করুণ কোমল এসো,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত, সুন্দর ফিরে এসো।”

গানের সঙ্গে যখন প্রাণের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ঘটয়া উঠে, তখন গানের বাণী আর বাহিরের শব্দমাত্র থাকে না, তাহা প্রাণের কথায় পরিণত হইয়া যায়, গান তখন ধ্যানের আসন গ্রহণ করে। এই গায়িকাও তেমনি তর তন্ময় হইয়া গিয়া বেঞ্চির পিঠে মাথা রাখিয়া এলায়িতদেহে অর্ধমুদ্রিতনেত্রে পায়ের তালে তাল দিয়া যেন গানের বাণী ভুলিয়া গিয়া প্রাণের ভাষাতেই ভাসিয়া চলিতেছিল,—

“আমার নিতি সুখ ফিরে এসো,

আমার চিরসুখ ফিরে এসো;

আমার, সব সুখ দুঃখ মগ্নন করা—

বাঞ্ছিত ফিরে এসো,—

এই ছাদে আসিতে হইলে সিঁড়িতে উঠিয়া যে দালানটা পার হইয়া আসিতে হয়, সেইখানে ঠিক

সেই সিঁড়ির মাথায় জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল। গানের সুরে ও ভাবে মন ছাইয়া থাকায় গীতকারিণী তাহা জানিতে পারেন নাই দেখিয়া, যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, সে সেইখানেই একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। চুরি করিয়া পাশের বাড়ীর লোকটির মতন গান শোনার জন্য যে রহিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা মনে হইল না। বোধ করি, কোন একটা সংশয় বা দ্বিধায় পড়িয়াই সে ওই রকম চলচ্চিত্ত বা মানসিক কোন দ্বিধায় দৌল্যমান হইয়াই স্থির রহিল। একবার যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবার জন্যও মন তার যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার সিঁড়ির ধাপের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানর ভঙ্গীতেই প্রমাণ করিয়া দিল। আবার কি ভাবিয়া কে জানে, সে নিজেকে ফিরাইয়া লইয়া ছাদের দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তার পর যেন মনকে আরও একটু শক্ত করিয়া লইয়া একেবারে গট গট করিয়া সঙ্গীত-কারিণীর পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল—

বোধ করি বা একটু শব্দ হইয়া থাকিবে—মেয়েটি তখনই গান বন্ধ করিল। চোখ মেলিয়া ও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই আন্তে আন্তে উঠিয়া বসিল, তার পর মুখের উপর কাঁপাইয়া পড়া চুলের গোছাটাকে ঠেলিয়া দিয়া সেই মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল। মাটিতে পড়িয়া গড়া হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া অতঃপর সে চুপটি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রকার ভাল মন্দ একটি সম্ভাষণের কথাও তাহার মুখ দিয়া যেন বাহির হইল না। মনের মধ্যে একটা বড় রকম ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল কি না, তা অবশ্য নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে ওই গানটাই যে সে বিশেষ করিয়া এমন সময়টার গাহিতেছিল, ইহারই জন্য লজ্জায় তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ঘুরিয়া আসিয়া ইহার পরিত্যক্ত আসন-খানায় বসিয়া পড়িলেন এবং ইহারই হস্তচ্যুত বাজনাটা নিজের জামুর উপর তুলিয়া ধরিয়া বাজনা-রাখা জায়গাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া উহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, “বসো”।

মেয়েটি উহার পাশের জায়গাটিতে না বসিয়া খানিকটা দূরে খালি মেজের উপর বসিয়া পড়িল। তখন নরেশ—আগন্তুক নরেশচন্দ্র একবার বিব্রত ও অসুস্থস্বচ্ছন্দে উহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণে সেতারের ঝঙ্কার তুলিয়া অসুস্থতার সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটা গাইবে কি?”

মেয়েটির মুখের উপর কোন ভাবের রেখাই পড়ে

নাই,—তাঁ যা ছিল, সে তার মনের ভিতরেই লুকানো ছিল, মুখখানাকে অমন ভাবশূন্য রাখিতে মনের মধ্যে তাহার যে কতখানি বেগ দিতে হইতে-ছিল, তা’ শুধু সেই জানে, তবে বাহিরের সে চেষ্টাটা তার ব্যর্থ হয় নাই। মাথা হেলাইয়া সে নিজের সম্মতি জানাইলে নরেশ অনির্দিষ্টভাবে তারের উপর অঙ্গুলীর ঘা দিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, “কোনটা গাইবে?”

সে নম্রস্বরে জবাব দিল, “যেটা বলবেন।”

“আমি যেটা বলবো, সেটাই যে তোমার গাইতে ইচ্ছে হবে,—এমন কি কথা আছে? যেটা তোমার ভাল লাগবে, সেইটাই তার চাইতে গাও না কেন সুখমা!”

সুখমা ক্ষণকাল মাথা নত করিয়া কি ভাবিল, তার পর মুখ না তুলিয়াই আন্তে আন্তে গান ধরিল—

“ধায় যেন মোর সকল ভাগবাসা,—

প্রভু! তোমার পানে তোমার পানে—

তোমার পানে,—

যায় যেন মোর গভীরতর আশা—

প্রভু! তোমার টানে তোমার টানে—

তোমার টানে,—

গানটা আরম্ভ করিয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল, এ গানও আজ ইহার সাক্ষাতে তাহার গাওয়া ভাল হয় নাই। আধ্যাত্মিক হিসাবে এ সব খুবই বড় জিনিষ বটে এবং ছোট বড় সবারই এ জিনিষের উপর দাওয়া আছে। কিন্তু মানুষ সব কিছুই বড়র দিকটার চাইতে ক্ষুদ্র অংশটুকুকেই যে বড় সহজে দেখিতে পায়—অথবা দেখিতেই চাহে। অর্থ-বিকৃতি ঘটাইয়া এই সর্বস্বান্তকর আত্ম-নিবেদনকে যে, নিজের ভোগে লাগাইতে না পারা যায়, তাও তো নয়! তার চেয়ে সে যদি গাহিত,—

“আমার মাথা নত ক’রে দাও হে—

তোমার চরণধূলার তলে,

সকল অহঙ্কার হে আমার—

ঘুচাও চোখেরই জলে!”

না, তাহাতেও তার মনের দুর্বলতা হয় তো ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ঘুচিত না!—উপায় নাই!

গান শেষে নরেশ বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফুল গাছের টেবের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে প্রশংসাসূচকভাবে বলিয়া উঠিলেন, “বাঃ ভারি

সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেচে তো তোমার! সুখমা!
তোমার সেই চন্দনা কি কি কথা কহিতে শিখেছে?
কই সেটাকে যে দেখেছিনে? ননীবাবু তো তার
প্রশংসা করতে শত মুখ হ'য়ে ওঠেন।”

সুখমাও তাহার মাগুবান অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে
উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; জবাব দিল, “সেটাকে আমি
খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েচি।”

“উড়িয়ে দিয়েছ! ওঃ, অসাবধানে উড়ে গেছে
বুঝি? সুন্দর পাখীটা ছিল।”

“সুন্দর ব'লেই তো তাকে তার কুৎসিত বন্দীদশা
থেকে মুক্ত ক'রে দিলাম। স্বাধীন হয়ে কি আনন্দেই
সে উধাও হয়ে নীল আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল!
তার মনে তখন কতই না আনন্দ হচ্ছিল।”

নরেশ মৌন বিষয়ে ছ' চোখ ভরিয়া সেই
এতক্ষণকার নির্ঝাঁকু এবং এক্ষণে উচ্ছ্বসিতমুখী
নারীর সহসা উজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।
যেন তাহার মনের আবটা একটুখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারিয়া চয়ন-করা এক-গোছা রজনীগন্ধা লইয়াই
ফিরিয়া তাহার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,
শান্তকণ্ঠে কহিলেন, “সুখমা! স্বাধীন হওয়াই কি সর্বত্র
বাঞ্ছিত? স্বাধীনতার মধ্যে দুঃখ নেই, লজ্জা নেই?”

সুখমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা
উঁচু করিয়া বলিল, “আছে, যতদিন না মানুষ নিজের
উপর বিশ্বাস করতে শেখে, সে আশঙ্কাও ততদিনের।
কিন্তু যদি কোন দেবতার আশীর্বাদ তাকে স্বাবলম্বনের
মহৎ শিক্ষায় দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে, তখন—তার পর
থেকে অধীন জীবনের লজ্জা তার পক্ষে সব চেয়ে বড়
লজ্জা হয়ে দাঁড়ায় না কি?”

নরেশ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তার পর
অতি মৃদু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস স্তম্ভপূর্ণে মোচন
করিয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তুমি
আমার আসতে লিখেছিলে কেন?”

সুখমা আবার নতমুখী হইল, নরেশের দৃষ্টি হইতে
নিজের মুখ সে একটুখানি আড়াল করিয়া রাখিয়া
শান্ত অথচ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল, “এমন ক'রে আর
তো আমার দিন কাটচে না, তারই একটা উপায়
ক'রে দেবার জন্ত আমি আপনাকে বিরক্ত করতে
বাধ্য হয়েছি। আমার অপরাধ দয়া ক'রে নেবেন
না। এ মহা পাপকে যখন ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন,
তখন তো ফেরতেও পারছেন না। কিন্তু যা ভাল
হয়, কোন কিছু একটা করুন। না হয় এই খাঁচার
দরজাটা খুলেই দিন। আমি এমন ক'রে থাকলে
পাগল হয়ে যাব বোধ হচ্ছে।”

নরেশচন্দ্র এই কথায় একটুখানি ব্যথিত হইলেন।
সহসা জোর করিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ-
পূর্বক তিনি ঈষৎ আবেগভরে কহিয়া উঠিলেন,
“আমার নির্লিপ্ততা তোমায় দুঃখ দিয়েছে মনে হচ্ছে,
কিন্তু তুমিই যে আমার কাছ থেকে সে অধিকার
জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ সুখমা! আমায় যে তুমি
বারণ করেছিলে,—তাতেই তো আসি নি।”

সুখমা মুখ তুলিল না! সেই আধ-ফেরানো
মুখেই চাপাকণ্ঠে সে উত্তর দিল, “ঈশ্বর জানেন,
তার জন্ত আমি একটুও দুঃখিত নই। আপনার
অস্বাভাবিক চরিত্র আমার জন্ত লোকের চোখে আজও
মান হয়ে রয়েছে, আর সে দাগ নারায়ণের বুকের
ভৃগুপদচিহ্নের মতন হয় তো চিরস্থায়ী হয়েই রইলো।
এতবড় অভাগীকে যে শুধুই নিজের দয়াগুণে আশ্রয়
দিয়ে রেখেছেন,—তেমন কথা বিশ্বাস করবার মত
উদারতা এ সংসারে ক'জনের আছে? তার উপর
এখন আপনি বিয়ে করেছেন। আপনার স্ত্রী,
বৌ-রাণীর কানে যদি ওঠে, আপনাদের দাম্পত্য
জীবনের শাস্তি নষ্ট হবে, সে আমি জানি বই কি!
তা নয়, তা নয়; বিশ্বাস করুন। কিন্তু সত্যি সত্যি
আর যে আমি পারচি না। আমার এ বন্ধনহীন
অবস্থা আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না! আপনি
বুঝতে পারছেন না, আমার এই খাঁচা আমার কত
বড় অসহ্যই যে হয়ে উঠেছে! এর বাইরে আমার
কাজ দিন—বা হোক একটা সামান্য কাজ দিন।
কাজের অভাবে আমি ম'রে যাচ্ছি। আমি যে
একটা মানুষ, আমি যে বস্ত্র নই, এই বিড়ম্বনার
প্রাণ আমার বার হয়ে যাচ্ছে। শুধু গান, শুধু
বাজনা, শুধু খাওয়া ও ঘুমান, এ কি সহ্য করা যায়?”

সুখমা স্বগভীর নিশ্বাসে যেন তাহার অন্তরস্থ অসহ-
নীয় যন্ত্রণানলের অনেকখানি বাহিরে প্রেরণ করিয়া
নীরব হইল, কিন্তু নরেশচন্দ্রের কোমল চিত্তে
তাহার সেই মর্ম্মবিদারী বেদনার কাতর কণ্ঠ অনেক-
ক্ষণ পর্যন্তই সুরভরা বীণার তারের মত আপনা
আপনি বাজিয়া চলিল। এ যে কত বড় ব্যথার অভি-
ব্যক্তি, কি হতাশার আবেদন, সে কথা যে তিনি
জানিতেন।

তিনি একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, “আমি
বুঝি বই কি বেদানা! তোমার দুঃখ যদি আমি না
বুঝতুম,—সেই প্রথম দেখার দিনে, একটুকু ছোট্ট মেয়ে
যখন তুমি, সেই তখন থেকেই যদি না বুঝতুম,—তা
হ'লে হয় তো তোমায় আজ আমার এত কাছে এনে
দিতে পারতাম না! আমি জানি,—তোমার দুঃখ

আমি জানি। তোমার আত্মত্যাগ সেও যে কত বড়, তাও আমার অজ্ঞাত নয়। সে যদি ভুলতে পারতুম, আজ তোমায় আমাকে চিঠি লিখে ডেকে আনতে হতো না। কিন্তু শোন সুসমা! তোমার এই বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা আমি ক্রমাগতই ভেবেছি, ভেবে কিন্তু কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পাই নি। দেখ, হয় তো এখনও অনেকদিন তোমায় বাঁচতে হবে। তার আগে রোগ ও জ্বরার আক্রমণে অক্ষম হয়ে সেবার দরকার হওয়ারও কিছুই বিচিত্র নয়। তার পর একটা অবলম্বন না রাখলে চিরদিন তোমার কাটবেই বা কি নিয়ে? কোন একটা পথ তুমি এখনও বেছে নাও।”

সুসমা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না, বা দিবার চেষ্টাও দেখাইল না।

নরেশ তাহার এই নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্যে ইহাকে অর্ধ-সম্মতি মনে করিয়া ঈষৎ উৎসাহিতভাবে কহিতে লাগিলেন—“তোমার মায়ের যে ইচ্ছার উপর আমি তোমার শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম, দেখছি, তোমার মনের সঙ্গে সেটা ঠিক সায় দিচ্ছে না। তুমি সে দিকে মন দিতে পারচো না।—”

সুসমা কহিল, “তাই বা পারচি কই?”

নরেশ ক্ষণকালের জ্ঞাত সচিন্তিত নীরব থাকিয়া পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে লাগিলেন “কিন্তু একটা মানুষের জীবন যে কোন রকমের কষ্টবন্ধন-শূন্য, নিরালস্য ও ভবিষ্যতের আশাভরসাবিহীনভাবে টেকে থাকতে পারে না, সে তো তুমি ক্রমেই বুঝতে পারচো? তাই অনেক ভেবেই আমি—যাক্ কিন্তু হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য যে সব সমাজে সমাজবিধির নিয়ম একটু শিথিল, সেখানের কোন কোন লোকে—”

যে কথাটা নরেশচন্দ্রের জিভের আগায় আটকাইয়া পড়িতেছিল, সেটা শেষ করিবার প্রয়োজনও হইল না। অকস্মাৎ উচ্চ এবং মর্ম্মভেদী কণ্ঠে, “আপনি এই কথা বলেন!—”

এইটুকু বলিয়া উঠিল এবং তার পরই বক্ষবদ্ধ ঘুরিয়াপড়া পাখীর মত স্থলিত পদে সুসমা প্রায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার বুক চিরিয়া তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া তখন একটা উদ্দাম ক্রন্দন ঝরণার মতই বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে যে কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

নরেশচন্দ্র অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারও

বুকের মধ্যে তখন একটা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যথার সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। বহুদিনের পুরাতন অথচ অ-বিস্মৃত স্মৃতি মনের মধ্যে যেন নূতন হইয়া আবার ফুটিয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কহিলা তাপস চাহি মোর মুখে—

কোন দেব আজি আনিলে দিবা?

তোমার পরশ অমৃত-সরস—

তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

—কাহিনী।

আট বৎসর আগের কথা;—বর্ষার ঝিপ্ ঝিপে বৃষ্টিতে কাদায় রাস্তা-ঘাটের দুর্দশা যেমন হইতে হয় তেমনি হইয়াছে। আকাশ ঘোলাটে, চলনামা গঙ্গার জলের মতই তাহারও যেন কর্দমাক্ত ময়লা রং। সূর্য্যের দেখা-শোনা পাওয়াই ভার, রাত্রে চাঁদ তারা যে কত দিনই ওঠেন নাই, তার হিসাব ছিল না। এই রকম সময়ে একদিন চাঁপাতলার গলির মোড়ে একখানা মোটর গাড়ী কণ্ঠে সৃষ্টে প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রবেশপথেই তার কল বিগড়াইয়াছিল, সে আর চলিল না। গাড়ীর আরোহী দুজন ইহাতে বেজায় বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ মাদ্রাজী সোফারের সঙ্গে বকা-বকি করিলেন ও শেষটার অগত্যা নামিয়া পড়িতে হইল।

দুজনের মধ্যে এক জন অপর জনকে বলিলেন, “ওহে ননি! আজ আর তা হ’লে হলো না, চলো, ট্যাক্সি নিয়ে সিনেমা টিনেমা কোথাও একটা ঘুরে আসা যাক।”

ননী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, “কিন্তু তার গানের খ্যাতি শুনে আপনি যে গান শুনতে আজ আসবেন, এ খবর আমি তাকে পাঠিয়েছি। ডাব্লিম আপনার জন্য যে অপেক্ষা ক’রে থাকবে। আমি তাকে খবর দিয়েছি যে, থিয়েটারে তোমার গান রাজা বাহাদুরকে মুগ্ধ ক’রে দিয়েছে।”

‘রাজা বাহাদুর’ অপ্রসন্ন ক্রকুটি করিলেন, বলিলেন, “তা ব’লে তো আর কাদা মাখামাখি হয়ে যেতে পারিনে। তা ভিন্ন অত সব বলতেই বা তুমি গেলে কেন? গান অবশ্য ভালই লেগেছিল, যে দিন হয় তখন একদিন শুনলেই চলতো। বিশেষতঃ ওদের

বাড়ী গিয়ে গান শুনতে আমার তেমন প্রবৃত্তিও
হচ্ছিল না। এ হয় তো ভালই হ'লো।”—

আর কি বলিতেছিলেন, বলা শেষ হইল না,
পথের পাশের কর্দমাক্ত অন্ধকার হইতে কে এক জন
বলিয়া উঠিল—“বাবু! বাবু মশাই গান শুনবেন?”

নরেশচন্দ্র কি বলিতেছিলেন, ভুলিয়া গিয়া
মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ওই শোন
হেননীলাল! গান শুনবার আবার অভাব কি,
যে তার জন্ত এই গলির কাদা ভাঙতে হবে? গান
স্বয়ং এসেই আমাদের আমন্ত্রণ করচে!—কই কে
গান শোনাতে চাইছিলে গা? এসো না, গান আমি
শুনতে রাজী আছি।”

মোটর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অন্ধকার গলির
ওধার হইতে একটি ছোট মেয়ে এধারে আসিয়া
দাঁড়াইল। মেয়েটির পরণে একখানি গোলাপী
রংএর সস্তোষপুরের ডুরে, গায়ে একটি ঢলঢলে
গোলাপী সিল্কের বাজারে কেনা জ্যাকেট, এক হাত
কাঁচের ঝুরো চুড়ি, কপালে তেলেজলে চকচকানো
চুলের পাতা নামান এবং তাহারই নীচে একখানা
বড় গুলপোকার টিপ। বয়স তাহার সাত আট
বছরের বেশী মনে হয় না। পাতলা ও অপুষ্ট দেহ,
কিন্তু রংটুকু দিবা ফুটফুটে এবং মুখখানিও সুন্দর।

এই বৃষ্টির রাতে জনবিরল অপরিচ্ছন্ন গলির
মধ্যে একা এমন সুসজ্জ একটি ছোট বাঙ্গালীর
মেয়েকে গান শুনাইতে ব্যগ্রভাবে উত্তত দেখিয়া
নরেশচন্দ্র কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। সাজ
পোষাক চেহারায় তাহাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে মনে
হয়, ভিখারীর মেয়ে কখনই নয়। তবে এমন করিয়া
সে পথের মধ্যে গান শুনাইতে চাহিল কি জন্ত—
এই কথাই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন।
এমন সময় মেয়েটি ঈষৎ একটুখানি সঙ্কোচের
সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু! এইখানেই কি
দাঁড়িয়ে গান শুনবেন? না আমার বাড়ীতে
আসবেন?”

ননী এই কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া
কৌতুকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, “ওহে, রাজা!
খুকিমণিটি যে আবার বাড়ীতেও ডাকে হে!
ব্যাপারখানা কি?”

নরেশ কিছু ব্যথিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “তোমার বাড়ী কতদূর? তোমার গান
শুনলে তোমাকে কিছু দিতে হয়?—না, অন্ধকার
গান শুনাতো?”

মেয়েটির চোখে জল আসিয়াছে, তাহা নিকটস্থ হইয়া গেছে।

মোটরের আলোর দেখা গেল, সে ঢোক গিলিয়া
গিলিয়া সেই চোখের জলটাকে দমন রাখিল ও
কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিল, “অমনি ত শোনাইনে,
পরসা দিতে হয়।”—ক্ষীণ কণ্ঠে ইহা বলিয়াই তার-
পর হঠাৎ যেন চমক-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুর্ব-
লতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া
উঠিল, “অ-বাবু! আসুন না, গান শুনবেন,
আসুন না। আমি খুব ভাল গাইতে পারি।
আপনার দিবি—সত্যি বলচি।”

ননী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনশ্চ বন্ধুকে
সম্বোধন পূর্বক ইংরাজী ঝাড়িল, “হোয়াট এ লিটল
উইচ সি ইজ!”—তার পর সেই মেয়েটিকে বলিল,
“এই ব্যেস থেকেই খুব তো তৈরি হয়ে উঠেছে
দেখছি! ঘরে তোমার আর কেউ আছে বলতে
পারো, না তুমিই?”

মেয়েটি আবার জলভরা চোখে ঝাড় নাড়িল
এবং আবার সেই রকম ঢোক গিলিতে গিলিতে
অশ্রুজলে ভেজা অশ্রুধারা “আমার মা আছে, মা’র
বড় ব্যারাম—” বলিয়াই হঠাৎ সে দুই করতলে মুখ
ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। “তৈয়ারি” সে
যে এখনও হইতে পারে নাই—তাহাই যেন ওই
রকমে সে ইহাদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিল।

একটি মুহূর্তের মধ্যেই নরেশচন্দ্র সকল অবস্থা
বুঝিয়া লইলেন। কি দারুণ দুর্বিপাকে পতিত
হইয়াই এই কচি বয়সের মেয়েটি আজ কি নিষ্ঠুর
দুর্ভাগ্যের হস্তে নিজেকে ঠেলিয়া দিতে আসিয়াছে,
সেই ভয়াবহ কাণ্ডটা যেন একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার
মূর্তিতে নরেশের দুই চোখের সামনে অগ্নিময় হইয়া
উঠিল। এই সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত জীবনের
শেষ দুর্বস্থা তাহাদের পাপের ভার প্রায় এই রকমেই
ভরাইয়া তোলে। কোন পতিতপাবন যদি নিজে
আসিয়া এদের একটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই
হয় ত এর একটু সত্বপায় হয়! করুণায় একেবারে
বিগলিত হইয়া পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েটির
কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাড়ী
কি বেশীদূর? কাছে হয় তো আমি যাব।”

মেয়েটি ক্রমালে চোখ মুছিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া
বলিল, “ওই বড় বাড়ীটার একতলার একটা ঘরে
আমি আর মা থাকি, দূরে যেতে আমার ভয় করে,
আমি পারি না।”

নরেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, “চলো।”

সোফার বলিল, “রাজা সাহেব! গাড়ী ঠিক

ননী উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাব করিল, “ওহে, তা হ’লে এটিকে কিছু দিয়ে ডালিমের ওখানেই যাওয়া যাক চলো।”

নরেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়াই অগ্রসর হইতে থাকিয়া সঙ্গিনী মেয়েটিকে সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নামটি বল তো?”

সে বলিল, “আমার নাম সুসমা। কিন্তু আমার সবাই বেদানা ব’লে ডাকে।”

“তুমি ক’ বছরের?”

মেয়েটি বলিল, “ন’ বছরের।”

“নয়! তা কিন্তু মনে হয় না। আচ্ছা, গান গেয়ে তুমি রোজ কত ক’রে পাও?”

সুসমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তার পর আবার তেমনি সলিলদ্রবর্ধে উত্তর করিল, “এই তিন দিনে এক টাকা বার আনা পেয়েছি, তাতে মার এক শিশি ওষুধ বই হয়নি।”

নরেশ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অত কম কেন? একটা গানে কত নাও?”

সুসমা বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, সে এবার আর তাহা গোপন-চেষ্টা না করিয়াই জবাব দিল, “কত আর নিই, যে যা দেয়। কেউ শুনতেই চায় না, অনেকে এমন ঠাট্টা করে যে, আমার গাইতে ভাল লাগে না। আজ তাই সারাদিন আসি নি, এমন মা’র বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—কি করি, তাই এলুম। না হ’লে—”

মেয়েটি আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তাহার ক্ষুদ্র শরীরটুকু ছলিয়া ছলিয়া উঠিয়া তাহার অসহ্য দুঃখ জানাইয়া দিতে লাগিল।

পাপের পরিণাম যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও; তরঙ্গিনীর রোগে রোগে এমন দশা হইয়াছিল যে, চোখে সে যেন দেখা যায় না। সে’ৎসে’তে ঘরের মেজের ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ বিছানার ককাল মূর্তির মত মা পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় আতঁনাদ করিতেছে, গৃহসজ্জার মধ্যে ছ’ একটি ওষুধের শিশি, একটি জলের ঘটি ও এক পাশে ছ’ একটি হাঁড়িকুড়ি ও ময়লা কাপড়-চোপড় পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক ছরবছাপর গৃহের মধ্যে গৃহস্বামিনীর কন্ঠা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, এই ঘরের গৃহস্বামিনীর সহিত তুলনায় তাহার সাজসজ্জাকে তখন কষ্ট বড় যে কৃত্রিম বলিয়াই বোঝা গেল, সে যেন বাহিরে থাকিতে অসুভবও করা যায় না। মেয়ের সাড়া পাইয়াই সেই ককালবিশিষ্ট মুখ্য তার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে প্রবল তীক্ষ্ণ

স্বর বাহির করিয়া বদ্ধ জন্তুর অস্থপায় হিংস্র গর্জনের অল্পকল্পে চোঁচাইয়া উঠিল, “পোড়ারমুখি! অ-পোড়ারমুখি! এরই মধ্যে যে আবার ছুটে চ’লে এলি বড়? এবার যদি পরমা না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিস্ তো এই মরতে মরতে উঠেও খেংরার চোটে পিঠের চামড়াখানা তুলে নেবো, জেনে শুনে ঢুকতে আসিস্। পোড়ারমুখি, তোর আবার ভদরআনির অত পট-পটানি কেন্ লা শুনি? লোকে ঠাট্টা করলে গুর লজ্জায় মাথা কাটা যায়! ওরে আমার লজ্জাবতী লতা রে! এর পরে খাবি কি ক’রে? দাসীগিরি করলেও যুে কোন ভদর-লোকের ঘরে তোকে ঠাই দেবে না, তা জান্চিস কিছু?”—

সুসমা ছলছল চোখে মায়ের কাছে ঘেসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুগাঢ়স্বরে কহিল,—“রাজাবাবু গান শুনতে এসেছেন।”

“ওমা! তাই বল! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, যে আমার মৃতন দীনের কুটীরে আজ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো! ওমা, ও বেদানা! আসনখানা এনে রাজাবাবুকে পেতে দাও মা, পেতে দাও। আঃ, এমন আধমরা হয়েও প’ড়ে আছি যে, উঠে ব’সে আপনাদের মতন মহাজনদের একটু সম্বর্দ্ধনা ক’রে নেবো, সেটুকুও শক্তি আমার পোড়া দেহে নেই।”

নরেশ ও ননীলাল আসন গ্রহণ করিলেন, সুসমার গানও একটার পর একটা করিয়া তিন চারটে শোনা হইয়া গেল। গলা শুনিয়া নরেশের তো বটেই, এমন কি ননীবাবুরও আর এই সন্ধ্যাটাকে নিতান্তই ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল না। গান শুনিয়া নরেশ তরঙ্গিনীকে বলিলেন, “সুসমার এমন গলা, ওকে কেন কোন্ থিয়েটারে দাওনি?”

তরঙ্গিনী ফৌস করিয়া একটা জলন্ত নিশ্বাস ফেলিল, “দেখুন, রাজা সাহেব! পাপের পথে যতই এগিয়ে গেলুম, পাপের ভারে মন আমার ততই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সুখ খুঁজতেই বাড়ীর বাইরে এসেছিলুম, খুঁজে দেখলুম,—তার একটা কণাও পেলুম না। আমার সেই কুঁড়েঘরে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, এই বাড়ীর তেতালাতেও তা পাইনি, তাই বড় সাধ ছিল, ওকে ও পথে আর যেতে দেবো না। ওর গলার জন্তে বছরখানেক আগে থেকেই ওর জন্তে ওরা দর দিচ্ছিল, আমি যেতে দিই নি। কি মনে করেছিলুম জানেন? আমার সব টাকা দিয়ে ওর জন্তে কোম্পানীর কাগজ কিনে দোবো, তার আরে ওর খাওয়া-পরা চলবে,

আর ওকে খুব গান-বাজনা শেখাব, বড় হয়ে ও একটা সঙ্গীত-বিদ্যালয় খুলবে, তাই থেকে ওর নামও হবে, পয়সাও হবে, আর ধর্মও থাকবে। তা হলো না। তা হলো না,—ভগবানের ইচ্ছে নয়—তা হলো না।”

নরেশ এই রূঢ়ভাষিণী নির্ধরপ্রকৃতির পতিতা মায়ের মনের ভিতরের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে সেই মুহূর্তেই তাহার জন্ম অনেকখানি সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার টাকা ছিল, তা হ’লে এমন হ’লো কেন?”

তরঙ্গিণী বলিল, “ঠিকিয়ে নিলে মশাই! ঠিকিয়ে নিলে! ভদ্রলোক মনে ক’রে শ্রামলাল পাইনের হাতে দশ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ কিনতে দিলুম। সেই টাকা নিয়েই সে ফেরার হলো! উল্টে তার পিছনে পুলিশ ডিটেক্টিভে কত রকমে কত টাকাই আমার খরচ হয়ে গেল মশাই! ধনে-প্রাণে আমার সে মেরে গেল! তা যদি ধর্ম থাকেন, না হ’লে একদিন ঐ টাকা নেওয়া তার বেকাবে, ওম্নি হজম করতে পারেন না।—” আরও অনেক কটুক্তি সে তাহার নিজের ধনের অসৎ পথের অংশীদারের উদ্দেশ্যে ফোয়ারার মতই উৎসারিত করিয়া দিল। তার পর মনের জ্বালা, গালির বজ্রায় অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে পরে কথঞ্চিৎ শান্তভাবে পুনশ্চ নিজের কাহিনী ফিরিয়া আরম্ভ করিল। অনেক আড়ম্বরে নিজের সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিনের সবটুকু খবর দিয়া মোট কথা সে এইটুকু জানাইল যে, সেই চৌর্য্য ব্যাপারের পর হইতেই মনের অত্যন্ত আঘাতেই তার বাতজর হয়, তার উপর উকিল বাড়ী, পুলিশ থানায় ছুটাছুটি ইত্যাদিতে রোগ বাড়িয়া যায়। উপার্জন বন্ধ, —চিকিৎসার খরচ প্রথমে গহনা, শেষে আসবাব-পত্র বেচিয়া চলিতে থাকে। কালের ধর্ম্মে গহনা-গুলায় সোনার ভাগ কমই ছিল; বিলাতি সোনা, পাথর, মতি এই সবই কিনিবার সময় দাম লাগে বেশ, বেচার বেলায় সিকি হইয়া যায়। শেষে বেচিতে বেচিতে যখন সবই ফুরাইয়া গেল, কেবল প্রাণটাই বাকি রহিল, ডাক্তারও ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেও শুধু পথ্য মেলা পর্য্যন্ত তার হইল। প্রথম কিছুদিন ধার-কর্জ বন্ধ-বান্ধবের দয়াধর্ম্মে চালাইয়া—শেষে সে সবও যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অনুরূপায়েই স্বমমাকে রোজগার করিতে পাঠাইতে হইল। তাহাকে থিয়েটারে পাঠানই স্থির হইয়াছে,

কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না। কাঁদিয়া উঠিয়া পা জড়াইয়া ধরে, বলে, অত লোকের সামনে গান তাহার গলা দিয়া বাহির হইবে না;—বরং সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পয়সা আনিয়া দিবে, তবু ওখানে যাইতে পারবে না।

তরঙ্গিণী বলিল, “দেখুন রাজাবাবু! মেয়েটার ঐ কথা শুনে আমারও কি আর বুক ফেটে যায়নি? আমিই তো ওকে সেই একরত্তি বেলা থেকে পাপকে ঘেঁষা করতে শিখিয়ে এসেছি। ‘আমার পাপ আমার সঙ্গেই বিদায় হোক, ওকে আমার সে ঘেন কিছুতেই স্পর্শ করে না’,—এই যে আমার ঠাকুরের কাছে একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু কি করবো বলুন, পোড়া পেটের দায়ে শেষ-কালে তাই আমায় করতে হলো। তা আপনি বলুন তো ও রকম ভিখীর মতন পথে বার হওয়ার চাইতে এখন থেকেই থিয়েটারে ঢোকা ওর পক্ষে ভাল নয় কি? আপনি বরং দয়া ক’রে ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারকে একটু ব’লে করে দেন,—দেবেন কি?”

নরেশ স্তম্ভমার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার ভয়ত্রস্ত ছুটি চোখের সঙ্গে তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। সেই শিশুর মত বালিকা-চক্ষের ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিটুকু নরেশের পুরুষ চিত্তকে বিপুলবলে আকর্ষণ করিল। আহা! এই কুপথ অনুসরণে একান্ত অনিচ্ছুক এই একান্ত অসহায় জীবনটিকে সে যদি আজ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া যায়, তাহা হইলে সে কি ইহার ভবিষ্যতের সমুদয় পাপ এবং তাপের জন্ত সম্পূর্ণরূপেই দায়ী হইয়া থাকিবে না? তাহার বুদ্ধি—তাহার বিবেক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, “নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়, তাহাকে—শুধু একমাত্র তাহাকেই এই অসহায় জীবটির সমস্ত হৃদয়-জন্ত—এখানে নাই হোক, আর এক লোকের সব চেয়ে বড় দরবারে জবাবদিহি করিতে হইবেই হইবে। তখন সে বলিবে কি? ঘণা করিয়া সে ইহার দিকে চাহে নাই,—এই কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারিবে? ঘণা বাস্তবিকই তো ইহাদের তাহারা করে না! তা করিলে ডালিমের গান শুনিতে এই বর্ষার রাত্রে বাহির হইয়াছিল কিসের জন্ত? অবজ্ঞায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিয়া-ছিলাম,—এমন কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে, লজ্জায় কি মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা করিবে না? তিনি যে এর আসন্ন বিপদের ঠিক সন্ধিক্ষণেই তাহার রক্ষা-হস্তের মধ্যেই এই অনন্তসহায় ভীরা দুর্বল কণী

হস্তখানি টানিয়া আনিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! কেমন করিয়া সে ইহার এতবড় দুর্দশার দিনে ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? না, সে তাহা পারে না।—মহুয্যতের দিক্ দিয়া তো নয়ই, অমাত্য হইলেও নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে কদর্য্য সৃষ্ট কাক,— তাহাও সহায়চ্যুত কোকিলশিশুকে নিজের কুলায়ে লালন করে, ফেলিয়া দেয় না।

নরেশ একটু পরেই বিদায় লইলেন, আসিবার সময় সুষমার হস্তে দশটি টাকা দিয়া তার মাকে বলিয়া আসিলেন, “সময় মত তিনি আবার আসিবেন, তাহাদের খরচ তিনিই দিবেন, কিন্তু আজ হইতে সুষমা তাহার মতামুত্তী হইয়া চলিবে এবং তাহাকে না জানাইয়া বাড়ীর বাহির হইতে পাইবে না।”

সুষমার বয়স যদি ন’বছর না হইয়া চৌদ্দ হইত তো তরঙ্গিনী বা ননীবাবু কিছুই বিস্মিত হইত না। তাহা নয় বলিয়াই দুজনেই একটু একটু বিস্ময় বোধ করিল। কিন্তু তখনই কি ভাবিয়া লইয়া পতিতা করজোড়ে কহিল, “কিন্তু আমারও একটি নিবেদন আছে রাজাবাবু! আপনি দেবতা মানেন?”

“কেন?”

“তা হ’লে দেবতার নাম নিয়ে শপথ করতে হবে, বেদনাকে আপনি কোন দিনই ত্যাগ করতে পারবেন না।”

নরেশ শুধু বলিলেন, “আচ্ছা।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গগন ব্যবধান, তবুও মনঃ-প্রাণ,

না সাঁপি যদি বুক না ফাটে

তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস

স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,—

ভাঙিলে সে স্বপন—মরিতে নার যদি—

ব’ল না ‘প্রেম’ তবে কভু তায়।

—তীর্থরেণু

সুষমার মা মাসখানেকের মধ্যেই মরিল। তখন সুষমাকে লইয়া নরেশ একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। পতিতার গর্ভজাতা কন্যাকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখা সম্ভব নয়; অথচ থাকেই বা সে কোথা? তাহার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির যে পরিচয় তিনি পাইতেছিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি মমতায় চিত্ত তাঁহায় পরিপূর্ণ হইয়াই উঠিতেছিল, এমন জীবনটি যেমন করিয়াই হোক তাঁহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিতে

হইবে; পাকের মধ্যে জন্মিলেও তাহাকে পঙ্কজ-রূপে ফুটিয়া উঠিতে সহায়তা করিতে হইবেই। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভবানীপুরের প্রান্তে এই ছোট্ট বাড়ীখানি তাহার নামে কিনিয়া দিলেন। একটি বৃদ্ধা দরওয়ান ও একটি বৃদ্ধা চাকর রাখিয়া তিনি সেই বাড়ীতে এই ভিন্ন জগতের মেয়েটিকে এক রকম বন্দী দশাতেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়াই রাখিলেন না। কারণ, ইহার পরিচর্যা করিতে স্বীকৃতা হইবে, এমন দরের যে ঐ, অসৎ শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয় তাদের মত অল্পই পাওয়া যায়—এই রকমই নরেশের বিশ্বাস ছিল।

সুষমার মায়ের সাধ ছিল, মেয়ে সঙ্গীত-কলাটা ভাল রকমে আয়ত্ত করিয়া তাহারই চর্চায় ও শিক্ষায় জীবনোৎসর্গ করিতে পারে, নরেশচন্দ্রের ইহা অসম্ভব ঠেকিল না, এই রকমই একটা কোন পথ ইহাদের জন্ত তৈরী করিয়া না দিতে পারিলে এদের জীবনই বা আশ্রয় পায় কোথায়? আজকাল তো অনেকেই মেয়ে-বউদের গানবাজনা শিক্ষা দিতেছেন, এদের মধ্যে যারা পাপের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুপথে জীবিকার্জন করিতে চায়, তাদের লইয়া যদি একটি সঙ্গ তৈরী করা যায়,—অবশ্য বিশেষভাবে পরীক্ষা লইয়া,—তবেই ইহাতে প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে। তাহারই অন্তঃপুরিকাদের গানবাজনা শিখাইতে পারে। বৈষ্ণবীরা তো অন্তঃপুরে ভিক্ষা লইতে যায়, মিসনরী মেমেদের সঙ্গে যে সকল দেশীয় খুশ্চান মেয়েরা যিশুর গান গাহিয়া ও শেলাইবোনা, একটু আধটু শিখাইয়া বেড়ায়, তাদের মধ্যেও তো ঢের জিনিষ ছিল, ধর্ম্মশিক্ষার ও সঙ্গ-মধ্যের শাসন-সংযম-তায় তাহাও সংযতভাবে চলিতে শিখিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার অধিকার লাভ করিয়াছে। তেমনি এদের লইয়াও যদি একটা কর্ম্মশালা খোলা যায়, মন্দ হয় কি? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নরেশচন্দ্র ওস্তাদ রাখিয়া সুষমাকে গানবাজনা ভাল রকমেই শিখাইতে লাগিলেন।

হরিধন ঠাকুরা তাহার তানপুরা সেতারের ওস্তাদ হইল, ননীবাবু হইল হারমোনিয়ম ও এসরাজের এবং একজন বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী আসিয়া বীণ শিখাইতে লাগিয়া গেল। ইংরাজী বাংলা লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও হইল। সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নরেশচন্দ্র আবর্জনা ঠেলিয়া ফেলিয়া ধূলা-ময়লা কাটাইয়া ইহার ভিতরকার খাঁটী সোনাটুকু ধুইয়া বাহির করিতে চাহিতেছিলেন। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে দৈবাৎদৃষ্ট একটি বুদ্ধ সাধুর প্রতি তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিলে তিনি

তঁাহাকে ইহার নিকট টানিয়া আনিলেন। মেয়েটির ভিতরকার আগ্রহ ও সদিচ্ছা সাধুটিকেও বিগলিত করিল, তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে উহাকে যখন তখন আসিয়া সংস্কৃত পরিচয় করাইতে আরম্ভ করিয়া মুখে মুখে নীতিশাস্ত্রের অনেক শিক্ষাদানই করিলেন। ইহাকে পাইয়া সুষমা নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করিল। এমন মহৎ সঙ্গ ও প্রকৃত স্নেহ সে তো কল্পনাতেও কখন পায় নাই।

এ দিকে কিন্তু বাহিরে বাহিরে নরেশ ও সুষমা সম্বন্ধে অনেক কিছুই রটিয়া উঠিতেছিল। নরেশ—অবিবাহিত ধনী ও নিরতিভাবক নরেশ একটা কম বয়সের—সে যে কত কম, সে হিসাব রাখিতে কার গরজ পড়িয়া গিয়াছে—মেয়েকে একখানা সাজান বাড়ীতে রাখিয়া তার উপর বিস্তর খরচপত্র করিতেছেন, তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা আসিয়া সেখানে গানবাজনার মজলিস জমাইয়া তুলে;—আবার সে মেয়েও দেখিতে ভাল, গায় ভাল, বাজায় উৎকৃষ্ট!—এ সব যোগাযোগের মধ্যে সঞ্চারিতঃ মানবকল্পনা কিসের সন্ধান পাইয়া থাকে! কাজেই চারিদিকে সুষমা সম্বন্ধে যে গুজব রটিল, সে তার বেশ অনুকূল নয়। নরেশের বাকি বন্ধু যারা, তারা ননীবাবুদের প্রতি তীব্র ঈর্ষাপ্রদর্শন করিয়া নরেশকেও তাঁহার একচোখোমীর জন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অনুযোগ করিতে থাকিল। নরেশ ব্যস্ত হইয়া সকলকেই অন্ন বিস্তর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহাদের আন্দাজ একেবারেই ভিত্তিহীন, সুষমা তাঁহার আশ্রিতা।—আর কিছুই নয়। সে নেহাৎ ছেলেকান্না এবং অত্যন্ত নির্মল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া চোখের ইসারা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “বেশ তো, হোক না সে সতীশ্বরের ধ্বংসপন্থ! আমাদের তাতে তো কোনই আপত্তি নেই। আমরা শুধু তার ছোটো গান শুনে আসতে চাই, এই বৈ তো নয়।”

অগত্যা গান শুনাইতে হইল এবং আরও ছুচার-বার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পার পাওয়া গেল না। ইহাদের মধ্যের দু এক জন গুচ্ছ রহস্য করিয়া সুষমার সঙ্গে কথা কহিতে যাইতেই নরেশ চোক রাঙ্গা করিয়া চাহিলেন এবং সেই হইতে তাঁহাদের বন্ধুত্বের অবসান হইল। নিজের সম্পত্তির উপরে উহার প্রবল আধিপত্যের চেষ্টা বোধ করিয়া বাকি সকলে কদাচ সুষমার গান শুনিতে চাহিলেও তাহাকে অসম্মানের ভাবে সম্ভাষণ করিতে ভরসা করে না। কিন্তু তবুও সুষমা ইষ্ঠাৎ এক দিন নিজের সম্বন্ধে লোকমতটা ভালরূপেই জানিতে পারিল।

সাধুটি বদরীনাথ চলিয়া গিয়াছেন, সুষমার বয়স এখন ষোড়শ পূর্ণ ননীবাবু ও হরিধন এখন শুধু সপ্তাহে একদিন করিয়া আসে, বাকি দুজন একদিন অন্তরে। সুষমার মনটা আজকাল বড়ই শূন্য শূন্য বোধ হইতেছিল; নরেশ ইদানীং আর তেমন ঘন ঘন আসা-যাওয়া করেন না। আসিলেও আর যেন তেমন প্রাণখোলা ভাবে তাহার সহিত না মিশিয়া চুপচাপ গানের বুলিই শুনিয়া যান এবং গানের শেষে সবার সঙ্গেই, কোন দিন সকলের চেয়ে আগে উঠিয়া, নিঃশব্দে প্রস্থান করেন। কে জানে কেন, সঙ্গতই হোক আর অসঙ্গতই হোক, সুষমার প্রাণ ইহাতে ব্যথিত হয়, তাহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগে।

একদিন সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিল। কলীবাটে মহিলা সমিতি হইল। স্বদেশী সম্বন্ধে কোন ভদ্রমহিলা কি বক্তৃতা করিবেন। নরেশকে পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সে সেই সমিতিতে গেল। সে যেখানে বসিয়া ছিল, কমবয়সী কতকগুলি বৌ-ঝির সেইখানে সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এক জন অপরকে বলিল, “দেখেছি, ওর মুখের সঙ্গে আমাদের ছোট বোদির একটু যেন আদল আসে! কে-ভাই ও?”

“জ্যাকেটটির ছাঁট তো বড় সুন্দর! জিজ্ঞেস কর না, কাদের বাড়ীর মেয়ে না বউ?”

“ওমা, বউ কি বলচিস্ লো! সীতের নাকি সিঁদুর আছে! জান না ভাই—ও কে?”

অবশেষে জানাজানি হইল। সুষমা উহাদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিরত হইয়া স্বীকার করিল, তার বিবাহ হয় নাই, তার বাপকুলের কেহ নাই। তার বাপের নাম জিজ্ঞাসায় সে নিরুত্তর রহিল। তার পর কার কাছে থাকে জিজ্ঞাসায় সে যখন বলিল, একাই থাকে, তখন সেই তরুণী মেয়েরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বুদ্ধি করিয়া প্রশ্ন করিল, “তোমরা কি ভাই ব্রহ্মজ্ঞানী? তাদের ঘরের মেয়েরা মেয়েদের মতন পড়াশোনার জন্তে বোডিং টোডিংও তো থাকে শুনেছি। সেই রকমই কি এখানে এসেছ?”

সুষমা শ্রান ও বিপর্যয়ে ঘাড় নাড়িল।

এই সময়েই একটি প্রোঢ়া উহাদের কথাবার্তায় একটুখানি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া তাহাদের সামনে আসিয়া সুষমার মুখের কাছে বুকিয়া পড়িয়া বলিয়া

উঠিলেন, “দেখি কার পরিচয় শোধান হচ্ছে। ওমা! এ যে ওই ‘সুখমাকুটারে’র সুখমা গৌ! অবাক কলি তোরা! ও আবার নিজের পরিচয় কি দেবে তাদের শুনি? চল চল, ওদিকে গিয়ে বসবি চল। ছুঁড়ী-গুলোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে! হরি বলো মন!—”

নিজেদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা কোথায় ঘটিয়াছিল, ভালমতে বুঝিতে না পারিলেও কোথাও যে ঘটিয়াছে, সেইটুকু বুঝিয়া লইয়া সেই অসুস্থসন্ধিৎসা-পরায়ণা তরুণীর দল ছুন্দাম্ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঝনঝন্ শব্দে অলঙ্কার বাজাইয়া সভ্যমণ্ডপের অপর প্রান্তে চলিয়া যাইতে যাইতে পূর্ণ কোতুহলে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “কেন গা! ওকে কি আপনি চেনেন?”

প্রোঢ়া হাতমুখ নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ওমা, তা আর চিনিনে? ও যে কোথাকার এক খেতাবী রাজার রাখা মেয়েমানুষ। ওর সঙ্গে কি আর ভদ্র ঘরের মেয়েদের কথা কইতে আছে মা?”

সুখমার মনে হইল, তাহার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। আলোকময় জগৎ যেন তমসাবৃত হইয়া গেল।

নরেশচন্দ্রও কিছুদিন হইতে এই সম্বন্ধীয় জালা নেহাৎ কমও ভুগিতেছিলেন না। বন্ধু-বান্ধবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুহৃদ ও হিতকামীর দলও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর ভৎসনাপূর্বক এই সর্ব্বনেশে নেশার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। দেশ হইতে বিমাতা হঠাৎ এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহার মর্শ্ব এইরূপ—
বিশ্বস্তমত্রে জানিলাম, তুমি একটা পতিতার সঙ্গ লইয়া উন্নত হইয়াছ, তাহার পায়েই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছ, তাকে রাণীর বাড়া করিয়া রাখিয়াছ। এ সব কি ভাল? অবশ্য তোমাদের মত বড় লোকের ঘরে সবই সাজে, তথাপি বিবাহ না করিয়া শুদ্ধমাত্র হীনসঙ্গে কাটাইলে চলিবে কেন? বংশরক্ষা করা তো চাই। ও সব বা আছে থাক; তা না হয়, এর সঙ্গে একটি বউ আন, সব গোল চুকিয়া যাক। যদি তোমার মত হয়, আমার বোনঝি চামেলীর সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন স্থির করি। চামেলীকে ছোট বেলায় বোধ করি দেখিয়াছ? বড় হইয়া আরও সুন্দরী হইয়াছে! দিবা ভাগর মেয়ে, তোমার সঙ্গে অসাজসু হইবে না।

এই চিঠি পাইবার পর নরেশের দ্বিধাগ্রস্ত মন যেন সম্পূর্ণরূপেই তাহার নূতন চিন্তাধারারই অনুবর্তন

করিয়া একেবারে স্থিরসঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী সুখমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ধ্যাবেলায় একাকিনী সুখমা বসিয়া অর্গানের বাজনার সঙ্গে নিজের মধুর কণ্ঠের যোগ করিয়া গাহিতেছিল—

“ওহে জীবনবল্লভ! ওহে সাধন-হৃদ! ”

আমি মর্শ্বের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু নীরবে যাব, হৃদয়ে লয়ে প্রেম-মুরতি তব।—”

হঠাৎ খুব কাছেই জুতা-পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেশচন্দ্র।

তৎক্ষণাৎ বাজান বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়িতেগেল। মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

নরেশ ব্যগ্র হইয়া বারণ করিলেন, বলিলেন, “বেশ মিষ্টি লাগছিল, জান তো, গান শুন্তে আমি বড় ভালবাসি। যা গাচ্ছিলে গাও, আমি শুনি।”

সুখমা আজ্ঞাপালন করিল। গাহিতে তার উৎসাহ বদ্ধিত হইল। সে গাহিতে লাগিল—

“সুখ দুঃখ সব ত্যজ্য করিছ প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজে হাতে যাহা দিবে তাহা—

মাথায় তুলে লব।”

গান থামিলে তাহার দিকে একটু নত হইয়া নরেশ কোমলকণ্ঠে কহিলেন—“নিজে হাতে ‘যা’ দেব, তা মাথায় তুলে নেবে কি? ‘তোমার মর্শ্বের কথা’ আমি না জানি তা’ নয়; আজ ‘আমার মর্শ্বের কথা’ আমি তোমায় জানাতে এসেছি, তুমি শুনবে কি বেদানা?”

সুখমা এমন সুর ইহার কণ্ঠে কোন দিনই শুনে নাই। আর এই সব কথা! সে ত্রস্ত বিশ্বয়ে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

নরেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন ও তাহার দৃষ্টি হইতে নিজের চোখ সরাইয়া লইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, “আমি তোমায় ভালবাসি।”

সুখমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেশ দেখিলেন, সে হাত দুখানা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি দুই হাতে তাহার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“অনেকদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবেসেছি, দূরে স’রে যাবার চেষ্টা করছিলাম, পারলাম না, তুমিও তো আমায় ভালবাস—আমায় হও। আমি তোমায় চাই।”

সুখমা জোর করিয়া তাঁহার হাতের মধ্য হইতে নিজের মুখ ছিনাইয়া লইয়া পিছু হটিয়া গেল, বারেক মাজ তাহার শান্ত, সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ দৃষ্টি দীপ-শিখার মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ললাটের শিরা সকল ক্ষুরিত হইয়া ধূমকেতুর মত দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে একটি মুহূর্তের জন্ত। পরক্ষণেই অসহায় ও অবসন্নভাবে নরেশের পায়ের তলায় জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে দুটি হাত জোড় করিয়া বলিল—

“আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু ইহলোকে আপনিই যে আমার একমাত্র আশ্রয়—আমার দেবতা! আপনার প্রতিও প্রকৃতা হারালে কি নিয়ে বাঁচবো, আমার তাই বলুন?—” বলিতে বলিতে থর থর করিয়া বায়ুতাড়িত পুষ্প-পেলবের স্নায়ু দুখানি ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পাতায় জমা শিশিরের মত ঝরিয়া পড়িল।

নরেশ তাহার কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি আমার ভুল বুঝেছ বেদনা! তেমন ক’রে তোমায় আমি পেতে চাইনি। আমি স্থির করেছি, তোমায় আমি বিয়ে করবো।”

বিহ্বলচিত্তের মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুখমা উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আপনি আমার বিয়ে করবেন! আমাকে! নিশ্চয়ই আপনার মাথার ঠিক নেই; কিন্তু—”

নরেশ মনের ভিতর দ্বিধা লজ্জা অনুভব করিলেও তাহা গোপন রাখিয়া সপ্রতিভভাবেই হাসিয়া উত্তর করিলেন,—“আমি পাগলও হই নি, নেশাও করি নি, সহজ স-জ্ঞানেই এই প্রস্তাব করছি এবং এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে,—তা আর বদলাবে না।”

শুনিয়া সুখমার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, সে তাহার শাপিত ছুরিকার মতই উজ্জল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নরেশের আবেগময় নেত্রের উপর স্থির করিয়া তেমনি নির্মম কণ্ঠে জবাব দিল—“কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাবে সন্মত নই। আমি আপনার স্ত্রী হতে চাইনে।”

নরেশের মুখের ছবি বিশ্বয় ও বেদনাক্রান্ত হইয়া উঠিল “সে কি!—সুখমা! তুমি কি আমার তবে ভালবাস না?”

বন্ধুকের গুলী খাইয়া ছোট পাখীটি যেমন ঘুরিয়া পড়ে, তেমনি করিয়াই মুহমানা সুখমা আবার

নরেশের পায়ের তলায় ফিরিয়া বসিয়া পড়িল। অনাহুত চোখের জলকে প্রাণপণে রোধ করিতে করিতে অর্ধব্যক্তস্বরে সে কহিল, “আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কি না, ভগবানই জানেন! কিন্তু জ্ঞানতঃ আমার শরীর-মন দিয়া এ জন্মে আমি কোন পাপই করি নি, তাই মনের মধ্যে আপনার পূজা করাকে আমার পক্ষে দুঃসাহস বোধ হইলেও তাতে পাপ করেছি বলতে পারি না। আপনি আমার দেবতা,—আমার দেবতারও বাড়া—আমার ঈশ্বর! আপনাকে মিথ্যা আমি কেমন ক’রে বলবো? কিন্তু যদি কখন জন্ম বদলে আবার মানুষের দেহ—মেঘেমানুষের দেহ—পাই, তবেই তা আপনাকে দিতে পারবো। কিন্তু এ পাপ দেহ—আমি বরং একে খণ্ড খণ্ড ক’রে ফেলবো,—তবু আপনার পায়ে দিতে পারবো না।”

নরেশচন্দ্র এই গভীর বেদনাপূর্ণ আত্মপ্রকাশে গভীরতর সহানুভূতি ও ব্যথানুভব করিলেন। নত হইয়া সুখমার একখানি হাত হাতে লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ আদরের সহিত কহিয়া উঠিলেন, “তোমার দেহ পাপ-দেহ কিসে সুখমা? কোন পাপই তো এ শরীরে তুমি করো নি, তবে কেন অন্তের পাপের কলুষে নিজেকে তুমি ময়লা ক’রে দেখচো? জন্ম সম্বন্ধে তোমার হাত ছিল না, সে জন্ত তুমি দায়ী নও। তোমার যা সাধ্য, তাতে তুমি উচ্চ সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছ।”

সুখমা নিজের হাত যথাস্থানেই বদ্ধ থাকিতে দিয়া মর্শ্মপীড়িতের ব্যাকুল বেদনার সহিত তীব্র বিলাপপূর্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আপনি ভুল করছেন! আমার এ দেহ পাপ-প্রসূত, পাপ-পুষ্ট, এই শরীর দিয়ে আমি আর সব হ’তে পারি, শুধু গৃহস্থের বউ, আর—” সুখমা নীরব হইল।

নরেশ তাহার হাতে একটু অধীরভাবে চাপ দিয়া প্রশ্ন করিলেন, “আর?”

জোর করিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া সুখমা নতচক্ষে উত্তর করিল,—“সন্তানের মা হ’তে পারি না। • সমাজের কাঁহিরে দেশের,দেশের, ধর্মের,কর্মের আর আর অনেক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্যে আপনারা আমাদের নিয়োগ ক’রে আমাদেরও বাঁচান আর নিজেরাও বেঁচে থাকুন, শুধু ড্রেনের মধ্য থেকে তুলে অন্তঃপুরে নেবেন না; কার মধ্যে কতখানি বিষ ফে থেকে যায়, তার কি কিছু স্থিরতা আছে!”

নরেশ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহা লক্ষ্যে সুখমা আরও একটু জোর দিয়া দিয়া বলিতে

লাগিল—“যেমন ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী বা পুরুষের বিবাহ করা অনুচিত, এবং দুই ব্যাধিগ্রস্তদের বিয়ে করা মহাপাপ, তেমনি আমাদেরও এই বিধাত্ত শরীরের রক্ত দিয়ে জীবনষ্টির মত মহাপাপ আর সংসারে কোন কিছুই নেই। আমার মায়ের রক্ত আমার মেয়ের মধ্যে যদি—”

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুসমা দু’ হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।—“আর বলবেন না, আমি পারচি না, হয় তো দুর্বল সামান্ত স্ত্রীলোক লোভে প’ড়ে যাব। কিন্তু তেবে দেখুন, আপনার সন্তান আমার রক্তের দোষে হয় তো—হয় তো—হয় তো ঐ পাপপথে ঐ হীন বৃত্তিতে—ওঃ ভগবান্! ভগবান্! এমন যেন না হয়।”

সুসমার সুগভীর হতাশার মর্শাস্তিক বিলাপ, মর্শের একান্ত প্রাণকাটা অসহায় আত্মতার মধ্যে মিশিয়া অশ্রুট হইয়া গেল। দু’হাত দিয়া ঢাকা মুখ সে নিজের দুই জামুর মধ্যে লুকাইল।

সুসমা চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু তাহার অন্ধিত এই ভয়াবহ চিত্র নরেশের বৃকের মধ্যেও বোধ করি, একটা সংশয়ের আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার এত-ক্ষণকার সতেজ দৃষ্টি ও প্রসন্ন ভাব পরিবর্তিত হইয়া আসিয়া এক্ষণে তাহার স্থলে কেমন যেন একটা সন্দেহাকুল চলচ্চিত্রতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

বতক্ষণই এই ভাবে কাটিয়া গেল। দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙ্গান ছিল। তার পেণ্ডুলেমটা একটা ভ্রমরের গঠনের, একটা পদ্ম ফুলের কাছে সেই ভ্রমরটা ক্রমাগত ডানা মেলিয়া আনাগোনা করিতেছে কিন্তু যেন প্রত্যাখ্যাত হইয়া হইয়াই ফিরিয়া যাইতেছিল, তাহারই ব্যাকুল আবেদনের সুরে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল।

তখন নিদ্রোখিত হইয়া উঠিয়া নরেশচন্দ্র সুসমার দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, “সুদানা!”

“আজ্ঞে!”

“কিন্তু, সুসো! দুটো জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষটা কি একেবারেই তুচ্ছ করবার? এ বিয়েতে আমরা দুজনেই কত সুখী হ’তাম, সেটাও ভেবে দেখ।”

সুসমা হয় তো এই কথাটাই তখন ভাবিতেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে ইহার জবাব দিল,—“এ বিয়েতে আপনাকে স্বজনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে হবে, সমাজে হের হ’তে হবে, আর তা ছাড়া সব চেয়ে বড় যা’ তা তো আগেই বলেছি। এ অবস্থায় যে সত্যকার ভালবাসে, সে কি কখন সুখী হ’তে পারে?—না মরে

যায়? কেমন ক’রে জানলেন যে, দুজনেই সুখী হবো?”

“তা হ’লে কি তোমায় চিরদিনই এই অমর্যাদার মধ্যে ফেলে রেখে দেওয়াই আমার কর্তব্য ব’লে তুমি স্থির করচো?”

“আমার জন্মই যে এই অমর্যাদার মধ্য দিয়ে, আপনি কি তা এত ক’রেই বদল করতে পারলেন—যে, আরও আশা করচেন? লাভে হ’তে এখন যেটাকে ‘পুরুষোচিত দুর্বলতা’ ব’লে লোকে আপনাকে করুণার সঙ্গে মাপ ক’রে চলে, তখন তা করবে না। আর আমি? আমি লোকের চোখে যেমন আছি তাই থাকবো। শুধু তারা ঘণার সঙ্গে এই কথাই ব’লে আমার সাম্রিধ্য ছেড়ে স’রে যাবে, যে ওটা এতদিন রাজা নরেশচন্দ্রের—নরেশচন্দ্রের—” যে লজ্জাকর শব্দটা মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল না, তাহার দুশ্চেষ্টা অধ্যবসায় হইতে উহাকে মুক্তি দিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তোমার কথাই হয় তো ঠিক।”

সুসমা মুখ তুলিয়া বলিল, “আরও একটি ভিক্ষা চাইবো?”

নরেশ শুধু স্তানমুখে চাহিয়া রহিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না।

সুসমা কহিল, “আপনাকে খুব শীঘ্র বিয়ে করতে হবে। আর যত দিন না আপনি আপনার সেই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন, তত দিন আমার দেখা দেবেন না।”

নরেশ গভীরতর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচনপূর্বক ভারাক্রান্তচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, “আচ্ছা।”

দুজনে পাশাপাশি অর্ধ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। রাত্রি তখন গভীর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উঠানভরা চাঁদের আলো যেন থমথমে নিঝুম হইয়া আছে। অঙ্গনের এক পার্শ্বে পেয়ারা গাছটায় একটা পাখী সেই প্রশ্রুট চন্দ্রালোককে দিবালোক ভ্রম করিয়া ঘুমভাঙ্গা ভাঙ্গাগলায় মিনতি করিয়া বলিতেছিল—“বউ কথা কও! বউ কথা কও!—”

বহির্দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ সুসমা দাঁড়াইয়া পড়িল, নরেশচন্দ্র নিতান্ত বিমনা থাকিলেও তাহার এই আকস্মিক অচলতা তিনি অনুভব করিলেন। চলা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া সুসমা হঠাৎ কান্নাধরা দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, “অত্যন্ত লোভ হ’লেও বড় হ’য়ে অবধি

কখনও আপনাকে স্পর্শ করে আপনার পায়ের ধূলা আমি মাথায় নিতে সাহসী হই নি। শুধু আজকের মন্তন একটিবার আশায় সেই অধিকারটুকু নিতে দিন।”

এই বলিয়াই অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে উপড় হইয়া উহার দুই কম্পিত পায়ের উপর মাথা রাখিল এবং বিলম্বে সেখান হইতে নিজের মাথার চুলে মুছিয়া জুতার ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, দেখিতে চেষ্টাও করিলেন না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

তার পর তিন বৎসরের পরে এই দেখা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আশা রেখো মনে,—হৃদ্যে কভু
নিরাশ হ'য়ো না ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবে না,—
হায়, তেমন রাত্রি নাই।
রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে,—
হ'য়ো না গো দিশাহারা,
মানুষের যিনি চালক,—
তিনিই চালান চল তারা।
রেখো ভালবাসা সবার লাগিয়া ভাই,—
জেনো মানবেরে,
প্রভাতের মত প্রভা নান করে,—
জনে, জনে, ঘরে ঘরে।
—তীর্থরেণু।

কলিকাতা মহানগরী এক্ষণে সুপ্তিমগ্ন। সেই নিয়ত কর্ম-কোলাহলময়ী রাজধানীর মধ্যে এক্ষণে কদাচিত্ একটা শব্দ শোনা যায়। পথ প্রায় জনহীন; ভাড়াটে গাড়ী কচিৎ একখানা স্টেশনের পথে বাহির হইয়াছে, অথবা ফিরিতেছে। একটা মাতাল কোথাও স্থলিতপদে গ্যাসপোষ্টে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। দু'একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী এবং হাতের 'বেটন' এক আধ বারের মত রাস্তার উপর দেখা গেল, তাহার জন্ত কিস্ত গলির মধ্যের কোকেনের দোকানে কোন ব্যস্ততাই দেখা গেল না।

বড় রাস্তার উপরকার প্রায় সকল দোকানই বন্ধ, একখানা ময়রার দোকানের সামনে তখনও আলো

জলিতেছে এবং ভিড়ান তখনও বন্ধ হয় নাই, তার তাড়ু-চালানর খরখরানি শোনা যাইতেছে। কোন সময় হয় তো একখানা চলন্ত মোটর সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে থিয়েটার-ফেরৎ নরনারীদের হাঙ্গাকৌতুক অকস্মাৎ একবার যেন অন্ধকারের বুকে আলো ঠিকরাইয়া পড়ার মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কদাচ পকেটে থৈথিস্কোপ রাখিয়া কোন ডাক্তার বিশেষ কোন রোগীর জন্ত আহত হইয়া ছুটন্ত মটরে বসিয়া আছেন দেখা গেল।

বড় বড় সাহেবী হোটেলের ও দেশী বিদেশী থিয়েটার বাড়ীগুলার সামনে গাড়ী মোটর কতকগুলো করিয়া তখনও জমিয়া আছে। উর্দি পরা আর্দালীরা সোফারের পাশে বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুনীবদের দল আহার অথবা বিহারে মত্ত, তাঁহাদের কাছে রাত্রির খবর পৌঁছিতেছে না; ছরবছর এক শেষ এই গরীব ভূত্যের জাতির। তাদের রাত নির্জন পথের ধারেই পোহাইবার উপক্রম করিতেছিল।

আরও এক জায়গায় কিছু আলো, কিছু শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। একটু বড় রকম বাড়ীর সামনে সামনে এক আধখানা গাড়ী মোটরও দাঁড়াইয়া ছিল। সেগুলো ইংরাজ বাঙ্গালী মাড়োয়ারী ভাটিয়া সকল জাতির।

গঙ্গাতীরে এখন কল-কারখানা ও শীমার-শীম-লঙ্ঘের বকবকানি ফৌসফৌসানি সব নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই তীরের বড় বড় আফিস-বাড়ীর জানালা দরজা সব বন্ধ, নিরালোক এবং শুষ্ক। সারা-দিনের কঠোর শ্রমের পর যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্য-গুলো তাদের বিপুল দেহগুলোকে যেখানে সেখানে মেলিয়া দিয়া ঘুমে এলাইয়া পড়িয়া আছে। কে জানে, কখন বাণীর উর্দ্ধস্বরে সারা সहरকে চকিত করিয়া দিয়া জাগ্রত হইবে!

নিরঞ্জন এই সমস্ত দীর্ঘ পথ নীরবে অতিবাহিত করিয়া আসিল। এক পাশে বিপুলায়তন গড়ের মাঠ, হীরক ও মকরত মণির মালা গলার দিয়া ঘুমাইয়া আছে। 'অম্বরজাতীয়' নরনারীর রূপের আলো, পোষাকের চমক সেখানে আর ছিল না। 'ইংরাজের স্বর্গোচ্চান' স্তব্ধ স্থির। 'কিন্নরের' কণ্ঠরব আর তথা হইতে শ্রুত হইতেছিল না। গন্ধর্বলোকের সকল জাঁকজমক ঘুমে কোলে চাপা পড়িয়াছে। কেবল জলের বুকে জাগিয়া আছে শুধু নৃত্যশীল তারার মালা, আর একখানা মহাজনৌ নৌকার বুকে জাগিয়া জাগিয়া একটা চাটগেয়ে মাঝি তাললয়বিহীন এক অপূর্ব রাগিণীর স্বজন-তৎপর হইয়াছিল।

নিরঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া সেই গীত-সুধা উপ-
ভোগ করিল—

“এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকূলে,
চাঁদের হাট মিলাইত গো—
সে রূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো ও—ও—ও—।”

রস ইহাতে যত থাক না থাক, নিরঞ্জনের অন্তরের
পিপাসা অকস্মাৎ যেন তাহাতেই ভরিয়া উঠিল।
ওই যে পশ্চিমবঙ্গের নিকটে অনাবৃত উপহসিত,
উহাদের পক্ষে একটুখানি দুর্বোধ্য ভাষায় এই জন-
সম্পদশূন্য নিঃসঙ্গ রাত্রে ওই নিরঙ্কর মাঝি নিজের
মনের ভাবটি—কাহারও কাছে নয়, শুধু নিজের
কাছেই প্রকাশ করিতেছিল—নিরঞ্জনের বোধ
হইল, উহার ভিতর দিয়া সে যেন সাহেবের আফিস
হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ
করিয়াছে। এই উচ্চারণের বৈসাদৃশ্য, এই শব্দ-
বিন্যাস, এ যে তার বুকের মণি, এই যে তার মায়ের
দান। সে কাদালের মত উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কিন্তু
গায়কের তদ্ভাঙ্গন স্বর শুধু ‘রহিয়া রহিয়া’ ঐটুকুকেই
ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল। গান আর অগ্র-
সর হইতে পাইল না।

নিরঞ্জন কিনারায় কিছুক্ষণ পাইচারী করিয়া
বেড়াইয়া বেড়াইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।
ততক্ষণে চাঁটগোঁয়ে মাঝির সঙ্গীতসাধনা সমাপ্ত হইয়া
গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণভাবেই সমুদয় বিশ্বচরাচর
নিরুন্ম, নিস্তব্ধ এবং নিদ্রিত। ভোরের আলো
লাগিয়া আকাশের তারাগুলো শুদ্ধ যেন ঘুমাইয়া
পড়িতেছিল। গঙ্গার জল মূচ্ছাতুরের তায় পাণ্ডুবর্ণ
ও নিম্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

নিরঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল, আপনাকে
আপনিই বুঝাইতে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, “কিছু-
তেই ভুলতে পারচিনে কেন? অথবা নাই বা ভুলেই,
মন কেন আমার স্থির হচ্ছে না? আমি তো তার
অহিতাকাঙ্ক্ষা করিনি, তার ভালই চেয়েছিলাম।
আমার জন্ত—আমার সেবা করতে গিয়ে তার শোচ-
নীয় মৃত্যু ঘটে গেল, এতে আমার তো কোন হাত
ছিল না? তবে কেন নিজেকে তার হত্যাকারী
ব’লে মন আমার নিজের কাছেও মহাপাপীর মনের
মতন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে? জীবন দুর্ব্বল হ’য়ে
পড়েছে? চারিদিকে কেবল সেই ছায়া—সেই
ছায়াই কেন দেখছি? তার কণ্ঠ নিয়তই কেন
আমার কানে বাজছে? একি হলো আমার?
কালীপদ! ভাই! বন্ধু! তোমার শেষ অনুরোধ

রাখতে পারিনি ব’লেই কি এমন ক’রে পাগল হ’য়ে
যাচ্ছি? চেষ্টা তো করেছিলুম, বিয়ে করবো, স্থখে যথা-
সাধ্য রাখবো সেই ইচ্ছাই তো ছিল, পারলুম না, সে
কি আমার হাত? তবে কেন আমার এ দণ্ড? সব
তো হারিয়েছি,—নিজেকে শুদ্ধ, তবে শুধু তাকেই
দেখি কেন? এবার আর স্বপ্ন নয়! বাস্তব মূর্ত্তি
ধরেই যে সে আমার দেখা দিচ্ছে। কিন্তু—কি
কুৎসিত, কি জঘন্য, কি সঙ্কটের পথ দিয়েই তার
ছায়া আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে! ওঃ, কার মধ্য
দিয়ে,—কার! আর কি কোন রাস্তা সে পেলে
না? নাঃ, আর সহিতে পারচিনে! পালিয়ে তো
এসেছি, আর ফিরবো না, একেবারেই পলাই।
কোন দিন হয় তো কি ব’লেই বসবো। নিজেকে তো
আমার বিশ্বাস কত! না হ’লে আমি—এই আমি—
এই ডবল অনার নিয়ে বি এ পাশ, ফার্স্ট ক্লাশ এমে—
অ্যা—এই কি সেই আমি? নাঃ, নিশ্চয় না।
নিশ্চয় সেই আগের আমি ম’রে গেছি। এ তার—
কে?—”

নিরঞ্জনের প্রতি লোমকুপটি পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া
উঠিল। নিঃসঙ্গ অবোধ শিশু যেমন ভূতের ভয়ে
অন্ধকার হইতে আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনি
করিয়া নিজের সঙ্গকে সে একান্ত ভয়ে অসহ্য বোধ
করিয়া যেন নিজের কাছ হইতে পলাইতে চাহিয়াই
ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। ছুটিতেও
আরম্ভ করিত, হঠাৎ তাহার কানে যেন দৈববাণীর
মতই কোথা হইতে সেই বিজন নদীপুলিনে এক
মানবকণ্ঠের স্বরলহরী ভাসিয়া আসিয়া ঠেকিল।
আকুল হইয়া কান খাড়া করিতেই বোকা গেল, সে
একটা গান এবং নদীতীরেই, তাহার নিকট হইতে
সামান্য একটুখানি দূরে থাকিয়াই কেহ সে গান
গাহিতেছে। বংশীরবাকুষ্ঠ সর্পের মতই সে সেই
শব্দ লক্ষ্যে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে, শব্দ হইতেছিল
কল কল কল। জল কিনারায় অনেক দূর অবধি
উঠিয়া আসিয়াছে, স্রোতের মুখে দূরগামী পণ্যবাহী
কয়েকখানি নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাদের
দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল ছপাংছপ্। নিরঞ্জনের
ভয়ান্ত বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া একটা আশ্বাসের আন্ত-
শ্বাস উঠিয়া পড়িল।

গান গাহিতেছিল একজন স্ত্রীলোক এবং ওই
বিজায় কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও নিরঞ্জন স্পষ্টই
বুঝিল, এ শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট দখল আছে। সে গানটা
এই—

“যে জানে আনন্দময়ী! তোমাকে।

ও সে কি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব দেখে।

যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদের নাই কুল,—

তারা জানে না যে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল;—

সংসার নিরানন্দের ফুল—

শেষে আনন্দময় ফল পাকে।”—

নিরঞ্জন এক পা এক পা করিতে করিতে কোন্ সময় একেবারে ইহার গায়ের কাছে গিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটি ইহার সঘন-নিশ্বাসের শব্দে বারেক চাহিয়া দেখিল; তার পর ঘাড় ফিরাইয়া হাত দশেক দূরের একটা গাছতলায় তাহার বিশ্বাসী দ্বারবানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিত মনে যে গান গাহিতেছিল, তাহাই গাহিতে থাকিল। নিরঞ্জনকে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার পাগল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় নাই। সে গাহিল—

“বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তারে,

ওমা, বিপদ নৈলে জন্মান্তর জীব ডাকে না তোরে;—

মা, তোর করুণার ফল, বিপদ কেবল,

জাগার অবোধ বালকে।”—

এ গান শুনিয়া নিরঞ্জন চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আচম্কা বলিয়া উঠিল, “একি সত্যি কথা, মা? জানি নান?”

মেয়েটি স্থান বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কি সত্যি কথা বাবা?”

কম বয়সী মেয়েটির মুখে এই গভীর সম্বোধনটি তাৎপর্য ছন্নছাড়া নিরঞ্জনের আরও মিষ্ট লাগিল। সে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিয়া আবার ছেলে-মানুষের মতন প্রগল্ভ প্রশ্ন করিয়া বসিল। “ওই যে বল্লেন, ‘বিপদ সম্পদের তরে,’ একি সত্যি?”

নারী কহিল, “হ্যাঁ বাবা! খুব সত্যি।”

নিরঞ্জন কহিল, “আপনি কখনও বিপদে প’ড়ে কি এর সত্যতা যাচাই ক’রে নিতে পেরেছেন?”

সে কহিল, “পেরেছি বই কি! বিপদ সঙ্গে ক’রে নিয়েই তো আমি জন্মেছিলুম, কিন্তু দিনকের দিন যত বিপদ ঘন হ’য়ে এলো, ততই সম্পদও নিকটতর হ’তে লাগলো। শেষে যখন সর্বনাশ এসে আমার গ্রাস করতে দু’হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনি সময় একেবারে তিনি নিজে ছুটে এসেই আমার কোলে তুলে নিলেন। এই যে গাইচি শুধুন না।”—

এই বলিয়া সে পুনশ্চ গাহিতে লাগিল—

“প’ড়ে বিপদের ফাঁদে, ছেড়ে সংসারের সাধে,
যখন কাতর প্রাণে, কুসন্তানে মা’ ব’লে কাঁদে—

তখন, অরার গিরে কোলে নিয়ে,—

সুত-সুখা দাও তাকে।

মাগো, তবে আর এ সংসারে আনন্দ নাই,—

বলে কে?”

নিরঞ্জন নিষ্পন্দ হইয়া গান শুনিল, তার পর বিমোহিতভাবে সে ঐ অপরিচিতা মেয়েটির দিকে মুখ ফিরাইয়া উহাকে বলিল, “তোমার আমার মা ব’লে ডাকতে ইচ্ছা করচে! মা’র মতন তুমি আজ আমাকে, যে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলুম, সেই মহাশিক্ষার মধ্যে হাতে ধ’রে টেনে এনে দিলে।”

মেয়েটি জোড়হাত নিজের কপালে ঠেকাইয়া জবাব দিল, “মা’ হবার যোগ্যতা আমার একটুও নেই; তবে আপনি আমার বাবা হলেন। তা নিজের মেয়েকেও তো লোকে আদর ক’রে ‘মা’ বলে, সেই হিসাবে আমার আপনি ‘মা’ই বলবেন। আমার নাম সুখমা। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এক এক দিন এখানের খোলা হাওয়া আর আমার বড় মায়ের রূপ দেখতে আসি। থাকি কি না আদিগঙ্গার ছেলে মাটির বুকে! আপনিও হয় তো আমার মতই উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই এসেছেন? আপনাকে আমার কিন্তু বড্ড ভাল লাগছে! হ’লে কি হয়, সকাল হ’য়ে এ’ল, আপনি এখন বাড়ী যাবেন তো? আমিও তা হ’লে এখন বাড়ী যাই।”

নিরঞ্জন মুগ্ধ হইল, একটু যেন সে তৃপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিল, “তুমিও খুব বিপন্ন হয়েছিলে বললে না? তোমার কথার ভাবে বোধ হ’লো, আজও তোমার সে বিপদের মেঘ সম্পূর্ণ কাটেও নি। কিন্তু তুমি তো বেশ শান্তভাবেই সব কথা বলচো,— সংসারকে শাশানের পরিবর্তে আনন্দ-কানন ব’লেও উল্লেখ করতে তোমার বাধছে না! আমি যে তা ভাবতেও পারিনে।”

সুখমা বলিল, “দেখুন, আনন্দ তো বাইরে পাবার জিনিষ নয়, আর কুড়িয়ে বেড়াবারও বস্তু নয়। ওটাকে নেই নেই ভাবতে ভাবতে ওটা একেবারেই মরীচিকা হ’য়ে মিলিয়ে যায়। আর আছে আছে জপ করতে করতে নিজের মনের মধ্য থেকে সে সহস্রদলে বিকসিত হয়ে ওঠে। আমার সাধুজী আমার এই রকম ক’রেই ভাবতে শিখিয়েছিলেন। আহা, আবার যদি আমি তাঁকে ফিরিয়ে পেতুম! সংসারে কতই যে শেখবার রয়েছে। কিছুই তো শিখতে পেলুম না। ছার মেয়ে হ’লে

জন্মেছিলুম, তাও আবার একেবারেই অধমের চেয়েও অধম হয়ে!”—

তোর না হইতেই কলিকাতা মহানগরীর নিজা ভঙ্গ সাড়সুয়েই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকজন গাড়ী ঘোড়া মটর রিক্সা হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। এখানে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁটাইতেছে, ওখানে আবর্জনার স্তুপ বোঝাই হইতেছে। দোকান ঘরের দরজা জানালা খটাখট খোলা হইতেছে, গল্লামানের যাত্রীরা আসা-যাওয়া করিতেছে। রাতভিখারীরা ঘরের পানে এবং ভোরের কীর্তন গাহিয়া বৈরাগী বৈষ্ণব বা বাউলেরা ফুটপাথের উপর চলাচল করিতেছিল। কলের বুড়ি, মাছের বাজরা মাথায় লইয়া ও দুধের তার কাঁধে বহিয়া মুটেরা বাজারের দিকে চলিয়াছে। নিরঞ্জনকে এত ভোরে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া রাজবাড়ীর দ্বারবানেরা কিছুই বিশ্বাস বোধ করিল না। এ বাড়ীর সবাই জানে সে পাগল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাসি খেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এমনি ক’রে তোমায় দিব ফাঁকি!
বুকে আমার যে সুর বাজে,—গুঞ্জরে যা মর্ম্মমাবে,
ভেবেছিলাম সুখের সাজে রাখব তারে ঢাকি।
—ওইন্দ্রি দেবী।

পড়াশোনা চুকাইয়া দিয়া নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করিতে করিতে একদিন পরিমল হঠাৎ চমকভাঙ্গা হইয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, নরেশের মুখ আজ কাল বেজায় গম্ভীর হইয়া আছে এবং তিনি ইদানীং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরিমল যুক্তি দিয়া স্থির করিল যে, ওটা ঠিক বৈরাগ্য নহে, ক্রোধই হইতেছে উহার উচিত অভিধান। নিরঞ্জনের ছাত্রাবস্থা হইতে ছুটি লওয়ায় তিনি তাহার উপর এবার একটু বিশেষভাবে চটিয়াছেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ তিরস্কারকে সে অত্যাচার বোধ করিয়া মনে মনে নিজের রাগ করিত, অভিমান করিত। কিন্তু তাহার নিছক ভয় ছিল, তাঁহার ওই নিস্তরু ক্রোধের মৌন অভিনয়কেই। সে জানিত, মনের ভিতর হইতে রাগ না করিলে তেমনটা প্রায়ই ঘটিত না। যেহেতু সমস্ত উদার স্বভাবের লোকের মতই নরেশের মনে বড় অল্পেই আঘাত লাগে। পরিমল ভয় পাইল।

‘কর্ণধার’ প্রেসের ম্যানেজার গাদাখানেক কাগজপত্র লইয়া আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব তর্কাতর্কি করিয়া এই সবেমাত্র চলিয়া গিয়াছেন। নরেশের একখানা ‘তরুণ’ নামক মাসিক পত্র এবং একখানা ‘নবীন জগৎ’ নামক সাপ্তাহিক ছিল। এই সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে দুজনে একটু মতের অনৈক্য ঘটিতেছে। ম্যানেজার সে দিন এমন একটুখানি আভাস দিলেন, তার ভাবটা যেন নরেশ তাঁহার স্বাধীন ও নির্ভীক ভাব সর্বদা বজায় রাখিতে চাহিলে উহার এখানে চাকরী করা একটু অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, এই রকমেরই। নরেশ এই বিষয়েই কিছু ভাবিতেছিলেন।

পরিমল আসিয়া প্রবেশ করিল।

“নিরঞ্জনের কাছ থেকে এই একুনি পড়া শেষ ক’রে এলেম। ওর কাছেই আমি পড়বো, তুমি রাগ করো না।”

নরেশ একটা অপ্রিয় আলোচনার পরেই অপ্রিয় চিন্তার (এবং শুধু এই একটিই নয়, আরও অনেক-গুলারই) হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার হয় তো মনের মধ্যে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্যভাবই করিলেন। চোখ না ফিরাইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কই না, রাগ তো করিনি।”

পরিমল তাঁহার গা ঘেষিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, “তা বই কি, রাগ নাকি আবার তুমি করতে বাকি রেখেছিলে! ক’দিন ধ’রে দেখাই পাইনে, কথাই কও না, আবার বলা হচ্ছে, ‘রাগ করেন নি!’ মাগো! এমনি ক’রেই কি তা ব’লে শান্তি দিতে হয়? ওর চাইতে যে কান মলে দেওয়াও ঢের ভাল ছিল।”

নরেশ নিজের মনের চিন্তা তদ্রূপে যে জীর প্রতি কর্তব্যের এতটাই ক্রটি ঘটিতে দিয়া ফেলিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিয়া মনে মনে লজ্জিত ও ঈষৎ দুঃখিত হইয়া পড়িয়া তাহার হাত দুটি নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া দিলেন ও তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিবার ভাবে কহিলেন, “তাই নাকি? এসো তা হ’লে কান মলেই দিই।” এই বলিয়া তাহার লজ্জায় রাঙ্গা কর্ণমূল দুই আঙ্গুলে ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

পরিমল ওইটুকু আদরেই একেবারে গলিয়া পড়িল। তার পর অনেকখানি দানের একটু একটু প্রতিদান কাড়িয়া ছিনাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “বল রাগ ভাল হয়েছে বল? রাগ করোনি বলে তো আমি মানুবো না,

আমি জানি যে, তুমি আমার উপর খুব বেশী রকম রাগ করেছিলে। এত শীগগির যে আমার আদর করবে, সে আমি একেবারে ভাবতেই পারি নি।”

নরেশ তখন আদরের গৌরবে গরবিনীকে আর একটু ‘উপরি’ পাওনা পাওয়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আহা, এমন জান্লে না হয় একটু রাগ ক’রেই থাকতুম যে! তা আমার রাগটা কেন হয়েছিল বলা তো? আচ্ছা, দাঁড়াও মনে করি। নাঃ, পারলুম না। তুমিই মনে ক’রে দাও দেখি। কিন্তু দেগ, যেন মিথ্যে ক’রে যা’ তা’ একটা বলে দিও না।”

পরিমলও এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসিতে হাসিতে লুটো-পুটি থাইয়া শেষে বলিল, “উনি রাগ ক’রে জন্ম করবেন আমার, আবার উণ্টে তার হিসেব নিকেশ করতে হবে আমাকেই। এ মজা তো বড় মন্দ নয় দেখি। ঈস, আমি বলবো কেন?”

নরেশ গাভীরোঁয়ের ভাণ করিয়া বলিল, “বেশ মশাই, বেশ! না হয়, বলবেন না। না হয় এবার থেকে আমার রাগের হিসাব রাখবার জন্তে আর একটা হিসাব-নবিশই রেখে দেবো, তার জন্তে আর হয়েছে কি।”

পরিমল আর এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিল, তার পর অনেক কষ্টে হাসি থামিলে পর স্বরণ করাইয়া দিল যে, সে দিন সে নিরঞ্জনর কাছে আর পড়িবে না বলিয়াছিল এবং তার পর হইতেই নরেশের মুখ বেজায় তার ভার দেখা যাইতেছে।

নরেশ তখন যেন চমকভাঙ্গা হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, “ওহো, তাও তো বটে! তা হ’লে এখন তাকে নিয়ে কি করা যায়-বলো দেখি? তা ওকে তুমি যদি বরখাস্তই করলে, তা হ’লে না হয় ওকেই আমার রাগ করবার হিসাব রাখবার জন্ত রাখাই থাক না কেন? একটা কাজ তো ওকে দিতে হবে।”

হাস্তের কলঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিমল বেদম হাসি হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তাই দাও। আমি হরির লুট মেনেচি, তুমি ওকে যাতে নিজের কাজে লাগাও তারই জন্তে! তা হ’লেই তোমার হিসাবের কড়ি আর বাঘেও খেতে পারবে না।”

নরেশচন্দ্রও প্রথমটা তাহার হাসিতে যোগ দিলেন, তার পর একটু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “সত্যি কি নিরঞ্জন বড় বেশী অন্তমনস্ক?”

“তুমি দিন কতক পরীক্ষা ক’রেই দেখ। আমার মাথা খাও।”

নরেশ কহিলেন, “তাই দেখবো, প্রেসের ম্যানেজার বোধ হয় চলো। যে ক’দিন নতুন না পাই, ওকেই সঙ্গে নিয়ে চালাবো।”

পরিমল পরম পরিতোষ লাভ করিল, সম্বন্ধটা অন্য রকম না হইলে হয় তো বলা যাইত, প্রাতর্কাক্যে তাঁহাকে রাজা হওয়ার জন্ত আশীর্বাদ করিল—এ ক্ষেত্রে তা অবশ্য করিল না; কিন্তু বিশেষ রকম যত্ন করিয়া সে স্বামীর কপালের ঘাম নিজের শান্তিপুরে সাড়ীর আঁচল দিয়া মুছিয়া দিল। ‘কত ঘামচো?’ বলিয়া ঘরে ইলেকট্রিক পাখা খোলা থাকা সত্ত্বেও নিজের আঁচল ঘুরাইয়া তাঁহাকে হাওয়া দিতে লাগিল এবং আরও পতি-সেবার কি কি খুঁটিনাটি সমাধা করিতে মনোনিবেশ করিয়া দিল, তার খবরে কাজই বা কি?

কিন্তু দু’দিন যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, নিরঞ্জনের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়ার মধ্যে অসুবিধা তার যতই থাক না কেন, বুঝি আনন্দও একটুখানি কোথায় যেন ছিল। সেই আপনাতোলা অসহায় ও নিঃসঙ্গ জীবটিকে সে যে ঘণ্টাখানেকও একটুখানি কাজ দিয়া রাখে; এইটুকু হইতেও সেই কর্মহীন দীর্ঘ অবসরের ক্লান্ত জীবনটিকে বঞ্চিত করা তার কাছে হঠাৎ যেন চৌর্যের মতই অপরাধজনক ঠেকিল। আর এই অবসরে এই বিপুল রাজপ্রাসাদের অসংখ্য দাসদাসীবর্গের দ্বারায় উৎপীড়িত উপদ্রুত মানুষটিকে সে যে কতকটা রক্ষা করিয়াও চলিতেছিল, সেইটুকুকে হারাইয়া ফেলার তার মন আজ পীড়া বোধ করিতে লাগিল। আহা, ভাগ্যচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে কি নিপীড়িত—কি ভীষণরূপেই নিপীড়িত সে; আর কি তাকে পীড়ন করিতে দিতে আছে? নিজের স্বামীর মহত্ব অনুভব করিয়া সেদিন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, রাত্রে নরেশ শয়ন করিতে গেলে, সেও তৎক্ষণাৎ আর এক দিক দিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। নরেশের মন যদিও সে সময় পত্নী-সন্তুষ্ট্যের ঠিক অনুকূল ছিল না,—বড়ই চিন্তামান ও ভারাক্রান্ত—তথাপি স্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মেহ প্রদর্শন পূর্বক তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, “এসো।”

স্ত্রীর সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটুখানি ক্রটি বোধ থাকার কুণ্ঠাতেই তাহার ‘পরে সময় সময় আদরের মায়াটা কিছু বেশী করিয়াই বঞ্চিত করিতে হয়,

সেখানে নিজের শরীর-মনের আলোকে প্রশ্ন দেওয়া বুঝি একেবারেই চলে না!

পরিমল আসিয়া টিপ করিয়া তাঁহার পারে একটা প্রণাম করিল, আর এক দিনকার একটা অবিস্মৃত এমনি দৃষ্টই স্মরণ করিয়া নরেশের হৃৎপিণ্ডে অমনি প্রমত্তবেগে ছলিয়া উঠিল, তিনি কষ্টে সংযত হইয়া উহা চাপা দিবার জন্ত, উহাকে নিজের বুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ধরিলেন।

“ঈশ!—আজ হঠাৎ এত ভক্তি কেন?”

“অভক্তিই বা কবে ছিল? ভক্তিভাজনকে ভক্তি করবো না?” বলিয়া পরিমল স্বামীর আদর-টুকু নিঃশেষে উপভোগ করিয়া লইল। নরেশ তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—“আমি বলবো, কেন প্রণাম পেলুম?”

পরিমল বলিল, “বল তো দেখি, কেমন বলতে পার?”

“আদর খাবার জন্তে।”

“যাও, হ্যাঁ,—তা বই কি? আমি এক্ষুণি চলে যাব।” পরিমল এই অলুযোগ জানাইলেও নিজের পাওনা-গুণা ছাড়িয়া যাইবার কোন ভরা দেখাইল না।

“তা হ’লে নিরঞ্জনকে চেলাগিরি ছাড়িয়ে দিয়েছি ব’লে? ঠিক কি না?”

“না, তাও না।—ভাল কথা! নিরঞ্জন তোমার কাজ করচে কেমন বল তো?”

“চমৎকার! নিরঞ্জন যে এতটাই বিদ্বান্, তা আমি কখন মনেও করতে পারি নি। ইংরাজীতে, বাংলায়, হিসাবে পত্রে, সকল দিক্ থেকেই ওর সমান শক্তি। বি, এ, এম, এ পাশ না করলে কখনই অমন হ’তে পারে না,—অন্ততঃ অতদূর পড়াও চাই। কে জানে ওর কি রহস্য! এ কি কোন দিনই জানতে পারা যাবে না?”

কথাগুলো নরেশচন্দ্র পরিমলের চেয়ে বোধ করি নিজের মনকেই শুনাইতে চাহিয়া বলিলেন,—

“যতই ওকে দেখছি, ততই যেন নূতন নূতন বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি! ও যেন একটা জীবনবুদ্ধ সারনাথ বা সাক্ষির ভগ্নস্বপ্ন! বাহিরেরটা সব মাটির টিপি হয়ে গেছে। কিন্তু যতই খুঁড়ে তোল, অভিনব অভিনব ভাস্কর্যের আবিষ্কারে মন যেন বিশ্বয়সাগরে কুলহারা হয়ে যায়! ও’কে? কে জানে ওর পরিণাম কেমন ক’রেই অমন হলো!”

সহসা বিদ্যুৎসুরণের মতই কোন কথা স্মরণে আসিয়া পরিমল স্বামীর বক্ষে চঞ্চল হইয়া মুখ তুলিল,

“দেখ, ওর একখানা ডায়ারি আছে। আমি দেখেছি, ও ব’সে ব’সে তাতে কি সব লিখে রাখে। সেইখানা পেলে হয় তো ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যেতে পারে।”

অবিশ্বাসের মূহু হাস্তে নরেশচন্দ্রের অধর কুঞ্চিত হইল। “তুমি যেমন পাগল!—পাগলের আবার ডায়ারি! আর থাকলেই বা ও আমাদের সে দেখাবে কেন? তাই যদি দেখাবে, তা হ’লে তো সব বলতেই পারতো।”

পরিমলের মনের মধ্যে যাই থাক, তাহা প্রকাশ না করিয়া মুখে সেও স্বামীর কথায় সায় দিল, সংক্ষেপে বলিল, “তা বটে।” কিন্তু সেটা ঠিক তার মনের কথা নয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মনের আবেগে উড়িতে চায়,

অক্ষম পাখা পড়িয়া যায়,

বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার।

—তীর্থরেণু।

নরেশচন্দ্রকে বিমনা ও ব্যথিত করিতেছিল স্ব-মার এই চিঠিখানা।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

পূজ্যতমেষু!

সে দিন ডাকাইয়া আনিয়া সব কথা অপনাকে আমার বলা ঘটে নাই এবং সামনে বলার ভরসা না রাখিয়াই তাই আজ পত্রে সে কথা জানাইতে বসিয়াছি। এই-সাহস, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার জন্ত শ্রীচরণে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। শিশুগুলোর শত অপরাধের চেয়ে বেশী স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিতে পারেন নাই; আর আপনি তো আমার সহস্র অপরাধকেও সহ্য করিয়া লইয়াছেন, তাই ভরসা, আরও না লইয়া থাকিতে পারিবেন না।.....

সে দিনও আপনাকে জানাইয়াছিলাম, আমার বর্তমান জীবনযাত্রার পদ্ধতি আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতেছে। পাখীকে খাঁচার পুরিয়া মাহুষে তার স্বাধীন জীবনের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বিলাসে আদরে! তাহাকে ভরাইয়া দিয়াও যেমন তার স্বাধীনতার স্বতিকে ভুলাইয়া দিতে পারে না, মাহুষের মনকেও তেমনি তার পক্ষে হুপ্রাপ্য শান্তির ও অজস্র সুখের নীড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও বুঝি তাহার উদাম উন্মুক্ত

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেও রোধ করিতে পারা দায় হয়। তার মন যখন কর্মের জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন বিশ্রামশয্যা তার পক্ষে কণ্টকারণের স্থান-ধিকার করে। তার পরেও যদি জোর করিয়া তাহাকে সেখানে পড়িয়া থাকিতে হয়, তো সে কাঁটা শুধু তার শরীরকে নয়, তার মনকে শুদ্ধ তীক্ষ্ণ ধারে বিধিয়া বিধিয়া রুদ্ধিরাক্ত ও অসাড় করিয়া দেয়, (তাই অধীন জাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের দিনে দিনে দুর্বলদেহ ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়া অনিবার্য্য)।—আমারও সেই অবস্থা। শুধু নিজেকে লইয়া দিন কাটান নয়, নিজের কাছে নিজের দাম এতটাই কম হইয়া গিয়াছে যে, সে কি বলিবে,—এটা যদি আমার কোন তৈজস পত্রের সামিল হইত তো এটাকে জঞ্জালের সঙ্গে বাঁটাইয়া আমি কোন্ কালে আদি গঙ্গার ভাসাইয়া দিতাম।

আমার কাজ দিন,—কোন—কোনও একটা কাজ দিন। কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের চাকরী আমি পাই না কি? বেশী না জানি ‘ক’ খ’ও তো ছোট মেয়েদের শিখাইতে পারিব। কোন ভদ্র পরিবারে গান শিখাইবার অধিকার কি আমার আছে? যেখানে আমি আদরের সহিত অভ্যর্থিতা হইব, সেই আমার স্বজাতি-বর্গের মধ্যে পা দিবার কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক ভরে কাঁপে! অথচ আমি জানি, সেইখানেই আমার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। যদি তাদের মধ্যে একটি জীবনও আমার দ্বারা রক্ষিত হয়! জানি, আমার মত পুণ্যসঞ্চয়-হীনার পক্ষে সে পুণ্যের প্রলোভন নেহাৎ সামান্য নয়। কিন্তু আমার তাহাতে ভরসা হয় না। মনের মধ্যে আমার প্রৌঢ় দেখা দিলেও বয়সে আমি আজও তো কুড়ির সীমা ছাড়াইতে পারি নাই। নিজের উপরে বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইলেও পরের উপর এখনও যে ভর রাখিতে হয়। তদ্বিন্ন বাহাদুর আমি পাপ-পথ হইতে ফিরাইয়া আনিব, তাদের আশ্রয় কোথায়? সেও যে একটা মস্ত বড় অভাব রহিয়াছে। সবার মনেই কিছু এত বড় বৈরাগ্য জাগিবে না যে, কালীবাসিনী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া লইতে পারিবে।

তা হ’লে আমার পথ কি? আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি নিজেই একবার সে পথটা খুঁজিয়া দেখি? প্রথমে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখি, যদি ভদ্র পরিবারে কর্মে পাই, অল্প চেষ্টা আমি করিব না। আমার মত অপবিত্রার পক্ষে নিতান্ত স্পর্ধা হইলেও চিরদিনই আমার বড় লোভ হয় যে, উহাদের পবিত্র

সঙ্গে নিজের এই শূন্য নিরালস্য জীবনটাকে আমি একটুখানিও আমি পবিত্র করিয়া লই। মিশনরী মেমরা ও তাদের আয়ারা যেটুকু পায়, জানি না সেটুকু পাওয়ার যোগ্যতা আমার মত হীনজনের আছে কি না?—কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? বলুন, অনুমতি দিন, আদেশ করুন,—ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি? শ্রীচরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণতি।

আপনার সেবিকাধমা

সুসমা দাসী।

নরেশের মনের মধ্যে এই মিনতি ও বেদনাভরা আবেদনখানির প্রতি পংক্তিটি যেন বিছার কামড় মারিতেছিল। মানুষের ভাগ্যান্বিতার প্রতি একবার অভিমান হইল, অমন একটি জীবনকে কেন তিনি এমন ব্যর্থ করিবার জন্ত অস্থানে পাঠাইলেন!—নিজের অক্ষমতার ‘পরেও রাগ ধরিল; সে যদি উহার রক্ষাতারই গ্রহণ করিয়াছিল, তবে তাহার যশ অকলঙ্কিত রাখিতে পারিল না কেন? লোকচক্ষে তাহার মর্যাদাকে এমন নির্দয়ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া তাহার একেবারেই উচিত হয় নাই এবং পরিশেষে সেই অসহায় বালিকাকে তাহার বন্ধিগৃহে একাকিনী দুর্বল জীবনবহনে বাধ্য করিয়া নিজে সে শত উদ্দীপনা ও আনন্দের জীবনে এই যে সরিয়া রহিল, এর মধ্যেও যে কত বড় কাপুরুষতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তা’ ভাবিয়াও লজ্জার মাথা তাহার হেঁট হইয়া আসিল। আরক কৰ্ম্ম সূচাক্রমে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে যাহার সাধ্যে কুলাইবে না, সে তেমন কাজের ভার মাথা পাতিয়া লয় কেন?

বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কয়দিন পরে এই পত্র লিখিয়া দ্বারবানের হাতে পাঠাইয়া দিল।

শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন—

সুসমা!

তোমার পত্রে তোমার আগ্রহ ও উদ্বেগের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে তোমার আর নিবৃত্ত করিতে পারি না। তুমি বুদ্ধিমতী; নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে তোমার বিচার আমার চেয়ে তুমি নিজে ভালই করিতে পারিবে। তোমার অন্তরের পবিত্রতা এবং দৃঢ়তা আমার অবিদিত নয়; তোমার আমি সর্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করি। যাহা সম্ভব এবং সম্ভব বোধ করিবে, তাহাই করিও। যখন যে সাহায্যের আবশ্যক, অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইতে দিখা

করিও না। ঈশ্বর তোমায় কুশলে রাখুন এবং মঙ্গল করুন, এই আন্তরিক আশীর্বাদ করি।

তোমার চিরসুভাষী

নরেশচন্দ্র।

সুখমা এই পত্র পাঠ করিবার পূর্বে একবার এবং পরে আর একবার দেবনির্মাল্যের জায় সম্মুখে ও প্রজ্ঞায় উহী নিজের মাথায় ঠেকাইল। পাঠশেষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া চুপি চুপি চিঠিখানি নিজের বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। তারপর গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া সে একেবারে তাহারই মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিল। যে অল্পমতি পাইবার জন্য কয় দিন দিবারাত্রি সে বারিপ্রত্যাশী উৎসুকী চাতকের জায় আশাপথপানে চাহিয়া ছিল, সে প্রত্যাশা তো পূর্ণ হইল। কিন্তু কল্পনা—সুন্দর ও মধুর কল্পনা বাস্তবের বেশে যখন দেখা দিবে, তখন তার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য যদি ঠিক সেই মানসরূপে দেখা না দেয়, যদি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দেখা দেয়, তবে সে যে সহিতে পারা দায় হইবে! এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তারপরে হঠাৎ সুখমার স্মরণ হইল যে, তার প্রাণে সবই সহিয়া যায়। তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইয়া সে নরেশচন্দ্রের পত্রোত্তর প্রদান করিল।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

পূজ্যতমেসু!

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া কৃত-কৃতার্থা হইলাম। এইবার চিরদিনের স্বপ্ন সফল করিতে সচেষ্ট হইব। কেমন করিয়া কাজ আরম্ভ করিব, কিছুই জানি না। আপনার অবস্থা অনেক বড় ঘর জানা আছে, কিন্তু সে সব জায়গায় হয় তো আমার প্রবেশ নিষেধ। কারণ, পরিচয়পত্র তো দিবার কিছুই নাই এবং দিলেও সুফলের পরিবর্তে কুফলেরই আশঙ্কা অধিক। কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমার পরিচিত করিয়া দিতে পারেন কি? যদি সম্ভব ও সম্ভত হয় করিবেন।

আপনার সেবিকাধমা

সুখমা দাসী।

এই পত্র পাইয়া নরেশচন্দ্র আরও একটু বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, এই প্রথম চেষ্টায় সুখমা অকৃত-কার্য্য হইবে। তাহার হতাশাকাতর মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করিয়া লইয়া তিনি তাহার জন্য

অত্যন্ত উষ্ণ ও দীর্ঘ একটা নিশ্বাস মোচন করিলেন। তার সেই যে মুখ আধ অন্ধকারে অন্ধাবরিত-মানসিক সংগ্রামে বিধ্বস্ত অথচ সুদৃঢ় চিত্তবলে বলীয়ান সেই যে দুটি চোখের দৃষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘ কালের লেখাকেও পরাভব করিয়া দিয়া তাঁহার মানসনেত্রে যখন তখন ফুটিয়া থাকে, তাঁহাকে জাগ্রতে বা নিদ্রিতে অনুসরণ করিয়া বেড়ায়, আর একবার তাহাদের মধ্যে তীব্র হতাশার মর্ম্মস্তব্দ যন্ত্রণার শিখা তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। সে দিনের ত্যাগে আত্মপ্রসাদ সব কিছু ক্ষতিকেই জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এ যে শুধুই আঘাত ও অপমান। অথচ জীবনের এই লক্ষ্যধরিয়াই যে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে,—শুধু স্বৈচ্ছায় নয়—ইহারই জন্য বাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে,—আর তাই করিতে গিয়াই যে আরও বিশেষ করিয়াই লোকলোচনের ও জন-রসনার তীক্ষ্ণ ও নির্দয় সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে পথ হইতে অপরীক্ষিত ভাবেই বা তাহাকে ফিরিতে বলা যায় কেমন করিয়া?—বিশেষ সকল দিকের পথই যাহার সঙ্কীর্ণ!—কিন্তু কেমন করিয়াই বা ইহার আকাজক্ষা পূর্ণ করা যায়? যখন মুমূর্ষু সুগন্ধা নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার আশার কথা জানাইয়াছিল, ভবিষ্যতে সুখমা একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক গৃহস্থ-কল্যাণের শিক্ষার জন্য অত্যাৎসর্গ করে, এই সাধ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল, তখন সেটাকে নরেশচন্দ্রও খুবই সম্ভত ও সহজ বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন এবং সেই পথেই তিনি উহাকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছেন। তখন ভুলিয়াও তাঁহার মনে এ সংশয় জাগ্রত হয় নাই যে, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে নিষ্কলঙ্ক সুখমাকে জনসমাজে কলঙ্কিত হইতে হইবে এবং তাহার পক্ষে তখন শিক্ষয়িত্রীর আসন পাওয়া অধিকতরই কঠিন হইয়া পড়াও সম্ভব। সে ভুল ভাঙ্গিল বহু বিলম্বিত হইয়া। বা হোক, এখনকার ঘেটুকু সহ্যপায়, নরেশচন্দ্র তাহাতে আলস্ত করিলেন না। সুখমার পত্রের উত্তর না দিয়া তিনি নিজেই প্রথমে এক বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেলেন। সেখানেই মহিলা-অধ্যক্ষ, পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে নরেশের মন যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু বিধার অবসর নাই। তিনি ছ'একটা বাদ দিয়া আর সব কথা উহাকে খুলিয়া বলিলেন। মহিলাটি বিশেষ গাভীর্ঘোর সহিত পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিয়া লইয়া গভীর-মুখে উত্তর দিলেন, “মাপ করবেন মশাই! আমাদের

স্কুলে বিশেষ ভদ্রসংসারের গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের ভিন্ন কাজ দেওয়া হয় না।”

নরেশ অন্তরে অন্তরে লজ্জান্বিত করিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন, “যদি সেই মেয়েটি বিনা বেতনে এখানে দু’এক দিন মেয়েদের গান ও বাজনা শিখিয়ে, যার, তাতে আপনার আপত্তি আছে?”

প্রবীণা মহিলা অবিচলিতস্বরে জবাব দিলেন, “সে রকম আমাদের নিয়ম নয়। চরিত্র সম্বন্ধে উচু রকম সার্টিফিকেট অন্ততঃ দু’তিন জন বিজ্ঞ ও বিশেষ-রূপ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট হ’তে না আনুলে স্কুলের মেয়েদের মধ্যে কাকেও মিশ্রিত দেবার নিয়ম নাই।”

সুখমার জীবন-চরিত্রের সঙ্গে এই আপত্তিটার অকাটা ও সুদৃঢ় সংযোগ দেখিয়া নরেশচন্দ্র সেখান হইতে নিরন্তরে প্রস্থান করিলেন।

আরও দু’এক স্থলে প্রায় একরূপ উত্তর লইয়া তিনি ওদিকের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। ছোট খাট অর্দ্ধঅচল প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বিনা বেতনের সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে অবশ্য অতটা তাচ্ছিল্য ঘটা হয় তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু বড়দের কাছে হতাশ হইয়া নরেশের আর ছোট দরবারে হাত পাতিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ তাঁহার মনে হইল, যদি উচিতের দিক ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বাধ্য করা বা লোভে ফেলা অমুচিতই হইবে। কারণ, সুখমা-জাতীয় জীবনের বিশ্বাস করিয়া কতকগুলি অপরিণতমতি বালিকার শিক্ষার ভার দেওয়া কতদূর সমীচীন, তাহা ভগবান্ই জানেন। সুখমা যদি তাঁহার এমন পরিচিত-তমা না হইত, তবে নিজেই তো তিনি ইহার বিরোধী হইয়া উঠিতেন। বড়ই সমস্তার বিষয়।—এদের পথ দিতে হইবে, কিন্তু সে পথ দিতে গিয়া আবার অন্তের পক্ষে এতটুকু না তাহা পিচ্ছিল হইয়া পড়ে, তার উপরও যে দৃঢ়বদ্ধ দৃষ্টি রাখার একান্তই আবশ্যক।

নরেশের এক উদারমতালম্বী বন্ধু ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ‘বিশ্বপ্রেমিক’ নাম দিয়াছিল; আসল নাম তাঁর, বিশ্বপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। নরেশের মোটর আমহাষ্ট্র ট্রাফে মোড় ফিরিতেছিল, বিশ্বপ্রিয় চীৎকার শব্দে ডাকিল, “রাজাবাহাদুর!”

নরেশ মনে মনে যেন ইহাকেই খুঁজিতেছিলেন, উল্লাসে ব্যগ্র হইয়া গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলে গাড়ীখানা যতটা অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণে বিশ্বপ্রিয় নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল, “কোথায় চলেছেন?” নরেশ গাড়ীর দরজা নিজে খুলিয়া ধরিয়া উহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “আপনার কাছেই। আসিবেন একটু?”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

না হয় দেবতা আমাতে নাই।—

মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা

সাধকেরা পূজা করে তো তাই?

একদিন তার পূজা হ’য়ে গেলে,

চিরদিন তার বিসর্জন,

খেলার পুতলি করিয়া তাহারে

আর কি পুজিবে পৌরজন?

—কাহিনী।

বিশ্বপ্রিয়কে নরেশ সুখমা-সম্বন্ধীয় সমস্তার কথা জানাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। বিশ্বপ্রিয় সব কথাই নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিল, কিন্তু সুখমার সঙ্গে নরেশের যে কখন কোন অসৎ সম্বন্ধ ছিল না, এই কথাটা সেও মনে মনে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। রাজা নরেশের যে প্রবল প্রতাপাশ্রিতা ‘উপসর্গ’টির জন্য তিনি কলিকাতা মহানগরীর অনেকখানি আত্মীয়-রূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্থাৎ যথার্থ বড়লোকের ছেলের দলে স্থান লাভ করিবার নেহাৎই অযোগ্য নহেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং অন্ত সকলের মত বন্ধুসমাজে তাঁর ‘নিজ জনের’ পরিচয় করাইয়া দিতে উহাকে পাশে লইয়া কি বাজালা, কি ইংরাজী আর কি পার্শী থিয়েটারে রিজার্ভ বক্সে বসিয়া অভিনয় না দেখার, বাগানের মজলিসে তাহার ‘মজুরা’ না করানোর ধনী মহলে যে নিন্দার সীমা ছিল না, এ সব তো আর লুকানো কথা নয়। আজ হঠাৎ একেবারে জলজ্যাস্ত সেই জীবটিকে বেমালাম উড়াইয়া দিতে চাহিলে সে উড়িবে কেন? বন্ধুদের মধ্যে নরেশের আড়ালে অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে—অবশ্য যাদের একটু বাক্য-রসোপভোগসামর্থ্য ছিল—উল্লেখ করিতে হইলে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে ‘বসন্তসেনার চারুদত্ত’ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বিশ্বপ্রিয় নিজেও কখন কখন যে না করিয়াছে, তা নয়। অতএব সে স্থির করিল, বিবাহিত ও নূতনের আশ্বাদপ্রাপ্ত নরেশ সুখমাকে পুরাতন ও জীর্ণ বস্ত্রের স্তায় ফেলিয়া দিতেই ইচ্ছুক হইয়াছেন। প্রবল অনুকম্পাপরবশ হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল—“কিছু ভাবনা নেই, আমি

তার জন্ত ভাল দেখে কাজ ঠিক ক'রে দেবো। গান শেখাবার কাজের আবার ভাবনা। লোকে একটা শেখাবার লোক পায় না।”

নরেশ বিশ্বপ্রিয়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চিনিত। সে নিশ্চিত হইয়া বাড়ী গেল এবং সুমমাকে লিখিল, স্কুলে সুবিধা নয়, তবে ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে কাজের জোগাড় শীঘ্র হইবারই সম্ভাবনা আছে। সংবাদ পাইলেই জানাইব।

শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া গেল এবং বিশেষভাবে অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে না পারিলেও অগত্যা এক রকমে মনস্তুষ্ট করিয়া লইয়া নরেশ সুমমাকেও সেই খবর তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন। সে চিঠি পাঠাইতে তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উখিত ও পতিত হইল।

কিন্তু সুমমার ইহাতে যেন আনন্দের আর অবধি রহিল না। কাদালে যেন কি নিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে, এমন করিয়াই সে নেহাৎ সাত বছরের মেয়ের মতন আফ্লাদে প্রায় নাচিয়াই উঠিয়াছিল। এক বিলাতফেরৎ-পরিবারে তাহাকে দু' তিন ঘণ্টার জন্ত দু' এক রকম বাজনা শিক্ষা দিতে হইবে। বাড়ীতে কেবল স্বামি-স্ত্রী। স্ত্রীটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন ধনাঢ্য ও নব্যতন্ত্রের ছেদ্রী-কন্তা, স্বামীটি বাঙ্গালী।

সুমমা উঠি পড়ি করিয়া রান্না-খাওয়া সারিল, বরাবর সে নিজেই রান্না খায়। নরেশ প্রথমাবধি ইচ্ছাপূর্বকই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহাতে বিলাসিনীর গর্ভপ্রসূতা সুমমা বিলাসসুখকে তুচ্ছ বোধ করিতে শেখে, সেই শিক্ষাই তিনি তাহার জন্ত সর্ব-প্রযত্নে স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। সুমমারও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তিবোধ ছিল না।

আহার সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি সে বেশভূষা সমাপ্ত করিয়া লইল। সুমমা বড় একটা লোকসমাজে বাহির হয় নাই। ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া জীবনের মধ্যে এই তার প্রথম। কাপড়ের টাঁকটা খুলিয়া ফেলিয়া সর্বপ্রথম তাহার ভাবনা হইল, কি পরিয়া সে আজ বাহির হইবে? যত দিন সুমমা ছোট ছিল, চাঁদনির বাজারে কেনা করিদপুরী ছিটের ফ্রকই একমাত্র তাহার জন্ত কিনিয়া দেওয়া হইত। বৎসরে একবার পূজার সময়ে একটা সিল্কের পোষাকের মুখ সে দেখিতে পাইয়াছে। তের বৎসর বয়স হইলে প্রথম সে সাড়ী পরার জন্ত আবেদন জানায়, তার পর হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর সবচেয়ে মোটা ও কম দামী সাড়ী, টাটা মিলের মার্কারের সেমিজের সঙ্গে সে আটপোরে

পরিবার জন্ত পাইয়া আসিয়াছে। পূজার এক খানা ঢাকাই, শান্তিপুর্বে, নেহাৎ অল্প দামের বাজে বেনারসী এই রকমই কিছু পাইত। সেখানি সে দু'একদিন পরিয়া সময়ে ভাঁজ করিয়া গুছাইয়া তাহাতে দু'একটি কর্পূরের চাক্তি আনাইয়া দিয়া রাখিয়াছিল। এই শেষ তিন বৎসর নরেশ তাহাকে পূজার কাপড় কিনিয়া দেন নাই, খরচের টাকা এই তিন বৎসর তাহার নামে মণিঅর্ডারে আসে। রাজ-বাড়ীর সরকার বা দরওয়ানেরা আর তাহার মাস-কাবারী বাজার করিয়া দিয়া যায় না। কাপড় সে পূর্বের মতই কেনে, পূজার সময় নিজের চাকরদের কাপড় কিনিয়া দেয়, নিজের জন্ত কেনে না। মনে মনে এই কথা বলিয়া মনে তাহার বিষম হইয়া থাকে যে, ওরা আমার চাকর, তাই ওদের আমি দিচ্ছি, আমি যার দাসী, তিনি যখন আমায় দিলেন না, তখন আমার কাজ কি?

তাই আজ বহুকাল পরে ধুলাপড়া ট্রাকের ডালা তুলিয়া সে চুপ করিয়া তার অনেক দিনের পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারটির পানে অনেকক্ষণই চাহিয়া থাকিল। এক একটি সাড়ী জ্যাকেটের ভাঁজে ভাঁজে যেন তার এক একটি অতীত বৎসরের স্মৃতির স্তূপ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সে ঠেলিয়া উহাদের যেন নাড়া দিতেও তার বুকে বাজিতেছিল। তার পর অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া এক একটি করিয়া সে সেগুলিকে মাটিতে নামাইতে লাগিল। এই গোলাপী ডুরে সাড়ীখানি সর্বের প্রথম বৎসর তিনি নিজে হাতে করিয়া দিয়াছিলেন। সুমমা কাদালের মতন সেখানিকে গায়ে বুকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বারংবার উহাতে চুম্বন করিল। যেন ইহাতে আজও সেই দাঁতার হৃদয়ের সৌরভটুকু পর্য্যন্ত লাগিয়া আছে,—এমনি আগ্রহে উহার ঘ্রাণ লইল। সে কাপড় পরা চলিবে না—উহা আবার সময়ে সাবধানে যথাস্থানে রক্ষিত হইল। আর একখানি সাড়ী ও তার সঙ্গে জ্যাকেটটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুমমার বুকের রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। কালোঘাটের মহিলা-সঙ্গী সেই জ্যাকেট সাড়ী। গভীর ঘুণায় ক্রোধজনক জঘন্ত বস্তুর জায় সে তাল পাকাইয়া সে দুটাকে বাস্তব মধ্যে দু'আঙ্গুলে ধরিয়া ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিল। সে দিনের দুষ্ট স্মৃতি তার দেহ যে দিন ভস্ম-বশেষ হইয়া যাইবে, সেই ছাইএর মধ্য হইতেও বুঝি মিলাইবে না। নিজের জন্ত যত নষ্ট হোক, সে যে তার আশ্রয়দাতার কত বড় গ্লানির মূল, সে দিন বড় আঘাতেই সে পরিচয় যে সে পাইয়াছে! তার আগে

স্বপ্নেও যে তেমন সম্ভাবনা তার মনের কোণেও কখন জাগে নাই! জাগিলে—কি করিত? বলা যায় না। তার দেবতার চিত্তে তার জন্ম ব্যথা বোধ যে বিশেষভাবেই আছে, অন্ততঃ এটুকু জানিবার পূর্বে এত বড় লজ্জাকর দুঃসংবাদটা তার কর্ণগোচর হইতে পারিলে নিঃসন্দেহ সে নিজেকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিত না। কিন্তু এখন? আত্মহত্যার অধোগতি তার এই অধোগতিতে প্রাপ্ত জীবনের শেষ সঞ্চয় করিয়া লইতে যত না মায়া হয়, তার চেয়ে বেশী মনে লাগে, তার শোচনীয় মৃত্যু নিশ্চয়ই নরেশকে যে বেদনা দিবে তাই ভাবিয়া।

একখানি ভোমরাপেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী ও একটি সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরিয়া নিজের গলায় পরা একমাত্র সম্পত্তি এক-নর সুরু গোট হারটুকু জামার উপর তুলিয়া দিতে দিতে হঠাৎ কি মনে হইল। ছোট আরসিখানি পাড়িয়া সে নিজের মুখ দেখিল। তার পর আবার কি ভাবিয়া, সেই জ্যাকেট সাড়ী ও হারটুকু খুলিয়া ফেলিয়া আটপৌরে মোটা সাড়ীর সঙ্গে একটি পাবনা-ছিটের চেককাটা রংজলা হাতাবড় জ্যাকেট পরিয়া সাজসজ্জা সমাধা করিল। হাতে রহিল দুই গাছি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও হাতের সঙ্গে আঁটিয়া বসা সোনার চুড়ি। এক সময় উহাদের বরফির মতন কাটুনি ছিল, কিন্তু এখন সে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে ও ছ'একগাছার মুখ ছুটিয়া গিয়াছে।

নূতন ও সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পাইয়া স্বমমার আনন্দের আর অবধি রহিল না। এত দিনে যেন জন্ম সফল হইল বলিয়া তার মনে হইল। মায়ের শেষ ও প্রধান ইচ্ছা ক্ষে অংশতঃ পূর্ণ হইতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়াও তাহার মনে সুখ ধরিতেছিল না। মা যে নিজের পথ হইতে সযত্নে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাহার আজিকার এই আনন্দময় জীবনের পথটুকু প্রস্তুত হইবার সুযোগ দান করিয়া গিয়াছেন, এই মনে করিয়া সে তাহার উপর একটুখানি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। নতুবা মায়ের উপরের অভিমান যে তাহার কত বড়, তাহা সে নিজেও যেন পরিমাপ করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা নিজেদের পাপ দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধে অপর জীবনকে কলঙ্ক-কালি মাখাইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষে কঠিন বন্ধুর ধূলিশয্যার শোয়াইয়া দেয়, তাদের অপরাধের তুলনা আর কোন কিছুই সজেই কি হইতে পারে? মানুষ নিজেকে লইয়া তার যা খুসী করিতে হয় করুক; কিন্তু আর অন্যট জীবনকে সে নিজের পথে আনয়ন করিতে কোন

মতেই অধিকারপ্রাপ্ত নহে। সেই মা'র কাছেই বোধ করি, জীবনে এই প্রথমবার সেই মাথা নোয়াইল এই বলিয়া যে, যতই হোক, যখন এই জাতীয় নারীর গর্ভেই পূর্বজন্মের মহাপাপে তাহাকে স্থান লইতে হইয়াছিল, তখন ভাগ্যে তার মায়ের মনে ওই ধর্মজ্ঞানের বীজটুকু রোপণ করিয়া ভগবান তাহাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন; নহিলে আজ তার কি গতি হইত?

চাকরীর প্রথম ধাক্কা খাইল, সে চাকরী করিতে মূনিবাড়ী সর্ব প্রথম পা দিয়া! কর্তা এবং তাহারই ছাত্রী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি মিসেস্ গুহ;—তা জানেন বোধ হয়? আপনাকে আমি মিস্ বা মিসেস্ কি বলবো, অমুগ্রহ ক’রে আমার আপনি ব’লে দেবেন। বিশ্বপ্রিয়-বাবু সে কথা ঠুনাকে কিছুই তো বলেন নি?”

স্বমমার ললাটে অচিন্তিত লজ্জার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সে নতমুখে উত্তর করিল, “আমার নাম স্বমমা দাসী।”

“কিন্তু পদবীটা না জান্লে, আপনাকে আমি কি ব’লে উল্লেখ করবো, তারই জন্ম সেটা জানার—”

“না না, আমার আপনি স্বমমাই বলবেন, সেই আমার বেশী ভাল লাগবে।”

দ্বিতীয় দিনটা অমনি কাটিল, তৃতীয় দিবসে আর একটা সমস্তা দেখা দিল।

মিসেস্ গুহ মানুষটি বড়ই সাদাসিদ্দে, ভালমানুষ গোছের লোক। মনের মধ্যে তাঁর ছল-চাতুরী বড়ই কম। সে দিন সে আন্তরিকতার সহিতই স্বমমাকে জানাইল যে, তাহার গান-বাজনা শুনিয়া তাহার স্বামী ও তাঁর এক জন বড়লোক মক্কেল বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আগত সপ্তাহের প্রথমেই তাঁদের বাড়ীতে একটা বড় রকম ‘পার্টি’ হইবে। তাঁদের বিশেষ ইচ্ছা, স্বমমা সে দিন নিমন্ত্রিত সভায় গান ও বাজনা শোনায়।

স্বমমা এ কথা শুনিয়া একটু পরে ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিনয়ে উত্তর করিল, “আমায় মাপ করবেন, আমি সে পারবো না।”

মিসেস্ গুহ একটু ভুল করিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “কেন পারবেন না? আপনাকে তো তেমন ‘নার্তাস’ ব’লে বোধ হয় না।”

স্বমমা মৃদু হাসিয়া কহিল, “তা নয়, আমি অপরিচিত পুরুষদের সামনে গাইবো না, তাই বলছি।”

মিসেস্ গুহ একটু জিদ করিয়া বলিলেন, “তাতে

দোষ কি? গান গাওয়া কি কোন মন্দ কাজ? ওনার ভারি সাধ হয়েছে যে, অতিথিদের আপনার এই চমৎকার গান শোনান।”

সুধমাকে সম্মত করিতে পারা গেল না।

দিন কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিল। সুধমা নিজের মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বয়স্কা ছাত্রীর শিক্ষাকার্য্য অতি সত্বরে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইটুকু করিতে যে সুখ, যে আনন্দ-প্রসাদ সে নিজের মধ্যে উপভোগ করিতেছিল, বঙ্গ বিহারের শাসনভার হাতে পাইয়াও তাহা লাট সাহেবেরা পাইয়া থাকেন কি না সন্দেহ। মাস-কাবারে যখন চল্লিশ টাকার হিসাবে দশ দিনের মাহিনার সে ১৩০/৫ হাতে পাইল, বুক যেন গোরবে তাহার ফুলিয়া উঠিল। নিজের স্বাধীন এবং সংপথের উপার্জনে সে এখন হইতে নিজেকে পোষণ করিতে পারিবে। প্রথম মাসের টাকায় মা কালীর কিছু পূজা পাঠাইয়া দিল এবং ভিখারীর জন্ত কিছু রাখিল।

হাইকোর্ট বন্ধ ছিল; বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া বসিয়া চাখিয়া চাখিয়া কোন সুপের পদার্থ পান করিতে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ বাজনার শব্দ ভেদ করিয়া সুধমার সঙ্গীত-হরী কানের তাবে ঝঙ্কার দিল। উৎকর্ণ হইয়াছিলেন দু'জনেই, কিন্তু অল্প পরে সুধমার সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “এ কি! কে গাইচে বল তো? আশ্চর্য্য যে!”

মিঃ গুহ বলিলেন, “গাইচে আমার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী সুধমা দাসী। আশ্চর্য্য বল্চো কেন? হ্যাঁ, তা বলতেই পার।—হোয়াট অ্যান্ এককুইজিট রীচ ভয়েস! কিন্তু—”

বন্ধু এ সব কথাগুলো কানে না তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ এমনই সুরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন যে, মিঃ গুহর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

“কি হয়েছে? গলা ওর খুব ভাল নয়?”

বন্ধু সহাস্তে উত্তর দিলেন, “কে বল্চে ভাল নয়? তা নয় মাই ফ্রেণ্ড! আমি তোমার জোর কপালের জন্ত তোমায় ‘কন্‌গ্রাচুয়েট’ করচি। ‘রথ দেখা এবং কলা বোচা’ এক সঙ্গে তা হ’লে দুইই বেশ চালাকো? আচ্ছ মন্দ নয়।”

“রেখে দে’ তোর হেঁয়ালি! তুই কি চিনিস ওকে?”

সুধমার ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, “তা আর চিনি, সুধমা দাসী যে আমার ‘নেকটজোর নেভার’। ও প্রমাণ করেছে যে তাই ধরে ফেলেছি। কি ক’রে বাগালে দাদা?”

“আপনিই এসেছে। আচ্ছা, ওর ব্যাপারখানা কি বল তো শুনি?”

“বল্চি! রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুরের নাম শুনেছ?”

“উঁ হঁ, কই মনে ত পড়ে না। তার?”

“হঁ।”

“তার পরে?—”

“চিরন্তনী। খুব ধুমধাম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাওনা-বাজনা, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মোটর দাঁড় করিয়ে রাখা। তার পর আর কি, ‘প্রস্থানং কুরু কেশব।’ কিছুদিন একলা একলা স্বর-সাধনা ক’রে ক’রে ইদানীং বোধ হয় পেটের নাড়ীতে কিছু টান ধরে থাকবে, তাই শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্তে এই...স্ট্রীটে এসে পৌঁছেছেন। তোমায় কিন্তু আমার ভারী হিংসে হচ্ছে।”

মিঃ গুহ বিস্ময়সহকারে মন্তব্য করিলেন, “কিন্তু ধরণ-ধারণ তো সে রকম মনে হয় না। আমার সামনেই বার হ’তে চায় না।” বলিয়া গান শুনাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া সুধমার ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া বলিল, “আরে রেখে দে তাই, ঢের দেখেছি। ও সব ওঁদের চাল। ওঁরাই ‘ছুঁচ হয়ে ঢুকে’ আবার ‘ফাল হয়ে বার হন’। খুব দাঁও লেগেছে রে তাই, খুব দাঁও! আমি তো এ পর্য্যন্ত কখন ‘আরে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি।’—কিন্তু সেই সঙ্গেই ‘মন প্রাণ যা’ছিল তা দিয়ে ফেলেছি।”

কয়েকদিন পরে সুধমা গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ী ও তার বিশ্বাসী দরওয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ড্রইং রুমে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর খালি, মিসেস গুহ সেখানে নাই। অকৃত্রিম ব্যাপৃত আছেন মনে করিয়া নিজের আসনের কাছে আসিয়া সেই তাঁহাকে নিজের আগমন জানানু দেওয়ার ইচ্ছায়, যেমন এসবাজ তুলিয়া লইয়াছে, অমনি পাশের ঘরের পর্দা নড়াইয়া মিসেস গুহর পরিবর্তে বাহির হইয়া আসিলেন, মিঃ গুহ।

সুধমা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল, তাহার এ ঘরে অবস্থান না জানিয়াই গৃহস্থানী অসুস্থ এই ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে দেখিতে গাইয়া এখনই প্রস্থান করিবেন। কিন্তু নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়া কৃত্যোগ করার পরিবর্তে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকিয়া তিনি তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সম্বোধন করিতেছেন।—

“গুডমর্নিং! আমার গাফিলিতে আপনাকে অনর্থক এই কষ্ট পেতে হ’লো। মিসেস গুহ আজ

বোনের বাড়ী গেছেন, ফিরতে তাঁর রাত হবে, তিনি বলেছিলেন, আদালিটিকে ব'লে রাখতে যে, আপনি আসা মাত্রে এই খবরটা জানায়, আমার সেটা কিন্তু আদৌ মনে ছিল না, মাপ কর্ণেন।” মিঃ গুহ কণা প্রার্থনা শেষ করিয়া অঙ্গুলি-ধরা চুরোট চৌটে চাপিয়া সেকহাণ্ডের জন্ত নিজের হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

সুখমা তাহা স্পর্শ করিল না। সে রাগে গুম্ব হইয়া গিয়া কঠিন হইয়া রহিল, তার পর অকস্মিক মুখ ও চোখ রাখিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে এই কথা শুধু বলিল, “চাকরদের একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বলবেন।”

মিঃ গুহ বড়ই বিপন্নভাবে জবাব দিলেন, “বেয়া-রাটা আজ ছুটি নিয়ে গেছে, আদালিটা এই মাত্র খেতে গেল, মালীটাও বাড়ী নেই, আপনি বসুন না একুণি ওরা খেয়ে নিয়ে আসবে, ওরা এলেই গাড়ী আপনাকে আনিবে দেবো।”

অগত্যা এই ভয়বিপন্ন সুখমা স্পন্দিতবক্ষে ও শক্তিমুখে দূরের একটা আসনে আলগোছ ভাবে বসিয়া পড়িল। স্পষ্ট করিয়া ইহার অবাধ্যতা করিতেও তাহার ভরসায় কুলাইল না।

মিঃ গুহ চুরোট টানিতে টানিতে সুখমার আপাদ-মস্তক খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। মনে কিছু বিষয় ও দ্বিধা জাগিতেছিল। রাজা-রাজ্জড়ার অমুগ্ধীতার মত রূপ তাহার শরীরে থাকিলেও বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিপরীতই যে প্রমাণ করে! পৃথিবীর সব চেয়ে মোটা ও অ-সুখস্পর্শ পোষাকে তাহার সুডৌল গঠনের সবটুকুই যেন চেষ্টা করিয়া ঢাকা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, বাকলবসনা শকুন্তলা যেন তাহারই সম্মুখে! আবার মুগ্ধ মন সুরেশ্বরের ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ করিল—“ওসব ওদের লীলা-কলা, ঠাট-ঠমক,—তা বুঝতে পারচো না!”

মিঃ গুহ তখন দ্বিধাশূন্যভাবে উহার সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিলেন—

“একটা গান না, চমৎকার গলা আর হাত আপ-নার।” এই বলিয়া তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সত্য-সত্যই সুগঠিত ও সুসলিল হাত দুটির পানে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি চোখে না দেখিয়াও অনুভব করা যায়। সুখমার মলাট হইতে বক্ষ অবধি সেই অনুভূত মুগ্ধ দৃষ্টির সজ্জার রং মাখান হইয়া গেল। কিন্তু চূপ করিয়া থাকিয়া উহাকে বেশী প্রশংসা দিয়া ফেলা হইবে বোধে সে অত্যন্ত বিনীত ও যত্নকণ্ঠে উত্তর দিল,

“আজ থাক, একটা গাড়ী যদি আমার বরা ক’রে আনিবে দেন।”—

মিঃ গুহ যথাপূর্ব বসিয়া থাকিয়া উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বলেছি তো চাকররা বাড়ী নেই, এলেই গাড়ী পাবেন। ততক্ষণ না হয় এসরাজটা একটু বাজান না। আমরা কি শোনবার যোগাই নই?”

এরূপভাবে এক জন অপরিচিত পুরুষকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেখিয়া সে যত বিস্মিত, ততই আহত হইল। আশ্চর্য্য দৃষ্টি কিরাইয়া বারেক ইহার দিকে চাহিয়াই সে পুরুষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমার ক্ষমা করবেন; কিছুই আমি আজ পারবো না।”

মিঃ গুহ তখন আর এক পথ ধরিলেন।

“সুরেশ্বরকে আপনি জানেন? সুরেশ্বর বোস? আপনার পাশের বাড়ীতেই থাকে।”

সুখমার রাঙ্গামুখ সাদা হইয়া গেল। বুকের ভিতর ধক করিয়া উঠিল; অস্পষ্টভাবে সে বলিল, “না”—

“সে কিন্তু আপনার অনেক কথা বলে। আপনার গান শুনেই চিন্তে পেরেছিল। আদি গঙ্গার উপররোডে ‘সুখমা-কুটারে’র ঠিক পাশেই হিন্দু রংয়ের বাঁহাতি বাড়ীখানা তার।....”

সুখমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ধড়ফড় করিতে লাগিল। উঠিয়া পলাইয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছায় তার পা তাহাকে টানিতে লাগিল, এই অপরিচিত পুরুষের চোখে তার মর্যাদা যে কোথায় গিয়া পৌছিয়াছে, সে কথা সে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল এবং এও বুঝিল যে, তাহার অমন পরিচয় না পাইলে কখনই তিনি তাহার সহিত এই ভাবের সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইতেন না। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল।

“দেখুন, সংসারে এই রকমই নিত্য ঘটচে। সব মানুষ যদি ভদ্র হতো, তা হ’লে আর ভাবনা কি? কিন্তু তা ব’লে আপনার এ বয়সে এই রকম খেটে খাবার দরকারও তো দেখতে পাই নে কিছু। সবাই অবশ্য রাজা নরেশচন্দ্র না হ’তে পারে, কিন্তু আমা-দেরও যে মনে কোনই সখ নেই, তাও তো নয়। যাতে তোমার কোন দিকে কষ্ট না হয়, হাতে ছ’পয়সা জমে, ছ’খানা গহনা-গাঁটি গারে পরতে পারো, তার জন্ত আমাদের বিশেষ চেষ্টা থাকবে। আর এই এক জোড়া মুক্তোর ছল এনেছি—”

চেরার ঠেলার শব্দে মিঃ গুহকে উত্তিত বোধ

করিয়ে তাড়িত-স্পর্শের জ্বালা লাগে দিয়া উঠিয়া দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতই স্বপ্না উর্দ্ধ্বাসে ছুটয়া পলাইল। কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া—তার কোন হুঁস না রাখিয়াই সে বাড়ী ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিল। ইতিমধ্যে পিছনে একবারও চাহিয়া দেখিল না। তার পর সদর রাস্তায় আসিয়া যখন পড়িতে পড়িতে গ্যাস পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন কাহাকেও অনুসরণ করিতে না দেখিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল ও তখন মনে হইল, অত জোরে না ছুটিলেও হয় তো বা চলিত। বাস্তবিক তো কেহই তাহাকে ধরিতে আসে নাই। অপর কেহ দেখিতে পাইয়া থাকিলে কি না জানি মনে করিয়াছে? তার পর কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া, শুষ্ক অধর ও কণ্ঠ কোনমতে একটুখানি রসসিক্ত করিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে যে দিকে চোখ যায়, চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখনও তার মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ তুমুল হইয়া রহিয়াছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

“কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা—

আমি পথের ভিখারী নহি গো।”

—রবীন্দ্রনাথ।

মানুষের হৃদয়রহস্য যে দেবতাদেরও অপরিজ্ঞাত, —এ কথা অস্বীকার করা চলে না এবং বোধ করি, অস্বীকারও কেহ করে না! কিসে যে তার স্মৃতি, আর কত অল্পেই যে তার দুঃখ, সে বুঝিয়া ওঠাই ভার। নিরঞ্জন যত দিন পরিমণের স্নেহকতা করিতেছিল, অস্বস্তির তার যেন অন্ত ছিল না। এমন কি, একদিন অশান্তি তার সীমা ছাড়া হইয়া গিয়া বাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে পলাইতেও উত্তত করিয়াছিল। আবার যখন আপনা হইতে সেই দুঃখ কার্যটা তার ঘাড় হইতে নামিয়া পড়িল, অমনি বুকিতে পারা গেল যে, যেটাকে সে অসহ্য পীড়ন বোধ করিতেছিল, ঠিক সেইটিতেই যেন তার সব চেয়ে বড় সুখের উপাদান অলক্ষ্যভাবেই নিহিত ছিল। বিগত-জীবন প্রিয়তমের মূর্তি মানুষ প্রাণপণে স্মরণে আনিয়া তাহারই ধ্যানস্থ হয়, অথচ প্রাণও কাঁদে। ওই সম্মানিতা ছাত্রীটির সর্বাঙ্গকে কোনও হারা-নিধির পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভব করিতে থাকিয়া তাহাকে মন্থ করা যেমন নিরঞ্জনের পক্ষে কঠিন, আবার

তেমনই বুকি তাহার মধ্যে একটা ছবস্ত লোভও তাহারও অজ্ঞাতে তাহার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রচণ্ড অধিকারস্থাপন করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে পূর্বে বুঝে নাই, পরে বুঝিল। পরিমল যে আর তাহার নিকটে পড়া লইতে আসে না, এক দিকে ইহাতে সে খুসী হইয়াও আর এক দিকে কিন্তু হইতে পারিল না। আবার নিজের মনের এই ক্রটিটুকু লক্ষ্যে আসিতেই অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে মনকে কঠিনভাবে সে পীড়ন করিয়া বলিল,—

“খবরদার! পাগলামী ক’রো না; তোমার স্বপ্ন তোমার মধ্যেই থাক, বাইরে তার ছবি যেন কোন মতেই না ফুটে!”

প্রেমের অল্প স্বল্প কাজ হাতে লইয়া সে ক্রমে তার প্রায় সবটুকুই নিজের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিল এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তার এত দিনের যে শক্তি, যে অধ্যাবসায় পক্ষাবতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাই আবার জাগিয়া উঠিল। একবাক্যে সবাই স্বীকার করিল যে, এমন উদ্যোপনা, সহিষ্ণুতা, কর্মক্ষমতা আর তীক্ষ্ণবী সর্বদা এ সব কাজে পাওয়া যায় না। যারা এত দিন তাহাকে অপ্রকাশ্যে উপহাস ও প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছিল, তা’রাও লজ্জা পাইল।

বস্তুতঃ মানুষের শক্তির আধার কখন যে খালি হইয়া যায়, আবার কিসে ভরিয়া উঠে, তার কোন সময় ঠিক করা নাই। উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের অভাবে কত উৎকৃষ্ট বীজ অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়, অথবা বপন করাই ঘটে না। নিরঞ্জন একটু একটু করিয়া যেন তার হারানো শক্তি এই আশ্রয়ে আসিয়াবধি খুঁজিয়া পাইতেছিল। পরিমলের সঙ্গে মাসখানেকের মেলা-মেশায় তার মরিচাধরা বুদ্ধির কৃপাণে শান পড়িয়াছে; এবার কাজের মধ্যে ডুবিতে পাইয়া, তার উপরের সমস্ত ধূলি-ব্রজাল যেন ধুইয়া গেল। এখন সে আর তত অগম্যমন্ডল হয় না, মাসমাহিনার টাকাগুলা দিতে আসিলে খাজাঞ্চিকেই উহা জমা রাখিতে বলিয়া গোটা কতক শুধু চাকরমহলে বাটিয়া দেয়। হবে খানসামার দল মুখ বাঁকাইয়া উহা গ্রহণ করে, ও নিজেদের মধ্যে তাঁর সমালোচনা করিয়া বলে, “বাছা হুঁ আমাদের এবার চালাক হচ্ছেন দেখি যে!” আর এক জন বলেন, “হবে নাই-বা কেন? এখন যে পেটে রাজা-সাহেবের ভাত পড়েচে। ও-ভাতকে হজম ক’রে চলতে পারা কঠিন-রে ভাই; ওর জোরে অনেক পোঁটাচুমির বেটা চন্দনবিলাস হ’য়ে উঠলো! তা দেখিস-নে?”

যে খাতাখানার কথা সে দিন পরিমল তার স্বামীর কাছে বলিতেছিল, সেখানার মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জন নিবিষ্ট হইয়া কি লিখিত। সেটার আরম্ভ ছিল, এই রকম—

“এই মলাট-ছেঁড়া চার পরসাদামের খাতাখানা হাতে পেয়ে আজ হঠাৎ ডায়রি লেখার কথা মনে পড়ে গেল। মনে যে পড়লো, তা সেটা কিছু আর বিচিত্র নয়! কত-কালেরই যে অভ্যাস ছিল। কিন্তু নয়ই বা কেন? আমার এ জীবনটার সকলই যে বৈচিত্র্যময়। এর মধ্যে পূর্ব-সংস্কারগুলো এখনও যে কেমন ক’রেই না ম’রে গিয়ে বেঁচে আছে এবং সুযোগ পেতেই মাথা তুলে খাড়া হচ্ছে, এইটাই তো ঘোর আশ্চর্যের বিষয়! নিজেই আমি অবাক হ’য়ে গিয়ে ভাবছি যে, তা হ’লে আমার দ্বারা এখনও আবার পৃথিবীর কোন কোন কাজ-কর্মও চালিয়ে নিলে। আশ্চর্য্য, তারি আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু!

“আচ্ছা, আমি আগে কি ছিলুম, সেটাও একটু একটু ক’রে মনে করবার চেষ্টা করা বোধ হয় নেহাৎ মন্দ নয়! যা’ ছিলুম, আর এখন যা’ হ’য়ে দাঁড়িয়েছি, এ থেকে আমিই আমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে, তা আর পাঁচ জনে কেমন ক’রে পারবে? কিন্তু সে পারবার কিছু দরকারও তো নেই। সে লজ্জা আমি আমাকে যে কোন মতেই দিতে পারবো না।—না, না, আমার অতীত! আমার সোনার স্বপন! আশার আনন্দে উৎসাহে সম্মানে ভালবাসায় ভরা, আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের অতীত! যত মাধুর্য্য যত আকর্ষণই তোমার মধ্যে থাকে থাক, তুমি শুধু আমার ধ্যান-ধারণার মধ্যেই লিপ্ত হয়ে থাক। পথের ভিখারী নিরঞ্জনের কাছে তুমি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদের মত গোপন আকাঙ্ক্ষার ধন হ’য়েই থাক, ঐট কক্কশ বন্ধুর শুক বর্তমানের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আমি তোমায় আঘাত করবো না, লজ্জা দেব না।

“নিজের কথা ভাবতে গেলেই মনে হয়, এর আগে যে জন্মটা আমার চলছিল, সেটা যেন শেষ হয়ে গিয়ে এখন আর একটা নতুন জন্ম চলছে। আর বস্তুতঃও তো তাই! আমার সে জন্মে আমার চেহারাখানা ঠিক কার্তিকের মতন নাই থাক, ঘর পরে সবাই যে আমার রূপের তারিফ করেছে, সে তো আমি নিজের কানেই শুনেছি। আর এখন, আমার দেখলে লোকে শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আবার ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কঁদে ফেলে—পালিয়ে যায়, সেও আমি জানি। জন্ম আমার ঠিকই বদলে গেছে, তবে

এবারে জাতিস্বর হয়ে জন্মেছি ব’লেই এত জালা! পুরানো কথা মধ্যে যেমন কিছুদিন ভুলে গিয়েছিলেম, তেমনি বরাবরের জন্ত একেবারেই যদি ভুলে যেতেম, সে যেন ঢের ভাল হতো। তবে দুঃখ এই যে, জন্ম নতুন পেলেও এবারে আর কচি ছেলেটি হয়ে জন্মে মা’র বুকে ঠাঁই পেলেম না। আর একটু একটু ক’রে বাড়তে গিয়ে ছেলেরা যে অবসরটুকু পেয়ে নেয়, সেও আমার ভাগ্যে ঘুটলো না।—একেবারে এই বাজপড়া তাল গাছের মতন আমাকে নিয়ে আমার এই নবীন জন্ম আরম্ভ হলো!

“আচ্ছা, বাড়ী ছিল আমাদের চট্টগ্রামের যে দিকটার, সে সবই তো দেখছি ঠিক ঠিক মনে পড়ে যাচ্ছে! মধ্যে কিন্তু এসব কথা এমন ক’রে মনে করতে পারতাম না। আমার ঠাকুরদা মশাই শুনেছি, নেহাৎ নির্ঝরোদী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর এক বিশ্বাসী (!) আমলার কারসাজীতে পড়ে সমস্ত জমিদারীটি হারিয়ে ফেলে মনের দুঃখে এইখানে এসে বাস করতে থাকেন, এই আমার মা’র কাছে শুনেছি, তার আগে তিনি গাজন-হাটের এগার আনির জমিদার ছিলেন।

“আমার বাবাকে আমার বেশ স্পষ্ট ক’রেই মনে আছে। করসা রং, দেড়হারা পাতলা লম্বা চেহারা, খুব গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, কি উদার মনই তাঁর ছিল! আমার বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। একবার স্বর্ঘ্যাস্ত খাজনার দায়ে ঐ গাজন-হাটের তালুক—তখন আর তা এগার আনি নেই,—তার ষোলআনাই তখন গিরিশচন্দ্র মিত্রেরই হয়ে গেছে—সেই তালুক লাটে ওঠে! বাবা খুব সামান্য দামে তাঁর সেই নিজের পৈতৃক বিষয় একজন চাপরাসীকে দিয়ে কিনিয়ে রাখেন এবং পরের দিন নিজের হাতে পত্র লিখে যারা তখন তাঁর জায় বিষয় অন্তায় ভাবে ভোগ করছিল, তাদেরই খবর দেন যে, কেনবার টাকাটা পেলেই তিনি ওদের তালুক ফিরিয়ে দেবেন। হলোও তাই। আমার আজও সেই কথা মনে করতে আফ্লাদে আর গোরবে বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে! আমি সংসারে এসে কার জন্তে কি করলুম?

“পিতৃহীন হয়েছিলেম, নিতান্ত অসময়ে। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় পড়তে গেছি, বিনামেঘে যেন বজ্রাঘাত হলো! ভাই বোন আমার আর কেউ ছিল না। মা’র পক্ষে বড়ই কষ্টকর। ছুটির সময়টুকুই তাঁর কাছে থাকি, বারমাস তিনি একলা।

“কল্কাতার হোষ্টেলে যাঁরা বাস করেছেন, আমাদের মতন পাড়ারগেয়ে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চলে ছেলে গেলে তাদের সেখানে যে কত বড় দুর্দশা বটে, সে হয় তো তাঁদের জানা আছে! কোন্ সময় অন্তঃমনক হয়ে একজন ‘কেডারে ডাহে?’ ব’লে ফেলেছে,—আর রক্ষা আছে! খোঁজ ক’রে ক’রে তাই, নিজের স্বজাতি (?) দেখেই ভাব ক’রে ফেলা যেত এবং আমার এক ঘরের পড়সী হলেও পশ্চিমবঙ্গকে ‘দূরে পরিহার’ চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকতেন। কারণ, আমাদের পক্ষে তাঁরা ছিলেন একটু ‘দুর্জন’।

“কালীপদ আমার বিশেষ অনুরক্ত হয়ে দাঁড়াণো। জীবনে সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করতে যাওয়া,—আর কি বনিষ্ঠ যোগই যে সে হয়েছিল! এত ভালবাসা বোধ হয় আর কারকেই কখন বাসতে পারি নি, আর না,—বাসতে পারবোও না। এখন কি আর সে ভালবাসার শক্তিই আমার মধ্যে আছে? মন ছিল তখন একটা কাদার তালের মতন, তাকে রকম বেরকম ক’রে ছাঁচে ঢেলে নিলেই হলো, এখন হয়েছে সে একখানা নিরেট পাথর। তাকে ভাঙাও যায় না, গড়াও যায় না।

“কালীপদ আমার প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল বটে; তবু আমার মতন নয়। সে তার জীবনের মস্ত বড় কথাটাই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আমি হ’লে তা’ পারতুম না। যাকে ভালবাসলেম, তার সঙ্গে যদি একটা মস্তবড় আড়ালই রেখে দিলেম, তা হ’লে আর প্রাণে প্রাণে যোগ হবে কোন্খান দিয়ে? গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে যদি একটা প্রকাণ্ড পাহাড় গাঁথে ওঠে, তা হ’লে যুক্তবৈদীর সব মহিমাই যে তুচ্ছ হয়ে যায়! কালীপদের যে আমার না জানানো গোপন কথা ছিল, সে আমি জানতে পারলেম, একেবারেই অসময়ে।—যে দিন পুলিশের লোকে আরও ক’জন ছেলের মধ্যে তারও ঘর তোলপাড় করে’ একটা ছোট্ট রকম বোমার সরঞ্জামের সঙ্গে তাকেও ধ’রে হাতে হাতকড়ি দিয়ে ও কোমরে বেঁধে নিয়ে চ’লে যায় সেই ঘোর দুর্দিনে। আমাকেও দুদিন একটু টানটানি করেছিল; কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ বুঝে শেষটা ছেড়ে দিলে।

“‘পদ’র সঙ্গে শেষ দেখা তার আন্দামানে যাবার আগের দিন। দেখা হ’তেই খুব হাসিমুখে এগিয়ে এসে, আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলে। হাত তার বাঁধা! দণ্ডিত অপরাধী পাছে কিছু ক’রে বসে—

তার কিন্তু সে মৎলবই নয়। খুব প্রফুল্ল হয়ে সোৎসাহে অনেক কথাই সে অনর্গল ব’লে গেল। তারপর সর্ব্বের শেষ অনুরোধ আমার এ জন্মের মতই সে জানিয়ে দিলে।

“‘রমেশ! তোমার তো আজও বিয়ে হয় নি, তুমি সুখদাকে বিয়ে করতে পারবে না? তা হ’লে এ জন্মটার মতন নিশ্চিন্ত হয়েই ঘানি বোরাই এবং বাঁতে শীতাই আর একটা নূতন জন্ম পাওয়া যায়, তারই চেষ্টা দেখি।’

“আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘সুখদা কে?’

“‘কেনু তোমার তো আমার বোনের কথা আমি বলেছিলুম। সুখদা তারই নাম। ধরো, এই আমার মতনই তাকে দেখতে।—পারবে না?’

“আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করলেম, ‘কেন পারবো না, ঈশ্বর সাক্ষী, তোমার বোনের জন্ত তুমি নিশ্চিন্ত থেকে।’

“‘পদ’ খুসী হয়ে আমার তার বাঁধা হাত দিয়ে জীবনের শেষ আলিঙ্গন চুকিয়ে দিলে। সেই শেষ! জীবনের প্রথম প্রভাতে যা পেয়েছিলেম, জীবনের প্রথম প্রভাতেই তাকে হারিয়ে ফেলেম। বিশ্বাসের গুণী দিয়ে বেঁধে সে যাকে আমার স’পে দিয়ে গেল, তাকেও আমি নিজের পাপে নষ্ট ক’রে ফেলেছি—হারিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্জনকার স্বতিই আজও আমার বুকে আগুন হয়ে ঠিকরে পড়চে, উকা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ভুলতে আজও একজনকেও তো পারি নি!—আর কি কোন দিন পারবো?

“—কে আস্চে? তিনিই কি? কেন তাকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে? সুখদা যদি রাগী হতো, তা’ হ’লে তাকেও ঐ রকম সুন্দর দেখাতে পারতো। মানুষে মানুষে মিল থাকে দেখেছি, কিন্তু এতটা মিল এর আগে আর ত কখনও দেখি নি!”

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এ তো নষ্ট তৃণদল ভেসে আসা ফুল ফল
ব্যথাভরা মন এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিও।

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রবল মানসিক উদ্বিগ্নে ও উত্তেজনার স্রবমার সে রাতে অর আসিল এবং দিন দুই সে সেই অরেক কষ্টে মনের কষ্টে বিছানা লইয়া রহিল।

নিজের উদ্দেশ্যে তার যেন ঘণা ধরিয়া গিয়াছিল। এমন কালামুখ তাহার যে—সে কি কোথাও বাহির করিবার উপায় নাই? যাক, তবে সুড়ঙ্গের মধ্যে বিষেভরা সাপের মত এ জন্মটা তার লোকচক্ষের বাহিরে, শুধু তাদের নিঃসম আলোচনার মধ্যেই কাটিয়া যাক! মনে পড়িল,—নরেশ সে দিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, “স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নাই? লজ্জা নাই?” সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গলদস্ত্র নেত্রে দু’হাত জোড় করিয়া আত্মগতই কহিতে লাগিল, “দেবতা আমার! দেবতা আমার! তোমার দিব্যদৃষ্টি যে সে দিন এত সূক্ষ্মভাবে আমার এই অপমানগুলো দেখতে পেয়েছিল, তা তো আমি জানি নি! কেন তবে আমার অজ্ঞতার আন্ধার গ্রাহ করলে?” তার পর সবিস্ময়ে সে ভাবিল, যে পৃথিবীতে নরেশচন্দ্র আছেন, মিঃ গুহর মত লোকেও সেখানে কেমন করিয়া জন্মায়!

ডাকের পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। সুসমার নামে কালে-ভদ্রে একখানা পত্র আসিলে সেখানা নরেশচন্দ্রের নিকট হইতেই আসে। আজও সেই বিখ্যাসেই পরিপূর্ণচিত্তে সাগ্রহে পত্রখানা লইয়া মাথায় ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ সুসমার লক্ষ্য হইল, উপরে হস্তাক্ষর নরেশচন্দ্রের নহে এবং খামখানা অন্য ছাদের। চিঠি লিখিবার লোকের বাংলাই তাহার কোনখানেই তো নাই, কে লিখিল তাহাকে এই চিঠি! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মোটা খামখানা সে মাথার কাঁটা দিয়া খুলিয়া ফেলিল। সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত হাতের লেখা, আর সম্পূর্ণরূপেই অবমাননাজনক ইহার বর্ণবিবরণ! ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া চারি পৃষ্ঠা চিঠির শেষে নামের স্বাক্ষরটা উল্টাইয়া দেখিতে গেল। সেখানে লেখা আছে—“তোমার একান্ত দর্শনাভিলাষী সুরেশ্বর বসু।” চিঠির উপরে এ বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর নম্বর দেওয়া রহিয়াছে। তখন মিঃ গুহর কথা তাহার স্মরণ হইল। তাহার প্রতিবেশী সুরেশ্বর বোসকে সে চেনে কি না, এই প্রশ্ন তিনি তাহাকেই সে দিন করিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর মিঃ গুহর বন্ধু। প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার বক্ষঃস্থল অবধি জ্বলিয়া গেল। অতি সামান্য প্রতিবাদেই সে মর্দিত করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আবার কি ভাবিয়া তাহা গদির তলায় তদবস্থাতেই রাখিয়া দিল। সে পত্রে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তাহার আভাস দু’চার পংক্তির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং সে দিন মিঃ গুহর মুখে সে কথা শুনিতেও তো তার বাকি নাই। রাজা নরেশচন্দ্র তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছিলেন

এবং যাহা হইতে এক্ষণে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাহার উহাকে রাখিতে প্রস্তুত, ইত্যাদি অনেক কথাই সেই পত্রে লেখা আছে। পত্রখানা নরেশকে দেখান উচিত বোধেই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল না!

কানাই সিং বিস্তর রাগারাগি করিয়াও তাহাকে রাঁধাইতে না পারিয়া বিষম ক্রোধে গজগজ করিতে উঠিয়া গেল, “তা হ’লে হামিও আজ আর রুটি বানাবে না। এমন ক’রে রোজ রোজ উপোস দিলে যে তোঁর জান বার হয়ে যাবে খুঁকি বউয়া! খোড়া কুচ তো আদমী মুহেমে দেয়।”

তার পর নিজের তৈরী আটার রুটি ও আলুর তরকারি বানাইয়া এক ঘটি জল ও থালায় খাবার আনিয়া তার সামনে ধরিয়া দিয়া বলিল, “লে’ এখন উঠে বৈঠকে খা’লে বাবা; দুটো খা’লে!”

সুসমার চোক দিয়া এতক্ষণের পর তাহার চোক নাক জালা করিয়া অকথা যন্ত্রণারূপি তপ্ত অশ্রুর আকারে ছুটিয়া বাহির হইল! নিজের যে অরুণ্ডদ মর্ম্মব্যথা তার মনের ভিতরে জন্মাট বাধিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রচণ্ডবলে আঘাত করিতেছিল, এই একমাত্র স্নেহ করিবার বুড়া সাথীটির এইটুকু স্নেহাভিব্যক্তিতে সেই অব্যক্ত দুঃখ তাহার ব্যক্তের সামান্য ফিরিয়া আসিল। সে খাবার কোলে করিয়া ক্রমাগত চোকই মুছিতে লাগিল।

কানাই সিং সান্ত্বনা দিয়া বলিল, “খেয়ে লে বউয়া, খেয়ে লে, তোঁর অসুখ কুছু বাড়বে না, আমার কথায় বিশোয়াস কর। কচি বাচ্চা, কত উপোস করবি বল্ দেখি?”

অনেক কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া সুসমা তার পুরাতন বন্ধুর যত্নের দান মোটা রুটির দু’একখানা খাইয়া তখন বুকিতে পারিল, এটুকু পাওয়ার তাহার বিশেষ প্রয়োজন ঘটয়াছিল। অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া সে তখন স্নেহকারীকে একটু খুসী করিবার জন্ত তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, “সিং-জি! আচ্ছা তোমার বউ মেয়েরা সেখানে গেলে তোমার রুটি গড়ে দেয় তো? সেখানে তো নিজে রাঁধতে হয় না?”

কানাই সিং একগাল হাসিয়া জবাব দিল, “আরে নারে বউয়া! সেখানে হামি কিসের দুখে নিজে রাঁধতে যাবে? কিস্মতিয়া, ববুয়া হামার বড়া পুতৌ নানুকিয়া মাই সবকোই রুটি পেকিয়ে দেয়, হামি বৈঠে বৈঠে খাই। সেখানের রুটি বড়া মিট লাগে।”

পানীয়ে মিঠা বহুত। আছা কব্ না কব্ সেহাতি খেতে পারবে, সে তো না জানে কুছ!”

সুখমা অকস্মাৎ কি যেন একটা ক্ষীণ আলোক রেখা ঐটুকু পরিতাপের বেদনার মধ্যে জলিয়া উঠিতে দেখিতে পাইল। সে একেবারে কাঙ্গালের মতন ব্যাকুল হইয়া ছুচোকঁভরা আগ্রহ লইয়া কানাই সিংহের মুখের পানে চাহিল।

“সিং-জি! আমার তুমি ফেলে যেও না! বরং আমার সঙ্গে ক’রে তোমার দেশে নিয়ে চল, তাই নিয়ে চল সিং-জি! যাবে?”

কানাই এই কাতর ও ব্যগ্র আবেদনে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও এ প্রস্তাবেই মহা সন্তুষ্ট হইয়া গেল। আপ্রান্তমুখ দন্ত বিকশিত করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “হামার বাড়ী গিয়ে কি তুই থাকতে পারবি খুঁ কি বউয়া! সে যে মাটির বাড়ী, তার ফুসের চাল। কি করবো গরীব আদমী। রাজাবাবু তোকে যেতে দেবে কেন?”

সুখমা উত্তেজিত আবেগে অধীর হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “খুব দেবেন, খুব দেবেন। আমি কোথাও স’রে যেতে পেলে তিনিও যে রাহমুক্ত হ’ন, —কেন দেবেন না? কিন্তু আমি গেলে তারা কি আমার ঢুকতে দেবে, সিং-জী? আমি কোথায় থাকবো?” সুখমার অর্ধেকটুকু উৎসাহ এই চিন্তা-ভাব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটার টানের মতই চলিয়া গেল।

কানাই সিং জিব কাটিয়া তন্তুশব্দে “সে কি রে বাবা! কেন, তুই কার কাছে কি কছুর করেছিস রে?” বলিয়া সম্মুখে আদরে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বহির্দ্বারে খটাখট্ খটাখট্ করিয়া অসহিষ্ণুভাবে কাহাকে কড়া নাড়িতে শোনা গেল। রাজাবাবুর পত্রবাহক বিশ্বাসে ছুজনেই তন্তু হইল। নতুবা এমন সুখজনক আলোচনার মধ্য হইতে কানাই সিংকে এত শীঘ্র কেহ উঠাইতে পারিত না।

খানিক পরে উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, রাজাবাবুর লোক নয়, ব্যারিষ্টার সাহেব সুখমার দুদিনের কাজ কামায়ের কৈফিয়ৎ কাটিতে আসিয়াছেন। সে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে, ববুয়ার এখন বড় অসুখ, দেখা কিছুতেই হইবে না, তাহাতে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। শেষকালে কানাই সিংকে বিরক্ত দেখিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহাকে বজেন, দেখা করাইয়া দাও তো এটা পাইবে! কানাই তাহাকে উত্তম মধ্যম বাড়িয়া দিত, শুধু পাছে ববুয়ার

মনিবকে চটাইলে ববুয়া তার উপর রাগ করে, তাই সে পারে নাই। এই বলিয়া বুদ্ধ কান্দো কান্দো গলায় সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “অমন নোকরী তুই করিসনে খোঁকী! হামি রাজাবাবুকে বলবো, তোর টাকার আটচে না, আর কিছু বেড়িয়ে দিতে। হামার রাজাবাবু তেমন নয়।”

কানাই সিংহের আনিত সংবাদে এ দিকে সুখমার অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিয়া সে দ্বারের দিকে সম্মুখ দৃষ্টি রাখিয়া উর্দ্ধ্বাসে বলিয়া উঠিল, “কিছুতে না, কিছুতে না, সিং-জী! দেখ, যেন সে আমার বাড়ীতে না ঢুকতে পারে। তুমি যে করে হয়, তাড়াও ওকে, তাড়াও।—যদি এখানে এসে পড়ে—শিগ্গির যাও।”

বিস্মিত কানাই সিং কি বলিবার জন্ত মুখ খুলিতে গেলে, দারুণ অধৈর্যের সহিত সে তাহাকে ঠেলিয়া দিল, “আঃ যাও না সিং-জী, একুণি হয় ত এখানে এসেই উপস্থিত হবে।”

কানাই সিং প্রস্থান করিলে ছুটিয়া আসিয়া সুখমা ঘরের সব কয়টা দরজা জানালায় থিল আঁটিয়া দিল। তার হাত-পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া যাইতেছে।

বিশ্বপ্রিয় বাবু পরের দিন সকাল বেলায় আসিয়া নিজের নাম-ছাপা কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন, “সবিনয় নিবেদন,—রাজাবাহাদুরের অনুরোধে আমিই আপনার জন্ত মিঃ গুহর বাড়ীর চাকরী জোগাড় করিয়াছিলাম, যদি সেখানে কোন অসদৃশ কিছু ঘটয়া থাকে, তার জন্ত আমিই প্রধানতঃ দায়ী এবং আমিই তার জবাব দিতে বাধ্য। সে জন্ত আমার সব কথা জানাও উচিত। অতএব যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে মিনিট কতকের জন্ত আপনার বাহিরের ঘরে আপনার কোন বিশ্বাসী লোকের উপস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটতে পারে।”

পত্র লেখার ধরণে বিশেষতঃ পূর্বেই নরেশের পক্ষে তাহার ‘বদ্ধ’ বলিয়া ইহার উল্লেখ থাকাতো সুখমা কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার ধারের অব্যবহারে পতিত আসবাবহীন বৈঠকখানা ঘরখানায় বিশ্বপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

বিশ্বপ্রিয় তাহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সবিনয়ে কহিল, “মিঃ গুহর কাছে কাল রাতে শুনলুম, আপনি আর তাঁর স্ত্রীকে

বাজনা ~~কোঁকিল~~ যাচ্ছেন না। আপনার না যাবার কারণ জানতে কল তিনি এখানে এসেছিলেন, আপনি দেখা করেন নি, অপরন্তু আপনার চাকরের হাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন।”

সুখমা আসিবার সময় নিজের রুমচুলুঙাকে টানিয়া মাথার উপর কুণ্ডলী করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছিল, চোখে এক জোড়া চোক ওঠার সময়কার নীল চশমা ও গায়ে একখানা মোটা রূপার সে নিজেকে লুকাইবার ইচ্ছায় ঢাকা দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দিকে চোখ পড়িতেই বিশ্বপ্রিয় যেন আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। রাজা নরেশের আশ্রিতা যে এতটাই ছেলে মানুষ, এ ধারণা তাঁর মোটেই ছিল না। আরও বিশ্বয়বোধ হইল তাঁর নিরাভয় ও অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া।—এ যেন একটি নেহাৎ সাদাসিধা স্কুলের মেয়ে। একে আর কিছু যে মনে করিতেই পারা যায় না।

ধীর এবং স্থিরকণ্ঠে সুখমা উত্তর করিল, “তিনি যা বলেছেন, সবই সত্যি। শুধু তাঁকে অনুগ্রহ ক’রে ব’লে দেবেন, আমি তাঁর বাড়ী আর চাকরী করবো না, তাঁরা যেন দয়া ক’রে আমায় বিরক্ত না করেন।”

অনুমানে সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপ্রিয় কিছু হুঃখিত, কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মূহু মূহু বলিলেন, “রাস্কাল! আচ্ছা, তাকে আমি দেখে নেবো। কিন্তু আপনার কাছে আমিই অপরাধী হয়ে পড়লুম। আচ্ছা, এবারে আমি বিশেষ জানাশোনা ভদ্রবর দেখে আপনার জন্ত খুব ভাল চাকরী ঠিক ক’রে দোব, দেখবেন।”

সুখমা নতমুখে বলিল, “আমার আর চাকরীর ইচ্ছা নেই।”

বিশ্বপ্রিয় সলজ্জে মাথা-হেঁট করিলেন এবং তাঁর পর নত মুখেই কহিলেন, “সংসারে মিঃ গুহ অল্পই জন্মায়, জানবেন।”

সুখমা কহিল, “তা, আমি জানি, কিন্তু আমার স্থানও যে বড়ই স্বল্প-পরিসর। ক’জন আমার বাড়ী ঢুকতে দিতে রাজী হবেন?”

এই অকুণ্ঠিত ও নির্ভীক আত্মভিষ্যক্তিতে বিশ্বপ্রিয় একদিকে যেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে তাঁহার আলোচনার পথও মুক্ত হইয়া গেল। তিনি তখন ঘরের মধ্যের দ্বিতীয় চৌকিখানি টানিয়া দিয়া সুখমাকে বলিলেন, “বসুন, আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমি একটুখানি আলোচনা করিতে চাই। আপনার বিষয়ে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে আমার বতটা জানা আছে, আর নিজেও

যেটুকু আজ আপনাকে দেখেও আমি বুঝেছি, তাতে সাধারণ সমাজ আপনাকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবে না ব’লেই আমার বিশ্বাস। আমি সব কথা জানিয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করবো এবং ধ’রে নিচ্ছি, তাতেও যদি না কৃতকার্য্য হ’তে পারি, তা হ’লে—”

বিশ্বপ্রিয় একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে সুখমা জিজ্ঞাসা করিল, “আমার সমস্ত খবর পেয়েও কি ব্রাহ্মসমাজ আমার তার মধ্যে স্থান দিতে প্রস্তুত হবে?”

প্রশ্নের ধরণে, আর ঐ ‘সমস্ত’ কথাটার উপর জোর দিয়া বলাতে বিশ্বপ্রিয় মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিয়া একটু যেন আমতা আমতা করিয়া এক রকমে জবাব তৈরী করিয়া লইলেন—“দৈবানুভূত কুলে জন্ম’ সমাজ সে কথাটা জানে বৈ কি!”

সুখমা নিজের অস্পষ্ট হইয়া পড়া কণ্ঠস্বরকে সুস্পষ্ট-তর করিয়া তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল, “জন্মগত অপরাধের কথা নয়। যে অধিকারে মিঃ গুহ আমার অবমানিত করাকে অপরাধ বা পাপ বোধ করেন নি, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা কি আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি বদল করতে পারেন? অথবা আমি যা আছি, লোকের মনে তাহাই থেকে যাব, অথচ যে দেবদেবীদের আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, শুধু বাহিরে স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে তা করিনে?—আর যে নিগূণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার ধ্যান বা ধারণা কাছেও গিয়ে পৌঁছতে পারে না, সকলের মধ্যে সগর্বে স্বীকার ক’রে নিতে হবে যে, তাঁহারই উপাসক আমি? এত পাপের মধ্যে আমার এতবড় একটা প্রতারণা কেন করতে যাব? হিন্দুসমাজে মেশবার অধিকার আমার নাই থাক, তবুও মনে-প্রাণে যে আমি হিন্দুই।”

এর পর আর বিশ্বপ্রিয় কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দু’একবার ক্ষীণ ভাবের প্রতিবাদ-চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূতবোধে শেষে অনেক চেষ্টা করিবার পর নিজের সকল দ্বিধা ও লজ্জা সংবরণ করিয়া তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিতই মোরিয়াভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—

“এই সামান্য ক্ষণের কথার বার্তায় আপনাকে আমি চিনেছি। রাজার কথা,—সত্য কথাই বলবো—পূর্বে আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন আমি আপনার তেজস্বিতায় ও সরলতায় মুগ্ধ হয়ে সব কিছুই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস ক’রে নিতে পেরেছি। আপনি আমাদের সমাজে আসতে চান; আমি সব্বলে আপনাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা ক’রে তুলতে

আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত হবো। আপনি যদি ব্রাহ্মধর্মে না আসতে চান; তা' হ'লে আপনাকে নিরাপদ ও সম্মানের স্থান দেবার জন্য আমি অত্যন্ত আত্মদানের সহিতই আপনাকে সিবিগ ম্যারেজ অ্যাক্টের হিসেবে বিবাহ করতে সম্মত জান্বেন। আপনার মত মহিলার এ অবস্থায় থাকা অসুচিত এবং যারা থাকতে দেয়, তারা অপরাধী।”

সুখমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ঘোড়হাতে নমস্কার করিল, কৃতজ্ঞতার সজলকরণস্বরে সে কহিল, “আপনি আমার যে কথা আজ মুখেও বলতে পারলেন, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা' আমার চিরদিন মনের ভিতর গাঁথা থাকবে। কিন্তু আমি যে কোন সমাজের লোকেরই জ্ঞী হবার যোগ্য নই। আমার সম্বন্ধে এখন থেকে আপনারা শুধু নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করেন, এই আমার শেষ ভিক্ষা।”

বিশ্বপ্রিয়রও আর বলিবার কথা যোগাইল না। তখন দুজনেই বিদায় লইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

“হ'ত ভাল যদি হ'তে কুৎসিত—

অথবা সে হ'তে বলী

ভয়ে আসিত না ভালবাসিত না—

চরণে যেত না দলি।”

—তীর্থ-সলিল।

অশান্তির আগুন যখন জ্বলিতে আরম্ভ হয়, ইহার যেন আর শেষ দেখা যায় না। কোথা দিয়া ও কেমন করিয়া যে রাজা নরেশচন্দ্রের সহিত সুখমার বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবরটা দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল বলা কঠিন, কিন্তু কলিকাতার ধনী-মহলে যাহারা ও-সকল সংবাদ রাখিয়া থাকেন এবং নরেশচন্দ্রের সুন্দরী আশ্রিতার সম্বন্ধে যাদের বিশেষ একটু আগ্রহ মনের মধ্যে এতদিন চাপা ছিল, তাঁদের মধ্যে দু'এক জন ধনী লোকের মোটর সুখমার দরজায় থাকা মারিয়া গেল। বেহ বা পত্র—কেহ বা বন্ধু পাঠাইলেন। কানাই সিং হুকুমবরদারী করিল। রাজার পত্রবাহক ভিন্ন সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হুকুম ছিল,—ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা কানাইয়ের স্বভাব, কানাই সে বিষয়ে কোন ক্রটি দেখাইল না।

শেষে ডাক্তার করুণানিধান বাবু দেখা করিতে আসিলেন। ইহার সম্বন্ধে কি করা উচিত, ঠিক না পাইয়া কানাই সিং মুনিবকে খবর দিতে গেল।

ডাক্তার নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া পেন্সিলে লিখিয়া দিলেন,—“সে যে কাহারও সহিত দেখা করিতেছে না, তাহা তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা স্বতন্ত্র। তিনি সুখমার বাল্যকালে কতবার রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে আশ্রিয়া তাঁর গান শুনিয়া গিয়াছেন, রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন যে! তা তখন হইতেই তিনি সুখমার জন্য পাগল, কেবল নরেশের বন্ধুত্বের খাতিরেই এতদিন চূপ করিয়া ছিলেন। তাঁর জ্ঞী এখন মারা গিয়াছে।—সুখমার রূপ ধ্যান করিয়াই তিনি আর নুতন করিয়া সংসাজিতে পারেন নাই।” কানাই সিং ঈর্ষৎ ক্ষুব্ধভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, “আজ নয়, আপনি কাল আসিবেন।” এদের উদ্দেশ্য সেও এখন বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সুখমার কার্যে তাঁর বুক অহঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহা চূর্ণ হইতে বসিল, ভাবিয়া সে মর্মে আহত হইল।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণচিত্তে নিজের খাটিয়ায় বসিয়া পড়িয়া সবেমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে “সীতারাম। সীতারাম!”—এমন সময় উপর হইতে ডাক আসিল—“সিং-জী!”

মুখ ভার করিয়া কানাই গিয়া নিরুত্তরে কাছে দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘরের মেজের বসিয়া সুখমা চোক মুছিতেছে, বোধ করি কাঁদতে-ছিল। তাহাকে দেখিয়াই সে আহত-শিশুর স্তায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মর্ম্মবিদারী স্বরে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, “সিং-জী, ভাইয়া! আর তো আমি এ দেশে থাকিতে পারাচিনে, আমার তোমার দেশে তুমি নিয়ে চলো।”

কানাই সিং এই দুদিনের ব্যাপ্তির মনে মনে অত্যন্ত চট্টিয়াই ছিল। সে যেমন গ্রীত তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া কথিয়া উঠিল, “বউয়া! তুই কাঁদিস্ নে, তুই হামার বেটী আছিস্, বেটীসে বড় করে হামি তোকে মেনিছি, হামি তোহর হুকুম পেলে ওই দুখমন্-বাবুদের নাক ভেঙ্গে দিতে পারি। তুই হুকুম দে, দেখি তোকে কোন্ জানোয়ার কাঁদাতে আসতে পারে।”

সুখমা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল “না কানাই ভাইয়া! কারকে আমি কিছু বলবো না, ওদের দোষ কি? ওরা চিরদিন আমাদের মত লোকেদের সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রে আসতে পেরেছে, পারছে, ওরা তাই জানে। আমাদের মধ্যেও যে মানুষের প্রাণ আছে, ইজ্জতবোধ আছে, তা তো কোন দিন কেউ ভাবতে শেখে নি।

সমাজ তো আমাদের রক্ষার কোন উপায় করেনি, কেউ তো আমাদের দোরে দোরে গিয়ে উদ্ধারের উপদেশ শোনায় নি, আমাদের নিয়ে শুধু পুতুল খেলা-তেই পেরেচে। আমরা যে মানুষ, সেটুকু শুদ্ধ ভুলে গিয়েছে। ওদের বলবার আছে কি? এর জন্য আমরাও যে দায়ী। শুধু ওরাই নয়, আমরাও যে ভুলে গিয়েছিলুম, আমরাও মানুষ।”

কানাই সিং রাগিয়াই ছিল। সে তেমনি উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “রাজা বাবুরই তোমার খবর না লেওয়া খুব কসুর হচ্ছে। আমি এখনি গিয়ে সব হাল শুঁকে জানিয়ে আসছি।”

“সিং-জী ভাইয়া! আমার একলা রেখে তুমি যেও না, তবে আমার শুদ্ধ সঙ্গে ক’রে নিয়ে চলো।”

কানাই যেন এতক্ষণের পর নিজে আশ্বস্ত হইয়া উঠাকেও আশ্বস্ত করিতে চাইয়া বারবার কহিয়া বলিতে লাগিল, “তাই চল বউয়া! তাই চল। আমার রাজাবাবু তোকে দুস্কু পেতে দেবে না; এমনি ক’রে থাকিলে তুই মরিবে যাবি।”

বেলা তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। রুদ্ধহার ঘরের মধ্যে পাথার হাওয়ায় গ্রীষ্মতাপ কিছুই অল্পভূত হই-তেছিল না বটে; তবে বহির্জগতে তখনও পচা ভাদ্রের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ বেলা অবসানের পথে আলস্ত-প্লথ গতিতে ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিল, যাইবার জন্য তার বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল না। পশ্চিমাকাশে সূর্যের দেখা নাই; কিন্তু প্রবলপ্রতাপাধিত রাজ-চক্রবর্তী রাজার শাসনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যেমন তাঁহার শাসনপ্রভাব কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার শাসিত প্রদেশকে প্রভাবান্বিত রাখে, তেমনি তাঁর মহিমাঙ্গাল তখনও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে গৌরব বিস্তৃত করিতেছিল। নরেশচন্দ্র নিজের আপিস-ঘরে দু’একজন কর্মচারীর সহিত কাজকর্ম দেখিতেছিলেন; এইবার উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় কানাই সিং দ্বারে দাঁড়াইয়া বার-কতক কাসিয়া নিজের ‘পরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া লইল এবং তার পর দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া ডাকিল, “মহারাজ!”

“কে? কানাই সিং?—যুগল! পালমশাই! আজ আমি এইবার উঠি, কাল আর একবার ঐ খসড়াটা ভাল ক’রে দেখে শুনে দেওয়া যাবে।”

নরেশ কানাই সিংয়ের কাছাকাছি হইয়া নিম্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের খবর ভাল তো কানাই সিং?” হাতে চিঠি আছে কি না, উদ্বিগ্ন চোখে দেখিয়া লইলেন।

কানাই সিং দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল,

“খবর কাঁহা কুছু আচ্ছা হায় মহারাজ! বউয়াজী বহুত তক্লিবসে হায়। হাম উন্কো সাথ্ করকে হিয়া লে আয়া।”

“নিয়ে এসেছ! তাকে!”—নরেশ যেন ভয়ঙ্কর-ভাবে চমকিয়া উঠিলেন।—“কি হয়েছে তার? আমার খবর দিলেই হোত।”

কানাই সিং সুষমাকে সত্যসত্যই ভালবাসিয়া-ছিল, একেই সে সুষমার প্রতি ‘মহারাজের’ ব্যবহারকে প্রশংসা করিতে কোনমতেই সমর্থ হইতে-ছিল না, তার উপর ইঁহার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অথচ সুষমার অর্থাভাবে অবমাননাজনক চাকরী করিতে যাওয়া, বিশেষ তাহারই পরিণামে এত দুঃখ-ভোগ, তাহার মনকে অত্যন্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়া-ছিল। এক্ষণে সুষমার আগমন-সংবাদে নরেশকে বিপন্নভাবাপন্ন দেখিয়া সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। মনিবের মর্যাদা তুলিয়া গিয়া সে অভিমান-পরিপূর্ণ বিরক্তস্বরে জবাব দিল, “মহারাজ! হুকুম করমাইয়েতো হাম হামারা বউয়াজীকো আপনা দেশপ’র—যাঁহা হামারা বেটী পুতৌ হায়, হুঁয়াই লে চলে?—লেকেন গরীব পরবর!—গরীবকা বাচ্চা কো উপর এইসা বেথেয়াল হোকে রহ্না ঠিক বাত নেই হায়!”

ভৃত্যের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নরেশচন্দ্রের চিন্তা-বিপন্নতা গভীর লজ্জায় পর্যাবসিত হইয়া আসিল। আত্মচিন্তায় বিরত হইয়া তখন আশ্তে আশ্তে উঠাকে প্রশ্ন করিলেন, “সুষমা কোথায়?”

গাড়ীর মধ্যে ফটকের বাহিরে আছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কানাই সিংয়ের সহিত অগ্রসর হইলেন।

পিছনে কর্মচারী দুজনের মধ্যে যুগল তখন নিম্ন-স্বরে অপর জনকে সম্বোধন করিল, “ব্যাপারখানা শুনলেন তো পালমশাই! বাইজী সাহেব যে বাড়ী চড়োয়া হ’য়ে এসে উপস্থিত হ’লেন দেখছি! আসা যাওয়া কমেছে কি না, অমনি গেরো কষতে বাড়ী বয়ে ছুটে এসেছেন।”

পালমশাই চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া মুচকি হাসির সহিত টিপনী কাটিল, “ভাই রে! ওরা হ’লো জলের কুমীর; ওদের দাঁতের মধ্যে যার গর্দানখানা গিয়ে পড়েচে, সে কি আর কখন তা’বার ক’রে নিতে পারে? এতো তোমার রাগব-বোয়াল নয় যে ফের উগ্গরে দেবে!”

“এইবারেই আমাদের রূপসী-রাণী ঠাকুরগটির সিংহাসন টলমলে হ’ল বোধ হয়! যা হোক ভাই,

আমার কিন্তু একবারটি ওর রূপখানা কোন রকমে দেখে চক্ষু দুটো সার্থক ক'রে নিতে হবে। শুনেছি নাকি মাগীটা আরমানী বিবি?"

পাল কহিল, "দুষ্ট ছোড়া! আরমানী কেন হ'তে যাবে?—সে যে, আদত কাশ্মীরী।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোরে পুষ্প দিলে ব'লে পুড়িছে অন্তরে
পুড়িয়া মরুক পুষ্প দিব কেন তাবে?

—মহাভারত।

পরিমল মুক্তার মালা জড়ান খোঁপার উপর একটি পাতাশুক মাদা গোলাপ পরিয়াছে, গায়ে তার পাতলা গোলাপী বেনারসীর হাতখোলা জ্যাকেট, তাহাও বোম্বাই মুক্তায় খচিত এবং মুক্তার ঝালরগুলি তার নব কিসলয়চিকণ স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যে ভরা মন্থন বাহুর উপর অতি সুন্দর ভাবে দোল খাইতেছিল। কানের হীরা কয়খানা সন্ধ্যা-শুকতারার মতন উজ্জল এবং গলায় একাবলী মুক্তার হার তেমনি স্থূল ও সুগোল। গোলাপ-ঝাড়ের বুটাকাটা সন্ধ্যাকাশের মতই সমুজ্জল গোলাপী আভাযুক্ত সাড়ীর আঁচল হালফ্যাসানে হীরার পিনবদ্ধ, হাতে একখানা পালকের পাখা,— এই রকম সাজগোজ করিয়া সে সন্ধ্যা আকাশের শোভা দেখিতে ছাদে উঠিয়াছিল,—অমরা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু ডাকিতেছেন। পরিমলের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সকল ভূষা তখনই সার্থক হয়, যখন এই সাজান দেহ তার যথার্থ আদরের পাত্রের আদরের স্পর্শ ও প্রশংসার দৃষ্টি লাভ ক'রে।

“কি গো! কি ভাগ্যি আজ যে এমন অসময়ে গরীবের গরীবখানায় রাজামশাইএর পায়ের ধুলো পড়লো? বলি কোন্ দিকের সূর্য্যি আজ কোন্ দিক দিয়ে অস্ত গেলেন?”—বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারই দিকে উদ্বিগ্নমুখে অগ্রসর স্বামীর মুখ সে দেখিতে পাইল এবং তাহার আনন্দোত্তেজনা ও সুধাবেগে স্পন্দিত হৃদয় যেন অকস্মাৎ শ্রোতোহত হইয়া থমকিয়া গেল। উদ্ভূত অধরের সরস হাস্য এবং ব্যগ্র বাহুর সাগ্রহ আমন্ত্রণ নিরুদ্ধ রাখিয়া সেও উৎসুকনেত্রে উহার হাস্যলেশহীন গম্ভীর এবং উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভরসা করিয়া যেন কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না।

নরেশ এক বার তাহার দিকে চাহিয়া ‘এসো’ বলিয়াই নীরবে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গলার স্বরে কোন কিছু অভাবনীয় ঘটনার আভাস পাইয়া পরিমল চমকিয়া উঠিল, শঙ্কিতমুখে উৎকণ্ঠিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ'য়েছে?”

নরেশ ঘরের মধ্যে আসিয়াই পরিমলের দিবানিদ্রা উপভুক্ত বিচানাটার একধারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, পরিমল নিকটে আসিতেই নিজের পাশে তাহাকে জায়গা দিয়া সন্দেহশঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পরিমল! আজ আমাদের মস্ত বড় পরীক্ষার দিন। তুমি যদি আজ অকপটে আমার সাহায্য করো, তবেই আমি রক্ষা পাই।”

পরিমল কোন অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, “কি করবো বলো?”

নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবেন, তিনি যেন তার ভাষাই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তাঁহার উৎসাহ ও দৃঢ়তাপূর্ণ চিত্ত অকস্মাৎ যেন এই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। পরিমলের অবস্থাও এই সময়টুকুর মধ্যে যেন উহার চেয়েও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কি শুনিবে, সে যে তার কোন আন্দাজই করিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেশ তাঁর বক্তব্য কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“একটি অনাথা মেয়ে সংসারে অনেক নিগ্রহ ভোগ ক'রে আমাদের দ্বারস্থ হইয়াছে, তুমি যদি তাকে দয়া ক'রে একটুখানি আশ্রয় দাও।”

বুকে চাপিয়া ধরা প্রবল আতঙ্কটা যেন একথণ্ডে অচ্ছন্ন শব্দ-মেঘের মতই সরিয়া গেল। স্বামীর বিষম চিত্তিত মুখের উপর কোতুকপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে ভৎসনার স্বরে কহিয়া উঠিল, “ও মা গো! কি মানুষ তুমি! আমি বলি, কি না জানি হ'য়েছে!” বলিয়াই স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া তাঁর গলাটা ছ'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সুখের আবেগে গলিয়া পড়িয়া বলিল, “তা ব'লে অতটা হিংস্রটে আমায় তুমি মনে ক'রো না! এত লোকে তোমার বাড়ী আশ্রয় পাচ্ছে; আর সে মেয়ে-মানুষ ব'লেই আমি বুঝি তাকে রাখতে দিলে হিংসেয় বুক ফেটে ম'রে যাবো, এই তুমি মনে করলে? বেশ তো, রাখ না তাকে;—একনি থেকেই রাখ না। কোথায় আছে সে?”

নরেশ স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনের এবং অজস্র অন্ততপ্ত আদরের মধ্যে অপরাধ-বিরত হইয়া পড়িয়া

তাহার দিকে না চাহিয়াই চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “এর সব ভার তোমায় কিন্তু নিজের হাতে এখন থেকে নিতে হবে! আমি না বুঝে এত দিন ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর তার ফলেই আজ ওর এই বিপন্ন দশা। তুমি এবার ওকে সেই দুর্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোমার স্বামীর তুলে প্রায়শ্চিত্ত করবে, কেমন পরি-রাগি!”

পরিমল নিজের আনন্দ-স্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক ও কৌতূহল ভরিয়া কি কথা বলিতে গিয়াই যেন কোন্ নূতন পথের চিন্তাধারায় আর এক ধারে চলিয়া গেল। হঠাৎ সে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “মেয়েটির নাম কি?”

স্বামী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া নরেশ যেন একটুখানি থতমত খাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, “সুখমা তার নাম, সে—

পরিমলের আদরভরা বাহুর বাঁধন শিথিলমূল হইয়া তাহার স্বামীর কণ্ঠ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া পড়িল। শুক ফুলের মত হইতে যেমন করিয়া কঠিন ফলের গুটি বাঁধিয়া উঠে, তেমন করিয়া তাহার আনন্দবিকশিত প্রফুল্ল মুখের সমুদয় রেখা যেন সেই মুহূর্ত্তই অত্যন্ত কঠোর হইয়া দেখা দিল। সে নরেশের সামিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া দৃষ্ট-ভঙ্গীতে মুখ তুলিয়া অরিতকণ্ঠে কহিল, “আমার বদলে যদি রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে, তা হ’লে কি আজ আমার কাছে যে কথা বলতে পারলে, সেই কথা তার কাছেও তুমি তুলতে পারতে? নিতান্ত গরীব ব’লেই না আমার তুমি তোমার রক্তিতার সঙ্গে একত্রে বাস করবার কথা বলতে দ্বিধা পর্যান্ত করলে না।—কিন্তু জেনো, গরীব হ’লেও আমি ছোট লোকের মেয়ে নই, যে, একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে পারবে।”

নরেশ এই অপ্রত্যাশিত ক্ষুর স্বরের তীব্র তিরস্কারে যেন অধাক হইয়া গেলেন। সুখমার পরিচয় যে ইহারও নিকট কিছুমাত্র গোপন নাই, মায় তাহার নামটা শুধু—এ খবর তাঁর জানা ছিল না, তাই এই কথার ঘায়ে তাঁর যেন সকল আশাই এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেও লজ্জায় স্তিমিমাণ হইয়া ক্ষণকাল সুখমা সম্বন্ধে নিজের অবিমুগ্ধকারিতার অনুতাপ দ্বিকারে নীরব হইয়া থাকিয়া পরে আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

“তুমি যদি আমার একটুও ভালবেসে, এতটুকুও

শ্রদ্ধা ক’রে থাক পরিমল! তা হ’লে নিজের অভিমান ছেড়ে দিয়ে আমার এই বিপদের দিনে আমার সহায় হও। পরের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়, তার মধ্যে অনেক অসত্যও থাকে; আগে সকল কথা নিরপেক্ষভাবে জেনে শুনে তার বিচার ক’রে তবেই রায় দিতে হয়। সুখমাকে আমি এতটুকু কচি মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক রকম মানুষ ক’রেছি। তার জন্ম অপবিত্রা মায়ের গর্ভে; কিন্তু নিজে সে অতি পবিত্র, তাকে একপাশে একটু স্থান দিলে তোমার বাড়ী নিতান্তই কলঙ্কিত হবে না;—যে সব বি-চাকরাণীদের তোমার বাড়ীতে ঢুকতে দাও, তাদের সঙ্গে ওর তুলনাও হয় না।”

পরিমল স্বামীর বেদনাক্রান্ত ও অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া একবারটি যেন নিজের মনের মধ্যে একটা ঘোর-র দৌর্বল্য অনুভব করিয়া ফেলিয়া-ছিল। পরক্ষণেই কিন্তু তাহার সেই সব পুরাণো কথা মনে পড়িয়া গেল। সৎ-শাস্ত্রী, বৈমাত্র-নন্দ, অন্নদা বিস্বাই যে এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই তাহার এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীটির সংবাদ তাহাকে শুনাইয়া দিতে এতটুকুও বিলম্ব করিতে পারে নাই। শাস্ত্রী এমন কথাও আভাসে-ইঙ্গিতে জানাইয়া-ছিলেন যে, “নরেশের তো বিয়ের সাধে বিয়ে করা নয়; নেহাৎ লোক দেখাবার জন্ত একটা বউ এনে ঘরে পুরে রাখা। সুখমা ব’লে তার যে বাইজি আছে, তার মতন সুন্দরী নাকি বাংলাদেশে আর জন্মায় নি। পাছে তার মনে কষ্ট হয়, তাই নরেশ এমন কুৎসিত ও দুঃখীর ঘর দেখে বউ এনেছে। সেই তো সর্বেসর্ব্বময়ী কি না, তা এই পরিমলকে কোন্ দিন না কোন্ দিন তার বান্দী হ’তে না হ’লেই এখন বাঁচা যায়।”

সেই হৃদয়ভেদী তীক্ষ্ণ শর পরিমলের মস্তকের মধ্যে যে বেঁধানই ছিল। তাই নিষ্ঠুর ও কঠিন হইয়া থাকিয়া সে শাস্ত্র অথচ অবিচলিত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, “তোমার এত বাগান, এত বাড়ী রয়েছে, সে সবের অধিকার তো তুমি ওকে দিলেই পারো, শুধু আমার যেটুকু ভুল ক’রে দিয়ে ফেলেছ, সেইটুকু ছাড়া।—ও যদি স্বর্গের দেবীও হয়, তবু আমার কাছে ওর এত-টুকুও জায়গা হবে না।”

এবার নরেশের মনও বেজায় গরম হইয়া উঠিল। বিরক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তিনি কথার উপর জোর দিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “কি তার অপরাধ?”

পরিমল দেহ ঋজু ও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া

উঠিয়া উজ্জল চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীর মুখে নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া ধরিল, স্পষ্টস্বরে কহিল, “তার অপরাধ এতই প্রবল যে, তাকে দেওয়া ভালবাসা ফিরিয়া নেওয়া অসম্ভব বোধে ভূমি আমার মত তুচ্ছ-কেও তুচ্ছ বোধ করতে পারো নি। কিন্তু সেই-খানেই মস্ত বড় ভুল করেছিলে। রাজার মেয়েরও যেমন, ভিখারীর মেয়েরও তেমনি, মন ব’লে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বৃকের ভিতরে একই রকম ভরা আছে। তুমি যাকে ভালবাস, তাকে আমার পাশে ব’সে ভাল-বাসবার সুযোগ আমি তোমায় কিছুতেই দিতে পারবো না। যদি তাকে এ বাড়ীর কর্তৃত্ব দেবে ব’লেই স্থির হয়ে থাকে, তা হ’লে ছকুম করো, আমিই না হয় বাগানে গিয়ে থাকিগে। এক বাড়ীতে ভদ্র-কল্লার আর পতিতার মেয়ের থাকা চলবে না।”

নরেশকে একেবারেই স্তম্ভিত বাক্যহীন দেখিয়া নিজের উদ্যত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া লইয়া রোষক্লর ও উচ্ছ্বাসিতস্বরে পুনশ্চ কহিল, “কিংবা বাগানও যদি তার হাওয়া খাবার জন্তে দরকার প’ড়ে যায়, কাজ নেই আমায় তা দিয়ে। তার চাইতে দেশের বাড়ীতে নতুন মায়ের কাছে আমায় বরং পার্টিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক’রে দাও, আর ততক্ষণের জন্তে শুধু তোমার তাঁকে—”

নরেশ একটা স্মদীর্ঘতর নিশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুর কণ্ঠে কহিলেন, “পরিমল! বিপন্ন আশ্রয়ার্থীকে তোমার দয়ার মধ্যেই সঁপে দিতে চেয়েছিলেম, সেটা এমনভাবে নেবে জান্লে সে চেপ্টা করতেই আসতেন না। ভাল, তাকে একবারটি নিজের চোখেই দেখ,—ভাল মন্দ লোক তো চোখে দেখেও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ডাকি তাকে?”

পরিমল দু’হাত তুলিয়া দু’চোক ঢাকিয়া মাথা নাড়িল।—“আমার স্বামীকে আজও যে আমার কাছ থেকে তুলিয়ে রেখেছ, আমি তার মুখ দেখবো না।”

ষাণ্মিংশ পরিচ্ছেদ

তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে
কহিল পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে

মোরে তুলে?

—কথা।

হে অনন্ত জ্যোতির্ময় বুদ্ধিবে কি তুমি!
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি।
সাধকে কি সিদ্ধি তরে, ইষ্টদেবে পূজা করে,
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় নাক তার?
চির সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার।
জান না আমায় আঁম জানাতে না চাই।
আমি যেন যুগে যুগে এই সুখ পাই।

৩ইন্দিরা দেবী।

নীচের তলার একটা ঘরে সুবমা একাকিনী মেজের উপর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যেন একগাছি ছিন্ন লতিকার মতনই বসিয়া পড়িয়াছিল। রাজা নরেশচন্দ্রের এই সুবিপুল ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদ-ভবনে প্রবেশ করিয়াই তার সমস্ত মনটা যেন লজ্জার অমৃততাপে সঙ্কোচে ও দিকারে গুটাইয়া অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক ও নিরুপায়তার ভয়ের তাড়নায় সে কানাই সিংয়ের প্রস্তাবিত এই কাজটা করিয়া ফেলিবার পরক্ষণ হইতেই তার মনের মধ্যে কিসের একটা অস্বস্তির ঝড়, তুফান তুলিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল। নিশ্চিন্তে নিদ্রিত গৃহস্থের সুখনিদ্রার অবসরে তাহাকে হতসর্বস্ব করণোদ্দেশ্যে চৌধ্যবৃত্তি করিতে আসিয়াছে, এমনি একটা দ্বিধা ও আতঙ্ক যেন তাহার লোভের মধ্য দিয়া উকি মারিয়া উঠিতেছে—বলিয়া—তার বোধ হইল। যতক্ষণ নরেশ তাঁর স্ত্রীর সন্মতি আনিতে গিয়াছিলেন, তায় মধ্যে একটা অকথ্য লজ্জা ও অত্যন্ত তীব্র সঙ্কোচে সুবমার যেন উঠিয়া সে ঘর সে বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিতেছিল। ছিছি, ছিছি, কেন সে মরিতে এ বাড়ীর পবিত্রতার মধ্যে—উহাদের দাম্পত্য-সুখের মাঝখানে নিজের এই কলঙ্কলাঙ্ঘিত পাপছায়া ফেলিতে আসিয়া দাঁড়াইল? সে কি গৃহস্থ-ঘরে পা রাখিবার যোগ্য!।

নরেশ আসিয়া সঙ্কোচে যুহুচরণে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সুবমার মনের ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিমিষেই নিবিয়া গেল। সে মুখ তুলিল না, নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না, কোন প্রশ্ন না করিয়াই যেমন ছিল,

তেন্নি নিজের ও নিষ্পন্ন হইয়া রহিল। শুধু এত-ক্ষণের পর একটা প্রবল রোমনোচ্ছ্বাস ভিতরে ভিতরে তাহার বক্ষকে মথিত ও কণ্ঠকে পীড়িত করিয়া অতি তীব্র বিস্ফোরকের মতই বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

বহুক্ষণ এমনি ভাষাশূন্য অসহ্য নীরবতার মধ্য দিয়া নিজেদের বেদনাকে প্রশমিত হইয়া আসিবার অবসর দান করিয়া এবং তার পর নিজের মনের মধ্যের চক্রাকারে মথিত ক্রোধ ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের জ্বালাকে কথঞ্চিৎ দমনে আনিয়া নরেশচন্দ্র যথাসাধ্য সৌম্যভাব অবলম্বনের চেষ্টা পূর্বক বলিলেন, “চলো সুষমা! তোমার এখনকার মতন বেলগাছিয়ার বাগানে নিয়ে যাই।”

সুষমা এই কথাটুকুর মাঝখান দিয়া যেটুকু বা বাকি ছিল, সেটুকুও বুঝিয়া লইয়া এইবার তার নৈরাশ্য, ভয় ও বেদনা-বিহ্বল চক্ষু দু’টি স্তম্ভীরে উঠাইয়া নরেশচন্দ্রের গভীর ও স্থির সঙ্কল্পপূর্ণ ছুই চোখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, “কানাই সিংয়ের দেশেই আমাকে পাঠিয়ে দিন, তার বুড়ী মা আছে, মেয়েরা বউয়েরা আছে, তাদের মধ্যে আমি বেশ থাকতে পারবো। আপনার বাগানবাড়ীতে আমি আর যাবো না।” সুষমার কণ্ঠে ভৎসনার ভাব প্রকাশ পাইল।

সে কথা কানে না তুলিয়াই নরেশ কহিলেন— “বেদনা! আমার স্ত্রী হয় তো ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছেন, আজও হয় তো আমি তোমার ভালবাসি। অথচ এই আমার জন্তই তুমি বিশ্বের ঘুণা ও লাঞ্ছনার তরঙ্গে পড়ে, হাবুডুবু খেতে খেতে অসহায় অনাদৃত ভেসে ভেসে বেড়াচ্চো, আর আমি নিজেকে নিয়ে গৌরব ও স্তুতি সন্তোষ করছি! না, আর তা হবে না। আজ রাত্রেই তোমায় আমি বিয়ে করবো। বলতে তো কেউ কিছুই বাকি রাখে নি, আরও তাদের যত খুসী নিন্দা করুক না। আমি কারু কথাই আর শুনবো না, তুমি আমার স্ত্রী!”

সুষমা নরেশের কথার ভঙ্গীতে ও তাঁহার দৃঢ় কণ্ঠশব্দে অবাক ও আশ্চর্য হইয়া গিয়া সভয়চক্ষে তাঁহার ক্রোধ ও আবেগোত্তেজিত মুখের দিকে বারেক চকিত কটাক্ষ করিল, তার পর তাঁর পায়ের কাছে পড়িয়া আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে বলিল, “না, না, সে আমি হ’তে দোব না। আমি এই-বার জন্মের মতন চ’লে যাচ্ছি, আর কক্ষনো আমার নামও আপনি শুনতে পাবেন না, এবারকার কথা শুধু ভুলে যাবেন।”—সে কঁাপিতে কঁাপিতে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

নরেশ তাহার কাছে একটুখানি আগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, “তুমি ভুলে যাচ্চো বেদনা! তোমার কখন ত্যাগ করবো না ব’লে যে তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বিবাহ ভিন্ন অন্য রকমে তোমার আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই যে কত কঠিন হয়ে উঠছে, সে তুমি দেখচোই তো? অতএব ভালমন্দ যাই হোক, এই আমাদের পথ, এর পরিণাম বা হবার হবে— উপায় কি যার?”

সুষমা তখন তাহার বিবাদসমাজের অশ্রুধৌত মুখখানি উন্নত করিল; দুঃখের অশনিপ্রহারে ফাটিয়া পড়া অন্তরের ব্যথা চাপিয়া সেই অশ্রুপ্রবাহের মধ্যেই অত্যন্ত করুণ একটুখানি হাসিয়া সে ভৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, “আরও একটা উপায় আমার আছে, সেটা ভুলে যাবেন না। অপরের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্ত সেটা আমি নির্বচন করতে ভরসা করিনি বটে; কিন্তু যিনি রক্ষক, তিনিই যদি ভক্ষক হ’ন, তা হ’লে অগত্যা এই সেই পথটাকেই আমার বেছে নিতে হবে। আমি মরবো।”

নিরতিশয় ব্যথা ও লজ্জাভূতব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা হ’লে তুমি কি করতে বলো? স্রোতের মুখে তোমার ভাসিয়ে দেব?”

সুষমা তাঁহার গভীর ও শোকাহত মুখের দিকে চাহিয়া মুহু ও শাস্তভাবে জবাব দিল, “সামান্য কিছু টাকা দিন; কানাই সিংয়ের দেশেই আমি যাব।”

নরেশ চলিয়া গেলেন, কিছু পরে আসিয়া দেখিলেন, সুষমা একা নয়, তার সঙ্গে নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কী কথাবার্তা কহিতেছে।

নরেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নিরঞ্জন এক বলক আনন্দের হাসির সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “এ যে আমার আনন্দময়ী—”

সুষমা ত্রস্তে বাধা দিল, “আমায় অমন কথা বলবেন না,—আমি আপনার অতি দীনহীনা মেয়ে!”

নরেশ নিরতিশয় বিশ্বাসের সহিত কহিলেন, “তোমাদের দুজনে চেনা-শোনা হ’লো কি ক’রে?”

শুনিয়া হঠাৎ নরেশ যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক ক্ষীণ আলোক-রেখার সন্ধান পাইলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন, “নিরঞ্জন! যাকে তুমি মা ব’লে উল্লেখ করতে যাচ্ছিলে, একান্ত অসহায় জেনে অনেক মন্দলোকে তার সঙ্গে কুব্যবহার করতেও দ্বিধা করছে না। তারই রক্ষার ভার তুমি যদি নাও, তা হ’লে আমি নিশ্চিত হ’তে পারি। আমি তোমার চিনেছি, তুমি আমার চেয়েও এ কার্যের বেশী উপযুক্ত।

আমার নিজের মধ্যেও একটা লোভের আগুন জ্বলন্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি ওকে 'মা' বলেছ—তুমিই ওকে আমার কাছ থেকেও রক্ষা করতে পারবে। আমি তো ও-চোখ নিয়ে প্রথম থেকে ওকে দেখি নি।”

নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তার এ নতুন চাকরী এক মুহূর্তেই স্বীকার করিয়া লইল। তখন স্থির বিজলীর মত চোখ দুটি নরেশের সত্যচিন্তা-ভারবিমুক্ত ঈষৎ প্রসন্নমুখে স্থাপন করিয়া সুসমা কহিল, “কিন্তু কার তার ওকে নিতে হচ্ছে, সেটা আমার বাবার আগে থেকেই জেনে নেওয়া উচিত যে?”

এই বলিয়া নরেশকে বাক্যবিমুখ দেখিয়া সে নিজেই নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া অকল্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, “আমি এক জন অতি হীনজীবী পতিতার মেয়ে, বাবা! সমাজে আমার জায়গা নেই ব’লে, অত্যন্ত ছোট বেল থেকে রাজাবাহাদুর দয়া ক’রে আমার একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে লালন-পালন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষে যা হয়ে থাকে, সেই ধ’রে বিচার ক’রে, লোকে আমার জন্ত ওঁর দেবচরিত্রেও কালি মাখাতে ছাড়ে নি। স্বাধীন-ভাবে কোন চাকরী নিয়ে থেকে ওঁর দেওয়া আশ্রয় ছাড়লে হয় তো কালে আমার ও ওঁর নাম স্বতন্ত্র হয়ে পড়বে, এই আশা করেছিলুম, হিতে বিপরীত হ’লো! ভয় পেয়ে আজ এখান অবধি—আমার দুপ্রবেশ জেনেও জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছিলাম। আমি হয় তো সকল সুখের রাহ।”—বলিতে বলিতে আকস্মিকোদিত বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া সুসমা চুপ করিয়া দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করাতে তার চোখের জল গোপনেই সাদা পাথরের মেজের কঠিন বক্ষ আর্দ্র করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরঞ্জন সব কথা শুনিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বলিল, “মা! সমাজ-বন্ধনের মধ্যে জাতি, নীতি, কুল, গোত্র এ সমুদয়ের নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু তার বাইরে সম্যাসদী সম্প্রদায়ে শুধু চাই চরিত্র ও ত্যাগ। তোমার ক্ষুদ্র ইতিহাসে ও-দুটি জিনিষই প্রভূতপরিমাণে দেখতে পেলুম। আমরা মারে-ছেলেতে যদি কোন সেবাশ্রমে, যদি কোন পুণ্যক্ষেত্রে সম্যাসিপরিচালিত কৰ্মশালায় সম্যাসগ্রহণ ক’রে কাজ নিই, তা হ’লে তোমার মা কি ছিল, -সে প্রশ্নও যেমন অনাবশ্যক হয়ে যাবে এবং তোমার—

নরেশ গভীর আবেগ ও আনন্দোত্তেজনার

৫ম (খ) ৩১

নিরঞ্জনকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছ নিরঞ্জন! সুসমার মত মেয়েরা যখন সমাজের জন্ত নয়, তখন ওদের জন্ত কোন সামাজিক জীবের আশ্রয়ও সুসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কথাবার্তা কইবো। ওদের মতন মেয়েদের জন্ত একটি সম্যাসিনী-পরিচালিত আশ্রম করতে পারার বোধ হয় খুবই দরকার আছে।”

নিরঞ্জন উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “এক সময় আমার মনের এটা একটা মস্তবড় কল্পনাই ছিল। মিসনরীরা যেমন পথে কুড়নো (ফাউণ্ডলিং) ছেলে-মেয়েদের জন্ত আশ্রম ক’রে রাখে, ঠিক তেমনি হিন্দুসমাজ থেকে কেন করা হবে না? যে সব পতিতা নারী বা পতিতার মেয়ে, সুপথে ফিরতে চায়, তাদের আশ্রয় কোথায়? এই সুসমা-মায়ের মতন নিষ্পাপ হয়েও যারা মায়ের পাপের ফলে সমাজের বাইরে, অথচ সংপথে থেকে দূরতপশ্চার ক্ষয় করতে সমর্থ, তারা কেন সে সুযোগটুকু পাবে না? বৈষ্ণবের আখড়া বা মঠধাত্রীদের আড্ডা বঁধাধর রক্ষামন্দির যে নয়, সে জ্ঞান সকলের নেই। এদের দ্বারাও কত কাজ যে করিয়ে নেবার আছে। যে কাজ মিসনরী মেয়েরা এবং তাদের আশ্রিতা পালিতারা করচে, সে সবই এরা পারে; আর স্ত্রীত্যাগী, তাঁতবোনা, সেবাশ্রম ক’রে দুঃস্থের ধন-সেবা ইত্যাদি আরও কি কিছু কম করবার আছে? তবে কেন এত শক্তি অনর্থক অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে? পথভ্রষ্টের জন্ত কি পথ সহজ ক’রে কেউ দেবে না?”

সুসমা দুজনকার পায়ের গোড়াতেই প্রণাম করিয়া উঠিয়া আনন্দসজলচক্ষু কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের কদাকার মুখের দিকে চাহিল; গাঢ়স্বরে কহিল, “বাবা! আমায় ওই রকম ক’রেই তুমি এইবার সার্থক ক’রে তোল। এখন মনে হচ্ছে, তা হ’লে আমার মতন হতভাগ্য জীবনেরও দরকার তো কোথাও আছে!”

নিরঞ্জনের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া সুসমা চলিয়া গেল। এক দিক্ দিয়া অতুল শান্তিতে এবং আর এক দিক্ হইতে একটা তীব্র ব্যথায় নরেশচন্দ্রের প্রাণটা যেন হাহা করিয়া উঠিল! এত দিন পরে সুসমা যে তার প্রকৃত পথের সন্ধান ও সে পথের বথার্থ আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারই আনন্দ,—আর তার সঙ্গেই এত দিনের পর সুসমার সকল সম্বন্ধ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার ব্যথা একটু তীব্র হইয়াই মনে

বাজিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা দুজনেই যে মন্ত বড় প্রলোভনকে জয় করিয়া অন্নান ও অপ্রতিহত রহিলেন, ইহার গৌরবও তাঁহার সেই ক্রিষ্ট চিত্তকে কম সাধনা দিল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য যদি না বর্জন করে তোরে,

আমিও তোমায় করিব না বর্জন।

—তীর্থরেণু।

সে দিন নরেশ যখন চলিয়া গেলেন, পরিমলের বোধ হইল, স্বামীকে যেন সে স্বদূর কালের মতই হারাইয়া ফেলিয়াছে, হয় তো বা চিরকালের জন্যই তাহাদের এই ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, অতঃপর কোন দিনই তাঁহাকে সে আর নিজের কাছে ফিরিয়া পাইবে না। সে নিজের স্বর্ণহস্ত-খচিত গোলাপী আঁচল মুখে চাপিয়া ব্যথায় আকুল আচ্ছন্ন হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কল্পিত হইয়া বিদীর্ণপ্রায় অন্তরের মধ্য হইতে তাহার অভিমানপুষ্ট অভিযোগ উঠিয়া আসিল। কান্নার অধীর হইয়া সে মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, “হুঃখীর চেয়েও হুঃখী আমি, সে তো তুমি দেখতে পাওনি। তাই ভেবেছ, কতকগুলো সোনা-দানা চাপিয়ে দিলেই গরীবের মেয়ের বুঝি বুক ভরিয়া দেওয়া যায়, না? আমার মতন ক’জন বাপের ভালবাসা পায়? আমার কি শ্রমভরা মস্ত লোক ভাইই ছিল! আমার মা;—আর তিনি? তাঁর কাছেই কি আমি কম পেয়েছিলাম? দাদার বন্ধু, কিন্তু দাদার চাইতেও যেন তাঁর যত্ন আরও বেশীই ছিল। তাঁর মায়ের কথা মনে হ’লে যে এখনও আমি কান্না চাপতে পারিনে। আমায় তুমি গরীব ব’লে, কালো ব’লে, এত তুচ্ছ ভাববে যদি, তা’ হ’লে কেন আমায় রাণী করতে নিয়ে এলে? আমি না হয় সেখানে প’ড়ে থেকে মরেই যেতুম। আমার মতন পোড়াকপালীর মরণই ভাল ছিল যে। আজ যদি আমি আবার তোমায় হারাই, তা’ হ’লে বেঁচে থেকে আমার হবে কি?”

আবার—সে আবার বর্তমান আঘাতের ও নিরুদ্ধবেদনায় ভরা অতীত স্মৃতির স্বরণে অজস্র কান্নায় ফাটিয়া পড়িল। কিন্তু তার পরই তার মনে হইল, হয় তো এক্ষণে তার স্বামী তাঁর ভালবাসার জনকে পাশে লইয়া তাহাকে ফেলিয়া কোথায়—কত

দূরেই চলিয়া যাইতেছেন। নিজের দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং স্বজনত্যাগ অতীত আবার যেন নিজের ভয়াবহ মূর্ত্তিখানা লইয়া মনের মধ্যে উকি মারিয়া গেল। অমনই সেই প্রচণ্ড অভিমান যেন বত্মধারায় ভাসিয়া গেল। সে সহসা বিদ্যাদবেগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে মোটর প্রভৃতি বাড়ীর কোন গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছে না, থিড়কীর স্রামনে শুধু একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। পরিমল ইহা দেখিয়া ঈষৎ আশ্চর্যচিত্তে ফিরিয়া যাইতেছিল, সহসা নজরে পড়িয়া গেল, নীচে সেই ভাড়া গাড়ীর অভিমুখে একটি ক্ষীণাঙ্গী ও সুন্দরী মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহাকে দেখিয়া সে সুষমা বলিয়া মনেও করে নাই, কিন্তু যখন তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া নিরঞ্জনও সেই গাড়ীতে উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তে নরেশ আসিলেন ও নিরঞ্জনের হাতে একটা চিঠির খাম দিয়া বলিলেন, “এই চিঠি দেখালেই তারা সমস্ত ঠিকঠাক ক’রে দেবে। সুষমা! তুমিই সম্পূর্ণ নিরাপদ হ’তে পারবে জেনেই নিরঞ্জনকে আমি তোম’র দিলাম। দেখচি ওর মতন বন্ধু আমার আর জগতে কেউ কোথাও নেই।”—তখন সেই নিবাড়স্বর বেশধারিণী ও বালিকাকৃতি মেয়েটিকে সুষমা জানিষ্ঠা পরিমল অত্যন্তই বিস্মিতা হইল; এবং তার পর তার মনে হইল, রূপই বা তার এমন অসাধারণটা কি?

লোকের রটনা যে কতটাই অবাস্তব হইতে পারে, তাই দেখিয়াও সে অবাক হইল। সে যে এত দিন শুনিয়াছে, রাজা তাঁর অদ্বৈত রাজ-ঐশ্বর্য্য সুষমার চরণেই ঢালিয়া দিয়াছেন। হীরায় তার গা ভর্তি এবং রূপ নাকি তার সেই হীরার চেয়েও উজ্জ্বল! তার জায়গায় এই সাদাসিদে নিরলঙ্কারা সুষমাকে বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকিল। স্বামীর হুঃখিত কণ্ঠ ও অভিমান বাক্যও পরিমলের ঈর্ষাবিক্ত অন্তরে এই সুষ্যাগে লজ্জার স্ফটী বিদ্ধ করিতে ছাড়িল না।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙিয়া কাহার নীতল স্পর্শ এবং চাপা কান্না অনুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে?”

পরিমল ঝাঁপাইয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, অশ্রুপরিপ্লুত কাতর স্বরে বলিল, “আমার উপর তুমি নির্দয় হইয়া না। আমি যে সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি!”

নরেশ জীর মুখ-চুখন করিলেন, তাঁর বুক ভরিয়া

একটা নিশ্বাস উঠিল। বলিলেন, “পরিমল! সুখ-
মার কথা তুমি কি ভুলে যেতে পারবে?”

পরিমল মাথা হেলাইয়া জানাইল, সে পারিবে।
লজ্জায় সঙ্কোচে কথার উত্তর সে দিতে পারিল না।

“সে জন্মের মতই আমার সংস্রব ছাড়িয়ে গেছে,
তোমার কল্পনা থেকেও অন্ততঃ তাকে তুমি মুক্তি
দিও, আমরা যেমন ছিলাম, তেমনই থাকবো।”

নিরঞ্জন সুখমাকে লজ্জায় নরেশচন্দ্রের বাগানে
ঘাইবার জন্তই বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ সে বলিল,
“ওই বাগানের রাস্তার ধারেই আমি আধমরা হয়ে
পড়েছিলাম, রাজাবাহাদুর আমার ওইখান থেকেই
ভুলে নিয়ে আসেন। বাগানের দরওয়ানগুলো ঠিক
যেন ঘমদূত!”

সুখমার এ কথা শুনিয়া কি মনে হইল, সেই জানে,
সে সহসা বলিয়া উঠিল, “দেখুন, বাবা! আমার সেই
ছোট্ট বাড়ীটিতে অনেকগুলি দরকারী জিনিষপত্র
আছে, আজ আমরা সেইখানেই ঘাই চলুন; কাল
তখন সব গোছগাছ ক’রে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে
একেবারেই।”

ভিতরের কথা না জানিয়া নিরঞ্জন সহজেই সম্মত
হইল। যেখানে এক দিন ভিখারী নিরঞ্জন নরেশের
রূপালাভ করিয়াছিল, সেখানের ভৃত্যবর্গ হয় তো মনি-
বের অসাক্ষাতে আজও তাহাকে তেমন করিয়া না
মানিতেও পারে। নরেশের পত্র থাকিলেও মানুষের
প্রকৃতিকে কি-হুকুমে রদ করা যায়? তাই সেখানে
তাহার কিছু উপকৃত হওয়া সম্ভব জানিয়াই নিজের
বাড়ীতেই সে ফিরিতে চাহিল। নিরঞ্জন সঙ্গে
থাকিতে মনে যথেষ্ট সাহস ছিল।

এখানে আসিয়াই কিন্তু অপ্রত্যাশিত ফলাফলে
আনন্দে সে মূর্ছা ঘাইবার উপক্রম করিল।—এ যে
তার সেই ছোট্ট বেলাকার ইষ্টগুরু সেই সাধুজী!
আজিকার বড় হৃদ্বিনে অবাচিতরূপে আসিয়া তাহারই
প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবর্ণনীয় আনন্দের আতি-
শয্যে শিশুর মত চঞ্চল ও উৎফুল্ল হইয়া চোখে জল ও
মুখে হাসি লইয়া সুখমা বারবার বলিতে লাগিল,
“ঠাকুর গো! আপনি নিশ্চয়ই ভগবান্! আমি যে
কায়মনোবাক্যে আপনাকেই ডাকছিলাম, তা আপনি
জানলেন কেমন ক’রে?”

সাধু কহিলেন, “বেটা! আমি যে তোমার
নিজের দরকারেই-খুঁজতে এসেছি যে! রাজাবেটা
যদি হুকুম দেয়, তা হ’লে আমি তোকে আমার
‘অশরণালয়ের’ সেবার্মের ভারটা দেবার জন্তে সঙ্গে
ক’রে অযোধ্যাধামে নিয়ে ঘাই।—সেখানে

হুতিনজন জমীদারের সাহায্যে আর ভিক্ষার ধন
দিয়ে আমি এক মস্ত কাজের ছোট্ট বোজ বপন করেছি।
জানিস বেটা! বদরীনারায়ণে গিয়েও তোর কথা
আমার মনে জাগছিল। পথে এক তোর মতন
পাঞ্জাবী মেয়ে হাতে পেলুম, তার মা বেটা আমার পা
জড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়েকে ফেলে দিয়ে ছুটে
পালালো,—বল্লে, মেয়টি যাতে ধর্মপথ পায়। বিস্তর
ভেবে ভেবে তোদের কথাই আজ পাঁচ ছ বছর ধ’রে
গেয়ে গেয়ে কিছু টাকার জোগাড় করলাম। এর
মধ্যে আরও হুতিনটি ছোট ছোট মেয়ে আমার
কথা শুনে তাদের মায়েরা আমার দিয়ে গেছে। পথের
ধারে সত্ত জন্মানো একটাকে কুড়িয়েছি। দুজন বুড়ো-
মানুষের জিন্মায় তাদের রেখে তোকে এই নিতে
এসেছি। কি হবে বেটা! গান-বাজনা শিখে?
হরিকে ডাকবার জন্ত নিজের স্বভাবদত্ত কণ্ঠ যতটুকু
আছে, তাই যথেষ্ট! কাজ কর; জগতে এসেছিস, জন্ম
সার্থক কর। যে যেমন জন্ম পেয়েছিস বেটা, তারই
আবার বড় ক’রে নেওয়া যায়। সবাই কিছু সংসার
আর এক জনের বউ হবার জন্তে জন্মায়নি। হাঁ,
কুড়ি সাজিয়ে খেলা নাই বা করতে পেলি? ছেলে হ’লে
মা না বল্লেই কি তার মা হওয়া যায় না? যাদের
দুঃখের জন্ম, লজ্জার জন্ম, জন্মেই যারা সব হারায়—
এমন কি, নিজের ধর্ম পর্য্যন্ত—তাদের মা হবে কি
চিরদিনই ওই সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিদেশী
মায়েরাই? তোরা দখল ক’রে নে রে বেটা, দেশের
ওই অনাদৃত অংশটাকে তোরা নিজের জোরে দখল
কর। ক’রে চরিত্রবলে সকলের দৃষ্টি এই দিকে টেনে
আন। এ একটা কম অভাব নেই ত দেশের!”

ঠিক নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং জহা
শুধু কল্পনা মাত্র নয়, বাস্তবের মূর্তিতে তাহার দেখা
পাইয়া সুখমা কি নিখিই হাতে পাইল, তাহা বলিবার
নয়। সে মুখে শুধু পুনঃপুনঃ আনন্দাশ্রুসিক্ত হইতে
হইতে বলিতে লাগিল, “উঃ, যদি আমি আজ না
আসতুম! যদি আমি আজ না আসতুম!”

সেই দুঃসহ ক্ষতির কল্পনামাত্র সুখমার প্রাণ
ধেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের তায় চমকিত হইয়া উঠিতে
লাগিল।

চতুবিংশ পরিচ্ছেদ

রোগ মসীঢালা কালীতরু তার
লয়ে প্রজাগণে, পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

—কথা।

নিরঞ্জন চলিয়া গেলে পরিমল তার জন্ত যে এতখানি শূন্যতা বোধ করিবে, তা বোধ করি তার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না। ইদানীং পড়ার দায় না থাকায় সে বেশ প্রসন্নচিত্তেই যখন তখন খুঁজিয়া পাতিয়া তাহার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করিতে আসিত। সেই অবসরে তার ঘরের বিছানার, আহারের ও পরিচ্ছদের তত্ত্ব-বধান করাও তার একটা কাজের মধ্যেই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অপ্রিয়দর্শন ভগ্ন-দেহমন লোকটির মধ্যে পরিমল যেন তার পূর্ব-স্মৃতির একটুখানি সৌরভ পাইত, তাই তাহার পরে তাহার পূর্ব-বিরাগ দিনে দিনেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সুষমা আসিয়া তাহাকে চিলের মতন ছোঁ। মারিয়া লইয়া যাওয়াতে হয় তো সে তার উপর একটু বেশী করিয়াই চটিত—যদি না এর মধ্যে জড়িত থাকিতেন তাহারই স্বামী। নিঃসঙ্গ পরিমলের অবসরকাল-ক্ষেপের একটুখানি অবসর নিরঞ্জনকে যে তাহার স্বামীর পরিবর্তে টানিয়া লইয়াই তাহার ঘাড়ের সুষমারূপী প্রেতিনীটা বিদায় হইয়াছে, এই কথা মনে করিয়া নিরঞ্জনকে তার এতই শ্রদ্ধা হইল যে, সে বলিবার নয়। হাজারবার করিয়াই তার তখন মনে হইল যে, কথায় যে বলে—যাকে রাখো, সেই রাখে—তা বাপু এ ঠিকই!—ভাগ্যে উনি ওটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তাই না আজ নিজে বেঁচে গেলেন, অন্ততঃ আমি তো বাঁচলুমই! ও না থাকলে আর কার ঘাড়ে যেত, আমার ঘাড়ই সে ভাঙতো নিশ্চয়।

যে সময়টার সে নরেশচন্দ্রের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধানের জন্ত নীচে নামে এবং কোন কোন দিন একবার করিয়া নিরঞ্জনেরও খোঁজটা খবরটা লয়, তেমনি সময় সে দিন নিরঞ্জনের বিজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার নজরে পড়িয়া গেল, একখানা মলাট ছেঁড়া পুরাতন খাতা। এই খাতার প্রথম পৃষ্ঠার ছত্র কয়েক মাত্র সে এক সময়ে পড়িয়াছিল, যখন সবে মাত্র এর আরম্ভ। এতদিনে না জানি মাষ্টারমশাই-এর ডাইরিখানা কতদূর অগ্রসর হইল,

সেই খবরটি জানার অদম্য কৌতূহলে পরিমল সেখানা চুরি করিয়া লইল। নিশ্চয়ই এইবার সে এই ছদ্ম-বেশীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে! তবে এই যে ডায়রি, এ সত্য সত্যই কি ডায়রি—ডায়রি-ছলে লেখা একটা উপভাস নয় তো? নরেশের বিশ্বাস, নিরঞ্জন একটা ছদ্মবেশী বড়লোক। কিন্তু পরিমলের মনে নিরঞ্জন সম্বন্ধে খুবই যে একটা কিছু প্রকাণ্ড ধারণা জন্মিয়া আছে, তা নয়। তার বিশ্বাস, সে একটু লেখাপড়া জানে, বসন্তে স্বাস্থ্যহার হইয়াছে, হয় গাঁজা খায়, না হয় আধ-পাগলা।—সে লোকটা আবার ডায়রি কিসের লিখিবে? তবে গাঁজা-খোর হইলে যে উপভাসিক হইতে নাই, তেমন তো কোন বিধান দেখা যায় না! অল্পবিদ্যা এবং মস্ত অবসর-লাভ বরং এ বিষয়ে কিছু সুযোগই তো ওর কাছে। অনায়াসেই এখানা একখানা উপভাস হইতে পারে। বেশ তো, না হয় তাদের মাসিক পত্রিকার খোরাক হইবে।

পরিমল এই খাতাখানার প্রথমার্ধ শেষ করিয়া যখন বাকি অংশ পড়িতে আরম্ভ করিল, তার চোখে তখন নিরঞ্জনের তেমন স্মৃতির ছাঁদের পরিষ্কার লেখাও যেন কতকগুলো অস্পষ্ট কালির আঁকের মতই,—যেন কতকগুলো পোকার ছানার মতনই কিলিবিলা করিয়া উঠিতেছিল। তার মাথার মধ্যে যেন একটা গুরু বেদনা, সর্বশরীরে যেন হাতুড়ি দিয়া পেরেক চোকার ব্যথা;—চোখের দৃষ্টি কখনও বাপসা, কখনও জালাময়,—আবার কখনও বা প্রবলবেগে প্রবাহিত অশ্রুর বন্যায় সম্পূর্ণ-রূপেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। তাহার অতীত জীবনের নতুন ভাগেরও বেশী তো দুঃখের মধ্য দিয়া অতীত হইয়াছে, কিন্তু এত যন্ত্রণা-ভোগ যেন তাহার সে সব ভয়ানক দিনেও ঘটে নাই। এ কি অসম্ভব সম্ভব হইয়া আজ তাহাকে দেখা দিল? এ কি সত্য? এ কি স্বপ্ন নয়? এ কি কোন বাহুকরের খেলা হইতে পারে না?—এও সম্ভব? এও সম্ভব?—

সে খাতায় কি ছিল? এমন কিছুই না! শুধু একটি দুর্ভাগ্য জীবনের দুঃখময় কাহিনী মাত্র। সংসারের খাতা হইতে ছিঁড়িয়া পড়া কয়েকখানি হারানো পাতা। সে পাতা ক'খানি এই রকম!—

“জীবটা যেন এলোমেলো হুস পড়েছে। এর গ্রন্থি যেখানটার ছিল, সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না,—জট পাকিয়ে গেছে কি না। লোকে আমার কথা জানতে চায়, তাদের কাছে বলবো কি, আমার

নিজের কাছেই সবটা যেন খাপছাড়া গোলমালে ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনেই কি ছাই ছিল কিছু? আমি যে কোন্ দেশের লোক, নামটাই বা কি ছিল, অক্ষরপরিচয় আমার কোন দিন হয়েছিল কি না, এ সবই তো ভুলে বসেছিলাম। মনে পড়লো কবে? তার বছর দেড়েক বাদে হবে বোধ করি? আচ্ছা, ডাক্তার সাহেবের আশ্রয় আমি ছেড়ে আসি কোন্ সময়টার? মনে পড়ে না। ই্যা, ভাবতে ভাবতে এই পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে, তাঁর ওখানে থাকতে থাকতেই আমি একটু একটু বই-টাই পড়তে পারছিলাম। এক দিন সাহেবের ছোট ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইছি, তাই শুনে মেমসাহেব সাহেবকে ডেকে আনেন। তাঁরা আমার ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করে কি একটা যেন বই দিলেন, গড়-গড় করে বুঝি পড়ে গেলুম। ভারী খুসী! ছেলেমেয়েরা তো আমার ঘিরে আনন্দে হাত ধরাধরি করে নাচতেই লেগে গেলো!

তার পর থেকে আমার ভারী খাতির। সাহেব তো তাঁরা নন, সিন্ধুদেশের লোক। চেহারায় আর পোষাকে আমার ওদের ইটালিয়ান বলে বোধ হয়েছিল, দুদিন পরে বুঝলুম আমার ভুল। আমার বুদ্ধির দশা ঐরকমই যে হয়ে পড়েছে। কে বলবে যে, এই আমিই এক দিন নাকি ডবল অনার নিয়ে বি এ, পাশ করেছিলুম সন্টার ওপোর হয়ে!

হায় রে—“ধন জন মান, পদ্মপত্র জলের সমান” এ যে দেখছি তারও চেয়ে বেশী!—বিজ্ঞে বুদ্ধি এ-গুলো তো ভিতরের জিনিষ, সে তো আর লুঠ করে নেওয়া যায় না, যথচ দেখা যাচ্ছে যে, তাও ফুরায়। আর দেহের রূপ! সে যে কেমন করেই একেবারে ছবছ একখানা পোড়া কাঠের মূর্তি নিতে পারে, সে যে দিন প্রথম দেখি, ঐ সিবিল সার্জন মালখানী সাহেবের বাড়ীতেই তাঁর ছোট মেয়ে সীতার হাতের কোটায় বসান আয়না দিয়ে, সে দিনের কথা,—এই তো দেখছি বেশ মনেই আছে! সে কি যজ্ঞগাই মনের মধ্যে বোধ করেছিলেম। তার পরই বোধ করি আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় ও সেই সময় পাগলীর ঝোঁকে কেমন করে বেরিয়ে পড়ে পালিয়ে আসি। সে তো মনে নেই! তার জন্তে এখনও আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তবে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে, সে যদি মানুষের মধ্যের সকল দুর্বলতারই উর্দ্ধে উঠতে পারে, তা হলে তো আর কথাই থাকে না, সে তো তখন পুরুষোত্তম পদ পায়। আমি যদি সেই জিনিষ হতে পারতাম, আমার জীবন

ধন্য হয়ে যেত। পারি নি, তাই এই দুর্দশা। সে দিন যে আমিকে আমি চিনতুম, সে আমিকে আর দেখতে পেলুম না। সে আমার যে মৃত্যু হয়েছিল, সে আমার আত্মীয়েরা যে আমার শ্মশান-ঘাটে বিসর্জন দিয়ে গেছে, সে আমি যে আর বেঁচে নেই। শ্রাদ্ধাধিকারী নেই বলে শ্রাদ্ধ না হয় হয়নি; কিন্তু তার নাম যে মরার হিসাবের সঙ্গে লেখা হয়ে গিয়েছিল। এ জগতের সঙ্গে যে তার কার-কারবার চুকে গ্যাছে, সেই সব কথাই ওই আয়নার মধ্য থেকে এক নিমেষের ভিতরে এই নূতন দেখা আধপোড়া ভীষণ মুখখানা আমার বলে দিলে, আর চোঁচিয়ে উঠে আমি মূর্ছা গেলুম। আর ওকে দেখিনি—কোন দিনই দেখিনি। দেখলে হয় তো এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি। কি জানি কেনই আমি ওকে সহিতে পারিনি,—একেবারেই সহিতে পারিনি। যেন মনে হয়, ঐ আমার সেই পুরানো অতীতকে—হারানো অতীতকে—আমার কাছে থেকে ডাকাতী করে কেড়ে নিয়েছে। এখন এ মুখ নিয়ে যদিই আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই, আমার কি তারা তাদের সেই পূর্ব-পরিচিত রমেশ বলে আদর করে ডেকে নেয়? না পাগল বলে পুলিশ ডাকে? এটা আমার জানতে ইচ্ছে করলেও এ পর্যন্ত পরখ করবার ভরসা আমার হয় নি। লোভ ছ’একবার মনে জেগেছিল, কিন্তু কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগলো। আমি যে মরা মানুষ! আগুনজ্বা চিতা থেকে চুরি করেই না হয় বেঁচে উঠেছি। তা বলে যারা আমার মৃত্যুতে দেখেছে, তাদের সামনে যাব কেমন করে? ভয়ও হয়, লজ্জাও করে। আবার চেহারাখানাও যদি আগের কোন্ চিহ্ন ধরে থাকতো, তা হলেও নয় একটা যাহোক কথা ছিল। যদি কোনও দিন যাই তো সেই ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে করে। কিন্তু তখনই কি পর্যাপ্ত হবে? তা ছাড়া আমি গিয়েই বা করবো কি? আমার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সে কি আর আজও আমার জন্তে পড়ে আছে? তা ভিন্ন সংসারে বন্ধন বলতে তো আমার কোথাও কিছুই বাকি নেই, সে সব যে চুকিয়ে নিয়েছি। নাঃ, দরকার নেই আর জাল প্রতাপটাদের দ্বিতীয় গ্রহসনে।

“আচ্ছা, মানুষগুলোর আসল অবস্থাটা কি? ভেবে ভেবে তার তো কোন কুল কিনারাই আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। গাছ থেকে না পড়ে সে মানুষের পেটের থেকে জন্মায়, তা ভিন্ন আর সবই তো তার গাছের ফলের মতই অনিশ্চিত। কোনটা হয় তো ফুলের মধ্যেই লয় পাবে, কোনটা অঙ্কুরেই শুকিয়ে

যাবে, কেউ তার চেয়ে বড় হয়ে ক'রে পড়বে, আবার কেউ বা টেকে থেকে পেকে উঠবে। তা, তাও যে ক'কে কাকে ঠোকরাবে, আর কে' বা পড়বে দেবতার নৈবেদ্যে বা রাজভোগে, তারই নাকি কোন ঠিকানা আছে? মানুষগুলোও যেন তেমনি এক একটা গাছের ফল, কুলহারার তরঙ্গ, পথ-হারানো পথিক। হ্যাঁ, মানুষ ঠিক যেন পথ হারানো পথিকই বটে! কোথায় ওদের বাড়ী-ঘর, কোথায় ওদের যাত্রা-পথের শেষ—তার তো কোন নিকেশই আমি দেখি না! কেবল ঘুরে ঘুরেই পরিশ্রান্ত। একটা গান অনেক দিন আগে শুনেছিলেম, কি কিসে যেন পড়েছিলেম—

‘মন! চল নিজ নিকেতন,

সংসার-প্রবাসে, প্রবাসীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণ?’ কিন্তু ‘নিজের নিকেতন’ কোথায় তার? জন্ম থেকে জন্মান্তর সে তো সেই অনাদি কাল হ’তেই এমন ক’রে ‘প্রবাসীর বেশে’ ‘ভ্রমণ’ করছে। একি অকারণ? এর উদ্দেশ্য নাকি শেষকালে সেই ‘নিজ নিকেতনে’ পৌঁছান। কিন্তু ক’জন লোকে আজকে পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারলো, আমার যে বড় জানতে ইচ্ছে করে? আমার তো মনে হচ্ছে, আমি বুঝি কোন দিনই তা পারবো না। নিজের এ জন্মের বাড়ী-খানাকেই মনে হচ্ছে যেন কত দূরেরই পথে। যেতে গেলে যেন সে পথ আর কখন ফুরবেই না;—তা’ নিজের সেই অসীম অনন্ত পথের শেষ ধারে যে সত্যিকারের বাড়ী আছে, সেখানে আমার পৌঁছে দেবার সাধি কি আর আমার আছে? তা’ হ’লে শুধু এ জন্মেই নয়, চিরজন্মেই এমন ক’রে পথে পথে ‘প্রবাসে প্রবাসে’ ঘুরেই মরতে হবে দেখছি! ওগো! ও, পারের বন্ধু! এই অফুরন্ত পথ কি আমার কোন দিনেই শেষ হবে না গো?

“আচ্ছা, সংসারে কি কেউ সুখী হয়? দু’চার দিনের কথা বলছি, অন্ততঃ তার আধখানা জন্ম ধ’রে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কেউ করতে কি পেরেছে? আমি তো মোটেই এটা বুঝে উঠতে পারি নে।—ধর, ছোটবেলায় সুখ তো বড় মন্দ থাকে না, কিন্তু লোভ তাতেও বাধা দেয়। যা চাই, তা পাইনে,—পাওয়ার ইচ্ছার শেষ রাখেন নি যে ভগবান! কাজেই সুখের পদ্মও যে কাঁটার উপর ফুটে থাকে। তার পর বিচারন্ত হইলেই স্ত্রের ঘরে শ্রুতি বসলো। ক, খ শেষ হতে না হ’তেই শটকে নামতা, সঙ্গে সঙ্গে এ, বি, সি, ডি’র ঠাণ্ডা। তার পর অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল দেখা দিলেই তো মাথার ঠিক রাখাই গোল হয়ে পড়ে। তার পর এই মহাসমরে জরী হয়ে উঠতে পারলে,—

ভগবান করুন আমার মতন কারু আজন্মের ভ্রম এমন ক’রে যেন ব্যর্থ না হয়। কিন্তু খুবই সুখী হতেও আমি বেশী লোককে দেখিছি, তাও তো আমার মনে পড়ে না। শুধু কোটির মধ্যে দু’একজন। যারা পরের জন্ত নিজেকে ছেড়ে দেন, তাঁরাই বোধ করি যথার্থ সুখী হ’তে পারেন—অন্ততঃ হওয়া তো উচিত।—তার মধ্যেও রাজা নরেশ কিন্তু সুখী নন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। গুঁর সব হাসি-খুসীই মূখের, মনের মধ্যে অশ্রুর নিঝর কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে। কেন? সে অবশ্য আমার জানা নেই। কিন্তু যা আমার মনে হলো, সেইটুকুই আমি আমার হেঁড়া খাতায় লিখে রাখলুম।

“আচ্ছা রাণী-মা—আমার যিনি ছাত্রী, তাঁকে আমার কি মনে হয়? তিনি সুখী না অসুখী? না; ও সব মেয়েরা সুখী বেশী না হ’লেও প্রায় অসুখী হ’তে পারে না।—মন ওদের ত্রুদ নয়, নিষ্ঠুর নয়, খুব স্বার্থ-পরও নয়। কিন্তু তবু একটা তফাৎ আছে। সেটা কি, সে যিনি তৈরি করেছেন, তিনিই জানেন,—তার বিশ্লেষণ করতে গেলে হয় তো হেরে যাবো, তবু একটা কিছু যে প্রভেদ আছে, তা’ স্বীকার করতেই হবে।—তিনি ঠিক রাজা নরেশ নন। এ জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ ডোবেও না, ওঠেও না, ভাঙ্গেও না এবং নূতন ক’রে কিছু গড়েও না। স্থিতিস্থাপকভাবে এরা একরকম কাটিয়ে যায় ভাল। বড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার এদের শক্তি ডানা আছে।—কিন্তু একে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে কেন? সর্বান্তঃকরণেই আমি আশীর্বাদ করি, ভগবান গুঁকে রাজরাণী ক’রেই যেন নিশ্চিন্ত থাকেন না, গুঁর সুখ যেন স্থায়ী হয়।

“সুখদার কথা মনে হ’তে আবার অনেক কথাই যেন মনে প’ড়ে গেল। সে সব পুরানো গাওয়া গানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে আছে, তারা যেন সুরবাহারের সুরের ঝঙ্কার উঠতেই আপনি এসে ধরা দিলে! সুখদার কথা আরও যে আমার বলবার আছে। তাকে কোথা থেকে, আর কেমন ক’রে পেলাম, সে কথা তো এখনও বলা হয় নি, আবার হারাতেও যে বেশী সমর লাগেনি, সেটুকুও তো বাকী রাখা চলবে না। সবটুকুই আমার মনের ভিতর একবার ভাল ক’রে গুছিয়ে নিই। তার পর? তার পর এ খাতা-খানা আর এক দিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই ভোরের আলো লাগা ঘুমন্ত গঙ্গায় তাসিয়ে দিই আসবো তখন। চাই কি, সেই অবসরে আর একবার আমার সেই “আনন্দময়ী মেয়েটি”র সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতেও পারে।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভু! এলেম কোথায়!
বরষ গত হ'ল, জীবন বহে গেল,
কখন কি যে হ'ল জানিনে হায়!
আসিনু কোথা হ'তে, যেতেছি কোন্ পথে,
ভেসেছি কালশ্রোতে তুণের প্রায়।
মৃত্যুসিনুপানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন,
জীবন অবহেলে, আঁধারে দিন ফেলে,
কত কি গেল চ'লে, কত কি যায়।

—অজ্ঞাত।

“কালীপদর বাড়ী যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যার বড় দেরো নেই। ও যে অত গরীব ছিল, তা আমি কোন দিন জানতে পারি নি। সামনের দরজার একটা পালা ভেঙ্গে বোধ করি কোথায় চ'লে গেছে, আর একখানা বাতাসে ঢক ঢক শব্দ করছে। বাড়ীখানা এক সময়ে যে গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বড় লোকেরই বাড়ী ছিল, সে আজও তার বিরাট বপু দেখেই বেশ বোঝা যায়। হ'লে হবে কি, আজ যে তার এ গাঁয়ে সবার চাইতেই দশা মন্দ, সেও তো আমি একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলেম।

“উঠানে তুলসীমঞ্চ প্রদীপ দিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে তার ময়লা কাপড়ের আঁচলটুকু গলায় জড়িয়ে প্রণাম করছিল, আমায় দেখতে পেয়েই সেই আঁচল সে গারে টেনে দিলে, মুখের চেহারা থেকেই জানতে পারলুম যে, সে আমার কালীপদর বোন সুখদা।

“সুখদার মা যত পারলেন কাঁদলেন, জন্মের মতন দীপান্তরিত ছেলের কথা উল্লেখ ক'রে তার আচরণের নিন্দা করলেন এবং যারা তাকে লম্বুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে তার চেয়েও অধিকতর পাপে পাপী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যেও তিনি খুবই আশীর্বাদ করতে পেরে উঠলেন না। তার পর অনেক বিলম্বে আর সব কথা চুকিয়ে দিয়ে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কথা তুলেন।

‘সংসার তো, আর চলে না বাবা, বা কিছু ছিল পদ'র মোকদ্দমার ধ'রে দিলাম, আইবড় মেয়ে ঘাড়ে, কি করি এখন?’

“আমি আগে হ'তেই ভাবছিলাম যে, কেমন ক'রে ও কথাটা আমি বলবো? অবশ্য পদ'র বোনকে চোখে দেখে বলবার ভাবনাটা আমার একটুখানি পরেই কমে গেছিলো। কারণ, কুৎসিত না হ'লেও সুখদাকে দেখতে ওতই সাধারণ যে, সে দেখেই যে আমি ঘুরে

পড়ি নি, তাই ভাবত: তার মা বিশ্বাস করতে পারবেন। এখন আরও একটু স্বেচ্ছা পেয়ে নিঃসঙ্কোচেই ব'লে ফেলুম, “তার জন্তে ভাববেন না, কালীপদ যাবার আগে তার তার আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমিও তার কাছ থেকে নিয়েছি।”

“পদ'র মা কেমন একটু সন্দেহের সঙ্গেই আমার মাথা হ'তে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথা কইলেন। একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, ‘তুমি আমার মেরেকে বিয়ে করবে? এতগুলো পাশ করেছ, অতি সুন্দর তুমি, পদ'র মুখে শুনেছিলাম, তোমার বাপ ছিলেন জেলার হাকিম। তুমি কি আমার মতন দুঃখীর মেরেকে—’

“আমি হাসি চেপে রেখে জবাব দিলুম—‘পদ আমায় তার ভার দিয়েছে, বিয়ে যার সঙ্গে হয় হবে, সে তো একুণ্ঠিই হ'চ্ছে না। তবে ভাল পাত্র আর কোথাও না পান তো আমাকেই তখন দেবেন, আমারও তাতে কোন আপত্তি নেই।’

“তার পর সুখদা মায়েই হুকুমমতন আমার জন্তে জলখাবার নিয়ে এসে রেখে দিয়েই চ'লে গেলে, আমি বলুন, ‘সুখদাকে দেখতে অনেকটাই কালীপদর মতন, তাই আমার আরও আপত্তি নেই।’

“সুখদার মা এবার যে কাগাটা কাঁদলেন, তার মধ্যে আধখানা দুঃখের এবং আধখানা স্বেচ্ছার। সেই ছেলেই তো তাঁকে মহাদেবের মতন জামাই দিয়ে গিয়েছে!—এই কথাটা এ ক্রন্দনের মধ্যে প্রধান হয়ে বৈলো।

“মাস পঁচেক পরে পড়াশোনা সাক্ষর করে ঘরে এসে বসলুম।

“ওইখানকারই সবজজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বছর পার হয় চ'লে আসছিল। মেয়ে আমি দেখেছি, চাকরমতীকে দেখতে বোধ করি ভালই হবে, বা একটু বেশী মোটা। তা ধনীর ছালালীরা ওরকম হবেন বই কি! গণে পণে, অলঙ্কার বস্ত্রে, এবং আসবাবপত্রে জজবাবু হাজার সাতেক টাকা মেয়ের প্রতি খরচ করবেন, এ কথাও নাকি ধার্য্য হয়ে গিয়েছিল। আমি বাড়ী এসে বসতেই তিনি লোক দিয়ে পাকা দেখার দিন ঠিক ক'রে ব'লে পাঠালেন।

“মা খুব খুসী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হরিবে বিষাদ হলো। মাকে সুখদার কথা ভেঙ্গে ব'লে জানালুম যে, এ বিয়ে করা চলে না। তাদের আমি কথা দিয়েছি। মা'র মনে যে আঘাত লাগলো, সে আমি বুঝেছিলাম। মা আমার এক সন্তানের জননী,

কুটুম্বিতার সাধ একটা নারীজন্মের লক্ষ্যিকি জেপিত।
যাই হোক, তবু আমার কথা বজায় রাখবার জন্যে
তার ধনী কুটুম্বের সাধ তিনি ছেড়েই দিলেন।

“জজবাবু নিজে এসে আমার ডেকে বসেন, ‘জানো
তুমি,তোমার মা’র নামে ‘ব্রিচ অফ্ কন্ট্রাক্টের কেস’
করতে পারি।’

“তা’ অবশ্য আমি জানতাম না। আর যতই
কিছু পড়ি না কেন,আইন তো আর পড়ি নি, জানবো
কেমন ক’রে? একটু ভেঁকা হয়ে রইলুম। তিনি
তখন আমায় কাবু দেখে অনেক কথাই বলেন এবং
তক্ষুনি গালি ফিরিয়ে নিয়ে আমায় ‘আশীর্বাদ’ ক’রে
যেতেও যে রাজী আছেন, তাও জানিয়ে দিতে দেবী
করলেন না। ততক্ষণে আমার জড়তা কাটলো।
আমি বলেন, ‘আমি আর এক জনকে কথা দিয়েছি;
তার গরীব অনন্তোপায়, তাদের বঞ্চনা করলে ঈশ্বরের
দরবারে আমি দোষী বেশী হবো। আপনার ভাবনা
কিসের?’

“কথাটা খোসামোদেরই হাঁচে ঢালা। তাতেই
খাতিব রাগ বাড়িলেও মাত্রাটা কিছু যে কম থাকলো,
সে বোধ করি উহারই জন্যে। তিনি কষ্ট পরিহাসে
ক্লান্ত প্রশ্ন করলেন, ‘তিনি কীর মেয়ে শুনি?’

“আমি বিনীতবচনে জবাব দিলাম, ‘তার বাপ
ছিলেন কালেক্টরীর সেরেস্তাদার, একমাত্র তাইএর
রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে,
বুড় মা ছাড়া অপর কেউ নেই।’

“জজবাবু যেন আঁৎকে উঠেই উঠে দাঁড়ালেন।
রাজদ্রোহের নামেই বোধ করি তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত
হয়ে থাকবে! এবার স্পষ্ট পরিহাসেই বলেন, ‘তা হ’লে
কুটুম্ব নির্বাচনটা করেছ ভাল! যা হোক সময় থাকতে
খবরটা পেয়ে ভালই হলো, এনাকিষ্টের দলে মেয়ে দিয়ে
কি শেষে ধনে প্রাণে মারা যেতাম।’

“মা’র অনুরূপা নিয়ে কালীপদর মা বোনকে মা’র
আশ্রয়ে এনে দিলাম। ভাবী পুত্রবধুর মুখ দেখে
মা যে আমার খুব উল্লসিত হয়ে উঠেন নি, সে তো
আমি বুঝতেই পেরেছিলুম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের
মাতাপুত্রে কোন আলোচনাই আমরা হ’তে দিই নি।
মন তার কল্পনার স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চাইবে
বই কি! নিজের ছেলের মন্ত নামওলা শব্দ, আর
সুন্দরী বউ কোন্ মা কবে চায় নি? অথচ কর্তব্যের
ধাতিরে কত কি-ই না করতে হয়। ক’জনের মাই
বা ভরাবুকে বউ ঘরে তুলতে পেরেছেন। স’য়ে যাওয়া
দরকার,—চুপ ক’রে সবই সয়ে যাওয়া,—যা পাই
তাকেই যথাসাধ্য ভাল মনে করা—এইটুকুই যে মন্ত

বড় দরকার। ঐটুকু না পারলেই যে মানুষ একে-
বারে গেল।

“সুখদারা রয়ে গেল,—আমি চাকরীর জন্যে খোঁজ-
খবর ক’রে বেড়াচ্ছি, আরও দুটো একটা পাশ-টাস
দেবারও ইচ্ছে আছে। বিয়ের জন্যে সুখদার মা
ছাড়া আর কারু যে বিশেষ কোন ভরা আছে,
তার তো কোন লক্ষণই দেখি নে। আমার—হ্যাঁ,
তা, আমার যে একেবারেই ছিল না। তাও বলতে
পারিনে, আবার ছিলই যে, তাও বলবার ভরসা
আমার নেই। বিয়ে জিনিষটা সম্বন্ধে খুব বেশী
তলিয়ে আমি কোন দিনই ভাবি নি। গোটা কয়েক
পাশ করার সঙ্গে ও’ও যেন একটা দায় চোকান।
কিন্তু সুখদাকে আমার ভালই লাগছিল। ভাল-
বাসা একে বলতে হয় বলা, আর তো কখনও
ভালবাসি নি, কাজেই ও নিয়ে তর্ক আমি করতে
পারবো না,—তবে ভালবাসার বর্ণনা যেখানে যত
পড়েছি, তাদের সঙ্গে এ ভালবাসার সম্পর্কটা বড়
বেশীই অল্প। সুখদা থাকে মা’র অন্তঃপুরে, আমি
থাকি হয় সদর বাড়ীতে, না হয় ত কলকাতায়।
বাড়ীর মধ্যে গেলে কখন কখন সুখদাকে এক আধ-
বার দেখতে পাই। একটু গভীর গভীর চালে সে
হয় তো মায়ের দুজনের পূজার যোগাড় করছে,
না হয় তো পান সাজবার সরঞ্জাম নিয়ে ব’সে গেছে,
মধ্যে মধ্যে পড়াতে ব’সে মা তাকে ‘বোকামেরে’ ব’লে
অভ্যুযোগ করচেন, তা’ শুনতে পেয়ে হাসি চেপে
আমি বাইরে পালিয়ে এসে হেসে ফেলেছি। আহা,
মা আমার ওপোর যা খুসী হচেন, ‘গাধা পিটে
ঘোড়া বানানো’ মুখের কথাটি তো নয়! সুখদার মেধা
জিনিষটা বড়ই নাকি কম! অন্ততঃ মা’র তো সেই
রকমই বিশ্বাস।

“বেশী দিন গেল না। বাবার চাকরী, তাঁর
অসময়ে মৃত্যুর সুপারিশে আমি নাকি পেতে পারতুম,
কিন্তু ইচ্ছা হ’লো না সেটাকে কাজে লাগাতে।
তা’ ভিন্ন সেই সবজজবাবু নাকি আমার সম্বন্ধে
সরকারের কান ভারী ক’রে রেখেছেন, এমনি একটা
গুজবও শোনা গেল। আমি নিজের টাকা দিয়ে
একটা আয়ুর্বেদিক ঔষধের দোকান খুলে বসলাম।
দেশে এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন,—মকরধ্বজে
সুরকির গুঁড়ো মেশাতে না জানায়, তাঁর কিছুমাত্র
পশার ছিল না। তাঁকে দিয়ে খাঁটি মকরধ্বজ তৈরিটা
শিখে নেবার চেষ্টা করতে লেগে পড়া গেল। তাঁকে
আমার সহায় ক’রে কস্তুরী ভৈরব বা মহা-মৃত্যুঞ্জয়
রসে কস্তুরীর বদলে আদা-বাটা বন্ধ ক’রে, দেশের

লোক যাতে খাঁটি জিনিষটা পায়; আর বিলিতি ওষুধের মতন নিঃসন্ধোচে মারাত্মক রোগীকে খাওয়াতে পারে, তারই জন্তে উঠে প'ড়ে লাগবো মনে ক'রে-ছিলেম। তা কপালে তো দেশের সেবা করবার পুণ্য সঞ্চিত করা ছিল না, হবে কি ক'রে?

“আমার কবিরাজখানার সত্যাকার মুক্তাভস্ম, স্বর্ণভস্ম—করাতের গুঁড়ো নয়,—নিখুঁত নেপালী কস্তুরী এবং যত রকম গাছ-গাছড়া পাওয়া সম্ভব ছিল, ক্রমে ক্রমে যোগাড় ক'রে তুলছি, এমন সময় এমন মারাত্মক হ'য়ে, আমাদের দেশে বসন্ত মড়ক দেখে দিলে যে, তাঁর কাছে আসল নকল সব রকমের কস্তুরী ভৈরব বা মৃত্যুঞ্জয় রস ভয় পেয়ে পালিয়ে রইলো। হরিনাম সহজে তো কেউ নেয় না। তা এক দিনের মধ্যে অমনি পচিশবারই হয় তো ঐ নাম গানটা কানে শোনা তো যেতই, মুখেও বলতে হ'য়েছে বই কি, পাড়া পড়সীর খাতিরে। মা আমার জন্তে ভয় করলেও নিজে নির্ভয়ে পড়সীর সেবার ছুটে যেতেন। আমার এঁটে উঠতে না পেরে কপাল চাপড়ে খুন হ'তেন, কিন্তু তবু জোর ক'রে বারণ করতেন না, কেঁদে বলতেন ও নিজের কাজ ক'রে রাখচে, বারণ আমি ক'রবো কি ক'রে? বিপদ তারণ তো আছেন, তাঁকেই প্রাণপণে ডাক্‌চি।”

“প্রথমে এ বাড়ীতে বসন্তের ছোঁয়াচ লাগলো, সুখদার মাকে। তাঁর সেবা আমরা তিন জনেই করছিলাম, কিন্তু দুজনেই আমরা এক দিনের আড়াআড়িতে দুজনকারই মাকে হারিয়ে ফেল্‌লুম। সুখদা মেয়ে মানুষ, সে লুটাপুটি ক'রে তার হারানো জিনিষের জন্ত চেষ্টা করে কেঁদে শোক প্রকাশ করলে, কিন্তু বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি ব'লে আমার অত বড় ক্ষতি আমার শুধু নিঃশব্দ চোখের জল দিয়েই সাক্ষ্য ক'রে নিতে হলো। তার উপর যে মুহূর্তেই জগতে আমার আর কিছুই জন্মের ও প্রিয় ছিল না, সেই সব চেয়ে আদরের মুখেই আমার নিজের হাতে,—ভাবতে গেলে সমস্ত মন বেন ভরে ও বিষয়ে শিউরে ওঠে। পেরেছিলুমও তো!

“সুখদার জন্মেই ভাবছিলাম যে বাড়ী ছেড়ে দুজনে কোথাও পালাব নাকি? এমন সময় আমার পালাবার শক্তি হরণ ক'রে আমার সর্বশরীর ব্যোপে বসন্তের গুটি দেখা দিল। সে কি যন্ত্রণা! উঃ সে কি যন্ত্রণা! বোধ করি শরশয্যা পেতে শুলেও তেমন করে সর্বশরীরে তার কলাগুলো বেঁধে না। হাজার হাজার ছুঁচ দিয়ে যদি সর্বশরীরের মাংসের মধ্যে ফোঁড় তোলা যায়, তাতেও কি অত বেশী যন্ত্রণা দিতে

পারে? উপকথার রাজার যেমন চোখে শুক ছুঁচ বেঁধা ছিল, আমার চোখেও বেন তাই হলো। বিশেষ ক'রে ডান চোখটার। রোগের খেলালে যন্ত্রণার আত্মনাদে কেবলই মরা মাকে আকুল হয়ে হয়ে ডেকেছি আর সঙ্গে সঙ্গেই কার অশ্রুজলে ভেজা কাতর স্বর কানে গেছে, ‘মা, মা, মা শেতলা! ভাল ক'রে দাও মা!—মা, মা, মা, ভাল ক'রে দাও মা!’

“যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, সুখদাকেই অনুভব করছিলাম, দেখবার তো চোখ ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাকে মিনতি ক'রে ব'লেও ছিলাম, ‘পালিয়ে যাও সুখদা! কেন অনর্থক প্রাণ দেবে, আমি তো গিয়েইছি।’ সে কেঁদে উঠে বলেছিল, ‘এক সঙ্গেই যাই চলো, একলা আমি দাঁড়াবো কোথায়?’

“এই প্রথম আর শেষ কথা আমাকে সে বলেছিল। এর পরের কোন কথাই আমার আর মনে নেই। আমার যখন জ্ঞান হলো, তখন আমার সকল শ্রুতি লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই মনে নেই, কতদিনে কত অল্পে অল্পে আমি আমার সেই মরণ-শয্যা থেকে বেঁচে উঠেছিলাম?

“হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারদের কাছে পরে শুনেছি, ডাক্তার যে দিন বজরা ক'রে আসতে আসতে জলন্ত চিতা থেকে আমার মাটিতে আছড়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে আমার জায়ন্ত দক্ষ হওয়া থেকে রক্ষা করেন, তার পর থেকে প্রায় ছয় মাস পরে আমার গায়ের বা শুকিয়ে আমার বাঁচবার আশা দেখা দেয়। এতকাল ধ'রে হাঁসপাতালের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে প'ড়ে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। প্রাণ জিনিষটা তো কঠিন বড় কম নয়! আচ্ছা, এই যে আমি মরে গিয়েও বেঁচে উঠলাম, এর পর থেকে কি আমার পুনর্জন্ম হলো না? আমি কি আর সেই আগের আমিই আছি? মরে যে গিয়েছিলাম, তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। পোড়াতে যারা এনেছিল, তারা আমার নিকট-বন্ধ কেউ যে নয়, তা চিতায় তুলে দিয়ে প্রস্থান করার প্রমাণও হচ্ছে। কিন্তু কি ভয়ানক আয়ুর জোর আমার! আর অমন নির্জন ‘শ্মশান’-ঘাটেও কি না অত বড় ‘বান্ধব’ জুটে গেল! সেই গলা পচা বসন্তের রোগী তুলে এনে, একবেলার পথ বয়ে এনে, এই যে ছ মাস ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচালেন, এ কি বড় সহজ কথা! আমার প্রাণটাকে যদি একটুও মায়া করবার দরকার থাকতো, তা'হলে তাঁকে আমার রোজ সকালে উঠে ফুল-চন্দনে পূজা করাই উচিত ছিল, কিন্তু তা না থাকলেও তাঁর দ্বার যে শেষ হয় না, তা আমার স্বীকার তো করতেই হবে।

তঁার পায়ের তলার পড়েই এই নূতন জন্মটাকে আমার ক্ষয় ক'রে যাওয়াই উচিত ছিল বই কি! কিন্তু তখন কি আর মাথার কোন ঠিক আছে? কে আমি, কি করছি, কোথায় যাব—সবই যে ভুল হয়ে গেছলো। ছ মাসের পর প্রাণের আশা! তারও পর পাঁচ ছয় মাস প্রায় পাগলামীর বিকারে কেটে যায়। ভাল ক'রে উঠতে বসতেও পেরেছি নাকি ন'মাস দশমাস পরে। সবশুদ্ধ বৎসর দেড়েক আপনা ভোলা হয়েছিলুম, অর্থাৎ জীবদর্শন ছাড়া মানুষের ধর্ম বড় কিছুই আমার মধ্যে ছিল না। তবে নিরুপদ্রব ব'লে পাগলা গারদে না পাঠিয়ে আমার ভগবান আমায় নিজের হাঁসপাতালেরই এক প্রান্তে ঠাই দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কপালে যে বিস্তর বিড়ম্বনা লেখা আছে, হবে কি—মনুষ্যত্ব ফিরে আসতে না আসতে এই মুখের ছবি আমায় পাগল ক'রে এবার পথেই ঠেলে বার ক'রে দিলে।

তার পরের কথা আরও যেন খেইহারা খাপ-ছাড়া। আসল কথা এই যে, তখন তো আর আমার কথা বলবার জন্ত ডাক্তার সাহেবের কম্পাউণ্ডার বা চাকর-বাকর কেউ সাক্ষী হয়ে বসেছিল না। কোথায় কোথায় গেলুম, কবে যেন একবার ভাল হয়ে কোন্-খানে চাকরী করি! শীতকালটা থাকি ভাল, আবার নাকি পাগলামী ঘাড়ে চাপে, তারা তাইতে তাড়িয়ে দেয়। এমনি কি কি ঘটেছিল, ঠিক ঠিক মনে না থাকলেও একটু একটু স্মরণে আসে। শেষে যেখানে চাকরী করি, তারাই আমায় পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেয় বুঝি? তা' সেখান থেকে বেরিয়ে অবধি আর পাগল হই নি, তবে নূতন ক'রে জরে পড়ে এমন দশা হলো যে, আর খেটে খাবার শক্তি-টুকুও ছিল না। দু'চার দিন ভিক্ষে ক'রে কিছু কিছু পেটে দিই, দু'চার দিন না খেয়েই কাটে, তার পর থেকে সকল কথাই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এই যে রাজা আমায় আমার আগের জন্মের মতনই মান দিচ্ছেন, এর কি আমি একটুখানিও যোগ্য?

“আচ্ছা, তা' হলে মানুষের সব চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যটা কিসে? সব হারানো, না জ্ঞান হারানো? বোধ করি জ্ঞান হারানোর মতন পাপের ভোগ আর কিছুতেই নয়। সবই তো আমার এই জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞানই যদি না রইলো, তা'হলে আমার “সব”কে যে আমি হারিয়েছি, তাই বা আমি জানতে পারলুম কই? দুঃখ জিনিষটা যে সর্বথাই পরিত্যাজ্য তাও তো নয়। দুঃখকেও ভোগ করতে একটা সুখ আছে। আমার

যে মা, আমার ইহজন্মের আরাধ্যা দেবী ছিলেন, 'তঁার বিয়োগদুঃখকে যদি আমার মন নিশ্চিন্ত ক'রে মুছে ফেলে দেয়, তা'হলে আমার পুত্র জন্ম সার্থক হবে কোথা দিয়ে? না না থাক,—হে ভগবন্! আমার এই অসীম দুঃখের পর্বত তুমি ভেঙ্গে দিও না। যদি কেউ দুঃখের মধ্যে বিস্মৃতির কামনা করে, জেনো, সে ভুক্তভোগী নয় ব'লেই তা করতে পেরেচে। আমার দুঃখ! আমার ব্যথা! আমার মনে তুমি পদ্মের মৃণাল হয়ে ওঠো, গোলাপের কাঁটা হয়ে থাকো,—তোমায় যেন আর ভুলি না। কিন্তু এই দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে আমি শিখলুম কোথা থেকে, বলো দেখি? সেও একটি দুঃখী মেয়েরই কাছে। সে আমার মেয়ে হয়েছে। কিন্তু তাকে আমি মোটে চিনি। নাই বা চিনলুম, এ ভবের হাটে কেই বা কা'কে চিনচে? যার সঙ্গে যখন মেল যায়, গঙ্গার ধারে গাছতলার ভোরের পাখীর মতন সে একটি আনন্দের গান গাইছিল। দুঃখ থেকেও যে আনন্দের রস ছড়িয়ে পড়ে, আর তা আজলা ভরে পান করা যায়, তা সেই দিনেই বুঝে নিয়েছি। নাঃ! আর যা' হই, পাগল আর হবো না। এইটেই দেখছি বিধাতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

“একটা জায়গায় বড়ই আমার খটকা লাগে। সুখদার মুখ যেন এ বাড়ীর রাণীর মুখে কে এনে বসিয়ে দিয়েছে। তঁার গলার শব্দও তারই চুরী করা!—এ' কেমন ক'রে হলো? আচ্ছা সুখদা মরে গিয়েছে ব'লে যে আমার ধারণা হয়েছিল, সেটাই কি ঠিক? কিসে জানলুম? কেউ কি আমার বলে-ছিল? কিন্তু বলবেই বা আমার কে? আমার পুরণো জগৎ থেকে কেউ তো আমার এই নূতন জগতে দেখা দিতে আসে নি। তা'হলে সে কি শুধু আমার মনেরই কল্পনা? তা'হলে কি আমার সব চেয়ে বড় কর্তব্যে আমি এমন ক'রেই অবহেলা করলুম? সুখদার তা'হলে কি হলো? সে তো কম দিনও নয়। চার বৎসর। এই চার বৎসর ধ'রে নিঃসহায় সুখদাকে কে দেখলে? খবর নেবো,—কিন্তু কেমন ক'রে? আমি যে মরে গেছি। মরা মানুষের চিঠি পেলে জাল ব'লেই লোকে উড়িয়ে দেবে! নিজে যাব? বিশ্বাস করবে কেউ? আবার হয় তো পাগলা গারদে ভর্তি হবো। বাড়ী ঘর টাকা কড়ি ছিল তো সবই,—তা কি তার থাকতে পেয়েছে, না আমার জাতিরাই দখল করলে? যদি জানতে পারতুম আমার সুখদা এই রাণী পরিমলের মতনই

কোন দয়ালু স্বামীর হাতে পড়ে সুখে আছে, আমি বাঁচতুম যে তা'হলে, আমি যে তার ভার নিইছিলুম।

“—কাল সংবাদপত্রে দেখলুম, যুদ্ধজয়ের জন্ত রাজনৈতিক অনেক অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে! আহা, আমার কালীপদ যদি আবার ফিরে আসে! কিন্তু তাকেই বা সুখদার কথা আমি কি বলবো?”

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ!
হৃদয় দিব তারি সনে!
—কথা।

নরেশ নিজের পাঠাগারে বসিয়া একখানা বই খুলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভাবিতেছিলেন তিনি সুসমারই কথা। সাধুজী ও নিরঞ্জনর সঙ্গে সুসমা অযোধ্যা যাইতেছে। সেখানে সাধুজী যে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন, তাহাই সুসমার পক্ষে সর্বাঙ্গাঙ্গ নিরাপদ স্থল। নরেশ অনেকখানি হাঁপ ছাড়িলেন। ঐ দুজন লোককে তিনি এ কার্যের যথার্থ উপযুক্ত শুদ্ধচিত্ত বলিয়াই জানেন। মনে মনে তাঁদের কার্য সফলতার কামনা করিলেন, মনে মনে সুসমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “এ জন্মটা তোমার এই রকম ক’রেই কাটিয়ে নাও, এবার যেন নিরাপদ হও, শান্তি পাও।”

উহাদের আরক কক্ষের জন্ত সাধুজী তাঁহার নিকট চাঁদা চাহিয়াছেন। তিনি একখানা চেকবই টানিয়া লইয়া দশ হাজার টাকা সই করিলেন, টাকাটা সমিতির ধনভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে।

পরিমল ঘরে ঢুকিয়া কথা কহিলে নরেশ চমকিয়া উঠিলেন, অশ্রু-পরিপ্লুত এবং কি ভাঙ্গিয়া-পড়া সে কণ্ঠস্বর!

“আমায় একবার সঙ্গে ক’রে সুসমার বাড়ী নিয়ে যাবে? তার কাছেও একটু ক্ষমা চেয়ে আসবো,—আর—আর—যাকে—যাকে না চিনে—না জেনে—”

“পরিমল! কি বল্চো তুমি? তুমি সুসমার বাড়ী যাবে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে?”

পরিমল রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, “শুধু তার কাছেই তো নয়; তার চেয়েও বেশী অপরাধী আমি যার কাছে তাঁর পায়ের ধূলা

না নিয়ে এলে আমি যে আর স্থির হ’তে পারছি নে।” —পরিমল সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশ চোঁকি হইতে সবেগে উঠিয়া পড়িলেন— “পরিমল! পরিমল! কার কথা বল্চো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।”

ক্রন্দনবিবশা পরিমল একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত্তে কাঁদিত্তে বলিতে লাগিল, “তুমি কি ক’রে বুঝতে পারবে? তুমি তো চেনো না।—কিন্তু আমি, আমি কি ক’রে তাঁকে অত অবজ্ঞা করেছিলাম! আমি কি ক’রে তাঁকে চিন্তে পেরেও চিন্তে পারি নি? গরীব নিরঞ্জন ব’লেই না অমন ক’রে তুচ্ছ করতে পেরেছিলাম! তিনি যে আমারই মায়ের আনা রোগ ঘেঁটে নিজে রোগে পড়েছিলেন, তাঁকে যে মরা মানুষ মনে ক’রে আমিই দাহ করতে নিয়ে যেতে দিয়েছি। উঃ, আমি কি! আমি কি! আমি কি!”

হাবড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে পা দিয়াই নরেশের সঙ্গে সাধুজীর দলের সাক্ষাৎ ঘটয়া গেল। সাধু সানন্দে চোঁচাইয়া উঠিলেন, “এই যে রাজা আমাদের তুলে দিতে এসেছেন!—জয়োহস্ত!”

সাধুজীর সঙ্গে স্বাগত শেষ করিয়া নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল নিরঞ্জনর দিকে। নিরঞ্জন এত লোকের মধ্যে তার মতন একটা নগণ্য লোকের এতটা খাতির অশোভন হয় দেখিয়া নত হইয়া নরেশের পদধূলি লইতে গেল, নরেশ তাহাকে উত্তপ্ত গাঢ় আলিঙ্গনে একেবারে বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন, কৃত্রিম কোপে হাসিয়া ধমক দিলেন, বলিলেন, “ফের বদমাইসি!”

তার পর ইঁহারা ষ্টেশনের একপ্রান্তে একটু ভিড় ছাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন। নরেশ বলিলেন, “নিরঞ্জন! মুক্তেশ্বর রায়ের নায়েব-দেওয়ান হরিশচন্দ্র মিত্র যে মহাপাতক করেছিলেন, তাঁর সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্ত তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ সম্পত্তির অর্ধেকটা—অর্থাৎ যেটা তিনি মুনীরের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সেটা আমি বিষয়ের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়া দিতে এনেছি,—কোন কথা শুন্বো না, নিতেই হবে। তোমার বাবা রত্নেশ্বরবাবু সেই সম্পত্তি হাতে পেয়েও একদিন আমার বাবাকে ছেড়ে দেন। সেই উপলক্ষে তিনি চিঠিখানি লেখেন, আমি বড় হয়ে সেখানি সম্বন্ধে তুলে রেখেছি। চার বৎসর মাত্র পূর্বে সেই চিঠি পেয়েই আমি তোমার পোঁজে চট্টগ্রাম গিয়ে জানতে পারি যে, মাস কয়েক পূর্বে তুমি মারা গেছ—এবং তখন আর কোন পথ না পেয়ে—যদিই

এতে আমাদের পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয়, ভেবে তোমারই শেষ চিহ্ন ব'লে তোমার পরিত্যক্তা”—

নিরঞ্নের পা টলিয়া সে বসিলা পড়িতেছিল, নরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া নিকটস্থ বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিলেন। গৈরিকধারিণী সুখমা দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের হৈয়ালিপূর্ণ কথাবার্তা সবিস্ময়ে শুনিতেছিল; নিরঞ্জনের শুক্রবার জন্ত অগ্রসর হইতে গিয়া সে সান্ধ্যে দেখিল,

নিকটস্থ মেয়েদের বিশ্রামাগার হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া, একটি তাহারই বয়সী মেয়ে সেই আধপাগলা নিরঞ্জনের পায়ের কাছে পড়িয়া অশ্রু-পরিপ্লুতমুখে বাষ্পগদগদস্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—“রমেশ দাদা! আমার কি আপনি চিন্তে পারচেন না? আমি তো মরি নি,—আমিই যে সেই পোড়ারমুখী সুখদা।”

সমাপ্ত

নারীমঙ্গল

—❦—
(স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

নারীমঙ্গল

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

নর এবং নারী লইয়াই মানব-সমাজ। ইহাতে একের বিহনে যখন কেবলমাত্র অন্যকে লইয়া সমাজ গঠন অসম্ভব, তখন একের সম্বন্ধে কোন কথা ভাবিতে বা বলিতে গেলেই অপরের সম্বন্ধেও সেই সঙ্গে চিন্তা বা আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এক জন বৈদেশিক পণ্ডিত বলিয়াছেন,—“নর এবং নারী সমাজ-রূপ পক্ষীর দুইটি পক্ষ, ইহাদের এক জনকে বাদ দিয়া অপরকে যখনই উড়িবার চেষ্টা করিতে দেখি, (উন্নতির) তখনই আমার মনে দারুণ ক্লেশ বোধ হয় এবং সফলতার সম্বন্ধেও সন্দেহান্বিত হই।”

আমাদের দেশের শাস্ত্রকাররা নারীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে স্বামীর সহধর্মিণীরূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। এই “অর্দ্ধাঙ্গিনী” এবং “সহধর্মিণী” শব্দ দুইটির দ্বারায় তাঁদের সমগ্র অধিকার যেরূপ সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়রূপে প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। আবার শুদ্ধ মাত্র এই ব্যক্ত জগতেই নহে, সমুদয় বিশ্বকাণ্ডেও যে এই উভয় শক্তির সম্মিলনমূল, তাহী সমস্ত দর্শন-শাস্ত্র শতমুখে প্রচার ও প্রমাণ করিতেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, ভক্তের শিব-শক্তি, এমন কি একমেবাদ্বিতীয়ম্—এক এবং অদ্বিতীয়ের দৃঢ় প্রচারক যে বেদান্তশাস্ত্র, তাহাতেও ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা-বিজুড়িত অথচ পরিদৃশ্যমান জগদব্যাপারের তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে মায়ার শরণাগত হইতে হইয়াছে।

অতএব শুদ্ধ জীব-জগতেই নহে,—সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বের মূলেও সেই দ্বৈততাবের লীলা,—অবিচ্ছেদ্য এক কোথাও নাই। এই জন্তই পৌরাণিক পরম মহেশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বর এবং মহাশক্তির পদতলে মহাশিব শব্দরূপী। এতদ্বারা শাস্ত্রকারগণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই দুই পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে, একেরই দ্বিধা বিভক্ত—দুইটি রূপমাত্র।

অতএব এই নব্য-শিক্ষার যুগে পুরুষ যখন নূতনের মধ্যে মগ্ন হইতেছে, তখন তাহার অর্দ্ধ—নারী সমাজেও যে এই নব্য-তত্ত্বতার স্রোতঃ প্রবলভাবে আঘাত করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক,—ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই যে নূতন স্রোতঃ দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ স্রোতঃ দেশের নদীর নিজের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা বৈদেশিক বস্তার অতর্কিত প্রাবন। এই নূতন স্রোতঃ বেগবতী ধারা আমাদের ঘর-দ্বার ভাসাইয়া না দেয়, সেই দিকে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। যেহেতু নর এবং নারীর পরস্পর সম্মিলনে গঠিত হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ, জীব-জগতের জননীগণের স্থান ঘরের ভিতর অংশে এবং পুরুষের বাহিরে। গলা ফাটাইয়া ইহার প্রতিবাদ-চেষ্টা করিলেও,—এই প্রকৃতিদত্ত অধিকারের পরিবর্তন ঘটবে না। কাজেই প্রাবন যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন স্বতঃই একটুখানি ব্যস্ত হইতে হয়।

“স্ত্রীশিক্ষা” বলিতে আজ কাল আমরা সাধারণতঃ মেয়েদের স্কুল-কলেজে লেপা-পড়া শেখানকেই বুঝি। আজ কাল এই প্রকারের শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং দিন দিন ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে। এই সব মেয়েরাই অদূর-ভবিষ্যতে এক দিন গৃহিণী এবং জননী হইবেন। নারীর শিক্ষা-দীক্ষা বাহা কিছু সমস্তই যে তাহাদের এই দুইটি প্রধানতম কর্তব্যসম্পাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া নির্বাচিত হওয়াই উচিত, ইহা স্থল-দৃষ্টিতেও বুঝা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ-গণ এ বিষয়ে একবারেই উদাসীন এবং দেশের গণ্য-মান্য জননায়কবর্গও—এত বড় চিন্তনীয় ব্যাপারে একান্তই চিন্তাশূন্য। এই কথাটা কি কেহই ভাবিয়া

দেখেন না যে, যত উচ্চ শিক্ষাই প্রাপ্ত হউন,—নর এবং নারীর কর্মক্ষেত্র কখনই ঠিক এক হইতে পারে না। উভয়ের শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তি যে পরিমাণে বিভিন্ন, উভয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ও সেই হিসাবেই কতকটা বিভিন্ন রাখিতেই হইবে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, শিল্পকলা, উত্তমরূপে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণভাবে কিছু গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্র এবং সন্তান-পালন প্রভৃতি গৃহকার্য্যই স্ত্রীশিক্ষার—প্রধানতম বিষয় হওয়া উচিত। রাশি রাশি অপ্রয়োজনীয় বই পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করাই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। এই অনাবশ্যক বইএর বোঝাপড়ার পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া ছেলেদের স্বাস্থ্য, ক্ষুধা এবং তাহার চরম ফল আয়ু কপূরের মত উবিয়া যাইতেছে; এইরূপ পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য লাভণ্য ক্ষুধা ও সজীবতা জলের মত অপব্যয় হইতেছে। বাল্যবিবাহে অকাল-মাতৃত্বে মেয়েদের শরীরের অবস্থা তো এর চেয়ে বেশী মন্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর পাঁচটা (মর্নিং স্কুলে) হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত নতুবা বেলা ৯টা হইতে ৪টা অবধি, নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া গাড়ী-ঠাসা হইয়া অনর্গল শুষ্ক কঠোর পাঠ্যভ্যাসের মধ্যে যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদের শরীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। ছেলেদের তবু পথ চলার অধিকার থাকায়,—অনেকটা মন্দ ফল সত্ত্বেও আলো-বাতাসের সহিত একটা সম্পর্ক থাকে; মেয়েদের ভর্তি গাড়ীতে মেয়ে উঠানো-নামানো করিতে করিতে অনেকখানি সময়ই বন্ধ থাকিতে হয়। অবশ্য সকলেই কিছু অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নহেন। টিফিন (জল-খাবার) পেট ভরিয়া, অথবা সুপাচ্য বা সুখাদ্য, এই অন্ন-সমস্তার দিনে কম মেয়েরই ভাগ্যে জোটে। ঘরেও সাত-সকালে বাচ্চা-কাচ্চা সামলাইয়া, মায়েরাও কিছু পরিপাটীরূপে আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন না। খাত্তের মধ্যে এ দরিদ্র দেশে ডাল-ভাত-তরকারী প্রধান সম্বল। উহা চিবাঁইয়া খাইবার অবসর নাই—গাড়ী আসিয়া পড়িবে। অজীর্ণ রোগ হইবার কিছু অপরাধ আছে কি? তার পর স্কুলে ও স্কুল হইতে ফিরিয়া ঘরেও সেই রাশিকৃত পড়ার চাপে পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়া। এইরূপে অবসরাভাবে, গৃহস্থ-কন্ডার উপযুক্ত কার্য্যকরী শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, মেয়েটি এক আধটি পরীক্ষায় পাশ করিল এবং ভগ্ন-দেহ, পুঁথিগত বিদ্যা ও স্কুলের পাঁচটা বিভিন্নাবস্থার সঙ্গিনীদের কল্যাণে বেশ একটু

মৌখীন রুচি লইয়া একটি দরিদ্র পরিবারের অর্দ্ধ শিক্ষিত কেরাণী গৃহে চলিয়া গেল। এ অবস্থায় মেয়েটির জীবন বেশ শান্তিপূর্ণ হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য সকল বিষয়েরই ছ'একটি ব্যতিক্রম থাকে, আমি তাহাদের কথা ধরিতেছি না; সাধারণতঃ ঐ ভাবের অর্থাৎ এই পুরুষোচিত ভাবের শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্য-তত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রাপ্ত—আধুনিক সহরে মেয়েদের কতকগুলি গুণের সহিত কতকগুলি দোষও যে জন্মিতেছে, ইহাকে অস্বীকার করিতে গেলে, সামাজিক সত্য ব্যাধির ঠিক মূল-তত্ত্বানুসন্ধান করা হয় না এবং যে রোগের প্রকৃতি-নির্ণয়ে ভ্রান্তি থাকে, তাহার প্রতীকার প্রায় অসম্ভব। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রের তো এই প্রকারই বিশ্বাস।

নবশিক্ষিতা মেয়েদের সেকালে (অশিক্ষিতা আমি বলিব না, যেহেতু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেকালে মেয়েদের স্কুল, কলেজে না গিয়াও এমনভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যাহা শিখাইতে আধুনিক এম্-এ ক্লাসেরও শক্তি নাই। উদাহরণস্বরূপে রাণী ভবানী, বিদ্যাসাগর-জননী, গুরুদাস-জননী, ভূদেব-জননী এবং ভূদেব বাবুর পত্নীর নাম করা যাইতে পারে। বিশ্ব-বিশ্রুত জ্ঞানী ও বিদ্বান্ স্বামী তাঁহার স্কুল-কলেজে না পড়া স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পারিবারিক প্রবন্ধে যে উৎসর্গ-পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত বঙ্গরমণীরই পাঠ করা উচিত। উহাতেই প্রমাণ পাইবেন যে, যাহারা নব্যশিক্ষা ব্যতীত যথার্থরূপে নব্যশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত স্বামীর জীবন এতদূর সুখময় করিতে পারেন, তাঁহারা কখনই অশিক্ষিতা ছিলেন না। আরও এক কথা, ফল দেখিয়াই বৃক্ষের শক্তিমত্তা প্রমাণিত হয়। সে কালের ঐ সব বাল্যে বিবাহিতা, উচ্চ-শিক্ষার বহির্ভূত মায়ের গর্ভে যে সবল, সুদীর্ঘজীবী, অসাধারণ শক্তিমান সন্তান স্থান-লাভ করিয়া দেশ ও জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কোন নব্যশিক্ষিতার সন্তানকে তো আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে দেখিলাম না! শিক্ষাও তো—আজ অন্যান্য পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। 'তবে কালোহর্য্য নিরবধিঃ'—পঞ্চাশ বৎসরেই হতাশ হইবার কারণ নাই; এবং যখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—অর্থাৎ নানা কারণে আর সেকালের সে সংঘততম পারিবারিক জীবন ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে, তখন অতীতের ক্রন্দন রুদ্ধ রাখিয়া জীবন্ত ও জাগ্রত বর্তমানের সমস্তারই যথাসম্ভব সমাধান-চেষ্টা করা কর্তব্য।) — মেয়েদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের কিছু প্রভেদ জন্মিয়া

হাইতেছে। আমি সেই সম্বন্ধেই দু-একটি কথা বলিব। জগৎ বৈচিত্র্যময়, প্রকৃতি বিভিন্ন। “ভিন্ন-রুচির্হি লোকঃ”—সকলেই যে আমার সহিত একমত হইবেন, এমন আশা বাতুলেই করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভিন্নরুচির দোহাই দিয়াই নব্যশিক্ষার কয়েকটি ত্রুটির বিষয়ে কথা কহিতে ভরসা করিতেছি।

নব্য-শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনা যায়, উহারা ঠিক পূর্বের মত ধর্মভীরু হয় না। (অবশ্য এ স্থলে সমাজপ্রচলিত ব্রত উপবাস, পূজা-হিক ও গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। নৈতিক চরিত্র নির্ভর করে কতকটা বংশ, পিতা-মাতা ইত্যাদিরই উপরে এবং অনেকটাই শৈশবশিক্ষার শৈথিল্যজাত কুসঙ্গে।) ইহার কারণ, আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষার কোনই বালাই নাই। ঘরেও ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া—মা-বাপ নিজেদের সকল দায়মুক্ত বোধ করিয়া, ও সকলের ব্যাঘাট রাখেন না,—অথবা, তাঁহাদেরও তো ঐ একই দশা! বালিকাব্রত, শিবপূজা প্রভৃতি অনেকটা অবসরের অভাবে, কতকটা আলস্তে, একটু বয়স বাড়িলে বৈদেশিক শিক্ষা ও সঙ্গপ্রভাবে, তুচ্ছ বোধে পরিত্যক্ত হয়;—অথচ উচ্চাঙ্গের ধর্ম-চর্চারও ব্যবস্থা নাই। কাজেই ছেলেদের মত মেয়েরাও ধর্মজ্ঞান-আচার-বিচার ও পূজার্চনা) বর্জিত হইয়াই বাড়িয়া উঠে। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজেও উপাসনার বিধি আছে—কিন্তু হিন্দুসমাজের তো মা-বাপ নাই। কাজেই হিন্দুসমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়ের পক্ষে ধ্যানপূজার্চনা বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে! ব্রত-উপবাসাদিতে যে নিয়ম-সংঘমের প্রয়োজন, তাহাদের চরিত্রগঠনে সেইটুকুরও আর তাহারা সহায়তা প্রাপ্ত হয় না।

নব্যশিক্ষিতাগণ পুরাতন দলের তুলনায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কতা এবং অসরলা—এ নিন্দাটাও তাঁদের ঘটিতেছে। স্কুল এবং কলেজে শিক্ষিতা হইলেই যে মেয়েরা কুটিল হইবেন, এমন কথা বলি না। তবে তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে ইহা এতই সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে যে, এ সম্বন্ধে আর বেশী স্পষ্ট করিয়া কোন কথা না বলিলেও চলে। প্রাচীনারা পরকে এক মুহূর্তে আপন করিতে পারিতেন, নবীনারা আপনকেও বহুদিনে নিকটতম করিতে তো পারেন-ই না,—পরস্পর পর করেন। ইহার অনেকখানি সত্য! ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা নিজের প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া, ছাঁচে ঢালাই করা নিষ্কির তৌলধরা কৃত্রিম শিষ্টাচারের আশ্রিতা

হইতেছেন। তাঁহারা বয়স্কার সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে জানেন না। তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্রুতা-লাপ কান পাতিয়া শুনিবেন, তাঁহারা তাহাতে পৃথিবীশুদ্ধ সজীবনিজ্জীবের সকল সংবাদ শুনিতে পাইবেন,—শুনিতে পাইবেন না শুধু তাঁদের নিজেদেরই সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতির আন্তরিক খবরটুকু। তাই একালের বন্ধুত্ব, বন্ধুর সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক, শুধু একটা “আহা”তেই পর্যাবসিত হইয়াছে। উহাতে আন্তরিকতা ও হৃদয়তা নাই। এখন দিন দিন গুণা গুণা এফ-এ, বি-এ এমন কি এম্-এরও অভাব নাই। ইহাতে অহঙ্কতাগণ নিজেদের বিদ্যালোকে নিজেরাই বলসিতনেত্রী হইতে অবশ্য লজ্জিত হইবেন, তবে “অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী” এই যা ভয়! খুব বেশী উর্দে খুব বেশী মেয়ে উঠেন না; এবং তাঁহারা উঠেন, তাঁহারাও রক্ষণশীল সমাজের নহেন। তাঁহাদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং সাহেবীআনার প্রভাবাঘ্রিত আধুনিকতা লইয়া একপ্রকার দিন কাটিতে পারে, যেহেতু তাঁদের সমাজবিধি অনুসারে পরের ঘরকে প্রায়ই তাঁদের আপন করিতে হয় না এবং বিবাহ করা-না-করাটাও অনেকটা নিজেদেরই হাতে।

নব্য মেয়েদের গৃহকর্মে অক্ষমতা ও তচ্ছিন্নতা অবশ্য অনেকটাই অবস্থায় পড়িয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহার জন্ত খুব বেশী দোষ দিবার নাই। স্কুল হইতে আসিয়া স্কুলের পড়া সারিয়া,—তার উপর ইদানীং যেমন সকলকার সব কত্যাগুলিকেই চৌষট্ঠিকলাকুশলা করিয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সে বেচারাদের এই ঘোর কলির অন্তর্গত ক্ষীণপ্রাণে আর কতই সামর্থ্য যে, ইহার উপর আবার রন্ধনাদি কার্য্যকরী বিদ্যালোভে মনোযোগী হইতে পারে? তবে যখন এ শিক্ষা না হইলে নয়, তখন মায়েরা যদি যত্ন ও সহানুভূতির সহিত এ বিষয়ে সচেষ্টি হন, তবে অন্ততঃ ছুটির দিনেও একটু আধটু রন্ধন শিক্ষা দিতে পারেন। এ ভিন্ন পান সাজা, ছোট ভাইয়ের লালন-পালন, বাপের অল্প-স্বল্প সেবা, মায়ের সামান্য কিছু সাহায্য—এগুলির নিত্য অভ্যাস না রাখাই অনুচিত। এই সব প্রীতি-ভক্তির সমাবেশেই বাঙ্গালীর মেয়ের নিজস্ব জীবন গড়িয়া উঠিতে সাহায্যলাভ করে। বঙ্গের শিক্ষাগুরু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গৃহকর্তাদিগকে, বিবাহের বয়ঃক্রম হইবার পূর্বেই প্রত্যহ একটু একটু করিয়া রন্ধন এবং গৃহস্থ-গৃহের উপযোগী অত্যাবশ্যক গৃহকর্মে নিযুক্ত করিতেন। এমন কি, এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত, যেমন বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে—তেমনি এ বিষয়েও প্রতিযোগী

পরীক্ষা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকিত। ছোট মেয়েদের দ্বারা বাপ-ভাইকে পরিবেশন করিয়া খাওয়ানর অভ্যাস করাইলে, উহাদের নিজেই ভালটা খাই—এ লোভটি জন্মিতে পারে না। পীড়িত, ভাই-বোনের কতকটা শুশ্রূষা ও তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান হইতে ভবিষ্যতে সন্তানপালন সম্বন্ধে যেকোন প্রাকটিক্যাল (কার্য্যকরী) জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব, তেমন স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সতেরখানা বই পড়িলেও হইবে না। অবশ্য এ সব বিষয়ে যিনি শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহার নিজের শিক্ষা যেন অসম্পূর্ণ না হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, ঘাড়ে পড়িলে আপনিই সব শিখিয়া লইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে এবং এ যুক্তির মধ্যে আদৌ সহজদয়তা নাই। ঠেকিয়া শেখার বিড়ম্বনা অনেক। যথাকালে বীজ বপন করিয়া সবুজে জলসেচন করিলে অফলা হইবার অথবা কুফল লাভের আশঙ্কা খুব কমই হইয়া থাকে। বিশেষ ভাগ্যলক্ষ্মীর চিরচঞ্চল্যের অপবাদ সনাতন কাল হইতেই শ্রুত হইয়া থাকে। এ জন্ত ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে কিছু কিছু কার্য্যকরী বিজ্ঞা সকলেরই শিখিয়া রাখা উচিত। এ দেশের ছেলেদের শিক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে থিয়োরিটিক্যাল (ভাবপ্রবণ) যথেষ্ট প্রাকটিক্যাল (কার্য্যকরী) নহে, বাকীরা আমাদের দেশের অনেক দেশ-হিতৈষী মহাত্মা আজকাল আক্ষেপ করিতেছেন, এ কথা অনেকেই জানেন। আমার মনে হয়, ছেলেদের মত—না, বরং অধিকতর ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইবে, যদি আমাদের মেয়েরা কার্য্যজগৎ ছাড়িয়া কেবলই ভাবলোকের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন। শুনা যায়, ইয়োরোপীয় রাজপরিবারসম্মত সন্তানসন্ততিবর্গ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অচপল আর্জুগতো সন্দিহান হইয়া স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্ত কোন না কোন একটা কার্য্যকরী শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। আমাদের বর্তমান সম্রাট নাবিকের কার্য্যে সুশিক্ষিত। মোগল সম্রাট আকবর শাহ, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি এবং মোগল রাজকন্যাবর্গও কেহ টুপী প্রস্তুত, কেহ আলেক্সা-লিখন, সুগন্ধি প্রস্তুত ইত্যাদি অর্থকরী বিজ্ঞা শুধুই শিক্ষা করিতেন এমন নয়,—তদ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করিতেন, এ কথা ইতিহাস-অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

বিলাসিতাবুদ্ধি এক্ষণে আমাদের সমাজের প্রতি স্তরেই হইতেছে। এ জন্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই প্রধানতঃ দায়ী করিতে চাহি না। তবে স্কুল-কলেজে সকল শ্রেণীর একবয়সী মেয়েদের সর্বদা মেশামেশির জন্ত, একের দোষগুণ যত নীত্র অস্ত্রে

মে (খ) ৩৩ -

সংক্রামিত হয়, অতএব ততদূর হইতে পারে না। এই হেতু এই বিষয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর একটুখানি দৃষ্টি রাখা আমার সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ধনিকতাগুণ ‘শ্রাময় লেদারের হিলওয়াল লেডী স্কু’ ‘রেশমী ষ্টকিং’ লম্বা চোড়া বিচিত্র ফিতার স্কুল ও জ্যাকেট, ব্রুক, পেটিকোটের নিত্য নূতনতর ফাসানের আমদানী করিতে থাকিলে বেচারী গরীবের মেয়েদের কচি মনেও সংক্রামক ভাবে ঐ সকলের উপর লোভ জাগ্রত হওয়া খুবই অস্বাভাবিক নহে। বিলাসিতা জিনিসটার দোষই ঐ। যাহা একের পক্ষে অনায়াসলভ্য এবং সহজ-ভাবেই আচরণীয়, অন্যের পক্ষে হয় তো বা উদার ফল অশেষ অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। নিম্ন-দ্রষ্টাদিতে যাহা ঘটবে, তাহা কতকটা অপ্রতি-বিধেয় (হয় তো তাহারও প্রতিবিধান আছে)। কিন্তু শিক্ষাকে স্কুল-কলেজে সকল মেয়েরই পরিচ্ছন্ন অল্পট অনাড়ম্বর অর্থাৎ সকল অবস্থার মেয়েদের পক্ষে যাহা পাওয়া সম্ভব, তেমন বেশেই আসা সম্ভব। (বেশভূষা, যানবাহন ইত্যাদির অত্যধিক আড়ম্বরে আজকাল ধনি-দরিদ্রের প্রভেদটা অত্যন্তই সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। অনেকেই হয় তো ভাবিয়া দেখেন না যে, এই প্রভেদই ইউরোপীয় মহা অনর্থের—অর্থাৎ বন্সেভিজমের মূল।) এ স্থলে বলাই বাহ্যিক যে, শিক্ষয়িত্রী নিজেই উহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবেন। এক্ষণে এফ-এ বি-এ পাশ ব্যতীত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনে অপর গুণপণা দেখার প্রথা রহিত হইয়াছে। সেই হেতু মেয়েদের পক্ষে বিলাসিতাবর্জন বৈদেশিক-তার প্রবল প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মেয়েদের শিক্ষাভার যাহাদের হস্তে, তাঁহারা নিজেরাই তো জগদব্যাপারে একান্ত অপরিণতবুদ্ধি স্কুলের মেয়ে। নিজেদের সন্তঃপ্রাপ্ত পুংথিগত বিজ্ঞামাত্র সঞ্চয় করিয়া আসিয়াই, শত শত অপরিপক্বমতি বালিকার জীবনগঠনের সহায়তা করিতে হয়। আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে স্কুলের এবং গৃহের উভয়পক্ষীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষেই কিছু চিন্তা করিবার আছে। যে জন্ত বালিকার মাতৃ সামাজিক অকল্যাণের হেতু বলা যায়, তাহারই কিছু কিছু ক্রটি এই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাকুলের হস্তে শত শত কন্ডার মাতৃত্বত গ্ৰস্ত করায় সংঘটিত হইতেছে না কি?

শিক্ষাদান কার্য্যটি নিতান্ত হাসিখেলার জিনিষ

নহে। বিদ্যাদান যেমন মহাদান, তেমনি মহাব্রত। জগতের সমুদয় মহৎ কার্যই অনায়াস বা অস্বাভাবিক নহে; পরন্তু কষ্টসাধ্য। যুগযুগান্তরে এবং শুধুই এ দেশে নয়, দেশ-দেশান্তরেও, এই শিক্ষাদান কার্য ত্যাগ-সংযত-জীবন তাপস-তাপসী সম্প্রদায়ের হস্তেই চ্যুত ছিল। বৈদিকযুগের ঋষিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৌদ্ধযুগেও সহস্র সহস্র ভিক্ষু-ভিক্ষুণীই মানব-সমাজের শিক্ষাগুরুর পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন (তখন ধর্ম এবং বিজ্ঞা স্বতন্ত্র বিভক্ত ছিল না।) ইয়োরোপখণ্ডেও ধর্ম এবং লোকশিক্ষা সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীপণের ত্যাগ-দীক্ষিত চিত্তাশ্রম করিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। আজিও চির-কৌমার্যাবলম্বিনী খৃষ্টানকুমারীকুল শুধু স্বদেশেরই নহে, দেশদেশান্তরেও, সহস্র সহস্র অনাথ অনাথার রক্ষয়িত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। এই সেদিনেও মাতাজী তপস্বিনীর অধীনে আদর্শ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালধর্মের তপস্যা সঙ্কীর্ণতর হইয়া গিয়াছে—একের অবর্তমানে তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়া কঠিন। এই সকল আঠার কুড়ি বৎসরের বালিকাগণকে সেই সকল শিক্ষাময় ব্রতধারিণী মহাতাপসীগণের সহিত তুলনা করিতে আমি বসি নাই; এবং ইহাদের কাছে তেমনটি দাবী করিতে যাওয়া শুধু নিঃসমতাই নয়, বাতুলতাও। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের দেশে যে মেয়ের ঘরে একটি বয়স্ক সপত্নীপুত্র আছে—হয় তো তাহার বিবাহও হইয়া গিয়াছে—সে মেয়ে বিয়ের কনে আসিয়াই যুবক পুত্র বা পুত্রবধূর সম্মানে (বা স্নেহে) তাহাদের মাতার যোগ্য কতকটা প্রোচা সাজিয়া বসে,—এমনও তো ঘটিতে দেখা যায়! আর এসেই যে পারে, সুখী সে-ই হয়। তেমনি এই বয়সে বালিকা এবং জগতের মধ্যে একটি উচ্চতম পদে আরুঢ়া, এই মেয়েগুলিকেও তাঁদের উচ্চপদের মর্যাদা রক্ষার্থেও কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করিতেই হইবে। নিজেরা স্নেহসম্পন্না হৃদয়বতী ও বিলাসবর্জিতা হইলেই, তাঁরা এই ঘোর দায়িত্বে পরিপূর্ণ পদলাভের উপযুক্ত হইতে পারিবেন। ইংরাজীতে যাহাকে “প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং” বলে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর উচ্চাঙ্গন যিনি গ্রহণ করিবেন, এই তাঁহার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। (অথবা ইহা সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত বলাই সম্ভব)।

অবশেষে প্রধান কথা এই যে, নানাকারণে মানুষের ব্যয়ের দিকটাই অপরিপাতিতরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে।

মহার্য্যতার যেমন সীমা নাই, তেমনি শেষও নাই। নিজের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাইতে পারেন, আজিকালিকার এই ঘোরতর সমস্তার দিনে “গৃহলক্ষী” অভিধান তাঁহারই লভ্য। গৃহসংস্কারে গৃহিণীর সাহায্য নহিলে চলে না। অশনে, বসনে সর্বত্রই কার্যক্ষমকোচের প্রয়োজন। দয়াদর্শ আত্মীয়তাটাই শুধু না বাদ পড়িয়া যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অশ্বাশী থাকিয়া, যদি সাধ্যমত স্বল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে পারেন, তবেই তাঁহার সুশিক্ষিতা নামের যোগ্য,—নতুবা এমন অকলা বিচার আদর বাড়িবে না। ইংরেজীমানার প্রকোপে আমাদের চলিচলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার হস্ত হইতে ছেলে-মেয়েদের রক্ষা করিবার জন্য—ম্যালেরিয়া বা দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে দেশরক্ষার চেষ্টার মতই চেষ্টা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা জাতীয় জীবনের যেটুকুও বা দুর্দশার বাকী আছে, তাও থাকিবে না।

পূর্বেও মেয়েরা অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। তাহাতে নারীমনস্তপ্তিসম্পাদন পূর্বক গৃহস্থের গৃহে অসময়ের জন্য একটা সঞ্চয়ও থাকিত, কিন্তু এ যুগের নারী-বিমোহন ধাবতীয় বস্ত্রজাতই ভূয়া। অলঙ্কাররূপে ইহারা ক্রয়কালীন বহুমূল্য এবং বিক্রয়কালীন মূল্যহীন;—মুক্তা-চুণী বা কাঁচ-পাথর এবং অধিকাংশই রেশম-পশম ও লেশ-চিকনের গাদা। এই সমস্ত সম্পত্তি তো নহেই, অধিকন্তু বিপত্তি এই যে, এই সকল রাশি রাশি আবর্জনার বিনিময়ে দেশের কোটি কোটি টাকা জনশ্রোতের মত বৈদেশিক বিপণিজাত হইতেছে। তাও আবার এই হা-অন্নের দিনের মুখের অন্নগ্রাস শস্ত্রের মূর্তি ধরিয়া। অথচ এ সব কথা যে বাঙ্গালীর মেয়ে না জানেন, এমনও তো নয়। এক দিন বিদেশী শিল্পবর্জনের (বয়কটের) প্রতিজ্ঞায় ইহারাই অগ্রণী ছিলেন। এক্ষণে নিজেরা ভুলিয়া নিজ নিজ সন্তানকেও অসহায়ভাবে বৈদেশিক বিলাসিতা-সমুদ্রে মগ্ন হইতে সহায়তা দিয়া ধীরভাবেই করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, সে দিনের অপেক্ষা আজ কি এ দেশে সুদিনের অভ্যুদয় হইয়াছে? যদি শিক্ষায় চিন্তোন্নতি না হইয়া, স্বদেশের, সমাজের, স্বজনের এত বড় হ্রবহ্রাস, অবনতির দিনে কাহারও প্রতি কোনই কর্তব্য করিতে না শিখায়, তবে কি ফল সেই বিফল শিক্ষার গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কোন স্বনামধন্য ভারবাহী জন্তুবিশেষের অবস্থা লাভে? চলিত কথায় বলে, দুষ্টগোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। তাই বলি, কেবলমাত্র দুখানা ইংরেজী

বাংলা উপন্যাস বা ইতিহাসের দুপৃষ্ঠা উন্টাইলেই—মাসিকপত্রে দুটা প্রবন্ধ লিখিলেই—নারীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না। নব্য-শিক্ষিতাকে বিবি বাঁনাই-লেই চলিবে না, দেবী করিতে হইবে। শিশুচিত্ত কাদার তালের মত,—উহাদের যে ছাঁচে গড়িবে, উহারা নির্দিষ্টারে তেমনি গঠিত হইবে। আমরা যদি শিব (শিব-মঙ্গল) গড়িতে আর কিছু গড়িয়া ফেলি, সে দোষ তাদের নয়, আমাদের।

সন্তানের শিক্ষার জন্ত মা-বাপকে অত্যন্ত সচি ও সংযত হইতে হয়। যে আদর্শ তাহাদের সম্মুখে খাড়া করিবে, সে আদর্শের দেবতা তাঁহাদের নিজেদের হওয়া চাই। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ পরের চাইতে নিজের দৃষ্টান্তই সমধিক শিক্ষাপ্রদ। আমি যদি অনাচারী হই, আমার ছেলেকে সদাচারী হইতে বলিবার পুরা সাহস আমার বুকে আশ্রয় পাইবে না। আমার চিত্ত যদি গুরুজনে বিদ্বিষ্ট হয়, নিজ সন্তানের বশুতা আমি দাবী করিতে যাইব কোন্ মুখ দিয়া? আবার বলি, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া অথবা গৃহশিক্ষকের হস্তে সঁপিয়া দিয়াই নিজ কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করিবেন না। বাহাতে উহারা স্বধর্ম-ভক্ত, পরধর্মসহিষ্ণু, স্বজনপ্রেমিক, স্বদেশাহরক্ত, দরিদ্র-সেবক ও অনাড়ম্বর পবিত্র-চরিত হইতে পারে, অর্থাৎ মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে পারে, তেমন করিয়াই উহাদের শিক্ষা দিতে প্রাণপণ করুন। এ কার্যে পিতার অপেক্ষা মাতার সহায়তারই প্রয়োজন সমধিক। আর এইখানেই তাঁদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার সাফল্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এইখানেই মাতৃহের মহা পরীক্ষা। আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি, এবং সবার জন্তই মঙ্গলময়ের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যেন এই মহাব্রত,—এই মহাব্রত তিনি আমাদের বার্থ না করেন, যেন ‘মা’ নামে কলঙ্ক স্পর্শ না করে।

আমি স্কুল-কলেজের বিরোধী নহি। বরং নর-নারী-নির্কির্দেশে ইতরভদ্র সকলেরই জন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের একান্ত পক্ষপাতী; এবং ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চ অর্থাৎ কলেজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করি না, কিন্তু উহার বর্তমান ব্যবস্থায় সন্দেহ নহি; এবং পূর্বেই বলিয়াছি যে, নারীজন্ম শুধু বি-এ এম-এ পরীক্ষা পাশেই সার্থকতার চরম ফললাভে সমর্থ—এ বিশ্বাস আমার নাই। অতএব আমার বিশ্বাস মতে মেয়েদের জন্ত এখন আমাদের অনেক

বেশী ভাবিতে হইবে, খাটিতে হইবে,—উহাদের মঙ্গল-মঙ্গল ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। অমঙ্গলের ভ্রাতৃ পথে যদি পাঠান হইয়া গিয়া থাকে, ফিরাইয়া আনিয়া স্কুল-কলেজের পথে শুভযাত্রা করাইতে হইবে। নিজের মেয়েটিকে বিবাহের বাজারে বাঁধা নিয়মে কনে-দেখানর মামুলা শিক্ষা দিলেই চলিবে না—উহাকে স্বামীর সহধর্মিণী—সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীবের অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং তদপেক্ষাও উন্নত দৃষ্টিতে জীব-জননী রূপে দেখিতে হইবে। যদি ইহার উপযুক্ত রূপে তাহাকে গড়িয়া দিতে না পার, তবে ‘মেকি টাকা’ চালানোর মত ‘খেলো’ জিনিষ দান করার অপরাধে ইহ-পর দুই লোকেরই দরবারে তোমার সাজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল, নিশ্চিত জানিও। কারণ, এই যে বিদেশী ঢঙের পুরুষোচিত শিক্ষা মেয়েদের জন্ত বিহিত হই-রাছে, ইহা সংশোধিত, পরিবর্তিত না হইলে, আমাদের মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎ খুবই সুখোজ্জ্বল বলিয়া আমার তো বিশ্বাস হয় না—অবশ্য যদি না আমি ভ্রমে পড়িয়া থাকি।

২

প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে দলে দলে ইংরাজী-শিক্ষিত ছেলেরা খুঁটান হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। অনেকে আন্দাজ করেন, ইহার কারণ, সেই সময়-টাতে এ দেশে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব সাধারণের নাগাল পাওয়ার অবস্থায় স্থলভ ছিল না (খুব সম্ভব, জিনিষটা ঠিক সাধারণের জন্ত সৃষ্ট নয় বলিয়াই)। অথচ সাত সজু তেরো নদী পার হইয়া আগত খুঁটান পাদরীরা তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের চর্চাটা খুব জোরের সঙ্গেই করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। ঘরে শালগ্রাম-শিলায় ভগবানের অর্চনা হয়। পূজার মন্ত্র এই—“সহস্র-শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং সভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টা অত্র্যতিষ্ঠদশাস্ত্রলম্।” ছেলে বিশদার্থ জানে না। পাদরী বাললেন, “নোড়াহুড়ি ফেল সাগরের জলে।” ছেলে দেখিল, নিজের ঘরের পূজা-মন্দিরে সেই নোড়াহুড়ি।—ফেলিয়া দিল। আত্মীয়েরা কপালে করাঘাত করিলেন। প্রতিবেশী বলিলেন, “জাতি-ভ্রষ্ট!” তেমন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা সর্বত্র হইল না, বাস্তবিকই পূজা ঐ শিলামূর্তির নহে। পূজা যিনি মহতের চেয়েও মহৎ, আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, (অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্) সেই সর্বভূতাবধিসের। শিলা বা প্রতিমা তাঁহার প্রতীক বা ‘সিম্বল’। ইহা ব্যতীত অধিকারি-ভেদে উপাসনা-ভেদের ব্যবস্থা এই সনাতন হিন্দুধর্মে ঋখেই আছে,—

যাহাতে স্বধর্ম-ত্যাগ ও পরধর্ম-পীড়ন ব্যতিরেকেও, অনায়াসে এই ধর্মবৃক্ষের ছায়ায় বিচরণ পূর্বকই ঈশ্বরিত ধর্ম লাভ করা যাইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির অভ্যুদয় হইল। মুদ্রাসক্তির কল্যাণে শাস্ত্র-সকল সাধারণের দুস্তাপ্য রহিল না। এখন দুপাতা বাঙ্গালা ও আধ পাতা সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াই যে খুসী গীতা উপনিষদের বাণী অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেছে। এক্ষণে আর স্বদেশে বা বিদেশে (নিতান্ত মূর্থ ব্যতীত) হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক ধর্ম বলিয়া অবজ্ঞা করিবার পথ নাই; এবং নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টান হওয়ার ক্যাসনও বদল হইয়াছে। তাই বলিয়াই কি দেশে ধর্মের আবহাওয়া জোর করিয়াছে বলিতে হইবে? ‘ফলেন পরিচীয়ে’ এই যে কথাটা আছে, যে কার্যফলেই কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তার পরিচয় কিছু পাওয়া গেল কি? অজ্ঞতার এবং বিজ্ঞতার সম পরিণাম দাঁড়াইল না কি? শাস্ত্রের অপ্রচার বা শাস্ত্র অনধিকারী করার যদি দেশে অজ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে আজ যখন শাস্ত্র স্ত্রী-শূদ্র সকলেরই আয়ত্তাধীনে আসিল, তখন জ্ঞানের উজ্জলতর জ্যোতিতে দেশবাসীর অন্তরগুহা আলোকিত হইল না কেন? জ্ঞানীর যে লক্ষণ, ‘সমত্বঃখ-সুখমস্ত সম লোষ্ট্রাশ্চক্ষাধন’—তাহা আজ-কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কয় জন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খুঁজিয়া মিলে? জ্ঞানীর এ পরিচয় পুঁথিগত হইবার উপক্রম করে নাই কি?

লোকে বলিবে, “তুমি যে কুরুক্ষেত্রময় অর্জুন খুঁজিতে আরম্ভ করিলে!” অথচ সেই কুরুক্ষেত্রেও একটি ভিন্ন দুইটি অর্জুন ছিল না। আমি বলিব, ‘তবে আর ভগবানের অতবড় গীতাখানা প্রচার করিয়া ফললাভ কি হইল?’ বস্তুতঃ, শিক্ষাপ্রচার জিনিষটা শুধুই ব্যক্তিবিশেষের জন্ত নয়; সাধারণেরই জন্ত। যিনি স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত, স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানী, তিনি ভগবানের প্রেষ্ঠ বিভূতি,—পুরুষসিংহ! তাঁরা লোক-শিক্ষা দিতে আসেন, নিতে আসেন না। শিক্ষা-প্রচার অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা সর্বসাধারণের জন্ত। ইহার ফল যদি তাহাদের মধ্যে প্রকটিত না দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা সূত্রচারিত হয় নাই।

বীজ বপন করিলে বৃক্ষ হয়। এই কথাটা সাধারণ ভাবে মিথ্যা না হইলেও, অখণ্ডনীয় সত্যও নহে। ‘বীজ বপন না করিলে কখনই বৃক্ষ জন্মিতে পারে না’,—এই হেতুই ইহা আংশিক সত্য; কিন্তু

বীজ বপন করিলেই যে বৃক্ষ জন্মিবে, এমনও তো কোন প্রমাণ নাই। প্রথমতঃ, বীজ-বপনের পূর্বে জমীটি তৈয়ারি হওয়া চাই। জমী উর্বরা হওয়া প্রয়োজন। জমী নিড়াইয়া জলসেকে আর্দ্র হইলে, মৃত্তিকা খননপূর্বক বীজটি পুঁতিতে হইবে (বীজের মধ্যেও ফলোৎপাদিকা শক্তি নানা কারণে নষ্ট হইতে পারে)। তার পর অল্পরোদগম হওয়ার পর হইতে বিবিধ উপায় ও যত্নে সন্তান-স্নেহে উহাকে জিয়াইয়া রাখিয়া, লালন ও পালন করিতে হয়। তবেই হয় ত কালে উহার ফললাভ সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এই যে অজস্র শাস্ত্রপ্রচার, ৩রামকৃষ্ণ, ৩বিবেকানন্দ, ৩ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৩ভাস্করানন্দ, জ্ঞানানন্দ, আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার প্রভৃতির এবং আরও অনেকা-নেক মহাত্মা মহাপুরুষের জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণী সকলই যেন ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে, ইহার কারণ ধর্মবীজ-বপনের জমীর অবস্থাটা মোটেই ভাল নাই—কারণ? কারণ, তাহাতে যে সব আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তদ্বারা উহার সমস্ত উর্বরতা শক্তিকেই উহা গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সোজা কথা এই যে, আমাদের দেশে এই যে ধর্মভাবের হ্রাস দেখা যায়, ইহার প্রধান এবং প্রবলতম কারণ, আমাদের রাজার দেশের ধর্মহীনতা। ইয়োরোপ আজ আমাদের জীবনের আদর্শ! সেই ইয়োরোপ আজ অধ্যাত্ম বিচার জটিলতা-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া, জড়-তত্ত্ববাদের গুণগানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, দেখিতে গেলে, ইয়োরোপে এক্ষণে ধর্ম-চর্চার স্থান জড়বিজ্ঞানেরই অধিকৃত হইয়াছে। ধর্মচর্চা যৎকিঞ্চিৎ এতটুকু। সেই অবশেষটুকু পাদরী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নির্বাসিত। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশকে ইয়োরোপের মস্তশিষ্য বলিতে পারা যায় না। শিষ্যের ধর্ম—গুরুর পদাঙ্কানুসরণ, আবার কখন কখনও শিষ্যের কাছে উপদেষ্টা গুরুরও পরাভব প্রাপ্তির কথা শুনা যায়, (যেমন কোন কোন বিষয়ে জাপানীরা ইয়োরোপকেও পরাস্ত করিতে পারিয়াছে)। এ দেশে ইহাকে বলে গুরুমারা বিদ্যা। কিন্তু এ দেশ কি তাহার গুরুদেবের অনুসরণে স্বদেশের সর্বপ্রকার হিতের জন্ত সর্বস্ব পণ করিতে, জড়প্রকৃতিকে ক্রীত-দাসীত্বে আনয়নপূর্বক অভূতপূর্ব অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার সকল করিতে, ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের চরমশিখরে নিজ দেশের উত্তরপুরুষকে আরোহণ করাইতে, অপরিমিত অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও অসাধারণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে? তবে, ইহাকে শিষ্য কেমন করিয়া বলিব? অগত্যা দাস-

বলাই সম্ভব। দাসের ধর্মই এই যে, সে প্রভু-জাতির অনুকরণ করাতেই জীবনের চরম সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকে;—স্বাধীন স্বাভাব্য কখনই বেশী দিন রক্ষা করিতে পারে না। এক দিন সমস্ত মানবজাতির পরিচালক, জাগতিক সর্বপ্রাচীনতম সভ্যতার প্রচারকগণ যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে জাতি যে আজ বাহিরের মতই তাহার সমস্ত অনুকরণ দিয়াই দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা তাহার সর্বশরীর ও মনেই আজ ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই আজ ইয়োরোপীয় ভীষণ ধর্মহীনতা আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত। আর অর্ধমৃত অক্ষমদের মধ্যে যেমন সংক্রামক রোগেরও প্রতিষেধ সম্ভব হয় নাই, তেমনই ইহাও অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। মহাপুরুষগণ দর্শন দিলেন,—আশা দেখা দিল। তাঁদের জলদম্ভস্বরে আহ্বান আসিল, ‘উত্তীর্ণত জাগ্রত’। উত্থানশক্তি বারেকের জন্ত স্পন্দিত হইল;—কিন্তু হায়, মোহাচ্ছন্ন রোগীর ক্ষণিক মোহাপনোদনেরই জায় কি অচিরস্থায়ী সে আশা!

তবে সত্যই কি আর আমাদের এ দেশে উন্নতির কোনই আশা নাই? দিনে দিনে পরানুকরণে রত, পরপদসেবী এ জাতি কি জগতের যে কোন স্বল্পজীবী দাসজাতির মতই ধীরে ধীরে কালের তরঙ্গমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে? হিন্দু বলিতে কিছুই কি আর তাহার বাকী থাকিবে না? অসম্ভব! এই মহাজাতির উপর দিয়া অনেক প্রলয়-ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহার অবশুস্তাবী ফলে শাখা, মহাশাখা পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তথাপি এ মহাবৃক্ষ কেহ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে নাই। আজও পারিবে না।

আমাদের দেশেরই কোন শাস্ত্রকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

‘অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে।’

কয়লাকে শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতার নাশ হয় না।

ভক্তবীর তুলসীদাস ইহার জবাব গাহিলেন,—

‘সদগুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।’

তব, কয়লা কি ময়লা ছুটে,
যব্ আগ্ করে পরবেশ।’

কথা এই যে, ‘জ্ঞানের অগ্নি যদি অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তবে সেখানে যত বড় কয়লাই থাক্ না কেন, সে তাহাকে দগ্ধ করিয়া, নিজের উজ্জ্বল্যের দ্বারা উহাকেও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবেই।’ অঙ্গার শত ধৌতি দ্বারাও নিজের স্বভাব যে ত্যাগ করে না, তার কারণ

এই যে, ঐ উপায় উহার পক্ষে ঠিক পথ নহে। অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহার নিজস্ব পথ উন্নতির বথার্থ পথ প্রাপ্ত হইলে, সেই অঙ্গারই আবার উজ্জ্বলতম আভা ধারণ করিতে সমর্থ। এই যে অজ্ঞানান্ধকারন্যূনের উপায়, ইহাই জ্ঞানাগ্নি। গীতাকার বলিয়াছেন,—

‘জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন!’

এই জ্ঞানের পথকে অনুসরণ করিলে, জীবনের জটিলতার গ্রস্থি স্বতঃই খুলিয়া যাইবে। কর্তব্য এবং অকর্তব্য খুঁজিবার জন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ নব্যুগের রাঙ্গাবাতি (ডেন্জার সিগ্‌নাল)-ধারী ভ্রান্ত পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হইবে না; নিজের হৃদিস্থিত হৃদীকেশই সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। অতএব হউন নর, হউন নারী, —প্রকৃত জ্ঞানের পথ, ধর্মের পথ (ধর্ম ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়) অন্বেষণ করিয়া লউন। জগতে খুঁজিলে মিলে না, এমন কিছু আছে কি? আবার দেখুন, জ্ঞানের পথ কোন দিনই কাহারও জন্ত রুদ্ধ নাই। কোন পথই প্রকৃতপক্ষে কাহারও জন্ত কোন দিনই রুদ্ধ থাকে না। শুদ্ধমাত্র অধিকারিভেদে পথভেদ আধ্যাত্মিকারগণ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। তবে মানুষ নিজেকে সহজে নিম্নাধিকারী বলিয়া নিজের মনের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে; তাই বিশ্বসঙ্কুল উচ্চ পথে আরোহণ করিতে যায় ও অপারগতার শেষে পথপ্রদর্শকের প্রতি গালি পাড়িতে বসে। বেদ যখন শ্রুতি ছিল, তখন খুব সম্ভব মন্ত্র অশুদ্ধি ও বিকৃতি ভয়েই সাধারণভাবে স্ত্রী-শূদ্রের তাহাতে অধিকার ছিল না, কিন্তু উহার প্রধানতম অংশ, জ্ঞানকাণ্ডে, গীতায়, পুরাণে, ষড়্‌দর্শনে সমুদয় বেদ্যুদ্বে, পূর্ণ জ্ঞানমার্গে কাহাকেও তো অনধিকারী করা হয় নাই; এবং এক্ষণে তো চারিদিক্ হইতেই এই জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠিবার স্ববন্দোবস্ত করাই হইতেছে। তবে এই মহামণিময় রত্নমুকুট শিরে ধারণ করিবার আগ্রহ ও আবেগ কই? হউন নর, হউন নারী, এই শুভের পথে, সত্যের পথে আজ আপনারা একান্ত উত্তমে, একান্ত আগ্রহে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হউন। তবে এক কথা, এই জ্ঞানমার্গ-বলয়নের প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া লইবেন যে, যে পথটি অবলম্বন করিলেন, উহা স্পথ কি না। ভিত্তি-মূল শিথিল হইলে অট্টালিকা যতই সুচারু-নির্মিত হউক, তাহার পতন-ভয় ততই অধিকতর। ধর্মহীন শিক্ষাও তেমনি লোক-সাধারণের পক্ষে প্রকৃত শুভের পথ না হইয়া, বিপথেই পরিণত হইয়া থাকে।

শাস্ত্র ধর্মের তত্ত্বকে গুহানিহিত (ধর্মসূত্র তত্ত্ব নিহিতঃ গুহায়াং) এবং সেই গুহাপ্রবেশের পথকে দুর্গম পথ, (দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ।) এবং ক্ষুরস্ত্র ধারণার সহিত উপমিত করিয়াছেন। অতএব সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও আত্ম-সুখপরায়ণতা যে শিক্ষার বীজমন্ত্র, সে শিক্ষা সেই “গুহা-নিহিত” দুর্গম পথের শিক্ষা যে নহে, ইহা অত্যন্তই স্পষ্ট। আর সেই সব যে শিক্ষা, উপনিষদ তাদের “অবিজ্ঞা” নামে অভিহিত করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, ‘অক্ষং তমঃ প্রবিশন্তি যেঃ বিজ্ঞা-মুপাসতে?’ অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ শিক্ষা ভগবৎসান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। এক্ষণে একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইদানীং যে শিক্ষা আমাদের কতাপুলের জন্ত নির্ধারিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আর যা থাকুক, ধর্ম-তত্ত্বলাভের কোনই পথ নাই। অনেকের মুখে শুনা যায় যে, বয়স হইলেই আপনি ধর্মে মতি হইবে। কথাটা কি বেশ সঙ্গত? অবশ্য দৃষ্টান্ত সব বিষয়েরই দু’দশটি না পাওয়া যায়, সংসারে এমন কোন কিছুই নাই। মহাপাপীদের একটি কোন আকস্মিক ঘটনার আঘাতে সহসা মহাপুণ্যাশ্রয় পরিণত হইতে দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু সেও সেই ব্যতিক্রম। তদ্বিন্ন আরও এক কথা, পতন-শক্তি যাহাদের অতিশয় বেগবতী, উঠিবার ক্ষমতাও তাহাদেরই মধ্যে প্রচুরতর। মোট কথা তাহারা শক্তিমান; বাঁকা পথে অগ্রসর হইতেও তাদের বাধে নাই—সোজা পথেও না। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, চিরদিন অর্থের ও কামের সেবা করিয়া, সহসা জীবনের শেষকর্মে অকস্মাৎ এক দিন ধার্মিক হইয়া উঠা স্বাভাবিক নহে। তাঁদের যতটা ধার্মিক দেখায়, তার মধ্যে সাড়ে চৌদ্দ আনাই প্রায় শারীরিক ক্ষমতা-হাস-প্রাপ্তির পরিণাম মাত্র! এই জন্তই আধ্যাত্মিক সর্ব-প্রথমে ধর্মের স্থানই নির্দিষ্ট। ধর্ম-শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হইলে, অর্থোপার্জন ও কাম্যোপভোগ এবং পরিশেষে আজীবন ধর্মোচরণের ফল-লাভ মোক্ষ-প্রাপ্তি ইহাই সনাতন বিধি। হিন্দুর আশ্রম-ধর্ম এই নিয়মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাল্যাবধি মধ্য যৌবনে দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা ছেলেরা দীর্ঘায়ু ও নীরোগ-শরীর হইত। ধর্ম-সংযুক্ত বিদ্যালয়ভিত্তিক গঠিত-চরিত্র যুবকগণ গার্হস্থ্য ধর্মের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। মেয়েদের যদিও গুরুগৃহপ্রবাসের ব্যবস্থা ছিল না, (বৌদ্ধযুগে দু’এক স্থলের কথা শুনা যায় মাত্র); তথাপি স্বগৃহে বাস করিয়াই তাহারা ত্যাগ-সংযতস্বভাবা, পরসুখে আত্মসুখাসুখী নিমজ্জনকারিণী

জননীগণের সহায়তায় সেইরূপেই ত্যাগ-ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। ব্রত-উপবাস, অতিথিসেবা, পিতার ছাত্রবর্গের প্রতি সমুচিত ব্যবহার, রোগীর শুশ্রূষা, প্রতিপাল্যের প্রতি আত্মীয়-ভাব পোষণ—এ সকলের অপেক্ষা কোন্ শিক্ষা মহত্তর, কেহ বলিতে পারেন? ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কচ্ছসাধন, আজ যাহা আমাদের কত্যাগণকে আমরা নিতান্তই নোংরা জিনিষের মত পরিত্যাগ করাইতেছি, ত্যাগ-ধর্মের দীক্ষার পক্ষে তাহার স্থান নিতান্তই তুচ্ছ করিবার মত ছিল না। মানুষ হঠাৎ এক দিনে বীণ্ডুখুষ্ট হইয়া দাঁড়ায় না। যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, এক শুকদেব ব্যতীত আবহমান কাল হইতে সকলকেই সেই কথ করিয়াই পড়াশোনা আরম্ভ করিতে হইয়াছে। উর্দ্ধে উঠিবার জন্ত একটির পর একটি করিয়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। তা যিনি যতটা উপরে উঠিবেন, তাঁহার উঠিবার সোপানের সংখ্যা ততই অধিক। আবার এও ঠিক, মানুষ বড় অভ্যাসের দাস। ভাল মন্দ সে যেটুকুই শেখে, শৈশব হইতেই শেখে। বার তের বছরের বোমাগুলি তাঁদের বাপের বাড়ী হইতে যে শিক্ষা লইয়া খসুর-ঘরে পদার্পণ করেন, সেগুলি তাঁহারা চিরজন্মেও কি আর ভুলিতে পারেন? তা যদি হইত, তাহা হইলে ছেলের বিয়ের সময় ভাল ঘরের মেয়ে লোকে খুঁজিয়া বেড়াইত না। মানুষ স্বভাবতঃই বড় আলস্যপ্রবণ,—জীবনের গতিও নদী-স্রোতের মতই নিম্নগামী। জীবের সাধারণ ধর্ম আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিই। এ বিষয়ে সামান্য কীট ইত্যাদির সহিত তাহার প্রভেদ নাই। তবে যে মানুষ আজ জীবশ্রেষ্ঠ, সে শুধু নিজের সেই নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তিকে, কঠোর নিয়ম-সংযমের সুকঠিন আল বাঁধিয়া, সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ফিরাইতে পারিয়াছে বলিয়াই। এই বাঁধ যত শক্ত হইবে, নদীর স্রোতঃ ততই হইবে উর্দ্ধমুখী। নতুবা আসল মানুষের নগ্নমূর্তি—সে তো অসভ্য জাতির মধ্যে কতকটা, প্রমত্ত ব্যক্তির মধ্যে কিছু এবং উন্মাদের ভিতরে অনেকখানিই প্রকটিত। কি বীভৎস সে রূপ!

তবে কথা এই যে, এখন আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার যে সহজ অঙ্গটা, অর্থাৎ উহাদের মধ্যের অধ্যবসায়-শক্তি, গবেষণা-শক্তি, সম্মিলন-শক্তি, স্বদেশ ও স্বদেশীর জন্ত আত্মত্যাগ-শক্তি ব্যতীত আর যে চাকচিক্যময় বাহ্য রূপটা, সেটার প্রলোভন এতই যে, তার মধ্যে যত বড় সর্বনাশই আমাদের জন্ত

প্রচ্ছন্ন থাক, উহাকে ত্যাগ করিবার শক্তিও আজ আমাদের মধ্যে নাই।

এখন যদি উহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া আবার সেই পূর্বতন কালের গোময়লিপ্ত গৃহাঙ্গনে ফিরিয়া যাঁতে অনুরোপ করা হয়, তো সে কথা বাতুলের প্রলাপের সহিত উপমিত হইয়া, একটা ভ্রমল ভাস্কর্যের সৃষ্টি করিবে মাত্র। অতএব সেকালের নিয়ম ভাল ছিল, কি ছিল না, সে তর্ক তুলিয়া বুঝা কালক্রমের প্রয়োজন নাই। এখনকার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজনীয়, সেই সম্বন্ধে কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমার বিশ্বাস (পূর্বেও বলিয়াছি), আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষার দিকটাকে এতখানি শিথিল করিয়া রাখিলে, তাহাদের সঙ্গে বত বড় শত্রুতা করা হইবে, জার্মানীও ইংরেজের সহিত তেমন শত্রুতা করিতে চেষ্টা করে নাই।

* কুসংস্কার * দূর করিয়া সেকালে পচা, পুরান, ঘুণধরা আচারের গুণ্ডা হইতে নিজেকে ত্যাগ করিয়া, — মেয়েদেরও দ্বার করিবার জন্ত আমাদের দেশের একদল চরমপন্থী বন্ধপরিচর হইয়া আছেন। সংবাদপত্র ও

* কুসংস্কার বলিতে যে কতটা বুঝায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। প্রতিমায় চিত্ত স্থির রাখিয়া ভগবৎ-আরাধনা, অভ্যাস স্থির রাখার জন্ত দীক্ষা-গ্রহণ, শাস্ত্র-শাসনে সম্মাননা, সন্ধা-উপাসনা প্রভৃতির সমস্ত উপস্থিত হইলে আহা-সংযম, হিন্দু আচার-বিবর্জিত গৃহে পান-আহার না করা, দৈব-ঔষধ নামে ব্যবহৃত (বহু স্থলে) অসাধারণ রূপে ফলপ্রাপ্ত নানাবিধ মাহুলি কবচ প্রভৃতিতে সরল ভাবে বিশ্বাস স্থাপন—এ সকল তো নিন্দিত ছিলই; অধিকন্তু গুরুজনের প্রতি আনুগত্যটাও আজকাল এই দলের মধ্যেই আসিয়া পড়িল দেখিতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তিত্বাত্মবাদটা সমাজ গড়িবার না ভাঙিবার মন্ত্র? ব্যাপ্তি দ্বারা কখনই কোন জিনিষ গঠিত হয় না। ঈশ্বর যখন ব্রহ্মা, তখনই সৃষ্টি;—এবং যখন এক, তখনই লয়, এই ‘ইন্ডিভিজুয়ালিজম্’ বা ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার অল্প-বিস্তর কল সারা ইয়োরোপই ভোগ করিতেছে। তবে সেটা সম্পূর্ণ সফল হইয়া উঠিয়াছে কিস সাব্রাজ্যে। ইহার দু’একটা ফলপ্রাপ্ত এ দেশের চিরন্তন বিচার-পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়াছিল। তাহারই অবশ্রুতাবী ফলে ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান গুপ্তহত্যা, নারীহত্যা পাপেও পঙ্কিল হইয়া, দেশের উদ্বোধিত শক্তির অকালে অপব্যয় করিয়া ফেলিল। ইয়োরোপের পক্ষে এ কিছুই নয়;

মাসিকপত্রিকায় উপজ্ঞান প্রবন্ধে ঠিক ঐ খুঁটান মিশনারীদের সুরেই ইহা গাও আওড়াইতেছেন—‘নোডানুড়ি ফেল সাগরের জলে।’ অধিকন্তু খুঁটান মিশনারীদের চেয়ে এঁদের পরিচিত ভাষার আত্মবিশ্বাস মানুষের কানের ভিতর দিয়া সবমে পশিতেছে বেশী;—এবং এই পথটাই না কি সংসারের সকল যাত্রা-পথের চাইতে সব চেয়ে সোজা পথ, তাই তাঁদের কথার চেয়েও কাজের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লোকাভাবও ঘটিতেছে না। এই যে হিন্দুমানীর অচলায়তন-চূর্ণের কনকট দিয়া তৈরী রাস্তা, এর শেষে কোন দেবারতম তো নাইই,—চার্চ, মসজিদ, প্যাগোডা, এমন কি একটা ব্রহ্ম-মন্দিরও দেখা যায় না। এ পথ একেবারে উদ্ভাসভাবেই খোলা পথ। এ পথের যাত্রী ছেলে-মেয়েদের ব্রত, উপবাস, পূজার্চনা, প্রার্থনা, উপাসনা—কোন কিছুই করিতে হয় না। মহম্মদ বা খ্রীষ্টকে সম্মান প্রদর্শন করিতে কোন মুগলমান বা খুঁটান ছেলেমেয়েদের মনে লজ্জা হইবেনা; কিন্তু নব্যতন্ত্রের হিন্দু-সন্তানদের রাম বা কৃষ্ণের প্রতি মনে মনেও কোন শ্রদ্ধা সঞ্চিত থাকিলে, তাহা সবদে গোপনের চেষ্টা করিতে হয়। নিজের ধর্ম, নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার, নিজের দেশের রীতিনীতি,—এ সকলই শুধু বিদেশীদের কাছেই নয়, বিদেশী-ভাবাপন্ন আত্মীয়-কুটুম্ব, প্রতিবেশীর সাক্ষাতেও গোপন-চেষ্টায় পলে-পলে আরক্ত গুণ্ডা হইতে হয়। অর্ধোড়ক শব্দটা

কিন্তু হিন্দুর পক্ষে এ মহাপাপ। ধর্ম-শিক্ষার শিথিলতা দ্বারা দেশের ছেলেদের পক্ষে এ-সবও সম্ভব হইতেছে। নব্য-শিক্ষায় এই ব্যক্তিত্ববাদটা এতই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে, বাংলার একখানা প্রধানতম সংবাদপত্রে কোন নব্য শিক্ষিত এমন কথা লিখিতেও প্রশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন—“এতে বিশ্বাস বা ক্ষোভের কোন কারণ দেখি না। এ যে যুগ-লক্ষণ। এ যে বড় আশারই কথা। এখন আর তরুণের দল সবাই বাবা খুড়ো মামা মেসো পিসে মাষ্টারমশাই বা ঘুণধরা শাস্ত্রের কথায় ওঠ-বোস করতে সম্মত নয়।……বিনয় মানে দাসত্ব নয়।”

‘বিনয় মানে দাসত্ব’ না হইতে পারে; ঐচ্ছিক্য, অসংযমে, ধৃষ্টতায় কোন উচ্চবল নিহিত আছে, তাহা আমাদের মত সেকালে লোকেদেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আচ্ছা, “বাবা, খুড়ো, মেসো, পিসেকে” না হয় অসম্মানই করিলাম, সেটা সহজ বটে। কিন্তু মনিবের বেলা কেমন ব্যবহারটি করিব, সেটি তো কই জানা রহিল না?

এখন বোধ হয় সব চাইতে ইতর ভাষায় দাঁড়াইয়াছে। ছত্রিশ জাতে একসঙ্গে ছোয়াছুঁরি করিয়া না খাইতে পারিলেই এখন “ছোট প্রাণ” বলিয়া পরিচিত হয়। শিক্ষিত বা শিক্ষিতা কেহ ঐরূপ করিলে লোকে বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।

এর উপর অবস্থার চতুর্গুণ বায়ে ঋণগ্রস্ত ও অনর্থকী জীবন-যাপন নব্যশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইতেছে,—এ কথা পরম্পরেরই কিছু কিছু জানা এবং শুনা আছে। জিজ্ঞাসা করি, সেও কি এই ধর্মশিক্ষার নৈখিলাজাত নহে? ধর্ম মানুষকে কি শিক্ষা দেয়? বিশেষ বিশেষ মাজনুদের কথা ছাড়িয়া দাও, ধর্ম মানুষকে মানুষ হইতেই শিখায়। মানুষের পক্ষে মানুষের ধর্মই তাহার স্বধর্ম। এখন মানুষ বলিতে দ্বিপদবিশিষ্ট জীববিশেষকে বুঝাইলেও, মানুষের মধ্যে যে বস্তুটা মানুষ্যত্ব, সেটা শুধুই ওই আহা, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি জৈবধর্মই নহে। প্রাতে উঠিয়া সাহেবী অনুকরণে চা-বিস্কুট সেবন, মধ্যাহ্নে সাহেবী কায়দায় টেবিলে বসিয়া ডিনার খাওয়া, অপরাহ্নে খোলা গাড়ী বা মোটরে হাওয়া খাওয়া, মজার আপামর সাধারণ সকলকার সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, এবং মধ্যে ঠিক নিজের সম্মুখস্থ নরনারী লইয়া বিলাতী ধরণের আহা-বিহার ও আমোদপ্রমোদ করা (সমকক্ষ হইলেও সেকেলে সঙ্গীর্ণ রুচিগ্রস্তা অসভ্যাগণ ইহার বাহিরে নিজ দোষেই বাদ পড়িতে বাধ্য হন)—এ ভিন্ন যদি কখন উচ্চ ইংরাজ-সমাজে নিমন্ত্রণ ঘটিল তো কুইন মেরীর সঙ্গে ঠিক সমান পোষাকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য সর্বস্বপণে সচেষ্ট থাকাই মানুষের জীবনের আদর্শ নয়। যাহারা ঠিক এই নক্সায় চলেন না, অর্থাৎ আহা-বিহার বিষয়ে ক্রিষ্ণ সংযত, তাঁহারাও অস্বস্তি: মহারানী কুচবেহারকেও মজ্জায় লজ্জা দিতে যে বিশেষ ব্যগ্র নন, তাও ঠিক বলিতে পারি না।

মেয়েদের এই বিবিয়ানীর নেশা কাটাইতে হইবে। এই সর্বনেশে মোতাত ছাড়াইবার প্রধান উপায় ধর্মচর্চা। স্বধর্ম নিষ্ঠা ব্যতীত কি জ্ঞী, কি পুরুষ কাহ্নও চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফূরণ হইতেই পারে না। জ্ঞান ব্যতীত সঙ্গীর্ণতা দূরীভূত হয় না। আধুনিক মতে যে ইংরাজের সর্বপ্রকার অনুকরণেই চতুর্ভুতির প্রসাধনতাভের উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই ইংরাজের ধর্মনীতি অথবা রাজনীতি এবং সমাজনীতিও যে কতখানি সঙ্গীর্ণ ভিত্তির উপর সঙ্গীর্ণরূপেই সংস্থিত, তাহা ইংরাজ-চরিত্রাভিজ্ঞ

দূরদৃষ্টিম্পন্ন মনীষিগণের সহিত আলাপে এবং তাঁহাদের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেই জানিতে পারেন। আমি এখানে একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করিলাম। এ সময়ে মেহেরপুরে চাকরী করার সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুক্ এবং আমার পূজনীয় পিতৃদেব একটা গরমের দিনে কি একটা মোকদ্দমার তদারকক গিয়াছিলেন। অনেক ক্রোশ পথ ঘোড়া ছুটাইয়া ফিরিয়া আসিলে একটু বিশ্রামের পর পিতৃদেব ঠাণ্ডা হইবার জন্য মুখে চোখে ও কানে বারবার ঠাণ্ডা জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঐ সাহেবটি আমার পিতার সহিত বিশেষ স্নহদ্বন্দ্ব ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? ওরূপ করিলে কি শরীরের ক্রান্তি দূর হয়?” পিতৃদেব উত্তর করিলেন, “মুখে ও কানে জল দিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। আপনি করিয়াই দেখুন না।”

ইহা শুনিয়া সাহেব অঞ্জলি পাতিয়া জল লইলেন; এবং মুখের কাছে সেই অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়াও গেলেন; কিন্তু তার পরই কি ভাবিয়া সেই জলজলি ফেলিয়া দিয়া, একটা নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, “না, আমি ওরূপ করিতে পারি না; যেহেতু কোন ইয়োমোপিয়ান করেন না।”

স্বদেশীয়েদের অসাক্ষাতে এবং এক জন বিদেশীর সাক্ষাতে অতি সামান্য বিষয়েও নিজ সমাজে অপ্রচলিত এই সামান্য পরানুকরণের দ্বারা নিজের শাস্ত শরীরকে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য হইতে এই যে তিনি স্বচ্ছন্দে বঞ্চিত করিলেন, এবং এত বড় সঙ্গীর্ণ মতটাকে প্রকাশ করিতে এতটুকুও বিধাগ্রস্ত হইলেন না, এর কারণ উহারা জেতার জাতি। পরের ঠাকুরের চাইতে এঁদের নিজের কুকুরটার উপরেও শ্রদ্ধা বেশী। আর সে শ্রদ্ধা প্রকাশকে এঁরা গোরবের চক্ষেই দেখেন। যেহেতু এঁদের মনে আত্মসম্মান-বোধ জিনিষটা খুব স্পষ্টভাবে জাগ্রত আছে। আর ঐ টুকুর অভাব আছে বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়েপুরুষে নিজের ধর্মকে, নিজের সমাজকে পদে পদে বিদেশীর কাছেও লাজনা-কষাহত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হইতে অর্দ্ধপ্রবীণ পিতা সকলেই অর্দ্ধাচীন, অজ্ঞ, কুসংস্কারাক্ত; এবং নব্য শিক্ষার মূল-মন্ত্রই এই যে, পরানুকরণ করিতেই হইবে। যদি কোন ছেলে একটা ভাল পদ পাইলেন, দুইচারি শত টাকা

বাধা মাহিনা হইল (আর বিলাত-ফেরৎ হইলে
 তৌ আর কথাই নাই।) তৎক্ষণাৎ (অধিকাংশ
 স্থলে) একটা বাবুচি, সাহেব-বাড়ীর ফেরৎ তক্কা
 লাগান ছ'চারিটা খানসামা, একখানা সাহেবি-
 কামদার সাজান বাংলা গোছের বাড়ী (কলিকাতা
 হইলে সাহেবদের সহিত ভাগ করিয়া চৌরঙ্গী
 অঞ্চলের সাহেবী হোটেল বা ভাড়া-বাড়ীর একটা
 ফ্ল্যাট) এবং নিজের সাহেবী, ও স্ত্রীর শুধু সাদী
 খানা বাদ আর সমস্তই হাল ফ্যাসানের মেম-
 সাহেবের সঙ্গে সমান হিসাবে জুতা, মোজা, ব্লাউস,
 পেটিকোটের, চামরা বাসনের গাদা দিয়া নব-
 জীবনের মনোচরণ আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়েরা
 যারা তিন পাতা ইংরাজী পড়িয়াছেন, তাঁদের
 স্বপ্ন, স্বপ্নমাজ—কোন কিছুই ঋণ স্বীকার করিতে
 হয় না। তাঁহারা এ বিষয়ে স্থানে স্থানে পুরুষদেরও
 পরাজিত করিতেছেন। তা মেয়েরা শিক্ষিতা
 এবং স্বাধীনা হইয়া কি দেশের ও দেশের কোন
 কাজে লাগেন? উঃ! সমস্তে বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া,
 সে শিক্ষার সাধারণ্যে প্রচার-চেষ্টায় দরিদ্রের পর্ণ-
 গৃহে এঁদের অভ্যুদয় ইহারা কি কখনও কল্পনা
 করিয়াও দেখিয়াছেন? স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাগ্রহে শিখিয়া
 প্রতিবেশী দরিদ্রগণকে সে অমূল্য জ্ঞানদানে
 এঁদের কোনই আগ্রহ আছে? চিকিৎসা-বিজ্ঞা
 যথাসক্তি আয়ত্ত করিয়া (বিশেষতঃ হোমিও-
 প্যাথি ও বাইওকেমিক চিকিৎসা) রোগাতুর,
 দীন-হীন স্বদেশীকে আসন্নমৃত্যু ও রোগ-বন্ত্রণার
 হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার চেষ্টা ইহারা জীবনের
 পুণ্যতম ব্রতরূপে পালন করিতে চাহিতেছেন?
 লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ স্বদেশীর মুখের অনগ্রসররূপ
 বিদেশী পণ্য বর্জন করিতে কি ইহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
 হইতে পারিয়াছেন?—স্বদেশীর প্রতি অজ্ঞায় ব্যব-
 হারের প্রতীকারকল্পে স্বদেশীয় মহাপ্রাণ নেতার
 দ্বারা আহুত অনুরুদ্ধ হইয়াও এ দেশের সহস্র-সহস্র
 শিক্ষিত তরুণ-তরুণী নিজেদের দেহ-বিলাসের এত-
 টুকু ব্যতায় ঘটিতে দিয়া, দেশমাতৃকার সেবাত্রত
 গ্রহণ করিতে কি কিছুমাত্র চাকল্য প্রকাশ করিতে-
 ছেন? না,—কিছু না! কেন? যেহেতু, তাঁদের
 মধ্যের মনুষ্যত্ব আজ ধর্মশিক্ষার অমৃত-নিষেক
 অভাবে অচেতন মূর্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে।
 মাস্তমের মধ্যে যে শক্তি মনুষ্যত্ব, তাহা সর্ব-ভূতাদি-
 ষ্ঠিত চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। আধার যদি মলিন
 হয়, অভ্যুদয়ের অতি উজ্জল আলোকরশ্মিও বাহির
 হইবার পথ পায় না। আমাদের অন্তরের

আলোকও আজ তাই আমাদের লোভাতুর চিত্তের
 ঘন বেষ্ঠনীমধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আমাদের
 অমানুষ্যে পরিণত করিতেছে। আমরা শিক্ষা ও
 স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া শুদ্ধমাত্র বৈদেশিক
 বিলাসিতার সঙ্গে স্বদেশীয় আলস্যময় ভাবে জীবন-
 যাপনকে সংযোগ করিয়া, এক অপূর্ণ-সৃষ্ট জীব
 পরিণত হইতেছি। ধর্ম আমরা মানি না; কর্ম
 আমাদের লোকহিতকর, বা আত্মহিতসাধক নয়,
 মাত্র আত্ম-সুখ-স্বচ্ছন্দ্যবিধান জ্ঞান। আমাদের
 না ব্রহ্মতত্ত্ব, না বস্তুতত্ত্ব,—শুধু বিলাসতত্ত্বটাই শিক্ষা
 হইতেছে ভাল করিয়া। যে দেশে অসীম-শস্যায়
 বঙ্গল-বসনে বনবাসিনী ঋষি পত্নী ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা
 দিতেন, সে দেশের মেয়েদের আটপোরে নিত্য
 সজ্জায় একটা ইজের, গেঞ্জি, একটা সেমিজ, দুইটা
 পেটিকোট, একটা বডিস, একটা ব্লাউস, একখানা
 (অধিকাংশ স্থলেই) শান্তিপুরে, বড়জোর ফরাস-
 ডাকার ১২ হাতি সাদী, একখানা ক্রমাল, একজোড়া
 চটিজুতা,—এ তো চাই-ই। আর পোষাকীর হিসাব
 রাখিতে স্বয়ং একাউন্টেন্ট জেনারেলও? পারেন
 কি না সন্দেহ! নব্যশিক্ষিত পিতামাতার ছেলে-
 মেয়ের (বেবি ও মিসিবাবার দল) অসনে বসনে,
 শয়নে ভ্রমণে ইংরাজ-বাচ্চার সহিত বর্ণ ব্যতীত
 আর কিছুতে খুব বেশী প্রভেদ নাই। ঘরের মধ্যে
 খুশ্চান বা অর্ধ-খুশ্চান আয়ার সাহায্যে তাঁরা
 বাঙ্গালা বুলি শিখিবার পূর্বাবধিই ইংরাজী বুলি
 শিখিতে অভ্যস্ত। বাবা, মা, দাদা, দিদি—সকল-
 কারই আটপোরে পোষাকের মত অষ্ট প্রহরের
 ভাষাও ইংরাজী। যারা অতটা দূরে উঠিতে
 অক্ষম, তাঁদের একটা কথার মধ্যে অন্ততঃ আধ-
 খানার চাইতে একটুখানি বেশী বেশী ইংরাজীর
 বুকুনী দিয়া শোধান করা। যাদের আয় সহস্রার্ধ
 বা তাও নয়, তাঁদের চাল দেখিয়া কে না সন্দেহ
 করিবে যে, পিছনে অন্ততঃ মহারাজা বর্দ্ধমানের
 সিকি আয়েরও সম্পত্তি একটা আছেই। গাড়ী-
 ঘোড়া এ যুগে যার নাই, সে তো ছোটলোকের
 সাহিল। মোটর, এরোপ্লেন, সব্‌মেরিন—এ তো
 ইচ্ছা করিলে তুমি-আমিও চড়িয়া বেড়াইতে পারি!
 আবার দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের বাড়ীতে পশ্চিমে ঝড়ো
 হাওয়া এখনও এতদূর জোর করিয়া উঠিতে পারে
 নাই, তাদের মধ্যেও অশান্তির জের নেহাৎ কম
 নয়। বুড়াবুড়ীর দলকে (সম্ভবতঃ উত্তরাধিকারিণী
 অর্থ লাভের আশাতেই) স্পষ্ট লজ্বন করিয়া
 নব্যেরা নিজেদের বিজয়-নিশান উড়াইতেও সঙ্কুচিত;

অথচ মনের মধ্যে এই অধীন্যতাটা মরার বাড়ী খোঁচা দিতে দিতে জন্মটাকেই ব্যর্থ বোধ করাইতেছে। এই অবস্থার একটি মেয়ে, ভাস্কর সম্পর্কীয়ের নিমন্ত্রণে কতকটা আধুনিক সুখ-সম্পদে পূর্ণ গৃহে আগমন করিয়া, মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—

“এমন একখানা বাড়ী যার-নেই, এমন করে যে স্ত্রীকে রাখতে পারে না, তার গলায় মালা দেওয়ার চাইতে দড়ি দেওয়াই ভাল।”

অতঃপর হিন্দুনারীর কি এই আদর্শ দাঁড়াইবে? বিলাসিতা যদি দেশের এত বড় দুর্দিনেও দেশের মেয়েদের জীবনের এতখানি সারাৎসার হইয়া দাঁড়ায়, যাহাতে দেশের চরকায় কাটায়, মিলের তৈয়ারি মোটা সূতার মোটা সাড়ী পরিয়া মিলওয়ালাদের এবং তন্তুদার কুলের প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে না পারেন, নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবমত বিলাসিতা যথাসাধ্য বর্জন প্রতিজ্ঞায় বন্ধপরিষ্কার হইতে না পারেন, তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে, বিলাস-অলসিতা জীবন-ধাপনই ভারত-নারীর পুণ্যময় ত্যাগমহত্বে মহৎ চরিত্রের স্থানাধিকার করিতেছে না?

এ দেশে একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী নব্য নারী নারীমহিমাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিতেছেন। পতি-পুত্রের অস্তিত্বকেও যে এ দেশের নারী কত বড় প্রেমের বলে, ক্ষমার বলে সহনীয় করিয়া চলিতেন, আজও চলেন, ইহার মহিমা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। ইহার মধ্যে শুধুই দুর্বলের অনুপায়তাই দেখিয়া থাকেন। তাঁদের জন্তও তাঁরা ইংরাজী বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ-প্রথা চালাইতে চান না। কি? * আমার মনে হয়, ঐ সকল স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন নব্য লেখকেরা অধিকাংশই বিপত্নীক বা নিতান্ত গোবেচারী স্ত্রীর স্বামী। নতুবা ইবসেনের নোরা সাহিত্য-জগতে বা রঙ্গমঞ্চে মস্তবড় হিরোইন, বা বীর-চরিত্রা হইতে পারেন;—নিজের বরকন্নার মধ্যে ইহার আবির্ভাব, যত বড় সংস্কারকই হোন, কেহই পছন্দ করিবেন না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই—যাঁরা চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছেন, হয় তো মনে পড়িবে,—উহাতে যাহাকে ‘বিস্মৃষ্টো’ সৃষ্টি-রূপাৎ স্থিতিরূপা চ পালনে, তথা সংস্কাররূপান্তে—ইত্যাদি শ্লোকে, সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, সেই তিনিই আবার অন্ততঃ ‘দ্বিঃ সমস্তা সকলা জগৎ—

এই বাক্যে জগতের সমুদয় নারী-শক্তির কেন্দ্ররূপে স্তূত হইয়াছেন। অতএব নারীকে যে এ দেশে চিরদিনই অবলা ভাবে দেখা হইত না, এ কথা বলা চলে; এবং নারীও যে বাস্তবিকই অবলা নহেন, তাহা দরিদ্রের জীবনে নিয়তই সুপ্রত্যক্ষ। জাঁতাপেয়া মোট বহা, কুলী মজুরের কাজ করা—নারীর শ্রমের কোন্ কাজটা না আজও সর্বত্র গরীবের মেয়েতে করিতেছে? ইয়োরোপে, যেখান হইতে মেয়েদের সুখালস জীবনের ছাঁচ তৈরী হইতেছে, সেখানে কি? সেখানে দুই-শত চারিশত টাকায় নবাবের বেগম হওয়া চলে না, এবং ইয়োরোপীয়ের জীবন সেইখানেই অত্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছে। ছোটবেলা হইতে কশ্মে অভ্যাস থাকিলে, ক্রান্তি ও অবসাদ না বুঝিয়া, উহা হইতে স্বাস্থ্য ও আনন্দলাভ হয়। ময়দা-মাখা অভ্যাস রাখিলে, ডিস্‌পেপসিয়া দূর করিবার জন্ত ডাক্তারকে ডায়েল-ভাঁজার ব্যবস্থা করিতে হয় না। [অবশ্য তেমন তেমন গৌয়ার ডাক্তারও আছেন, যারা অনেকক্ষেত্রে বাটনা-বাটা বা কড়াই ভাঁজার প্রেসক্রিপশনও করিয়া বসিবেন।] অভিজাতবর্গ সর্বত্র সমান হইলেও, কি দৃষ্টান্ত দেখাইল এই জর্মানী ফ্রান্সের ধনি-সম্প্রদায়, ফরাসী মেয়েদের মত সৌখীন না কি পৃথিবীতেই ছিল না। সেই মহা-বিলাসিনী ফরাসী-মহিলারা মেথর-ডোমের কাজ হইতে মোটর এঞ্জিন এবং আফিস আদালত পর্যন্ত অত বড় রাজ্যটাই প্রায় চালাইল। রুসিয়ার ও জর্মানীর রাজকুমারীগণ কাপ্তানের পোষাক পরিয়া সৈন্যদল গঠিত করিলেন। আমাদের দেশের অবস্থায় আমরা পতিত দরিদ্রের বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান দিয়া, ঔষধ-পথ্য বিলাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে, নিজের মধ্যের পঞ্চদষ্ট মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারি না কি? মুসলমান বাবুর্জির হাতের চপ কাটলেট খাইলেই তাহাকে জাতে তোলা হয় না। তার রোগ-শয্যা সেবা করিতে সাহস হইবে কি? তার ঘরের পাশে শত-শত অন্নহীন, বস্ত্রহীন—আর সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ‘অন্ন-বস্ত্রের চেয়েও যাহা সমধিক দুঃখপ্রাপ্য বস্তু, সেই অমূল্য রত্ন-স্বরূপ বিদ্যাহীন মূর্খের দল কি জল-আচরণীয়, কি অনাচরণীয় জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে পশুবৎ বিচরণ করিতেছে,—তোমার ঘরে দাসত্ব করিতেছে. তাদের তুমি মানুষ করিতে কতখানি চেষ্টা করিতেছ? এ কি তোমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য? তাদের বিদ্যাদান, সুনীতিদান মানুষ হইতে সহায়তা দান, যদি করিতে পারো,

* তখনও যে কথাটা অসম্ভব ছিল, আজ তাহাও সম্ভবপর হইয়া আসিয়াছে। (১৩৩৫)

তবেই তাদের জাতিদান করা হইল। নতুবা নিজের পাকশালার পক্ষাশ মণ ভাতসিদ্ধ করিবার ভার দিলেও সে যে নীচ—সেই নীচই থাকিবে, এবং তাহার স্পৃষ্ট অন্নগ্রহণে তোমার মহিমা কিছুই বৃদ্ধি পাইবে না। এ কি তুমি পারো না, এ কি তোমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য? তুমি না বিশ্ব-শক্তির অংশ? বিশ্বেশ্বর না তোমার অন্তর-মন্দিরের চিরাধিষ্ঠাতা, তোমার শরীর মনের প্রত্যেক অণুপরমাণুটি পর্য্যন্তই না সেই সর্বভূতাদিদাসের অধিষ্ঠান-গৌরবে গৌরবময়! তবে কি, না তোমার সাধ্য? তাঁর মহান শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন তুমি ধর্ম্মকে সহায় করিলে পারো না কি?

তার পর 'জিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎহু।' সমস্ত জগতের নারীশক্তিই যে মহাশক্তির অংশ। অতএব নব্য বঙ্গের মেয়েদের ফুলের বিছানা বা (প্রিংগের গদী) পাতিয়া স্তম্ভপূর্ণে শোয়াইয়া রাখিবার কিছু মাত্র আবশ্যক করে না। তাঁদেরও জোর গলায় বলা চলে, 'উত্তীর্ণ জাগ্রত'—এবং উঠিলে ও জাগিলে বরপ্রাপ্তিও যে তাঁদের পক্ষে খুবই সুদূর-পর্য্যন্ত দুরীণ-স্বপ্ন, তাও আমার মনে হয় না। আমি দেখিতেছি, পতিত জাতির শিক্ষা, অর্দ্ধ-পতিত জাতি অর্থাৎ আমাদের নিজের ঘরের চাকর বাকরের উন্নতিসাধন, বিলাসিতার হ্রাসে অযথা ধনক্ষয় নিবারণ, অনাবশ্যক বিষয়ে বৈদেশিক অনুকরণ প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক কার্যের সমাধানই পুরুষের চেয়ে মেয়েদের হাতে। নিজের নিজের ঘরের ও সমাজের সেই সব জাল জঞ্জালগুলি যদি অন্ন-বিস্তার ঝাড়া-ঝুড়ি করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে আলো-বাতাস বড় কম পাওয়া যায় না। আর এই ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দিনে সেই কি সামান্য লাভ?

৩

আজকাল স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধে ছোটবড় সকল মাসিকই ভরিয়া থাকে দেখিতে পাই। পুরুষ লেখক ও নারী লেখিকা কেহ বা উদ্যম স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে, কেহ বা বিপক্ষে, মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুইটি দল হইয়া পড়িতেছে। অথবা ইহা নূতন নয়, জগতের সকল ক্ষেত্রে সেকলে ও একেলে, প্রাচীন ও নবীনের এ অভ্যাস আবহমানকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে, এবং চলিতেই থাকিবে। ইহা আশার কি নিরাশার কথা, তা অবশ্য জানি

না, কিন্তু সেকলে বা প্রাচীনের সম্মুখে ধ্বংস তো, কৈ এ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গেল না। তবে এ যুগের পর কি হয়, বলা যায় না। আমার পূজ্যপাদ ঔপিত্তদেব বলিতেন, 'যাহা প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলের নিদান, তাহার অপক্ষয় হয় না। যাহা অমঙ্গলের হেতু, তাহাকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না।' যদি স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে সামাজিক ও পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, যদি প্রাকৃতিক বিধানে নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষা হইবার যোগ্য হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতাবধি এই যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুরুষের অধীনতায় বাস করিতে হইত না। নিসর্গতঃ নারী-পুরুষের কার্যক্ষেত্র ভেদ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। স্বীকার করি আর নাই করি, শারীর বলে নারী ঠিক পুরুষের সমান হইতে পারে না। অবশ্য এক জন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, এক জন কন্মদেবী, এক জন জোয়ান অফ্ আর্ক, এক জন চাঁদ মুলতানা জন্মিতে পারেন; কিন্তু পুরুষের পৌরুষের উদাহরণ তো আর ওরূপ হৃদয়জনেই সীমাবদ্ধ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সর্বত্রই পুরুষ নারীর অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে। বলিবে, ও সব ক্ষেত্রে নারীকে কখনও স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। মানিলাম,—কিন্তু এই কিছুকাল ধরিয়া তো অনেক মেয়েই ছেলেদের সঙ্গে কলেজে বেটাছেলের শিক্ষা লাভ করিতেছেন; হুঁ একটা চাকরীও করিতেছেন। পাবার বেলায় কিন্তু তাঁদের নিকট হইতেও সেই একঘেয়ে প্রেমের গল্প, কবিতা বা এক আধটা স্বদেশী গান ভিন্ন আর কি পাওয়া যায়? যা সঙ্গত নয়, তা বলিতে গেলে চলিবে কেন? তার চেয়ে যেটা সঙ্গত ও শোভন এবং সামাজিক ও পারিবারিক বিপ্লবেরও বিরুদ্ধে, তেমন তাহেই মেয়েদের দাবীটা উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেইরূপ সুবিবেচনার সহিত সেটা পেশ হওয়াও চাই।

আমাদের যথার্থতঃ চাই কি? চাই উন্নতি। উন্নতি কাকে বলে? উন্নত হইলে মানুষ কি পায়? কিসের আশা করে? উন্নত জীবের জীবন সুখময়, না দুঃখ-বিড়ম্বিত? উন্নতির দ্বারা যদি পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সে উন্নতির আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে কি না? এই সকল বিষয় অতি উত্তমরূপে ও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, তার পর নারী-পুরুষের

শিক্ষা ও কার্যক্ষেত্রে একীকৃত করা বর্তব্য। জী-
শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াও নরনারীর কার্যক্ষেত্রে
একীকৃত করা অনুচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া
থাকেন; এবং তাঁহারা এই আজিকালিকার দিনে
অর্ধাচীরের দলভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।
কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আবহমান কাল ধরয়া
নবীনের পাশ্বে প্রবীণের, বিজ্ঞের পাশ্বে অজ্ঞের,
আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের একটা স্বভাব-নির্দিষ্ট
স্থান রহিয়া গিয়াছে। পৃথিবী যথেষ্ট দ্রুত চলিয়াও
ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়া নাই।

যাহা হউক, পুরুষোচিত জী-শিক্ষা ও মেয়ে-
পুরুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে সেকেলেদের যুক্তিটা
কিরূপ—একবার নিজের চোখ দিয়া সেটা দেখা
যাক :—

মেয়ে-পুরুষে যদি সমান শিক্ষা লাভ করিয়া
একই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তবে ঘর সংসারের
অবস্থা কিরূপ হইবে? এখনও সেকেলে শিক্ষার
কল্যাণে বুড়ী ও আধ-বুড়ী মা, খুড়ী, মাসী, পিসী
গোটাকতক জীবিত আছেন, এবং বোমা বা মেয়েদের
চাকুরী করিতে যাইবার সময় তাঁরা না হয় দিতেও
প্রস্তুত। কিন্তু যখন আর একপুরুষ পরে তাঁদের
তিরোভাব ঘটবে, তখন শুধু এই বোলসেভিক-বুগের
চাকর-চাকরাণীর হাত দিয়া কি ঘর-সংসার করা
ও ছেলে-মেয়ে মানুষ করিয়া তোলা সম্ভব হইবে?
সেকালের আদর্শ চাকর-চাকরাণীরা অনেকটাই
ছেলে-মেয়েদের মাসী পিসী বা দিদির স্থলাভিষিক্ত
হইয়া যাইত, এখন ত দেখিতেছি, তাহারা শুধু
বাহিরের লোকই থাকিয়া যাইতেছে। অবশ্য
ইহার জন্ত উভয় পক্ষেই দায়ী,—বয়স মনিবের
পক্ষই অধিকতর দোষী। দেশে যে অধিনয়,
বিলাসিতা ও আলস্যের স্রোতঃ বহিতেছে, ইহারাও
তাহার প্রকোপে পড়িয়াছে। স্বামি-স্ত্রী যদি একই
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া একই কার্যক্ষেত্রে যুগিয়া
বেড়ান, তাহা হইলে তাঁদের কল্যাণ-পুঞ্জের অবস্থাটা
কেমন হইবে, তাঁরা শুধু সেই কথাটাই ভাবিয়া
কুল কিনারা খুঁজিয়া পান না! অনেকে বলিবেন,
কেন, তখন সংসারের আশ্রয় বাড়িবে, এক জনের স্থলে
দশ জন দাসদাসী রাখা যাইবে। সেকেলেরা বলেন,
আরও যেমন বাড়িবে, ব্যয়ও তেমন বাড়িবে,—
তবে আর লাভটা কি দেখিতে পাইলাম? লাভের
মধ্যে এখন ছেলেরা বাপের নিকট শিক্ষা ও মেহের
অবকাশ বেশী না পাইলেও, মায়ের কাছে পায়,
—তাদের সেই সুখটুকুও হুয়াইবে। স্বামী জীর

হাতের অন্ন-ব্যাঞ্জে তৃপ্ত হ'ন, নীরস কর্মক্ষেত্রে
প্রাণান্ত শ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া প্রেমময়ী পত্নীর
মিষ্টবাক্য এবং শিষ্ট সেবায় শ্রমোৎসাদন করেন,
সেইটুকুই হারাইবেন। স্বামি-স্ত্রী দুজনেই এক
বা বিভিন্ন আফিসে কেরানীগিরী করেন, না হয়
স্কুল-মাষ্টারী করেন, না হয় ওকালতী বা ডেপুটী
ম্যাজিষ্ট্রেটী করিলেন ধরা গেল,—সন্ধ্যার সময়
বা পরে দুই জন দুই দিক হইতে শান্ত-ক্লান্ত, ও
হয় জঙ্গসাহেবের নিকট, না হয় কালেক্টর সাহেবের
নিকট, না হয় আফিসের বড় বা ছোট সাহেবের
নিকট তিরস্কৃত হইয়া আসিয়া দেখিলেন, বি
হাতবাক্তা লইয়া চম্পট দিয়াছে; বামুন ঠাকুর
বা বাবুজি মহারাজ হয় ত তাহার সঙ্গী। আর
একটা চাকর তাড়ি খাইয়া বেহুঁষ হইয়া পড়িয়া
আছে। ছেলে-মেয়েগুলি ক্ষুধায় কাঁদিতেছে।
একটার খুব জ্বর। এমন অবস্থায় সেই শিক্ষিতা
ও রোজ-গেরে জী কি করিবেন? 'জনম অবধি'
স্কুল-কলেজে পড়া ও চাকরী করায় পুরুষের মতই
তো! তাঁহার সংসারের খুঁটিনাটি কার্যের শিক্ষা
অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে? না, তিনি সব্যসাচী
হইয়া জন্মিয়াছেন? উনানে আগুন দেওয়া হইতে
রাগ্নাবাগ্না, পথ্য-সেবা সমস্ত জোগাইয়া রোগা ছেলে
লইয়া রাত জাগিয়া আবার পরদিন প্রাতে সেই
সমস্ত করিয়া আফিস ছুটিবেন? কর্ত্ত-গৃহিণীর
মধ্যে আফিস কামাইটা করিবেন কে? যদি
করার উপায় না থাকে,—রোগা ছেলেটিকে কার
কাছে দিয়া যাইবেন? প্রতিবেশী মেয়েদেরও তো
আফিস আছে, কলেজ আছে, কিছু না কিছু
আছেই আছে। তা ভিন্ন পরোপকার করার চালও
তখন চলিবে কি?

যখন এই ভাবের জী-শিক্ষার ও স্বাধীনতার
প্রচলন হইবে, তখন ত আর এখনকার মতন ইহা
মাত্র কুমারী মেয়েদের বা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই
সীমাবদ্ধ থাকিবে না। এত পরিশ্রমে এ দেশের
মেয়েদের রাংয়ের শরীর গলিয়া যাইবে
না তো? আমার তো সন্দেহ হয়। তার পর দাসী-
চাকরের হাতে অসহায় মাতৃত্যুক্ত শিশুর পালন
যেরূপ হয়, সেটা যে সাধারণের অবিদিত বিষয়,
তাহা তো মনে হয় না। অবশ্য শিশুপালনে স্নেহ
আমার হাতে দিয়া ছেলে মানুষ করার মত অধিক
অবস্থা সবারই কিছু হইবে না। একটি লেডী
ডাক্তারের মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম—

"ক্যাম্বোলে যখন পড়ি, তখনই আমার বড়

মেয়েটি জন্মিয়াছিল। ঘরে কেহই নাই, একটি পশ্চিমা দাইয়ের কাছে মেয়ে রাখিয়া যাই। মেয়ে দিন দিন যেন জড়ের মত হইয়া যাইতে লাগিল, চুপ্‌চাপ্‌ থাকে,—হাসে না, খেলে না, আমারও অবসর কম; মনে কার, অত কাঁচুনে ছিল, বেশ শান্ত হইয়াছে। এক দিন হঠাৎ স্কুলে গিয়াই ছুটা হইয়া গেলে, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, মেয়েটি ঘুমাইতেছে। ইচ্ছা হইল, কাছে গিয়া একটু আদর করি। তুলিতে গেলাম, মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিল না। ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিলাম,—একটি প্রতিবেশিনী ছেলে মেয়ে লইয়া বেড়াইতে আদিলেন; ছেলে-মেয়েরা গোলমাল করিতে লাগিল—তাহাতেও খুকীর ঘুম ভাঙ্গিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া, আবার তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম, মেয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। যতই নাড়াচাড়া করি, মেয়ে জাগে না। ভয় পাইলাম। নিজেও সন্দেহ হইল, এবং ডাক্তারও বলিলেন, ‘কোনরূপ মাদক দ্রব্য এই প্রকার অবস্থা ঘটয়াছে।’ দাইকে অনেক পীড়াপিড়ি করিতে শেষে সে স্বীকার করিল যে, সত্য-সত্যই সে খুকীকে রোজই একটু করিয়া একবার আফিম খাওয়ায়। বড় কাঁদে—কিছুতেই সামলাইতে পারে না, কি করিবে না খাওয়াইয়া? অন্তদিন আমি যতক্ষণে বাড়ী ফিরি, ততক্ষণে মেয়ের নেশা কাটিয়া আসে—শুধু ঝিমামো অবস্থাটাই থাকে, আজ অসময়ে আসায় এই বিপত্তি! ডাক্তার বলিলেন, ‘আমাদের অপেক্ষা করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে।’ বাস্তবিকই যথাকালে খুকীর সেই কুস্ত-কণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই দিনই দাইটিকে তড়াইলাম।”

তার পর? “তার পরে এমন ধারাটা ঘটে নাই বটে, তবে বুঝিতেই তো পারেন,—মা-হারী ছেলেরা একটু দূঃখেই মাতুষ হয়। ঠাকুরমা, দিদিমাও ঘরে নাই—তবে সকাল-সন্ধ্যায় যতটা পারি দেখি।”

অবশ্য এমন অনেক মা সংসারে আছেন, যারা কলেজে না গিয়াও, চাকুরী করিতে বাহির না হইয়াও, ছেলে-মেয়েদের দাসী-চাকরের হাতে ফেলিয়া রাখেন। অনেক ঘরে দেখা যায়, ছেলে দাসীর জিন্সায় শোয়, খায়, কাপড় পরে এবং খেলা করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চাকর বা দাসীরা ছেলেদের লইয়া গিয়া রান্না মহলে চাকর মহলে বা রান্নার ধারে তাদের গা খালি করিয়া ছাড়া দেয়। ছেলেমেয়েরা যত পারে কয়লা মাখে, ধূলা মাখে, যা-তা বুড়াইয়া খায়, পথের অভদ্র ছেলেমেয়ের

সঙ্গে মেশামিশি করে, তার পর বাড়ী ফিরিবার কালে কলের কাছে লইয়া গিয়া তাদের গায়ে, হাতে খানিক জল ঢালিয়া, জামা-জুতা চড়াইয়া দিয়া ঝি বা চাকর তাহাকে বেশ ফিটফাট অবস্থায় বাড়ী ফিরাইয়া আনে। তা হোক না কেন সে অরোরুগী, হোক না কেন তখন পুরা শীতকাল। মা দেখিলেন, তাঁর সখের ফ্রকটি ঝির তদারকে বেশ ভালই আছে। ভিতরের খবর ত আর হঠাৎ জানা যায় না,—দৈবাৎ যায়। এই তো ঝিয়েদের মায়ী-মমতা! আর তা হইবেইবা না কেন? বিশেষ যত্ন দিন না এ দেশে নিম্নশিক্ষা সার্বজনীন হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব উহাদের বোধগম্যও তো হইবে না। নিজেদের ঘরে নিজেরা যেভাবে কাটাইয়াছে, তাহাই তো তাহাদের আদর্শ। পূর্বে কতকটা বাধ্যতার গুণ ও এক স্থানে বহুদিন থাকায় তাহারা মুনিব বাড়ীর চালচলন কিছু কিছু শিখিয়া লইত; এখন সে দিন নাই, পাঁচ বাড়ীর তরকারী চাখিয়া বেড়ানই এখন লোকজনের ক্যাসন হইয়া উঠিয়াছে। এক বাড়ীতে স্থির হইয়া থাকে না, মায়া-দয়া ও হয় না, শেখও না কিছু। কাজেই আমার মনে হয়, মেয়েদের যদি পুরুষের সঙ্গে ঠিক এক শিক্ষা ও একই ভাবের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁদের মাতৃত্ব একান্তই ক্ষুণ্ণ হইবে। যদি তাঁহারা সুগৃহীণী ও সু-মাতাই না হইতে পারিলেন, তবে স্ত্রী-শিক্ষার সার্থকতা কি রহিল? শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর উপার্জনের সহকারিণী হইয়া সংসারের অনাটন যে বিশেষ কম করিতে পারিবেন, আমার তা মনে হয় না। যেহেতু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যেমন এক দিকে আর বাড়বে, তেমন অপর দিকে ঝি, চাকর, রাধিবার বামুন এবং উহাদের হাতে সমস্ত ভার দলে একগুণে দুগুণ খরচও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। তার উপর, এখন ঘরের মধ্যে যেখানে একটা সেমিজ-সাড়ীতে চলিয়া যায়, সেখানে আফিসের পোষাকে অনেকগুণ বেশী খরচ পড়িবে। পুরুষ কেরানীর একটা ধুতি পিরাগ উড়ানিতে, ছেঁড়া জুতার কাজ চলে। মেয়ে কেরানীর একটা ইজারগেজি, সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউস, সাড়ী, জুতা, মোজা রুমাল—এ নহিলে পুরুষ-মহলে বাহির হওয়া চলেই না; অধিকন্তু, নারীস্বভাব-স্বলভ সেগুলি সৌখীনও কতকটা হওয়া চাই। কোথাও যে এ সৌখীনত্বের ব্যতিক্রম নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু বিচারটা লোকে সমষ্টি ধরিয়াই করে।

যেমন যেমন পদার্থাদ্যাদার বুদ্ধি,—এই পোষাকে-
পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে অর্থব্যয়েরও তেমনই
বুদ্ধি হইবে, ইহা নিশ্চিত, এবং অসঙ্গতও
নহে। পুরুষ সবডেপুটী, ডেপুটী, সবজজ
উকীল যা পরিবেন,—ঐ-ঐ পদস্থার নারীর পোষাকে
অন্ততঃ তার ছুগুণ খরচ তো পড়িবেই,—বেশী না
হইলেই বাঁচি! পুরুষের একটা সূট হইলে সাত
দিন চলিয়া যায়—মেয়েরা কখনই এক কাপড়ে ছ
দিনের বেশী বাহির হইবেন না। নানা কারণে
মেয়েদের রোজগার তাঁর স্বামি-গৃহের সচ্ছলতা বৃদ্ধি
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ
আমার মনে হয়, মানুষের মনটাও গৃহে অর্থাগমা-
পেক্ষা স্ত্রীর নিকট স্নেহ-সহানুভূতির অধিকতর
প্রত্যাশী। এক সঙ্গে দুজনে খাটিয়া আসিয়া আছাড়
খাইয়া পড়ার চাইতে, কর্মকান্ত শরীরে প্রেমময়ী
পত্নীর হাতের স্নেহ পাওয়া—তার মাহিনার টাকার
চেয়ে স্বামীর পক্ষে অধিকতর লোভনীয় হওয়াই
বেন স্বাভাবিক বোধ হয়। জগতে এমনও অনেক
হতভাগ্য আছে, তারা হয় তো টাকাকেই সারাৎসার
ভাবে,—তাদের পরিচর্য্য অবশ্য আমার জানা নাই।
আমরা যা দেখিলাম, দেখিতেছি, তাহাতে ইহাই
বুঝিয়াছি—স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।
বিকৃত শিক্ষার ফল সু-ফল হইতে পারিবে না।
নারীকে পত্নী ও মাতা থাকিতে দিয়া, তাঁহার বৃত্ত
কিছু উচ্চশিক্ষার [High Education বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের আধুনিক শিক্ষাকেই শুধু আরি উচ্চ (মহৎ)
শিক্ষা বলিব না। অনেক আধুনিক শিক্ষিত অর্থাৎ
পাশ-করা ছেলেমেয়ে দেখিয়াছি, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি
এই শিক্ষা পাইয়াও এতই সঙ্কীর্ণ থাকিয়া গিয়াছে
যে, পাশ না করা অনেককে তার চেয়ে অনেক
বেশী উচ্চশিক্ষিত বলিয়াই মনে করি। যে শিক্ষার
মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ হয় না, তাহা ঠিক উচ্চ-
শিক্ষা নয়। পাশ-করান বিদ্যামাত্র।] পুরুষোচিত
স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হোক,—আমরা অর্থাৎ
সেকালেরা কোনই আপত্তি করিব না। শিক্ষিতা
স্ত্রী স্বামীকে সুখী করিবেন, সন্তানকে সুপালন
করিবেন ও সুশিক্ষা দিবেন,—তা না হইলে স্ত্রীশিক্ষার
কোন উপকারিতাই রহিল না। অশিক্ষিতা ও
সুশিক্ষিতার প্রভেদ কি রহিল, যদি সেই মায়ের
ছেলেমেয়েদের কোনমতে অনাথের মত “নাচিয়া
বাঁটিয়া” পরের হাতে মানুষ হইতেই হইল?
পুরুষের সহিত সমকক্ষতা করাই কি অতঃপর স্ত্রী-
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল?

হু'এক জনের লেখায় দেখিলাম, “যদি মেয়েরা
গৃহস্থালীর কার্য্য না শিখিলে দোষ হয়, পুরুষের
বেলায়ই বা হয় না কেন?” ইত্যাদি। হইবে
না কেন? অকর্ম্মণ্য পুরুষের নিন্দা বৈ কোথাও
থ্যতি নাই, তবে তা লইয়া যে পুলিশ কেস হয়
না, তার কারণ, তাকে সংসারের জন্ত উপার্জন
করিতে হয়; কাজেই তার কাছে একাধারে
সমস্ত গুণ সর্ব্বদা আশা করা যায় না। হাড়ভাঙ্গা
খাটুনির পর হাড় জুড়াইবার একটুখানি অবসর
দেওয়াও হয় তো ভদ্রতা বলিয়া বোধ এত দিন মেয়ে-
দের মনের মধ্যে ছিল। যে সব মেয়েরা বাহিরের
কাজ করেন, তাঁহারা ই বা সংসারের কতখানি
কি পারিয়া উঠেন,—সে খবরটা লওয়াও নেহাৎ
মন্দ নয়। [অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম কোথাও
থাকিতে পারে; কিন্তু হু'এক জনের কথা ধর্তব্যই
নয়। পুরুষের মধ্যেও “ভোলানাথ” শ্রেণীর লোক
খুবই বেশী দেখা যায় না।] আর এ না পারার
জন্ত আমি মেয়ে-পুরুষ কাহাকেও খুব বেশী দোষও
দিই না। কলিযুগের অন্নগতপ্রাণ নরনারীর
স্বাস্থ্য বেক্রপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাদের কাছে
অত্যন্ত বেশী আত্মরিক বলের আশা করাই
অত্যাশ্র। অতিরিক্ত শ্রম এ দিনে আর কাহারও
দ্বারায় চলিবে না। সুখাত্তের একান্ত অভাব,
পানীয় জলের দূষণীয়তা, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধগৃহে
বাস, সহরের ধূম, ধূলি ও রোগ-বীজাণু-পূর্ণ বায়ু-
সেবন, সব চেয়ে ভেজাল খাদ্য, মহার্ঘ্যতা এবং
আধুনিক যুগের “বস্ত্র-তত্ত্বতা,” তার উপর বর্তমান
শিক্ষাপ্রণালীর জঁতাকলে পিষ্ট, দুর্ব্বল শরীর,
অন্নায়ু, অসুস্থ, ছেলে-মেয়েদের সব দিক্ সামলাইয়া
বাঁচিয়া থাকা যে কত বড় কঠিন ব্যাপারে
পরিণত হইতেছে তাহা একটুখানি মনোযোগ
করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এর উপর ঘর বাহির
সমুদায় সামলাইতে গেলে, বেচারীরা হু'দিনের
আয়ু যে এক দিনেই শেষ করিবে। বিশেষতঃ,
সধবা মেয়ে, যারা সন্তানের মা হইবেন, তাঁদের
আবার এর উপর কত বড় এক-একটা ধাক্কা
আছে। পুরুষ “ভোলানাথ” প্রকৃতির যেমন হয়,
অনেক মেয়ে “কপালকুণ্ডলা” প্রকৃতিরও
তেমনি দেখিতে পাওয়া যে না যায়, তা'ও নয়।
জগতে সকল প্রকৃতিরই নারী-পুরুষ জন্মান
স্বাভাবিক, এবং এতে উত্তরবেই নিন্দাজনন হওয়া
সঙ্গত। কিন্তু প্রকৃতিকে তাই বলিয়া কে কবে পরা-
ভব করিতে পারিয়াছে? এ সব লেখক-লেখিকারা

দেখিতেছি একেবারেই ভাবে ভোর! মেয়েদের পক্ষ লইতে হইবে বলিয়া এতটাই লইয়া বসেন যে, শেষে সেই সহানুভূতির দাপটে মেয়েদেরই লজ্জায় পড়িতে হয়। মনে হয়, যেন কতকটা প্রচ্ছন্ন মোসাহেবীর ভাষা আসিয়া পড়িতেছে! ও জিনিস-টাকে সবাই কিছু পছন্দ করে না; অনেকে মস্ত পর্যন্ত করিতে পারে না এবং মনে মনে সন্দেহও করিয়া থাকে।

আমার মনে হয়, যদি চেষ্টা করিতে হয়, তবে যেটা মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব, সেইটার জন্তই করা উচিত। যা করিলে স্বাস্থ্যহীন ধ্বংসোন্মুখ জাতির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারে, ধর্মোন্নতি ঘটানো সম্ভব লাভের সহায়ক হয়, সেই শিক্ষার প্রবর্তন জন্ত সমবেত চেষ্টা ও যত্ন লওয়া কর্তব্য। মানুষ কখনও পরামর্শকরণের দ্বারা স্বাধীন হইতে পারে না। ভিন্ন জাতির, ভিন্ন সমাজের অনুকরণে সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতে গেলে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াই সম্ভব; অন্ততঃ, তার ফল ঠিক সফল হয় না। যেহেতু, সেই পূর্বোক্ত প্রাচীনের একটা দল কোন কঠিনমূল গুণাবিশেষের জায় একেবারেই তো মরে না। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাক—যদিই সেই দলটাকে সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ-পূর্বক একেবারে আগাগোড়া নতুন করিয়া সমাজটিকে গড়া যায়, তা হইলে হয় তো একটা বিরাট স্বৈচ্ছাতন্ত্র-সমাজ গড়িয়া উঠিবে মাত্র; কিন্তু সেটা ঠিক ভারতবর্ষীয় হইবে না।

এদেশের শাস্ত্রে ও সমাজে নারীর স্বাভাব্য লেখাপড়া করিয়া বর্জনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে যথেষ্টই গালি পাড়া হইতেছে; কিন্তু স্বাভাব্য-বর্জিত না হইয়াও কি ভারতীয় নারী যে কোন দেশের মহিলাগণের অপেক্ষা কোন বিষয়েই অবনত ছিলেন? রাজপুত-কণ্ঠাগণ পুরুষ যোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রে ‘প্যারেড’ না করিয়াই এমন শিক্ষা লাভ করিতেন, বাহাতে শত্রু-হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্ত যোদ্ধা-বেশে অস্ত্রধারণ করিতেও তাঁদের বাধিত না। ধর্মশিক্ষা এতই প্রগাঢ় ভাবে হইত যে, স্বধর্ম ও সম্মান-রক্ষার জন্ত সুখসাধপূর্ণ অতৃপ্ত মানবজীবনকে গুরু তৃণখণ্ডের জায় অনায়াসে হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিতা ছিলেন না। সেই সকল মনুষ্য-শাসিতা স্বাভাব্য-বর্জিতা বা বড় বড় সাম্রাজ্য পালনও করিয়াছেন, আজও অনেক মেয়ে পুরুষোচিত শিক্ষা না পাইয়াও শুধু

মেয়েলী শিক্ষার মধ্যে থাকিয়াও স্ফূর্ত ভাবে ও মীদারী চালাইতেছেন, অবশ্য তার জন্ত পুরুষ কর্মচারীদেরও সাহায্য লইতে হয়। নারী-স্বাভাব্য অর্থ এমন নয় যে, নারীকে পুরুষের সঙ্গে চুলে চুলে আঁচলে আঁচলে গ্রহি দিয়া বেড়াইতে হইবে।

আমার তো মনে হয়, হুকুম দিয়া বাহিরের স্বাধীনতাই লোপ করা যায়; অন্তরের স্বাধীন বৃত্তিগুলির উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিবার পারে না। তা যদি পারিত, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতে বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং এই সে দিন মাত্র যে বিপ্লবময় যুগের অবসান হইল, সেই সকল যুগেই প্রাথমিক শ্রেণী শ্রেণীভিত্তিক মহিমাময়ী মহিলাগণের অভ্যুদয় হইতে পারিত না। কারণ, নারী-স্বাভাব্য-বর্জনের আদেশ তো আর আজ দেওয়া হয় নাই। সে তো সেই আদিযুগেই হইয়া গিয়াছে। মেয়েদের স্বাভাব্য-বর্জিত হইতে নিষেধ করিয়া শাস্ত্র তাঁদের স্বাধীনতার পথে যে কাঁটা গাড়িয়া দিয়াছেন, এমন তো প্রমাণ পাই না। পিতা, পতি, পুত্র সং হইলে, তাঁদের মধ্যে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও মনের স্বাধীন ক্ষুধা আবার সেই রকমই হইতে পারে। আসলে, সমস্ত সমাজকেই উন্নত হইতে হয়, নতুবা নর কিম্বা নারী কাহারই শিক্ষা সমান হইতে পারে না।

আমার কথা এই যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হউন,—পারেন তো পুরুষের চেয়ে অধিকতরই উচ্চ-শিক্ষিতা হইতে চেষ্টা করুন; সে খুব সুখের কথা। কিন্তু তাঁর পুরুষ হইয়া কাজ নাই, সংসারের কর্তার তিনি সহধর্মিণীই থাকুন। ছেলেদের গর্তধারিণী মাত্র না হইয়া “মা” হোন। আর ইহাতেই সংসারের শান্তি নির্ভর করিতেছে।

তবে কি এই অর্থ-সমস্তার দিনে মেয়েদের উপার্জনের কোথাও কোন প্রয়োজন নাই? তা’ যথেষ্টই আছে, এবং পূর্বেও ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে এই প্রথা চিরদিনই প্রচলিত রহিয়াছে। যে সমাজ যতটা উন্নতিলাভ করে, স্ত্রী ভবিষ্যদৃষ্টি তাহার ততটাই বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ এক দিন জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংস্কারক তাঁর দূরদর্শন-শক্তির দূরদীক্ষণ-সাহায্যে অনেকখানি বিবেচনার সঙ্গেই নর-নারীর কার্যক্ষেত্রে এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সকল দেশেই জাতীয় উন্নতির সহিত সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা একান্ত ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। যে জাতি যতটা বেশী উন্নতি লাভ

করিয়াছিল, তারই সমাজে ততটা বেশী আঁটাআঁটি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইজ্জত থাকিলেই লোকে সেটা রাখিবার চেষ্টা করে। যার নাই, সে কি রাখিবে? আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে—‘নাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।’ আমাদের এখন সত্যকার মর্যাদা কুরাইয়া গিয়াছে বলিয়াই পাঁচ জনের পাঁচটা দৃষ্টান্ত দূরে বসিয়া দেখি, আর সেই তালে তাল দিয়া নাচিয়া উঠি। আমার মনে হয়, মেয়ে-পুরুষের একত্র শাণীর পরিশ্রমের ব্যবস্থাটা উন্নতির চিহ্ন নহে, উহা উন্নতাবস্থা হইতে অবনত হওয়ারই লক্ষ্য। মেয়েরা যদি পুরুষের সহিত চাকরী লইয়া টানাটানি না করে, তবে কেমন করিয়া এই অর্থ-সমস্যার দিনে সমস্তাপূরণ হয়? অনাথা বিধবাগণ আত্মীয়-গৃহের “লাখি ঝাঁটা” খাইতে এ যুগে তো স্বীকৃতি নহেন,—ভীরা করিবেন কি? আমরা বলি, আপনার লোকের লাখি-ঝাঁটার চাইতে মনিরের লাখি-জুতা মিষ্ট লাগিলেও তাহার কিছুই খাইয়া কাজ নাই। পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া এই চাকরী-সমস্যার দিনে চাকরীর চেষ্টায় না ফিরিয়া যে জিনিসটা এ দেশে এখন প্রধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যে জন্ত অনেক দূরদর্শী হিতকামী লোকে ছেলেদেরই পাশের পড়া ও হাতের চাকরী ছাড়িয়া আসিয়া বোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন, সেই কুটীর-শিল্পের (Cottage Industry) দিকে তাঁহারা মনোযোগী হইলেই তো পারেন? পূর্বেও ভদ্র-ঘরের মেয়েরা খুব মিহি সূতা তৈরি করিত। আজও চেষ্টামাত্রে তাদের হাতে অতি সুন্দর সূতা বাহির হইতেছে [আমার একটি সহোদরা জমীদার-পত্নীর কাটা সূতা দেখিয়া জ্বোলারা বলিল, ‘এমন সূতা আমাদের হাতে বাহির হয় না। আমার কত্তা নিজের হাতের কাটা সূতায় তাই ও বোনপো-দের জন্মদিনের কাপড় বুনাইয়া পরিতে দিয়াছে এবং সেও কিছু মন্দ হয় নাই।] ইচ্ছা করিলেই অনেক মেয়ে শুধু সখের জন্ত নয়, প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যেও এই কার্য্য ও এইরূপ অস্ত্রান্ত অনেক কার্য্যই ঘরে বসিয়া বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। ইহাতে আত্মীয়ের বা কালেক্টর সাহেবের বা বড়বাবুর ছোটবাবুর কাহারই অধীন হইয়া থাকিবার প্রয়োজন ঘটিবে না, অথচ হাতেও দু পয়সা আসিবে, দেশেরও মঙ্গল।

তবে কি সবাই ঐ একই কাজ লইয়া মাতিবে,

বলিতে চাও? পারিলে তো ভালই হইত, তা তো আর সম্ভব নয়! এত ধৈর্য্যও সবার নাই। আর এ দিকে সবারই শক্তিও সমান থাকে না,—প্রবৃত্তি তো থাকেই না। অল্পশিক্ষিতা অধিকাংশের জন্তই এই পথ উচিত পথ বলিয়া মনে করি। শুধু চরকা-ভাঁতই নয়; কাটা, কাপড়ের, বোতাম তৈরির, মোজা, গেঞ্জি, জুতার ফিতা বুনিবার কলের দাম খুব বেশী নয়, সেই সব কল আনাইয়া, তাহারই সাহায্যে এদেশে শিল্পবৃদ্ধির চেষ্টা এবং নিজেদেরও অভাবমোচন হইতে পারে না কি? অনেকে এ সব যে করে না তাও নয়,—উপার্জনও বেশ হইয়া থাকে মনে হয়। এখনকার দিনে ভাল ভাল কাট-ছাঁটের জাকেট, ব্লাউস, বডি, ফ্রক তৈরি করিতে শিখিলে, প্রত্যেক পাড়ায় বোধ করি দুখানা দোকান চালাইতে পারা যায়। দর্জীদের তো ডাকিয়া ডাকিয়া কখন সহজে পাওয়াই যায় না,—এতই তারা কাজে ব্যস্ত! অথচ কাজ তাহারা কতই জঘন্তভাবে করে, প্রায়ই কাপড় নষ্ট করিয়া দেয়। আমার মনে হয়, অভাবগ্রস্ত মেয়েদের এটি একটি ভাবিবার বিষয়, এবং এ বিষয়ে দেশে অভাবও রহিয়াছে। কেরাণী উকীলের তায় দর্জি সস্তা হইয়া পড়ে নাই, কাজেই বিশেষভাবে কাহারও অন্ন কাড়িয়া খাওয়া হইবে না।

মেয়েদের কতকগুলি পদের প্রয়োজন এ দেশে ছিল এবং চিরদিনই থাকিবে; যথা লেডী ডাক্তার। আমার মনে হয়, এ পদে আরও মেয়ে চাই এবং তাঁদের উন্নতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। লেডী ডাক্তার এখনও সর্বত্র সুলভ নহে; অথচ ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কতই অধিক। বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্ত লেডী প্রিন্সিপাল, টীচার প্রভৃতিরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল ও আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তবে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থার উপর আমাদের একটুখানি আপত্তি আছে। আমাদের মতে, মেয়েদের যখন নৈসর্গিক ব্যবস্থায় পুরুষ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র থাকিতেই হইবে, না থাকিয়া যখন উপায় নাই, [মনে করুন, সবার মেয়েই তো আর কুমারী হইয়া থাকিবেন না, পরের চাকরী করিলেও যদি বা ছুটি থাকে তো উকীল ব্যারিষ্টারের তো মোটেই ছুটি নাই। অঁতুড় ঘরে বসিয়া তো আর মকেলের জন্ত ‘বহস্’ করা চলিবে না, আর যদি পশ্চিমের ঝড় আরও বেগে বহে, বিবাহ-প্রথা এ দেশেও উঠিয়া যায়,

সমাজ-বন্ধন ভাঙিয়া চূর্ণ হয়, তথাপি নারীরও হৃদয়। যে একেবারেই সমূলে বিনষ্ট হইবে, এমন ভরসা হয় না।] তখন তাঁদের শিক্ষা, সহবত—সমস্তই কতকটা নারীভাবাপন্ন করাই কি ভাল নয়? [অবশ্য যারা চির-কৌমর্য্য-ব্রতাবলম্বিনী হইবেন, সে করজনের কথা এ স্থলে বলা হয় নাই। তাঁরা যেরূপ ইচ্ছা চলিতে পারেন এবং চলিয়াও থাকেন। বিচার সমষ্টি ধরিয়াই করিতে হয়]। পতির পত্নী এবং সন্তানের মাতা যখন তাঁহার হওয়া অনিবার্য্য, তখন গৃহিণী ও জননীর কর্তব্য না শিখিয়া তাঁহার উপায় কি? ঐ দুইটি পদের কর্তব্য কি এতটাই সামান্য যে, সে সম্বন্ধে কিছু না শিখিলেও উহার সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায়? তবে সংসারে এত অশান্তি কেন? পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রীকে দ্বৈত্যাগ করিয়া হাবভাবময়ী পরকীয়ার প্রতি লুক্ক হয় কেন? সন্তান বালাবধি ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতি-শিক্ষার অভাবে কুসন্তানে পরিণত হয় কেন? পত্নী এবং মাতা যদি অশিক্ষিতার পরিবর্তে অফলা-বিদ্যায় শিক্ষিতা হইলেন, তাহাতেই বা তাঁহার পতি-পুত্র কতখানি লাভবান হইবেন? তাই বাল্য-যৌবনে বিদ্যাই হউন; কিন্তু তাঁরা মেয়ে থাকুন, তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই—এইটুকুমাত্র তাঁদের কাছে অনুরোধ। জগতে পুরুষের সহিত সমকক্ষতা-লাভই যে উন্নতির চরমোৎকর্ষ, এমনও মনে করিবার কিছু দেখি না। যাহাতে প্রকৃত উন্নতিলাভ হয়, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই—সেই শিক্ষালাভের উপায় অন্বেষণ করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চ জ্ঞানতা, স্বচ্ছাচার কাহারও প্রক্ষেপেই অনুকরণীয় নহে। আজ সেই উদ্দাম স্বচ্ছাচারিতার ইরোপীয় সমাজই সমগ্র ইরো-পীয় জাতির মধ্যে চিন্তাশীল মনীষিগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া তুলিতেছে—তাঁদের রচনার মধ্য দিয়া তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ তাহারই মোহে বাহিরের বাতাসে মত্ততার অন্ত নাই! জানি, পুরুষের তিতর স্বচ্ছাচারিতা নারীর চেয়ে অধিক, [অবশ্য এটা ভ্রমসমাজেই; নতুবা নিম্নসমাজের নারী-পুরুষে প্রায় সমান স্বচ্ছাচারী। তাড়ি থাইয়া মাদল বাজাইয়া অকৌলঙ্গ নর-নারীর উদ্দাম নৃত্যও দেখিয়াছি, আর আজ একে নিকা, কাল তাকে সাজা করিতেছে, তাও নিত্য দেখিতেছি।] এটা সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্তই হয় তো বা পুরুষেরই স্বার্থপরতাপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা গঠিত। আমি বলি, তাই যদি হয়, তথাপি এই অনাচারেরই

বিরুদ্ধে মেয়েরা আপত্তি করেন কোন্ মুখে? “তুমি যদি বাইজী লইয়া বাগানে চলিলে, তবে আমিও একটা বাবুজী লইয়া রাস্তায় বাহির হইব।”—অতঃপর মেয়েরা এইরূপ কথাও কি বলিতে চাহেন না কি? এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুরুষের উচ্চ জ্ঞানতার প্রশ্রয় আমি আদৌ দিতে চাহিতেছি না, এবং পতিতা নারীর জ্ঞান পতিত পুরুষও যে সমাজের অঙ্গে দুষ্টব্রণবৎ—ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে আমার আদর্শ ও উপ-দেষ্টা আমার পিতামহদেবের জীবনচরিত হইতে তাঁহার মতামত তুলিয়া দিতেছি; * তাহাতেই আমার যুক্তির প্রামাণিকতা জানা যাইবে। কিন্তু সমাজের একটা অংশে দুর্ব্বলতা বা অসংযম আছে বলিয়া যে অন্তটাকেও সেই দিকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, আমি এ হীন প্রতিশোধের পক্ষপাতী নই। “মানুষ অত্যাচার বুঝতে পারলে, জ্ঞান অজ্ঞান নির্বিচারে নিজের ক্ষতি করে ও অনেক সময়ে প্রতি-শোধ নিতে চেষ্টা করে থাকে—এটিতে তার ধর্ম্ম-অধর্ম্ম দেখবার (!!) বা নিন্দা-প্রশংসা কিছু করবার নেই। এতে শুধু দেখতে পাওয়া যায়, উৎপীড়িত মানবাত্মার ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে আত্মহত্যা। এ আত্মহত্যা দেহের নহে—মনের। কিন্তু এই যে বিদ্রোহ, এই যে প্রতিশোধম্পৃহা, এটিতে কি বিশেষ ভয়ের কারণ আছে?” ইত্যাদি। আমি অবাক হইয়া ভাবি,

* কোন সুশীলা পতিব্রতা পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যার ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত পতি পরদার-রতি হইতে উপদংশরোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই রোগ পত্নীতে সংক্রামিত করিয়াছিল। ধৈর্য্যশীলা এবং লজ্জাশীলা ব্রাহ্মণ-কন্যা ঐ প্রকৃত রোগের কথা কখন কাহাকেও বলেন নাই, পতির কুচরিত্র গোপনে রাখার জন্ত নিজে অসহ্য যন্ত্রণা বৎসরের পর বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ শুনিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে বিশেষ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন—“পরদাররত স্বামীর সহবাস না করিয়া পতির কুপথ পরিত্যাগ এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্ত হিন্দুনারীর ব্রত ধারণপূর্ব্বক দেবারাধনায় রত থাকাই ধর্ম্ম। কোন ইউরোপীয় রাজকুমারের দেশ-ভ্রমণকালে বাইজী-সংস্রব প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, তাঁহার রাজবংশীয়া পত্নী দীর্ঘকাল পৃথক্ আবাসে বাস করিয়া নারী-মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।” ভূদেব-চরিত দ্বিতীয় ভাগ অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

অপরিণত বালিকা, বিশোরী ও বুবতীবৃন্দের তরল চিত্তে এ কি আগুন জ্বলান! মানুষের মন স্বভাবতঃ দুর্বল, সুখস্পৃহ ও নিয়গামী—‘জীবনাস্ত গতি-মিত্য নিয়গাস্ত নিসর্গতঃ’—সেখানে “নিয়মের” “সংযমের” “কোন প্রকার বন্ধনের” প্রয়োজন নাই, এ কি স্থিরমস্তিষ্ক নরনারী অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারেন? এই বন্ধন শুধু কি নারীর উপর অস্ত্রায় করিবার জন্তই ব্যবহৃত হইয়াছে? এমন তো মনে হয় না, প্রমাণও নাই। সকল নারী ও নরই সমাজবন্ধনের অধীন। বন্ধন নহিলে সমাজ বলিয়া পদার্থই তো থাকে না; আহ্মি কাল দেখা দেয়। নারীর মধ্যে যদি শক্তি থাকে, যথার্থতই তিনি যদি ধার্মিক ও তেজস্বিনী হন, যদি অন্তর হইতে বিতৃষ্ণায়হীন সঙ্গ করিতে না পারেন, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজগৃহে আগত মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মহাবীর জায় স্বধর্মত্যাগী (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন মহাপাতক) স্বামীর সহিত অপরিচিতব্য ব্যবহার করিতে পারেন; নিজে কিন্তু পাপাচরণ দ্বারা প্রতিশোধ লইতে পারেন না। বলিবে, এ দেশের সতীত্বের আদর্শ ইহাতে হয় তো খর্ব হইবে, সমস্ত পতিগণ ইহাতে লাঠী লইবেন। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না। অবশ্য এ দেশে নারীর সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের আদর্শ অপরিমীমই ছিল। ব্যভিচারী স্বামীকেও স্ত্রী বহু স্থলে ভক্তি-প্রীতি করিয়া থাকেন, দেখা বা শুনাও যায়; কিন্তু সেটা কি শুধু পুরুষে জবরদস্তিরই ফল, না তার মধ্যে হৃদয়-বৃত্তিরও কোন খেলা আছে? শুধুই লোকলজ্জা, না নারীর নিজেরও কোন স্বার্থ, কোন সুখ ইহাতে নিহিত থাকে?—সেই সকল নারী এবং তাঁদের হাতে পূজা পাওয়া পুরুষেরা হয় তো ঐ তেজস্বিনীকে দোষ দিবেন, কিন্তু ধর্ম যে তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা জোর করিয়াই প্রমাণ করা যায়। যেহেতু, যেমন নরের, তেমনি নারীর পতিত বা পতিতা কাহাকেই যে সমাজ-অঙ্গে সন্তান-সন্ততি উপহার দেওয়া সম্ভব নহে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত। উভয়ের মধ্য হইতেই বিষদ্রষ্ট সন্তানের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক; এবং সে বিষ সমাজ-অঙ্গে সঞ্চারিত করিতে কাহারই অধিকার নাই। বলিবে, তবে পুরুষের পাপ সমাজ সহিয়া লইতেছে কেন? আমি বলিব, সমাজ আজ কোথায়? যখন প্রকৃত জীবন্ত সমাজ ছিল, তখন না কি পুরুষের পাপেরও যথা-সীতি বিচার ও শাস্তি হইত। শাস্ত্র-সকলের মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরুষের

পক্ষেও ব্রাহ্মণের শূদ্র-সংসর্গ, অগম্যাগমন ইত্যাদি মহাপাতকের মহা-প্রাশস্তিত্বের বিধান কি কঠোর-ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিয়া লইবেন। নিজ-ভার্য্যাকে ক্রোধবশে ব্যভিচারিণী বলিলে, কস্তার বিব্র করিলে, জীধন দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, এমন কি, অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি শারীরিক অস্ত্রাচরণ করিলেও পুরুষ প্রাশস্তিত্যই হইতেন। পুরুষের শাস্তি যদি সমাজ-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল, তবে নারীর পাপের শাস্তি এখনও কেন সমাজ হইতে উঠিয়া যায় নাই? একেবারেই কি উঠে নাই? কতকটা গিয়াছে বৈ কি? যাত্রা অতই খবর রাখেন, তাঁরা এটাও কি রাখেন না? আজকাল অনাচার-ব্যভিচারের জন্ত কে কোথায় সমাজে “একঘরে” হইয়া আছে? তবে পুরুষের পাপের চেয়ে নারীর পাপকে আমিও সমধিক নিন্দিত ঘণিত বলিয়া মনে করি;—নারী মাতা—সন্তানকে তাহার শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়; সন্তানের বাল্য, এমন কি, কৈশোর-শিক্ষা অবধি তাঁহারই হস্তে। তাঁহার সকল কার্যই সর্বদা সান্নিধ্য বশতঃ সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। তাঁহার শরীর-মনের পবিত্রতা সমধিক পরিমাণেই থাকার প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

যে মন্দ আছে সে আছে, তার জন্ত আমি মন্দ হইতে চাহি না। বরং যদি ক্ষমতা থাকে, মন্দকে ভাল করিবার কোন উপায় করিতে পার, কর। কিন্তু সে উপায়—পুরুষের প্রতি প্রতি-শোধে পুরুষ হওয়া নয়; অভিমানে আত্মহত্যাও নয়। এই যে আত্মহত্যা রোগের সংখ্যাতিত আধির্ভাব হইয়াছে, ইহার মূলেও কি আজকালের ধর্মহীন নীতিহীন কুশিক্ষা ও মেয়ে-পুরুষের এই সব উত্তেজনামূলক প্রবন্ধপাঠের কার্যকারিতা নাই? আমার মনে হয়, কিছু আছে। বস্তুতঃ সকল কার্যই দূরদর্শনের সহিত সহিষ্ণুভাবে কর, কোন কার্যই তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি করিতে নাই।

আমাদের সমাজে নরী-নিগ্রহ নাই—এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু আমি এ কথা বলি যে, ‘যতটা রটে, তার কিছু কিছু বটে’ অত্যধিক (too much) কিছুই ভাল নয়। জন্মান বুদ্ধের সময় ও বিছু পরে পর্যন্ত যেখানে যে কিছু সন্ধিৎ ব্যাপার ঘটত, ইংরেজেরা ভ্রম্মাণের ঘাড়ে তার দায় ফেলিত। তেমনি নারীর হুঃখ আছে বল-র্যাই যে তাদের সকলই হুঃখ, আর পুরুষের সবই সুখ,

তারাই ভয়ানক অত্যাচারে জর্জরিতা, আর পুরুষ, নিজের স্বার্থের খাতিরে তাদের নিজের 'সেবা-দাসী' করিয়া রাখিয়াছে, এমন সব কলন সংসার-নভিজতার পরিচায়ক মাত্র—কলনা-কুশলতার পরিচায়ক। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাটা দোষ রাখিয়া, করা হয় না, গুণানুসারেই করা হয়। পরে হয় ত জাতীয় উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দোষ-গুণের প্রাবল্য দেখা দেয়;—সেগুলি ধৈর্যের সহিত বিবেচনা-পূর্বক সংশোধন করিয়া লইতে হয়। তার চেষ্টা না করিয়া তার উপর নিজেদের কলনাকে উদ্ভাস করিয়া দিয়া কতকটা টানিয়া আনা অভাবের সৃষ্টি করিলে হৈ-চৈ লাগে মন্দ নয়, কিন্তু সমস্তার সমাধান হয় না। পুরুষকে জাতি তুলিয়া গালি দিয়া নিজেদের জ্ঞা-রসনা-সম্বন্ধীয় নিন্দার সপক্ষে ভোট দেওয়া হয় মাত্র। সমাজের সব প্রথারই নারী-নির্যাতন উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় না। যেমন এই বর-পণ প্রথাটি ভাল নয়; কিন্তু বর-পণ্য প্রথাটার সৃষ্টি হইল কোথা হইতে? না, এ দেশের মেয়ের পিতৃ-ধনের উপর কোনরূপ অধিকার নাই, অথচ বিবাহের সময় 'দেয়া বরাদ্দ বিড়বে ধনরত্নসম্বিতা' ইত্যাদি বাক্যে কিছু ধনরত্ন দিবার আদেশ আছে। বরের বাপ সেই দাবীটার উপর জোর চালায়, সে-টা কি ঠিক নারী-নিগ্রহ? না নরনিগ্রহ? এবং অনেক স্থলে কন্ডার পিতা সুযোগ পাইলেই মেয়েকে ফাঁকি দিয়া থাকেন, এও দেখা যায়। সেই অন্তায়টুকু ঘটে বলিয়াই বরের বাপের ঘারাতেও এই বরপণ আদায় করা রূপ অন্তায় কার্যটি অহুষ্ঠিত হয়। এ পণ আদায় কেহ মেয়ের কাছে করে না, এবং শ্বশুর-বাড়ীতে বধু যে নিগ্রহ ভোগ করে, তাহার সাড়ে তিন ভাগ বধুর শাওড়ীরই হস্তে। আমি ত দেখি, পুরুষের অপেক্ষা অপ-রের উপর অন্তায় অত্যাচার করিতে নারীর শক্তিই অধিকতর কার্যকরী। এ প্রথার যদি উচ্ছেদসাধন করিতে চাও, ধর্মমূলক জ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তনজন্ত সচেষ্ট হও। এ দেশে শিশু-মৃত্যুর হার বড় বেশী বলিয়াই জানা যাইতেছে, তাহার ফলে জাতীয় ধ্বংস অনি-বার্য। যাহাতে জননীগণ সুস্থ, সবল ও শিশু-পালনে অভিজ্ঞ হইয়া এ দেশের এই শোচনীয় মহা-মারী নিবারণ-চেষ্টায় প্রাণোৎসর্গ করিতে পারেন, সেই শিক্ষা ও ত্যাগের জন্ত যত্নবতী হউন। সংসারে যদি অর্থ-সচ্ছলতা না থাকে, মহাত্মার মহাবাণীতে কর্ণপাত করুন,—সমস্ত অবসরকালে চরকা, তাঁত, কাটা-কাপড়ের কাজ, বিবিধ শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত করুন। ধাত্রী-বিঠা এমন ভাবে শিক্ষা করুন,

যাহাতে 'কেস্টা' সামান্য একটুখানি শক্ত হইলেই অমনি পুরুষ ডাক্তার না ডাকিতে হয়। [হু এক জন প্রায় পুরুষের সমকক্ষা নারী এ যুগের পূর্বযুগে কলিকাতায় ছিলেন, এখন এক জনও নাই।] এত পরিমাণে শিক্ষিতা লেডী ডাক্তার পাওয়া যাক, যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই তাঁহারা সুলভ হইতে পারেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্ত অনেক সময় বহু আয়াসে নিতান্ত অযোগ্য টিচার পাওয়া যায়; ইহারই বা প্রাচুর্য কোথায়? উন্নতি কৈ? নারী যে সকল অধিকার অর্জনশীলী পূর্বে পাইয়াছিলেন, তাহারই মর্যাদা কি পূর্ণমাত্রায় রাখিতে পারিয়াছেন যে, অধিকতর দাবী করিবেন? কেহ বলিবেন,—যদি মেয়েদের ডাক্তারী ও মাষ্টারী করাতে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাদের ব্যারিষ্টারী বা কেরানীগিরি করায় অন্ত কিসের? তার উত্তর এই যে, যে কার্যে মেয়ের অধিকার ছিল এবং তার সর্বপ্রত্যক্ষ কারণও বর্তমান দেখা যায়, সে কার্যের সংস্কার বা উন্নতিতে আপত্তি করিবে, এমন মূঢ় কে আছে? ধাত্রীবিঠা-শিক্ষা চিরদিনই নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। পূর্বে এ বিঠা নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষা করিত, আজ না হয় এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরাও করিতেছেন। এটাকে অনধিকার-চর্চা কেহই বলিতে পারেন না। আর নারী-শিক্ষা পূর্বেও মা-ঠাকুরমাতেই দিতেন, কোথাও কোথাও শিক্ষিতা বৈষ্ণবী বা শ্রাবীণা বিধবাগণও বাড়ী বাড়ী গিয়া পুরাণ-কথা প্রভৃতি মৌখিক শিক্ষা, কেহ বা বর্ণশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন—ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর শিক্ষা ও তাঁহার ইজ্জতরক্ষা নারীর নিকট হইতেই হইয়াছে এবং হওয়াও সম্ভব। অতএব এই সম্বন্ধীয় উন্নতি যতটা হয়, ততই মঙ্গল। এজন্য কতকগুলি মেয়ের—যত দিন না মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা পুরুষদিগের সহিত পৃথকভাবে ব্যবস্থিত হইতেছে, তত দিনের জন্ত এই পুরুষোচিতভাবে ব্যবস্থিত কালৈজিক শিক্ষা গ্রহণ ও তাহাতেই পাশ করার প্রয়োজন—তাও মানি, [এ স্থলে বলিয়া রাখি, আমি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একেবারেই বিরোধী নহি। মাত্র, শরীরের 'পক্ষে' যাহা কার্যকরী হইবে, ভবিষ্যজীবনে ফলপ্রসূ হইবে, তেমন শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষ মাত্র] এবং সকল মেয়েরই বিদ্যা-বুদ্ধি বা জ্ঞান-পিপাসা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই গৃহের বল্যাণ, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু ইহার মূলে যদি ধর্ম-শিক্ষা ও বিনয়শিক্ষা থাকে, তবেই সে সমুদায় শোভন

হয়। বিজ্ঞা যখন বিনয়ের জননী, তখন বিপরীত প্রমাণ দেখাইলে চলবে কেন? আর সেই শিক্ষাটা আগাগোড়া পুরুষোচিত না হইয়া মেয়েদের জীবনযাত্রার উপযোগিতাবে কতকটা বিহিত হয়, এইটুকুই আমরা চাই ও উচিত বলিয়া মনে করি। ইদানীং কেহ কেহ নারীকে 'দেবী' বলার বিশেষ বিরোধী। অথচ এ দিকে আবার ইহার বিপরীতে অর্থাৎ "দিন্কা মোহিনী রাতকা ডাকিনী" এই তুলসী দৌহাকেও তো ইহার। অবমানজনক বলিয়াছেন? অতএব তাঁদের সাপও বলিবে না, সাপিনীও বলিবে না, তবে কি বলিবে? তাঁরা বলেন, 'আমরা দেবী হইতে চাহি না, নারী হইতে চাহি।' আমিও তো তাই বলি, যদি সত্যই নারী হইতে চাহেন তবে নারীর কর্তব্য শিক্ষা গ্রহণ করুন; নারীর ব্রত, নারীর ধর্ম পালন করুন; নারীর কর্তব্য

সম্পাদন করুন।] দেবীত্বে ও "মহিমাবিত্তা" নারীত্বে বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। নারীর ভাগ, সংঘম, নিষ্কাম সাধনা ও আত্মবিস্মৃত প্রেমকেই লোকে 'দেবীত্ব' দান করিয়া থাকে, তার রক্তমাংসের শরীরটাকে তো নহে। আর এইগুলিকে ছাটিয়া দিলে নারীরও যে সকল মহিমা বিলুপ্ত হয়! 'মহিমাবিত্তা' নারী সংসার-বাসিনী,—তিনি পিতার কন্যা, স্বামীর সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী; 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিত্র' প্রিয়শিষ্যা ইত্যাদি এবং তাঁর সম্ভানের মা। তিনি স্বতন্ত্রা, স্বাবলম্বিনী ও স্বার্থপর। সীতা, সাবিত্রী, সতী, অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী ইহাদের সকলেই পতিব্রতা ও নারী-কর্তব্যে মহিমাময়ী ছিলেন—তাই না আজ তাঁরা লোকচক্ষে দেবী! নতুবা তাঁরা তো আর দণ্ডভূজা বা শতশীর্ষা ছিলেন না।

সম্পূর্ণ

ত্রিপুরেশ্বরী

(ঐতিহাসিক নাটিকা)

প্রস্তাবনা

(নারী ও বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

প্রলয়ের কালে যখন কারণজলে ডুবল ধরা
(তখন) পুরুষ হ'লেন পুরুষ-হারা
বিশ্ব হ'ল জ্যোন্তমরা
আবার, এ জগত উঠলো জেগে
আত্মনারীর বীণার তানে
তাই, নারী বেধার সম্প্রতি
(জেনো) নারায়ণের বাস সেখানে ।
যে দিনে নারীর মুখে বেদ-বেদান্ত হ'ত গীত
সে দিনের নরের মস্তে মৃত হ'তো সঞ্জীবিত
দেখ, মহিষ-মর্দিনীর কোলে
জন্ম নিলেন তারকারি
আর, বাগ্মীকি-ব্যাস অমর হ'লেন
বাগ্‌বাদিনীর সেবা করি
পদ্মবোনির আরাধনার হয় তো জীবের মুক্তি ঘটে,
পদ্মালয়ার করলে পূজা বিশ্বনাথে কীর্তি রটে,
নারীর মুখের তিরস্কারে সৃষ্টি হ'ল তুলসী-পাখা,
কালিদাসের অমর কীর্তি সেখানে সেই নারীর কথা,
স্মরণ রেখ এই কথাটি বিশ্বপতির অর্দ্ধ যিনি
শক্তি তিনিই সকল জীবের,
তুচ্ছ তিনি নন কখনই । [প্রস্থান ।

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—ত্রিপুরাধিপতি সিংহভূজের অন্তঃপুরস্থ শয়নকক্ষ,
ত্রিপুরেশ্বর শস্যের অর্দ্ধশায়িতভাবে বৈপ্রহরিক
বিশ্রাম করিতেছেন । এক জন কিসরী
ব্যজন করিতেছে, অপর
পদসেবানিরত]

রাজা । (স্বগত) কি হবে অনর্থক এই
বলকরে ? এই সুখের পৃথিবী, এই অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ
রাজসম্পদ, এমন অলোকসামান্য প্রেমময়ী জীবন-
মজিনী, আনন্দময় হর্ষভ জীবন, এ সমস্তকে অনাবশ্যক

বৈরিতায় এক মুহূর্তে ধ্বংস ক'রে ফেলার লাভ কি ?
মন্ত্রিদলের প্ররোচনার আরা কানরাজ-প্রেরিত গোড়-
পতির বহুমূল্য উপচৌকনগুলি গ্রহণ করাই তখন
খুঁটতাই হয়েছিল ! কিন্তু এখনও তার প্রতীকার আছে ।
সেই রত্নরাজি ফিরিয়ে দিয়ে সক্রিয় প্রস্তাব করলে
নিশ্চয়ই গোড়েশ্বর তা' সমর্থন করবেন । এখনই তার
ব্যবস্থা করিয়ে ফেলি—ইহাই সঙ্গত ।

(ত্রিপুরেশ্বরের প্রবেশ)

ত্রিপুরেশ্বরী । মহারাজ ! মহারাজ কি শত্রু
শিরের লয়ে এমনই গাঢ় নিদ্রায় নিমজ্জিত আছেন যে,
এই উচ্চ আহ্বানও তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না ? ধন্য ।

রাজা । (মনে মনে) প্রেমময়ীর আজ এমন
কঠোর স্বর ! এমন কর্কশ ভাষা ! এ কি হ'ল !

ত্রিপুরেশ্বরী । (অঙ্গস্পর্শপূর্বক) সুখনিদ্রা পরি-
ত্যাগ করুন, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে ।

রাজা । (চক্ষু চাহিয়া) কি হয়েছে মহারাণি ?

রাণী । শুনিলাম, গোড়পতির সহিত সক্রিয়
প্রস্তাব হইতেছে ? এ কি অবিদ্বান্স জনরব মহারাজ ?

রাজা । অবিদ্বান্স কেন দেবি ?

রাণী । অবিদ্বান্স কেন ? মহারাজ ! আপনার
পূর্বপুরুষগণ কি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ছিলেন না ?
আপনি কি তাঁদের বংশধর নছেন ? আপনার ত্রিপুর-
বিজয়ী ত্রিপুরারিসম সহস্র সহস্র শিক্ষিত সৈন্যদল তো
কৈ আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই ? আপনি তো
বার্দ্ধক্যজীর্ণ জরাজর্জর ও রোগহর্ষল নছেন ! তবে
কেনন করিয়া বিশ্বাস করিব রাজেন্দ্র, যে, স্বয়ং যে
বিবাদের সূচনা তৈরী করিয়া দূরদেশ হ'তে তাদের
আমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, এখন সেই অবিদ্বান্সকারিতার
জন্ত অমৃতপ্ত হয়ে সেই দারসমাগত অতিথির যথোচিত
কাল্পধর্ম্যমোদিতভাবে অভ্যর্থনা সশস্ত্রে না ক'রে
পাণ্ডার্থাদানে সম্পন্ন কর্তে ইচ্ছুক হয়েছেন ? এ যে
একান্তই অবিদ্বান্স মহারাজ !

রাজা । (লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, পরে কহি-
লেন, (বৃথা এ অহঃবাগ মহারাণি ! অনর্থক

আত্মপ্রাণভয়ে ভীত হয়েই যে আমি আমার বুদ্ধাভি-
যুখী সৈন্তদলকে বিমুখ করছি, এরূপ সন্দেহ করো না।
নারী তুমি, জানো না যে, পরাক্রান্ত গোড়াধিপতির
সেনাবল কি অপরিমিত, তাঁর ধনবলও আবার সেই
জনবলেরই অনুরূপ! সেই অসীম সৈন্ত-সাগরের
তুলনায় আমার সৈন্তগণ সমুদ্রের নিকট গোপ্পদের
মতই নগণ্য। কোন্ ভরসায় আমি ঐ উন্নত সাগর-
সদৃশ বিশাল গোড়াধিপতির অসম্ভব প্রতিরোধ-চেষ্টায়
আমার নিরপরাধ প্রজাবৃন্দকে উৎসাহিত ও বিনষ্ট
করবো?

রাণী। কোন্ ভরসায়? উত্তর-সারথি পার্থ
কোন্ ভরসায় অনন্তসহায় একা সেই শৃঙ্খল সমুদ্র-
বীচিমালা সম তুলিত অসংখ্য মহাপরাক্রান্ত কোরব-
বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন? কোন্ ভরসায়
সুরক্ষিত লক্ষ্যপূরীর প্রাসাদ-তোরণে অশিক্ষিত বক্ত
বাহিনী সঙ্গে রঘুকুলপ্রদীপ দুর্লভা সাগর লজ্জিয়া
অবরোধ করেছিলেন? ত্রিপুরেশ্বর! সেই ক্ষাল-
শোণিত কি তোমারও শিরাসমূহে প্রবাহিত হচ্ছে না?
নারী আমি? না মহারাজ! আমার সংশয় হয়,
বিধাতা নরদেহে তোমাকেই আমার পরিবর্তে নারীত্ব
প্রদান করে ফেলেছেন!

রাজা। (সোহিষ্ণে) অর্জুন ও রামচন্দ্র এক-
বারই জন্ম নিয়েছিলেন, কোথায় কত উচ্ছে তাঁদের
স্থান আর কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি!

রাণী। (স্বগত) তোমার ভীকৃত্য লইয়া তুমি
এই রত্নপর্যাক্ষে শয়ান থাক, আমার ত্রিপুরসৈন্তকে
আমি তাদের মরণার্থ হারাতে দিব না। (দাসীদের
প্রতি) তোরা চ'লে যা।—

[দাসীদের সসম্মুখে প্রণামান্তর প্রস্থান।

(মহারাজের চরণে মস্তক রাখিয়া)

শুনুন মহারাজ! যতক্ষণ না গোড়সেনা ত্রিপুর-
সীমান্ত পরিত্যাগ করে চ'লে যাচ্ছে,—ততক্ষণের জন্ত
আপনি আমার বন্দী। আজ্ঞা দিন আপনাকে
বন্দী করতে—মহারাজ! দাসীর এ অনুরোধ রাখুন!

রাজা। (আদর করিয়া) তোমার অনুরোধ
কি ঠেলে পাবি? তথাস্ত! আমি তোমারই বন্দী।
[ত্রিপুরেশ্বরী সিংহিনীসদৃশ অটলচরণে কক্ষ-বাহিষে
আসিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন]

রাণী।—কে আছিস?

রাজা।—এ কি! এ যে সত্যই আমার বন্দী
করলে!

প্রতিহারীদ্বয়। কি আদেশ মহারাজি।

রাণী। বিনা অনুমতিতে কেহ যেন এই কক্ষের
দ্বার মুক্ত না করে। স্বয়ং রাজ্যেশ্বরের আদেশেও
নয়।—এ তাঁহারই আজ্ঞা।

প্রতিহারীদ্বয়। যে আজ্ঞে—স্বয়ং রাজ্যেশ্বরের
আদেশেও নয়—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ত্রিপুরা-রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর।

কাল অপরাহ্ন, মূলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, যুবরাজের
প্রমোদ গৃহ। পুষ্পান্তরণা রাগবধু বিজয়াদেবী
বীণাধরে বর্ষারাগিণী আলাপ করিতেছেন,
যুবরাজ তানপুরা লইয়া সঙ্গত করিতেছেন।

(বিজয়ার গীত)

বাদল রাতে বরিষে ধারা
ঝরে, ঝরে, ঝরে, অঝোরে পাগল-পারা।
চপলা উঠে হাসিয়া,— গভীর ধ্বাস্ত নাশিয়া,
মত্ত দাহরী, ডাকিছে ফুকারি,
বাতাস হাহা করে আপন-হারা।—
তারই ব্যাকুল স্বরে, পরাণ কেমন করে,—

(সহসা কক্ষমধ্যে মহারাণীর প্রবেশ)

রাণী। (তীব্রস্বরে) কুঞ্জ, বিজয়া! এই কি
তোমাদের প্রেমলাপ ও সঙ্গীতালাপের উপযুক্ত
কাল?

[উভয়েই চমকিয়া যন্ত্র ফেলিয়া দিলেন ও সলজ্জে
উঠিয়া প্রণাম করিলেন ও বদ্ধাজলি হইলেন]

রাণী। গোড়সৈন্ত নগরবরোধ করতে আসছে,
সে সংবাদ রাখ কি ত্রিপুর-যুবরাজ?

যুবরাজ। (গভীর লজ্জায় সবিনয়ে) জানি মা!
কিন্তু গোড় হ'তে আমাদের আর অমঙ্গলাশঙ্কা নাই।
মহারাজ কল্য প্রভাতেই সজ্জিত প্রস্তাব করে দূত
প্রেরণ করবেন।

রাণী। দিক্ দিক্ কাপুরুষ! কেন মাতৃগর্ভে
তোমার মৃত্যু ঘটে নি? শোন কুঞ্জ! গোড়সেনা
নগরদ্বারে পৌঁছবার পূর্বেই ত্রিপুর-সৈন্ত তাদের অন্ত
দ্বারা বধাবিহিত সংবর্ধনা করবে। আমি এ যুদ্ধের
সেনাপতি। সাহস থাকে, আমার পশ্চাতে এস, না
থাকে, এইখানে বন্দী থাক, বুদ্ধান্তে মুক্তি পাবে।
—বিজয়া!

রাজবধু। (নিকটে আসিয়া) আর্যো! আমার
আপনার সঙ্গে নিন; আপনার দত্ত শিক্কা আর
আমার সার্থক হোক।

রাণী। (সম্মেহে) বীরপুত্রের জননী হরো!
এস মা!—

যুবরাজ। মা! আমি কি তোমার গর্ভে বাস
করি নি? যতই অসাধ্য হোক, তবু তোমার আদেশ
যখন, তখন হোক জয়, হোক পরাজয়, এ যুদ্ধে যাত্রা
তো করতেই হবে।

রাণী। হোক জয়, হোক পরাজয়!—কেন এ
দ্বিধা?—না না, হৃদয়ে অনন্ত বল, অন্তরে
অসীম ভরসা লয়ে এস, অন্তরেরও অন্তস্তল হ'তে সূদৃঢ়
প্রত্যয়ে বল, হবে জয়, নাহি পরাজয়!—

[সকলের প্রস্থান।]

তার দৃশ্য

ত্রিপুর-সৈন্তগণ।

উঠিয়া সৈন্তদল দেখিতেছিল, দূরে
কাশ জুড়িয়া ধূলিজাল উড়াইয়া
সর্বজয়ী বিপুল সৈন্তদল
বগরদ্বারাভিমুখে ছুটিয়া
আসিতেছে।

এখনও গোড়সেনার মূর্তি স্পষ্ট
ধায় না, কিন্তু অশ্ব-খুরোখিত
ব্যো অসংখ্য মুণ্ডলহরী চেনা যাচ্ছে।

সৈনিক। উঃ, মনে হচ্ছে, যেন একটা
পর্বত-প্রাচীর সচল হয়ে ছুটে আসছে!
সৈনিক। অথবা একটা প্রবল জলপ্লাবন!
দেখতে সেটা এসে এখনই সমস্ত
কে তার করাল জঠরতলে গ্রাস ক'রে নেবে।

।। দাবানলও বলতে পার। ঐ শোন,
র তাদের অশ্বগজদের হেঁচা ও বৃহিত
গুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ওঃ, কি পরিতাপ!
।। শিশুর মতন অসহায়ভাবে ঐ বৈদেশিক
র প্রবল তরঙ্গে মর্দিত হয়ে মরতে হবে,
বাধা দিবার সামর্থ্যও নেই! ক্ষত্রিয়ের
ক ভীষণ লজ্জা! কি পরিতাপ!

ঠে। কি ভীষণ লজ্জা! কি অপমান!

নকেই কোষ হইতে অসি মুক্ত করিল)

রাজার আদেশ, শত্রুকে শত্রু দ্বারা নয়,
।। অভিনন্দন করতে হবে, কিন্তু আমরা
নট-ভাটের কার্য আমরা কেমন ক'রে
রতে জানলে তো! শত্রু-সম্ভাষণের
ক'রা আমাদের জানা আছে।

বীরধর্মের বিরোধী আদেশ।

৫ম। যদি এ আদেশ আমরা না মানি,
তা'তেও আমাদের অপরাধ হয় না। প্রভুর
আদেশ যেখানে ধর্মের হানিকর, সেখানে রাজাদেশ
অগ্রাহ্য।—ধর্ম রাজারও উপর।

৩য়। ধর্মবিরোধী রাজাদেশ অগ্রাহ্য করলে
অত্মায় হয় না? তা' হ'লে—

(নেপথ্যে) না, ধর্মবিরোধী রাজাদেশ অগ্রাহ্য
করলে অত্মায় বা অপরাধ হয় না। পুত্রগণ!
তোমাদের সিদ্ধান্তই ঠিক! বীর, শত্রুকে তার
সনাতন পথেই অভ্যর্থনা করতে অধিকারী।
সৈনিকবৃতি গ্রহণ ক'রে ভাটবৃতি করতে তোমরা
কখনই বাধ্য নও।

(বর্ষা-চন্দ্রাবর্তা বীরেন্দ্রাণী-বেশে ত্রিপুরেশ্বরীর
প্রবেশ, যুবরাজ ও যুবরাজীও তদ্রূপ যোদ্ধা-বেশে
ভাঁহার পশ্চাতে প্রবিষ্ট হইলেন)

রাণী। ত্রিপুরাধিষ্ঠিত ত্রিপুর-বিজয়ী দেবাদি-
দেব মহাদেবের ভক্ত ত্রিপুরবীরবৃন্দ! তোমরা কি
বৈদেশিকের সগর্ব-পদলাঙ্গিতা ধরণীর ধূলির
উপর মাথা লুটিয়ে তাদের স্পর্দিত মস্তককে
আরও উচ্চতর দেখতে চাও? অথবা দেবী
ত্রিপুরার নিকট উৎসর্গিত, চতুর্দশ দেবতার নিকট
নিবেদিত ও তাঁদের প্রসন্নতার চিহ্ন-পরিচায়ক
পবিত্র যজ্ঞমাংসে উদর পূর্ণ ক'রে তাঁর প্রত্যাদেশ-
মত শত্রুকে স্বার্থ বীরধর্মায়ু্যমোদিতভাবে তীক্ষ্ণাণ
অস্ত্র দ্বারাই সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করবে?

বীরগণ। (সমকণ্ঠে আঘাত-মেঘের মতই গর্জিয়া
উঠিয়া) —অস্ত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করতে চাই মা!

রাণী। এস তবে, দেবতার প্রসাদ গ্রহণে বল-
বীর্ঘ্য ও সাহস সম্বদ্ধিত ক'রে নিয়ে এই বর্ষা-নিশীথেই
আমাদের যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। নির্ভীক
আক্রমণকারীরাই বিজয়লাভ ক'রে থাকে, ইহা
জেনে রাখ।

১ম ও ৫ম সৈনিক। মহারাজ আমাদের সেনা-
পতিষ নেবেন, কৈ, তাঁকে তো দেখছি নে মা?

রাণী। তিনি অমুস্থ, আমিই তোমাদের এ
যুদ্ধের সেনাপতি।

৭ম। মহারাজ অমুস্থ—

রাণী। সৈনিক! এখন কুলগৌরব-রক্ষার সময়,
স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষায় মনোযোগী হও,
পরিচর্যার প্রশস্ত পাল প'রে

সকলে।

মহারাজী চম্পা

(গীত)

চল রে চল রে চল রে তোরা জীবন-আহবে চল,
বাজবে সেথা রণভেবী আসবে প্রাণে বল।

জীবন-আহবে চল

বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে

লাগুক জীবন দেশের কাজে,

জীবন গেলে জীবন পাবে, হবে এ জীবন সফল

চল চল চল।

[গাহিতে গাহিতে সকলের গ্রন্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

তোরণ-বাহির্ভাগ।

[ত্রিপুরেশ্বরী, কুঞ্জকা, বিজয়া, ত্রিপুর-সৈনিকগণ ও
বহুতর নাগরিক, যুবা, বৃদ্ধ, বালক ও
নারীগণ সশস্ত্র প্রবেশ করিল]

সমবেত কণ্ঠে—জয় চম্পামহারানীর জয়!

জয় মা ত্রিপুরেশ্বরী!

(গীত)

হও গো ধন দেশের জন্ত জীবন করিয়া পণ,
জননীর তরে সঁপি অকাতরে জীবন-যৌবন-ধন,
তাহে মৃত্যু বরিতে হয়, হোক না কিসের ভয়,
অমর কেহ তো নয়, ভয়ুর এ জীবন,
জীবন কর রে পণ।

যদি স্বদেশের হিতে প্রাণ পার দিতে জন্ম সফল হবে,
যাবৎ এ ক্ষিতি রহিবে কীর্তি অক্ষয় যশ রবে,
দিয়ে নশ্বর প্রাণ, লও অবিনশ্বর মান,
যে জন কীর্তিমান, চিরজীবী সেই ভবে,
শুধু বাঁচিয়া কি ফল তবে?

যদি প্রাণ পেতে চাও মান পেতে চাও

অর্পহ প্রাণমন,

দেশের জন্ত দেশের জন্ত জীবন করিয়া পণ।

পঞ্চম দৃশ্য

বৃদ্ধকক্ষে মহারাজা দিগন্ত আসীন।

রাজা। কৈ, কোথাও কোন শব্দটি পর্যন্ত
নাই। পুরী একেবারে জনহীন শ্মশানের মতই
স্তব্ধ নিঃসাড়। মহারানী ত্রিপুরাবাসী নরনারী
কেই দেখছি এই মহাহবে আছতি দান করতে
কাজ নেই।

ব্যবহা-পতন

দেখছি বাদ দেন নি। উঃ, কি দুর্দমনীয় তেজ ও
অহমিকা ঐ নারীর! সিংহিনী বা সিংহবাহিনী কি
যে ঠেকে মনে করবো, ভেবে পাইনে। নারী হয়ে এত
বড় রক্তপিপাসিনী আমি আর কখনও কাঁকেও
দেখি নি এবং শুনিও নি। হায় আমার ত্রিপুরা!
অসহায় ক্ষুদ্র ত্রিপুরা! শাস্ত্রনিষিদ্ধ জীনাগকের হাতে
পড়ে তুমি অনর্থক আজ ধ্বংস হ'তে বসেছ—

ঐ উষাদেবী তাঁর রক্তপদ্মপ্রভ চরণ ফেলে ধীর-
মহুর-গমনে: পূর্বাকাশ-উপকূলে দেখা দিলেন। ঐ
লোহিত-রক্তরাগ! উঃ, এ যে আমার সহ হচ্ছে
না! এ কি আমার ত্রিপুর-প্রজার রক্তশ্রোতের
প্রতিচ্ছবি? হয় তো এতক্ষণে প্রবল শত্রুসেনার হস্তে

কুবের হস্তে পড়বে।

নর-নারী সকল মর্দিত, ধর্ষিত,
ঐ উজ্জল রশ্মিচ্ছটা! ও কি শত্রু-
প্রতিবিম্বিত হয়ে অমন তীক্ষ্ণতর

সূর্য্য অবসানের পথে ঢলে প
সুখসূর্য্যও এতক্ষণে অস্তাচলগামী হ
উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার! এ

অন্ধকারেই ত্রিপুরার চির-ভবিষ্যৎ অ
(নেপথ্যে ঘোর কোলাহল)

গৌড়সেনার জয়-কোলাহল! আর
শত্রুসৈন্য শূন্য পুরী অধিকার করতে আসছে
কি দুর্দৈব! আমি কি এমনি জালবদ্ধ মুষ্টিবে
শত্রু-হস্তে নিহত হবো? ওরে অকর্ম্মণ্য ভীরা
ধর্ম, তোর ভীরাতার এই বুঝি সমুচিত ফল! না
সে অক্ষয়কীর্তির অম্লান যশের অধিকার নিয়ে
প্রার্থিতভাবে প্রাণ দিলে, আর তুই—(কো
নিকটতর হইল) নাঃ, একখানা তরবারি
নেই, ওঃ!—ওঃ! পাষাণি! পাষাণি! এ কি
নির্ম্মম প্রতিশোধ! (ঘারমুক্ত হইল) ন
অবিমুখ্যকারিতার এই ফল! এ কি! এ কি

(আলুলায়িতকুন্তলা দীনবেশিনী

চম্পাদেবী আসিয়া নতজানু হইলেন—

রাণী। রাজন্! গৌড়সৈন্য

হস্তে ধ্বংস হয়েছে। ত্রিপুরা অ
এক্ষণে এই রাজদ্রোহিণীর যথ
পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করুন।

রাজা। (উঠিয়া) দেবি

(নেপথ্যে) জয় মা ত্রিপুরা

চম্পামহারানীর জয়।